Registered N0 65.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ।	১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
১ম সংখ্যা।	14th April, 1927.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

দুঃখই মঙ্গল!

আমার তরে তোমার বিধান
কোন্ মঙ্গলের পথে
বুঝিতে দিলে না তা' যে
আজও কোন মতে!
অন্ধ আমি—বদ্ধ আমি,
অজ্ঞ অভাজন,
তাই বুঝি হ'ল না মোর
মঙ্গল-বরণ?
অন্তরে বাহিরে দুই
আঁধারের খেলা—
মিলাইছে নিত্য নূতন
দুঃখের আঁধার-মেলা।
আমি কি তোমার মনোমত,
সুখের লীলা-ভূমি?
দুঃখরূপী হ'য়ে তাই
লীলা কর তুমি?
দুঃখ হউক মিষ্ট তবে
মিষ্ট অশ্রুজল!
মাথা পাতি' বিধান মানি—
দুঃখই মঙ্গল!

শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী

হে নিত্য-ক্রিয়াশীল বিশ্ববিধাতা, তুমি নিয়ত তোমার এই জগতকে অবিরাম গতিতে উন্নতি ও কল্যাণের পথে নিয়া চলিয়াছ—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পুরাতনকে অতিক্রম করিয়া নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছ। এখানে কাহাকেও তুমি একই ভাবে বসিয়া থাকিতে দেও না, কাহার জন্য পশ্চাৎগতিও নির্দ্দেশ কর নাই। আমরা তোমার উন্নতি-স্রোতে আপনাদিগকে অর্পণ না করিয়া, আপনার অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ, সময় সময় তোমার বিরুদ্ধ পথে চলি বটে, অবনতির পথে ছুটি সত্য; কিন্তু তোমার অসীম প্রেমে ও মঙ্গল বিধানে বেশী দূর যাইতে পারি না—নানা প্রকার দুঃখ বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া, বিবিধ প্রতিবন্ধকতায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া, ফিরিয়া আসিতেই হয়। সেই বক্রগতিতেই তুমি আমাদিগকে তোমার উন্নতি ও কল্যাণের নূতন পথে নূতন ভাবে অগ্রসর না করিয়া ছাড় না। তুমি কখনও আমাদিগকে ঠিক আমাদের পথে চলিতে দেও না। আমাদের সকল ইচ্ছা ও কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, একটা নূতন বক্রপথেই আমাদিগকে চালিত কর। তাই জগৎকে যেমন তুমি নিত্য নূতন রাজ্যে অগ্রসর করিতেছ, আমাদের জীবনকেও তেমনি তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার দিকেই লইয়া যাইবার আয়োজন করিতেছ। তোমার করুণায় প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের নিকট নূতন আশা, নূতন শক্তি লইয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু হে হৃদয়-দর্শী দেবতা, তুমি দেখিতেছ আমরা সকল সময় তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাই যদিও প্রতিমুহূর্ত্তে তুমি আমাদের জন্য নূতন জীবন লইয়া উপস্থিত হও, আমরা অনেক সময় আপন দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত হই। হে করুণাময় পিতা, আমাদের নিকট তুমি যে নূতন বর্ষ আনিলে, ইহাতে যাহাতে আমরা নূতন

আমাদিগকে সে বল ও বুদ্ধি প্রদান কর। তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। তুমি আমাদের সকলকে নব জীবন প্রদান কর। নববর্ষে তোমার ইচ্ছাই সকল জীবনে পূর্ণ-ভাবে জয়যুক্ত হউক। তোমার পবিত্র রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

নূতন দৃষ্টিলাভ—পুরাণ দৃষ্টি ল'য়ে প্রকৃত দেখা হয় না। তোমরা কেবল জড় দেখ, তোমরা কেবল মানুষের মধ্যে পশুত্বের খেলাই দেখ, তোমরা কেবল কদর্য্যতাই লক্ষ্য কর। তোমাদের যে দৃষ্টি আছে, ও-দৃষ্টিতে দেখা হয় না; ঐ দৃষ্টি ল'য়ে তোমরা কেবলই ভ্রমে পতিত হ'চ্ছে। তাই জগতে আনন্দ পাও না, সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর না, পুণ্য দেখ্‌তে পাও না। আজ নূতন দৃষ্টি লাভ কর; নূতন ভাবে দেখ; দেখ্‌বে যেখানে কদর্য্যতা সেখানেও সৌন্দর্য্য রয়েছে; সৌন্দর্য্য ও আনন্দের খেলা জগতে চল্‌ছে। বিশ্ব আনন্দে নৃত্য ক'চ্ছে। যাকে কুৎসিত দেখ, তার মুখেও কি সৌন্দর্য্যের আভা! যাকে নিষ্ঠুর, নির্ম্মম বল, তার ভিতরেও কত প্রেমের লীলা। যাকে পাপী ব'লে, মলিন ব'লে ত্যাগ কর, তার প্রাণে কত উদারতা, কত প্রেম, কত ত্যাগ! বাহিরের চোখে কিছুই দেখা যায় না; অন্তরের দৃষ্টি খোল। বাহিরের আবরণের পশ্চাতে যে সৌন্দর্য্য, যে মাধুর্য্য, যে প্রেম, যে ত্যাগ, যে আনন্দ রয়েছে, তাহাই দেখে তৃপ্ত হও। নূতন দৃষ্টি লাভ কর।

আমার কামনা—আমাকে সুখে রাখ, আমি এ কামনা করি না। দুঃখ পাই, বেদনা পাই, তাতেই যদি কল্যাণ হয়, তবে তাহাই হউক; কিন্তু তোমার প্রতি নির্ভর রেখে যেন দুঃখ বেদনা বহন কর্‌তে পারি। আমাকে লোকে ভালবাসা দিবে, আদর কর্‌বে, এ কামনা আমি করি না; আমি যেন সকলকে প্রেম বিলাতে পারি, প্রিয়জনের উপেক্ষা ও অনাদর পেয়েও যেন প্রীতি দিতে পারি; কল্যাণ কর্‌তে পারি! শোক আসুক, তাপ আসুক, তাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু সেই শোক তাপের ভিতরেও যেন তোমার কল্যাণময়ী মূর্ত্তি দেখে নিরুদ্বেগ হ'তে পারি। বিপদজাল ঘনিয়ে আসুক, তাতে আমার ভয় নাই; কিন্তু বিপদের মধ্যে তোমার মুখ দেখে যেন অভয় হ'তে পারি। পাপ প্রলোভন আসুক, তাতে আমি ভীত নই; কিন্তু তার ভিতরেও যে তোমার প্রেমের আলিঙ্গনের মধ্যে আছি, তা অনুভব ক'রে যেন পাপ ও প্রলোভনকে জয় কর্‌তে পারি। লোকে আমাকে নিন্দা কিম্বা প্রশংসা করুক, তাতে আমার আসে যায় না; কিন্তু তোমার প্রেমে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সকল নিন্দা ও প্রশংসার ভিতরে যেন দেশের ও দশের সেবা কর্‌তে পারি। লোকে আমার কাজ বুঝুক আর না বুঝুক, আমি যেন সকলকে ভালবেসে তাদের কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণসাধন কর্‌তে পারি।

সম্পাদকীয়।

নূতন ও পুরাতন বর্ষ—নানা আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, উত্থান পতন, জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়া আর একটি বৎসর চলিয়া গেল। যে ভাবে আমরা ইহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম, সেই ভাবেই যদি ইহাকে বিদায় দিতে পারিতাম, তবে কত আনন্দেই আজ আমরা নূতন বৎসরকে আবার অভিনন্দন করিতে পারিতাম! দুঃখের বিষয়, আমাদের আলস্য উদাসীনতা, ত্রুটি দুর্ব্বলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও বিরোধিতা বশতঃ পুরাতন বৎসর আমাদিগকে যেখানে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিত, সেখানে আনিতে সমর্থ হয় নাই। তাহা হইতে আমরা যে গতি ও শক্তি লাভ করিতে পারিতাম, আমাদের জীবনে তাহার একান্ত অভাবই দেখিতে পাইতেছি। গত বর্ষের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে অনেক বিষয়ে আমাদের হৃদয় আশার পরিবর্ত্তে নিরাশায়ই ম্রিয়মাণ হয়। আমরা জানি, আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল লোকের পক্ষে অবিরাম গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না, তাই আমরা যদি কঠিন সংগ্রামের মধ্যে সকল সময় জয়লাভ নাও করিতে পারি, সময় সময় পরাজিতও হই, তথাপি আমাদের নিরাশ হইবার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল প্রকার জয় পরাজয় উত্থান পতনের মধ্যে যদি দেখিতে পাই, আমরা যে সত্য শিবসুন্দরের পবিত্র নিশানতলে সকলে মিলিত হইয়াছি, তাহার গৌরব রক্ষা করিবার জন্য সকলে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছি না, আলস্য ঔদাস্য বা স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ অথবা কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া, তাহাকে পদদলিত করিতেছি বা ধূলিধূসরিত হইতে দিতেছি, জীবনদেবতার উন্নত পতাকার স্থলে আত্মগৌরবের ক্ষুদ্র নিশানটি প্রোথিত করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি না, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে তাহার মধ্যে আশার স্থান অতি অল্পই আছে, নিরাশার কারণ যথেষ্টই রহিয়াছে। সকল সময়ে সকল বিষয়ে আদর্শকে রক্ষা করিয়া চলা কঠিন সন্দেহ নাই; কাজেই বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া তাহা হইতে বিচ্যুতি আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু অনুতপ্ত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যদি না থাকে, তবে নিশ্চয়ই উহাকে মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া, নিতান্ত দুর্গতির অবস্থা বলিয়া, গণ্য করিতে হইবে,—সেরূপ স্থলে পুনরুত্থান সুদূরপরাহতই মনে করিতে হইবে। আর যদি শুধু কোনও একজনের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, বহু লোকের মধ্যেই এরূপ দৃষ্ট হয়, যাহারা নিজ জীবনে উক্ত প্রকার ব্যবহার হইতে দূরে থাকে তাহারাও, যদি অন্যের মধ্যে উহাকে রোধ করিতে সচেষ্ট না হইয়া, বরং সমর্থনদ্বারা বর্দ্ধিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, দেখিতে পাওয়া যায়, তবে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার যথেষ্ট পরিচয় চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তাহার প্রভাব যে কিয়ৎপরিমাণে আমাদের মধ্যেও দৃষ্ট না হইতেছে এরূপ বলা যায় না। আমাদের মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, যাহারা

ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, বিনা সংগ্রামে বিরুদ্ধ স্রোতেই ভাসিয়া চলিতেছে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ডুবিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না, লজ্জা বা বেদনা বোধ করিতেছে না, দলপুষ্টি সাধনদ্বারা সংখ্যাবাহুল্যের বলে আপনাদিগের জন্য সংসার-ক্ষেত্রে একটা গৌরবজনক স্থান করিয়া লইতে, স্ফীতবক্ষে উন্নত-মস্তকে জগতে দাঁড়াইতে বিধিমত চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখ-জনক হইলেও, ইহাতেই আশা বিসর্জ্জন দিবার কারণ নাই। কেন না, ইহাই প্রবলতম স্রোত নহে, ইহা শুধু একদিকের চিত্র মাত্র; উজ্জ্বলতর চিত্র, প্রবলতর স্রোতও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ত্তমান অবনতির গতিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য বহুলোক যে বদ্ধপরিকর হইতেছেন, উচ্চ আদর্শকে অক্ষুন্ন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন, উদাসীনতা অবহেলা পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহ উদ্যমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, কোনও প্রকারেই পাপের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইতেছেন না,—ইহা নিশ্চয়ই বিশেষ আশার কথা। দিন দিন বল লাভ করিয়া অবশেষে ইহারাই যে সর্ব্ববিজয়ী হইয়া উঠিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পুণ্যময়ের রাজ্যে সত্য ন্যায় পুণ্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং বিধাতা যে পক্ষে কার্য্য করিতেছেন, সে পক্ষ যে অনিবার্য্যরূপেই পরিণামে জয়লাভ করিবে, তাহা ত সুনিশ্চিত। অপূর্ণ মানুষ, মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার পথে চলিতে যাইয়াও, নানা ভুল ভ্রান্তিতে পতিত হয়; সেজন্য সময় সময় তাহাকে যে পরাজিত না হইতে হয়, এমন নহে। সে পরাজয় সাময়িক, তাহা তাহাকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে, পরিণামে জয়লাভ করিতেই, সাহায্য করে। ইহাতে আশাহত হইবার কোনও কারণ নাই।

শান্তস্বরূপ মঙ্গলময় বিধাতা যেরূপ ধীর শান্ত ভাবে আপনার কার্য্য করিয়া যান, মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। মানুষের জীবনে ভাবের উত্তেজনাই তাহার সকল কার্য্যের চালক। সে-ভাব যে সকল সময় জ্ঞানের অধীন থাকিয়া, সংযত অবস্থায় মানুষকে চালায়, তাহা নহে। বরং অধিকাংশ সময় অতি উদ্দাম অসংযত বেগেই উহাকে একদিকে টানিয়া লইয়া যায়—বিপথেও নিয়া ফেলে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ব্যতীত সংযম ও স্থিরবুদ্ধি আসে না। সুতরাং সাময়িক ব্যভিচার দেখিয়া আমাদের ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। যখন দুই বিপরীত স্রোতের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, দুই দলে সংগ্রাম বাঁধে, তখন উদ্বেলিত ভাবের উত্তেজনা না জন্মিয়া পারে না, উদ্গারিত ধূলিও বাষ্পের অন্ধকারময় মেঘসৃষ্টি অনিবার্য্যরূপেই ঘটে। কিন্তু সে অন্ধকারময় মেঘ কালে কাটিয়া যাইবে, শান্তিসূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক তাহার স্থান অধিকার করিবে, সকল দিক তাহার পবিত্র কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া নব জীবনে, নূতন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে, সমস্ত মণ্ডিত হইবে। সংগ্রাম ও সংঘর্ষ ব্যতীত অসারতা ও মলিনতা বর্জ্জিত হয় না, কদর্য্যতা ও অযোগ্যতা বিদূরিত হয় না, দীর্ঘকালের পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনা-রাশি অপসারিত হইতে পারে না। তবে একটা কথা [illegible] রাখিতে হইবে, শুধু সৈন্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ করা [illegible] না, শুধু-উৎসাহ উদ্যমে, আগ্রহে উত্তেজনায়, পাশব [illegible] ও সংখ্যাবাহুল্যে, সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায় না। স্থির ধীর শান্ত সুবিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া কার্য্য করিতে না পারিলে, সবই ব্যর্থ হইয়া যায়। অনেকে এই কথাটা ভুলিয়া, শুধু সংহত হইলেই যে যথেষ্ট হইল না, কেবল আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিতে গেলে যে চলে না, অভিজ্ঞ নেতার অধীনে সুপরিচালিত হওয়া যে অপরিহার্য্যরূপেই আবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারে না, বা স্মরণে রাখে না। ইহারা বার বার পরাজিত ও ব্যর্থকাম হইয়া অবশেষে অভিজ্ঞতায় শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সুবিবেচনার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে আর বৃথা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতে হয় না। এ বিষয়ে সর্ব্বোপরি বিশ্ববিধাতাকে যেমন অদ্বিতীয় নেতা ও চালক করিতে হইবে, তেমন অভিজ্ঞ সুবিবেচক মানুষের নেতৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে। অপরের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে হইলে যে বিচার বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তাহা নহে. পূর্ণস্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই এই অধীনতা স্বীকার সম্ভবপর, এবং উহাই করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে আপনার স্বেচ্ছাচারিতা ও কর্ত্তৃত্বস্পৃহাকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে,—অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন না দিলে কিছুতেই চলিবে না। যদিও আমাদের মধ্যে এই সুবিবেচনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না, তথাপি আশা আছে, দেখিয়া না শিখিলেও ঠেকিয়া শিখিতেই হইবে। সুতরাং আমরা আশা লইয়াই নববর্ষে প্রবেশ করিতেছি। যে পুরাতনকে আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছি, তাহা যতই অন্ধকারময় হউক না কেন, তাহা আমাদিগকে যতই দুর্ব্বল ও পঙ্গু করিয়া থাকুক না কেন, আমাদের সম্মুখ নিশ্চয়ই আলোকময়, দুর্ব্বল হইলেও আমরা মৃত নই, একেবারে শক্তিহীন নই—যত অল্পই হউক, চলিবার শক্তি আমাদের কিছু না কিছু আছেই, যত ধীর পাদক্ষেপেই হউক, আমরা নূতন বলে, নূতন উৎসাহে, নবজীবনের পথে একটু করিয়া অগ্রসর হইতে নিশ্চয়ই সমর্থ। তাহা ছাড়া বিশেষ আশারও যে অনেক কারণ আছে, সে-কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, শুধু আশার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আশা আমাদের প্রধান সহায় সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু আশা আমাদিগকে জীবনপথে একপদও অগ্রসর করিবে না, আমাদিগকে আপনার চেষ্টা যত্নেই সে পথে চলিতে হইবে; নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না। তাহার অর্থ অবশ্য এই নহে যে, আপনার চেষ্টা যত্ন, শক্তি সামর্থ্যের, উপরই নির্ভর রাখিতে হইবে, আপনার বলেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব। নির্ভর যে প্রেমস্বরূপ জীবনবিধাতার উপরই রাখিতে হইবে, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিতে [illegible] তাহার কৃপা ও শক্তি ভিন্ন আমরা কিছুই করিতে পারি না। তথাপি আমাদের যে টুকু করিবার, আমাদের উপর [illegible] নি যে ভার দিয়াছেন, [illegible] না করিলেও চলিবে [illegible] নানা জনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্ত্তব্য নানা প্র[illegible]র। বিভিন্ন লোকে তাহা আবার বিভিন্ন ভাবে দেখি[illegible] থাকে। কিন্তু সকলের সকল প্রকার কার্য্যের মূল উ[illegible] একই; সুতরাং সকলেরই মূল লক্ষ্য একই

হওয়া উচিত। অতএব আমাদের সকলকেই সেই মূল লক্ষ্যটির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেই মূল লক্ষ্যটি যে আমাদের সকল জীবনে ও কার্য্যে, জগতের সকল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ও কার্য্যে, সেই পুণ্যময় জীবনদেবতা ও বিশ্ববিধাতার পবিত্র ইচ্ছাকে পূর্ণভাবে জয়যুক্ত হইতে দেওয়া, তাঁহার পুণ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করা, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে—এ বিষয়ে ধর্ম্মার্থিদিগের মধ্যে তকোনও মতভেদ থাকিতেই পারে না; যাঁহারা ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া শুধু সরল ভাবে জগত্তত্ত্বের অনুশীলন করেন তাঁহারাও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সৃষ্টির পশ্চাতে যে মঙ্গলময়ী ইচ্ছা রহিয়াছে, তাহাকে অব্যাহত ভাবে কার্য্য করিতে দেওয়ার উপরই সকলের অনন্ত উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, বৈজ্ঞানিক আলোচনাও সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। আমরা যদি কোনও রূপে প্রতিরোধ না করিয়া সেই ইচ্ছাস্রোতে আপনাদিগকে অর্পণ করি, তাহা হইলে সাধারণ ভাবেই আমরা বিনা আয়াসে সকল প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের প্রত্যেকের ও জগতের সকল প্রকার দুঃখ দুর্গতির, পাপ মলিনতার, লাঞ্ছনা অবনতির একমাত্র কারণ যে আমাদের বিদ্রোহিতা, এই মঙ্গল ইচ্ছার বিরোধিতা, তাহা বোধ হয় অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। সকল প্রকার সংস্কারচেষ্টার মূলও যে এখানেই, এই ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার ঐক্যসাধনেই, এই আনুগত্য ও বাধ্যতা অর্জ্জনেই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। পাপ পুণ্যের যে অন্য কোনও অর্থ নাই, এই বিধিই যে জগতের অমোঘ বিধি, তাহা নীতিশাস্ত্রের সর্ব্বজনগ্রাহ্য মূল-সূত্র। কাজেই আমরা যাহাই করি না কেন, সকলের মধ্যে যদি এই মূল লক্ষ্যটিকে ধরিয়া থাকি, তবে আমরা কিছুতেই বিপথে চালিত হইব না, ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইলেও সহজেই আমরা ঠিক পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে, এবং কোনও অবস্থাতেই আমাদের কোনও ভয় বা আশঙ্কার কারণ থাকিবে না, কিছুতেই আমাদের অগ্রসরগতি রুদ্ধ হইবে না, আমাদের নিজের, সমাজের ও জগতের কোনও প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইবে না। তবে আমরা এই লক্ষ্য ও সংকল্প লইয়াই নববর্ষে প্রবেশ করি। করুণাময় পিতা আমাদিগকে নূতন আশা উদ্যম, উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা, বল ও শক্তি প্রদান করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতে সমর্থ করুন। আমাদের অপর সকল ইচ্ছা অভিরুচি, কর্ত্তৃত্ব ও নির্ভর বিদূরিত হউক তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজ ও মিলনমন্ত্র*

মিলনোৎসবের শঙ্খ [illegible]বার নূতন করিয়া বাজিয়া উঠিল বাজাও, তরুণগণ, এ শঙ্খ [illegible] ভাল করিয়া বাজাও। [illegible] গভীর ধ্বনিতে ব্রাহ্মসমাজে নূতন [illegible] সঞ্চার কর। যে ব্রাহ্মসমাজ একমেবাদ্বিতীয়মের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আপনি ঐক্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ভারতকে ঐক্য-বন্ধনে বাঁধিবে, যে ব্রাহ্মসমাজ সে প্রতিজ্ঞা বার বার বিস্মৃত হইতেছে, তাহাকে বার বার উদ্বুদ্ধ কর।

আমাদের প্রার্থিত ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মিলন কিরূপে সম্ভব হয়, ও দেশের সকল ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মসমাজের আরও অধিক প্রগাঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে, এ বিষয়ে আমার কয়েকটি চিন্তা তোমাদের সম্মুখে ধরিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার কর্ম্ম-ব্যবস্থাতে ও সমাজ-ব্যবস্থাতে স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও, ধর্ম্মে কোন পার্থক্য নাই। ধর্ম্মবিষয়ে পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করা, কেবল অপ্রধান বিষয়কে প্রধান স্থান দেওয়ার ফল।

ধর্ম্ম যতই বাহির হইতে অন্তরের দিকে, প্রথা হইতে জীবনের দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহা অধিক সত্য হয়, এবং ততই তাহা মানুষে মানুষে মিলনের ভাবকে অধিক বর্দ্ধিত করে। অতীতকালে অতিরিক্ত বাহিরের আড়ম্বর কতকগুলি কার্য্যকে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ বলিয়া স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিয়া দিত। বর্ত্তমান যুগে পূজার পদ্ধতিসকলে ও সমাজসংগঠনের ব্যবস্থাসকলে (organisation) বাহিরের অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের মাত্রা এত [illegible] হইয়া যাইতেছে, এবং সে-সকল এত অধিক পরিমাণে চিন্তা ও যুক্তি-সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, চিন্তায় প্রতিষ্ঠার জন্যই সে-সকলকে আপাততঃ ধর্ম্মের অন্তরের দিক বলিয়া ভ্রম হয়। মনে হয়, এত গভীর মননের পরে যে উপাসনা প্রণালী স্থির হইল, এত চিন্তার ও যুক্তির ফলে যে সমাজগঠনবিধি নির্দ্ধারিত হইল, তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্মের অন্তরতম ও অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে পূজা অর্চনা এবং মানুষ সম্বন্ধে দলগঠন ও মানুষকে স্বদলে আনয়ন,—এ সকলও ধর্ম্মের প্রথার দিক, প্রণালীর দিক, ও বাহিরের কাজের দিক মাত্র। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ভক্তি ও আনুগত্য, এবং মানবের প্রতি প্রীতি, মানবের নিঃস্বার্থ সেবা, মানুষকে প্রেমের মাধুর্য্যের ও চরিত্রের সৌন্দর্য্যের দ্বারা আপনার করিয়া লওয়া,—এসকলই ধর্ম্মের অন্তরের দিক ও জীবনের দিক।

অন্তরের ও জীবনের ধর্ম্ম পৃথিবীতে মিলন বিস্তার করে। ইহার কারণ এই যে সকল ধর্ম্মেরই অন্তরতম ব্যাপারটি একরূপ। একটি তুলনার সাহায্যে এই সত্যটি বুঝিবার চেষ্টা করি।

একটি বাঙ্গালী যুবক পশ্চিমের একটি সহরে গিয়া এক জন সদাশয় লোকের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। প্রথম প্রথম তিনি অতিথির জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে বাস করিতে লাগিলেন, ও সেখানে থাকিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে, বাড়ীর লোকগুলির স্নান আহার বিশ্রামাদির সময় কিরূপ, ও রীতি কিরূপ; এবং আপনার সকল কার্য্যে তিনি সেই রীতির অনু[illegible] করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ক্রমশঃ পরিচয় একটু বৃদ্ধি পাইলে, তিনি গৃহস্বামীর বসিবার ঘরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ও তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন, ও এইরূপে বাড়ীর মানুষগুলির [illegible]মত এবং রুচি ও [illegible]চি বুঝিয়

* [সার্ব্বজনীন মাঘোৎসবে যুবকদের [illegible]ৎসবের দিনে (১৩ই মাঘ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপদেশ।

বীর-হৃদয় প্রতিদ্বন্দ্বীরাই, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বন্ধুভাবে পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে পারিয়াছেন। জগতে বীর-হৃদয় বন্ধুগণই শ্রেষ্ঠ বন্ধু, বীর-হৃদয় কর্ম্মিগণই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী। পৃথিবীর সকল কল্যাণকর্ম্মেরই রীতি এই যে, তাহার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মিগণকে অন্তরে-অন্তরে যোদ্ধৃপ্রকৃতি লইয়া কর্ম্ম করিতে হয়; কারণ, জগতে এমন কোনও যুগ আসে না, যখন অসত্য অন্যায় অসাধুতা অপবিত্রতার সঙ্গে সংগ্রাম মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয় না। দেশের সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্ম করিতে গিয়া তোমরা বীরজনোচিত উদারতার সহিত মিলিবে, বীরজনোচিত সহিষ্ণুতার সহিত খাটিবে। কিন্তু তোমরা ভুলিও না যে কর্ম্মী হইলেও তোমরা যোদ্ধাদের সন্তান। যিনি তোমাদের যোদ্ধৃপ্রকৃতি পিতৃগণের রাজা, যিনি তোমাদের জীবনের রাজা, সেই রাজরাজেশ্বরের, সেই পবিত্র-স্বরূপের, সেই সত্যস্বরূপের প্রতি অণুমাত্র অবিশ্বস্ততার আচরণ তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

মিলনাগ্রহকে সজীব ও সচেষ্ট করিয়া লইয়া, তাহাকে উদার ও উন্নত ভূমিতে স্থাপন করিয়া, ধর্ম্মের অন্তরের দিকটিকে অধিক প্রধান স্থানে রাখিয়া, পরমত সম্বন্ধে বীরোচিত সহিষ্ণুতা এবং অসত্য অন্যায় ও অপবিত্রতা সম্বন্ধে বীরোচিত সতর্কতা চির-জাগ্রত রাখিয়া, যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ নূতন যুগে বৃহত্তর কল্যাণ-কর্ম্মে আপন জীবনকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন, ভগবান তাহাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

নবদ্বীপ-স্মৃতি।

ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল তখন, যখন তিনি প্রচারার্থী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন আমার একটা ধারণা ছিল, যাঁহারা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দর্শন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত নহেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত তাঁহারা নহেন,—ব্রাহ্মপ্রচারকদের সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষায় পাণ্ডিত্য আবশ্যক। ধর্ম্মজীবন যে ধর্ম্মপ্রচারের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল, সে জ্ঞান তখন আমার তেমন প্রস্ফুটিত ছিল না। তবে পরমভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি প্রাণের শ্রদ্ধাভক্তি স্বতঃই ধাবিত হইত—তাঁহার গভীর বিশ্বাস ভক্তির প্রভাবে,—উপাসনার মাধুর্য্যে। নবদ্বীপবাবুর গোঁসাইর ন্যায় ভাব, ভক্তি আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল। তাঁহাকে জানিবার আমার সুযোগও ঘটিয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন দেখিয়া আমার পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—পাণ্ডিত্য অপেক্ষা ধর্ম্মজীবন যে ধর্ম্মপ্রচারের অধিকতর অনুকূল, এই শিক্ষালাভ হইয়াছিল;—তবে যে ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মজীবনের একত্র সমাবেশ হয়, সে ক্ষেত্রে সোণাসোহাগার মিলন হয়।

ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, জ্ঞানী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দের অনুচর-রূপে কখন কখন তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের সহযাত্রী হইয়াছি। নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদে বৃত হইলে তাঁহার প্রচারকার্য্যের সহযাত্রী আমি কখনও হই নাই। তাই তাঁহার প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্য্য বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহোপলক্ষে আমি ময়মনসিংহ গিয়াছিলাম। নবদ্বীপবাবু সেই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিবেন শুনিয়া আমার মনে ভাবনা হইয়াছিল,—সহরের হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান কত শত লোক এই বিবাহ দেখিতে আসিবেন,—উপাসনা, উপদেশ যদি তেমন হৃদয়গ্রাহী না হয়, তবেত বড়ই ক্ষোভের ও লজ্জার বিষয় হইবে। তখন প্রেমিক কবি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কেই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিতে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলাম। নবদ্বীপবাবু অবিবাহিত, তিনি বিবাহের আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, কেমন কেমন বোধ হইতেছিল। বিবাহ-সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, আচার্য্য "ওঁ ব্রহ্ম" ধ্বনি করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, দয়াময়ের দয়ায় তাঁহার কণ্ঠে ভক্তি ও শক্তির সঞ্চার হইল, বিবাহানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল, সমবেত সকলে উপাসনা ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা না থাকিলেও প্রাণে প্রেম ভক্তি থাকিলে যে প্রচারকার্য্যে সাফল্যলাভ হয়, সেদিন আমার এ জ্ঞান লাভ হইল।

বেনেটোলা লেনের পুরাতন ৪৫নং বাটীর বহির্ভাগে সিটি কলেজের স্কুল বিভাগের কয়েকটী শ্রেণীর অধ্যাপনা হইত, অন্ত-র্ভাগে দ্বিতলে আমাদের একটী "মেস্" ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা দ্বিতলের একটি কুঠরীতে প্রচারার্থী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু আর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপবাবু আমাদেরই সঙ্গে আহার করিতেন। আমাদের মেসে আমিষখাদ্যেরই প্রাচুর্য্য ছিল,—তাঁহার জন্য সামান্য নিরামিষ খাদ্যের আয়োজন হইত, তিনি তাহাদ্বারাই পরিতৃপ্তরূপে আহার করিতেন, একদিনের জন্যও কোনওরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। তার পরে দীর্ঘকাল তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছি, কখনও আহার পরিচ্ছদে তাঁহাকে বিলাসী দেখি নাই, অসনে বসনে এমন অল্পে পরিতৃপ্ত লোক কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু মহাশয়ের পত্নী তাঁহাকে বৃদ্ধবয়সে একখানি মূল্যবান্ বহরমপুরী রেশমী বালাপোষ দিয়াছিলেন। আমি প্রথম যেদিন তাঁহাকে বালাপোষ গায়ে দেখিয়াছিলাম, তখন কৌতুক করিয়া বলিয়া-ছিলাম,—"বৈরাগীর বেশ সাজ হয়েছে দেখ্‌ছি! বুড়ো আইবুড়োর দেখি বর সাজতে সাধ হয়েছে"! হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ছাড়া আমাকে এমন ঠাট্টা আর কেউ করেনি। জান, যিনি আমাকে এখানা দান করেছেন, তাঁর ইচ্ছা আমি ইহা গায় দিই; স্নেহ ভালবাসার দান উপেক্ষা কর্‌তে নাই,

* [illegible] বার্ষিক স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম কর্ত্তৃক পঠিত।

মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়, নতুবা তোমার মত ফিটফাট্ বাবুকে আমি এখনই দিয়ে দিতাম"। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর প্রচারক বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর গায় ওখানা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, ভক্তের কন্থা যদি আমার গায় উঠিত, তবে নিজেকে ধন্য মনে হইত।

পুরাতন ৪৫নং বেনেটোলার বাড়ীতে প্রচারার্থীদের শিক্ষার্থ প্রতিদিন সন্ধ্যাসময় ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দের কেহ না কেহ আসিতেন,—তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনা করিতেন। আমিও তাহাতে যোগদান করিতাম। তখন দেখিয়াছি,—গোঁসাইর সঙ্গে মিলিয়া নবদ্বীপবাবু কি প্রমত্ত কীর্ত্তন করিতেন। "দীননাথের চাইতে হবে, এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে,"—তাঁহার ভক্তি গদগদ কণ্ঠে এই সংগীত কি মধুরই শুনিয়াছিলাম; এখনও কাণে ও প্রাণে বাজিতেছে।

বেনেটোলা লেনের সেই বাড়ী বিক্রয় হইলে আমাদের বাসা ভাঙ্গিল, নবদ্বীপবাবু বাবু কালীশঙ্কর সুকুল মহাশয়ের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তখন, এখন যেখানে সাধনাশ্রমের ত্রিতল অট্টালিকা উঠিয়াছে, সেখানে একটী জীর্ণ খোলার ঘর ছিল। সেইঘরে সন্ধ্যাসময় সংকীর্ত্তন হইত, সেই কীর্ত্তনের নেতা ছিলেন, নবদ্বীপবাবু আর আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়; খোলবাদক ছিলাম আমি। আর তাহাতে নিয়মিতরূপে যোগ দিতেন—মহেন্দ্রনাথ মিত্র, কুঞ্জবিহারী সেন ও উমাপদ রায়। কি প্রমত্ত কীর্ত্তন হইত! যেদিন গোঁসাই আসিয়া জুটিতেন, সেদিন মনে হইত,—নদীয়ায় শ্রীবাসের আবাসে কীর্ত্তনের কথা। সেই সকল মধুর-স্মৃতি প্রাণে চিরমুদ্রিত হইয়া আছে।

তাঁহার সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, যখন তিনি আমার আত্মীয় পরলোকগত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর গৃহে একাধিকবারে ১২।১৩ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সেই পরিবারের কর্ত্তা, গৃহিণী ও সন্তানেরা সকলে তাঁহার গুণে ও বাৎসল্যে কি মুগ্ধই না ছিলেন! তিনি তাঁহাদের পরস্পর হইয়াও নিজের ধর্ম্ম ও চরিত্র প্রভাবে সেই গৃহের গুরু ও অভিভাবকস্থানীয় হইয়াছিলেন। সম্পদে, বিপদে—বিবাহে, শ্রাদ্ধে, এমন কি জন্মদিনে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদের গৃহে আচার্য্যের কার্য্য না করিলে তাঁহাদের প্রাণের পরিতৃপ্তি হইত না। তিনি তাঁহাদের সকলের প্রাণকে এমনি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। যখন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে "সম্মানিত সভ্য" পদে বরণ করা উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদের বিষম দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছিল, তখন নবদ্বীপচন্দ্র ছিলেন প্রাবীণদের দলে। তখন তিনি নবীনদের প্রতি তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন। উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার নবীনদলের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। সুকুমার ওরফে তাতার উপর তজ্জন্য নবদ্বীপবাবুর কি তীব্র আক্রমণ ছিল! তথাপি সেই পরিবারের উপর তাঁহার এমনি স্নেহ বাৎসল্যের প্রভাব ছিল যে, একদিনের জন্যও তাঁহাদের কেউ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি হারায় নাই। তাতার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহারই কোলে মাথা রাখিয়া তাতার স্ত্রী সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। সাধনাশ্রমে তাঁহার অন্তিমশয্যায় তাতার স্ত্রী তাঁহার অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের উপর তাঁহার স্নেহ, বাৎসল্য, এবং চরিত্র ও ধর্ম্মভাবের এমনি প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল। কেবল এই এক পরিবার নহে, কত শত পরিবারের উপর তাঁহার এরূপ প্রভাব ছিল।

উপেন্দ্রকিশোরের গৃহে তাঁহার অবস্থানকালে মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গে আমার নানা বিষয়ে সংঘর্ষণ হইত, উভয়ের মধ্যে বচসাও হইত। কিন্তু আমার ও আমার স্ত্রীর উপর তাঁহার এমনই স্নেহ সৌহার্দ্দ্য ছিল যে, একদিনের জন্যও মনোমালিন্য ঘটে নাই। আমার শ্বশুর কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত নবদ্বীপবাবুর এক নিগূঢ় ধর্ম্মযোগ ছিল,—তজ্জন্য আমার স্ত্রীকে কন্যাবৎ স্নেহ করিতেন, আমার স্ত্রীও তাঁহাকে "কাকাবাবু" ডাকিতেন ও গুরুজন জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তিনি যখন সাধনাশ্রম হইতে গড়পাড়ে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ী যাইতেন, মাঝে মাঝে সুকীয়া ষ্ট্রিটে আমাদের গৃহে পদার্পণ করিতেন। রোগদৌর্ব্বল্য বশতঃ উপরে উঠিতে পারিতেন না, নীচেই বসিতেন, এবং আমার স্ত্রীর প্রদত্ত দুগ্ধ পান করিয়া কত না আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কখন কখন গিরিডিতে আমাদের গৃহে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। তখন আমার পরিবারস্থ সকলে তাঁহার সেবা করিয়া কি অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিত,—তাঁহার সস্নেহ ব্যবহারে তাহারা কত প্রীত হইত। আমাদের পরিবারে বাসকালে তিনি পারিবারিক উপাসনাতে যে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, তাহাতে আমরা বালকবৃদ্ধ সকলে কি তৃপ্তি অনুভব করিতাম,—তাঁহার নাতিদীর্ঘ উপাসনাতে সকলের প্রাণ মুগ্ধ ও আনন্দিত হইত। সহজ, সরল ভাষায় কি প্রাণস্পর্শী আরাধনা ও প্রার্থনা তিনি করিতেন!

তিনি কি সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী পুরুষ ছিলেন! আমাদের গৃহের নিকট এক গৃহে তিনি কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই গৃহের বহির্ভাগে প্রতিদিন অনেকে সমবেত হইতেন,—সেখানে একজন হাকিমও আসিতেন। সকলে মিলিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ ও পরচর্চ্চা করিতেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বেশ উচ্চগলায় হইত,—আমাদের গৃহ হইতে শুনা যাইত। একদিন এরূপ পরচর্চ্চার সময় নবদ্বীপবাবুর তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া গেল,—তাহাতে হাকিমপ্রবর স্তম্ভিত ও নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। তদবধি যে কয়দিন তিনি সেই গৃহে বাস করিয়াছিলেন, তথায় আর পরচর্চ্চার সভা বসিতে দেখা যায় নাই। উপেন্দ্রকিশোরের গৃহে অবস্থান কালেও কতদিন কত সময় তাঁহার তেজস্বীতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,—অন্যায়, অপচয় ও অমিতব্যয়িতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। ইহাতে তাঁহার পাত্রাপাত্র ভেদ ছিল না।

তাঁহার হৃদয় বড়ই উদার ছিল। অপ্রিয় কথা শুনিলে অনেকেই এরূপ চটিয়া যান যে, বহুদিনের বন্ধুত্বের বন্ধনও ছিন্ন করিতে কুণ্ঠিত হন না। নবদ্বীপচন্দ্রের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। আমি অনেকদিন অনেক সময় তাঁহার প্রাণে ব্যথা

দয়াছি,—কড়াকথা শুনাইয়াছি; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার স্নেহ, ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হই নাই। এরূপ একটী মাত্র ঘটনা উল্লেখ করিব। লোকের জীবদ্দশায় কাহাকেও অভিনন্দন দেওয়া হয়, আমি তাহার বিরোধী। আমার ধারণা, যাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়, ইহাতে তাঁহার অনিষ্ট করা হয়। আমার এরূপ ধারণা থাকাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, সকলে ধূম্রযানযোগে কলিকাতা হইতে চুঁচুড়া গিয়াছিলেন, সেই শোভাযাত্রাতে আমি যোগ দিই নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে এরূপ অভিনন্দন দেওয়াতে আমার সহানুভূতি ছিল না। নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে যখন অভিনন্দন দেওয়া হয়, তখন স্নেহাস্পদ সুকুমার রায় একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি আমার নিকট চাঁদার জন্য আসিলে বলিলাম, "তুমি আসিয়াছ, তাই চাঁদা দিচ্ছি; কিন্তু এরূপ অভিনন্দন দান আমার মত নহে,—এ কথা তুমি তোমাদের দাদামহাশয়কে বলো"। নবদ্বীপবাবু অভিনন্দন-সভায় আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "তুমি যে এলে?" আমি বলিলাম,—আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ।" তিনি বলিলেন,—"মতের বিরুদ্ধে কাজ করা তোমার ভাল হয় নাই।" কেমন উদারতা! মতান্তরে মনান্তর নাই, স্নেহশ্রদ্ধার সংঘাত নাই।

তিনি ছিলেন,—একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি সহজেই সকল বিষয় আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইত। বিষয়ী না হইয়াও বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ছিল,—ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবান্ধবদের বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনাতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত।

মানবচরিত্র-বোধেও তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তি ছিল। প্রকৃত সাধু, অসাধু চিনিতে তাঁহার অধিক সময়ের প্রয়োজন হইত না। মানবচরিত্র অধ্যয়নে তাঁহার এরূপ দক্ষতা দেখিয়াই ব্রাহ্ম পিতামাতারা তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের পাত্র, পাত্রী নির্ব্বাচনে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শের প্রার্থী হইতেন। আমার নিজের এবং কন্যার বিবাহে তাঁহার এই ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলাম।

তিনি ছিলেন,—একটী পুরো খাঁটি মানুষ। তাঁহার ভিতর বাহির এক ছিল। তিনি যাহা অনুভব করিতেন, মুক্তকণ্ঠে তাহা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না;—লোকের অনুরাগ, বিরাগের ধার ধারিতেন না। তিনি নিষ্কির ওজনে জীবন যাপন করিতেন। দেনা, পাওনা সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় খাঁটি ছিলেন। বন্ধুদের কাহাকেও ঋণগ্রস্ত দেখিলে তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেন,—ঋণমুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে কত তাড়া দিতেন। কোনও কার্য্যের ভার লইলে সেটী সম্পন্ন না করিয়া তিনি নিরস্ত হইতেন না।

তিনি ছিলেন,—ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক। রুগ্ন দেহ লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে অক্লান্ত শ্রম করিয়াছেন,—স্থানে স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়াছেন; উপাসনা করিতে অনুরোধ করিলে অসুস্থতানিবন্ধন কখনও আচার্য্যের কর্ত্তব্য পালনে কুণ্ঠিত হন নাই। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"—এই ছিল তাঁহার জীবনের সংকল্প। রুগ্নদেহে কত দুঃস্থের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন,—আর্ত্তজনের প্রাণে সান্ত্বনা দানের জন্য কত স্থানে ছুটিয়া গিয়াছেন! একদিন তাঁহার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া উপেন্দ্রকিশোরের গৃহে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি—দেখি, বিছানায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রোগের যাতনা কি বড় অসহ্য হয়েছে? প্রাণকৃষ্ণবাবুকে কি সংবাদ দিব?" তিনি বলিলেন,—"রোগের যন্ত্রনা অপেক্ষা প্রাণের যন্ত্রণা বড় অধিক হইয়াছে; একটী মেয়ে বিপদে পড়ে আমাকে যেতে লিখেছে,—কলিকাতার বাহিরে। আমার যে আজ যাইবার শক্তি নাই।" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তবে কয়দিন পরেই একটু সুস্থ হইয়াই ছুটিলেন সেই দুঃস্থের সাহায্যার্থ!

তাঁহার সাধনার কথা কি বলিব! তিনি প্রতিদিন গভীর নিশিথে নির্জ্জনে আরাধ্য দেবতার ধ্যানে বসিতেন,—ব্যাকুল প্রার্থনাতে পার্শ্ববর্ত্তী উপাসকদের প্রাণ বিগলিত করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সম-সাধক, তাঁহারাই ইহার সাক্ষী। তাঁহার এরূপ পার্শ্বে বসিবার সৌভাগ্য কচিৎ কখন আমার হইয়াছে।

তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মাভিমান ছিল না, তাঁহার বাক্যে, ব্যবহারে ধর্ম্মাভিমানের জ্বালা ছিল না,—স্নেহ প্রেমের উষ্ণতা ছিল। তিনি যখন কাহারও পরিবারে যাইতেন, ধর্ম্মোপদেষ্টার বেশে যাইতেন না,—একজন আত্মীয় ও আপনার জনের বেশে যাইতেন,—সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখীর বেশে যাইতেন। তাহাতেই তিনি পরিবারস্থ সকলের প্রাণ অধিকার করিয়া বসিতেন। এরূপ ছিল তাঁহার সস্নেহ প্রকৃতি,—মিষ্ট ব্যবহার।

তাঁহার হৃদয় একদিকে বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিল, অপরদিকে কুসুমের ন্যায় সুকোমল ছিল। অন্যায়, অত্যাচারের যেরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, অন্যায়কারী ও অত্যাচারীর দুঃখ, পীড়া দেখিলে তেমনি আবার ব্যথিত হইতেন। এইজন্যই দু'একটী অপ্রশংসিত পরিবারের সঙ্গে স্নেহ বাৎসল্যের বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার অনেক বাদানুবাদ হইত। তিনি বলিতেন,—"পাপকে ঘৃণা কর, পাপাচারীকে ভালবাসিতে চেষ্টা কর।"

তাঁহার জীবন-চরিত লেখক তাঁহাকে "প্রেমিকবর" আখ্যা দিয়াছেন। আমার মনে হয়,—তাঁহাকে "ভগবৎপ্রেমিক' আখ্যা দিলেই ঠিক হইত। ভগবৎপ্রেমিক না হইলে কি মানুষ অপরকে এত ভালবাসিতে পারে? "নামে রুচি, জীবে দয়া"—এই ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। "মারলে মারলে কলসীর কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না,"—এই ছিল তাঁহার জীবনের একটী আদর্শ। তাঁহার হৃদয়ের ভালবাসা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাই তাঁহার শবের সঙ্গে এত পুরুষ রমণী নিমতলার শ্মশানঘাটে অনুগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃ-পুরুষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ৬৪ যোগীর এক যোগী ছিলেন। তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণব পিতামাতার প্রদত্ত "নবদ্বীপচন্দ্র" নাম তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৭শে মার্চ্চ ভাগলপুর নগরীতে পরলোকগত বাবু দুর্গানারায়ন বসুর পত্নী দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ৩০শে মার্চ্চ দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্যাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ৪৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৪৲ ও সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ৩রা এপ্রিল মেদিনীপুর নগরীতে পরলোকগত প্যারীলাল ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র বিভুপ্রসাদ দীর্ঘকাল ক্ষয়রোগে ভুগিয়া যুবা বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৩রা এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী পরলোকগতা চপলাবালার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৭শে মার্চ্চ গিরিধি নগরীতে বাবু উমাপদ রায়ের দৌহিত্রী লীলা বক্সিত নিমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৩ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম বাবু উমাপদ রায় নিমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, ধর্ম্মের জন্য অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হীরালাল সরকার পিতা পরলোকগত হরলাল সরকারের ৩১ম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন—সাধনাশ্রমে ১৲ অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধায়িনী সভায় ২৲ নারীরক্ষা-সমিতিতে ২৲। এ দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চির শান্তি লাভ করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের গৃহে, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্তের পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করিয়াছেন। ছেলেটির নাম অভিজিত ও অজয় রাখা হইয়াছে। এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অপূর্ব্ববাবু পূর্ব্ব-বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ বিধবাশ্রমে ১০৲ এবং Maternity and Child welfare এ ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২১শে মার্চ্চ ঢাকায় রামমোহন রায় লাইব্রেরী গৃহে স্থানীয় ব্রাহ্মযুবকগণ মিলিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী প্রার্থনা করেন এবং যুবকদিগের ছাত্রসমাজের সভ্য হওয়া ও ব্রাহ্মসমাজের নানা কার্য্যে উৎসাহী হওয়া যে কত প্রয়োজন তাহা বুঝাইয়া দেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ও অবিনাশ বাবু যুবকদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন। অনেক যুবকই ছাত্রসমাজের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হন। সভায় স্থির হয়, মাসের মধ্যে দুই দিন আলোচনা ও দুই দিন বক্তৃতা হইবে। তাহা ছাড়া কয়েকটি যুবক প্রতি সপ্তাহে মিলিত হইবে। অবিনাশ বাবু তাহাদিগকে তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দিবেন। কিঞ্চিত জলযোগের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

ঢাকার নীতিবিদ্যালয়টির অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছিল। সম্প্রতি অবিনাশ বাবু ও অমৃত বাবু উৎসাহের সহিত নীতি-বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক বালক বালিকা প্রতি সপ্তাহে উক্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেছে।

উৎসব—গত ১৪ই ও ১৫ই ফাল্গুন হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে:—১৪ই অপরাহ্নে নগরকীর্ত্তন গ্রামপ্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ। ১৫ই প্রাতে উষাকীর্ত্তন; তৎপরে সমাধিক্ষেত্রে প্রার্থনা। ৯ঘটিকায় মন্দিরে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস। মধ্যাহ্নে আলোচনা; ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতি। অপরাহ্নে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী।

রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র তথায় গমন করেন। ১৭ই মার্চ্চ সায়ংকালে এবং ১৮ই মার্চ্চ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শেষোক্ত দিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুসখা দাসের বাটীর প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন হয়। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "ব্রাহ্মসমাজ কি চান" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৯শে মার্চ্চ প্রাতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুসখা দাসের বাটীতে উপাসনা হয়। রমেশ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের একাধিক-অশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত মতে সম্পন্ন হইয়াছে:—১৮ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় কর্ণেলগোলা ব্রহ্মমন্দিরে উদ্বোধন, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। ১৯সে সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের বাটীতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। ২০শে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কর্ণেলগোলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। ২১সে সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ দত্তের বাটীতে উপাসনা হয়। ২২শে শ্রীযুক্ত দেবব্রত মল্লিকের বাটীতে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়; ২৩শে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসুর বাটীতে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়; ২৪শে সন্ধ্যায় পাহাড়ীপুর প্রার্থনা সমাজে উপাসনা হয়; ২৫শে শ্রীযুক্ত গিরিধারী দত্তের বাটীতে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। ২৬শে পরলোকগত প্যারিলাল ঘোষের বাটীতে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। এই কয় দিবসই শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত উপাসনা করেন। ২৭শে কর্ণেলগোলা ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। ২৮শে শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী চন্দ্রের বাটীতে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। ১লা মার্চ্চ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্তের বাটীতে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়, এই দুই দিবসও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ দত্ত উপাসনা করেন। ২রা মার্চ্চ অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ণেলগোলা ব্রহ্মমন্দিরে "ইউরোপের সামাজিক ও ধর্ম্ম জীবন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৩রা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের বাটীতে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। ৪ঠা ও ৫ই শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের বাটীতে পাহাড়ীপুর প্রার্থনা সমাজের উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত উপাসনা করেন। ৬ই প্রাতে কর্ণেলগোলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে অন্ধ ও খঞ্জদিগকে বস্ত্র ও দীন দরিদ্রদিগকে তণ্ডুল ও পয়সা দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় সমাজমন্দিরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দত্ত উপাসনা করেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ই মে, ১৯২৭, শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সমাজ মন্দিরে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়—১। ১৩৩৩ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব। ২। ১৩৩৪ সনের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। বিবিধ।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ
২।৩ নং লায়েল রোড, ঢাকা
৩১শে মার্চ্চ, ১৯২৭

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন,
সম্পাদক

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩রা বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি-এ,

লইলেন; কাহার প্রকৃতির ঝোঁকটি কোন্ দিকে, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া লইলেন। ঘনিষ্ঠতা আরও বর্দ্ধিত হইলে, ক্রমশঃ তিনি বাড়ীর ছেলে মেয়েদের এবং কর্ত্তা ও গৃহিণীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া অন্তঃপুরে গমনাগমন করিবার অধিকার লাভ করিলেন, ও সেখানকার আলাপে, আমোদ-আহ্লাদে, ও কার্য্যে তাঁহাদের সঙ্গী হইয়া পড়িলেন। গৃহিণী যেখানে বসিয়া রন্ধন করেন, কর্ত্তা ও গৃহিণী যেখানে পুত্র কন্যাদের লইয়া কথা বলেন, সেখানে গিয়া তিনি বসিতে লাগিলেন। "বড় ছেলেটি বিদেশে গিয়াছে, শিক্ষা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে বাড়ীর অবস্থা ভাল হইবে," এই কথা বলিতে বলিতে পিতামাতার চক্ষে মুহূর্ত্তের জন্য স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের একটি দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। "সে ছেলেটি বড় ভাল, তার মনটা বড় মমতায় ভরা। সে যখন বিদেশে যাইবে, তাহার কয়েক দিন আগে আমাদের ছোট মেয়েটি মারা যায়। সে বোন্‌টি ঐ ছেলের বড় প্রিয় ছিল। বিদেশযাত্রার পূর্ব্বক্ষণে সে সেই বোন্‌কে স্মরণ করিয়া মায়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া নীরবে কত কান্না কাঁদিল,"—এই বর্ণনা করিতে করিতে পিতামাতার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অন্তঃপুরের এই সকল দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া সেই বাঙ্গালী যুবকটি ভাবিতে লাগিলেন, "এ বাড়ীখানি তো ঠিক আমার সুদূর স্বদেশের বাড়ীখানিরই মত। এই পিতামাতার স্নেহও ঠিক আমার পিতামাতার স্নেহেরই মত। ইচ্ছা হয়, ইঁহাদের পুত্র-স্থানীয় হইয়া ইঁহাদের স্নেহের অংশ লাভ করিয়া ধন্য হই।"

জগতের প্রত্যেক ধর্ম্ম যেন এক একটি গৃহ। সেই গৃহের সহিত অন্তরঙ্গতার যেন তিনটি অবস্থা আছে। প্রথম পরিচয়ে, তাহার পূজার রীতি, উপাসনার সংস্কৃত কি আরবী কি ল্যাটিন মন্ত্র, এবং উপনয়ন জলাভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠান চক্ষে পড়ে। দ্বিতীয় অবস্থায়, সে-ধর্ম্মের মতামত কিরূপ, তাহার বিশেষ বাণীটি কি, এবং তাহার বিশেষ ঝোঁকটি কোন্ দিকে, মানুষ তাহা লক্ষ্য করে। তৃতীয় অবস্থায়, সে তাহার অন্তঃপুরের সংবাদ পায়।

ভিতর বাড়ীর খবর যেমন সব পরিবারেই এক প্রকার, ধর্ম্মের অন্তঃপুরের খবরও তেমনি সব ধর্ম্মে এক প্রকার। তাহা কি খবর? মায়ের প্রাণটা তাঁর সন্তানের জন্য কেমন ব্যাকুল হয়, সেই খবর। যে-ছেলেটি কাছে রহিয়াছে, তাহার জন্য মায়ের ব্যাকুলতার প্রকাশটি কিরূপ, এবং যে-সন্তান দূরে গিয়াছে, তাহার জন্য মায়ের ব্যাকুলতার প্রকাশটি কিরূপ, এই খবর। যে ধরা দিয়াছে, তাহাকে পাইয়া মায়ের মনটা কেমন সুখী, আর যে ধরা দিতেছে না, তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া আনিবার জন্য মায়ের কিরূপ অস্থিরতা, এই খবর। মায়ের ভালবাসার, মায়ের ব্যাকুলতারই নানা বর্ণনা; তাহারই নানা ইতিহাস, তাহারই নানা উচ্ছ্বাস, তাহারই নানা তরঙ্গ, তাহারই নানা লীলা, তাহারই নানা কীর্ত্তি। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, মায়ের জন্য সন্তানের ভক্তি ভালবাসার, মায়ের চরণে সন্তানের আনুগত্যের ও আত্মসমর্পণের কত বিচিত্র আকার, কত বিচিত্র প্রকাশ, কত বিচিত্র ভাষা!

সকল ধর্ম্মের অন্তঃপুরে এই একই কাহিনী। সে কথা এমনই মধুর যে প্রাণকে তাহা তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ করে। মাতৃভক্তিতে যাহার হৃদয় কোমল ও সিক্ত, এমন মানুষ যদি কোথাও গিয়া দেখিতে পায় যে, এ:টি :১ স্নেহে গদগদ হইয়া নিজ সন্তানকে আদর করিতেছেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাহারও সেখানে সেই মায়ের সন্তান হইয়া তাঁহার স্নেহের অংশী হইতে ইচ্ছা করে। যেখানে মাতৃস্নেহের লীলা, সেখানেই তাহার প্রাণ লোলুপ হয়। ধর্ম্মজগতেও তেমনি। পৃথিবীর যে-দেশেই হউক, যে-যুগেই হউক, যে-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়াই হউক, যেখানে জগজ্জননীর স্নেহ দয়া বিশেষ ভাবে তাঁহার মানব-সন্তানের দিকে নির্ঝরের মত ঝরিয়াছে, সেখানেই তাহা দেখিয়া ভক্তের চক্ষু সজল, ভক্তের চিত্ত লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে। সেখানেই ভক্ত দুবাহু তুলিয়া 'মা! মা!' বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সেই নির্ঝরধারায় স্নান করিয়া লইয়াছেন। সেখানেই তিনি সেই সন্তানদলে মিশিয়া গিয়া, তাহাদের ভক্তির সঙ্গে নিজ ভক্তিকে মিশাইয়াছেন।

এই জন্য দেখিতে পাই, সকল ধর্ম্মেরই মরমী সাধকগণ আচারবাদীদিগের অপেক্ষা একটু পৃথক্ ধরণের মানুষ হন; তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী থাকেন না। তাঁহারা সকল ধর্ম্মেরই মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিয়া তাহার সরস সুধাধারার আস্বাদন করিয়া লন। তাঁহাদের কাছে কোন ধর্ম্ম আর "পর" থাকে না।

তবে কি সম্প্রদায় ও মণ্ডলীর কোনও মূল্য নাই? আছে বই কি? পরিবারের যে মূল্য, সেই মূল্য আছে। যাহাদের সঙ্গে রক্তের যোগ, শিক্ষার ও ভাবের যোগ, এক পূজার প্রণালীর যোগ, একই ধর্ম্ম-ইতিহাসের যোগ রহিয়াছে, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ আরসকলের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ হইবেই। কিন্তু সন্তানকে ভালবাসিতে গিয়া যেমন পৃথিবীর সব মায়েরা বোঝেন যে, আমাদের আহারে পরিচ্ছদে ভাষায় যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন, মাতৃত্বে আমরা সকলেই এক, তেমনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ লোকেরা জানেন যে, আমাদের আচারে রীতিতে ও পূজার প্রণালীতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া, ও ঈশ্বরের প্রতি মানবের ভক্তি আমাদের সকলের মধ্যে একই বস্তু।

ঈশ্বরকে সত্যপুরুষরূপে অনুভব করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে, তাঁহার আনুগত্যে, তাঁহার প্রেমানন্দে জীবন ধারণ, ইহাই ধর্ম্মের প্রাণ। পূজায় নয়, নিয়ম পালনে নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনের ঈশ্বরমুখীনতাতেই প্রকৃত ধর্ম্মের পরিচয়। ধর্ম্ম মানুষের কতকগুলি বিশেষ কার্য্যের সমষ্টি নহে; ধর্ম্ম, জীবনের একটি বিশেষ স্বভাব।

জীবনের দিকটিকে প্রধান স্থানে রাখিলে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মও পরস্পরের সহিত মিলনোন্মুখ হইয়া উঠে; রীতি ও নিয়মের দিকটিকে প্রধান করিলে এক ধর্ম্মের মানুষেরাও ক্রমশঃ পৃথক পৃথক দলে চিহ্নিত ও বিভক্ত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মসমাজে তাহাই ঘটিয়াছে।

জীবন অপেক্ষা নিয়মপালনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়া প্রাচীন কালে এদেশে কত ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহা আমরা জানি। সত্য বটে, অতীতকালের সেই ভেদবুদ্ধি,

বহুদেববাদ, সাকার পূজার নানা প্রণালীর পার্থক্য, এবং বাহ্য আচার বিষয়ে নানা শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও ভিন্ন ভিন্ন বিধি-নিষেধ,—এই সকল অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার একটি বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ বহুদেববাদ, সাকার পূজা, ও বাহ্য আচার ত্যাগ করিলেই যে ভেদবুদ্ধির ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহা নয়। নিরাকার এক দেবতার পূজারই বিভিন্ন পদ্ধতি, অথবা ধর্ম্মসাধনের এক একটি বিশেষ ভাবের ও আদর্শের প্রতি এক এক সাধকদলের বিশেষ ঝোঁক, অথবা সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন প্রণালী,—এ সকলও ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিতে পারে, যদি এ সকলের গুরুত্ব বাড়াইয়া বাড়াইয়া অবশেষে স্বদল ও পরদলের ভেদচিহ্ন হইবার গৌরব ইহাদিগকেই প্রদান করা হয়, যদি ধর্ম্মের প্রধান দৃষ্টি জীবনগত ধর্ম্ম হইতে উঠিয়া গিয়া এ সকলের প্রতি আবদ্ধ হয়। বাহ্য আচারের রীতি বিষয়েই হউক, কি আধ্যাত্মিক পূজা ও সাধনের রীতি বিষয়েই হউক, ধর্ম্ম একবার কোনও দিক দিয়া রীতিপ্রধান হইয়া উঠিলেই তাহা ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিতে থাকে।

কেহ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বলিয়া, কেহ 'Our Father which art in Heaven' বলিয়া, কেহ 'লা ইলাহা ইল্লিল্লাহ,' বলিয়া, কেহ বা নিজের মনের ভাব নিজের মনোমত শব্দে ব্যক্ত করিয়া, ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন। কেহ বসিয়া, কেহ জানু পাতিয়া উপাসনা করেন। কেহ কোন বিশেষ মহাপুরুষের প্রভাবে অনুপ্রাণিত, কাহারও বা কোন বিশেষ সাধুভক্তের সঙ্গে যোগ নাই। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর উপাসকগণের সকলেরই জন্য জীবনের দুঃখ-তাপে ঈশ্বরের আশ্রয়ের মূল্য একরূপ, জীবনে ঈশ্বরের দয়ার অনুভব একরূপ, জীবনে ঈশ্বরের অধীনতার ভাব ও ঈশ্বরে নির্ভরের ভাব আয়ত্ত করিবার জন্য সংগ্রাম একই রূপ। এই সকল লইয়াই ধর্ম্ম। কে এমন আছে, যাহার সহিত একত্র বসিয়া সেই পরমপিতার আশ্রয়ের অনুভব, সেই পরম দয়ালের দয়ার অনুভব, আস্বাদন করিতে পারি না? জীবনে ঈশ্বরের আনুগত্য ও ঈশ্বরে নির্ভর লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারি না? যে রাজা রামমোহন রায় আন্তরিক ধর্ম্মের ও তজ্জনিত একতার মহান্ আদর্শটি ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার স্বর্গবাসী আত্মা হইতে এই মহৎবাণী ব্রাহ্মসমাজের দিকে নামিয়া আসিতেছে;—"ব্রাহ্মসমাজ বাহ্য আচারের ভিন্নতা-জনিত ভেদ-বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন; এখন ব্রাহ্মসমাজকে উপাসনা-পদ্ধতির, সাধনাদর্শের, অনুষ্ঠান-প্রণালীর ও সমাজ-ব্যবস্থার ভিন্নতা-জনিত ভেদবুদ্ধিও অতিক্রম করিয়া আসিতে হইবে। বরং এ সকলের বিচিত্রতাতেই ব্রাহ্মসমাজকে আনন্দিত হইতে হইবে।"

আজ বিশ্বাসনয়নে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই? ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার দ্বিতীয় শতাব্দীর জীবনে কি-ভাবে প্রবেশ করিবেন? কঠোর রীতি-সর্ব্বস্বতায় খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া নয়, আবার সাধন ও তপস্যার বিশেষ বিশেষ চিহ্ন-সকল মুছিয়া ফেলিয়া উদাসীন শিথিলতার মিলনে মিলিত হইয়াও নয়; কিন্তু রীতির সকল বিচিত্রতা সত্ত্বেও এক হইয়া, পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিয়া ও ভালবাসিয়া, জীবনগত ধর্ম্মের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া, হাতে হাতে ধরিয়া অগ্রসর হইবেন।

হে তরুণগণ, আমার এই আশা তোমাদেরও প্রাণের আশা, তাহা আমি জানি। অতীত ঘটনা সমুত্থিত যে উষ্মা এক পুরুষ আগের ব্রাহ্মদিগের চিত্তকে তপ্ত করিয়াছিল, তাহা তোমাদের চিত্তকে তপ্ত করে নাই, তাহা আমি জানি। মিলনের জন্য হাতখানি বাড়াইতে আমাদের মধ্যে কাহারও মনে ক্ষণিকের দ্বিধা আসিলেও আসিতে পারে; কিন্তু তোমরা মিলিতে ও মিলাইতে একান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছ, তাহা আমি জানি। আমি সমগ্র প্রাণের সহিত বলিতে পারি, তোমাদের সে-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। আমি সমগ্র প্রাণের সহিত বলিতে পারি, ব্রাহ্মসমাজ যতই মলিন অথবা দুর্ব্বল হউক না কেন, ইহা এমন অধম নিশ্চয়ই হয় নাই যে ইহাতে বংশানুক্রমে আগত বিবাদই চিরজীবী হইবে এবং বংশানুক্রমে আগত ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ধারাসকল বিশীর্ণ হইয়া যাইবে। আমি জানি, ব্রাহ্মসমাজের সকল দলেই এমন মানুষ অনেক রহিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে পর-পর ভাবটি একেবারেই বিদ্যমান নাই। আমি জানি, পরস্পরকে ভাই বলিয়া বুকে ধরিবার আগ্রহ অনেক হৃদয়ে বহু দিন ধরিয়া সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। তুচ্ছ বাধা বিঘ্ন কবে সরিয়া যাইবে, সকল দল কবে এক হইবে, বহু দিনের সঞ্চিত মিলন-পিপাসা এক প্রবল স্রোতে সকল অভিমান অভিযোগ কবে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তাহার জন্য অনেক হৃদয় অপেক্ষা করিতেছে, অপেক্ষা করিয়া করিয়া বেদনাতুর হইয়া উঠিতেছে। আমার হৃদয়ও তাহার মধ্যে একটি। হে তরুণগণ, তোমাদের চেষ্টায় কি সে বাধা-প্রস্তর সরিবে, হৃদয়ের উৎসগুলি ছুটিবার ও মিলিবার পথ পাইবে?

মিলনের প্রয়াস সম্বন্ধে তিনটি কথা মনে রাখা আবশ্যক; প্রথম, যে মিলনের আদর্শ আমাদের মনে রহিয়াছে, তাহা কেবল নিশ্চেষ্ট উদারতার দ্বারা আয়ত্ত হইবার নহে। ইংরেজীতে toleration ও charity বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাদ্বারা এ মিলনসংঘটন সম্ভব হইবে না। শুধু একে অন্যকে সহিয়া যাইব, অথবা একে অন্যের গুণ স্বীকার করিব, ইহা যথেষ্ট নহে। এ মিলনসাধনের জন্য, অন্যের মহৎ ভাবে, মহৎ আদর্শে, মহান্ প্রয়াসে যত দিন আমরা সঙ্গী হইতে না পারিতেছি, তত দিন আপন জীবনকে সেই পরিমাণে অসম্পূর্ণ ও নিস্ফল বলিয়া অনুভব করা আবশ্যক, এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সেই সাহচর্য্য অন্বেষণ করা আবশ্যক। "আমি মিলিতে প্রস্তুত হইয়া আছি, তুমি আসিয়া আমার সঙ্গে মিলন স্থাপন কর", এই ভাব যথেষ্ট নয়; "আমিই আপনার কল্যাণের জন্য যাচিয়া খুঁজিয়া অগ্রসর হইয়া মিলিত হইব," এই আগ্রহে মন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, মনে রাখিতে হইবে, মানুষের সঙ্গ করিবার ও মানুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার ভূমি, শুধু পরস্পরের মতের ও বিশ্বাসের ঐক্যে নহে। সকলের মধ্যে যাহা সাধারণ, সেই L. C. M. টুকুর ভিত্তিতে যে সম্বন্ধ দাঁড়ায়, তাহা অকিঞ্চিৎকর। পরিবারে ভাই বোন পতি পত্নী প্রভৃতি আত্মীয়গণ, পরস্পরকে

কি-চক্ষে দর্শন করেন? রুচি ও প্রকৃতিতে পরস্পরের মধ্যে যত মিল ও যত অমিল, সব-শুদ্ধ, সমগ্র মানুষটিকে তাঁহারা আপনার বলিয়া অনুভব করেন। একজন মানুষ সম্বন্ধে যে কথা, মানুষের দলের সম্বন্ধেও সেই কথা। কোনও ধর্ম্মমণ্ডলীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে মতের ও বিশ্বাসের কতটুকু মিল আছে, শুধু তাহার গণনা করিলে চলে না। সে মণ্ডলীর সমগ্র ইতিহাস, তাহার অতীত হইতে আগত সকল আদর্শ, সকল বাণী, তাহার সাধুভক্তগণের জীবনের সকল দুঃখ সকল সংগ্রাম ও সকল আশা, তাহার তীর্থের, শাস্ত্রের, ভাষার, ও সমবেতভাবে উচ্চারিত মন্ত্র প্রভৃতির সকল অনুপ্রাণন,—এই সমুদয়ের মধ্যে আপনাকে গভীরভাবে নিমজ্জিত করিতে হয়। বৈষ্ণবকে কেবল বুঝিতে হইলেই যদি স্বয়ং বৈষ্ণব হওয়া আবশ্যক হয়, তবে কোনও ধর্ম্মমণ্ডলীর সহিত ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইলে, তাহার মর্ম্মস্থলে কতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করা আবশ্যক, একবার আমরা তাহা যেন বিবেচনা করিয়া দেখি।

এক সময়ে এইরূপ একটি কথা শোনা যাইত যে, বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নব ধর্ম্মের (অথবা 'যুগধর্ম্মের') একটি কাজ এই যে, সে আর-সকল ধর্ম্মকে বিচার করিবে, ও তাহাদের সত্যাসত্য বাছাই করিয়া, তাহাদের সত্যসকলকে সংগ্রহ করিবে ও আত্মস্থ করিবে। কিন্তু বস্তুতঃ এ কাজ ধর্ম্মের নহে, এ কাজ পাণ্ডিত্যের। এবং পণ্ডিতেরা এখন দেখিতে পাইয়াছেন যে, কোনও ধর্ম্মান্দোলনকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে নানাদিক দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়; সে কার্য্যের জন্য বহুযুগের চিন্তা ও অধ্যয়ন আবশ্যক হয়; এবং এরূপ ভাবে সম্যক্‌রূপে চিন্তা ও অধ্যয়ন করিলেও তাহাকে একেবারে নিঃশেষে বুঝিয়া লওয়া কখনও সম্ভব হয় কি না, সন্দেহ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের সত্যাসত্যের বাছাই করিবার প্রয়াসটিই অল্পজন-সুলভ অগভীর চিন্তা ও দৃষ্টির ফল বলিয়া বর্ত্তমান যুগে একেবারে পরিত্যক্ত হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের কাজ নিশ্চয়ই ইহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ এই যে, ইহা মানুষকে সকল ধর্ম্মের মর্ম্মস্থানে শ্রদ্ধার সহিত প্রবিষ্ট হইতে শিক্ষা দিবে। দোষ গুণ, ভুল ভ্রান্তি, দেশের ও কালের বিশেষ সংস্কার ও বিশ্বাস, এই সকলের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যে-মানুষগুলি এক একটি বিশেষ ধর্ম্মধারা জগতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জীবনে বিধাতার লীলা অনুভব করিতে, তাঁহাদের সকলকে আত্মার আত্মীয় করিয়া লইতে শিক্ষা দিবে।

মিলনপ্রয়াসীর মনে রাখিবার তৃতীয় কথাটি এই যে, মিলনভূমি খুঁজিতে হইবে দৃষ্টিকে নামাইয়া নয়, দৃষ্টিকে উন্নত করিয়া। বিভিন্ন ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গে, মানব-মনকে লঘু ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরিতৃপ্তি দিবার যে সকল আয়োজন আছে, তাহা মিলনের ভূমি হইতে পারে না। হিন্দুর হোমানলের ও যজ্ঞমন্ত্রের গাম্ভীর্য্যে, হিন্দুর প্রতিমাপূজার শোভায় সৌন্দর্য্যে, সাধারণ মানুষের মনকে আকর্ষণ করিবার বহু উপাদান থাকিলেও তাহা মিলন-ভূমি হইতে পারে না। হিন্দুজাতি যেখানে অজস্র পুরাণ, কাহিনী, যাত্রাগান প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া, ধর্ম্মের সহিত চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিকে, ধর্ম্মের সহিত অভিনয়কে মিশাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার ভিতরে আস্বাদন করিবার অনেক বস্তু আছে। কিন্তু তাহা মিলনভূমি হইতে পারে না। ধর্ম্মকে এইরূপে নিম্ন ভূমিতে নামাইয়া আনিয়া এ দেশ, ধর্ম্মের যে একটি মনুষ্যত্বের দিক ও বীরত্বের দিক আছে, তাহাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে; ধর্ম্মের প্রকৃত অনুপ্রাণনটি হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে ভূমিতে নামিয়া হিন্দুর সহিত মিলনের চেষ্টা যেমনি নিষ্ফল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খিলাফতের ভূমিতে নামিয়া মুসলমানের সহিত মিলনের চেষ্টা হিন্দুর পক্ষে যেমন নিষ্ফল হইয়াছে। তেমনি আবার, ধর্ম্মের নামে আমোদ অভিনয় সৃষ্টি করিয়া, অথবা নীতির রশ্মিকে কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়া, সাধারণ জনসমাজকে তুষ্ট করিয়া তাহাদের সহিত মিলন স্থাপনের চেষ্টাও বৃথা। মিলন-ভূমি মানব-অন্তরের নিম্নভাগে নহে, ঊর্দ্ধভাগে। এক পক্ষ নামিয়া আসিয়া যে মিলন, সে মিলন নহে, উভয় পক্ষ ঊর্দ্ধে উঠিয়া যে মিলন, তাহাই সার্থক মিলন। জগতে চিরন্তন নিয়ম এই যে, কাহারও সহিত মিল করিবার জন্য যদি তুমি ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চতম ভূমি হইতে একটুকুও নিম্নভূমিতে নামিয়া এস, তবে সর্ব্বাগ্রে তুমি তাহারই শ্রদ্ধা হারাইবে। প্রকৃত মিলনভূমি ধর্ম্মের সহজলভ্য তৃপ্তিসকলে নহে; প্রত্যেক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শে ও উন্নত প্রয়াসে। হিন্দুর পবিত্র ঈশ্বরানুভূতির ও চরিত্রে সংযমের আদর্শ, সমাজে ধনী অপেক্ষা ধার্ম্মিককে অধিক মান-দানের আদর্শ, বৌদ্ধের অনুষ্ঠান অপেক্ষা শীলের প্রতি অধিক সমাদর, মুসলমানের বিমল একেশ্বরবাদ, ধর্ম্মক্ষেত্রে রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, এবং রক্তের ও বর্ণের বৈষম্যবোধের প্রতি একান্ত অনাস্থা, খ্রীষ্টানের নীতিপ্রধান ও চরিত্রপ্রধান ধর্ম্মজীবনের আদর্শ, উচ্চ ও নীচ সকল মানবাত্মার মূল্যবোধ, ও তৎপ্রসূত কল্যাণকর্ম্মে প্রবল আগ্রহ, খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব উভয়ের ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধের আদর্শ,—এ সকলই মিলনের প্রকৃত ভূমি। প্রত্যেক ধর্ম্মকে প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে এই সকল শ্রেষ্ঠ ভাব ও আদর্শ সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রহণ না করিলে সে ধর্ম্মের পক্ষে পশ্চাতে পড়িয়া থাকা ও জগতের শ্রদ্ধা হারানো অনিবার্য্য। ব্রাহ্মসমাজকেও ইহার তিন শাখার প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠ আদর্শসকলকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের স্বদেশীয় রীতিসকলের প্রতি গভীর আস্থা, ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রথমযুগের বিবেকপরায়ণতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সর্ব্বসাধারণের মতের প্রতি সম্মান, নববিধানের ভক্তি-প্রধান ভাব,—এ সকল ইহার প্রত্যেক অঙ্গকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই উদার ও উন্নত মিলন-ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা যে শুধু ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার ঐক্যের জন্য প্রয়াসী হইব, তাহা নয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শিখ,—সকলের সাধনাকেই আপনার করিয়া লইব, এবং ক্রমশঃ সকলকে এক মহাবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য যত্ন করিব।

আচার, অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি ও সমাজরীতি প্রভৃতি যে ধর্ম্মের অঙ্গ নয়, সে সকলের প্রশ্ন যে ধর্ম্মের প্রশ্ন নয়, বর্ত্তমান যুগে একে একে সকল ধর্ম্মই তাহা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ

করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগ, ধর্ম্মে অন্তর্মুখীনতার যুগ। এ যুগে ধর্ম্মসকলকে পূর্ব্ব-বর্ণিত উদার ও উন্নত ভূমিতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতে কে আহ্বান করিবে? পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে আবদ্ধ হইতে কে আহ্বান করিবে? এবং বন্ধুভাবে পরস্পরের প্রেমভক্তিরসে ও পরস্পরের অনুপ্রাণনে মগ্ন হইয়া হইয়া ক্রমশঃ গলিয়া মিশিয়া সকলকে একাকার হইয়া যাইতে কে আহ্বান করিবে? এই আহ্বান করিবার অধিকারটি বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আছে। এবং যিনি দেশের দেশ, যিনি কালের কাল, শতাব্দী যাঁহার কাছে তুচ্ছ নিমেষ মাত্র, সেই অকাল-পুরুষের দৃষ্টি লইয়া এই মহামিলনের কল্পনা করিবার ও তজ্জন্য প্রয়াসী হইবার উপযুক্ত মানসশক্তি, উপযুক্ত বিশালদৃষ্টি ও সাহস, একমাত্র ব্রাহ্মসমাজেরই আছে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ রাজা রামমোহন রায়ের ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি, শতাব্দীর দূরতা উল্লঙ্ঘন করিয়া, ভারত সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্যের মহান্ আদর্শটি দেখিয়া লইয়াছিল। তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম একদিন **মিলিত ভারতের জাতীয় এক ধর্ম্ম** হইবে; ইহা ভারতের বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন অঙ্গসকলকে যুগে যুগে ক্রমশঃ অধিক অধিক একতাবদ্ধ করিয়া তুলিবে। ব্রাহ্মসমাজের সকল কর্ম্মের পশ্চাতে যাহাতে এই উচ্চ আশা ও এই বৃহৎ সাহস ও অধ্যবসায় চিরবর্ত্তমান থাকে, ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে শুধু মার্জ্জিত মত ও সামাজিক সুরীতি লইয়া আপনাতে আপনি তৃপ্ত ও দেশ সম্বন্ধে উদাসীন একটি দলে পরিণত হইতে না পায়, হে তরুণগণ, ইহার সম্মুখের যুগে তোমাদিগকে সে বিষয়ে জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যখন ব্রাহ্মসমাজের এই মহান্ আদর্শের সহিত ইহার বর্ত্তমান নানা ভাগে বিভক্ত দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খল অবস্থার তুলনা করি, তখন হৃদয় ক্ষোভে ও মনস্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। মনে হয়, রামমোহন রায়ের নামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কলঙ্ক লেপন ব্রাহ্মসমাজই করিতেছে। নব ভারতের যে-কোনও অপর সম্প্রদায়ের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহাদের কর্ম্মকল্পনা কত বৃহৎ ও সাহসপূর্ণ, তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি কত সুশৃঙ্খল, তাহাদের কর্ম্মে সফলতা কত বিশাল। এক এক সময় মনে হয়, ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী জাতির হস্তে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মভার প্রধানভাবে পতিত হওয়াতেই বুঝি ইহার এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কখনও বা আধ্যাত্মিকতার, কখনও বা আর্টের দোহাই দিয়া, আমরা ভাবের চরিতার্থতাকে এত অধিক অন্বেষণ করিতেছি যে, কর্ম্মে আমরা পঙ্গু ও একান্ত অপটু হইয়া পড়িতেছি; এবং বৃহৎ কল্যাণ-কর্ম্মের চাপ ও দায়িত্ব অধ্যবসায়ের সহিত বহন করিতে করিতে মানুষ যে-কর্ম্মতৎপরতা ও যে-পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষালাভ করে, সে-শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমরা তর্ক বিতর্কে ও তুচ্ছ দলাদলিতে শক্তিক্ষয় করিতেই অভ্যস্ত হইতেছি। ভগবানের বিধি এই যে, অনেকগুলি মানুষ যখন কাঁধে কাঁধ দিয়া একটি বড় কাজে খাটে, তখন তাহারা সহজেই তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্যসকল ভুলিয়া যায়। হে তরুণগণ, যদি তোমরা আগামী যুগে ব্রাহ্মসমাজকে বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মকল্পনায় ও কর্ম্মোদ্যোগে টানিয়া নামাইতে পার, ও অধ্যবসায়ের সহিত তাহাতে নিযুক্ত রাখিতে পার, দেখিবে, ইহার মিলনসম্বন্ধীয় প্রশ্নসকলের সমাধান আপনা আপনি হইয়া যাইতে থাকিবে। দেখিবে, ইহার অত্যধিক মতবিলাসী ও দ্বন্দ্বপ্রিয় লোকগুলি আপনিই পশ্চাতের আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

হে তরুণগণ, তোমাদের কাছে আমার অন্তকার শেষ কথা এই যে, মানবসমাজে যোদ্ধার কাজ ও কর্ম্মীর কাজ ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু মানবসমাজে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। সংসারে ধ্বংস ও সৃষ্টি, ভাঙ্গা ও গড়া, এই দুই কাজই করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বংশকে কুসংস্কার অন্যায় ও অপবিত্রতার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, তাই ইহার দ্বারা এতদিন সৃষ্টির কাজ ভাল করিয়া সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। কুসংস্কারবর্জ্জন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে; তাই, জ্ঞানরাজ্যের সকল উন্নতির ও বিস্তারের সহিত সমতালে চলা এবং বিভিন্ন ধর্ম্মসকলের সহিত যোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্যক্‌রূপে হইয়া উঠে নাই। সমাজের বৈষম্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে; তাই সকল শ্রেণীর মানুষের, বিশেষতঃ সমাজের অধস্তন শ্রেণীর এবং নারীর যুবকের ও বালকের, শক্তির সদ্ব্যবহারের নব নব ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যথেষ্ট পরিমাণে হয় নাই, এবং সমাজের ধর্ম্মজীবনধারাকে এই সকল শ্রেণীর মানুষের উপযোগী করিয়া নানা বিচিত্র আকার প্রদান করিবার চেষ্টাও সমুচিতরূপে করা হয় নাই। অসাধুতা ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাই সাধুভাবে অর্থোপার্জ্জনের নব নব উপায় উদ্ভাবন, স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া বিশুদ্ধভাবে আমোদ সম্ভোগের আয়োজন সৃষ্টি, সমাজের ও দেশের নরনারীর জন্য মন খুলিয়া পরস্পরের সহিত মিশিবার স্থায়ী ব্যবস্থা,—এই সকলের কিছুই করা হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ এতকাল বিপথ সম্বন্ধে যত নিষেধ ও সতর্কতা প্রচার করিয়াছেন, মানুষের চলিবার জন্য নব নব সুপথ সৃষ্টি তত পরিমাণে করিতে পারেন নাই। আত্মরক্ষার কার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকাতে, দেশের সহিত কল্যাণকর্ম্মে মিলিত হওয়াও ভাল করিয়া হইয়া উঠে নাই। পৃথিবীর চিরন্তন রীতি অনুসারে, যোদ্ধার কাজ এবং অজ্ঞানাপথে প্রথম যাত্রীর (pioneerএর) কাজ করিতে গিয়া, ব্রাহ্মসমাজ এক যুগে দেশের বিপক্ষতা, ও তৎপরবর্ত্তী যুগে দেশের কিঞ্চিৎ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু দেশ এখন ব্রাহ্মসমাজকে এই প্রশ্ন করিতেছে,—ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এখনও কি দেশবাসীর সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিবার সময় আসে নাই? আমরা সকলে অনুভব করিতেছি যে, সে সময় আসিয়াছে। হে তরুণগণ, সম্মুখে যে যুগ আসিতেছে, তাহাতে তোমরা দেখিবে যে, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ প্রশ্ন দেশেরও প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং দেশের অধিকাংশ কাজ ব্রাহ্মসমাজেরও কাজ হইয়া গিয়াছে। তাই তোমরা আরও অধিক পরিমাণে কর্ম্মীর ভাব ও স্রষ্টার ভাব লইয়া সম্মুখের যুগে প্রবেশ করিতে পারিবে। তোমাদিগকে হয় তো আর দেশের বিপক্ষতার অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে না। ইতিহাসে চিরদিন দেখা গিয়াছে,

Registered NO 65.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ২য় সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮
29th April, 1927.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমস্বরূপ বিশ্ববিধাতা, এই সংসারে সকলকে পরস্পরের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হইয়া, মিলিত ভাবে তোমার কার্য্য সাধন করিয়া, উন্নতি ও কল্যাণলাভ করিতে হইবে, তুমি এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছ। আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থে মত্ত হইয়া, শুধু আপনাকে অথবা আপনার দলকে লইয়া বিব্রত থাকিব, আর অপর সকলের সঙ্গে কলহ বিবাদে নিযুক্ত হইব, এরূপ তোমার বিধি নয়—তাহাতে তুমি কাহারও মঙ্গল রাখ নাই। তুমি যে সকলের স্বার্থ ও কল্যাণ একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছ, সকলের জন্য এই এক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, সে-কথা ভুলিয়াই আমরা বৃথা কলহ বিবাদে নিযুক্ত হই, অপ্রেম ও বিরোধের জ্বালাতে দগ্ধ বিদগ্ধ হই। তুমি তোমার বিশেষ কার্য্যসাধনের ভার বিশেষ লোকের উপর অর্পণ করিয়াছ বটে, একই কার্য্য সম্পাদনের জন্য সমভাবাপন্ন লোকদিগকে বিশেষ ভাবে দলবদ্ধ হইবার ব্যবস্থা করিয়াছ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে অপরের সঙ্গে বিরোধের স্থান রাখ নাই—তোমার এই কার্য্যের বিভিন্ন দিক সংসাধনেই সকলকে নিযুক্ত করিয়াছ। আমরা মোহ বশতঃ অহঙ্কার ও কর্ত্তৃত্বস্পৃহার দ্বারা চালিত হইয়া, তোমার কার্য্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, আপনার ভাবে আপনার পথে চলিতে যাই এবং নানা প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত করি, একের কার্য্যে অপরে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হই। হে জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু ও কর্ত্তা, আমরা যদি সকলে সকল বিষয়ে তোমার অধীন হইয়া চলি, তোমার কার্য্যসাধনকেই লক্ষ্যস্থানে রাখি, তাহা হইলে ত এরূপ ঘটিতে পারে না, আমাদিগকে কল্যাণ ও শান্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না,—অপ্রেমে জর্জ্জরিত হইতে হয় না। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, আমাদের হৃদয়ের সকল ক্ষুদ্র বাসনাকে নির্ম্মূল করিয়া, তোমার মহৎ ভাবে, উন্নত লক্ষ্যে, আমাদিগকে পূর্ণ কর। আমরা সকলে প্রেমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, তোমার ইচ্ছাপালন ও কার্য্য-সাধন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার প্রেমের রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সকল জীবনে সমাজে ও জগতে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

প্রলোভনে ফেলিও না—রোগ শোক বিপদকে আমি ততটা ভয় করি না,—ভয় করি প্রলোভনকে। কত ভাবে যে মন বিচলিত হয়, কত রূপে যে প্রলোভন আসে! যেখানে পাপ পাপের বেশেই আসে, সেখানে ততটা ভয় নাই—সেখানে ত শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম। কিন্তু প্রলোভন পদ মানের বেশে আসে, সুখাদ্যের বেশে আসে, শরীর-রক্ষার বেশে আসে, পরিবারপ্রতিপালনের বেশে আসে, দেশ-হিতৈষণার বেশে আসে; ধর্ম্মের বেশে আসে, সভ্যতার বেশে আসে। আমি যে সম্মানের উপযুক্ত নই, সেই সম্মানের বেশে আসে। তখনই ত প্রলোভন হ'তে মুক্ত থাকা কঠিন। আমি গরীব, সংসার চালাতে পারি না,—নিজে কষ্ট পাই, পরিবার কষ্ট পায়; অর্থাগমের আশা পেলাম! ইহা ভগবানের দান, না, প্রলোভনের ছদ্মবেশ? দেশের কাজ, দশের কাজ, সমাজের কাজ করতে চাই; আমাকে দশজনে এসে উচ্চ সম্মান দিতে চাহিল; আমি জানি, আমি তার উপযুক্ত নই—এটি দেশের

আহ্বান, না, প্রলোভনের মনভুলান রূপ? কত ভাবে যে প্রলোভন আসে, পরীক্ষা আসে, সব সময় তা ধরতে পারি না। তাই যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, 'প্রভু, আমাদিগকে প্রলোভনে ফেলিও না'—Lead us not into temptation. আজ আমারও বল্‌তে ইচ্ছা হয়,—প্রভু, সব কর, দুঃখ দাও, শোক দাও, বেদনা দাও, কিন্তু প্রলোভনে ফেলিও না।

আমার আপনার কে?—তোমার ঘরে জন্মেছি ব'লেই কি আমি তোমার ঘরেই আবদ্ধ থাকব? তুমি আমাকে অন্নজল দিয়েছ ব'লেই কি কেবল তোমার সেবাই আমি করব? তোমার কাছে প্রথমে শিক্ষা পেয়েছি ব'লে কি আমি অন্য কারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করব না? আমার প্রাণ যে ঘর ছাড়িয়ে যায়! আমার প্রাণ যে বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে চায়! আমার মন যে সকলের চরণে ব'সে শিখ্‌তে চায়! বিশ্বপ্রাণ যিনি তাঁকে যখন আমি বরণ করেছি, আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে, প্রাণমন উদার হয়েছে। কে ঘরের, কে বাহিরের, কে দেশের, কে বিদেশের, কে আপনার, কে পর, এ ভেদজ্ঞান আমি আর রাখ্‌তে পারি না। আজ নূতন আলোক পেয়ে দেখ্‌ছি, বেদও আমার শাস্ত্র, বাইবেল কোরাণও আমার শাস্ত্র; ঋষিগণও আমার গুরু, খৃষ্টসমাজও আমার গুরু! হিন্দুও আমার, মুসলমানও আমার, খৃষ্টানও আমার, বৌদ্ধও আমার। আমি নূতন অঞ্জন নয়নে পরেছি; নূতন দৃষ্টি লাভ করেছি। আমাকে তোমরা এক স্থানে বদ্ধ ক'রে রেখো না। যে আমার প্রভুর দাস, সেই আমার আপনার। প্রভুর চরণে ব'সে হিন্দু মুসলমান, স্বদেশ বিদেশ, ইহলোক পরলোক বিচার করা চলে না। তাঁর চরণে ব'সে সকলই আমার আপনার। তোমরা কি এ দৃষ্টি পেয়েছ! তোমরা কি এ পথে এসে নূতন ভাবে দেখ্‌বে। যদি তোমরা না এস, আমি একাই দেখি।

ছেড়ে যেও না—তোমরা তাঁকে ছেড়ে যেও না। তাঁর ডাকেই না তোমরা এসেছিলে? তাঁর নামেই না তোমরা মেতেছিলে? তাঁর কথা শু'নেই না তোমরা কত দুঃখ ক্লেশ সহ্য ক'রেছিলে? তাঁর আদেশেই না তোমরা সকল ছেড়ে নিরাশ্রয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলে? আজ কোথায় যেতেছ? তাঁকে ছেড়ে কোথায় চলেছ? আজ কার আশ্রয় পেয়ে সুখে আছ মনে করেছ? আজ কি নিয়ে তাঁকে ভুল্‌তে যাচ্ছ? তাঁকে আজ দেখ্‌তে পাও না? তাঁর বাণী শুন্‌তে পাও না? তাঁর নাম মিষ্ট লাগে না? একবার স্থির হ'য়ে বসো; চোখে নূতন অঞ্জন পর; উৎকর্ণ হ'য়ে থাক। তাঁকে সঙ্গেই দেখ্‌তে পাবে, তাঁর কথা শুন্‌তে পাবে; তাঁর নামে মাধুর্য্য পাবে। আবার তাঁর চরণে প'ড়ে ক্রন্দন কর। অনুতাপের অশ্রুতে সিক্ত হও। প্রাণ সরস হবে, তাঁর চরণে আবার আশ্রয় পাবে। প্রিয় তিনি, বন্ধু তিনি, প্রাণনাথ তিনি; তাঁকে ছেড়ে দূরে যেও না।

সম্পাদকীয়

দল ও দলাদলি—দল সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই সৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহার একটা উপকারিতা এবং আবশ্যকতাও আছে। তাহাকে কোনও রূপে দোষাবহ বা অনিষ্টকর বলা যায় না। কিন্তু দলাদলি সম্বন্ধে সে কথা খাটে না, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলিতে হয়—উহা স্বাভাবিক নিয়মের বিকৃতি, মোহ ও বিকার হইতেই তাহার উৎপত্তি, তাহার কোনও উপকারিতা বা আবশ্যকতা নাই, প্রত্যুত যথেষ্ট অনিষ্টকারিতা আছে। প্রাকৃতিক জগতে যেমন সমধর্ম্মাক্রান্ত অণু পরমাণু-সকল স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ সংহত ও মিলিত হইয়া বস্তু-সকল উৎপন্ন করে এবং বিধাতার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, প্রাণিজগতে এবং মানবসমাজেও তাহার অনুরূপ কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নতম প্রাণী হইতে উচ্চতম মানব পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই যাহারা সমভাবাপন্ন, একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত, একই উপায় অবলম্বনদ্বারা কার্য্য সাধন করিতে অভ্যস্ত, তাহারা স্বভাবের টানেই পরস্পরে মিলিত হইয়া দলবদ্ধ হয়। আর, ইহার দ্বারা যে সকলেরই শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং সাধারণ কার্য্যটিও সহজে সুসম্পন্ন হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়—তাহার অসংখ্য প্রমাণ চারিদিকে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিচ্ছিন্ন ভাবে পৃথক পৃথক থাকিয়া কার্য্য করিতে গেলে যে ইহারা কোনও প্রকারেই সফলতা লাভ করিতে পারিত না, তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন নহে,—চাহিয়া দেখিলেই তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার বিস্তারিত আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই। এই দলগঠনের মধ্যে অনেক স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগও রহিয়াছে, যেমন পরিবার, সমাজ প্রভৃতি। আবার সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাময়িক দলও গঠিত হইতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে অধিকাংশই স্বাভাবিক নিয়মে আপনা আপনি গড়িয়া উঠে, আবার কোনও কোনওটা ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও গঠন করে। ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা হইতে যাহা প্রসূত হয়, তাহা যে সকল সময়েই কল্যাণকর হইয়া থাকে, এরূপ বলা যায় না; কেন না, ব্যক্তি বিশেষ যে কোনও সময়ই নীচ স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া লোককে বিভ্রান্ত করিতে পারে না, এরূপ কথা কিছুতেই বলা যায় না—বরং তাহার বিপরীত দৃষ্টান্তেরই অভাব নাই। তখন যে আর তাহা কল্যাণকর হয় না, অনিষ্টকরই হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা স্বাভাবিক নিয়মে ও মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে, তাহাতেও যে আবার কালে বিকৃতি ঘটিতে পারে না, উহা অকল্যাণকর হইয়া উঠিতে পারে না, এরূপ কথাও কেহ বলিতে পারে না; অপিচ উক্ত প্রকার বিকৃতির যথেষ্ট দৃষ্টান্তই রহিয়াছে। তবে যতক্ষণ প্রত্যেকের, অন্ততঃ অধিকাংশের, লক্ষ্য বিশুদ্ধ ও অবিচলিত থাকে, ততক্ষণ বিকৃতি ঘটিতে পারে না। লক্ষ্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেই, উহা অবিশুদ্ধ হইলেই, বিকৃতি আরম্ভ হয়, ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, চারিদিকে বিষ উদ্গীর্ণ হয়। তখনই দলাদলির সৃষ্টি হয়, অপ্রেমের গরল উৎপন্ন হয়।

দলের ভিন্নতা থাকিলেই যে দলাদলিও থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় দলের ভিন্নতা অনিবার্য্য; সকল পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়া একটি মাত্র দল থাকিবে, এরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই। বিভিন্ন কার্য্য, বিভি. মত, বিভিন্ন গতি, বিভিন্ন দৃষ্টি থাকিবেই; প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে; কেন না, তাহা বিধাতারই বিধি। বিধাতা এই বিচিত্র জগতে সকলের জন্য একটি মাত্র কার্য্য ও তৎসাধনের একটি মাত্র উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। বিচিত্রতাই তাঁহার জগতের স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সকলে পরস্পরের পরিপূরক। এই বিভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য হইতে বিরোধ ও অপ্রেম উৎপন্ন হইবার কোনও কথা নাই। পূর্ণ প্রেমের সহিতই এই পার্থক্য ও বিশিষ্টতা রক্ষিত হইতে পারে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা হইতেও দেখা যায়। মতান্তরে মনান্তর উপস্থিত হইবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই, স্বভাবতঃ তাহা ঘটেও না,—একমাত্র বিকৃত অবস্থায়ই সেরূপ ঘটিয়া থাকে। যখন স্বার্থে বা আত্মাভিমানে আঘাত লাগে, কেবল তখনই বিরোধ ও অপ্রেমের সৃষ্টি হয়। যেখানে ভিন্নতা ও তৎপ্রয়োজনীয়তার স্পষ্ট জ্ঞান আছে, উচ্চ আদর্শের দিকে দৃষ্টি আছে, সেখানে শ্রদ্ধা ও প্রীতি আছে, ব্যক্তিত্বের সম্মান আছে, উদার প্রেমও আছে। যে আপনার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে উৎসুক, কিছুতেই নিজের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করিতে প্রস্তত নহে, সে সর্ব্বদাই অপরের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে সম্মান করিতে যত্নশীল, সকলকে উদার প্রেমে গ্রহণ করিতে ও আপনার পথে চলিতে দিতে অকুণ্ঠিত। যে আপনি মহৎ আদর্শে অনুরাগী, সে অপরের আদর্শকেও সম্মান করে। সে কখনও অপরের বিশিষ্টতা ও স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া, অপরের আদর্শের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া, আপনার দলবৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত হয় না, অপরের কার্য্যে বিরোধিতা উৎপন্ন করিতে চায় না। আপনার আদর্শের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই, সে অপরের কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে উদাসীন বলিয়া তাহাকে আপনার পথে বিনা বাধায় চলিতে দিতে পারে। অনেকে ইহাকেই উদারতা মনে করে। কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন উদারতার কোনও মূল্য নাই—তাহা উদাসীনতারই নামান্তর মাত্র; সুতরাং তাহা হইতে প্রেম জন্মে না। যাহারা মনে করে, উক্ত প্রকার মিথ্যা উদারতা ভিন্ন প্রেম জন্মে না, এক দিকের প্রেম হ্রাস না পাইলে অন্যদিকের প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। প্রেম সীমাবদ্ধ জড়ীয় বস্তু নহে যে, এক দিকে বেশী হইলে অপর দিকে হ্রাস পাইবে। প্রেমের প্রকৃতিই এই প্রকার যে, উহা এক দিকে বর্দ্ধিত হইলে অপর দিকেও ব্যাপ্ত হইবে। যে আপনার জনকে ভালবাসিতে পারে না, সে কিছুতেই অপরকে ভাল বাসিতে পারে না। যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে—এক অর্থে প্রেম সম্বন্ধে এই কথা অতীব সত্য। যেখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আপনার লোকের বা দলের প্রতি প্রেম ও অপরের প্রতি অপ্রেম, সেখানে বুঝিতে হইবে প্রকৃত প্রেমেরই একান্ত অভাব আছে। যাহা আছে তাহা প্রেম নহে, উহা প্রেমের বিকার—মোহ। প্রেম ও অপ্রেম দুই পরস্পরবিরোধী বস্তু এক সঙ্গে থাকিতে পারে না,—একের আবির্ভাবে অবশ্যম্ভাবী রূপেই অপরের তিরোভাব ঘটিবে। প্রকৃত প্রেমে অন্ধতাও নাই, সংকীর্ণতাও নাই। প্রেম মানুষকে যেমন উদার ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন করে, অপরের মহত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ করে, অপর কিছুতেই তাহা করিতে পারে না। সুতরাং বিশুদ্ধ স্বদল-প্রীতি, আপনার আদর্শের ও লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা হইতে, কোনও প্রকারেই দলাদলির উৎপত্তি সম্ভবপর নহে! কিন্তু মোহ যখন এই বিশুদ্ধ প্রীতির স্থান অধিকার করে, তখন আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি আর বিশ্বস্ততা থাকে না, দলই সে স্থান গ্রহণ করে,—দল তখন আর উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় মাত্র থাকে না, আপনিই লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া বসে। তাহা হইতে যে অন্ধতা জন্মে, তাহাতেই যে-কোনও প্রকারে দলের প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা উৎপন্ন হয়, অপরদলের উপর জয়লাভ করিবার ইচ্ছা ও দলাদলির ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তখন আর মূল লক্ষ্যের দিকে, উচ্চ আদর্শের দিকে, কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ভাবই হৃদয়কে অধিকার করে, অহঙ্কার ও কর্ত্তৃত্বস্পৃহাই জাগ্রত হয়, উদারতা ও প্রশস্ততার কিছুমাত্র স্থান থাকে না, বিন্দুপরিমাণ বিশুদ্ধ প্রেমের অস্তিত্বও দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা যে অপ্রেম ও বিবাদ কলহের লীলাভূমি হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? এই জন্যই দলাদলি দ্বিগুণ অনিষ্টকর—ইহাতে দুইদিক দিয়াই ক্ষতি হয়। এই দলাদলির অধীন হইয়া মানুষ নিজের ও অপরের কি অনিষ্টই না সাধন করিয়াছে! জগতে কত মহা অনর্থই না ঘটাইয়াছে! অথচ মানুষ সে-কথা স্বীকার করিতে প্রস্তত নহে, অনেক সময় তাহা বুঝিতেই পারে না—মনে করে, মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়াই কার্য্য করিতেছে, ক্ষুদ্র দলাদলির অতীত হইয়াই চলিতেছে; ভাবে, সত্যানুরাগের দ্বারা চালিত হইয়াই বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে, অপরের সম্বন্ধে তীব্র ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। এরূপ স্থলে সত্যনির্ণয়ের একটি সহজ পরীক্ষা আছে—বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি প্রেম আছে কি না। প্রেম না থাকিলেই বুঝিতে হইবে, আর যাহাই বলি না বা ভাবি না কেন, অন্তরের অন্তরে দলাদলি ভিন্ন আর কিছুই নাই—সকলের মূল চালক একমাত্র দলাদলি; কারণ, দলাদলিই অনুদারতা ও অপ্রেমের জনক। সত্যের প্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকিলে, ঘোরতর মতভেদ হইতেও অপ্রেম উৎপন্ন হয় না। আর একটি উপায়েও সহজে ইহার পরীক্ষা হইতে পারে—আশা ও নির্ভর কোথায়—নিজের চেষ্টা যত্ন ও শক্তির উপর, না, বিধাতার শাশ্বত নিয়মের উপর; কাহার জয় চাই—নিজের ও নিজ দলের, না, সত্য ন্যায় ও মঙ্গলের, বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা ও ব্যবস্থার; আর, প্রাণে সফলতার জন্য ব্যস্ততা ও অস্থিরতাই বেশী, না, সত্য ও ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, বিশ্ববিধাতার ইচ্ছাই নিশ্চয় জয়যুক্ত হইবে বুঝিয়া, সফলতা বিফলতা বিষয়ে উদাসীনতা ও নিশ্চিন্ত শান্ত ভাবই অধিক অনুভূত হইতেছে। এই উপায়ে পরীক্ষা করিলে আমাদিগকে কখনও ভ্রমে পড়িতে হইবে না, আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে সমর্থ হইব, আমাদের মধ্যে দলাদলির ভাব সত্যই প্রসার লাভ করিতেছে কি না।

বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অতি সহজেই দলের ভাব দলাদলিতে পরিণত হইতে পারে। কারণ, সেখানে সাফল্যের দিকেই দৃষ্টি বেশী, উচ্চ আদর্শের চিন্তা অনেক পশ্চাতেই পড়িয়া থাকে। প্রথমে একটা আদর্শের কথা উঠিতে পারে, একটা উন্নত লক্ষ্যের দিকে কিছু দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু কোনও মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা প্রধান লক্ষ্যস্থানে থাকে না,—সাংসারিক সুখ সুবিধা মান প্রতিপত্তিই সর্ব্বপ্রধান লোভনীয় ও লভনীয় বস্তু বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার দিকেই সবল চেষ্টা যত্ন আগ্রহ ধাবিত হয়। এখানে অন্যের জয়ে, অপরের লাভে, নিজের কিছু ক্ষতি, আপনার অংশের কিছু ন্যূনতা ঘটে বলিয়াই অনুমিত হয় সুতরাং এরূপ স্থলে অতি সহজেই বিরোধিতা ও দলাদলির সৃষ্টি হইতে পারে, অপ্রেম হিংসা বিদ্বেষ জন্মিতে পারে, অপরকে সমান সুযোগ দিতে, সমান ভাবে বঞ্চিত হইতে দিতে, অনিচ্ছা উপস্থিত হইতে পারে। ধর্ম্মরাজ্যে কিন্তু সেরূপ কোনও আশঙ্কার কারণ নাই, উক্ত প্রকার সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই—সেখানে একজন অত্যধিক পাইলেও অপরের অংশ বিন্দু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, একের উন্নতিতে অপরের কিছুমাত্র ক্ষতি ঘটে না, বরং একের লাভে অপরেরও কিছু লাভ হয়, একের উন্নতিতে অপর সকলেরও কিছু না কিছু উন্নতি সাধিত হয়। এ ক্ষেত্রে সকলের কল্যাণ ও অকল্যাণ পরস্পরের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। আর, ঠিক ভাবে দেখিতে গেলে, সকল ব্যক্তির ও দলের মূল লক্ষ্যও একই; তাহার মধ্যে বিরোধের কোনও স্থান নাই। অথচ এই ধর্ম্মের নামে যত বিবাদ বিসম্বাদ, দলাদলি অপ্রেম বিদ্বেষ, মারামারি কাটাকাটি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃত ধর্ম্ম লইয়া দলাদলির সৃষ্টি হয় নাই, যত বিবাদ বিসম্বাদ ধর্ম্মের বাহিরের অসার খোসা লইয়াই। ধর্ম্ম লইয়াও অনিবার্য্যরূপেই দল গড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইতে দলাদলির জন্ম হয় নাই, হইতে পারেও না। অপূর্ণ মানুষের পক্ষে পূর্ণ ধর্ম্মের সমগ্র আদর্শ ধারণা করা সম্ভবপর নয়। সে আংশিক ভাবেই উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাই বিভিন্ন মানুষ ও দল ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক্‌মাত্র দেখিয়াছে ও ধরিয়াছে —সমগ্রটা কেহই ধরিতে পারে নাই। জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবপ্রাণে পূর্ণতর ও বিশালতর আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে. সন্দেহ নাই.—ভবিষ্যতে আরও কত হইবে কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু কোনও দিন যে একেবারে পূর্ণ আদর্শটা সকলের নিকট ফুটিয়া উঠিবে, এরূপ বলা যায় না। তাই এই ব্যক্তিগত ও দলগত পার্থক্য হয়ত চিরকালই থাকিবে—কোনও দিনই সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে না। এরূপ পার্থক্য ও দলভেদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং দোষহীন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দল স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয় ভাবেই গঠিত হইতে পারে। অন্য ক্ষেত্রে যেমন, ধর্ম্মজগতেও তেমন, কৃত্রিম ভাবে,—মানুষের প্রভাবে ও চেষ্টায়, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লইয়া—দল গঠিত হইতে পারে; অনেক স্থানে গড়িয়াও উঠিয়াছে। তাহা যে অনিষ্টকর, তাহা হইতে যে দলাদলির সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিবে। আমরা সে প্রকার দলকে কখনও নির্দ্দোষ বলি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বাভাবিক ভাবে যে দল গড়িয়া উঠিবে, তাহার মধ্যে পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে, প্রত্যেকে আপনা হইতে স্বাভাবিক টানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবে। সুতরাং দলগঠনের সকল প্রকার কৃত্রিম চেষ্টাকে আমরা ধর্ম্মসমাজের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী বলিয়াই মনে করি। অপর দিকে দলাদলি পরিত্যাগ করিতে যাইয়া যে দলকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে, ব্যক্তিত্ব হারাইতে হইবে, স্বাভাবিক স্বদল-প্রীতি বিসর্জ্জন দিতে হবে, তাহাও সমীচীন বোধ করি না। আপনার আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকিলে, আপনার ধর্ম্মকে সমগ্র হৃদয় দিয়া ভাল না বাসিলে যে অপরের আলোককে সম্মান করা যায় না, অপরকে সত্য প্রেম দেওয়া যায় না, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই সে কথা সুস্পষ্ট হইয়াছে, মনে হয়। আপনার ধর্ম্ম ও দল বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, ভাক্ত উদারতা যে কোনও ক্রমে অবলম্বনীয় নহে, তাহা যে সত্য উদারতা নামের যোগ্য নহে, উহাতে যে অপরের প্রতিও যথার্থ প্রেম প্রকাশ পায় না, তাহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই দলাদলি পরিত্যাগের প্রকৃত পন্থা কি, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আমাদিগকে আপনার আদর্শের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও প্রেম রাখিয়াই, অপর সকলকে উদার প্রেমের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, যথাসম্ভব মিলিয়া মিশিয়া সকলের সঙ্গে কাজ করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকারে সংকীর্ণ দলাদলি পরিত্যাগ করিতে হইবে, কৃত্রিম দলগঠনের প্রয়াস ও উক্ত প্রকার স্বগঠিত দলের প্রতি অসঙ্গত আত্যন্তিক-প্রীতি বা মোহও পরিহার করিতে হইবে। হৃদয়কে উদার ভাবে সকলের জন্য প্রেমে পূর্ণ রাখিতে হইবে। ধর্ম্ম ন্যায় ও মহৎ লক্ষ্যকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে হইবে। প্রেমময় পিতা আমাদিগকে প্রেম ও পুণ্যের পথে অগ্রসর করুন।

প্রেমই সার ধর্ম্ম।

আমি কলিকাতায় সমস্ত উৎসবে যোগ দিতে পারি নাই। উৎসবের জন্যই, যেখানে আমরা ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের প্রথমে অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছিলাম, সেই বরিশালে যেতে হয়েছিল। এখানকার উৎসবে কি ভাবের লীলা চলিয়াছে, তাহা আমি সম্যক্ অবগত নহি। কিন্তু যে ভাবটি আমার প্রাণে প্রবল হয়েছে, কাল রাত্রিতে উপাসনান্তে আচার্য্য সেই প্রেমেরই ব্যাখ্যা করিলেন। তাই আজ এই উদ্যান-মিলনক্ষেত্রে সেই প্রেমের কথাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমাদের প্রেমের বড়ই প্রয়োজন! তাই আমিও আজ প্রেমের কথাই বলিব।

বিগত ১৬ই মাঘ উদ্যান-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক বিবৃত।

যা হারিয়ে যায়, আগ্‌লে ব'সে রইব কত আর ?
আর পারিনে রাত জাগ্‌তে, হে নাথ, ভাবতে অনিবার।
আছি রাত্র দিবস ধ'রে, দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আস্‌তে যে চায় সন্দেহে তায়
ফিরাই বারে বার;
তাই ত বুঝি হয় না আসা আমার একা ঘরে,
আনন্দময় ভুবন তোমার বাইরে খেলা করে!
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও, এসে এসে ফিরিয়ে যাও;
রাখ্‌তে যা চাই রয় না তাহা,
ধূলায় একাকার!

যাহা আমার, যাহা এই আছে এই নাই, যাহা প্রাণে স্থায়ী শান্তি দিতে পারে না, পাছে তা হারিয়ে ফেলি, এই ভয়ে প্রাণের দুয়ার বন্ধ ক'রে যারা রাতদিন তাই আগ্‌লে ব'সে আছি—প্রতি মুহূর্ত্তে হারাই হারাই মনে হয়, কত ভাবনা, কত যাতনা—কিন্তু বাহিরে যে আনন্দময়ের আনন্দের খেলা চল্‌ছে, কত প্রেম, কত প্রীতি, কত ভালবাসার লীলা চল্‌ছে, কত ভাবে কত লোক হৃদয়-দুয়ারে এসে আঘাত কচ্ছে—ওগো দরজা খোল, আমরা এসেছি, প্রেম নিয়ে এসেছি, প্রেমভিখারী হ'য়ে এসেছি, হৃদয়দ্বার খোল, দেখ বাহিরে কত প্রেমের তরঙ্গ, সৌন্দর্য্যের বিস্তার—হায় রে, সে-ডাকে বধির রহিলাম, প্রাণের দরজা বন্ধ ক'রে রহিলাম, কাহাকেও অন্তরে ঢুকিতে দিলাম না! আমার প্রিয় যিনি, জীবনদেবতা যিনি, জীবনস্বামী যিনি, তিনিও এসেছিলেন! কত বেশ ধ'রে তিনি আসেন,—দুঃখীর বেশে, আর্ত্তের বেশে, শোকের বেশে, শোকার্ত্তের বেশে, অনাথের বেশে, তিনিও আসেন! তিনিও প্রাণের দ্বারে আঘাত করেছিলেন, তিনিও দ্বার বন্ধ দেখে ফিরে গেলেন। অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয় লইয়াই রহিলাম, প্রাণের দরজা খুলে হৃদয়-মন্দিরে কাহাকেও আসিতে দিলাম না, প্রভুকেও ফিরাইয়া দিলাম! বাহিরে এত সৌন্দর্য্য, এত মাধুরী, প্রেমের এত খেলা, যারা এসেছিল তাদের এত স্নেহ, এত প্রীতি, প্রিয়তমের আকুল আহ্বান, কিছুই সম্ভোগ করা হলো না! শুধু ক্ষুদ্র তুচ্ছ, অস্থায়ী জিনিষ লইয়াই রহিলাম।

প্রাণের দরজা খোল, হৃদয় উন্মুক্ত কর, বাহিরে চেয়ে দেখ কারা এসেছে—কত প্রেম প্রীতি স্নেহ ল'য়ে এসেছে, কত আকুল ক্রন্দন, শোকের আর্ত্তনাদ, দুঃখের বেদনা, লইয়া এসেছে! হৃদয়দেবতা তাহাদের মধ্যেই, তাহাদের সঙ্গেই অন্তরের দ্বারে এসে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন। হৃদয়ের দ্বার বন্ধ ক'রে রেখো না, প্রাণ উন্মুক্ত কর, সকলকে প্রাণে গ্রহণ কর, হৃদয়দেবতাও আসিবেন, অন্তরে ও বাহিরে নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে, নব আনন্দে জগৎ মাতিবে, নূতন প্রেম উৎসারিত হইবে, নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে।

আমাদের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। ইংরাজীতে ড্রামণ্ড মহোদয়ের একখানা গ্রন্থ আছে, তাহার নাম The Greatest thing in the World. তিনি বলিয়াছেন, প্রেমই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ, প্রেমই সর্ব্বরত্নসার। আমরা সময়ে সময়ে ঈশ্বরকে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" রূপে দেখি, বলি—যখন আমরা অপরাধ করি, প্রাণে ঘোর যন্ত্রণা, তখন তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু তিনি যে প্রেমময় দেবতা! তিনি যদি রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দেন, তাহাও তাঁহার প্রেমেরই পরিচয়। প্রেমময় দেবতার উপাসক যারা, প্রীতিসাধন তাহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। এক এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, যাহারা সংসারকে বন্ধন মনে করেন; তাহারা সুখভোগ ত পরিত্যাগ করেনই, প্রীতি স্নেহ ভালবাসা, দয়া সহানুভূতি, এই সকল অপার্থিব বিমল বৃত্তিগুলিকেও বন্ধন মনে করিয়া থাকেন—শৃঙ্খল লৌহনির্ম্মিতই হউক, আর স্বর্ণনির্ম্মিতই হউক, শৃঙ্খল ত বটে; তাহা মানুষকে বাঁধিয়াই রাখে। সুতরাং সকল বন্ধন ছিন্ন কর, হৃদয়কে শুষ্ক কর, সব মমতা বিসর্জ্জন কর, গিরিগুহায় বা বিজন অরণ্যে গমন করিয়া ধ্যানে মগ্ন থাক। ধর্ম্মসাধনে সময় সময় নির্জ্জনবাসের প্রয়োজন আছে; ধ্যান ধারণা ত ধর্ম্মের অঙ্গ, সুখ স্বার্থ পরিত্যাগ, সংযমসাধন ত ধর্ম্মের ভিত্তি, ত্যাগ বৈরাগ্যব্রত ত গ্রহণ করাই প্রয়োজন; কিন্তু এই সংযম, এই ত্যাগ, এই বৈরাগ্য, এই সমস্তই প্রেমের জন্যই। ঈশ্বরে প্রেম ও সেই প্রেমের জন্যই, ঈশ্বরের প্রীতির জন্যই, মানবে প্রেম—ইহাই ধর্ম্মের সার। আর, এই প্রেম বিস্তার করিতে যাইয়াই ঘর হইতে বাহির হইতে হয়, হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করিতে হয়, দশজনকে আলিঙ্গন করিতে হয়, আপনার সুখ, আপনার স্বার্থ, আপনার ক্ষুদ্রতা, ত্যাগ করিয়া, দশের জন্য ঈশ্বরের নামে জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। Be ye perfect as your Father in Heaven is perfect. প্রভু পরমেশ্বর প্রেমময় পিতা; তাঁহার সন্তান তোমরা, তোমাদিগকেও তাঁহার ন্যায় প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করিতে হইবে। তিনি যে এক জনকেও পরিত্যাগ করেন না—যে পাপী, অপরাধী, যে তাঁহাকে অস্বীকার করে, যে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া চলে,—তিনি যে তাহাকেও ভাল বাসেন, তিনি যে তাহার জন্যও ব্যস্ত, তিনি যে তাহাকেও ডাকিয়া আনেন! তিনি যে ৯৯টি মেষ পথে রাখিয়া একটি হারাণ মেষের সন্ধানে যাচ্ছেন! তাঁর প্রেমের পরিচয় কি তুমি আমি পাই নাই? জীবনের কত ঘটনাতে, কত সুখে, কত দুঃখে, কত উত্থানে, কত পতনে, কত বেদনায় অস্থির হ'য়ে, কত চোখের জলের মধ্যে, এই জীবনে, এই এই ক্ষুদ্র জীবনে, তাঁর কত প্রেমের পরিচয় পেয়েছি! তাই তাঁরই প্রীতির জন্য, তাঁর প্রেম-প্রেরণায় তোমাকে আমাকেও প্রেম দান করিতে হইবে—ঈশ্বরে প্রেম ও সেই প্রেমের জন্যই মানবে প্রেম। নদী তড়াগ সমুদ্র হইতে জল বাষ্প হ'য়ে উর্দ্ধে উত্থিত হয়; উর্দ্ধদেশে, শীতল বায়ুর সংস্পর্শে তাহা ঘনীভূত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। কিন্তু তাহাতেই কি বাষ্পজীবনের কৃতার্থতা? তা ত নয়। ঐ মেঘই আবার বারিরূপে, করুণায় ধারারূপে, পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধরাতল শীতল করে, নদীরূপে দেশ জনপদ বিধৌত করিয়া অসীম সাগর মুখে চলিয়া যায়—কত লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করে, ধরা শস্যশালিনী করে, কত বাণিজ্যসম্ভার বক্ষে ভাসাইয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া যায়, লোক চলাচলের কত সুবিধা করিয়া যায়! এখানেই ত বাষ্পজীবনের কৃতার্থতা। তোমার আমার প্রেমের কৃতার্থতা কোথায়? তোমার আমার প্রেম উর্দ্ধহইতে উর্দ্ধে ঈশ্বরের পাদমূলে উত্থিত হইবে; সেই প্রেম প্রেমময় দেবতার পাদস্পর্শ করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর মত মানবের মধ্যে

করুণারূপে, মৈত্রীরূপে, প্রীতি স্নেহরূপে, সহানুভূতি সমবেদনা রূপে, লোকশ্রেয়ঃসাধনরূপে, ছড়াইয়া পড়িবে,—কত মানুষের দুঃখ দূর করিবে, কত শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিবে, কত ব্যথিতের বেদনা দূর করিবে, কত পাপ তাপদগ্ধ মানবের প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ করিবে, কত অত্যাচার উৎপীড়ন নিবারণ করিবে, কত অশিক্ষা কুশিক্ষার স্থানে সুশিক্ষা বিস্তার করিবে! চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে, কত বেদনার কাতর কণ্ঠ শুনা যাইতেছে, কত আর্ত্ত ও পীড়িতের আর্ত্তনাদে গগন পূর্ণ হইতেছে, কত উৎপীড়িতের মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, কত ক্ষুধিত তৃষিত লোক হাহাকার করিতেছে, কত পাপের বেদনায় লোক অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! মানুষ জুড়াইতে চায়, জুড়াবার স্থান পায় না। তুমি কি নীরব থাকিবে? তোমার হৃদয়-কবাট কি রুদ্ধ করিয়া রাখিবে? তোমার কর্ণ কি বধির থাকিবে? প্রেমময় দেবতা তোমাকে আমাকে ডাকিতেছেন। ক্ষুদ্র মতদ্বৈধ ভু'লে, ধর্ম্মের অবান্তর আচরণ ছেড়ে, দ্বন্দ্ব ছেড়ে, কলহ ছেড়ে, স্বার্থ ছেড়ে, সুখ ছেড়ে, আপনার ক্ষুদ্রতা ছেড়ে এস, প্রাণে প্রেম, হৃদয়ে ভালবাসা ল'য়ে এস; সকলকে আপনার ব'লে গ্রহণ কর।

যীশু ব'লেছেন, যদি নৈবেদ্য লইয়া ঈশ্বরের বেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া থাক, আর তখন যদি তোমার মনে পড়ে যে কাহারও সঙ্গে তোমার অপ্রীতি আছে, তবে নৈবেদ্য রেখে যাও, আগে তাহার সঙ্গে মিলন ক'রে এস, তবে নৈবেদ্য প্রদান কর; নতুবা তোমার নৈবেদ্য গৃহীত হইবে না। হৃদয়ের একটু কোণেও যদি অপ্রেমের ভাব আসে, তবে জানিও, নিশ্চিত জানিও, উপাসনা সফল হইবে না। হৃদয়কে প্রেমে পূর্ণ কর, সকল বিদ্বেষ বিবাদ দূর ক'রে দাও। যাকে দূরে রেখেছ, সে যে তোমার ভাই, আপনার জন। যাকে তুচ্ছ করিতেছ, তার ভিতরে যে তোমার প্রাণের দেবতা রয়েছেন! যার প্রতি অপ্রেম প্রকাশ করিতেছ, সে যে তোমারই প্রাণের দেবতার প্রিয়! কোন্ প্রাণে তুমি তাঁহাকে দূরে রাখিবে? তুচ্ছ করিবে, অপ্রেম করিবে? মহাত্মা গান্ধি ব'লেছেন God is light, not darkness; God is love, not hatred.

স্নেহ মমতা, প্রীতি ভালবাসা সকলের প্রাণেই আছে। নতুবা এই সংসার টিকিত না। মার যদি সন্তানের প্রতি স্নেহ না থাকিত, এমন কষ্ট স্বীকার ক'রে সন্তানপালন তিনি করিতেন না; পিতা মাতা, ভাই বোন, স্বামী স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে সকলেই ভালবাসে—একান্ত দুর্বৃত্ত যে সে-ও আপনার জনকে ভালবাসে, আপনার জনের জন্য নিজের সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন করে। যে একান্ত দুরাচার সেও গৃহে আসিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করে। তাই ত গৃহে পরিবারে আনন্দের দৃশ্য, স্বর্গের ছবি, দেখিতে পাই। কিন্তু ধর্ম্মসমাজের লোক যিনি, ঈশ্বরের উপাসক যিনি, তার কেবল পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভাই বোন্, আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসিলেই চলিবে না, তাহাকে আপনার গণ্ডী ভেদ করিয়া বাহির হইতে হইবে,—দূরে যারা দাঁড়াইয়া আছে, হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতেছে, তাহাদিগকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে। যে তোমাকে স্নেহ করে, যে তোমায় আদর করে, তাহাকে যদি তুমি ভালবাস, আদর কর, তাহাতে তোমার বিশেষত্ব কি? সেরূপ ভালবাসা আদর যত্ন ত সকলেই করে। কিন্তু যে তোমাকে আদর করে না, যে তোমার স্নেহের প্রতিদান করে না,—তুমি স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে যাও, কিন্তু সে তোমাকে উপেক্ষার সহিত প্রত্যাখ্যান করে, তুমি প্রাণপণে তার কল্যাণ করিতে যাও, সে তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করে—তাহাকেও যদি ভালবাসিতে পার, তাহার প্রতিও যদি প্রেম রক্ষা করিতে পার, তাহারও যদি কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণচেষ্টা করতে পার, তবেই বুঝিব, তোমার প্রেমের শিক্ষা আরম্ভ হ'য়েছে। এই প্রেম ক্রমে ছড়াইয়া পড়িবে। কেবল রক্তের সম্পর্কের লোকের প্রতি নয়, কেবল বিবাহবন্ধনদ্বারা যাদের সঙ্গে আত্মীয়তা জন্মিয়াছে তাদের প্রতি নয়, কেবল স্বার্থের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে আছে তাদের প্রতি নয়, সকলের প্রতিই স্নেহদৃষ্টি, প্রেমের ভাব পোষণ করিতে হইবে। অন্ততঃ কাহারও প্রতি অপ্রেম থাকিবে না। মানুষকে মানুষ বলিয়া দেখ। আপনার সুখ ও স্বার্থের সঙ্গে জড়িত দেখ বলিয়াই কাহারও কাহারও প্রতি অপ্রেম আসে। কিন্তু তুমি যে ঈশ্বরে প্রীতি অর্পণ করিয়াছ? তিনি কোথায়? কোথায় তাঁহাকে খুঁজিতেছ? এই শূন্যেই তাঁহাকে খুঁজিবে? কেবল কি তাঁহাকে পাহাড়ে পর্ব্বতে, বনে জঙ্গলে, প্রকৃতির রম্য নিকেতনে, ফুলে ফলে, লতায় পাতায়, প্রাতঃসূর্য্যের বিমল আলোকে, পৌর্ণমাসী রজনীর জ্যোৎস্নালোকিত ধরার অপরূপ সৌন্দর্য্যেই তাঁহাকে দেখিবে? সেখানে তিনি আছেন, প্রতি পদার্থে তিনি আছেন, আলোকে আঁধারে তিনি আছেন, সূর্য্যে চন্দ্রে তিনি আছেন, পাহাড়ে জঙ্গলে তিনি আছেন; সকল দৃশ্যে, সকল গন্ধে, সকল রসে, সকল সুরে তিনি আছেন। তাঁরই গন্ধ গন্ধবাহী সমীরণ বহন করে; ফলে শস্যে তাঁহার রসের আস্বাদন পাই, তাঁহার সঙ্গীতধ্বনি সকল শব্দের মধ্যে শ্রুত হয়। চলিতে ফিরিতে তাঁহারই স্পর্শ অনুভব করি। তিনি যে তোমার আমার সকলের চারিদিক বেষ্টন ক'রে রয়েছেন, আলিঙ্গন করিতেছেন, স্নেহের কোমল স্পর্শ দিতেছেন। চক্ষু মেলিয়া দেখ, প্রকৃতিতে তাঁর শোভা দেখ, পাখীগণের মধুর সঙ্গীতে তাঁহার বাণী শোন, রূপে রসে গানে গন্ধে তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার মাধুর্য্য, উপলব্ধি কর। কিন্তু মানুষের ভিতরে তাঁহাকে দেখিবে না? তিনি যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রাণের প্রাণ, জীবননাথ হ'য়ে রয়েছেন! প্রত্যেক মানুষের মুখে তাঁহারই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মানুষকে ছাড়িয়া কোথায় স্বর্গের অন্বেষণ কর? মানুষের সঙ্গে তাঁর যে নিত্য লীলা চলিতেছে! মানুষের সুখে দুঃখে, হাসি কান্নায়, বিচ্ছেদে মিলনে যে তাঁরই প্রেমের খেলা চলিতেছে! একবার চেয়ে দেখিবে না? হৃদয়-কবাট বন্ধ ক'রে রহিবে? যে আসিতে চায় তাকে আসিতে দিবে না? বাহিরে কি সৌন্দর্য্য, কি প্রেমের তরঙ্গ, কি উৎসব, কি আনন্দের উচ্ছ্বাস, তাহা দেখিবে না—সম্ভোগ করিবে না? ঐ দেখ, ভাইকে তুচ্ছ করিও না! ঐ দুঃখী, ঐ গরীব, ঐ শোকার্ত্ত, ঐ উৎপীড়িত, ঐ লাঞ্ছিত যে তোমার দ্বারে প্রেমের ভিখারী হ'য়ে এসেছে, তার ভিতরে তিনিও যে আছেন! উহাদের তাড়িয়ে দিলে,

তিনিও যে চ'লে যাবেন! যদি নিরন্নকে অন্ন না দেও, তবে তাঁহাকেই উপবাসী রাখা হয়; যদি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় না দেও, তবে তাঁহাকেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়; যদি উৎপীড়িতকে সাহায্য না কর, তবে তাঁহারই অবমাননা করা হয়। তিনি যে স্বয়ং দুঃখী, পাপী, তাপী, আর্ত্ত, উৎপীড়িতের বেশে তোমার দ্বারে এসে আশ্রয় চাহিতেছেন, সেবা চাহিতেছেন, প্রেম চাহিতেছেন কোন্ প্রাণে তাঁহাকে বিমুখ করিবে? হৃদয়দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিবে? তোমার শক্তি নাই? তোমার অর্থ নাই? সে-কথা বলো না। তুমি যে নিজে কত সুখের আয়োজন করিতেছ, কত আরামের বন্দোবস্ত করিতেছ, কত বিলাসিতার জিনিষে গৃহ পূর্ণ করিতেছ! তুমি কি ঈশ্বরের দাস? তাঁকে কি তুমি চাও? তাঁকে কি তুমি প্রীতি কর? তবে তোমার ঐ সম্পদ, ঐ ঐশ্বর্য্য, বিলাইয়া দাও, তাঁর চরণে অর্পণ কর,—দরিদ্র নারায়ণের সেবাতে, বিপন্নের উদ্ধারে নিয়োগ কর। তোমার অর্থ নাই, সম্পদ নাই, শক্তি নাই, ক্ষমতা নাই। তবুও তোমার প্রাণে যদি প্রেম থাকে, তবে তুমিও কিছু করিতে পার। তুমি ত একটি লোকের সেবা করিতে পার, একটি নিরন্নকে অন্ন দিতে পার, একটি লোককে আশ্রয় দিতে পার! সকলেই কি অর্থসাহায্য চায়? মানুষ যে একটু স্নেহের ভিখারী, একটু সহানুভূতির প্রত্যাশী। তুমি কি একজন দুঃখীকে একটি সমবেদনার কথা বলিতে পার না? একজন শোকার্ত্তকে একটি সান্ত্বনার কথা বলিতে পার না? একজন পতিতকে আশার বাণী শুনাইতে পার না? তোমার কাছে আসিল, একটা প্রাণের কথা বলিয়া তৃপ্ত হইবে; তোমার সময় নাই, তুমি তার কথা শুনিলে না! তোমার গৃহে আসিল, একটা আশার কথা শুনিবে, একটা ভাল পরামর্শ পাইবে, তুমি উদাসীনের মত তাকে তাড়াইয়া দিলে! প্রাণে কত জ্বালা, তোমার কাছে এসেছে; তোমার সঙ্গে একটু কথা ব'লে জ্বালা জুড়াতে চায়; তোমার সময় হ'লো না। একটি দুইটী কথা ব'লেই কাজের অছিলায় উঠে গেলে; সে নিরাশ হ'য়ে ম্লান মুখে চ'লে গেল! তুমি এত নির্ম্মম, এত কঠিন কেন?

প্রেম অনেক সহ্য করে। যাঁরা প্রেমিক তাঁদের কত দুঃখ! সকলের দুঃখের বোঝা তাঁর মস্তকে এসে পড়ে। যীশুকে লোকে man of sorrows বলিত। তাঁদের কি নিজের দুঃখ? তা ত নয়। এই মানবসন্তান তাঁর কত প্রিয়! তারা পাপে তাপে ক্লিষ্ট, তারা প্রেমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না! এত দুঃখ তিনি সহিতে পারেন নাই; তাই তিনি সর্ব্বদা বিষণ্ণ ছিলেন। বুদ্ধ লোকের জরা মরণ ব্যাধিজনিত দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে, এই দুঃখনিবারণের কোনও পথ আছে কি না তাহা খুঁজিবার জন্য, রাজ্য ধন স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হইলেন। মানুষ হরি নাম করে না, মানুষের এত ক্লেশ! তাই চৈতন্য হরি নাম বিলাইতে পাগল হইলেন। স্নেহময়ী মাতা, প্রেমের প্রতিমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন। যার প্রেম যত, তাঁর বেদনাও তত বেশী। মানুষ বলে পুত্র-শোকের, প্রিয় জনের শোকের, গভীর বেদনা। তা ঠিক; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও তীব্র বেদনা আছে। প্রিয়জন যখন বিগড়িয়ে যায়, আপনার জন যখন পর হ'য়ে যায়, যাকে ভালবাস, সে যখন আদর্শচ্যুত হয়, সে যখন উপেক্ষা দেখায়, তখন যে প্রাণে বেদনা হয়, তাহার তুলনা নাই। প্রেমিক-হৃদয় মানুষ তাহাও সহ্য করিবে, তবুও প্রেম দিবে—যে দূরে যায়, তাকেও ভালবাসিবে, যে উপেক্ষা করিবে, তারও কল্যাণচিন্তা করিবে, যে বিপথে যায়, তার জন্য প্রার্থনা করিবে। যে তোমায় অপমান করে, নির্য্যাতন করে, তাকেও ভাল বাসিবে। প্রেম ক্ষমা আনিয়ে দেয়, যে ক্ষমা করতে জানে না, তার হৃদয়ে প্রেম জাগে নাই। প্রেম কাহারও নিন্দা কুৎসা সহিতে পারে না। তোমার প্রিয় যে, আপনার জন যে, সে যদি কোনও অন্যায় করে, তবে কি তার কুৎসা রটনা কর? অন্যে যদি তার কলঙ্কের কথা বলিয়া বেড়ায়, তা কি তুমি পছন্দ কর? তা ত কর না; তোমার প্রাণে আঘাত লাগে, তুমি ক্রন্দন কর, তুমি প্রার্থনা কর, তুমি প্রিয়জনের হাত ধ'রে বল, যেও না, ও পথে যেও না। এই ত প্রেমের রীতি। আর তোমার ভাই, তোমার বোন, তোমার সমাজের লোক, তোমার সমবিশ্বাসী কেহ যদি কোনও রূপে বিপথে যায়, তবে কি তোমার উল্লসিত হওয়া উচিত? তুমি কি তার কুৎসা রটনা করিবে? তার অকীর্ত্তির কথা লোকের কাছে ব'লে বেড়াবে? সে ত প্রেমের ধর্ম্ম নয়। তুমি তাতে ব্যথিত হবে, তুমি ক্রন্দন করিবে, তুমি হায় হায় করিবে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবে, তাকে প্রেমে আলিঙ্গন ক'রে বলবে, ও ভাই, ও বোন, ঐ পথ নয়। তোমার মুখ মলিন হবে, তোমার জীবন ভারবহ হবে। ইহাই ত প্রেমের রীতি। প্রেম দিয়াই সুখী, পাইতে চায় না। আমাদের প্রেমাস্পদ যারা তাদিগকে দিয়াই আমরা সুখী হই, প্রেম করিয়াই আনন্দ পাই; তারা যদি প্রতিদান না করে, তবুও তাদের ভালবাসি। মা সন্তানকে নিঃস্বার্থ ভাবে স্নেহ করে। আমরা যদি প্রেম সাধন করি, আমাদিগকেও অযাচিত ভাবে, প্রতিদানের আশা না রাখিয়া, মানুষকে প্রেম করিয়া যাইতে হইবে, কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। প্রেম না থাকিলে মানুষ ঝগড়া করে, কলহ করে, শ্রেয়ঃসাধন করিতে যাইয়াও, কাহার নাম হইবে, কে প্রশংসা পাইবে, তাহার জন্য লালায়িত হয়। এবং পরস্পর ঝগড়া করে, একে অন্যের সত্য মিথ্যা কুৎসা রটনা করে। ঈশ্বরের কাজে এসেছে, মানবের সেবা করিতে এসেছে, সেখানেও মানুষে মানুষে বিবাদ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ, দলে দলে বিদ্বেষ। এ কি নরকের দৃশ্য! তোমার দান ধ্যান, তপ জপ, সকলই বৃথা, যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে। পরমেশ্বরে প্রেম এবং সেই প্রেমের প্রেরণায় মানবপ্রেম, মানবের সেবা, এই প্রেমের জন্যই আত্মসুখবিসর্জ্জন। যেখানে আপনার সুখে লালসা, আপনার প্রভাব প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা, আপনাকে বড় করিবার ইচ্ছা, সেখানে প্রেম দাঁড়ায় না। প্রেম জাগিলে মানুষ নত হয়, আত্মবিসর্জ্জনে ব্রতী হয়, অপরের জন্য নিজের সুখ স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, অন্যকে বড় করিয়া নিজে ছোট হয়, অন্যকে গৌরব দিয়া নিজে নিম্নস্থান অধিকার করে।

প্রেমের প্রস্রবণ যিনি, তিনি তোমার হৃদয়ে। তোমার প্রাণ এত পাষাণ কেন? এই প্রেমের অভাবে সংসার মরুভূমি হলো,

ধর্ম্মসমাজ শুকাইয়া গেল। দুইটি ভাই একত্রে থাকিতে পার না, দুই জন সমবিশ্বাসী এক ক্ষেত্রে এক প্রাণে কাজ করিতে পার না, পরস্পরের কুৎসা কর, একে অন্যকে জব্দ করিতে চেষ্টা কর। কি দেখিয়া এই সাধন-ক্ষেত্রে এসেছিলে? কি জন্য এই ব্রাহ্মসমাজে এসেছিলে? সে দিনের কথা মনে কর। প্রেমময়ের প্রেমের লীলা দেখে কি আস নাই? ব্রাহ্মসমাজে ধরাতে স্বর্গের দৃশ্য অবতীর্ণ হইবে, প্রেম পরিবার গঠিত হইবে, ভাইবোনে মিলে ব্রহ্মনাম গান করিবে, ব্রহ্মের পূজা করিবে, ব্রহ্মের প্রেমে মানবের সেবা করিবে, ধরাতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবে, নূতন ভাবে সমাজ গড়িয়ে নব প্রেমে নূতন ভাবে পরিবার গঠন করিবে,—ইহাই ত আশা ছিল, ইহাইত জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাই ত অনেক কষ্ট সহিয়া, অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিয়া, অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, পিতা মাতার ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া, জানা হইতে অজানাতে ঝাঁপ দিয়াছিলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলে। কে সহায় হবে, কে প্রশংসা করিবে, কোথায় থাকিবে, কার আশ্রয়ে দাঁড়াবে, তাহা তখন ভাব নাই। ঈশ্বরের মুখ দেখে, তাঁর প্রেমের প্রেরণায়, ভাই বোনদের অকৃত্রিম স্নেহ দেখে, মুগ্ধ হ'য়ে এই স্থানে এসে দাঁড়ালে। আর আজ? কোথায় মানবসমাজে, দেশে, পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিবে, প্রেমবন্ধনে সকলকে এক করিবে, সকল অপ্রেম বিদ্বেষ দূর করিবে, সকল কলহ বিবাদ, সকল পরনিন্দা পরচর্চ্চা, বিদূরিত করিবে,— সে আদর্শ, সে আকাঙ্ক্ষা কোথায় গেল? আজ ভাইকে বোনকেও যে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিতেছ না! দুই জন ব্রাহ্ম এক স্থানে আছ, পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পার না! এ কি ভাব! এ কি দৃশ্য! ভাইকে যদি প্রাণে ডাকিতে না পার, মানুষকে যদি প্রীতি করিতে না পার, তবে—তবে প্রেমের দেবতা যে অন্তর্হিত হবেন, তিনিও যে ফিরিয়া যাইবেন, তিনিও যে প্রাণমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তাই বলি, ঈশ্বরকে কি চাও? ধর্ম্ম কি চাও? আজ কেন উৎসবে এসেছ? নূতন জীবন কি পেতে চাও? নূতন দৃশ্য দেখ্‌তে চাও? প্রাণমন নূতন ক'রে গড়্‌তে চাও? প্রেমময়ের প্রেমের স্পর্শ পেতে চাও? নূতন ভাবে জীবন চালাতে চাও? তবে প্রেম সম্বল কর, ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন কর; আর, ভাই বোনদিগকে প্রাণের ভিতরে ডাকিয়া লও। হৃদয়দ্বার বন্ধ করিয়া রেখো না, যারা আস্‌তে চায় তাদিগকে বাধা দিও না, তোমার সুখ, তোমার স্বার্থ তোমার আমিত্ব ল'য়ে থেকো না; ডাক, সকলকে ডেকে আন, হৃদয় প্রশস্ত কর, দৃষ্টি নবীন কর, প্রেমে হৃদয় পূর্ণ কর। আজই এই উৎসবের দিনে নূতন ব্রত লও। ঝগড়া কলহ থেমে যাক্, অপ্রেম দূর হোক। আজ নূতন প্রেমে সকলকে আহ্বান কর, আজ ক্ষমা কর, আজ ক্ষমা চাও। যারা যীশুকে ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ করেছিল, তাদের প্রতি তিনি প্রেম দেখিয়েছিলেন, তাদের জন্যও প্রীতিভরে তিনি ভগবানের চরণে প্রার্থনা ক'রেছিলেন। ঐ আদর্শ দেখে চল। ভাইকে বোনকে তাড়াইয়া দিলে, জীবনস্বামীও যে চ'লে যাবেন। তাই বলি, আজ আমরা প্রেমের জয় গাই, প্রেমে আমরা এক হই। আমাদের একটু ভেদ, একটু মত, ইহা বেশী হলো? আর, ভাই বোন দূরে প'ড়ে থাকবে? তা হবে না। আমরা প্রেমময় দেবতাকে বরণ করিয়াছি। তিনি আমাদের শত অপরাধ ক্ষমা করিতেছেন; কত বার কত প্রেমের সহিত হাত ধরিয়া গর্ত্ত হইতে তুলেছেন, কত আদর করিতেছেন ক্ষুদ্র আমরা, মলিন আমরা, তবুও তিনি আমাদের কাহাকেও ভোলেন না! তাঁর প্রেমের তুলনা নাই। সেই প্রেমময়ের প্রেমের রস পেয়ে আমরা কি প্রেম করিতে বিরত হব? ভাই বোনকে যদি ভালবাসিতে না পারিলাম, মানুষকে যদি প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে না পারিলাম, তবে যে প্রেমময়ের পূজা হবে না, তবে যে প্রেমময়কে উপেক্ষা করা হলো! এই জীবন যে বৃথা হ'লো! আর সব চ'লে যাবে, প্রেমই সঙ্গে থাকবে—প্রেম ইহলোকে, প্রেম পরলোকে। তবে আজ এই উৎসবের দিনে আমরা প্রেমের সাধন লই। এ সাধন খুব শক্ত সাধন নয়। দৃষ্টি একটু ফিরাও, নিজের সুখ স্বার্থ একটু হ্রাস কর, তাঁর চরণে একটু প্রাণ মন অর্পণ কর, তাঁর প্রেমের স্রোতে একটু অঙ্গ ঢালিয়া দাও, তাঁর প্রেমের অঞ্জন একটু চোখে পর, দেখ্‌বে, তাঁহারই প্রকাশ সর্ব্বত্র, সকল মুখে তাঁহারই সৌন্দর্য্য। তখন কেহ আর পর থাক্‌বে না, কেহ আর কুৎসিৎ থাক্‌বে না, কাহাকেও বাহিরে রাখ্‌তে ইচ্ছা হবে না। সকলকে প্রাণে টানিয়া আনিব, প্রেমময়ও ঘরে ফিরিয়া আসিবেন। তবে এই প্রেমসাধনে আমরা নিযুক্ত হই, প্রেমের দৃষ্টি লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাই। প্রেমময় দেবতা আমাদের সহায় হউন।

উপনিষদ্ ও বাইবল্-উক্ত ধর্ম্মের তুলনা (১)

১। উপনিষদের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে আরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদে উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, উপনিষদের মতে ব্রহ্ম স্বাতিরিক্ত কোনও বস্তু সৃষ্টি করেন নাই, আপনাকেই জগৎরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। "আমি বহু হই," "আমি জাত হই", এরূপ "ঈক্ষণ" করিয়া ব্রহ্ম প্রথমে তেজরূপী হইলেন। এই 'তেজ' কোনও অচেতন পদার্থ নহে ইহা সচেতন জীব। এই তেজই পরে 'ব্রহ্মা' 'হিরণ্যগর্ভ,' 'অপরব্রহ্ম', কার্য্যব্রহ্ম', প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই তেজ ভাবিলেন "আমি বহু হই," "আমি জাত হই" এবং এই ভাবিয়া তিনি অপ্‌রূপী হইলেন। এই অপ্‌ও তেমন ভাবেই অন্নরূপী হইলেন। 'তেজ', 'অপ্' ও 'অন্ন' নানা পরিমাণে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমগ্র জগৎরূপী হইলেন। পরবর্ত্তী দার্শনিক সাহিত্যে এই 'দেব'ত্রয়ই 'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ' এই গুণত্রয় হইয়াছেন। উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্ষেপে এই। এই সৃষ্টিতত্ত্বের ভাষা যে রূপকের ভাষা, তাহা অনেক উপনিষদ্-ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন। সৃষ্টি যে কোনও বিশেষ কালে হয় নাই, ইহা যে একটা অনাদি প্রবাহ, তাহার আভাস উপনিষদেও আছে এবং ব্যাখ্যাকারদেরও এই মত। 'আমি বহু হই', ব্রহ্মের এই 'ঈক্ষণ' হইতেই বোঝা

যায় যে, জগতের বিচিত্রতা তাঁহার চিন্তাতে নিত্যরূপে বর্তমান, সৃষ্টিপ্রবাহে সেই বিচিত্রতা অভিব্যক্ত হয়। কৌষীতকি উপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ে, ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদে ব্রহ্ম ও জগৎ, বিষয়ী ও বিষয়, 'প্রজ্ঞা' ও 'ভূতের' ভেদ ও অভেদ স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। 'প্রজ্ঞামাত্রা' অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব না থাকিলে 'ভূতমাত্রা' অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্ব থাকিতে পারে না, এবং 'ভূতমাত্রা' না থাকিলে 'প্রজ্ঞা-মাত্রা' থাকিতে পারে না। এই দুয়ের একের দ্বারা কোনও সত্তাই সিদ্ধ হয় না, অথচ এই দুটী ভিন্ন নহে, মূলে একই। ভেদাভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এই অখণ্ড বস্তুই বিশ্বাত্মা এবং তিনিই জীবের আত্মা। ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদের সিদ্ধান্ত এই। আরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদেও আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন, 'তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো'—হে শ্বেতকেতো, সেই বস্তু তুমি; কিন্তু ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদেই এই অদ্বৈততত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহা হউক, উপনিষদ্ একান্ত অদ্বৈতবাদিনী নহেন। সৃষ্টি-তত্ত্বে ব্যক্ত এবং অব্যক্তের, এক এবং বহুর ভেদ করিতে যাইয়াই এই অদ্বৈতবাদ কিয়ৎপরিমাণে দ্বৈতভাবাপন্ন হইয়াছে; তৎপরে জীবকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে এবং ব্রহ্মসাধনের উপদেশ দিতে যাইয়া, ইহা আরো স্পষ্টরূপে দ্বৈতভাবমিশ্রিত হইয়াছে। জীব শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতায় সসীম, সে ক্রমশঃ এই সকল বিষয়ে অসীম ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইতেছে,—সমুদায় ধর্ম্মসাধন-প্রণালীই এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের সর্ব্বত্রই সাধনের কথা। ইহাতে একটী গভীর সাধনপ্রণালী প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাধ্য ও সাধকের ভেদ ব্যতীত সাধন অসম্ভব, সুতরাং উপনিষদের অদ্বৈতবাদ দ্বৈতগর্ভ। শঙ্করপন্থীদের মতে উপনিষদের দ্বৈতভাবটা ব্যাবহারিক (practical or apparent) মাত্র, পারমার্থিক (absolutely real) নহে। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকেরা এই ভেদ করেন না, তাঁহাদের মতে দ্বৈত অদ্বৈত দুইই সত্য, এক অখণ্ড সত্যের দুটী দিক্ মাত্র। আমি এস্থলে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অন্যত্র (আমার 'Theism of the Upanishads' এ) দেখাইয়াছি যে, এই দুই ব্যাখ্যার বীজই উপনিষদে আছে।

২। ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। মুণ্ডকোপনিষদ্ (২।২) বলিয়াছেন তিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পান। মাণ্ডুক্যোপনিষদে (৭) বলা হইয়াছে তিনি মঙ্গলস্বরূপ ও অদ্বৈত। ঈশোপনিষদে (৮) বলা হইয়াছে তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। শ্বেতাশ্বতর (৬।৬) বলিয়াছেন তিনি ধর্ম্মাবহ, পাপনুদ। সুতরাং উপনিষদের ব্রহ্ম যে ব্যক্তিরূপী (personal being) এবং জীবের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত (personal) সম্বন্ধ আছে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীবের মুক্তি ও উন্নতির জন্য ব্রহ্ম কতদূর ব্যস্ত, তাহা উপনিষদের দুটী আখ্যায়িকায় বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। দুটীর ভাষাই রূপকাত্মক; পাঠক রূপক ভেদ করিয়া সারার্থ গ্রহণ করিবেন। কেনোপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে ব্রহ্মবিদ্যার আখ্যায়িকা আছে। অসুর জয় করিয়া দেবগণ নিজ বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। সমুদায় শক্তিই যে ব্রহ্মের শক্তি তাহা দেবগণ জানিতেন না। ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে দিব্য জ্ঞান দিবার উদ্দেশে কোনও স্থানে 'যক্ষ' অর্থাৎ বরণীয় রূপে প্রকাশিত হইলেন, কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। অগ্নি ও বায়ু পরে পরে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি তাঁহাদের শক্তি প্রত্যাহার করিয়া দেখাইলেন তাঁহাদের স্বতন্ত্র কোনও শক্তি নাই। ইহাতেও তাঁহাদের চৈতন্য হইল না। সর্ব্বশেষে ইন্দ্র যক্ষের সমীপবর্ত্তী হইলে, যক্ষ তিরোহিত হইলেন, কিন্তু হৈমবতী অর্থাৎ হিমালয়ে প্রাদুর্ভূতা বহুশোভমানা উমানাম্নী ব্রহ্মবিদ্যা ইহাকে শিক্ষা দিলেন যে ব্রহ্মই সমুদায় শক্তির আধার। কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে চিত্র-আরুণি-সংবাদে জীবাত্মার ব্রহ্মলোকে গমন, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলন-সাধন, রূপকের ভাষায় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিৎ আত্মা ব্রহ্মলোকের দিকে অগ্রসর হইলে ব্রহ্ম তাঁহার পারিচারিকাবর্গকে বলেন, "তোমরা ধাবিত হও, আমার প্রাপ্য সম্মান দিয়া তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস"। এই সকল পারিচারিকা ব্রহ্মবাদিনী শ্রুতি,—যেমন "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম"—যাঁহারা উপাসককে ব্রহ্মাভিমুখী করে। ব্রহ্মের আদেশে এরূপ পাঁচ শত 'অপ্সরা' চূর্ণ, বস্ত্র, ফল, অঞ্জন ও মাল্যহস্তে ব্রহ্মবিদের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে "ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করে"। "ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া" ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি যখন "আর" নামক হ্রদ মনের দ্বারা ('মনসা') পার হইয়া অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে কুপ্রবৃত্তিরূপ অরি জয় করিয়া 'ইল্য' বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হন, অর্থাৎ পার্থিব ভাবের শেষ সীমায় উপনীত হন, তখন তাঁহাতে 'ব্রহ্মগন্ধ' অর্থাৎ ব্রহ্মের অস্পষ্ট অনুভূতি প্রবেশ করে। তিনি যখন ব্রহ্মনগরে উপনীত হন, তখন তাঁহাতে 'ব্রহ্মরস' অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দ প্রবেশ করে। তিনি যখন ব্রহ্মভবনে উপনীত হন, তখন তাঁহাতে 'ব্রহ্মতেজ' প্রবেশ করে। তিনি যখন ব্রহ্মের সভাগৃহে উপনীত হন, তখন তাঁহাতে 'ব্রহ্মযশ' অর্থাৎ ব্রহ্মের গৌরব বা পবিত্রতা প্রবেশ করে। সেখানে ব্রহ্মের সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হয়। কেবল একটি কথার উল্লেখ করি। ব্রহ্ম তাঁহাকে "তুমি কে?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দেন "তুমি যে আমিও সে"। এই উত্তরে সত্তাগত অভেদ (unity of substance) এবং ব্যক্তিগত প্রভেদ (diversity of persons) দুইই আছে। অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মলোকে উপাসনা-নদীতীরে ব্রহ্মসন্নিধানে দেবতাদের সঙ্গে চিরবাস করেন।

৩। ব্রহ্মসাধন-প্রণালী

উপনিষদের স্থানে স্থানে নৈতিক উপদেশ আছে, কিন্তু ইহার বাহুল্য নাই। তার কারণ নীতি কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত, উপনিষদ্ প্রধানতঃ জ্ঞানকাণ্ড। বেদের পূর্ব্বাবভাগ—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক—এবং ধর্ম্মসূত্রাদি অধ্যয়নের পর উপনিষদ্ পাঠ করিবে, ইহাই প্রাচীন ব্যবস্থা। ব্রহ্মজ্ঞানার্থী হইয়া কেহ কোনও আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলে, আচার্য্য বিশেষরূপে দেখিতেন সেই জ্ঞানার্থীর পাপে অপ্রবৃত্তি এবং সাংসারিক নীচ নীচ বিষয়ে

বৈরাগ্য জন্মিয়াছে কি না। কঠোপনিষদের যম-নচিকেত-সংবাদ, প্রশ্নোপনিষদের ঋষি পিপ্পলাদ এবং তাঁহার ছয় শিষ্যের আখ্যায়িকা, তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু-বারুণি-সংবাদ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম জাবাল ও উপকুশল কামলায়নের আখ্যায়িকায় পাঠক এই কথার বিশেষ প্রমাণ পাইবেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে যেরূপ চরিত্র গঠিত হয়, তাহার একটী আদর্শ বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞ শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দেখেন। পাপ তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না, তিনি সমুদয় পাপকে বশীভূত করেন। পাপ তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, তিনি সমুদয় পাপকে দগ্ধ করেন। তিনি বিপাপ, বিরজ এবং বিচিকিৎস অর্থাৎ সন্দেহশূন্য হন। পরবর্ত্তী সময়ে এই শ্রুতি হইতেই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই 'ষট্ সম্পত্তি' সংগৃহীত হয়। যাহা হউক, উপনিষৎ প্রতিপাদিত প্রধান সাধন ব্রহ্মজ্ঞান এবং জ্ঞানমূলক প্রেম ও আনন্দ। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উপনিষদের মতে মানুষের প্রাকৃত বুদ্ধি অর্থাৎ উক্ত সাধনবিহীন লোকের বুদ্ধি, মোহাচ্ছন্ন। এরূপ বুদ্ধিতে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিশিষ্ট সাধন-প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। উপনিষদের মতে প্রকৃত আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান একই। ব্রহ্মই জীবের আত্মা। সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। উপনিষদে 'জ্ঞান' কথাটা অতি গভীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞান কেবল অধ্যয়ন ও বিচারের ব্যাপার নহে। জ্ঞান বলিতে ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই সমস্ত উচ্চাবস্থাও বুঝায়। বৃহদারণ্যকের 'মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে' যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, "হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দেখিতে, শুনিতে, মনন করিতে এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে"। এ স্থলে ব্রহ্মদর্শন উদ্দেশ্য, এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন উপায়। 'শ্রবণ' অর্থ ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ অর্থাৎ গুরুমুখে শিক্ষা বা ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থাধ্যয়ন। 'মনন' অর্থ শ্রুত বা অধীত বিষয় বিচার পূর্ব্বক বোঝা এবং তদ্বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। 'নিদিধ্যাসন' অর্থ গভীর ধ্যানদ্বারা আত্মাকে ধরিবার চেষ্টা। এই ধরাকে বলে 'ধারণা'। 'ধারণা'কে স্থায়ী করিবার চেষ্টা 'ধ্যান'। ধ্যানের স্থায়ী অবস্থা—যে অবস্থাতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না, অন্তর বাহির সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়,—সে অবস্থার নাম 'সমাধি'। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে পাঠক এই ব্রহ্মসমাধির একটী সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। এই সমাধির অবশ্যম্ভাবী ফল আনন্দ। তার কারণ ব্রহ্ম রস-স্বরূপ,—'রসো বৈ সঃ' (তৈত্তিরীয় ২।৭) এবং আত্মা স্বভাবতঃই প্রিয়তম। আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমুদয় হইতে প্রিয়, যেহেতু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর' (বৃহদারণ্যক ১।৪।৮)। এই রসস্বরূপ ও প্রিয়তম আত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলে যে আনন্দ জন্মে তাহার সহিত অন্য কোন আনন্দের উপমা হয় না। পূর্ব্বোক্ত নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে বলা হইয়াছে কেবল ভূমা অর্থাৎ অনন্তস্বরূপই সুখের আধার, সসীম বস্তুতে সুখ নাই, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই; তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে এবং বৃহদারণ্যকে (৪।৩) ব্রহ্মানন্দের পরাকাষ্ঠা নানা উপমাদ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

৪। জীবে প্রেমসাধন

ব্রহ্মপ্রেম হইতে ব্রহ্মানন্দ জন্মে এবং ব্রহ্মানন্দ হইতে জীবে প্রেম জন্মে। বৃহদারণ্যকে (১।৪।৮) বলা হইয়াছে "আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করে তাহার প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হয় না"। এই উপনিষদেরই মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে (২।৪ ও ৪।৫) যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীর নিকট বিশেষরূপে প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন: আত্মপ্রেমই সমুদয় প্রেমের মূল। পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা, স্বজাতি, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু আমাদের প্রিয় সেই সমস্ত আত্মারই জন্য প্রিয়। যে বস্তুতে যে পরিমাণে আত্মাকে দেখি সেই বস্তু সেই পরিমাণে আমাদের প্রিয় হয়। যখন সকল বস্তু ও সকল প্রাণীতে আত্মাকে দেখি তখন সকলই প্রিয় হয়। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"। ঈশোপনিষদে (৬) বলা হইয়াছে যিনি আত্মাতেই সকল প্রাণীকে দেখেন এবং সকল প্রাণীতে আত্মাকে দেখেন তিনি তখন হইতে আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

৫। পরলোক ও মুক্তি

পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে উপনিষদের মত এই যে, যাহারা বেদবিহিত সকাম কর্ম্ম করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে না, তাহারা দেহান্তে পিতৃলোকে যাইয়া তাহাদের পুণ্যকর্ম্মের ফল-ভোগ করে, কিন্তু সেই ভোগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। জন্মান্তর দ্বারা পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্যপাপ-গঠিত চরিত্র নষ্ট হয় না। নানা জন্মের সঞ্চিত পুণ্যফলে যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এবং সংসার-কামনা দগ্ধ হয়, তখন মুক্ত আত্মা ব্রহ্মলোকে যাইয়া চিরবাস করে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কোন কোন ঋষির মতে জীবন্মুক্ত আত্মাকে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় না, দেহান্ত হইলেই সে ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বিশেষরূপে একীভূত হয়। এই মতে ব্রহ্মলোক পরব্রহ্মের লোক নহে, অপর ব্রহ্মের লোক এবং ব্রহ্মলোকে বাস 'পরামুক্তি' নহে, 'আপেক্ষিকী মুক্তি'। কল্পান্তে অপর-ব্রহ্ম পর-ব্রহ্মে লীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তল্লোকবাসী জীবাত্মাগণও পরব্রহ্মে লীন হন। মুক্তি সম্বন্ধে এই ঋষিগণের এই মতভেদ উপনিষদে বিষদরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, কিন্তু ইহার আভাস আছে। এই আভাস হইতেই পরবর্ত্তী সময়ে দুটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতের উৎ-পত্তি হইয়াছে। ভেদাভেদবাদের শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাঠক ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন। অভেদবাদের প্রমাণ বৃহদারণ্যকে (৪।৩।৫) এবং প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের শেষভাগে পাইবেন।

৬। অপরব্রহ্ম ও শব্দ ব্রহ্ম (the Word)

বাইবল্-উক্ত ধর্ম্মের উল্লেখের পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্মের সহিত উপ-নিষদুক্ত ধর্ম্মের একটী সাদৃশ্যের কথা সংক্ষেপে বলি। পাঠক পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রহ্মের ভেদের কথা শুনিয়াছেন। দুয়ের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। অপর-ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম পরব্রহ্মের প্রথমজ সন্তান, কিন্তু তিনি অন্য প্রাণীর মত স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে উৎপন্ন নহেন। তিনি পর-ব্রহ্মের সঙ্কল্পজাত। দেশ-কাল-গত জগৎ তাঁহার

সহিত এক, এক অর্থে তাঁহার শরীর। জাগতিক ঘটনা সমুদায়ই তাঁহার মানসিক ক্রিয়া। সুতরাং এক অর্থে তিনি জগতের কর্ত্তা। মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমেই আছে "ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বের কর্ত্তা এবং ভুবনের গোপ্তা"। এই উপনিষদেই এবং বিশেষভাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, তিনিই প্রথমে ব্রহ্ম হইতে বেদ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার সন্তান অন্যান্য জীবকে তাহা প্রদান করেন। বাইবল্-উক্ত ধর্ম্মে এরূপ এক জন পুরুষবিষয়ক মত অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

উৎসবের দান

উৎসবে কি ধন মোরা লভিনু এবার?
শত শত নরনারী সুদূর আলয় ছাড়ি'
এসেছে গভীর তৃষ্ণা নিভাতে আত্মার!
কৃপার ভিখারী হ'য়ে শত অপরাধ ল'য়ে
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কত পাপীতাপী আজ,
যাচিছে প্রেমান্ন সবে মা'র কাছে মহোৎসবে,
অবতীর্ণ ধরা মাঝে নিজে বিশ্বরাজ—
বিলাচ্ছেন ধর্ম্মধন, লভিয়ে সন্তানগণ
হ'য়েছে সফলকাম উৎসবে সকলে;
জয় জয় ব্রহ্মরবে জয়ধ্বজা তুলি' ভবে
ডাকিছে জগতবাসি 'আয় দলে দলে'?
এদৃশ্য দেখিলে আর ফিরে যাবে সাধ্য কার—
অপার আনন্দনীরে হইবে মগন;
ঘুচিবে প্রাণের জ্বালা করি' নাম জপমালা
পাইবে শাশ্বত সুখ অমূল্য রতন।
মুছে যাবে পাপ-কালি, জীবনের ব্রত পালি'
ধন্য হবে নরনারী প্রেমামৃত-পানে;
মৃত জনে পাবে প্রাণ, মহাপাপী পরিত্রাণ,
কৃতার্থ হইবে সবে উৎসবের দানে।
এ দানের তুল্য নাই, দান বলিহারি যাই,
দানের মালিক আজ স্বয়ং ভগবান;
দিয়ে জীবে সত্যধর্ম্ম বিনাশি' পাপ অধর্ম্ম,
আপনি রচিলা ভবে মুক্তির সোপান।
সম্বৎসর পরে সবে মাতিব এ মহোৎসবে
পরব্রহ্ম-জয়ডঙ্কা বাজাইব মোরা;
সকলেই পাবো ত্রাণ করি' ব্রহ্মনাম গান,
দেখে যা এ দৃশ্য আজ জগৎবাসী তোরা।

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

মাঘোৎসবের নূতন গান।

(সুর—বিশ্বরাজ হে, কেন ডাক সখা ব'লে আর।)
ভক্তজনের সখা হে,
আমায় কেন আনিলে আবার?
আমি তোমায় জানি না, চিনি না! (দিবানিশি ভুলেই থাকি)
আমি ছিলাম সুখে, মোহ-মদিরাপানে (বিষয়-রসে মগ্ন হ'য়ে হে)
আবার ছুটে এলাম কাহার টানে,
তা তো জানি না, বুঝি না। (কে যে আমায় পাগল করে)
যদি এসেছ হে, এতই দয়া করি,' (নিজ গুণে গুণ-নিধি হে)
তবে দেখা দেও, হে প্রাণের হরি,
(আর) আমায় ছেড়ো না ছেড়ো না॥
(আমি র'লেম তোমার দ্বারে পড়ি')

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র

খাম্বাজ—ঠুংরী
(বিভুপদ-কমল—এই গানের সুর)
নামের ভিতরে যদি নামী নাহি রয়,
নাম কি হইত তবে এত মধুময়?
অনল অনিল জল, আকাশ অবনী-তল,
(আছেন) মধুরূপী মগ্ন করি' মধুতেই সমুদয়।
রসে গন্ধে গানে সুরে, কি করুণে, কি মধুরে,
যে খেলা হৃদয়-পুরে, নামীরই ত অভিনয়!
পুষ্প ছাড়ি' গন্ধ, কোথা, নাম যেখানে নামী সেথা;
অভিন্ন যে নাম আর নামী, এই জানি তার পরিচয়।
(আমি) ভয় পেলে নাম নিয়ে ডাকি, সুখ পেলে মুক হ'য়ে থাকি,
করকে স্মরণে রাখি' পাই শকতি, পাই অভয়।
অনামীরে দিয়ে নাম, ভক্ত প্রেমিক পূর্ণকাম,
(তারা) নামে নাচে হাসে কাঁদে, প্রেম-অশ্রুধারা বয়।
হে অরূপী, হে অনামী, নামে প'ড়ে আছি আমি,
কবে পাব দেখা তব, বল, আজ এ সুসময়।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

ব্রাহ্মসমাজ

দীক্ষা—বিগত ২২শে এপ্রিল কলিকাতা সাধনাশ্রমে শ্রীমান বভ্রুবাহন ঠাকুর পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিগত ১৭ই এপ্রিল হাওড়ার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামে আর একটী যুবক পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাহার বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। আমরা নবদীক্ষিতদিগকে সাদরে বরণ করিতেছি। করুণাময় পিতা তাহাদিগকে দিন দিন তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, বিগত ২৪শে এপ্রিল কলিকাতা

নগরীতে পরলোকগত মিঃ রজনীনাথ রায়ের অন্যতমা কন্যা অমিয়া বানার্জ্জি (মিসেস্ আর সি বানার্জ্জি) হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১৪ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত অনন্তনারায়ণ সেনের কন্যা কল্যাণীয়া সতী ও ভাগলপুর নিবাসী শ্রীমান আনন্দমোহন সহায়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব—নিম্নলিখিতরূপে বিগত বর্ষ শেষ ও নববর্ষের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছেঃ—

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল মঙ্গলবার—সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "বন্ধন ও মুক্তি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ধর্ম্মের নামে জগতে যে-সকল অন্যায় আচরিত হইয়াছে, বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া দেখান সে সমস্তই কুকর্ম্মের ফল। আবার চিরদিন সদ্ধর্ম্ম মানবের সকল প্রকার বন্ধন মুক্তির কারণস্বরূপ হইয়া জগতে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। চিরদিনই জগতের সর্ব্বত্র এরূপ সদ্ধর্ম্মের প্রকাশ ঘটিয়াছে এবং ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় একস্থানে যখন এরূপ ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে অন্যান্য স্থানেও সে-সময় সেরূপ ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে সকল বন্ধন মুক্তির বার্ত্তা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয় হইয়াছে।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) বুধবার—প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে উপাসনা, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে উপাসনা, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ উপলক্ষে প্রার্থনা হইয়াছে। স্থানীয় যুবকবৃন্দ কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীযুক্ত ষুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিগত ৪ঠা বৈশাখ আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীমান অভয়তারণ দাস পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে সঙ্গীত ও কীর্ত্তনের সঙ্গে সকলের আনন্দ বৰ্দ্ধন করেন। স্থানীয় বকবৃন্দ কীর্ত্তনে সাহায্য করেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—গত ২৯শে চৈত্র পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পরলোকগত গোবিন্দচন্দ্র গুহের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুহ স্বামীর আত্মার জন্য প্রার্থনা করেন। মিসেস গুহ এই উপলক্ষে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে ২৲ সাধারণ ফণ্ডে ২৲ টাকা এবং অনাথ ধনভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং "গোবিন্দচন্দ্র গুহ" নামে একটি স্থায়ী ফণ্ডের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে একশত টাকা দান করিয়াছেন। উহার জন্য প্রতিবৎসর গোবিন্দ বাবুর চাঁদারূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ ফণ্ডে আনা হইবে। জলযোগান্তে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

প্রচার—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বড়জুলি বাগানে শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ মিত্রের বাসায় এক রবিবার উপাসনা ও একদিন একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এবং একদিন রাঙ্গাপাড়া থিয়েটার গৃহে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া ৩রা মার্চ্চ তেজপুর গমন করেন। তথায় তিনদিন শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতীর গৃহে পারিবারিক উপাসনা, এক রবিবার প্রাতে একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা এবং সন্ধ্যায় সমাজ মন্দিরে সামাজিক উপাসনা করেন। ৭ই মার্চ্চ স্থানীয় থিয়েটার গৃহে "শিক্ষা ও আমাদের সমস্যা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১লা জানুয়ারী চণ্ডিভেটি যাইয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ শাসমলের বাড়ীতে উপাসনা করেন, ২রা ৩রা ৪ঠা জানুয়ারী দণ্ডপারুলিয়া শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর পড়িয়ার বাড়ীতে উপাসনা ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। ৫ই হইতে ৮ই চারিদিন মারিশদা গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ করণের বাড়ীতে দৈনিক উপাসনায় আচার্য্যের কাজ করেন। ৯ই জানুয়ারী প্রাতে কাঁথি ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১০ই জানুয়ারী বনমালীচট্টা গ্রামে শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ জানার বাড়ীতে উপাসনা; পরে আবার তিন চারি দিন মারিশদা দৈনিক উপাসনায় আচার্য্যের কাজ করেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় যান ও উৎসবে যোগদান করেন। ২৫শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাঁর বাড়ীতে তাঁর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কাজ করেন। ৩১শে জানুয়ারী দেবালয়ের সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কাজ করেন, ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাণীবন ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা করেন। দুইদিন কোনও পরিবারে উপাসনা করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বাগনানে শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়ের গৃহে বিবাহান্তে নববধূর শুভাগমনে উপাসনার কাজ করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি প্রাতে নবদম্পতির কল্যাণকামনায় উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। কলিকাতায় প্রতিদিন আশ্রমের উপাসনায় এবং মন্দিরে মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালীন আলোচনাসভায় যোগ দিয়াছেন। পুনরায় ২৭শে প্রাতে বাণীবন ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার—আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তথাকার মন্দির নির্ম্মাণের জন্য নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন—মেসার্স এইচ্ এম্ গুপ্ত লিলুয়া ২০৲ অশোক চাটার্জ্জি কলিকাতা ৫৲ শিশিরকুমার দত্ত ঐ ২৲ জি বি ত্রিবেদী ঐ ৩৲ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য (ঐ প্রথম কিস্তি) ৫৲ নারায়ণচন্দ্র মল্লিক (আন্দুল) ৫৲ বিশ্বেশ্বর ঘোষ ঐ ২৲ মাখনলাল চৌধুরী ঐ ৩৲ ফকিরচন্দ্র ঘোষ ঐ ১৲ ক্ষেত্রনাথ মিত্র ঐ ১৲, রামলাল চাটার্জ্জি—ঐ ১৲ হরিচরণ প্রামাণিক ঐ ১৲ অনুকূলচন্দ্র ভাণ্ডারী ঐ ১৲ নিবারণচন্দ্র চন্দ্র ঐ ১৲ মদনচন্দ্র সাধুর্খা ঐ ॥০ টি বি রাও ঐ ১৲ এম, সি, মেটিয়া ঐ ১৲ এস্ এম আচার্য্য ঐ ১৲ এ সি চক্রবর্ত্তী ঐ ॥০ সি আর ব্যানার্জ্জি ঐ ॥০ কিশোরীমোহন মুখার্জ্জি ঐ ১৲ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা ১৲ মোট ৫৭।০ পূর্ব্ব স্বীকৃত ৪৪৲ সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১০১।০

নবদ্বীপ মহিলা স্মৃতিভাণ্ডার—মহিলাদিগের নবদ্বীপ স্মৃতিভাণ্ডারের নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে,—সরলাবালা গাঙ্গুলী ২৲ সীতা রায় চৌধুরী ২০৲ সুনীতিবালা বসু ১০৲ সুষমা দাস গুপ্ত ৭৲ মোট ৩৯৲ পূর্ব্বপ্রকাশিত—৪০১৮৵০ সর্ব্বশুদ্ধ মোট—৪০৫৭৵০

Registered NO 65.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | ১লা, জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ 15th May, 1927. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে করুণাময় পিতা, তুমিই তোমার অপার কৃপায় আমাদিগকে তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়াছ ও বর্দ্ধিত করিতেছ। তুমিই ধর্ম্ম ও পুণ্যের চির প্রস্রবণ, সকলের এক মাত্র পরিত্রাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। আমরা মোহবশতঃ তোমার জীবন্ত কার্য্য অনেক সময় দেখিতে না পাইয়াই বিপথগামী হই। কিন্তু তুমি কাহাকেও ভ্রান্তির ও উদাসীনতার মধ্যে চিরদিন ডুবিয়া থাকিতে দেও না। তুমি নানা রূপে, নানা ভাবে, আমাদিগকে তোমার পথে ডাকিয়া আন। আমরা তাই আর অবিশ্বাসী থাকিতে পারি না। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সর্ব্বত্রই তুমি জীবন্ত ভাবে কার্য্য করিতেছ। তাহা যখন আমরা দর্শন ও স্মরণ করি, তখন আমরা আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া তোমার নিকট অবনত হই। তুমি আমাদের জীবনে ও সমাজে কত লীলাই করিতেছ! কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া না চলিয়া তোমার পবিত্র কার্য্যে নানা রূপ বাধা উপস্থিত করিয়া থাকি। তাই ত আমাদের জীবন ও সমাজ তোমার ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া উঠিতেছে না, সেরূপ সুস্থ সুন্দর হইতেছে না। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের এই দুর্ব্বলতা দূর করিবে? আর একটি বৎসর ত চলিয়া গেল। সমাজের জীবনে আবার নূতন বৎসর আসিল! আমরা যাহাতে নূতন বৎসরে ইহাকে সবল ও তোমার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারি, তোমার গৌরবকে আর ম্লান না করি, তুমি আমাদের সকলকে সে আকাঙ্ক্ষা ও বল প্রদান কর। সকল বিষয়ে তোমার অনুগত জীবন যাপন করিয়া আমরা নিজেরা ধন্য হই, তোমার পবিত্র ধর্ম্মের গৌরবকেও বর্দ্ধিত করি। তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

মৃত্যুর দণ্ড—মৃত্যুর দণ্ড কখন কি ভাবে যে কার জন্য আসে, তা ত আগে কেহই বোঝে না। কাহাকেও পূর্ব্ব হ'তেই খবর দেয়; কাহারও নিকট অতি মৃদু পাদবিক্ষেপে আসে। কেহ তার আগমনবার্ত্তা ঘুণাক্ষরেও টের পায় না। ইহাই ত তার নিয়ম, আর ইহাই পরম দেবতার বিধান। মৃত্যু আসে, প্রিয়জন চ'লে যায়, প্রাণ শূন্য হ'য়ে পড়ে, হৃদয় ভেঙ্গে যায়। তাই লোকে মৃত্যুর দণ্ডকে ভয়ের চক্ষে দেখে, তাঁর ভীষণ মূর্ত্তির কল্পনা করে। কিন্তু মৃত্যু গভীর বেদনার ভিতরেও শান্তির বীজ রেখে যায়। মৃত্যু মানুষকে অমৃতের সন্ধান ব'লে দেয়, মৃত্যুর ভিতরেই আমরা পরম সুহৃদকে জান্‌তে পারি। মৃত্যু আমাদিগকে শুদ্ধ ক'রে, মৃত্যু আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খু'লে দেয়; পরকে আপনার ক'রে দেয়। মৃত্যুর দণ্ড যখন আসে, তাহাকে অনাদর ক'রো না। মৃত্যুর দণ্ডই আমাদিগকে অন্তর-দেবতার আনন্দময় মন্দিরে নিয়ে যায়। মৃত্যুর দূত আমাদের শত্রু নয়—পরম বন্ধু। তাকে দেখে ভয় পেও না, তাকে উপেক্ষা ক'রো না। তার কল্যাণময়ী মূর্ত্তি দেখে আনন্দলাভ কর।

কোথায় এসেছি?—চল্‌তে চল্‌তে এ কোথায় এসে পড়েছি! ঐ যে ছেলেবেলা চল্‌তে আরম্ভ করেছি, এ চলার আর বিরাম হলো না! কত রোগ শোক, কত উপেক্ষা বেদনা, তার ভিতর কেবলই চলা, কেবলই ছুটাছুটি! কার টানে

চলি, কে আমাকে পশ্চাৎ থেকে চালায়? আজ কোথায় এসেছি? একবার থামি, একবার ভেবে দেখি, পশ্চাতের দিকে চেয়ে দেখি কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি। কারও সঙ্গে কি বাঁধা আছি? জীবনে সুখ পেয়েছি, দুঃখও পেয়েছি; জীবনে কত বন্ধু পেলাম, কত আপনার জনের উপেক্ষা পেলাম; কত শোক পেলাম, কত ব্যর্থতা এল! ইহা কি সকলই আকস্মিক? ইহার ভিতরে কি কা'রও হাত নাই? আজ চেয়ে দেখি এক খানি হস্ত অদৃশ্য থেকে আমাকে নিয়ে এসেছে। একটি ঘটনা বৃথা যায় নাই, এক ফোঁটা চোখের জল ব্যর্থ হয় নাই। সেই হস্ত প্রেম-হস্ত; আমাকে ধ'রে নিয়ে এসেছে। তাই আজ আমি এখানে এসেছি। আশা পেয়েছি, মৃত্যু হবে না। মৃত্যুর পরপারে অমৃতলোকের আভাস পেয়েছি। উপেক্ষাজনিত বেদনার মধ্যে প্রেমের ডাক শুনেছি। আমি অমৃতধামেরই যাত্রী হ'য়ে প্রেমের পথে এসেছি। আমার তবে ভয় নাই।

ভাইএর জন্য কি দায়ী নও?—কেইন আবেলকে গোপনে হত্যা করিল; পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "কেইন, আবেল কোথায়?" কেইন বলিল, "আমি কি জানি? আমি কি আমার ভাইএর রক্ষক?" পরমেশ্বর কেইনের এ অজুহাত শোনেন নাই। ভাই কি ভাইএর রক্ষক নয়? ভাই কি ভাইয়ের জন্য দায়ী নয়? ঐ যে তোমার ভাই বিপথে গেল, মরণের পথ ধ'রে চল্‌ল, এজন্য দায়ী কে? তুমি কি অনেক সময়ে তাকে ঠেলে ফেলে দাও নি? তুমি কি তাকে স্নেহ হ'তে বঞ্চিত ক'রে মরণের পথ খুলে দাও নি? সময়ে একটু সাবধান করলে, অপরাধে একটু ক্ষমা, একটু স্নেহ করলে, সে বেচে যেতে পারত। তার একটু দোষ দেখেই, দুর্ব্বলতা দেখেই, সমাজ কঠোর ভাবে দণ্ড দিয়েছে। আর তুমি? তুমিও ত তোমার ভাইকে ক্ষমা করতে পারলে না! স্নেহ ভরে বুকে তু'লে নিতে পারলে না! তার মরণের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলে! সে যে মরিল, সে যে স্রোতে গা ঢেলে দিল, সেজন্য দায়ী কে? একটু তার জন্য কাঁদিলে না, একটা সহানুভূতির কথা বললে না, তোমার প্রভুর চরণে কাতর প্রার্থনা জানালে না! তুমি কি দায়িত্ব হ'তে মুক্ত? তা নয়। ভাই ভাইএর জন্য দায়ী। আজ দায়িত্ব অনুভব কর। ভাইকে স্নেহের সহিত ডেকে আন; তার জন্য বেদনা বোধ কর। তার জন্য প্রার্থনা কর; তার জন্য প্রাণপাত কর।

সম্পাদকীয়

পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ—মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার অপার করুণায় আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উনপঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। আগামী বৎসর আমরা ইহার সুবর্ণ-সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিবার কল্পনা ও আয়োজন করিতেছি। এই সময় আমাদের হৃদয় যেমন এক দিকে ইহার জীবনে বিধাতার অপূর্ব্ব লীলার কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইতেছে, অপর দিকে তেমনি আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া ও বিবিধ ত্রুটির কথা ভাবিয়া দুঃখে ও পরিতাপে ম্রিয়মাণও হইতেছে। যেরূপ বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া করুণাময় পিতা ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, শক্তিশালী করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অবিশ্বাসীর প্রাণেও জীবন্ত মঙ্গলবিধাতার বিধাতৃত্বে বিশ্বাস উৎপন্ন না করিয়া পারে না। তাঁহার করুণা ব্যতীত মানুষের পক্ষে এরূপ কার্য্যসাধন কখনও সম্ভবপর হইত না। প্রথম সময়ের কর্ম্মীদের মধ্যে প্রাজ্ঞ প্রবীণ অথবা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোক যে বড় একটা বেশী কেহ ছিল তাহা নহে। বরং তাহার যথেষ্ট অভাবই ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যাঁহাদের হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই যে ইহার অধিকতর প্রাচুর্য্য ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহারা যে অধিকতর সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, সে-কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার কারণ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, আমরা নিশ্চয়ই কিছু শিখিবার ও অনুসরণ করিবার বিষয় প্রাপ্ত হইব। ইঁহারা যে কোনও প্রকার জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া, বলগর্ব্বিত ভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কোনও মতেই বলা যায় না। তাঁহারা যে বাহির হইয়া আসিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাহাও নহে। বরং বিপরীত ভাবটাই প্রবল ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মগণ যেমন সহজে পিতা মাতা, গৃহ পরিবার, পুরাতন সমাজ, পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসেন নাই, সত্যের জন্য, প্রিয় ধর্ম্মের জন্য, তাড়িত হইয়াই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এখানেও তাহাই দেখিতে পাই—কেহই হাল্‌কা ভাবে এই নূতন পরিবার পরিজনদিগকে, ধর্ম্মগুরু ও বন্ধুদিগকে, ছাড়িয়া আসেন নাই, বিতাড়িত হইয়া গভীর বেদনাযুক্ত হৃদয়ে, তাঁহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া পারেন নাই বলিয়াই, নূতন সমাজ গড়িয়াছিলেন। ইহার একটা প্রধান শুভ ফল এই হইয়াছিল যে, তাঁহারা কিছুতেই নিজের উপর নির্ভর রাখিতে পারেন নাই, এবং নিজেদের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা স্মরণ করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলবিধাতার উপরই সমস্ত নির্ভর স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—আপনাদিগকে একান্ত মনে তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাই যে তাঁহাদের সকল সফলতার মূল কারণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা আর অধিক করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই যে তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণ ত্যাগ আসিয়াছিল, সকলের শক্তি বিকশিত হইয়াছিল, উদ্যমশীলতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আর এখন যদি তাহার অভাব লক্ষিত হয়, একটা জড়তা ও অবসন্নতা আসিয়া যেন সকল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহার কারণ আমরা কোথায় অনুসন্ধান করিব? কালের নিয়মে প্রথম সময়ের সেবক ও কর্ম্মীদিগের অনেকেই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা দুই চারি জন আছেন, তাঁহারাও রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য। তাঁহাদের পরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের

সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযুজ্য। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে যে সমাজ লোকসংখ্যায় বা ধনে বলে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, মান প্রতিপত্তিতে, পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়াছে, তাহা ত কিছুতেই বলা যায় না—বরং তাহার বিপরীত কথাই যে সত্য, উহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। তবে এরূপ অবস্থা কেন? নূতন সেবক ও কর্ম্মী যে মোটেই আসিতেছে না, সে-কথা অবশ্য কেহ বলিবে না। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে যে আসিতেছে না, তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উৎসাহ উদ্যম যে মোটেই নাই, তাহাও বলা যায় না। তবে তাহাও যে উপযুক্তরূপ দৃষ্ট হয় না, সে কথা দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ অন্যান্য বিষয়ে সমাজ যে পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার অনুপাতে এই দিকের উন্নতি যে সন্তোষকর নহে—বরং নিতান্তই অপ্রচুর, লজ্জাজনকরূপে অকিঞ্চিৎকর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অথচ অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহ উদ্যম, চেষ্টা যত্নের, যে সেরূপ কোনও অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ত বলা যায় না। তৎপরিবর্ত্তে তাহার কিছু আতিশয্যই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য পরিমাণগত ততটা নয়, যতটা প্রকৃতিগত। একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে জানা যাইবে উভয়ের গতিই বিভিন্ন পথে, লক্ষ্যই ভিন্ন প্রকারের, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুই পৃথক। যাহার যাহা আকাঙ্ক্ষণীয় তাহার জন্য সে যে কম উৎসাহী বা চেষ্টান্বিত তাহার কোনই প্রমাণ নাই। সেরূপ পার্থক্য থাকিলে কোনও বিষয়েই সফলতা দেখিতে পাওয়া যাইত না। সাংসারিক উন্নতিও সম্ভবপর হইত না। কাজেই পার্থক্যের কারণ অন্যত্রই খুঁজিতে হইবে। সে কারণ খুঁজিতে যে অনেক দূরে যাইতে হইবে তাহাও নহে। একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে যে আমাদের অধিকাংশের পক্ষে সংসারটাই প্রধান লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অনুসরণীয় বিষয় দাঁড়াইয়াছে, ধর্ম্মটা, সকল বিষয়ে জীবনে জীবন-দেবতার আনুগত্যসাধনটা, অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে কি কাহারও কোন সন্দেহ আছে বা থাকিতে পারে? ইহার ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ কি আমরা সর্ব্বদা চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি না? নিশ্চয়ই এই তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য কোনও প্রকার সূক্ষ্ম গবেষণার প্রয়োজন নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, এ কথা চক্ষুমান ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিতেছেন, কেহই ইহাতে কোনও প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন না। অবশ্য, দুই চারিজনের ব্যক্তিগত জীবনে ইহার কোনও প্রকার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না, এরূপ কথা আমরা কখনও বলিতেছি না। কিন্তু তাহা গণনার বাহিরে রাখিলে, আমাদের আলোচনা অসত্য-দোষে দুষ্ট হইবে না—যাহা সাধারণ ভাবে অধিকাংশের পক্ষে সত্য, মোটামোটি ভাবেসমগ্রের সম্বন্ধে সত্য, তাহাই আমাদের আলোচ্য। অপর দিকে, প্রথম যুগের অধিকাংশের জীবনে যে ধর্ম্মই প্রধান লক্ষ্যস্থানে ছিল, সকল বিষয়ে জীবনের অদ্বিতীয় প্রভুকে অনুসরণ করা, গৃহ পরিবারে, সমাজে, জীবনে, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই সর্ব্বোপরি আকাঙ্ক্ষণীয় ছিল, আর সংসারটা অনেক পশ্চাতেই পড়িয়া ছিল, সেদিকে প্রায় কোনও দৃষ্টিই ছিল না, একটা উদাসীনতাই—অবহেলা বলিলেও মিথ্যা হইবে না—ছিল, তাহা কি সত্য নহে? সে বিষয়ে কি কাহারও সন্দেহ আছে? তাহা অস্বীকার করিবার কি কোনও উপায় আছে? বাস্তবিক তাহার এত অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না—একটু চক্ষু খুলিয়া চাহিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে, কোনও জীবনেই ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না, বিপরীত ভাবাপন্ন লোক সে সময় কেহই ছিল না, আমরা কখনও এরূপ কথা বলিতেছি না। এক্ষেত্রেও যাহা অধিকাংশের পক্ষে সত্য তাহাই বলা হইতেছে, তাহাতেই আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—নগণ্য সংখ্যাকে আলোচনার বাহিরে রাখিলে কোনই ক্ষতি হইবে না। সুতরাং যাহা অধিকাংশ সম্বন্ধে সত্য, মোটামোটি ভাবে সমগ্রের পক্ষে সত্য, আমরা শুধু তাহার কথাই বলিতেছি। আমরা যদি আরও একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিষয়টা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে আরও সুস্পষ্টভাবে ইহার সত্যতা বুঝিতে সমর্থ হইব। অবশ্য, সকলের পক্ষে সে পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। বাহিরের ইতিহাসের আলোচনা সকলেই করিতে পারে। এতক্ষণ আমরা সাধারণ ইতিহাসের কথাই বলিয়াছি। কিন্তু এখন আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার কথা বলিতে যাইতেছি। যাহাদের মধ্যে সে অভিজ্ঞতার অভাব আছে, তাহারা কোনক্রমেই ইহা অবলম্বন করিতে পারিবে না। সুতরাং নবীনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে প্রবীণদিগেরই দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

আমরা যদি প্রত্যেকে একটু সূক্ষ্মভাবে আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলে কি আমরা অধিকাংশই আমাদের প্রথম ও বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে সেই একই পার্থক্য দেখিতে পাই না? আমরা কি নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিতে পারি, যে লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা আসিয়াছিলাম, অপরিবর্ত্তিত ভাবে তাহারই অনুসরণ করিতেছি? যাহা এক সময় প্রথম স্থানে ছিল তাহা দ্বিতীয় স্থানে যায় নাই? যাহা দ্বিতীয় স্থানে ছিল, তাহা প্রথম স্থান অধিকার করে নাই? যাহা প্রধান ছিল, তাহা অবান্তর হয় নাই? আর, যাহা অবান্তর ছিল, তাহা প্রধান হইয়া দাঁড়ায় নাই? যদি তাহাই না হইবে, তবে আমাদের এমন দুর্গতি হইবে কেন? আমাদিগকে এমন ব্যর্থতা, এ প্রকার পরিতাপ ভোগ করিতে হইবে কেন? আমরা এরূপ প্রভাবহীন, হেয়, অবজ্ঞেয়ই বা হইব কেন? অপরের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া কি আমরা অন্তরের অন্তরে, জীবন-দেবতার সন্নিধানে, আত্মতৃপ্ত বোধ করিতে পারি? আমরা যদি আমাদের পার্শ্ববর্ত্তীদের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে না পারি, তাহারা যদি আমাদিগকে সংসারের অপর দশ জনের সমশ্রেণীস্থ বলিয়াই মনে করে, আমাদের আচার ব্যবহারে, চাল চলনে, উচ্চতর জীবনের কোনও পরিচয় না পায়, তবে সম্পূর্ণ তাহাদেরই দোষে উহা ঘটিতেছে, তাহার জন্য আমরা কিছুমাত্র দায়ী নই, এরূপ কাল্পনিক আশ্বাসে আশ্বস্ত থাকা, আরাম ও শান্তিভোগ করা, কি কখনও সুস্থচিত্ত মানুষের পক্ষে সম্ভবপর? ইহা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে, নিতান্তই অস্বাভাবিক।

বিনা কারণেই লোকে এতটা ভুল বুঝিবে মনে করা কখনও সঙ্গত নহে। অন্যের যত দোষ ত্রুটিই থাকুক না কেন, আমরা যে কিছুতেই সম্পূর্ণ দোষবিমুক্ত নহি, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার পর, একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব, আমরা অন্যের যতটা দোষ ত্রুটি কল্পনা করি, আপনাকে যে পরিমাণে দোষহীন মনে ভাবি, তাহার সমস্তই, অন্ততঃ অধিক ভাগই, আমাদের চিন্তাহীনতা ও মিথ্যা অহঙ্কার প্রসূত, একেবারে ভিত্তিহীন। তাই বলিয়া অপরের কোনও ত্রুটি থাকিতে পারে না, অন্ধতা ও বিকৃত শ্রদ্ধাহীনতা থাকিতে পারে না, অথবা তাহাদের মধ্যে সম্যক্‌প্রভাববিস্তারের কোনও প্রতিকূলতা থাকিতে পারে না, আমরা কখনও এরূপ কথা বলিতেছি না। আর, তাহা কোনও ক্রমে সত্যও নহে। দোষ ত্রুটি, প্রতিবন্ধকতা, উভয় দিকেই থাকিতে পারে, এবং প্রকৃত পক্ষে তাহা আছেও। তাই একের পক্ষে অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, নিজের সংশোধন বিষয়ে উদাসীন থাকা নিতান্তই অসঙ্গত। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উন্নতিলাভের পক্ষে ইহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বাধা, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই নবীন ও প্রবীণের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই, তাহার অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর আর কিছু নাই।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস হইতে নবীনদের একটা কথা বিশেষ ভাবে শিখিবার এই আছে যে, উহা প্রধানতঃ নবীনদেরই কীর্ত্তি। সকলেই যৌবনের প্রথম উদ্যমে আপনাদিগকে মহৎ আদর্শের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমস্ত বিষয়ে একমাত্র জীবনের অদ্বিতীয় প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য আর যাহা কিছু সমুদয় অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমগ্র মন প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়াই অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, দেশের মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া এক নূতন উন্নতির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন—দেশের মুখ ফিরাইয়াছিলেন, নিজেরাও ধন্য হইয়াছিলেন। বাস্তবিক যৌবনের পক্ষেই এই কার্য্য সহজ। দীর্ঘকালের সুদৃঢ় অভ্যাসের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, অমিত বলে সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া, লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া বৃদ্ধের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনেক কঠিন। তাই বলিয়া বৃদ্ধও যে ধর্ম্মের মহা বলে বলী হইয়া, যৌবনের উৎসাহ ও শক্তি প্রদর্শন করেন নাই, তাহা নহে। তাহারও বহু দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রহিয়াছে। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে যুবকদের যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নবীনগণ যদি জীবনের প্রথমেই ক্ষুদ্র সংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু দেখিতে না পান, মহত্তর লক্ষ্যের হাতে আপনাদিগকে অর্পণ না করেন, সকল বিষয়ে জীবন-দেবতার আনুগত্যকে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া জীবন-পথে চলিতে আরম্ভ না করেন, তবে তাঁহাদেরও কল্যাণ নাই, সমাজেরও কল্যাণ নাই—সকলের পক্ষেই মহতী-বিনষ্টি, মহা-মৃত্যু অবধারিত। অন্যের শত দোষ ত্রুটি থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা ভাবিয়া নিজের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে কাহারও কোন কল্যাণ নাই। অন্যকে ছোট করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না; আর, আপনি উন্নত না হইয়া অপরকে উন্নত করা সম্ভবপর নহে। অথচ নিজে উঠিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যেও কিছু না কিছু উঠিবেই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে আপনার দিকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবশ্য, তৎসঙ্গে অপরকেও ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা সামাজিক জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। পরস্পরকে উঠিতে সাহায্য করা আমাদের সকলের অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। আর, অপরকে উঠাইতে গেলে নিজের উঠিবার পক্ষেও বিশেষ সহায়তাই হয়। সুতরাং ইহাতে আমরা দ্বিগুণ লাভবান হই।

আর একটি কথা স্মরণে রাখা আবশ্যক—প্রত্যেকেরই নানা দাবী ও অধিকার আছে সত্য; কিন্তু তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকাতে কোনও কল্যাণ নাই, বরং যথেষ্ট অকল্যাণই আছে। কেন না, উহাই যত কলহ বিবাদের মূল। তাহার পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্যের দিকেই প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক—তাহাতেই সকলের কল্যাণ। পরস্পরের কর্ত্তব্যে কোনও বিরোধও নাই—বরং তাহার উপরই সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দাবী ও অধিকারের জন্য বৃথা বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি প্রত্যেকে আপনার কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত হয়, তবে সকলের অধিকারই পূর্ণ ভাবে সুরক্ষিত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত সমাজের কার্য্যও সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে না, প্রকৃত সামাজিক জীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না—সত্য ধর্ম্মজীবন ত দাঁড়াইতেই পারে না। বলা বাহুল্য কর্ত্তব্যপালন ধর্ম্মজীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্মহানি না হইয়া পারে না। এ বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্যের যে দায়িত্ব কত অধিক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সকলের সমান অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত—সুতরাং এখানে সকলের দায়িত্বও সমান, কর্ত্তব্যও সমান। বাস্তবিক কর্ত্তব্যপালন করিবার অধিকারই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অধিকার। ইহার তুলনায় অপর সকল অধিকারই অতি তুচ্ছ, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ, ইহার উপরই জীবনের উন্নতি বিকাশ ও কল্যাণ নির্ভর করে। আর, কর্ত্তব্যপালন ব্যতীত অধিকারও জন্মে না। কর্ত্তব্য পালন দ্বারাই আমরা সমাজ-দেহের অঙ্গরূপে গৃহীত হই—যে অঙ্গ আপনার কর্ত্তব্য পালন করে না, তাহার কোনও ন্যায়সঙ্গত অধিকারও থাকে না। সুতরাং আমাদের প্রিয় সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা প্রত্যেকে আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথাই বিশেষ ভাবে স্মরণ করি। যাহাতে আমরা নূতন বৎসরে সম্যক্‌ প্রকারে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া নিজেরা ধন্য হইতে পারি, সমাজকেও শক্তিশালী করিতে পারি এবং আগামী বৎসরে সুবর্ণ-সাম্বৎসরিকোৎসব যথাযথ রূপে সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত হইতে সমর্থ হই, করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও বল প্রদান করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই নূতন বর্ষে আমাদের প্রত্যেকের ও সমাজের জীবনে জয়যুক্ত হউক।

মায়ের ডাক।

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সাধকেরা নানা উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা, জলের মধ্যে যেমন মৎস্য, ঈশ্বরের মধ্যে তেমনি মানুষ। জলের ভিতরেই মৎস্য ক্রীড়া করে, বাঁচিয়া থাকে; মানুষও কেবল ঈশ্বরের মধ্যেই বাঁচিয়া থাকে! বাতাসের মধ্যে মানুষ যেমন, ঈশ্বরের মধ্যেও মানুষ তেমনি! এক বিন্দু বাতাসের অভাবে মানুষ ছট্‌ফট্‌ করে, অস্থির হইয়া উঠে, ঈশ্বরের অভাবেও মানুষের মহামৃত্যু ঘটে। এ জগতে কত জাতি বাস করিয়াছে! ঈশ্বরের অভাবে তাহাদের কি সর্ব্বনাশই না হইয়াছে, তাহা আমরা জানি। বারির জন্য চাতকের কি দশা হয়, তাহা ত আমরা সকলেই জানি। ঊর্দ্ধপানে তাকাইয়া এক বিন্দু জলের জন্য চাতকের সেই ছট্‌ফটানি, ডাকের পর ডাক ত আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু, মানুষ, তুমি কি ঊর্দ্ধপানে শুষ্ককণ্ঠে ঈশ্বরের জন্য এমনি ব্যাকুল ভাবে ডাকিয়াছ?

মধুর সঙ্গে মৌমাছির যে সম্পর্ক, মানবের সঙ্গে পরমেশ্বরের সেই সম্পর্ক। মৌমাছি মধু সঞ্চয় করে—মানুষ আগুন জ্বালাইয়া, মাছি দূর করিয়া, সেই মধু আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে। কত মৌমাছি মরিয়া যায়, যাতনা পায়, তবু কিন্তু আবার মধুকোষে যাইতে চেষ্টা করে। যাহারা ঈশ্বরকে মধু বলিয়া চিনিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন প্রবৃত্তিকুল মানুষকে ঈশ্বর হইতে দূর করিয়া দেয়। যাঁরা ঈশ্বরকে চিনেছেন তাঁরা, সব বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার দিকেই ব্যাকুল প্রাণে ধাবিত হন।

তাহা ছাড়া আবার পরম জননী সন্তানদিগকে ডাকেন। সে ডাক যাহারা শুনিয়াছে তাহারা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেই। পঞ্জাবে এক ভাই ছিলেন—এক জন বিষয়ী লোক। এক দিন কিন্তু তাঁর মার মুখের কথা মনে হইল—আর কি সন্তান স্থির থাকিতে পারেন? কাজে ইস্তাফা দিয়া উপরওয়ালা সাহেবকে চিঠি লিখিলেন। সাহেব তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বলিলেন, কিছুদিন সবুর কর। আত্মীয় স্বজন নানা উপদেশ দিয়া ইস্তাফা-পত্র ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে মার মুখ দেখিয়াছেন, মার ডাক শুনিয়াছেন। তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? কাজে ইস্তাফা দিয়া তিনি জীবন যৌবন সমস্ত মার হস্তে সমর্পণ করিলেন। এখন অনুতাপ হইতে লাগিল, কেন এত দিন বৃথা মার মুখ ভুলিয়া ছিলেন, কেন এত দিন তাঁর জন্য কাঁদেন নাই। নিরাকার মায়ের জন্য এত কাঁদা দেখিয়া কিন্তু লোকের আশ্চর্য্য মনে হইল। তাহারা ভাবিল লোকটা পাগল হইয়া গিয়াছে। ভাই প্রকাশ দেবের কিন্তু মায়ের জন্য কাঁদিয়া, তাঁর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, কি অসাধারণ শক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তাঁর মুখে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া থাকিত—তাঁহার মুখ দেখিয়াই কত লোকের ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি জীবনে শান্তি পাইয়াছিলেন। জগদীশ্বর, তোমার কার্য্য অভাবনীয়। দগ্ধ শরীর লইয়া বাঁচিয়া কি লাভ? ঈশ্বর ভিন্ন আর জুড়াইবার স্থান নাই।

আর এক জন—তিনিও ছিলেন বিষয়ী লোক। পরিবার পরিজন লইয়া বেশ সুখেই ছিলেন। অর্থের অভাব অনাটন কিছুই ছিল না। তাঁর মনেও তিনি প্রকাশিত হইলেন, আর ডাকিলেন—'চলিয়া আইস'! বুদ্ধি বলল আর কয়েক দিন সবুর কর, কিছু টাকা পাবে। কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু শরীর যেন ব্যাধিগ্রস্ত হইল, ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন অন্তর্হিত হইল। বুদ্ধির কথায় আর কর্ণপাত করিলেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী মার ডাকে ধরা দিলেন। তাঁহার শক্তি কি রূপ বাড়িয়া গিয়াছিল, আমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছি।

আজ উৎসবের দিনে তোমরা এই ডাক শুনিয়াছ কি? এখন এমন দিন আসিয়াছে যখন ধরা দিতে হবে। এই পৃথিবীর দুঃখ ভার কত বেশী হইয়াছে! এই পাপভার দূর করিবে কে? মানবকে উদ্ধার করিবে কে? আমাদের এই দেশকে আমরা কত ভালবাসি! একে উদ্ধার করবে কে? জাত্যভিমান দূর ক'রে দিতে হবে। স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নিম্ন শ্রেণী উচ্চ শ্রেণীর সবাইকে মায়ের কোলে আশ্রয় নিতে হবে। না হইলে এই দেশের উদ্ধার নাই।

এই ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী কেন? না, ব্রহ্ম এখানে বিরাজিত। তাঁহার এই প্রকাশের মধ্যে আমরা বাস করি। আমরা ত পাপী মানুষ, ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই আসিয়াছি। কিন্তু দেখিয়াছি, যখনই মা বলিয়া ডাকিয়াছি, মা অমনি সাড়া দিয়াছেন, দুর্ব্বলতা, নিরাশা চলিয়া গিয়াছে—আশায় প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। নিরন্তর উপাসনা করিলে মানুষ নূতন মানুষ হইয়া যায়।

শিবনাথ যে এত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা কোথা হইতে? সবই এই উপাসনার ফল। ব্রাহ্মসমাজকে আবার উপাসনাশীল করিতে হইবে। অরূপের রূপ এখানে প্রকাশিত। উপাসনার মধ্যেই তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহাকে দেখিয়া আপনাকে তাঁহার হাতে অর্পণ করিতে হইবে। কত ব্রাহ্ম তাঁহার কার্য্যে জীবন দিয়েছেন! পুণ্যের বাতাস আবার বহিতেছে। তাঁহার জন্য আমরা পরিশ্রম করিব, জীবন মন দান করিব। তাহাতে আমাদের কত আনন্দ! আমাদের জীবন তাহাতেই সার্থক। হে ঈশ্বর, তোমার কার্য্যে যেন আত্মদান করিতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। তুমি কৃপা করিয়া প্রার্থনা পূর্ণ কর।

৯ই মাঘ রাত্রিকালীন উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

উপনিষদ্ ও বাইবল্-উক্ত ধর্ম্মের তুলনা (২)

৭। বাইবলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

এখন বাইবল্-উক্ত ধর্ম্মের কথা বলি। পুরাতন বাইবলের প্রথম পুস্তকে যে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা বিগত অবৈজ্ঞানিক যুগে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকল খ্রীষ্টিয়ানই গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া

প্রতিপন্ন হওয়াতে এখন শিক্ষিত খ্রীষ্টিয়ানগণ উহাকে উপেক্ষা করেন। এই সৃষ্টিতত্ত্বানুসারে স্রষ্টা ও সৃষ্ট, ঈশ্বর ও জগৎ, একান্ত ভিন্ন। মানুষ "ঈশ্বরের প্রতিরূপে সৃষ্ট" হইলেও তাঁহা হইতে সত্তা সম্বন্ধে একান্ত ভিন্ন। কিন্তু নূতন বাইবলের চতুর্থ পুস্তকে, যোহন-কথিত সুসমাচারের প্রারম্ভে, যে সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে তাহাতে প্রকারান্তরে স্রষ্টৃ-সৃষ্টের ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব ভাল রূপে বুঝিতে গেলে গ্রীক্ ও ইহুদী দর্শনের জ্ঞান আবশ্যক। সেই জ্ঞান আমার অতি অল্প। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বলি। যোহন বলিতেছেন,—"আদিতে শব্দ ছিলেন, এবং শব্দ ব্রহ্মের সহিত ছিলেন, এবং শব্দ ব্রহ্ম। তিনি আদিতে ব্রহ্মের সহিত ছিলেন। সমুদায় বস্তু তাঁহাদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল; যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে তাহার কিছুই তদ্ব্যতীত সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাতে প্রাণ ছিল, এবং সেই প্রাণই মানবের আলোক। সেই আলোক অন্ধকারে দীপ্তি পায়, কিন্তু অন্ধকার তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।" সমুদয় জাগতিক বস্তু চিন্তার আকারে নিত্যকাল পরব্রহ্মে বর্ত্তমান। এই চিন্তাসমষ্টিরূপী পুরুষই 'শব্দ'—'শব্দব্রহ্ম'—যিনি আদিতে, অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে, ব্রহ্মের সহিত ছিলেন এবং যাঁহাদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি দেশে কালে জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। এই শব্দব্রহ্মই মানবের প্রাণ এবং আলোক, অর্থাৎ জ্ঞান; কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানব তাঁহাকে জানে না। "তাহাই সত্য আলোক, যাহা জগতে আসিয়া প্রত্যেক মানবকে দীপ্তি দান করে!" মানবসাধারণ তাঁহাকে চিনিল না, কিন্তু ক্ষণজন্মা কতিপয় লোক তাঁহাকে চিনিলেন। অবশেষে শব্দ যিশুরূপে শরীর ধারণ করিলেন। তখন অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। সুসমাচার-চতুষ্টয়ের সর্ব্বত্রই, বিশেষ ভাবে চতুর্থ সুসমাচারে, যিশু বলিয়াছেন, তিনি শরীরধারণের পূর্ব্বে ব্রহ্মের সহিত ছিলেন, তিনি ব্রহ্মপুত্র এবং ব্রহ্মের সহিত এক। "আমি এবং পিতা এক" (যোহন ১০।৩০)। কিন্তু তিনি পিতার সহিত ভেদও স্বীকার করিয়াছেন। "পিতা আমা অপেক্ষা মহত্তর" (যোহন ১৪।২৮)। বিচারের দিন কবে আসিবে, সেই বিষয়ে স্পষ্টই তিনি নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি যে পিতা হইতে প্রাপ্ত, তাহাও সর্ব্বত্রই স্বীকার করিয়াছেন। পিতার সহিত তাঁহার ভেদাভেদ যে প্রত্যেক মানবসম্বন্ধেই সত্য, তাহাও তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন। পবিত্রাত্মার অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া তিনি বলিতেছেন, "সেদিন তোমরা জানিবে যে আমি আমার পিতাতে, এবং তোমরা আমাতে, এবং আমি তোমাদিগেতে" (যোহন ১৪।২০)। তিনি শিষ্যদিগকে লইয়া যে শেষ দীর্ঘ প্রার্থনা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন.—"তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ তাহা আমি ইহাদিগকে দিয়াছি, যাহাতে ইহারা এক হইতে পারে, যেমন আমরা এক" (যোহন ১৭।২২)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যিশু পিতার সহিত যে একত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার একচেটিয়া নহে, খ্রীষ্টীভূত অর্থাৎ খ্রীষ্টের স্বভাবপ্রাপ্ত প্রত্যেক মানবই তাহা বলিতে পারে। সাধু পলের পত্রগুলিতে এই সত্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এখন তাঁহার মত সম্বন্ধে কিছু বলি। ব্রহ্ম যে সর্ব্বগত, আমাদের জীবনাশ্রয়, এই বিষয়ে পলের উজ্জ্বল জ্ঞান ছিল। এথেন্সবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে একটী প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, যার সদৃশ উক্তি বাইবলে আর কুত্রাপি নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে পল্ বলিতেছেন, "তাঁহাতে আমরা বাঁচিয়া আছি, বিচরণ করিতেছি এবং জীবনধারণ করিতেছি।" (প্রেরিতদিগের কার্য্যাবলী ১৭।২৮)। খ্রীষ্ট সম্বন্ধে পল্ বলিতেছেন, "যিনি অদৃশ্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি, সমগ্র সৃষ্টির প্রথমজ; কারণ, স্বর্গ এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তু, দৃশ্য এবং অদৃশ্য বস্তু, রাজা রাজ্য ক্ষুদ্র-রাজ্য, শক্তিসমূহ, তাঁহাদ্বারা এবং তাঁহাতেই সৃষ্ট হইয়াছে; তিনি সমুদায়ের অগ্রে, এবং তাঁহাতে সমুদায় ধৃত" (কলসিয়ানদের নিকট পত্র ১।১৫)। ফলতঃ পলের খ্রীষ্ট কেবল শরীরধারী যিশু নহেন। তিনি যিশুতে অবতীর্ণ বটেন, কিন্তু যিশুর জন্মের অনাদিকাল পূর্ব্ব হইতেই তিনি ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ ভাবে যুক্ত হইয়া আছেন। যোহনের শব্দব্রহ্ম এবং পলের খ্রীষ্ট একই।

৮। মধ্যবর্ত্তিত্বের মত

যাহা হউক, ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব সম্বন্ধে এই সকল উক্তি বাইবলে থাকা সত্বেও, এই সত্য সাধারণ খ্রীষ্টসমাজের চিত্তে বদ্ধমূল হয় নাই। সাধারণ খ্রীষ্টীয়ান ব্রহ্ম, জগৎ ও জীবকে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়াই মনে করেন এবং তাঁহার দৈনন্দিন সাধন এই একান্ত দ্বৈতভাবের দ্বারাই নিয়মিত। এই দোষ কেবল তাঁহার নহে। উপনিষদে জগৎ ও জীবের সহিত মৌলিক একত্ব যেমন উজ্জ্বলভাবে এবং নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বাইবলে সেরূপ হয় নাই। ইহার ফল ভাল মন্দ উভয়ই হইয়াছে। ভাল ফল এই যে, খ্রীষ্টধর্ম্মে পাপবোধ অতিশয় উজ্জ্বল এবং ধর্ম্মসাধনে অনুতাপ ও প্রার্থনার স্থান অতি উচ্চ। মন্দ ফল এই যে, ইহাতে পাপীকে ঈশ্বর হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় মতে এই বিচ্ছেদ এত গভীর যে, খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিত্ব ব্যতীত ইহা দূর হইতে পারে না। খ্রীষ্ট যে যিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্রুশকাষ্ঠে নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কেবল সেই আত্মবিসর্জ্জনের ফলেই ব্রহ্ম ও জীবের বিচ্ছেদ দূর হইতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টের সেই আত্মবিসর্জ্জনের ফলে ব্রহ্মের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতে গেলে, তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহা নিজ জীবনে সাধন করিতে হইবে। জগতের মঙ্গলের জন্য যিশুর জীবন দান খ্রীষ্টীয় সাধনের আদর্শ। তিনি যেমন উচ্চতর প্রয়োজনের জন্য নিজ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমনি মানবকেও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে হইলে সমুদায় নীচ দৈহিক প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া আত্মার বশীভূত করিতে হইবে।

৯। বিশ্বাস ও কর্ম্ম—খ্রীষ্টীভূত হওয়া

পল্ যে বিশ্বাসের কথা বলিয়াছেন তাহা কেবল মতমাত্র নহে। এই বিশ্বাসকে দৈনন্দিন জীবনে সাধন এবং কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। পলের মতে সাধুকর্ম্ম করিতে হইবে বটে, কিন্তু কর্ত্তৃত্বের অহংকার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করিতে হইবে। অহংকারমূলক কর্ম্মে মুক্তি নাই। বিশ্বাস এবং বিশ্বাসমূলক কর্ম্মেই মুক্তি। পলের

দেখা পড়িয়া মনে হয়, তাঁহার কথিত 'বিশ্বাস' এবং উপনিষদ্-কথিত 'জ্ঞান' একই বস্তু; উভয়ই অন্তর্দৃষ্টি-প্রসূত, শাস্ত্র বা গুরুতে অন্ধনির্ভর-মূলক নহে। কিন্তু এই বিশ্বাস কিরূপে লাভ করিতে হইবে, এই বিষয়ে যিশু বা পল্ কেহই কিছু বলেন নাই। এই বিষয়ে উপনিষদ্ ও বাইবলের শিক্ষা পরস্পর হইতে অতিশয় ভিন্ন। যাহা হউক্, খ্রীষ্টের আত্মদানের আদর্শে মানবের দৈনন্দিন সাধনের ফলে জীবন কিরূপে খ্রীষ্টীভূত—উপনিষদের ভাষায় 'ব্রহ্মীভূত'—হয়, তাহা সাধু পল্ তাঁহার গ্যালেসিয়ানদিগের নিকট পত্রে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "আমি খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশে হত হইয়াছি; তথাপি আমি বাঁচিয়া আছি; কিন্তু আমি আর আমি নই, খ্রীষ্টই আমার মধ্যে বাস করিতেছেন; এবং আমি এখন দেহে যে জীবন ধারণ করিতেছি, তাহা বিশ্বাসের জীবন, যে বিশ্বাস সেই ব্রহ্মপুত্রে আছে যিনি আমাকে ভালবাসিয়া আমার জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছেন" (২।২০)।

১০। বাইবলের নীতি

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উপনিষদে নৈতিক উপদেশের বাহুল্য নাই। এই বিষয়ে বাইবল্ উপনিষদ্ হইতে অতিশয় ভিন্ন। বাইবল্ নৈতিক উপদেশে পরিপূর্ণ। চিন্তা, ভাব, সঙ্কল্প, বাক্য, ব্যবহার, সকল বিষয়েই বাইবলে সূক্ষ্মভাবে পবিত্রতার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে মথি-কথিত সুসমাচারের ৫ম হইতে ৭ম অধ্যায় প্রধান স্থান। যিশুখ্রীষ্টের প্রেম, পবিত্রতা ও সেবাময় জীবন এই সকল উপদেশের দৃষ্টান্ত। এই জীবন ঐতিহাসিক কি না, কেবল কাল্পনিক আদর্শ কি না, এই প্রশ্নের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমার মনের ভাব এই যে, ধর্ম্মপুস্তক ইতিহাস শিক্ষা দিবার জন্য নহে, আত্মাতে উচ্চ আদর্শ উদ্দীপ্ত করাই ধর্ম্মপুস্তকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাইবলের দ্বারা বিশেষরূপে সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। যাহা হউক্, যিশুর সমস্ত নৈতিক উপদেশের সারসংগ্রহ এই—"তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তোমাদিগকে সেরূপ পূর্ণ হইতে হইবে।" (মথি ৫।৪৮)

প্রেম সম্বন্ধে বাইবলে কোন দার্শনিক তত্ত্ব নাই, কিন্তু মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম এবং মানবের প্রতি মানবের প্রেম, উভয় বিষয়েই বাইবলের উপদেশ অতি গভীর ও মধুর। বাইবলের মতে মানব ঈশ্বরের অতীব প্রিয় এবং মানবের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমাদের আহার, বিহার, সুখসচ্ছন্দতা, এই সমুদায়ের জন্য তিনি তো ব্যস্তই, আমাদের আত্মার উন্নতি এবং পরিত্রাণের জন্য তিনি বিশেষভাবে ব্যস্ত। যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উদ্বিগ্ন, তাহাদের ভ্রম দেখাইবার জন্য যিশু বলিয়াছেন, আকাশ-বিহারী পক্ষীর আহারের জন্য যিনি বিধান করিতেছেন এবং ভূমিতে উৎপন্ন পদ্মকে যিনি সুরঞ্জিত করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে মূল্যবান্ মানবজীবনের জন্য কত গুণে অধিক ব্যস্ত! (মথি ৬।২৫-৩০)। ঐ পুস্তকেরই ১০ম অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন,—যে চড়ুই পাখীর জোড়া এক পয়সায় পাওয়া যায় তাহারও গতিবিধি পরমপিতা পর্য্যবেক্ষণ করেন। মানুষ বহু চড়ুই পাখী অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্। ঈশ্বর আমাদের কেশের সংখ্যা পর্য্যন্ত জানেন, সুতরাং ভাবনার কোন কারণ নাই। ঈশ্বর পাপীর পরিত্রাণের জন্য কত ব্যস্ত এবং বিপথগামী মানব ঈশ্বরের দিকে ফিরিলে তাঁহার কত আনন্দ হয়, তাহা বাইবলে বিশেষভাবে দুটী আখ্যায়িকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক জন মেষপালকের যদি এক শত মেষ থাকে এবং তন্মধ্যে যদি একটী হারাইয়া যায়, তবে সে নিরনব্বইটিকে ফেলিয়া রাখিয়া হারাণ মেষটীর অন্বেষণে যায়। ইহাকে পাইলে সে স্কন্ধের উপরে চড়াইয়া আনন্দে বাড়ীতে লইয়া আসে এবং বন্ধুদিগকে তাহার আনন্দে আনন্দিত হইতে বলে। অনুতপ্ত পাপীর জন্য স্বর্গে এরূপ আনন্দ হয়। (লূক-কথিত সুসমাচার ১৫।৩-৯)। দ্বিতীয় আখ্যায়িকাটী আরও মধুর। কোন ধনী ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র তাহার প্রাপ্য পিতৃধনের অংশ লইয়া দূর দেশে গেল। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই আমোদ প্রমোদে সে তাহার সমস্ত ধন নষ্ট করিল। সেই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সে অতিশয় অভাবে পড়িল। নিরুপায় হইয়া সে কোন ব্যক্তির শূকর-পালকের কর্ম্ম লইল। সে ক্ষুধায় এত কষ্ট পাইত যে শূকরের ভক্ষ্য ভুসি খাইতেও তাহার ইচ্ছা হইত, কিন্তু তাহাও সে পাইত না। সে অনুতপ্ত হইয়া ভাবিল 'আমি আর আমার পিতার পুত্রনামের উপযুক্ত নহি, কিন্তু আমি পিত্রালয়ে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বহু ভৃত্যের এক জন হইয়া জীবনধারণ করিব।' সে পিত্রালয়ের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তাহার পিতা তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন। সে পিতার নিকট দৈন্য ও কাতরতা প্রকাশ করিতে না করিতেই, পিতা ভৃত্যদিগকে তাহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিতে এবং তাহার সম্মানের জন্য একটী ভোজের আয়োজন করিতে বলিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইহাতে বিরক্ত হওয়াতে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'তুমি তো সর্ব্বদাই আমার নিকটে রহিয়াছ, আমার সর্ব্বস্বই তোমার; কিন্তু তোমার মৃত ভ্রাতার পুনর্জ্জীবনে, হারাণ ভ্রাতার পুনঃপ্রাপ্তিতে, আনন্দ করা সমীচীন (লূক ১৫। ১১--৩২)। আখ্যায়িকাটী বিস্তৃত ও মধুরভাবে বাইবলে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে ইহার উল্লেখ করিলাম। পাপীর পরিত্রাণে ঈশ্বরের আনন্দ ইহা অপেক্ষা মধুরতররূপে আর কোন শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। মানবের প্রতি মানবের প্রেম এবং পরস্পরের সেবাও এরূপ মনোহরভাবে বাইবলে বর্ণিত হইয়াছে। মথি (২৫।৩১—৪৬) তে শেষ বিচারের বিবরণে পাঠক এরূপ একটী বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। আমরা ইহা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই দিনে খ্রীষ্ট বিচারাসনে বসিয়া সাধু এবং পাপীদিগকে দুই পার্শ্বে দাঁড় করাইবেন। সাধুদিগকে তিনি বলিবেন, "আমি ক্ষুধার্ত্ত হইলে তোমরা আমাকে আহার দিয়েছিলে, তৃষ্ণার্ত্ত হইলে পানীয় দিয়াছিলে, অতিথি হইলে আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে, বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র দিয়াছিলে, পীড়িত হইলে ঔষধ দিয়াছিলে, কারাবদ্ধ হইলে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলে। তোমরা আমার পিতার স্বর্গরাজ্য অধিকার কর।" সাধুরা উত্তর করিবেন, "প্রভো, আপনি কখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন এবং আমরা আপনাকে আহার দিয়াছিলাম? কখন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন

এবং আমরা পানীয় দিয়াছিলাম? কখন অতিথি হইয়াছিলেন এবং আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম? কখন বস্ত্রহীন হইয়াছিলেন এবং আমরা আপনাকে বস্ত্র দিয়াছিলাম?” বিচারক বলিবেন, “আমার এই ভাইদের মধ্যে একটী কনিষ্ঠতম ভাইয়ের প্রতিও যদি এরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, তবে তাহা আমার প্রতিই করা হইয়াছে।” তার পরে বিচারক পাপীদিগকে বলিবেন “আমি যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম তখন তোমরা আমাকে আহার দাও নাই, যখন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম তখন পানীয় দাও নাই, যখন অতিথি হইয়াছিলাম তখন আশ্রয় দাও নাই। যখন বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম তখন বস্ত্র দাও নাই, যখন পীড়িত হইয়াছিলাম তখন ঔষধ দাও নাই। যখন কারাবদ্ধ হইয়াছিলাম তখন দয়া কর নাই। যাও, শয়তান এবং তাহার অনুচরদের জন্য প্রস্তুত চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিতে যাও।” তখন পাপীরা বলিবে “প্রভো, আপনাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া আমরা কখন আহার দিই নাই? তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া কখন জল দিই নাই? অভ্যাগত দেখিয়া কখন আশ্রয় দিই নাই? বস্ত্রহীন দেখিয়া কখন বস্ত্র দিই নাই? পীড়িত দেখিয়া কখন ঔষধ দিই নাই? কারাবদ্ধ দেখিয়া কখন দয়া করি নাই?” তখন বিচারক বলিবেন “আমার এই সকল ভাইদের মধ্যে একটী কনিষ্ঠতমের প্রতিও যখন এরূপ ব্যবহার কর নাই তখন আমার প্রতিও কর নাই।” এই বর্ণনার পৌরাণিক ভাবের বিচার করা এস্থলে আবশ্যক বোধ করি না। ইহার সারভূত ভাব গ্রহণই একান্ত প্রয়োজনীয়। ঈশ্বর ও মানবের মৌলিক একতা, মানবের সেবাই যে ঈশ্বরের সেবা, এই সত্য এমন গভীর ও মধুর ভাবে আর কুত্রাপি ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া জানি না। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন, ইহাই খ্রীষ্টীয় সাধনের মূল উদ্দেশ্য। স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকের ভাব অতি উচ্চ সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব যত দিন পৃথিবীতে থাকে তত দিন পৃথিবীকে স্বর্গ করিবার চেষ্টা অপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা আর কিছু হইতে পারে না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল, এখন শেষ করি। ভারতের ভাবী ধর্ম্মসমন্বয়ে উপনিষদ্ ও বাইবল্-উক্ত সারধর্ম্মের সমুচ্চয় একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ভারতের পরিত্রাণ অনেক পরিমাণে ইহার উপর নির্ভর করে।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

পরলোকগতা প্রমীলা দেবী

জন্ম—১২ই আগষ্ট, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে;

মৃত্যু—১৩ই মার্চ্চ, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে।

আমার সহধর্ম্মিণী প্রমীলা দেবী ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিতা ধর্ম্মপ্রাণা স্বর্গীয়া চঞ্চলা দেবীর প্রথমা কন্যা ছিলেন। হুগলী জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর নিবাসী স্বর্গীয় রায় নবকৃষ্ণ ঘোষ বাহাদুর মহাশয় আমার শ্বশুর। তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। চঞ্চলা দেবী যৌবন কালেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পতির বিরুদ্ধভাব সত্ত্বেও যথাসাধ্য সেই ধর্ম্ম পালন করিতেন। পতির মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হাজারিবাগের প্রবীণ উকীল বাবু অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট তিনি থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার তিন কন্যার বয়োবৃদ্ধি-হেতু আর হিন্দুসমাজে থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। উদারহৃদয় অক্ষয় বাবুর সম্মতি গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলা দেবী তাঁহার কন্যা তিনটীকে লইয়া ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়ের আশ্রয়ে আসিয়া সাধন-আশ্রমে যোগদান করিলেন। চঞ্চলা দেবী উচ্চ ভগবদ্ভক্তি, সেবাপরায়ণতা ও অন্যান্য অনেক সদ্গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি যখন সাধন-আশ্রমে যোগদান করিলেন, তখন প্রমীলার বয়স প্রায় ১২ কি ১৩ বৎসর মাত্র। সেই সময়েই তাঁহার চেহারাটী অতীব সুন্দর ছিল।

প্রমীলার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, অপরিহার্য্যরূপে আমার নিজের জীবনের কথা কতক বলা আবশ্যক। আমার জীবনের যে অবস্থাতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় ও পরে ভালবাসার সঞ্চার হয় এবং তাহাতে আমার হৃদয় মনের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাই প্রথমে বলিব।

বাল্যকালে আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম। কোনরূপ প্রবল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। আমার বয়স যখন প্রায় ১৭ বৎসর, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ভক্তিভাজন স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, কয়েকজন ভক্ত ব্রাহ্মদিগকে সঙ্গে লইয়া, আমাদের বজ্রযোগিনী গ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন। তিনি আমাদের গ্রামে “প্রকৃত বিশ্বাস” এবং “সাকার ও নিরাকার উপাসনা” সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা করেন। আর সকলে মিলিয়া কিছুদিন সেখানে থাকিয়া সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত, ধর্ম্মালোচনা ও প্রাণস্পর্শী ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। সেই ভক্তদের সঙ্গ লাভ করিয়া আমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্বর্গের দেবতা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিলেন—আমি তাঁহার স্পর্শে নবজীবন লাভ করিলাম। নবজীবনের সেই স্বর্গীয় ভাবের কথা ও সেই পরম দেবতার স্পর্শজনিত অপূর্ব্ব আনন্দের কথা প্রকাশ করিতে পারি, এমন ভাষা আমার নাই। যাহারা নবজীবন লাভ করিয়াছেন ও সেই অপার্থিব আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন, কেবল তাঁহারা আমার সেই সময়ের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। সেই কৈশোরেই পরম দেবতা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। পিতামাতা প্রভৃতি সকল আত্মীয় যখন রাত্রিতে নিদ্রিত হইতেন, তখন আমি নিজ শয্যায় উপবেশন করিয়া দেবতার স্পর্শজনিত আনন্দ উপভোগ করিতাম। মনে হইত সেই স্বর্গের দেবতা করুণা করিয়া তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ আমার প্রাণে ঢালিয়া দিতেছেন। আমি কত প্রার্থনা করিতাম, কত ভাবে তাঁহাকে ডাকিতাম! অজস্র অশ্রুধারাতে আমার বুক ভিজিয়া যাইত। গভীর রাত্রিতে আমি নিদ্রিত হইতাম। প্রভাতে জাগিয়া প্রথমেই প্রভুর কথা মনে হতো, আর আমার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া যাইত। আমার সমস্ত হৃদয় সেই সময় শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া গিয়াছিল, আমার আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনাসকল স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ থাকিত। কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী হইল না। ক্রমে

শ্রাদ্ধবাসরে স্বামী শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত।

অন্ধকার আসিতে লাগিল। কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলাম। উপযুক্ত গুরুর অভাবে হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাব দূর হইতে লাগিল, এবং প্রায় তিন বৎসর পরে আমার হৃদয় একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আমার হৃদয়-দেবতা কোথায় লুকাইত হইলেন। ভীষণ সন্দেহে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ঈশ্বর যদি ত্রিকালজ্ঞ, তবে মানুষের স্বাধীনতার স্থান কোথায়, আর যদি মানুষের স্বাধীনতাই না থাকে, তবে সে পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী হইবে কেন—এই প্রশ্ন তখন উদয় হইল। ক্রমে ঈশ্বর, পরকাল ও ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতিতে গভীর সন্দেহ আসিয়া আমার হৃদয় মনকে গভীরতম অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল সেই সময়ের আমার হৃদয়ের তীব্র যাতনার কথা এমন কোন ভাষা নাই যদ্দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি। এই সময়ে আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলিকাতাতে সিটি কলেজে ভর্ত্তি হই। আমার অগ্নি-পরীক্ষা অন্য দিক হইতেও আসিল। আমার পিতৃদেব ও খুল্লতাত মহাশয়ের মধ্যে বৈষয়িক বিবাদ উপস্থিত হইয়া, নানা মোকদ্দমা আদি হইয়া, আমাদের সমুদয় কারবার ও সেই সঙ্গে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল। আর হঠাৎ আমার পিতার মৃত্যু হওয়াতে নানা দুরবস্থা চারিদিক হ'তে আমাকে আক্রমণ করিল। ফলে আমার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গেল; আমি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

এই সময়ে আমি ভক্তিভাজন সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের চরণতলে বসিয়া প্রাণের দায়ে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। এখনও আমি দর্শনের আলোচনা করিয়া থাকি। এবং দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া যে প্রভূত উপকার পাইয়াছি তাহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কেবল দর্শন আলোচনা করিয়া আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয় নাই। পরমদেবতার করুণাতে অন্যসকল অপূর্ব্ব সাহায্যও আমার জীবনে মিলিয়াছে। সেই সকল বিস্তৃত ভাবে এই স্থানে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে, সঙ্গতও নহে। একটি কথা কেবল বলা আবশ্যক। ভক্ত দার্শনিক ডাঃ মার্টিনো বলিয়াছেন জগতে যত রকমের সন্দেহবাদ ও নাস্তিকতা দেখা যায়, সে সকল বুদ্ধির অল্পতার জন্য ঘটে না, কিন্তু হৃদয়ের বিকাশের অল্পতাহেতুই ঘটে। নাস্তিক বা সন্দেহবাদীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা যথেষ্ট। কিন্তু কেবলমাত্র বুদ্ধির প্রখরতা মানুষকে সন্দেহের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না—বোধ বা অনুভূতি চাই, হৃদয়ের বিকাশ চাই। ধর্ম্মের উন্নত, পবিত্র ও অপার্থিব সত্যসকল অনুভব করিতে হইলে হৃদয়ের যে সকল দিক বিকশিত হওয়া আবশ্যক, সন্দেহবাদী বা নাস্তিকের হৃদয়ের সে সকল বিকাশের অভাব আছে। উন্নত ধর্ম্মজীবন হৃদয়ের উন্নত অনুভূতির উপরে নির্ভর করে, আর উন্নত অনুভূতি হৃদয়ের উন্নত বিকাশ সাপেক্ষ। মার্টিনোর এই কথা আমি অতীব সত্য বলিয়া জীবনে অনুভব করিয়াছি। সন্দেহের আগুনে যখন দগ্ধ হইতেছিলাম, তখন সাধন-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয়ের সেই সময়ের জীবন্ত উপাসনা ও উপদেশ আমার হৃদয়ের শুষ্কতা দূর করিতে লাগিল; আর সেই সময়েই চঞ্চলা দেবীর সহিত আমার পরিচয় ঘটে। কি কারণে জানি না, তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। সেই সাধ্বী নারীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব ও সুকোমল স্নেহ আমার হৃদয় মনকে সিক্ত করিতে লাগিল। এইরূপ আরো অনেক উপায়ে আমার হৃদয়ের শুষ্কতা দূর হইয়া ক্রমে তাহাতে স্বর্গীয় অনুভূতিসকল জাগিতে লাগিল এবং আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইতে লাগিল।

প্রমীলার প্রতি যখন আমার হৃদয়ের অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে যখন তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল, তখন এক অপূর্ব্ব ভাবে আমার হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল। আমার আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু প্রায় পাঁচ বৎসর কাল আমাদের বিবাহ স্থগিত ছিল। সেই সময়ে প্রমীলা বাঁকিপুরে আর আমি কলিকাতাতে থাকিতাম। আবেগপূর্ণ হৃদয়ে যখনই তাঁহাকে চিঠি লিখিতে বসিতাম বা তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতাম, তখনই আমার প্রাথমিক নবজীবনের স্বর্গীয় মধুর স্মৃতিসকল হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিত, এবং আমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত হৃদয়-দেবতার কথা মনে হইয়া প্রাণ আনন্দরসে পূর্ণ হইয়া যাইত। আর এই ভাবে আমার সেই হারান নিধিকে হৃদয়ে পাইয়া আমি তৃপ্ত হইতাম। এমনটী ত আর অন্য কাহারো প্রতি ভাল-বাসা হেতু ঘটে নাই। অতএব প্রমীলা আমার ধর্ম্মজীবনের এক প্রধান সহায়। আমার সম্বন্ধে বিধাতার এই অপূর্ব্ব বিধি আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি।

বিবাহ স্থির হওয়ার পরে আমার জন্য তাহাকে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাহাতে যে তাহার ক্লেশ হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু তিনি সেই ক্লেশের জন্য কখনও অভিযোগ প্রকাশ করেন নাই। আমার ভগ্নীদের সকলের বিবাহ হইলে পরে, যখন আমার সংসারের ভার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, তখন এই আশ্রমেই আমাদের বিবাহ হয়। সেই সময়ে প্রমীলার বয়স প্রায় ২২ বৎসর। আর আমার বয়স ২৯ বৎসর। দরিদ্রের বিবাহ বিনা আড়ম্বরেই সম্পন্ন হইল,—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে খাওয়ান হয় নাই। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই দিনের মর্ম্মস্পর্শী উপাসনা ও উপদেশে আমাদের বক্ষ অশ্রুসিক্ত হইল। এইরূপ দীন ভাবেই আমরা সংসারে প্রবেশ করিলাম। কটক জিলার অন্তর্গত কেন্দ্রাপাড়াতে আমার কর্ম্মস্থল নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে, আমরা বিবাহের পরে সেইখানে গেলাম।

বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে আমার ভাই। বয়সে তিনি আমার কনিষ্ঠ। আর সকল বিষয়েই তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিবাহের উপহারস্বরূপ কয়েকখানা ধর্ম্মগ্রন্থ ও আসনাদি কতক উপাসনার সরঞ্জাম তিনি আমাদিগকে দিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ঐ সকলের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। বিবাহের পরে তাঁহার প্রদত্ত জিনিষাদি অবলম্বন করিয়া আমরা উভয়ে মিলিত উপাসনা আরম্ভ করিলাম। প্রতি প্রভাতে উপাসনা না করিয়া আমরা জলগ্রহণ করিতাম না। এই নিয়ম সেই সময় হইতে আমরা অক্ষুন্ন ভাবেই প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি। তাহাতে যে কেবল একটী

নিয়ম পালনের অভ্যাস হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু এই নিয়মের ভিতর দিয়া পরমদেবতার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ যোগও স্থাপিত হইয়াছে। সতীশচন্দ্রের প্রদত্ত উপাসনার সরঞ্জামাদি এই বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। সেই জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু প্রমীলার অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব ও গভীর ধর্ম্ম-নিষ্ঠাই এই পথে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে। কেন্দ্রাপাড়াতে গিয়া কিছু কাল পরে আমাদের মিলিত উপাসনা বড়ই শুষ্ক হইতে লাগিল। এমন কি মিলিত উপাসনা করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। মনের দুঃখে মিলিত উপাসনা কিছু দিন বন্ধ রাখিবার অভিপ্রায় এক দিন আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার সেই কথা শুনিয়া প্রমীলা আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং আবেগ ভরে বলিতে লাগিলেন—"আমাদের আর সব বিষয়ই চলিবে, কেবল উপাসনাই বন্ধ থাকিবে—এ কি কথা তুমি বলিতেছ ?" আহা, তাঁহার সেই আকুল ক্রন্দন ও উপাসনার জন্য আবেগময়ী ব্যাকুলতা মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার হৃদয়কে সিক্ত করিল। দৈনিক মিলিত উপাসনা বন্ধ করিবার কথা আমার মনে আর কখনও উদয় হয় নাই।

ক্রমে তিনি নিজেও কথা বলিয়া উপাসনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সে উপাসনা অতীব সুমিষ্ট, সরল, ও অনুভূতিতে পূর্ণ ছিল। সরল উপাসনায় যখন তিনি নিষ্ঠার সহিত যোগদান করিতেন, তখন তাহার স্বাভাবিক সুন্দর মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। কটকে এক দিন সমবেত উপাসনাতে উপবিষ্টা প্রমীলাকে দেখিয়া ভক্ত কবি স্বর্গীয় মধুসূদন রাও মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন—"উপাসনার সময় প্রমীলার মুখশ্রী কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আভাতেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে! আমি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

অতীব সরল, সহজ ও অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভর করিতেন। সেই জন্য তিনি সকল প্রকারের বিপদের সময় শান্ত থাকিতে পারিতেন। আমার একবার কাজ গেল। তখন কয়েকটী সন্তান হইয়াছে। আমি দুর্ভাবনাতে চঞ্চল হইতে লাগিলাম। কিন্তু প্রমীলা সেই সময়ে যে কেবল নিজে শান্ত থাকিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন তাহা নহে, আমার চঞ্চলতা দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমার বন্ধুদিগকেও অনুরোধ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারি সাহায্যে আমি শান্ত হইয়াছিলাম। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার মধ্যমা কন্যা প্রায় মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছিল। জীবনের সকল লক্ষণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বন্ধুরা তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। আমার দুর্ব্বল চিত্ত আবার সেই সময়ে বিশেষ চঞ্চল হইতে লাগিল। প্রমীলা তখন রুগ্না, কিন্তু সেই ভীষণ পরীক্ষার সময়েও তিনি স্থির শান্ত। মুখে দয়াল নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এক দিকে আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, আর অপর দিকে আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যসকল করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছাতে সেই কন্যা সেই-বার পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইল। এইরূপ বহুবার তাঁহার এই অপূর্ব্ব শান্তভাব দেখিয়া আমার হৃদয় শ্রদ্ধাতে তাঁহার নিকট নত হইয়াছে।

আর একটী কথা। দুঃখ ও বিপদে পতিতা হইয়া তিনি যে কেবল চিত্তের শান্তভাব রক্ষা করিতেন তাহা নহে। ভগবানের দয়া ও মঙ্গলভাবে তাঁহার এমনই সহজ ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দুঃখকে তিনি তাঁহার কল্যাণপ্রদ দান বলিয়াই মনে করিতেন। এবং কখনও কোন দুঃখের জন্য তাঁহার চিত্তে অভিযোগ উপস্থিত হ'ত না। জীবনের নানা দুঃখে পতিত হইয়া, বিশেষতঃ আমাদের রুগ্না কন্যার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, আমার প্রাণ তিক্ত হইয়া উঠিত। তিনিও অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার চিত্তের গভীরতম প্রদেশে প্রভুর করুণাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস নিহিত থাকাতে, এই সকল দুঃখের জন্য কখনও অভিযোগ করিতেন না। বিবাহ করাতেই এই সকল দুঃখ ও দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে, অতএব সংসারে প্রবেশ করিয়া ভুল করা হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন কি না, বা সেই জন্য তাঁহার অনুতাপ হয় কি না, জানিবার জন্য অনেকবার প্রশ্ন করিয়াছি। প্রতি-বারেই একই উত্তর পাইয়াছি—"বিবাহ করিয়া ভুল করি নাই, জীবনে সুখ ও দুঃখ সমান ভাবেই ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি।"

পরদুঃখকাতরতা তাঁহার বড়ই প্রবল ছিল। কাহারও দুঃখ দেখিলে তিনি সহিতে পারিতেন না এবং যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের দুঃখের কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া, অনেকবার শত শত টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সাহায্যার্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। প্রতিবেশী দুঃখী ও গরিবের রোগের সময় নিজে পথ্য প্রস্তুত করিয়া রোগ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রদান করিতেন।

ধাত্রীকার্য্যে তাঁহার স্বাভাবিক কিছু অধিকার ছিল। সেই জন্য প্রসবকালে অনেকেই তাঁহাকে ডাকিত। তিনি অসুস্থ শরীরেও কতবার সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কত প্রসূতীকে সাহায্য করিয়াছেন! প্রসূতী নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিতেন না। আমার বর্ত্তমান কর্ম্মস্থলে শিক্ষিতা ধাত্রী বা স্ত্রী-চিকিৎসক নাই। দুইটী সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলার প্রসবসংক্রান্ত ব্যারাম হওয়াতে তিনি নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও বহুদিন ধরিয়া তাঁহাদের আবশ্যকীয় সেবা ও শুশ্রূষাদি করিয়া চিকিৎসার সাহায্য করিয়াছিলেন। ধাত্রী কার্য্যে তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার দেখিয়া, এই বিদ্যা ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার জন্য আমার কোন কোন ডাক্তার বন্ধু তাঁহাকে একাধিক বার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রন্ধনকার্য্যে তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ও অনুরাগ ছিল। বহু রকমের সুখাদ্য ও মিষ্টান্নাদি তিনি প্রস্তুত করিতে পারিতেন। নিজ হস্তে সে সকল রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। আবশ্যকীয় পাচক থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ হস্তে রন্ধন করিতেন।

সিলাইকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ পটুতা ছিল। গৃহে অনেকেরই পোষাকাদি তিনি নিজে প্রস্তুত করিতেন। তিনি অতি সুগৃহিণী ছিলেন। সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে নিযুক্তা থাকিয়া

যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

বিবাহিত জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সংসারের সকল ভার নিজে বহন করিয়াছেন। সাংসারিক কার্য্যে আমি নিতান্তই অক্ষম। অন্য দিকে আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম তাহাতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইত, এবং অনেক সময় মফঃস্বলেও গমন করিতে হইত। এই সকল কারণে আমি সংসার পরিচালন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই করিতে পারিতাম না। প্রতি মাসে কেবল বেতনের টাকাগুলি তাঁহার হস্তে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতাম। তিনি প্রকৃত গৃহকর্ত্রীরূপে সংসারের সকল ভার বহন করিতেন। সর্ব্বদাই অতিথি ও আত্মীয় স্বজনে গৃহ পূর্ণ থাকিত। এত লোকের সকল রকমের পরিচর্য্যা অতি নিপুণতার সহিত তিনি সম্পন্ন করিতেন। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি কেবল তাঁহার সন্তানদিগকেই প্রতিপালন করিতেন তাহা নহে, আমাকেও তিনি প্রতিপালন করিতেন। আমার শরীর, মন ও হৃদয়ের ভার তিনি বহু পরিমাণে বহন করিতেন। চিকিৎসার্থ কলিকাতাতে প্রায় দুই তিন মাস থাকিতে হইবে অনুমান করিয়া, এখানে আসিবার সময় আমার জন্য দুই মাসের সকল আয়োজন ও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কবেট্ বলিয়াছেন wife is the compensation of all troubles. আমার পক্ষে এই কথা অতীব সত্য। আহা, তাঁহার অভাবে সন্তানগণ মাতৃ-হীন হইল, আর আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইলাম! তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালবাসার বশে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিলোপ করিয়া সকলের সেবা করিতেন। কেবল আমার সম্বন্ধে ও তাঁহার সন্তানদের সম্বন্ধেই তিনি এই রূপ করিতেন তাহা নহে, অপর অনেকের সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যবহার নিঃস্বার্থ স্নেহে পূর্ণ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে বহু লোকের নিকট হইতে আমি চিঠি পাইয়াছি—প্রায় সকলেই তাঁহার স্নেহশীলতা ও সরলতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আপনাকে ভুলিয়া অপরকে সুখী করিবার এমন অপার্থিব স্পৃহা অল্প লোকেরই দেখিয়াছি। আর কপটতা ও প্রদর্শনস্পৃহা কখনও তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আমার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইবে, এই কথা তিনি বহুকাল হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন, এবং এই বিশ্বাস চির দিন তাঁহার অক্ষুণ্ণ ছিল। ক্রমে ক্রমে যখন তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে লাগিল, তখন তিনি এই কথা অনেক সময়ই বলিতেন। কথাটা আমার ভাল লাগিত না বলিয়া আমি শুনিয়াও তাহা শুনিতাম না। অবশেষে এক দিন তাঁহাকে বলিলাম—"তুমিতো জান আমি সংসারকার্য্যে একেবারে অক্ষম, আর বুলু (মধ্যমা কন্যা) রুগ্ন, তুমি চলিয়া গেলে কে এ সংসারের ভার বহন করিবে? খোকা (বড় পুত্র) উপযুক্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবার পরে, তাহার উপরে সকল ভার দিয়া উভয়ে একত্রে পরলোকে গেলে কি ভাল হইত না?" তিনি শুনিয়া বলিলেন—"সেইরূপ হইলে তো ভালই হইত। কিন্তু সংসারে সেইরূপ কদাচিৎ ঘটে তোমাকে এইরূপ ভাবে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া আমার বড়ই কষ্ট হয়। কিন্তু কি করিব, সবই বিধাতার ইচ্ছা। আমি আগে গিয়া তোমার জন্য পরলোকে ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিব"। হায়, তাঁহার সেই অভিলাষই পূর্ণ হইল!

গত ১৩ই মার্চ্চ রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় হঠাৎ তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া চারি মিনিটকাল তীব্র যাতনা ভোগ করিয়া তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া খোকাকে (বড় পুত্র) বুকে ধরিয়া বলিলেন—"কিছু আর বলা হইল না।" আহা, কি কথা বলিবার ছিল তাহা আর জানিতে পারিলাম না! আর সে যাতনা কতই না তীব্র, যাহাতে তিনি চারি মিনিটের মধ্যেই দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই যাতনা ভোগ করিয়া যেন আমিও এ দেহ ত্যাগ করিতে পারি।

এমন কখনও কখনও ঘটিয়াছে যখন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহার মনে ক্লেশ দিয়াছি। সেইরূপ অপরাধের জন্য যখনই ক্ষমা চাহিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি তাঁহার উদার হৃদয়ে কিছুমাত্র বিরক্তির সঞ্চার হয় নাই। তিনি কখনও আমাকে একটীও কঠোর কথা বলেন নাই। চিরদিনই তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। তত্রাপি নিজ অপরাধের জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে; শেষ সময়ে যে তাঁহার নিকট আন্তরিক ক্ষমা চাহিতে পারিলাম না, সেই জন্য হৃদয়ে বড়ই ক্লেশ হইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আমি সোনপুরে ছিলাম। গত ১৩ই মার্চ্চ (যে রাত্রিতে প্রমীলার মৃত্যু হয়) এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিলাম। যেন কোথায় যাইতেছি। পথে বামদিকে ভীষণ গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখি একটা বড় গাছ হইতে এক ভয়ঙ্কর সর্প ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া নামিয়া আসিতেছে। দেখিয়াই ভয়ে আমি পলায়ন করিতে লাগিলাম। কত ঝোপ কত জঙ্গল পার হইয়া এক মন্দিরের বারেন্দা দিয়া ছুটিতে ছুটিতে এক সেতুর উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসিয়া মনে হইল যেন সেই ভীষণ সর্প দেবতা হইয়া গেল। পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখিলাম সেই দেবতার সম্মুখে প্রমীলা তাঁহার অপূর্ব্ব স্বর্গীয় রূপে মণ্ডিতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এবং দেবতার সহিত কথা বলিতেছেন। তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইল যে প্রমীলার সহিত দেবতার সদ্ভাব হওয়াতে ভয়ের কারণ দূর হইয়া গিয়াছে। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে। ১৪ই মার্চ্চ প্রাতে বন্ধুদিগকে এই স্বপ্নের কথা বলিলাম, কিন্তু কেহই এই স্বপ্নের অর্থ বুঝিতে পারিল না। ১৪ই মার্চ্চ সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হইল না। শেষ রাত্রিতে বোধ হয় আধ ঘণ্টা কাল সামান্য নিদ্রা হইয়াছিল—তখন দেখিলাম প্রমীলা আমার নিকট আসিয়াছেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ১৫ই প্রাতে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম।

এখানে আসিয়া এক দিন আমার প্রাণে এই কথাটী প্রকাশিত হইল যে, স্বপ্নদৃষ্ট সেই ভীষণ সর্প আর কিছুই নহে, স্বয়ং মৃত্যু। তাহার একটী রূপ অতীব ভীষণ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে দেবতা। প্রমীলা মৃত্যুর সেই ভীষণতাকে অতিক্রম করিয়া সেই দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয়রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহাতেই মৃত্যুভয় দূর হইয়া গিয়াছে। মৃত্যু যে অমৃতের সোপান, এই স্বপ্নের ভিতর দিয়া সেই অপার্থিব সত্য আমার নিকটে প্রকাশিত হইল। এখানেও প্রমীলা আমার ধর্ম্মজীবনের সহায়।

প্রমীলার আর একটী অপূর্ব্ব গুণ ছিল। এমন কতক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে দেখা গিয়াছে যে, তিনি পারলৌকিক আত্মাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন। কখনও কখনও পরলোকগত আত্মারা তাঁহার হস্ত অবলম্বন করিয়া automatic writing দ্বারা তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—এবং পরবর্ত্তী ঘটনাতে সেই লেখার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

আমার প্রকৃতি বড়ই দুর্ব্বল। প্রমীলার অপার্থিব ধর্ম্মভাবের সাহায্য পাইয়াও, আর পুনঃ পুনঃ পরম দেবতার প্রকাশ দেখিয়াও, সম্পূর্ণরূপে আমি প্রভুর অধীনতাকে বরণ করিতে পারি নাই। অনেক দিন হইল অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম যে, বিষয়-ভোগের মোহ আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। নানা কল্পনার আকারে সেই বিষয়মুগ্ধতা আমার হৃদয়রাজ্যকে আচ্ছন্ন করিতেছে। হৃদয়-দেবতার বারম্বার সুস্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও সেই বিষয়মোহ আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই! তাহাতে প্রভুর সহিত আমার একটি বিচ্ছেদ ঘটিয়া রহিয়াছে। কত প্রতিজ্ঞা, কত সঙ্কল্প, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, লজ্জা ও অনুশোচনাতে আমি ম্লান হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু এই পাপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি নাই। সেই জন্য অনেক

সময়েই মনে হইয়াছে গুরুতর আঘাত ভিন্ন এই মোহ কাটিবে না—এ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না। যখনই সেই কথা মনে হইয়াছে, তখনই ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কাতে আমার চিত্ত ভীত হইয়াছে। প্রমীলার স্বাস্থ্য যতই ভাঙ্গিতে লাগিল, ততই সেই আশঙ্কা আমার প্রাণকে আকুল করিতে লাগিল। আজ সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। প্রমীলার তিরোধানে আমার চিত্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে—হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হায়, এই আঘাতেও কি আমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে না? আমি কি আমার হৃদয়দেবতার পূর্ণ অধীনতা সমগ্র হৃদয় দিয়া বরণ করিতে পারিব না? প্রমীলা, প্রমীলা, চিরদিন কত ভাবেই তো আমাকে সাহায্য করিয়াছ—আজ কি আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবে না? যে দেবতা আমাদিগকে মিলিত করিয়াছিলেন, তাঁহারি সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে! তুমি কি আজ তাঁহার সহিত আমার মিলনের সাহায্য করিবে না?

হে আমার হৃদয়দেবতা, দয়া করিয়া কৈশোরে আমাকে দেখা দিয়াছিলে। হে আমার জীবনসঙ্গী, পথের মাঝে এ কি খেলা খেলাইলে? এখন প্রভু, আমাকে মোহজাল হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার চরণে আশ্রয় দাও। প্রমীলাকে তুমি কুশলে রাখিও, আর তাঁহার অসহায় সন্তানদিগকে মঙ্গলের পথে ধরিয়া রাখিও। তোমার ইচ্ছার জয় হউক।

ব্রাহ্মসমাজ

জন্মোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উনপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইবে। ইহাতে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে—

শনিবার, ১৪ই মে—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বক্তৃতা, বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি-এ, বিষয়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা।

রবিবার, ১৫ই মে—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা—আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় আলোচনা, বিষয়—ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের আবশ্যকতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডাক্তার কালীদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট্, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বি-এ, এবং শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এম-এ।

সোমবার, ১৬ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ)—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা—আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উপাসনা—আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি-এ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৪শে এপ্রিল দার্জ্জিলিং নগরীতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তিলতা অল্প কয়েক দিনের অসুখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৫ সে এপ্রিল ঢাকা নগরীতে ব্যারিষ্টার শৈলেশচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ১২ই মে কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত উমাপদ রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু শাস্ত্র পাঠ ও জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ৬ই মে কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বিশ্বেশ্বর সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া রেণুকা ও ফরিদপুর জিলা নিবাসী পরলোকগত ভারতচন্দ্র সরকারের মধ্যম পুত্র শ্রীমান গজেন্দ্রচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হ ইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় চারুপমা বসু সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম—

প্রথম বিভাগে—চারুপমা বসু, বিভাবতী সেন, কনকলতা চৌধুরী, বাসন্তী দাসগুপ্ত। দ্বিতীয় বিভাগে—মুক্তা দত্ত, লাবণ্যলতা রক্ষিত, বগলাসুন্দরী রায়।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইস্কুল পরীক্ষাতেও যে করুণাকণা দাসগুপ্ত সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও বিশেষ আনন্দের বিষয়: প্রথম বিভাগে—করুণা দাসগুপ্ত, স্নেহলতা গুহ (৯ম স্থান) লতিকা সেন (১০ম স্থান), সুকৃতী দাস, সুধাময়ী বানার্জ্জি, অশোকা সেনগুপ্ত, সুনীতিপ্রভা নাগ, কিরণবালা দে, নিরমল সেনগুপ্ত, প্রীতিময়ী ঘোষ, সন্ধ্যালতা দত্ত, বীণাপাণি ঘোষ, অণুপ্রভা নাগ, ইন্দিরা দাসগুপ্ত, নির্ম্মলা নাগ। দ্বিতীয় বিভাগে—লীলা বসু, মীরা ঘোষ, রেণুবালা রায়, রেণু সেন, অমিয়বালা সেনগুপ্ত।

আনন্দময়ী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। বার্ষিক কার্য্য বিবরণ হইতে জানা যায় বিগত বর্ষে সর্ব্বসমেত ৭০৩৩ জন রোগী হইয়াছিল। তন্মধ্যে পুরাতন রোগীর সংখ্যা অর্থাৎ যাহারা একাধিক বার উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৪৫৯২। এই সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ২৫৯২ জন অধিক হইয়াছে। মিউনিসিপাল ডোম ও মেথরের সংখ্যা ২৪৫ জন। ঔষধ বিতরণ ভিন্ন রোগীদিগের ১০৯৪ জন দরিদ্রকে, সাগু, বার্লি মিশ্রি প্রদান করা হইয়াছে। এই ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কোন কোন ব্যক্তি পৃথক সাহায্য করিয়াছেন। অল্প দিনের মধ্যে সহরে এই প্রতিষ্ঠানটী সুপরিচিত হইয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি ও বার লাইব্রেরী হইতে এবং আনন্দময়ী ষ্টেট হইতে নিয়মিত সাহায্য পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে সাময়িক দানও কিছু সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু স্থানীয় সাহায্য যথেষ্ট নহে।

এ বৎসর আনন্দময়ী দাতব্য ঔষধালয়টী পঞ্চম বৎসরে উপনীত হইল। বিদেশেও সহানুভূতিকারক বহু সহৃদয় ব্যক্তি বাস করিতেছেন। তাই সম্পাদক তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। যথাসাধ্য সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে—শ্রীমন্মথমোহন দাস, সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, বরিশাল।

আমরা আশা করি এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটিকে সুন্দরতর করিবার জন্য সকলেই সাহায্য করিবেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩১ সে বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি-এ,

Registered N0 65.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
৪র্থ সংখ্যা। | 30th May, 1927. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে পবিত্রস্বরূপ পুণ্যময় দেবতা, তুমি এ সংসারে তোমার পূর্ণ পবিত্রতার রাজ্য সংস্থাপনের জন্যই নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছ। তুমি শুদ্ধমপাপবিদ্ধং; তাই বিন্দুমাত্র পাপ যাহাতে এখানে স্থান না পায়, তাহার জন্য তুমি পাপের সহিত সন্ধি সহ্য করিতে পার না। আমরা দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেক সময় সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হই। কিন্তু তুমি কিছুতেই তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে দেও না—নিয়ত উচ্চতর আদর্শ উপস্থিত করিয়া, তাহার জন্যই ব্যাকুল করিয়া তোল। জীবনের কোনও অবস্থাতেই চিরতৃপ্তি, চিরবিশ্রাম, রাখ নাই। এক তোমার অনুসরণেই আনন্দ ও কল্যান নিহিত রাখিয়াছ; তোমার পূর্ণতার দিকেই সকলকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছ। অনন্ত উন্নতির পথে গতিই সকলের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছ। তাই, যখনই আমরা সে পথ পরিত্যাগ করি, তখনই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হই, বেদনা ও লাঞ্ছনা আসিয়া সে পথকে রোধ করে, কণ্টকাকীর্ণ করিয়া ফেলে। তবুও সকল সময় আমাদের সহজে চৈতন্যোদয় হয় না—অনেক সময় ঠেকিয়াও শিখি না। তখন তুমি গুরু দণ্ডেরই ব্যবস্থা কর; কিন্তু কিছুতেই তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না, একেবারে মৃত্যুর মধ্যে ডুবিতে দেও না। ইহাই ত আমাদের আশা। তোমার এত করুণা না থাকিলে যে আমরা কোন্ আবর্ত্তে যাইয়া ডুবিতাম কে জানে? হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা দেখিতেছ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর। আমরা যেন কোনও প্রকারেই পাপের সঙ্গে সন্ধি করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ না করি। সর্ব্বদা তোমার পূর্ণ পবিত্রতার দিকেই যেন আমাদের গতি থাকে; আমরা যেন সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন হইয়া চলিতে পারি। তোমার পূর্ণ পবিত্রতার রাজ্যই আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার পবিত্র ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

ফাঁকি চলেনা—সংসারে অনেক মেকী জিনিষ চ'লে যায়—অনেকে মনে ভ'বে এক, কাজে করে অন্যরূপ; উদ্দেশ্য এক, বলে অন্য কথা। চায় স্বার্থ সুখ, দেখায় নিঃস্বার্থ ভাব। তাতে অনেক সময় লোকের চোখে ধূলি দেওয়া যায়—মনের ভাব লুকিয়ে মান প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, স্বার্থ সাধন করা যায়। কিন্তু মেকী জিনিষ অনেক দিন চলে না; অনেক দিন লোকের চক্ষে ধূলি দেওয়া চলে না—মিথ্যা প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে। কিন্তু যে পথে আমি চলেছি, এ পথে একটুও ফাঁকি চলে না। এখানে যে লুকিয়ে একটু আরাম ক'রে নিব, একটু স্বার্থ সাধন ক'রে নিব, তা চলে না। বিশ্বতশ্চক্ষু যিনি, তাঁর দৃষ্টি তোমার অন্তস্তল পর্য্যন্ত পৌঁছায়। মানুষ যাহা জানে না, অন্তরঙ্গ বন্ধু যাহা বোঝে না, আমি নিজেও অনেক সময় যা ধর্‌তে পারি না, তাঁর চক্ষু সেখানেও রয়েছে। তুমি মানুষকে ভুল বুঝাতে পার, কিন্তু অন্তর-দেবতাকে ফাঁকি দিতে পার না। এ পথে চল্‌তে হ'লে তীক্ষ্ণ আত্মদৃষ্টি চাই; অভিসন্ধি বিশুদ্ধ থাকবে, উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প, ভাব, চিন্তা, কার্য্য সবই পবিত্র হবে—প্রতি পদে তাঁর দিকে চেয়ে চল্‌তে হবে। যদি পদস্খলন হয়, তাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে সমর্থন করবে না; তাঁর চরণে অকপটে তা স্বীকার করবে, অশ্রুপাত করবে। দয়ার নিধি তিনি; তাঁর দয়া ও প্রেমে নির্ভর করবে; কিন্তু প্রবঞ্চনা করবে না। এ পথে একটুও ফাঁকি চলে না।

চল্‌তে থাকি—তাঁর নাম নিয়ে, তাঁর প্রেমের টানে, বাহির হ'য়েছি। আমি জানি না, কাল কোথায় যাব, কাল কি ভাবে থাক্‌ব। আমি জানি না, সম্মুখে কোন বিপদ্ আছে, কোন্ খানা আছে, কোন্ গর্ত্ত আছে। আমি জানি না, কে আমাকে আদর কর্‌বে, কে অনাদর কর্‌বে; কোন্ প্রিয়জন আমাকে আপনার ব'লে গ্রহণ কর্‌বে, কোন্ প্রিয়জন উপেক্ষা দেখিয়ে আমাকে পীড়িত কর্‌বে। আমি জানি না, কাল আমার আহার জুটবে কি না, মাথা রাখ্‌বার স্থান থাক্‌বে কি না। তবুও আমি যখন তাঁর নাম নিয়ে বে'র হয়েছি, আমি চ'লে যাব। আমার দৃষ্টি তাঁর দিকে। তোমরা যে কি সাবধানতার কথা বল, তা আমি বুঝি না। জানি আমি দুর্ব্বল, মলিন, তবুও তাঁর নাম পেয়েছি, তাঁর ডাক শুনেছি; তাই আপন মনে চলেছি। তোমরা আমাকে যাহা বল না, আমি চল্‌বই। প্রতি পদে বিপদ্ আস্‌তে পারে, তা ভাব্‌ব না, এগিয়েই যাব; তাঁর নাম নিয়ে, তাঁর বাণী শু'নেই চল্‌ব। কেবলই এগিয়ে যাব। তাঁর নাম আমার সম্বল; তাঁর নাম আমার সম্পদ্। তাঁর করুণা আমার আশ্রয়। তিনি যে ভাবেই রাখুন, আমি ফলাফল না ভেবে চ'লে যাব। তাঁর নাম গেয়ে চ'লে যাব। তাতেই আমার কল্যাণ; মৃত্যুতেও আমার অমৃতলাভ।

ভিখারী—দ্বারে ভিখারী এসেছে,—ক্ষুধায় পীড়িত হ'য়ে এসেছে—তাকে বঞ্চিত ক'রো না। একটি পয়সা দাও; এক অন্ন দাও; একটু করুণার দৃষ্টি দাও। ভিখারীকে ফিরালে প্রভু যে ফিরে যাবেন। প্রেমের ভিখারী ত তোমার নিকট অন্ন চায় না, অর্থ চায় না, চায় একটু প্রীতি, একটু সহানুভূতি, একটু স্নেহের দৃষ্টি। তাহাও দিতে পার না? সে এল তোমার কাছে, কত প্রেম নিয়ে, কত স্নেহ নিয়ে; তুমি তাকে আদর কর্‌লে না, দুটো কথা বল্‌লে না; সে নিরাশ হ'য়ে চ'লে গেল! সে কত দুঃখ বেদনার ভার বহিতেছে! আর সে পারে না। সে এসেছিল, তোমার কাছে সব কথা বল্‌বে; প্রাণের ভার লাঘব কর্‌বে। তোমার তা শুন্‌বার সময় হলো না! সে এসে ব'সে রইল, তুমি মুখ ভার ক'রে রইলে; একটা কথা বল্‌লে না, একটু হাস্‌লে না, সে উঠে চ'লে গেল। তাঁর প্রাণে আঘাত লাগল। অর্থের ভিখারী যে তাকেও ফিরাতে নাই; প্রেমের ভিখারী যে তাকে ফিরালে মহা প্রত্যবায় হয়। জগতে সব যাবে, এক প্রেম থাক্‌বে। এই প্রেম ল'য়ে প্রভু আমার ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ঘোরেন। তাঁকে প্রেম দিবে না? আর এই প্রেম নিয়ে সেও তোমার কাছে ভিখারীর বেশে এল; একটু আদর কর্‌বে না? প্রেমের অপমান সয় না। ভিখারী হ'য়ে যারা এসেছে, প্রেমের ভিখারী যারা, তাদের ফিরিয়ে দিও না। কত ব্যথা যাদের, একটু স্নেহ, একটু সহানুভূতি যারা চায়, তাদের স্নেহ ভরে আদর ক'রো। ভিখারীকে ফিরালে প্রভুও ফিরে যাবেন।

চিন্তার বিষয়—বর্ত্তমান সামাজিক জীবনে যে ধর্ম্মানুরাগ ও জীবনের মহৎ লক্ষ্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত শিথিলতা এবং সাংসারিকতার প্রাবল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমরা গত সংখ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মই ধর্ম্মসমাজের প্রাণ। তাহা যদি প্রধান স্থান অধিকার না করিয়া দ্বিতীয় স্থানে যাইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহাতে যে কালে সমাজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইতে পারে, উহা যে প্রাণঘাতী হইতে পারে, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা একটা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি সামাজিক জীবনেও, জোয়ার ভাটা আছে—চিরদিনই সমভাবে উচ্ছ্বাসময় জীবনপ্রবাহ আশা করা যায় না। যদি স্রোত রুদ্ধ না হইয়া যায়, তবে ভাটার পর জোয়ার আসিবেই, সাময়িক অবসাদ ও শিথিলতার অন্তে নূতন উৎসাহ উদ্যম, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, অনিবার্য্য রূপেই আসিবে। আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমগ্র চেষ্টা ও যত্ন যখন সেই মূল লক্ষ্য সাধনের দিকেই ধাবিত, তখন এ বিষয়ে আমাদের নিরাশা পোষণ করিবার কোনও হেতু নাই—বর্ত্তমান অবস্থায় ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে যে আমাদের আরও অনেক করিবার আছে, অধিকতর চেষ্টা যত্ন আগ্রহের আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা কোনও প্রকারেই বর্ত্তমান অবস্থায় আত্মতৃপ্ত থাকিয়া উদ্যমবিহীন ভাবে জীবন যাপন করিতে পারি না, স্রোতে ভাসিয়া চলিতে পারি না। তথাপি ইহাকে এখনও আমরা বিশেষ চিন্তার বিষয় বলিয়া মনে করি না। কেন না, এদিকে এখনও সমাজের প্রধান দৃষ্টি আছে। অবশ্য, অধিকাংশ লোকের মধ্যে সাংসারিকতার প্রাবল্য ও ধর্ম্মানুরাগের অল্পতা ঘটিলে, ক্রমে ধর্ম্মপ্রবাহ ব্যাহত হইয়া সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা যে একেবারেই অসম্ভব, কখনও সে কথা বলা যায় না। কিন্তু স্রোত যাহাতে বন্ধ না হয়, উৎসের সঙ্গে যোগ যাহাতে অব্যাহত থাকে, এখন পর্য্যন্ত তাহার যথেষ্ট আয়োজন রহিয়াছে। তাই স্রোত একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়ার কোনও আশঙ্কা অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। এক দিন প্লাবন আসিয়া সকল বাধা বিঘ্ন ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, সমস্ত ডুবাইয়া দিবে, সাংসারিকতা লজ্জিত হইয়া মাথা লুকাইবে। সাংসারিক সুখের মোহ চিরদিন থাকে না। তাহা দূর করিবার আয়োজন সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যেই রহিয়াছে,—সে ঘোর এক দিন না এক দিন ভাঙ্গিবেই, নিতান্ত নিদ্রাভিভূতেরও চৈতন্যোদয় হইবেই। বিশেষতঃ উহা ব্যক্তির পক্ষে যতটা অনিষ্টকর, সমাজের পক্ষে ততটা নয়; উচ্চ ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে যতটা, সাধারণ ভদ্র জীবনের পক্ষে ততটা নয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে অপর একটি বিপদের বীজ লুক্কায়িত আছে। উহাই অধিকতর মারাত্মক। সেদিকে দৃষ্টি না রাখিলে ক্রমে উহা বর্দ্ধিত হইয়া মহা অনিষ্টোৎপত্তির কারণ উপস্থিত করিতে পারে। সংসারটা যতক্ষণ ধর্ম্মের অধীন থাকে, ততক্ষণ উহা হইতে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। কিন্তু

উহা প্রধান স্থান অধিকার করিলে, ধর্ম্মের উপরে উঠিয়া গেলে, ধর্ম্ম ম্লান হয় বটে—তথাপি সাংসারিক নানা ঘটনার প্রভাবে অনেক সময় আবার ধর্ম্ম প্রবলও হইয়া উঠে। সাধারণতঃ মানুষ সংসারের জন্য ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইলেও, ধর্ম্মের বিরোধী হয় না, নীতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলে না। যতক্ষণ সাংসারিকতা এই সীমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ উহা মারাত্মক হয় না। কিন্তু যখন উহা স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিকৃত মোহে পরিণত হয়, তখন উহা সহজেই নীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিপজ্জনক হইয়া উঠে। কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা বাসনার শান্তি হয় না, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ইহার শুভ ফল এই যে, সুস্থ অবস্থায় আত্মা অল্পেতেই এই শিক্ষা লাভ করিয়া উক্ত পথ পরিত্যাগ করে এবং প্রকৃত তৃপ্তি ও সুখের পথ খোঁজে। সংসারের নানা ঘটনা সহজেই সুস্থ আত্মায় বৈরাগ্য জন্মায়—সংসার যে মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্যস্থানে থাকিতে পারে না, সে তত্ত্ব সহজেই বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু উদ্দাম প্রবৃত্তি মানুষকে ক্রমাগত লালসার পথেও চালিত করিতে পারে, অধিক হইতে অধিকতর ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের পশ্চাতেও ধাবিত করিতে পারে। বিচারহীন মোহগ্রস্ত মানুষ এই ভাবদ্বারা চালিত হইয়া, সহজেই নীতির বাঁধও ছিন্ন করিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ছুটিতে পারে। ইহাই উহার গুরুতর অনিষ্টকারিতা। অবশ্য, এই বিপদ নিবারণের জন্য বিধাতার বিধানে অন্তরে বাহিরে অনেক আয়োজন রহিয়াছে। মানুষ চিরকাল অবাধে এই পথে যে চলিতে পারে, তাহা নহে। তাহাকে এক দিন না এক দিন এই পথ পরিত্যাগ করিতেই হয়,—যে দেখিয়া না শিখে, তাহাকে ঠেকিয়া শিখিতেই হয়। তথাপি ইহা যে একটা গুরুতর বিপদ, ধর্ম্মজীবনের পক্ষে নিতান্ত ব্যাঘাতকর, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই রোগের বীজটিকে সমূলে ধ্বংস করিতে না পারিলে যে উহা কালে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নহে, সামাজিক জীবনেও, মারাত্মক বিষ ছড়াইয়া মহা বিনাশের কারণ হইতে পারে, সেকথা ভুলিয়া থাকা কোনও ক্রমেই সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে সকলের বিশেষ সতর্ক-দৃষ্টি রাখা একান্তই কর্ত্তব্য।

আত্যন্তিক সাংসারিকতা যখন নীতির সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, অন্যায় ভাবে সংসারের সুখ সুবিধা মান মর্য্যাদা প্রতিপত্তি লাভে কাহাকেও উত্তেজিত করে, তখন উহা যেমন নিজের পক্ষে তেমনি সমাজের পক্ষেও মহা অনিষ্টকর হইয়া উঠে। এই হেতু এ পথে বাধা দেওয়া সমাজের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ সমাজ-স্থিতির জন্যই ইহা আবশ্যক—ধর্ম্মসমাজ-রক্ষার পক্ষে ত ইহা আরও অধিকতর প্রয়োজনীয়। সকলেই যে সকল সময়ে সকল বিষয়ে উচ্চ ধর্ম্ম-ভাবের অধীন হইয়া, অথবা সাধারণ বিবেকের অনুশাসন মানিয়া চলিবে, তাহা সম্ভবপর নহে। যাহারা তাহা পারে না, তাহাদের জন্য সমাজের সাহায্য রহিয়াছে, সামাজিক লজ্জা ভয় শাসন রহিয়াছে। এই সকল লোককে সমাজই সুপথে পরিচালিত করে, মহা পতন ও বিনাশ হইতে রক্ষা করে। সমাজ এ বিষয়ে শিথিল হইলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই মৃত্যুর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তাই প্রত্যেক সাধারণ ভদ্র বা সভ্য সমাজেরই এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। ধর্ম্মসমাজ যে এ বিষয়ে অধিকতর জাগ্রত তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সমাজবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসমাজেও যে এই শ্রেণীর লোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তাহা অনিবার্য্য। কেহ কেহ ধর্ম্মের আবরণে তাহাদের অসদভিপ্রায় নিরুপদ্রবে সাধন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াও ধর্ম্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তবে জীবন্ত ধর্ম্মসমাজের মধ্যে তাহাদের দীর্ঘকালস্থায়ী অবস্থিতি সম্ভবপর নহে—অল্প দিনের মধ্যেই হয় তাহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, না হয় প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে। অনুকূল অবস্থা না পাইলে কিছুই বর্দ্ধিত হইতে পারে না, বাঁচিয়াও থাকিতে পারে না। সুস্থ শরীরে রোগের বীজ প্রবেশ করিলেও সহজেই বিনষ্ট বা বহিষ্কৃত হইয়া যায়,—বিস্তারলাভ করা দূরের কথা, অধিক কাল স্থায়ীও হইতে পারে না। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, অসদভিপ্রায় লইয়া গমন করিলেও সাধুজীবনের সংস্পর্শে কত দুরাচারী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সকল দেশের ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসেই তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজের অল্পদিনের ইতিহাসেও তাহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এখানে আসিয়া পাপী যে শুধু পরিত্রাণ পাইয়াছে তাহা নহে, সাধুত্বেও পরিণত হইয়াছে। ইহার সকলেই যে পূর্ব্বহইতে পাপের জ্বালাতে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া অনুতপ্ত চিত্তে ইহার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহাদের পরিবর্ত্তন ত সহজেই হইবার কথা; তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কৃতিত্ব থাকিলেও, ব্রাহ্মসমাজের বেশী কিছু হাত আছে বলা যায় না। আমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যের কথাই বলিতেছি। ইহার মধ্যে আসিয়াও অনেকের পাপবোধ জাগিয়াছে, নূতন অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, এবং তাহাতে সমস্ত দগ্ধ হইয়া কত জন কত সুন্দর পবিত্র জীবন লাভ করিয়াছে! কাহারও জীবনের কোনও পতনের কথা শুনিলে বন্ধুবান্ধবগণ তাহাকে লইয়া কি আকুল প্রার্থনাই না করিয়াছেন! সে প্রার্থনার ফলে কি পরিবর্ত্তনই না সংঘটিত হইয়াছে, কত বলই না সঞ্চারিত হইয়াছে! শুধু স্থূল ও প্রকাশ্য পাপ সম্বন্ধেই যে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা নহে। অনেক অতি সূক্ষ্ম গুপ্ত পাপও এই ভাবে বিতাড়িত হইয়াছে। পরস্পরের সাহায্যে ও সংস্পর্শে সকল জীবনেই মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র ভাবসকল ধিকৃত হইয়াছে, পবিত্রতার অতি উচ্চ আদর্শের পশ্চাতেই সকলে ধাবিত হইয়াছে। ধর্ম্ম যখন শুধু তত্ত্ব ও ভাবের রাজ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া কার্য্যগত জীবনে প্রবেশ করে, তখনই উহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সার্থকতা, এবং সেখানেই সমাজ বা মণ্ডলীর সহকারিতাও খুব বেশী। সে যাহা হউক, উক্ত অঙ্গের ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নহে। যে সকল লোক সে পথে যাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত নহে, তাহাদেরও ধর্ম্মসমাজের অঙ্গরূপে কতকটা ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইবেই। আর যাহারা ততটাও অগ্রসর নয়, তাহাদিগকেও অন্ততঃপক্ষে সাধারণ নৈতিক জীবন

যাপন করিতেই হইবে; তাহা না হইলে যে তাহারা কোনও ভদ্র বা সভ্য সমাজে থাকিবারই যোগ্য নহে—ধর্ম্মসমাজে থাকা ত দূরের কথা—সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাধারণতঃ সাংসারিকতা এই প্রকার ভদ্র জীবনের পরিপন্থী না হইলেও, উহার আত্যন্তিক অনুসরণে যে উক্ত সীমা লঙ্ঘনের যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহারও কিছু আভাস ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। উহা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ব্যাধি। কিন্তু উহা জাতীয় ব্যাধিতেও পরিণত হইতে পারে। একটা সমগ্র জাতি বা দেশও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে পারে—উহাকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে এবং দলবদ্ধ হইয়া উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান কালে এই ব্যাধি যে সকল জাতি ও দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, কেহই উহার হস্ত হইতে মুক্ত নহে, তাহা আমরা স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি। তথাপি এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও ধর্ম্মসমাজই কোথাও সাধারণ ভাবে উহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে বলা উচিত হইবে না। কোনও ধর্ম্ম সমাজই উহাকে প্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া চলিতেছে না, চলিতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া যে ধর্ম্মসমাজগুলি উহার আক্রমণের অতীত, তাহা কোনও মতেই বলা যায় না। সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তিগণ যদি উহার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে মূল দেহও কিছু পরিমাণে পঙ্গু হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর এই ব্যাধি বিস্তার লাভ করিয়া যদি সমাজসমষ্টির অধিকাংশকেই আক্রমণ করে, এবং কালে উহা পরিচালকবর্গকেও স্পর্শ করে, তাহা হইলে মর্ম্মস্থানে আক্রান্ত হইয়া উহার জীবন বিনষ্ট হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়। হয়ত ততটা হইতে পারিবে না; মর্ম্মস্থান আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই প্রাকৃতিক নিয়মে জাগ্রত জীবনীশক্তি সবলে কতক অঙ্গ বর্জ্জন করিয়াও আত্মরক্ষা করিবে। যাহা হউক, সুদূর ভবিষ্যতে প্রবেশ করিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ততটা আশঙ্কা না থাকিলেও যে ধর্ম্মসমাজেরও এই ব্যাধি হইতে যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই আমরাও যে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহি, ইহাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর চিন্তার বিষয়। ইহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্যন্তিক সাংসারিকতার মোহে, সহজে অর্থ প্রতিপত্তি লাভের আশায়, ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ধর্ম্ম ও নীতি বিসর্জ্জন দেওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে—ধর্ম্ম সমাজের আশ্রিত কোনও লোকও ইহা করিতে পারে। পরিতাপের বিষয়, আমাদের সমাজমধ্যে যে এরূপ কোনও লোক নাই, —তাহাদের সংখ্যা যত নগণ্যই হউক না কেন—এ কথা ত আর আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না। ইহা নিতান্ত লজ্জা ও দুঃখের বিষয় হইলেও, যদি রোগের প্রথম লক্ষণেই সমাজ ইহাদিগকে রোগমুক্ত করিতে পারিত, পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে তত চিন্তার বিষয় ছিল না। চারিদিকের বিষাক্ত হাওয়াতে যে রোগবীজ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা কঠিন। একমাত্র তাহারাই মুক্ত থাকিতে পারে যাহারা ধর্ম্মের টীকা লইয়া সর্ব্বব্যাধির আক্রমণের অতীত হইয়াছে। সকলেই সেরূপ ধর্ম্মপ্রাণ হইবে আশা করা যায় না। সুতরাং অনেকের পক্ষে ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু সমাজদেহের কোনও অঙ্গ উক্ত ভাবে আক্রান্ত হইলেও, জীবন্ত সমাজ তাহাকে সহজেই তাহা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ,—তাহাতেই সমাজের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির পরিচয়। তৎপরে, তাহা অবিলম্বে সাধিত হওয়া সম্ভবপর না হইলেও, যদি রোগ যাহাতে বিস্তারলাভ না করিয়া হ্রাসপ্রাপ্তই হয়, উক্ত ব্যক্তি যাহাতে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া মাথা হেঁট করিয়া আপনার সংশোধনেই নিযুক্ত থাকে, কাহারও নিকট হইতে কোনও প্রশ্রয় না পায়, আর বন্ধুবান্ধবগণ যাহাতে আকুল প্রাণে তাহার সংশোধনের জন্যই ধাবিত হয়, তাহাকে লইয়া প্রার্থনাদি করিতেই নিযুক্ত হয়, সমাজে সেরূপ ব্যবস্থাই থাকে, তবেও বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। সে যে অচিরেই পরিবর্ত্তিত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সে সমাজের জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণই থাকিবে, কিছুতেই তাহার অনিষ্ট সাধিত হইবে না। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি দেখিতে পাওয়া যায়, সে গর্ব্বিতভাবে উন্নত মস্তকে সমাজমধ্যে বিচরণ করিতেছে, তাহার নীচ বাসনা চরিতার্থ করিবার পক্ষে সাহায্য হইবে বলিয়া, সমাজের নাম ও পদ গ্রহণ করিবার জন্য অধিকতর লালায়িত হইতেছে, মিথ্যা আবরণ-রূপে অবলম্বন করিয়া উহার গৌরব নষ্ট করিতে, লোকচক্ষে উহাকে হেয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না, আর তাহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণও, অযথা মোহবশতঃ তাহার সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহার দোষ ঢাকিতে বা সমর্থন করিতে যাইয়া, সে বিষয়ে তাহাকে সাহায্যই করিতেছে, না জানিয়া এই প্রকারে তাহার সর্ব্বনাশই সাধন করিতেছে, যাহারা তাহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা না করিয়া, বাস্তবিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই, ব্যথিত হৃদয়ে সংশোধনের কথা বলিতেছে, নিজের ও সমাজের কল্যাণের জন্য একটু পশ্চাতে থাকিতে পরামর্শ দিতেছে, তাহাদিগকেও সকলে শত্রুই মনে করিতেছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে তাহার ও সে সমাজের অবস্থা নিতান্তই আশঙ্কাজনক, বড়ই শোচনীয়। ইহা যে কঠিন ব্যাধিরই লক্ষণ, ইহাতে যে স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির ক্ষীণতাই সূচিত হয়, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। সময়ে সতর্ক না হইলে যে কালে এ রোগ কতটা বিস্তার লাভ করিতে পারে, সমাজদেহকে কিরূপ পঙ্গু করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা প্রত্যেক কল্যাণকামী ব্যক্তির গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদের সমাজদেহের কোনও অংশেই—যত ক্ষুদ্র সীমায়ই আবদ্ধ থাকুক না কেন—এই রোগ প্রবেশ করে নাই, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিলে আমরা খুবই সুখী হইতাম। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, আমরা তাহা বলিতে পারিতেছি না,—ধীরে ধীরে অলক্ষিতে উহা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কাহাকে কাহাকেও আক্রমণ করিতেছে। অপর কেহ কেহ, ভ্রান্ত স্বজনপ্রীতি বশতঃই হউক আর যে কারণেই হউক, বিচারবিহীন হইয়া সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এবিষয়ে সাহায্যও করিতেছে। এদিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট

হয় নাই বলিয়া মনে হয়। এরূপ একটী গুরুতর বিষয়ে আর উদাসীন থাকা কোনও ক্রমেই সমীচীন বোধ হইতেছে না। তাই সকলে বিষয়টা ভাল করিয়া চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আমাদের মনে যে গুরুতর আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, তাহা কতটা সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেরূপ রোগের লক্ষণ যদি ক্ষুদ্রাকারেও দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা বিদূরিত করিবার জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি এখন হইতেই সাবধানতা অবলম্বন না করি, তবে ভবিষ্যতে উহার গতিরোধ করা যে কত কঠিন হইবে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। পাপের সঙ্গে কোনও প্রকারেই সন্ধি করা বিধেয় নহে। মোহ বা চক্ষুলজ্জা বশতঃ যদি পাপকে পাপ বলিতে কুণ্ঠা উপস্থিত হয়, তবে যে অচিরে পাপও নির্দ্দোষ বলিয়া গর্ব্বিতমস্তকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিবে, লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় থাকিবে না, তাহাতে কি আর কোনও সন্দেহ আছে? আর তাহা করিলে যে আমরা শুধু সমাজের নয়, আমাদের প্রিয়জনদেরও, সর্ব্বনাশই সাধন করিব, তাহা কি আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে? আমরা যেন আর প্রকৃত কল্যাণ বিষয়ে অন্ধ ও উদাসীন না থাকি। সর্ব্বোপরি পুণ্যস্বরূপের পবিত্র আসনকেই প্রত্যেক জীবনে ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। আমরা যেন কাহারও মধ্যেই নীতির শিথিলতাকে বিন্দুপরিমাণেও প্রশ্রয় না দেই! তিনি আমাদিগকে বল ও শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক।

নববর্ষের আকাঙ্ক্ষা।

আজ নববর্ষের উৎসব; উৎসবের দেবতা আমাদিগের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত এবং প্লাবিত করিবার জন্যই এখানে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আনন্দময়, তিনি সৃষ্টির আনন্দে এবং আপনার প্রেমের আনন্দে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, আমরাও নিরন্তর আনন্দে এই সংসারে বাস করি। তাই তিনি বিশ্বভুবন সৌন্দর্য্যে, সঙ্গীতে, রসে এবং প্রেমে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের স্বাধীন করিয়াছেন; আমরা তাই অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী হইয়া, তাঁহার আদেশ ও মঙ্গল-বিধি লঙ্ঘন করিয়া, সুখের সংসারে দুঃখ ও অকল্যাণ ডাকিয়া আনি; এই জন্য অনেক সময় আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখেই দিন কাটিয়া যায়। প্রেমময় দেবতা আমাদের সে দুঃখ ত সহিতে পারেন না; সন্তানের দুঃখে যেমন পিতার প্রাণে আঘাত লাগে, তেমনি আমাদের দুঃখে প্রেমময়ের প্রেমে আঘাত লাগে। তাই তিনি আমাদের আনন্দ বিতরণ করিবার জন্যই সময় সময় এক একটা উৎসবের আয়োজন করেন। এই নববর্ষের উৎসব যখন আনন্দেরই উৎসব, তখন, উৎসবের দেবতার নিকট জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের আকাঙ্ক্ষাই জানাইব।

এই নূতন বৎসরে কি পাইলে আমরা পরম আনন্দ লাভ করিব? এই প্রশ্নটি অন্তরে লইয়া, উদ্যানের বৃক্ষগুলির পানে তাকাইয়া, মনে কোন্ আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়? বৃক্ষগুলির মলিন জীর্ণ পুরাতন পত্র ছিল, সকলই ঝরিয়া গিয়াছে। উহার শাখা-প্রশাখা কেমন সবুজ রঙ্গের নবপত্রে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে! আমাদের আনন্দময় পিতা এই নূতন বৎসরে যদি আমাদের জীবনের পুরাতন কু-অভ্যাস, পুরাতন মলিন ভাব, পুরাতন আসক্তি, পুরাতন স্বার্থপরতা দূর করিয়া, নব নব আধ্যাত্মিক ভাবে হৃদয় সুশোভিত করিয়া তোলেন, তবেই আমাদের দুঃখ চলিয়া যায়, অন্তরে নির্ম্মল আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সেই জন্যই এই উপাসনান্তে আমাদের পিতার নিকট কয়েকটি আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লাভ করিবার নিমিত্ত অন্তরের আকাঙ্ক্ষা জানাইব।

সর্ব্বাগ্রে আমরা বলিব, 'হে উৎসবের দেবতা, এই নূতন বৎসরে আমাদের জ্ঞানের উন্মেষ কর, নব নব সত্যে অন্তর সমুজ্জ্বল কর, তাহা হইলেই আনন্দের আর সীমা থাকিবে না।' বর্ত্তমান সময়ে আমরা যতই চারিদিকের অবস্থা উৎকৃষ্টরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতেছি, ততই গভীরভাবে অনুভব করিতেছি, জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। শুধু কি অসম্পূর্ণ? যদি বলি জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, তাহা হইলে কি অত্যুক্তি হয়? যে সকল সূক্ষ্মদর্শী ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের গূঢ় রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, ঐ শুনুন, তাঁহারা আমাদিগকে বলিতেছেন, হে ধর্ম্মলাভার্থী নর নারী, তোমরা বিশ্বাস কর, ভক্তি, নীতি ও সেবা যেমন ধর্ম্মের এক একটি অঙ্গ, তেমনি জ্ঞানও ধর্ম্মের একটি অঙ্গ। যে ধর্ম্ম জ্ঞান-বর্জ্জিত, যে ধর্ম্ম ভাবুকতা ও চিরপ্রচলিত সংস্কারে পরিপূরিত, যে ধর্ম্ম বিচারবিহীন, যে ধর্ম্ম অন্ধবিশ্বাসে সমাচ্ছন্ন, সে ধর্ম্ম আজ মানুষকে উন্নতির উচ্চ গিরিশৃঙ্গেও লইয়া যাইতে পারে, আবার কাল সেখান হইতে অবনতির নিম্নভূমিতেও নামাইতে পারে। জগতের ধর্ম্মসাহিত্য আমাদের কাছে কোন্ সত্য প্রকাশ করিতেছে? বর্ত্তমান সময়ের দ্বন্দ্বকলহ আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া কোন্ দৃশ্য দেখাইতেছে? আপনারা একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আপনারা একবার সম্মুখের দিকে চাহিয়া সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকলহ দেখুন; তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন,—মানুষগুলি জ্ঞানবিচার-বিহীন হইয়া চিরপ্রচলিত সংস্কারকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। ঐ ধর্ম্মের সাহায্যে যথার্থই তাঁহারা আশ্চর্য্য বিশ্বাস লাভ করিতেছেন, যথার্থই তাঁহারা কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ত্যাগের পথে চলিতেছেন; উপাস্যদেবতার প্রতি ভক্তিতে তাঁহাদের চোখের জল ঝরিয়া যাইতেছে; কিন্তু এই মানুষগুলিরই পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে কেহ কিছু নূতন সত্য প্রচার করুক দেখি, কেহ কোন নূতন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক দেখি, তাহা হইলে ঐ সকল ধার্ম্মিক লোক, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, আপন আপন উপাস্যদেবতার নামে উন্মাদ হইয়া, তাহাদের রক্তপাত করাকেই অতি বড় পুণ্য কার্য্য বলিয়াই মনে করিবেন। শুধু কি তাই? জ্ঞানবিচারবিহীন, অন্ধসংস্কারের বশবর্ত্তী লোকসকল

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষের উৎসবে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বনে লিখিত।

উপাস্য দেবতার নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে এবং তাহাকে ধর্ম্ম মনে করিতেও যে কুণ্ঠিত হন না, এ দেশে এমন দৃষ্টান্তেরও ত অভাব নাই। জ্ঞানবিচারবিহীন হইয়া, শুধুই ভাবুকতা ও গোঁড়ামি লইয়া ধর্ম্মসমাজে থাকিলে, আমরা সকলেই যে দ্বন্দ্বকোলাহলকে ধর্ম্ম মনে করিয়া প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে পারি, সে কথা বিস্মৃত হইলে মোটেই চলিবে না।

জ্ঞানবিহীন ভাবুকতাপ্রধান ও গোঁড়ামির ধর্ম্ম যেন পাহাড়ের উপরের আল্‌গা পাথরের ন্যায়। ঐ যে দেখিতেছ গিরিশিখরে রমণীয় প্রস্তরখানি, উহার সৌন্দর্য্যে শৈলশৃঙ্গ কেমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু ঐ পাথরখানি যে আল্‌গা; যখন ঝড় উঠিবে, তখন ঐ পাথরখানি নড়িবে, তাহার পরে জলস্রোত যখন প্রবাহিত হইবে, তখন ঠেলিতে ঠেলিতে উহাকে গিরিপৃষ্ঠের শেষ প্রান্তরেখায় লইয়া যাইবে, তাহার পরে নিম্নে উহার পতন হইবে, উহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। জ্ঞানবিহীন পুরাতন সংস্কারের ধর্ম্ম এই রকমই উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। আর জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সত্যে সুদৃঢ় যে ধর্ম্ম, তাহা গিরিপৃষ্ঠের গভীর মৃত্তিকায় প্রোথিত অটল প্রস্তরের ন্যায়; তাহা ঝড়েও নড়ে না, জলস্রোতেও ভাসিয়া যায় না। সেই সুগভীর ধর্ম্মই চিরদিন আমাদিগকে উদার ও উন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত রাখিতে পারে।

আপনারা সকলেই একবার চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, আমরা ব্রাহ্ম হইয়াও যদি বৎসরের মধ্যে পাঁচ খানা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ না করি, আমরা নির্জ্জনে বসিয়া যদি আত্মচিন্তায় ও ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া না থাকি; ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কি নিগূঢ় সম্পর্ক, ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য কি, সেই লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে হইলে আমাদের কি করা প্রয়োজন, প্রিয় সমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি,—এই সকল বিষয় ভাবিয়া যদি না দেখি; তবে কি প্রতিদিনের অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া শুধুই সঙ্গীত ও ঈশ্বরের স্তোত্র মুখে আবৃত্তি করিলে উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিব? তাহা পারিব না। সেই জন্যই নববর্ষের উৎসবে আমাদের দয়াময় পিতার নিকট প্রার্থনা করি, 'তুমি প্রকৃত জ্ঞানালোচনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত কর, নব নব সত্যে আমাদের হৃদয়কে সমুজ্জ্বল কর।'

আমরা আজ উৎসবের দেবতার নিকট আমাদের অন্তরের আর একটি আকাঙ্ক্ষা জানাইব। তিনি আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া বিনয় ও শ্রদ্ধায় জীবনকে সুন্দর করুন। আমি ত জ্ঞানের বিস্তর গুণগান করিলাম। কিন্তু একটি বৃন্তের দুইটি পুষ্পের মত যখন জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই জীবনে বিকশিত না হয়, ততদিন জ্ঞান হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হওয়াও অসম্ভব নয়। ধর্ম্মপথে অহঙ্কার ও মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার মতন শত্রু আর কি আছে? মহাত্মা যিশু যে বলিয়াছেন, "সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর" তাহার মধ্যে কি গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন আছে! ধর্ম্মপথে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা নত করিয়া, বিনয়ে নম্র হইয়াই, প্রবেশ করিতে হইবে। উঁচু মাথা, ফুলানো বুক, গর্ব্বিতহৃদয় মানুষের এ পথে প্রবেশের অধিকার কোথায়? হায়, আমরা ধর্ম্মসমাজের সাধনার্থী হইয়াও যদি জ্ঞানের, মানের, অর্থের, সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের, অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া উঠি, যদি সমবিশ্বাসী-দিগকেও মনে করি, ঐ সকল লোকেরা কিই বা জানে, কিই বা বোঝে; উহারা কেন আমারই মতের অনুসরণ করিবে না, তবে আর কি রূপে ভক্তিলাভের অধিকারী হইব? আমার ত মনে হয়, আমরা আত্মচিন্তা করি না, আপনাকে বুঝিতে পারি না, সেই জন্যই অহঙ্কারের উৎপত্তি। তুমি একবার আত্মচিন্তা কর ত, আপনার ভিতরে কি আছে না আছে ভাবিয়া দেখ ত! তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, যাহা তোমার থাকা প্রয়োজন তাহার তুলনায় অতি অল্পই আছে, তোমার যত বড় হওয়া আবশ্যক, তাহার তুলনায় তুমি কতই ক্ষুদ্র! জ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল, সকল বিষয়েই তোমার দৈন্যের কি কিছু অভাব আছে? তবুও দর্প কেন? আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের অহঙ্কার, যেন সাগরকূলে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ গণনা করার মতন। হায়, নির্ব্বোধ মানুষ; তুমি সমুদ্রসৈকতে দণ্ডায়মান হইয়া ঢেউ গুণিতে চাহিতেছ? তোমার বৃথা চেষ্টা; অসীম সাগরবক্ষে ঐ যে তরঙ্গের পরে তরঙ্গ উঠিতেছে, উহার কি শেষ আছে? উহার কয়টি তুমি গণনা করিবে? তেমনি মানুষ তুমি যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লইয়া অহঙ্কার করিতে চাহিতেছ, তুমি কি জান, জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ই অসীম সাগরের ন্যায়। তন্মধ্যে লক্ষ কোটি সত্য ও ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে। তুমি উহার কয়টিই বা আয়ত্ত করিতে পারিবে! কি রূপেই বা তোমার অহঙ্কার শোভা পাইবে?

মানুষ সব সহিতে পারে, কিন্তু অহঙ্কার সহিতে পারে না। তুমি আপনাকে বড় মনে করিয়া অন্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে, আপনার শক্তি তাহার উপরে খাটাইতে চাহিবে, তাহা সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, কত সময় আমাদের প্রবল অহংভাবের জন্যই সমাজে কলহের সৃষ্টি হয়। আর তাহার উল্টা দিকে, আমাদের হৃদয় যদি শ্রদ্ধা ও বিনয়ে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ দুই স্বর্গীয় বস্তু হইতে সমস্ত সমাজে এমন এক সৌন্দর্য্য, প্রীতি ও সদ্ভাবের সঞ্চার হয় যে, আমাদের সমাজের মুখশ্রী রমণীয় হইয়া উঠে, আমরা সকলেই প্রীতি ও সদ্ভাবে মিলিত হইতে সমর্থ হই, আমাদের সেই মিলনের মধ্যেই ঈশ্বরের শক্তি নামিয়া আসে এবং সেই শক্তিতেই ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্ম প্রচার এই উভয়ই অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। সেই জন্যই আজ প্রার্থনা করিব, 'হে উৎসবের দেবতা, তুমি আমাদের অহংভাব দূর করিয়া, শ্রদ্ধা ও বিনয়ে অন্তর পূর্ণ কর। আমরা যেন নম্রভাবে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া, যাঁহার জীবনে যে মহত্ত্ব আছে, তাহা যেন গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।'

আজ এই নববর্ষে উৎসবের দেবতার নিকট পবিত্রতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জানাইব। এ সংসারে পবিত্রতা কি স্পৃহণীয় সামগ্রী! ঐ যে সরোবরে শত শত পদ্ম ফুটিয়া আছে, উহাতেই যেমন জলরাশি সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়াছে; তেমনি পবিত্রতা ফুটিয়া উঠিলেই এই জীবন সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া যায়। হায়, এমনও ভ্রান্ত মানুষ আছে যে, জীবন আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে সুন্দর করিতে চায়, সেজন্য উপাস্যদেবতার স্তবস্তুতি করে, দুঃখীর

প্রভৃতি দয়াপ্রকাশেও প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু পবিত্রতা লাভের জন্য প্রবৃত্তিকে সংযত ও সুখস্পৃহাকে খর্ব্ব করিতে চাহে না! তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখে না, পবিত্রতা ভিন্ন সুন্দর জীবন অর্থশূন্য আকাশকুসুম; সে হইতেই পারে না। কেমন করিয়া হইবে? পবিত্রতাই সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; সেই পবিত্রতাকে ত্যাগ করিয়া সুন্দর হইবার আশা কি রকম আত্মপ্রতারণা! পবিত্রতা লাভ করিয়া কি আমরা শুধু সুন্দর হই? আমরা উহাতে সুখীও হই। যেদিন সমস্ত সময় পবিত্রতায় আমার হৃদয় ভরিয়া থাকে, আমি রাত্রিকালে শুইয়া আত্মচিন্তা করিয়া যদি দেখি, আমার অন্তরে কোন নিকৃষ্ট ভাব, মলিন চিন্তা অথবা হিংসা-বিদ্বেষ প্রবেশ করে নাই, তাহা হইলে কি সুখের নিদ্রায় রজনী প্রভাত হয়! আর যদি দেখি, দিনের মধ্যে কতবার আমার হৃদয় ম্লান হইয়াছে, কতবার আমি ক্ষুদ্র হইয়া নিকৃষ্ট স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা হইলে শুধুই অনুতাপ করিয়া চোখের জল ফেলিয়া সুখের নিশীথিনীকে দুঃখ ও অশান্তিতে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হয়। সেই জন্যই আজ প্রার্থনা করি, 'হে উৎসবের দেবতা, তুমি চিত্তকে পবিত্র এবং জীবনকে সুন্দর কর।'

সর্ব্বশেষে ভক্তিলাভের জন্য আমাদের যে সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা, তাহাই দেবাদিদেবের নিকট ব্যক্ত করিব। ভক্তির ন্যায় দুর্লভ সামগ্রী আর ত কিছুই নাই। ভক্তি ভিন্ন নরনারীর ধর্ম্মতৃষ্ণা আর কি কিছুতে নিবারণ হয়? নিবারণ হয় না বলিয়াই এ দেশের বিস্তর সাধক ভক্তির জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ভক্তির জন্য কোন প্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেই কুণ্ঠিত হন নাই। এই সংসারে লক্ষ প্রকারের সুখের আয়োজন রহিয়াছে, মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সেই সুখ উপভোগ করিতেছে। অথচ মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই; সে যত পায়, তাহার চেয়ে সহস্রগুণে অধিক চায়। মানুষ এতই পাইতে চায়, তাহার তুলনায় তাহার সমস্ত পাওয়া বস্তু অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়। মনে ত হইবেই; মানবাত্মার অনন্ত-উন্মুখীন গতি; মানবাত্মা জ্ঞান-প্রেম-সম্পন্ন এক অসীমসুন্দর পুরুষকেই পাইতে চায়। সেই চিরবাঞ্ছিত দেবতার জন্যই ত অন্তরাত্মা ক্রন্দন করিতেছে। এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াই বোধ হয় কবি গাহিয়াছেন—

"ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন
তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন"।

এই ক্রন্দন কে থামাইবে? কে চিরবাঞ্ছিত দেবতার সঙ্গে মানবাত্মার মিলন করিয়া দিবে? ভক্তি ভিন্ন মিলন করিয়া দিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। ভক্তিই আমাদিগকে সীমা হইতে অসীমের দিকে লইয়া যায়; ভক্তিই আমাদের হৃদয়কে বিগলিত করে; ভক্তিই আমাদের জীবনের ধারাকে প্রেমসিন্ধুর সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া দেয়। তাই বলি, ভক্তির তুল্য মহা-মূল্য সামগ্রী আর কি আছে?

ভক্তির অমৃত রসেই ধর্ম্ম সরস ও মধুময় হয়; ভক্তি ভিন্ন সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানই অত্যন্ত কঠোর। আমাদের যে উপাসনা মিষ্ট লাগে না, ঈশ্বরের নাম শুষ্ক মনে হয়, বিষয়াসক্তি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম নিতান্তই যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে—ইহার কারণই এই যে, আমাদের ভক্তি নাই। একটু প্রকৃত ভক্তি আসুক ত আমাদের মধ্যে, তাহা হইলে উপাসনায় রস পাইব, সংগ্রামে সুখানুভব করিব এবং আত্মত্যাগে ধন্য হইয়া যাইব।

ভক্তির সঙ্গে মধুর চিনির রসের তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। ঐ যে ময়রার দোকানে প্রকাণ্ড কড়াই ভরা চিনির রস, উহাই সকল দ্রব্যকে মিষ্টরসে পূর্ণ করিবে। এখন ত রসগোল্লাগুলিকে দেখিতেছ শুধুই ছানার ডেলা; উহা রসনায় রাখিলে মিষ্ট বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু অপেক্ষা কর, ঐ ছানার ডেলা যখন চিনির রসে সিক্ত করা হইবে, যখন সেই রস উহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অণুতে অণুতে প্রবেশ করিবে, তখনই উহা মধুর হইবে, তখন উহা রসনায় রাখিলে মিষ্ট রসে রসনা ভরিয়া যাইবে। তাই বলি, আমরাও ভক্তির অমৃতরসে যদি হৃদয়কে ডুবাইয়া রাখিতে পারি, যদি হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, অণুতে অণুতে ভক্তিরস প্রবেশ করে, তবে হৃদয় মধুর মধুর হইয়া যাইবে, আমাদের বাক্য, আমাদের ব্যবহার, আমাদের সমাজ, আমাদের উৎসব—সকলই মধুময় হইবে। শুধু কি তাই? এই ভক্তিরস পরিবারে লইয়া গিয়া যদি উহাতে স্ত্রীপুত্র প্রিয়জন, এমন কি, বন্ধুবান্ধব এবং ভৃত্য ও পরিচারিকাদিগের হৃদয়ও সিক্ত করিতে পারি, তবে সবই মধুময় হইবে, সমাজে ও পরিবারে সর্ব্বত্রই আনন্দের তরঙ্গ উঠিবে। তাই অদ্য আমরা সকলেই প্রার্থনা করি, 'হে আমাদের মধুময় দেবতা, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়, আমাদের গৃহ পরিবার আমাদের সমাজ ভক্তিতে মধুময় করিয়া দাও।'

উনপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন-পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—

৩১শে বৈশাখ (১৪ই মে) শনিবার—সন্ধ্যায় "৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা" বিষয়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ের ভিত্তিস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নে প্রকাশিত যে দুখানা ঘোষণা-পত্র পঠিত হইয়াছিল, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে তাহা জনৈক বন্ধু পাঠ করেন।

"অদ্য অষ্টাদশ শততম শকে উনপঞ্চাশৎ ব্রাহ্মসংবতের শেষে ও পঞ্চাশৎ ব্রাহ্ম সংবতের প্রারম্ভে মাঘের একাদশ দিবসে, শুক্লপক্ষে প্রতিপদ তিথিতে, আমরা বালক বৃদ্ধ নর নারী একত্র হইয়া পরমেশ্বরের মহৎ ও পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করিতেছি। এই ভিত্তির উপর যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে জাতি ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর নর নারী সপ্তাহে সপ্তাহে সম্মিলিত হইয়া একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। এখানে কোনও সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের পূজা হইবে না; কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থ অভ্রান্ত এবং

মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া গৃহীত হইবে না; কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অবলম্বিত হইবে না; অপরের সম্মানিত বা ভবিষ্যতে কাহারও দ্বারা পূজিত কোন দেব দেবী, অবতার বা মহাপুরুষের প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্ত্তি বা কোন প্রকার চিহ্ন স্থাপিত হইবে না। এখানকার উপদেশে সকল দেশের সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ বা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শিত হইবে; কাহাকেও উপহাস, বিদ্রূপ, নিন্দা বা অবজ্ঞা করা হইবে না। এখানে সকল দেশের সকল সাধুর ও সকল শাস্ত্রের উপদেশ হইতে সত্যসকল আদরে সংগৃহীত হইবে। এখানে নরনারীর সমান অধিকার রক্ষিত হইবে। যাহাতে নরনারীর মধ্যে পবিত্র সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়, দেশের কুরীতি দুর্নীতি সকল নিবারিত হয়, ন্যায় ও পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, এবং পরমেশ্বরের মহৎ নাম মহীয়ান্ হয়, এরূপ উপদেশসকল প্রদত্ত হইবে। আমরা এই সকল আশা করিয়া অদ্য এই মহৎকার্য্যের সূত্রপাত করিতেছি, ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ আমাদের সহায় হউক। সমাগত ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম স্বদেশী বিদেশী পরিচিত অপরিচিত সকলে শুভ ইচ্ছার দ্বারা আমাদের সাহায্য করুন।"

বাঙ্গালা ইংরাজী ও হিন্দি ভাষায় এই প্রতিষ্ঠাপত্র পঠিত হয়:—

"অদ্য ১২৮৭ সনের ১০ই মাঘ, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী একপঞ্চাশৎ ব্রাহ্মসংবতে আমরা একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার্থ এই মন্দির উৎসর্গ করিতেছি। অদ্যাবধি এই মন্দিরের দ্বার জাতি ও সামাজিক অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর মনুষ্যের জন্য উদ্ঘাটিত হইল। নর নারী, যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সকল শ্রেণীর লোক ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, যিনি আমাদের মুক্তির একমাত্র কারণ, তাঁহার পূজা করিবেন। এই মহান্ পবিত্র পরমেশ্বর ভিন্ন এখানে সৃষ্ট কোন জীব বা পদার্থের পূজা হইবে না, কোন নরনারীকে ঈশ্বর জ্ঞানে, ঈশ্বরের সমতুল্য জ্ঞানে, ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে, অথবা ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানে, ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা হইবে না। এই গৃহে চিরকাল স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহাতে মানব জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি পায় এবং ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয়, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এখানে যে উপদেশ, বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি হইবে, সে সকলই এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হইবে। ধর্ম্ম-পিপাসু মনুষ্যগণ প্রাণে প্রাণে ঈশ্বরকে যাহাতে জানিতে পারেন এবং সাক্ষাৎভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারেন, তাহাই ইহার লক্ষ্য ও চেষ্টা হইবে।

"এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা সুরক্ষিত হইবে। কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তি অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। অন্য পক্ষে সকল শাস্ত্র এবং সকল দেশ ও সকল কালের সাধুলোকদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। এই মন্দিরে যে সকল উপদেশ বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি হইবে, তাহাতে কোন শাস্ত্র, সম্প্রদায়, বা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের প্রতি উপহাস, বিদ্রূপ বা অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ হইবে না। উপযুক্ত সম্মানের সহিত অসত্য খণ্ডন এবং সত্য সমর্থন করা হইবে। এখানে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষ ঈশ্বরের মনোনীত বা প্রিয় এবং অপর মনুষ্যগণ সে অনুগ্রহে বঞ্চিত, এরূপ বিবেচিত হইবে না। যাহাতে এই উদার ভাবের ব্যাঘাত হয় তাহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না।

"আমাদের মতের আধ্যাত্মিকতা যত্নসহকারে রক্ষিত হইবে। পুষ্প, গন্ধ, বলি, বর্ত্তিকা এবং বাহ্যিক পূজার অন্যান্য উপকরণ ব্যবহৃত হইবে না এবং যাহাতে ধর্ম্ম বাহ্যাড়ম্বর ও জীবনশূন্য প্রণালীতে পর্য্যবসিত না হয়, যত্ন সহকারে সেই চেষ্টা করা হইবে। যাহাতে নর নারীগণ ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করে, ভক্তি-প্রার্থী হয়, পাপকে ঘৃণা করে, ঈশ্বরানুরাগে ও আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হয় এবং যাহাতে নরনারীর মধ্যে পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সামাজিক সর্ব্বপ্রকার কুরীতি নিরাকৃত হয়, সাধু-কার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, তাহাই এখানকার সকল উপদেশ ও বক্তৃতার উদ্দেশ্য হইবে। সাক্ষাৎ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, যাহার দ্বারা পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় পায়, কুসংস্কার উৎপন্ন হয়, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অপহৃত হয়, বিবেক হীন হয়, নীতি দূষিত হয়, কোন প্রকারে তাহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না! এই মন্দির যেন শ্রান্ত পথিকদিগের আশ্রয় ও বিশ্রামস্থান হয়। এই গৃহে পাপীরা আসিয়া যেন সান্ত্বনা ও আশা প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বল যেন বল লাভ করে, যাহারা ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষ্ণাতুর তাহারা যেন আত্মার অন্ন পান প্রাপ্ত হয়। এই আশা ও প্রার্থনা পূর্ব্বক আমরা অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিতেছি! ঈশ্বর আমাদিগের সহায় ও পথপ্রদর্শক হউন"

তৎপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজস্থাপনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ত্রুটি ও অভাব লক্ষিত হইয়াছিল, আদর্শের ম্লানতা ঘটিয়াছিল, এবং তাহা দূর করিবার জন্য উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের বিভিন্ন দল যে বিবিধ প্রকার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া, যে সকল ঘটনা পরম্পরাতে পৃথক সমাজ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তাহাই বর্ণনা করেন। উদ্যোক্তাগণ যে ইহার জন্য কতদিন গভীর রজনী পর্য্যন্ত কি আকুল প্রার্থনা ক্রন্দন ও আলোচনাতে যাপন করিয়াছেন, তিনি বিশেষভাবে তাহা প্রদর্শন করেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে সেই সময়ের কর্ম্মীদের অনেকের জীবন্ত ধর্ম্মপ্রাণতার উজ্জ্বল চিত্র প্রদান করেন। তাঁহাদের অনেকের নামও হয়ত বর্ত্তমান সময়ের বহু লোকে জানে না।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে (১৮০০ শকের বা ১২৮৫ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ) তারিখে, টাউন হলের প্রকাশ্য সভাতে যথাবিধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইবার পূর্ব্বে, যে ২৫শে মার্চ্চ তারিখে উন্নতি-শীল ব্রাহ্মগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দির হইতে তাড়িত হইয়া, পার্শ্বস্থিত ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে পৃথক সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই দিনই যে প্রকৃত পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়, তিনি বিশেষ করিয়া সে কথাও বলেন। উক্ত দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। মন্দিরে গোলযোগ হইবে আশঙ্কা করিয়া তিনি সেদিন মন্দিরে গমন না করিয়া বন্ধুদের জন্য উক্ত গৃহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উক্ত

দিবস হইতে কিছু দিন উপেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে, পরে বহুবাজার ডাক্তার খাস্তগিরের গৃহে ও অবশেষে ৪৫নং বেনেটোলা লেনস্থ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত, নিয়মিত উপাসনা চলিতে থাকে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই মাঘ তারিখে বর্ত্তমান মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মাঘ তারিখে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই জন্ম-ইতিহাসের মধ্যে মঙ্গল বিধাতার যে জীবন্ত বিধাতৃত্বের লীলা, তাহার দিকেই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) রবিবার—প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি উপদেশ প্রদান করেন এবং ইহার প্রভাবে পাপীর জীবনও কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা দেখাইবার জন্য বিশেষ ভাবে মফঃস্বলস্থ একটি ব্রাহ্ম শিক্ষকের কার্য্যের উল্লেখ করেন।

অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকার সময় "ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের আবশ্যকতা" বিষয়ে আলোচনা হয়। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তৎপরে যথাক্রমে ডাক্তার কালীদাস নাগ ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আপনাদের বক্তব্য প্রকাশ করিলে, সভাপতি আপনার মন্তব্যান্তে সভা ভঙ্গ করেন। সময়াভাবে অপর কাহাকে আর বলিবার সুযোগ দেওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোনও কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলে চলিয়া যাইতে বাধ্য হওয়াতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মানব প্রেম ও প্রেমপরিবার বিষয়ে তিনি উপদেশ প্রদান করেন। একদিকে যেমন আমাদিগকে প্রেমের বেদনা বহন করিতে হইবে, অন্যদিকে অপরের আনন্দে ও উন্নতিতে আনন্দিত হইতে হইবে, এরূপ নানা ভাবে তিনি আমাদের এই দায়িত্বের কথা বলেন এবং প্রেমই যে সকল সৌন্দর্য্যের মূল তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করেন

২রা জ্যৈষ্ঠ—(১৬ই মে) সোমবার—সমাজ-প্রতিষ্ঠার দিন। প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা সাধনের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া উপদেশ দেন।

সায়ংকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার সময় যে বিবরণ-পত্র পঠিত হইয়াছিল, উদ্দেশ্যবিষয়ক তাহার শেষ অংশ তাঁহার নির্দ্দেশ ক্রমে পাঠ করা হইলে, তিনি বিগত ৪৯ বৎসরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্য সাধন করিয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়া উপদেশ দেন। দুঃখের বিষয় বক্তৃতা ও উপদেশাদি লিপিবদ্ধ করিবার কোনও বন্দোবস্ত না থাকাতে আমরা তাহা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব।

১৩৩৫ সনের ৬ই ভাদ্র (ইং ১৯২৮ আগষ্ট মাস) ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। এই সময়ের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। যেদিন এই শতবর্ষ পূর্ণ হইবে, সেই দিনে ভারতবর্ষের সকল ব্রাহ্মসমাজে এবং প্রার্থনা-সমাজে বিশেষ উপাসনা এবং সভা সমিতি হইবে। কলিকাতা মহানগরীতে ঐ সময়ে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনেরও ব্যবস্থা করা হইবে, এবং এই সময়ে যে সকল সভা সমিতি হইবে তাহাতে পৃথিবীর সকল একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আহূত হইবেন। ইউরোপ এবং এমেরিকার উদার-নৈতিক ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সহিত চিঠি পত্রাদি চলিতেছে, এবং তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের এই শতবার্ষিক উৎসবে গভীর সহানুভূতি জানাইতেছেন। এমেরিকার একেশ্বরবাদী সমাজের (Unitarian Association) সভাপতি ডাঃ স্যামুয়েল ইলিয়ট্ এবং মিড্‌ভিল তত্ত্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ডাঃ সাউথওয়ার্থ উভয়ে আমেরিকার বহু প্রতিনিধি সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আসিয়া এই মহোৎসবে যোগদান করিবেন। গত শীতকালে এমেরিকার একেশ্বরবাদী সমাজের প্রতিনিধিরূপে রেভারেণ্ড লরিং ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের এই শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে ডাক্তার ইলিয়টের গভীর সহানুভূতি তিনি জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করাই তাঁহার ভারতবর্ষে আসার একটি উদ্দেশ্য ছিল।

গ্রেটব্রিটেন এবং আয়ার্লণ্ড্ হইতেও একেশ্বরবাদী সমাজের বহু প্রতিনিধি ঐ সময়ে ভারতবর্ষে আসিবেন। ইংলণ্ডের ডাঃ ডবলিউ এইচ ড্রামণ্ড লিখিয়াছেন যে, এই শুভ অনুষ্ঠান যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া বহুদিন থাকিবেন।

এক্ষণে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, ৬ই ভাদ্রের অনুষ্ঠানের পর দেশীয় প্রতিনিধিদিগের দ্বারা গঠিত একটী দল বঙ্গদেশ ও আসামের বিশেষ বিশেষ স্থানে গমন করিয়া বক্তৃতাদি করিবেন। ইহাদের সহিত কয়েকজন সুগায়ক থাকিবেন। তাঁহারা কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করিবেন। এই সময়ে যদি কোন বিদেশীয় প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে বঙ্গদেশ ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে তাঁহারাও এই দলের সহিত গমন করিবেন। ইহাতে ইহাদের প্রায় দুই মাস কাল অতিবাহিত হইবে। অনন্তর অর্থাৎ নভেম্বর মাসে, তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিবেন। এবং সেই সময়েই এমেরিকা ও ইউরোপ হইতে বহু প্রতিনিধি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন। তখন কলিকাতা টাউন হলে একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। তাহাতে দেশীয় এবং বিদেশীয় বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি আহূত হইবেন। এই অধিবেশনের শেষে দেশীয় এবং বিদেশীয় বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিদিগের দ্বারা

একটী দল গঠিত হইবে। তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি-মন্দির বোলপুরের "শান্তিনিকেতন" দর্শন করিতে যাইবেন। পরে তাঁহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ এবং এবং প্রার্থনাসমাজ আছে তাহা পরিদর্শন করিবেন, এবং সেই সেই স্থানে নানা প্রকার সভা সমিতির এবং ইঁহাদিগের দ্বারা বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হইবে। এইরূপে বিভিন্ন প্রাদেশিক সমাজগুলি পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে প্রায় দুই মাসের অধিককাল লাগিবে। এই সময়ে তাঁহারা মাঘোৎসবে যোগদান করিবেন। এই মাঘোৎসবের সহিত শতবার্ষিক অনুষ্ঠান শেষ হইবে।

এই অনুষ্ঠান-পদ্ধতির মধ্যে আর একটী বিশেষ কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেটী এই—ব্রাহ্মসমাজে যত বিখ্যাত গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, সেগুলিকে পুনর্মুদ্রিত করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সে পুস্তকগুলির নাম যথাক্রমে এইরূপ—রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজি, বাংলা এবং সংস্কৃত পুস্তকগুলি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ আর জি ভাণ্ডারকর, বীরেশলিঙ্গম্ পান্ট্লু প্রভৃতির কোন কোন পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম্ম" ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ ভাষাতে প্রকাশিত হইবে। ইতিমধ্যে তিন খানা পুস্তক প্রেসে পাঠান হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম শতবর্ষের কার্য্যের তালিকা প্রকাশিত হইবে। ইহাতে প্রাদেশিক এবং মফস্বল সমাজগুলির কার্য্যাবলী এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় লিখিত থাকিবে।

ইহাও প্রস্তাব হইয়াছে যে, বিগত শতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ইতিহাস যে নিয়মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে কি না, সে সম্বন্ধে একটী বিশেষ অনুসন্ধান হইবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সমাজের নিয়ম-প্রণালীতে যদি কোন দোষ থাকে সেগুলিকে সংশোধন করা এবং মহত্তর কোন উপায় উদ্ভাবন করা যদি সম্ভব পর হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা।

শীঘ্রই কলিকাতায় তিন সমাজের প্রতিনিধি মিলিয়া একটী সভা হইবে। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক অনুষ্ঠান কিরূপে কলিকাতায় সুসম্পন্ন হইবে সে বিষয়ের আলোচনা হইবে এবং এই সভা হইতে তিন সমাজের প্রতিনিধি স্থিরীকৃত হইবে। এই প্রতিনিধিরাই ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন নিয়মাবলীর সংশোধন ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবেন।

শ্রীসুশীলকুমার দত্ত

প্রার্থনা

কৃপার ভিখারী তব—আর কিছু নাহি চাই,
পেলে তার এক বিন্দু কৃতার্থ হইয়া যাই।
আমি পাপী নরাধম, কিরূপে করুণা কর,
দেখ নাথ, চেয়ে দেখ, পাপে তাপে জর জর!
তোমা ছাড়া বহু দিন ছিনু এ সংসারে ম'জে,
পাপে কলঙ্কিত তাই ও-চরণ নাহি ভ'জে।
ধু'য়ে মোরে পুণ্য-জলে, কর নাথ নিরমল,
ও-পদকমল পুজি ঢেলে প্রেম-অশ্রুজল।
লভিয়ে পরম ধনে মনোসাধ পূর্ণ করি,
সেদিন নিকট হ'ক, এই ভিক্ষা যাচি হরি।
তোমার কৃপায় নাকি অসম্ভব সম্ভব হয়,
পাপীরে পবিত্র কর দীনবন্ধু দয়াময়।
ঘনা'য়ে এসেছে দিন—বেশী দেরী নাহি আর,
যেদিন মুদিব আঁখি, ছেড়ে যাবো এ সংসার।
অসার অনিত্য সুখ ফুরাবে স্বপ্নের মত,
জাগা'য়ে অমৃত প্রাণে দেখাও স্বর্গের পথ।
এ মিনতি তব পদে করি নাথ, কর-যোড়ে,
মিটাও প্রাণের তৃষা, কেশে ধ'রে তোল মোরে
পাপ-কূপে ডুবে র'বে কত কাল এ জীবন,
ধন্য কর দীন জনে দিয়ে তব শ্রীচরণ।
প্রার্থনা সফল হ'ক— কর এই আশীর্ব্বাদ,
ও-পদে পড়িয়া থাকি, পূরাও এ মনোসাধ।

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

মাননীয় শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়

বিগত ১৬ই বৈশাখের "তত্ত্বকৌমুদীতে" 'প্রলোভনে ফেলিও না' এই নিবেদনে আপনি প্রার্থনা করিয়াছেন—"প্রভু, সব কর, দুঃখ দাও, শোক দাও, কিন্তু প্রলোভনে ফেলিও না।" বাইবেলোক্ত যীশুর নামে প্রচলিত Lord's Prayer' নামক প্রার্থনাটির একটি অংশ উদ্ধার করিয়াই আপনি এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন। এই প্রার্থনাটি খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই অসংখ্য আকারে ইহুদাদেশে প্রচলিত ছিল। পরে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া আসিয়া নূতন বাইবেল গ্রন্থে দুই স্থানে দুই আকারে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রার্থনার এই অংশটির অর্থ এই, যে,

ঈশ্বর আমাদিগকে পাপে লইয়া যান। ঈশ্বরের কাছে না করিয়া প্রার্থনাটি সয়তানের কাছে করা উচিত ছিল এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বে সয়তানের স্থানও আছে। St. Augustine এর সময় হইতে খৃষ্টানগণই এ বিষয়ে আপত্তি করিয়া আসিতেছেন। বাইবেল গ্রন্থের সুবিখ্যাত টীকাকার Plummar তাঁহার *Luke* এর টীকায় লিখিয়াছেন—The idea of God's leading us into temptation was from early times felt to be a diffioulty. বহু ভাষ্যকার এই অংশটিকে "shocking" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। যথা—"Suffer us not to be led into temptation," অথবা "Have us not brought into temptatiop." এরূপ পরিবর্ত্তন এই Lord's Prayer এর অনেক মর্ম্মস্থানেই করিতে হইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদে আছে "Give us our daily bread." কিন্তু Harnaok নামক সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন, যে এই অংশের গ্রীকের বাস্তবিক অনুবাদ—Give us to-day our to morrow's bread. আত্যন্তিক ক্ষুধার পরিচয়, সন্দেহ নাই। আমরা ব্রাহ্মসমাজে উহাকে আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় পরিণত করিয়া যীশুর সম্মান রক্ষা করিতে পারি। যাহা হউক, খৃষ্টানেরাও যাহা পরিত্যাগ করিতেছেন খৃষ্টানী সেই আবর্জ্জনাই আমরা অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজ কি একটা non-offioial branch of Christianity, তাও আবার crude Christ iannity?

নিবেদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

[নিবেদনে উল্লিখিত 'প্রলোভনে ফেলিও না' কথার পত্রপ্রেরক যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন--"ঈশ্বর আমাদিগকে পাপে লইয়া যান"—আমরা লেখকের সেরূপ ভাব গ্রহণ করি নাই, কেহ করিবে আশঙ্কাও করি নাই; সেরূপ করিলে ভাষাটা একটু পরিবর্তন করিয়া দিতাম। ব্রাহ্মসমাজে কেহ যে ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত প্রকার ভাব পোষণ করিতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনায়ও আসে নাই। নূতন অর্থে পুরাতন ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে ভুল বুঝাইবার সম্ভাবনা আছে। তাই ভাষা সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক হওয়া উচিত, সন্দেহ নাই। হিন্দুশাস্ত্রের অনেক কথাও আমরা ভিন্ন ও উন্নততর অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। "মা মা হিংসীঃ"--আমাকে বিনাশ করিও না—প্রার্থনা কি সূচনা করে? খৃষ্টীয় কুসংস্কারের প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিশ্চয়ই কোনও আত্যন্তিক প্রীতি নাই—তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকেরও নাই।—তঃ সঃ]

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৯শে মে পুরীনগরীতে রায় বাহাদুর ডাক্তার প্রেমানন্দ দাস অল্প কয়েক দিনের অসুখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৮ই মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শারদাচরণ নন্দীর পত্নী দীর্ঘকাল ক্যান্সার রোগে ভুগিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ২৯শে মে জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে পুত্র কন্যাগণ তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ২০৲ প্রদত্ত হইবে।

বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিকের কন্যা বিদ্যুৎপ্রভা রায় (বুলি) টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

রায় সাহেব রমণচন্দ্র বিশ্বাস বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান উপাসক ছিলেন। গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন।

গত ১২ই মে তারিখে তেজপুরের অন্তর্গত তারাজুলী চা বাগানে পরলোকগত উমাপদ রায়ের কন্যা শ্রীমতী সুভাষিণী দাস তাঁহার স্বর্গীয় পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে ২৲ এবং কলিকাতা অনাথ আশ্রমে ৩৲ প্রদত্ত হইয়াছে। বাগানস্থ কুলিদের বালক বালিকাদিগকেও পয়সা দেওয়া এবং জলযোগ করান হইয়াছে।

বিগত ১৫ই মে ঢাকা নগরীতে পরলোকগত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ও স্বর্গীয়া শান্তিলতা মিত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সংকীর্ত্তনান্তে প্রথমে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুবোধচন্দ্র মজুমদার পারিবারিক সমাধিস্থলে শৈলেশ বাবুর চিতাভস্ম প্রোথিত করেন। তখন শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কয়েকটি শ্লোক পাঠ এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রার্থনা করেন। তৎপর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ললিতবাবু আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী শাস্ত্রপাঠ এবং অমৃতবাবু প্রার্থনা করেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সরযুবালা রায় শৈলেশ বাবুর ও কুমারী শেফালি মজুমদার শান্তিলতার জীবনী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়ের গৃহেও বুধবার সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাহাতেও ললিতবাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং নেপালবাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী লীলা রায় যথাক্রমে তাঁহাদের জীবনী বর্ণন করেন।

বিগত ২২শে মে মেদিনীপুর নগরীতে পরলোকগত প্যারিলাল ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র বিভুপ্রসাদের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। মাতা শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ তাঁহার পবিত্র জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন। বন্ধু বান্ধবগণের কয়েকখানি পত্রের অংশ শ্রীমান বিনয়জীবন ঘোষ পাঠ করেন। বন্ধু শ্রীমান কালীপদ রায় স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত স্বরচিত একটী সঙ্গীত করেন এবং এই বিশেষ উপলক্ষে রচিত তাঁহারই অপর একটী সঙ্গীত শ্রীযুক্ত স্নেহলাল দত্ত গান করেন। এই উপলক্ষে বিভুপ্রসাদের মাতা মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ৪৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে ৪৲ প্রচার ফণ্ডে ২৲ ও

সাধনাশ্রমে ৫৲ দান করিয়াছেন। এবং তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী ভক্তিউষা ঘোষ, ভ্রাতা শ্রীমান সত্যসুন্দর ঘোষ, এবং মামাত ভাই শ্রীমান প্রশান্তকুমার বসু প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া নারীরক্ষা সমিতিতে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন। দীন দরিদ্রদিগকেও বিবিধ প্রকারে দান করা হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ৪ঠা বৈশাখ চট্টগ্রাম জিলার চক্রশালা গ্রাম (বরমা) নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিশ্বাসের কন্যা কল্যাণীয়া হৃতপা ও বাণীবন নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় মল্লিকের পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা বরমা ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বিগত ২১শে মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাসের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া আরতি ও পরলোকগত মিঃ কেদারনাথ রায়ের পুত্র শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে রজনী বাবু প্রচার বিভাগে ২০৲, শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ১০৲, খাসিয়া হিল্‌স্ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, ও শিলং ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ—নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের অষ্টপঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়:—

১২ই এপ্রিল সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ১৩ই এপ্রিল প্রাতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী শাসমল এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ১৪ই এপ্রিল প্রাতে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দাস, এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। ১৫ই এপ্রিল প্রাতে বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "জীবন্ত ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৬ই এপ্রিল প্রাতে শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ উপাসনা করেন, বৈকালে বালক বালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায় মহিলাদের জন্য উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। উপাসনার পর মহিলা সমিতি পুনর্গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল প্রাতে শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য উপাসনা করেন। বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ উপাসনা করেন।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজ—গত ১৮ই বৈশাখ হইতে ২৪শে পর্য্যন্ত স্থানীয় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও অনুরাগ উৎসবের সাফল্য দান করিয়াছে।

১৮ই বৈশাখ—প্রাতঃকালে উদ্বোধন, আচার্য্য বাবু ললিতমোহন সেন; সন্ধ্যায় বক্তৃতা—সভাপতি বরদা বাবু, বক্তা—বাবু সুখময় দাসগুপ্ত ও বাবু ললিতমোহন সেন। ১৯শে বৈশাখ—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বরদাপ্রসন্ন বাবু; সন্ধ্যায় কথকথা, বিষয় সাধু হরিদাস। ২০শে বৈশাখ মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য বরদাপ্রসন্ন বাবু; অপরাহ্নে প্রার্থনা ও পাঠ—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন; তৎপর নগর সংকীর্ত্তন। ২১শে বৈশাখ প্রাতে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত। সন্ধ্যায় কথকতা—বরদাপ্রসন্ন বাবু। ২২শে বৈশাখ—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বরদাপ্রসন্ন বাবু; সন্ধ্যায় মহিলা উৎসব, বরদাবাবু উপদেশ দেন। ২৩শে বৈশাখ—বালক বালিকা সম্মিলন, আবৃত্তি ও জলযোগে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ২৪শে বৈশাখ—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বরদাপ্রসন্ন বাবু; সন্ধ্যায় ছাত্র সমাজের উৎসব।

বহরমপুর (গঞ্জাম) ব্রাহ্মসমাজ—সুরলা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল রথ উপাসনার কার্য্য করেন এবং শ্রীমান দণ্ডুক নায়ককে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শ্রীযুক্ত আর বালকৃষ্ণ রাও "বিশ্বাস" বিষয়ে উপদেশ দেন। শ্রীমতী রাসমণি দেবী ও শ্রীযুক্ত এ ভি কামাটের অধীনে যথাক্রমে রিফর্ম্ম ও সার্ব্বিস লীগ কন্‌ফারেন্স এবং পতিতপাবন মিসন কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়।

মিঃ ভিঃ পি চন্দ্রশেখর রাও তাঁহার পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান বহরমপুর উপাসনা-মন্দিরে সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত আর বালকৃষ্ণ রাও আচার্য্যের কার্য্য করেন। মিঃ রাও বহরমপুর ভি ভি এস সভার ভাণ্ডারে ৫ টাকা ও ছত্রপুর মন্দিরনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ৫৲ দান করিয়াছেন।

সুরলা পতিতপাবন মন্দিরে শ্রীমান অন্তর্যামী বিহারের কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল রথ আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালিকাকে প্রেমলতা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ বিহার ছত্রপুর মন্দির নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আর বালকৃষ্ণ রাওয়ের তৃতীয় পুত্র শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল রথ উপাসনার কার্য্য করেন।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ সায়াহ্নে মোহন বাগানে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে; শ্রীযুক্ত বারাণসী চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ,

Registered N0 65.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥
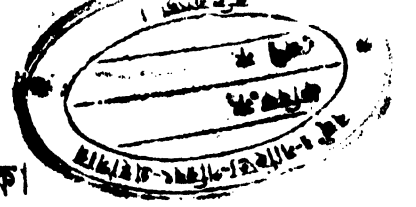
ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। | ১লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

৫ম সংখ্যা। | 16th June, 1927. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু ও কর্ত্তা, তুমি যে মহৎ উদ্দেশ্যে মানবজীবন সৃষ্টি করিয়াছ, অজ্ঞ মানুষ তাহা বুঝিতে না পারিয়া কত ভুল ভ্রান্তি করিয়াছে, কত দিকেই ছুটিয়া বেড়াইয়াছে! কিন্তু হে জ্ঞান-স্বরূপ প্রেমময় পিতা, তুমি সকল ভুল ভ্রান্তির মধ্যে তাহাদিগকে চিরদিন পথ দেখাইয়া আনিয়াছ, কিছুতেই তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে দেও নাই। তুমি মানবপ্রাণে যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও অনন্ত তৃষ্ণা দিয়াছ, তাহা কোনও প্রকারেই তাহাকে ক্ষুদ্রে তৃপ্ত হইয়া থাকিতে দেয় না—তোমার পূর্ণতার পথে নিয়তই পরিচালিত করে। তাই তোমার অপার করুণাতে আমরা জীবনে কত মহৎ তত্ত্ব জানিয়াছি, উন্নত আদর্শ পাইয়াছি। কিন্তু এত জানিয়া বুঝিয়াও যে অবিশ্রান্ত গতিতে তোমার পথে চলিতে পারিতেছি না, তোমার অসীম প্রেমের অসংখ্য নিদর্শন পাইয়াও যে সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া চলিতেছি না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। আমরা যে কোন্ মোহে, কি আবেশে, কিসে মত্ত হইয়া থাকি, জানি না। অন্তরদর্শী দেবতা তুমি, তুমি অন্তরের অবস্থা সকলই জান, আমাদের ক্রটি দুর্ব্বলতা সকলই দেখিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সকল দোষ দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত করিয়া তোমার করিয়া না লইলে, তোমার পথে চলিতে সমর্থ না করিলে, আমাদের আর অন্য উপায় নাই। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি আমাদিগকে বল ও শক্তি দেও। হে অগতির গতি, তুমি আমাদের গতি কর। হে জীবন-দেবতা, তুমি আমাদের জীবনকে সার্থক কর—তোমার জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে মণ্ডিত কর, সুন্দর ও মহৎ কর। আমরা তোমার অনুগত জীবন লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার ইচ্ছাই আমাদের সকল জীবনে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

কর্ত্তব্যের টানে—কর্ত্তব্য কি কঠিন! কর্ত্তব্যজ্ঞানের ভিতর দিয়া কা'র বাণী শুনি? বিবেকের ধ্বনিতে কা'র সুর বাজে? সেই সুর এসে আজ আমার সব ভাসিয়ে দিল! ধন জন প্রিয়জন সবই আমাকে ছাড়্‌তে হলো; একে একে সকল বাসনা কামনা বিসর্জ্জন কর্‌তে হলো! স্বহস্তে হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন কর্‌তে হলো! প্রভু, আর কতটা চাও? জীবনের উষাকাল হ'তে কেবল কর্ত্তব্যের কথাই শুন্‌লাম—কর্ত্তব্যের ভিতরে তোমার বাণীই আসে, সকলে বল্‌লেন। সেই যে ত্যাগ আরম্ভ হলো, এ ত্যাগের কি আর অন্ত নাই? তুমি আর কত চাও? ধন, জন, মান, প্রতিপত্তি সবই ত নিয়েছ। যাহা ইচ্ছায় দিয়েছি তা ত নিয়েছই; অনিচ্ছায়ও কত কেড়ে নিয়েছ। তবুও একটি স্থান আছে, যেখানে একটু সুখ পাই, একটু আনন্দ পাই। তাহাও শূন্য কর্‌বে? তাহাও কেড়ে নিতে চাও? তাহাও স্বহস্তে ছিঁড়ে দিতে হবে? তবে তাহাই হউক। কর্ত্তব্য আমার দেবতা, কর্ত্তব্যের নামে আমার সব শূন্য হোক; আমার জীবন তিল তিল ক'রে শেষ হোক। এই জীবনত্যাগে নব জীবন আস্‌বে। আসুক, আর না আসুক, তুমি যখন চেয়েছ, তুমি যখন কঠিন নির্ম্মম কর্ত্তব্যজ্ঞান দিয়েছ, আমি সবই ছেড়ে দিব—একটুও রাখ্‌ব না। এখন তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর।

আর কেন বিলম্ব বল?—জীবনের বেলা ফুরিয়ে এসেছে; সংসারের খেলা ভেঙ্গে গেছে; আর ত বিলম্ব সয় না। একে একে আমার সব সাধ, সব কামনা, ভেঙ্গে গেছে। সুখের আশায় কত ঘুরেছি, কত ব্যথা পেয়েছি, কত কাঁটা পায়ে ফুটেছে! যে ডাল ধরেছি, সে ডালই ভেঙ্গে গিয়েছে; যাকে

আপনার ব'লে আঁকড়িয়ে ধরেছি সে-ই আমাকে ব্যথা দিয়ে পালিয়েছে! যে স্বপন দেখেছি, তা-ই ভেঙ্গে গেছে! যে আলেয়ার পশ্চাতে ছুটেছি, তাহাই ফাঁকি দিয়ে, প্রলুব্ধ ক'রে, দূরে স'রে পড়েছে! এই জটিলতাময় সংসারের খেলা খেল্‌তে খেল্‌তে জীবনের বেলা ফুরিয়ে এসেছে; এখন বাড়ী পানে মন ছুটেছে। যিনি আমার বাসগৃহ, যিনি আমার চির আরাম, চির শান্তির প্রস্রবণ, আজ তাঁকেই প্রাণ চায়; তাঁর জন্যই ব্যাকুল হ'য়ে এয়েছি! আজ আর ছুটাছুটি করব না, আলেয়ার পশ্চাতে ছুটব না; আজ তাঁকে নিয়ে ব'সে থাকি, তাঁর চরণে প'ড়ে থাকি; অশ্রুজলে তাঁর চরণ ধৌত করি; প্রাণের ব্যথা তাঁর চরণে নিবেদন করি। দিন যামিনী তাঁর প্রেমের স্মৃতি ধ্যান করি! আর বিলম্বে কাজ নাই; তাঁর ক্রোড়ে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হই, নিরুদ্বেগ হই।

কে চালায় ?—আমি ত চল্‌তেই আছি—কত দিকে ছুট্‌ছি; কত ঘাত প্রতিঘাত আস্‌ছে! আমাকে চালায় কে? আমার নিজের ইচ্ছায় ত চল্‌তে পারি না; আমার সব ইচ্ছাই যে ভেঙ্গে যায়; সব কল্পনাই যে উড়ে যায়! তবে আমি কি স্রোতের পানা? স্রোতে—সময়ের স্রোতে, ঘটনার স্রোতে—যে দিকে ইচ্ছা আমাকে ভাসিয়ে নেয়? অথবা, আমি কি পুতুল-বাজির পুতুল? বাজিকর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আমাকে নাচায়? আমি জানি না, আমি বুঝি না। এক এক সময় মনে হচ্ছে, সময়ের স্রোতে ভেসে চল্‌ছি; লক্ষ্য নাই, কখনও চলি, কখনও থামি, ঘটনার পর ঘটনা আসে—সুখ আসে, দুঃখ আসে—তার কোনও অর্থ নাই, উদ্দেশ্য নাই। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা ত নয়। আমার বন্ধু যিনি, তিনিই অন্তরালে থেকে, পুতুল-বাজির বাজিকর হ'য়ে আমাকে চালাচ্ছেন। আমি তাঁর হাতে সূক্ষ্ম তারে বাঁধা রয়েছি। একটি ঘটনাও নিরর্থক নয়; একটি ফোঁটা চোখের জলও ব্যর্থ নয়। তিনিই ভাঙ্গেন, তিনিই গড়েন; তিনিই নাচান, তিনিই থামান। আমি তাঁরই হাতে। সব সুখ দুঃখ, মিলন বিচ্ছেদ, বেদনা তাঁরই দেওয়া; তাঁরই মঙ্গল বিধান; তাঁরই প্রেমের লীলা। তিনিই আমাকে চালাচ্ছেন।

সম্পাদকীয়।

পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন—মানুষের ধর্ম্ম ও জীবন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ—পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত যে চিরদিনই একে অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া আসিতেছে। জীবনসম্বন্ধীয় ধারণা, মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান, যেমন আদি কাল হইতে ধর্ম্মকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে, তেমনি ধর্ম্মবিষয়ক ধারণা, স্রষ্টা ও বিধাতাসম্বন্ধীয় জ্ঞানও জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, জীবনকে তদনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টান্বিত করিয়াছে। আদি মানব যখন এই দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়াছে, তখন এই দেহে বাঁচিয়া থাকাকেই, ইহার সুখ স্বাস্থ্য বর্দ্ধনকেই জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়াছে এবং জগতের নানা অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনা ও বস্তুসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া, বিবিধ সহায়কারী ও বিরোধী শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, বন্ধু ও শত্রুভাবাপন্ন দেবতা কল্পনা করিয়াছে; আর, তদনুসারে তাহাদের তুষ্টি সম্পাদনের দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য নানা প্রকার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়াছে, বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহাদের চরিত্র এবং অপরাপর কার্য্যও উহার দ্বারা বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম্মও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। নিম্নতম স্থূল জড়পূজা হইতে উচ্চতম চিন্ময় অনন্ত স্বরূপের আধ্যাত্মিক পূজাতে উপস্থিত হইতে অনেক অবস্থার মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে, অনেক ভুল ভ্রান্তিকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে—দীর্ঘ সময় লাগিয়াছে। এখনও যে উহা বিকাশের চরম সীমায় পৌছিয়াছে, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। একটা সত্য পথ পাওয়া গিয়াছে, এই পথেই ভবিষ্যতে যাহা কিছু উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হইবে, এইমাত্র বলা যায়। স্থূলভাবে মানুষকে যেমন শরীর মন আত্মা, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, তেমনি স্থূলতঃ এই বিকাশেরও তিনটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ যে পরিমাণে আপনার শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় পাইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহার ধর্ম্মও যথাক্রমে উক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে—উপহার বলির ধর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ মন্ত্র তন্ত্র স্তব স্তুতির ধর্ম্ম, চিন্তন মনন ও ইচ্ছাপালনের, জ্ঞান ভক্তি ও পবিত্রতার বা আনুগত্যের ধর্ম্ম, ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের মধ্যেও তিনটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়—জ্ঞানপ্রধান, ভক্তিপ্রধান, কর্ম্ম বা সেবা বা নীতি-প্রধান। কর্ম্ম, সেবা ও নীতিকে আমরা এখানে একই শ্রেণীভুক্ত করিলাম বটে; কিন্তু আমরা জানি তাহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে—তাহা পরবর্ত্তী আলোচনাতে পরিস্ফুট হইবে। তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মভাব বিকাশের ইতিহাসকে আর এক দিক হইতে দেখিলে তাহার মধ্যে আমরা যে অপর তিনটি স্তর দেখিতে পাই, তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। মানুষ প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে শারীরিক শক্তি বিষয়ে আপনার দুর্ব্বলতা ও অসহায় অবস্থাটাই বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছে; পরে আপনার মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া; বুদ্ধি বিচার উদ্ভাবনীশক্তির দ্বারা সকল বাধা বিঘ্ন প্রতিকূলতা জয় করিবার যে যথেষ্ট সামর্থ্য তাহার আছে তাহা দেখিয়া, আপনাকে অমিতবলশালী সর্ব্ববিজয়ী বীরপুরুষ বলিয়াই মনে করিয়াছে; পরিশেষে আবার আধ্যাত্মিক সংগ্রামে, রিপু ও প্রবৃত্তিকুলের উপরে জয়লাভ করিয়া পুণ্যকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায়, আদর্শানুযায়ী উন্নত জীবনগঠনে, বার বার পরাস্ত হইয়া আপনাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে। তাই প্রথমে দুর্ব্বলতাবোধ ও সবলের সাহায্যভিক্ষা এবং তাহার তুষ্টিসাধন বা তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত,

পরে আত্মশক্তিতে নির্ভর ও অহঙ্কার, পরিশেষে দীনতাবোধ ও আত্মসমর্পণ। আমরা পূর্ব্বে যে তিন শ্রেণীর ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটিতেই প্রথম দুই ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোথাও তৃতীয় ভাবটি থাকিতে পারে না। প্রথম ও তৃতীয় ভাবটির মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। প্রথমটির মধ্যে অসহায়ের ভাবটিই প্রবল, আপনার অক্ষমতাহেতু অপরের সাহায্যপ্রার্থনা আছে সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে নির্ভর ও আত্মসমর্পণ নাই। যে পর্য্যন্ত প্রেমময় দেবতার প্রেম ও করুণার সাক্ষাৎ পরিচয় না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত নির্ভর ও আত্মসমর্পণ জন্মে না। আর আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ছাড়া, উচ্চ আদর্শের তুলনায় আপনার ক্ষুদ্রতাবোধ ব্যতীত, দীনতাও প্রাণে জাগে না। এই তিনটি, বিশেষতঃ শেষ দুইটি, ভাবের কথাও আমাদিগকে সকল আলোচনার মধ্যে স্মরণে রাখিতে হইবে।

আমাদের দেশে ধর্ম্মের জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মরূপ ত্রিবিধ বিভাগ চিরপ্রচলিত। তবে ক্রমটা একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি হইবে। কর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডই বুঝায়। গীতাকার কর্ত্তব্য অর্থেও উহা ব্যবহার করিয়াছেন। গীতায় উভয় প্রকার প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিপন্থীর কর্ম্ম সাধারণতঃ সেবা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। প্রিয়তমের ইচ্ছাপালন রূপ ও সকল বিষয়ে পবিত্রস্বরূপের অনুসরণ রূপ উচ্চতর কর্ম্মও আছে। কিন্তু তাহাদিগকে এই কর্ম্মের মধ্যে ধরিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিক শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইলেও আমাদের দেশের যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডকে আমরা মানসিক শ্রেণীরই অন্তর্গত করিয়াছি। ইহার ব্যর্থতার বোধ হইতেই প্রতিবাদ-ছলে বৌদ্ধধর্ম্ম ও উপনিষদের ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। উভয়েই দার্শনিক চিন্তার ফল বলিয়া মূলতঃ জ্ঞান-প্রধান; অথচ একটিকে জ্ঞানের ধর্ম্ম ও অপরটিকে নীতির ধর্ম্ম বলাই সঙ্গত। আশ্চর্য্যের বিষয়, জ্ঞান হইতে ভাব বা ভক্তির পথ দিয়া যে নীতিতে স্বাভাবিক গতি, তাহা এখানে লক্ষিত হয় না; ভক্তি হইতে যে প্রেমানুগত্য ও উচ্চতর নীতি বা বিশুদ্ধতা প্রসূত হয়, তাহা এখানে দৃষ্ট হয় না। অথচ বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে ভাব ও সেবাপ্রধানও বলা যাইতে পারে—কেন না, উহা তুল্যরূপে প্রেমেরও ধর্ম্ম। তথাপি উহাতে ভক্তির স্থান নাই। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিশেষত্বের কারণ এই যে, তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী হউন বা না হউন—আমরা মনে করি তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসীই ছিলেন—তাঁহার ধর্ম্মে ও সাধনে তিনি ঈশ্বরের কোনও স্থান রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মে জীব-প্রেমের যথেষ্ট স্থান থাকিলেও, ঈশ্বর-ভক্তিপ্রসূত প্রেম ও আনুগত্যের, উচ্চতর নীতির কোনও স্থান নাই। তাঁহার নীতি যত উচ্চ ও বিশুদ্ধই হউক না কেন, তাহার সঙ্গে পবিত্র-স্বরূপের পুণ্যময় ইচ্ছার কোন সম্বন্ধই নাই, উন্নত ঈশ্বরানুগত ধর্ম্মজীবনের কোনও সম্পর্কই নাই। উপনিষদের ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানেরই ধর্ম্ম। তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ভক্তি ও নীতি সম্বন্ধে দুই এক কথা থাকিলেও, তত্ত্বজ্ঞান লাভই, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ ভাবে জানাই, তাহার চরম লক্ষ্য, তদতিরিক্ত কিছু সাধনীয় নাই। সকল স্থলেই যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মযোগ, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতি, সাধনীয় লক্ষ্য, তাহাও বলা যায় না। কেন না অনেকের মতে অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই, 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান জন্মিলেই, সব হইল। ব্রহ্মজ্ঞানলাভে তত্ত্বজ্ঞানের যতই প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন, দুই যে এক ও অভিন্ন নহে, সে-কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। তত্ত্বজ্ঞান শুধু চিন্তা ও বিচার হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য আপনার অতিরিক্ত অপর কোনও সত্তার অনুভূতি সকল সময় নাও থাকিতে পারে—প্রকৃত পক্ষে থাকেও না। দার্শনিক চিন্তালব্ধ তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান যদি একই বস্তু হইত, তবে অনেক দার্শনিকই ব্রহ্মজ্ঞও হইতেন। তাহা যে হয় না, বর্ত্তমান কালের দার্শনিকগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সে যাহা হউক, উপনিষদের ধর্ম্ম যে মূলতঃ জ্ঞানের ধর্ম্ম সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার প্রতিবাদস্বরূপ যে ভক্তির ধর্ম্ম এদেশে জন্মগ্রহণ করে, তাহাই সে-কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। সে-ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, বৌদ্ধধর্ম্মে ও উপনিষদের ধর্ম্মে যে একটা মৌলিক ভাবের একতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। উভয় ধর্ম্মই যে শুধু যাগ যজ্ঞ বাহিক ক্রিয়াকাণ্ডের ও বহু দেবদেবীর প্রতিবাদস্বরূপ জন্মিয়াছে তাহা নহে। অপরের সহায়তা না খুঁজিয়া সম্পূর্ণ আত্মশক্তির উপর নির্ভরও উভয়েরই প্রধান ভাব। বৌদ্ধের নৈতিকচরিত্র-গঠনে ও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানলাভে প্রধান ভাবে আপনার সাধন ভজন চেষ্টা যত্ন শক্তির উপরই নির্ভর, অপর কোনও শক্তির উপর নির্ভরের স্থান নাই। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' ইত্যাদি শ্লোক সত্ত্বেও যে আমরা সাধারণ ভাবে উপনিষদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, উক্ত ভাব অন্যত্র বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, আর তদ্বিপরীত ভাবের নিদর্শন সর্ব্বত্র যথেষ্টই রহিয়াছে। উপনিষদের ধর্ম্ম প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারা সেবিত ও বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই উহার মধ্যে এই ক্ষাত্র ভাব প্রাধান্য-লাভ করিয়াছে কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পূর্ব্ব-বর্ত্তী যাগ যজ্ঞের মন্ত্র তন্ত্রের ধর্ম্মেও উক্ত ভাবের প্রাধান্য ছিল। এই-ভাব কিন্তু চিরদিন প্রবল থাকিতে পারে না, আত্মশক্তির ব্যর্থতা ও অক্ষমতাবিষয়ক অভিজ্ঞতা মানুষকে এক দিন না এক দিন লাভ করিতেই হয়। তাই উপনিষদেও তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মেও দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধকদিগকে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। এক দিকে শুষ্ক জ্ঞানে অতৃপ্তি, অপর দিকে আত্মশক্তির অপ্রচুরতা, হইতেই ভক্তি-ধর্ম্মের উৎপত্তি। তাই প্রথম হইতেই জ্ঞান ও ভক্তিতে এই বিরোধ থাকাতে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তির উপর নির্ম্মল ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত ভক্তি বা প্রেমের ধর্ম্ম ভাল করিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। এই হেতু দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে ভক্ত প্রধানতঃ সত্য জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া ও কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া অসার ভাবুকতাতেই পরিণত হইয়াছে। ভাবুকতা ব্যতীত সেবার ভাবও ইহার মধ্যে ফুটিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু

সে-সেবার মূলেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের পরিবর্ত্তে কাল্পনিক ভগবৎপ্রীতিই দেখিতে পাওয়া যায়—মানুষকে নারায়ণরূপে কল্পনা করিয়াই সেবা করা হয়; কিন্তু উহা বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রেমপ্রসূত সেবা নহে। এই স্থলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইতে যে মানবের প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছে, এরূপ বলা যায় না। বরং তাহার ঠিক বিপরীত ভাবের খেলাই দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের সেবা করিয়া, তাঁহাকে ভাল বাসিয়াই মনে করা হয় ভগবানের সেবা করা হইল, তাঁহাকে ভালবাসা হইল। তাহা ছাড়াও ভগবৎপ্রেমের স্থান ও প্রেমে আত্মসমর্পণের ভাব যে ইহাতে নাই, এরূপ নহে। কিন্তু তাহাও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়াছে। সত্য দেবতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ হইতে যে এই ভাব জন্মিয়াছে তাহা বড় একটা দেখা যায় না। বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে মোটেই সত্য জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত ভক্তি নাই, এরূপ কথা কখনও বলা যায় না, আমরা তাহা বলিতেছিও না। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে আকারে উহা প্রধানতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমরা তাহার কথাই বলিতেছি। বৈষ্ণবধর্ম্মের কাল্পনিকতার সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ উহার নীতিহীনতা। প্রকৃত ভক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল নীতিপরায়ণতা। পবিত্রস্বরূপ ভগবানকে যে ভক্তি করে, ভালবাসে, সে কোনও ক্রমেই নীতি বিষয়ে শিথিল হইতে পারে না, পুণ্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না। তাহার মধ্যে প্রেম ও পুণ্য দুই সমভাবেই প্রকাশ পাইবে। পুণ্যেতেই প্রেম বা ভক্তির পরিণতি। পরবর্ত্তী এই বিকৃতির পূর্ব্বেও কিন্তু এ দেশের ভক্তিধর্ম্মে নীতির দিকটা তত বিকশিত হয় নাই। তাহাতে দুর্নীতি প্রশ্রয় না পাইলেও, চরিত্রে ও জীবনের সকল কার্য্যে ঈশ্বরানুগত্যের ভাব তেমন ভাবে প্রস্ফুটিত হয় নাই। ইহা এদেশীয় বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মেরও একটি গুরুতর অপূর্ণতা। ইহা সত্য জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইবারই অবশ্যম্ভাবী ফল। সাক্ষাৎ ব্রহ্মযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে কখনও এরূপ হইতে পারিত না।

জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম তিনটিই যে প্রয়োজনীয়, প্রত্যেকটিই যে অপর দুইটিকে ছাড়িয়া অপূর্ণ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাই গীতাকার এই তিনের সমন্বয়সাধনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তিনি তিনটির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, এরূপ অনুমিত হয় না। প্রথমতঃ, তিনি যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সমস্ত শিক্ষার প্রধান মৌলিক ভাব নিষ্কাম কর্ম্ম,—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, বাসনা-পরিশূন্য হইয়া, উদাসীন ভাবে কর্ম্ম করা। তিনি যে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও সেই একই কথা। ইহা এক দিকে খুব ভাল কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু অপর দিকে ইহা যে প্রাণহীন কঙ্কাল মাত্র, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে প্রেমানুপ্রাণিত কর্ম্মের, প্রিয়তমের ইচ্ছানুগত জীবনগঠনের কোনও কথা নাই—বাসনার বিসর্জ্জন আছে, ইচ্ছার নিমজ্জন বা আত্মসমর্পণ অর্থাৎ প্রকৃত ইচ্ছাযোগ নাই; সাধারণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যতীত কর্ম্মের কোনও উচ্চতর প্রেরয়িতা নাই। মানবজীবনের সমগ্র কর্ম্মের পরিবর্ত্তে এক অংশ মাত্রের কথা থাকাতে, ইহা যে অপূর্ণ রহিয়াছে, পঙ্গু হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই সমন্বয়ের ধর্ম্মেও মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশের স্থান নাই। এখানেও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মের ভাব বিকশিত হয় নাই। জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাসমন্বিত মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য তিনেরই সমভাবে উন্নতিসাধন আবশ্যক। আমরা চিন্তার সাহায্যের জন্য পৃথক ভাবে তিনটির কথা বলিলেও, তাহারা যে বস্তুতঃ পৃথক নহে, কাহারই অপরকে ছাড়িয়া ভিন্ন অস্তিত্ব নাই, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে—সে কথা আজ কাল সকলেই জানে ও বুঝে। প্রত্যেক মানবাত্মাই যে বর্ত্তমানে অবিকশিত অবস্থায় রহিয়াছে, আর তাহার মধ্যে যে অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা নিহিত আছে এবং জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে অনন্ত উন্নতির পথে, পূর্ণতার দিকে অবিশ্রান্ত গতিতে অগ্রসর হওয়াই যে মানব জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সে-কথাও বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সে কথা পূর্ব্বে অজ্ঞাত থাকিলেও, আজ কাল সকলেই জানে ও বুঝিতে পারে। এক মাত্র অনন্ত জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আধার জীবন-দেবতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগেই যে এই উন্নতি ও বিকাশ সম্ভবপর, তৎসাধনের যে অন্য কোনও উপায় নাই, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিলে যে স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি প্রেম ধাবিত হইবে, এবং তাঁহাতে প্রীতি স্থাপিত হইলে, তাঁহাকে ভাল বাসিলে, যে আপনা হইতেই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার ইচ্ছানুগত জীবন যাপন না করিয়া পারা যাবে না, আপনার ইচ্ছাকে একেবারে তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে ডুবাইতে হইবে, বিনা সর্ত্তে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে, সে কথাও অধিক ব্যাখ্যা না করিয়া বলিলে চলিবে। এ বিষয়ে আজ কাল কাহারও কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। যদি কোথাও ইহার কোনও ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে সেখানে মূলেই গোল আছে, সেস্থলে সাক্ষাৎ জ্ঞানেরই অভাব আছে, সত্য ব্রহ্মানুভূতি ঘটে নাই। আমরা অনেক সময় যুক্তি বিচার অনুমান কল্পনা ও ভাবের দ্বারা গড়া মিথ্যা মনঃকল্পিত চিন্ময় মূর্ত্তিকে সত্য ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম করিতে পারি। সেখানে সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব—উহাতে একমাত্র আমাদের নিজেরই কাজ। অনন্তস্বরূপ স্বপ্রকাশ দেবতাকে মানুষ আপনার শক্তিতে প্রকাশ করিতে পারে না—সেখানে পূর্ণরূপে ব্রহ্মেরই কর্ত্তৃত্ব, শুধু গ্রহণ বিষয়েই আত্মকর্ত্তৃত্ব আছে। এই কথাটা ভুলিয়া চলাতেই অধিকাংশ স্থলের ধর্ম্ম কৃত্রিম ও প্রাণহীন হইয়া যায়, তাহার দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। জীবনের উপর কোনও ধর্ম্মের কার্য্যের দ্বারাই উহার বিচার করিতে হইবে। যে ধর্ম্ম মানবজীবনের পূর্ণতাসাধনে সমর্থ নহে, তাহা নিশ্চয়ই অপূর্ণ, কখনও পূর্ণ নয়। ধর্ম্ম ও জীবন অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত; ধর্ম্মকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার জন্যই ধর্ম্মের অপূর্ণ বিকৃত আদর্শ লইয়া এত দিন মানুষ তৃপ্ত রহিয়াছে। এখন ধর্ম্মের যে পূর্ণ আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মানবজীবনকেও পূর্ণতার দিকেই লইয়া যাইবে। যদি তাহা না করে, জীবনকে

কোনও অংশে পঙ্গুই রাখে, তবে বুঝিতে হইবে ধর্মের পূর্ণ আদর্শ পাইয়াও আমরা সত্য ভাবে তাহার অনুসরণ করিতেছি না, আমরা মিথ্যা ও কল্পনার রাজ্যেই বিচরণ করিতেছি। আমাদের সকল সাধন ভজন চেষ্টা যত্নকে যেন আমরা এই ভাবেই পরীক্ষা করিয়া দেখি। তাহা হইলেই আর আমরা কিছুতেই পূর্ণ ধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়া অপূর্ণ জীবন লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিব না, প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইব না, ধর্ম একটা বাহিরের আবরণমাত্রে পরিণত হইবে না। উহা সত্য ভাবে জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়াই দাঁড়াইবে। ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ও জীবননিরপেক্ষ ধর্ম জগতের যে অকল্যাণ সাধন করিয়াছে, তাহা হইতে যেন আমরা আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে মুক্ত রাখি। আমরা যেন পূর্ণ ধর্মকে অপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করিয়া আর জীবনকে পঙ্গু করিয়া না ফেলি। আমাদের জীবনে ও সমাজে জীবনদেবতার সত্য সিংহাসন, পূর্ণাঙ্গ ধর্ম, প্রতিষ্ঠিত হউক। সকলে জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে সেবায় সুন্দর ও মহৎ হইয়া উঠি। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

বিশেষ সাধক দল।

আমরা কয়েক জন একত্র হইলেই ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা ও দুর্গতির বিষয় আলোচনা করিয়া থাকি। পাপীকে উদ্ধার করিবার, মন্দকে ভাল করিবার, অপরকে আকর্ষণ করিবার শক্তি, ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বের মত দৃষ্ট হয় না। এই দুর্ব্বলতা-নিবারণের উপায় কি তাহা ধীর চিত্তে গভীর ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এই চিন্তা মনে উদয় হইলে, মহাভারতের পাণ্ডবদিগকে মনে পড়ে। যুধিষ্ঠির যখন রাজ্যহীন হইয়া অরণ্যে সামান্য কুটিরে, মহা দুর্গতির মধ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন এক দিন ব্যাসদেব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পঞ্চ ভ্রাতা অত্যন্ত ম্লান ভাবে বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব তাঁহাদের দুর্গতিনাশের জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন:—'তোমাদের মধ্যে এক জনকে তপস্যায় পাঠাও, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন লৌকিক উপায়ে এ দুর্গতি দূর হইবে না।' তাঁহার উপদেশ অনুসারে অর্জ্জুনকে তপস্যার জন্য পাঠান হইল। অর্জ্জুন ইন্দ্রবান পর্ব্বতের উপরে কঠোর তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া শত্রুঘাতী অস্ত্রসমূহ লাভ করিলেন। পরে সেই সমস্ত অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, দুর্গতি দূর করিতে সক্ষম হইলেন। বিনা তপস্যায় কিছুই হয় না।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তাহা আমাদের গ্রামে ঘটিয়াছিল। আমাদের গ্রাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রাম। সেখানে অনেক সাধক এবং পণ্ডিতের বাস। বহু পূর্ব্বে আমার পিতার বাল্যকালে এক বৎসর ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়—১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণের শেষ পর্য্যন্ত এক বিন্দুও বৃষ্টি পড়ে নাই, খাল, বিল, পুকুর সব শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, পানীয় জলের অভাবে মহাকষ্ট হইয়াছিল, চারিদিকের গ্রাম হইতে চাষারা ছুটাছুটি করিতে লাগিল, এক ক্ষুদ্র পুকুরে শত শত লোক আসিয়া পড়িতে লাগিল। গ্রামের সব জল ফুরাইয়া যায় বলিয়া অন্য গ্রামের লোকের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়া গেল—জলের অভাবে সব মরিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঘরে ঘরে স্তব স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন—চারিদিকে ধর্ম কর্ম আরম্ভ হইল; কিন্তু কিছুই হইল না, এক বিন্দু বৃষ্টিও পড়িল না। গ্রামে এক জন মহা পণ্ডিত বৃদ্ধ সাধক ছিলেন; অবশেষে তাঁহার কাছে সকলে গিয়া পড়িলেন; বলিলেন 'আপনাকে সাধনায় নাম্‌তে হবে, নতুবা হয় না।' তিনি স্বীকার হইতেছেন না, এত বয়সে কঠোর সাধনা সহিতে পারিবেন কি না সন্দেহ হইতেছে। কিন্তু কেও তাঁর কথা শুনিল না, সকলে ব্যাকুল হ'য়ে, নিতান্ত ব্যগ্র হ'য়ে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। শেষে তিনি সাধনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রাতঃকালে তিনি সেই একমাত্র পুকুরের দেড় হাত জলে মগ্ন হইয়া বেদ-মন্ত্রের সাধনা করিবেন, এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়া মাত্র শত শত লোক সেই পুকুরের পারে জড় হইল। তিনি প্রাতঃকালে পুকুরের ধারে এলেন, এক ব্যক্তি মটরের মালা হাতে করিয়া তীরে বসিয়া রহিল, সূর্য্যোদয়ের সময় তাঁকে জলে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—তিনি বেদমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন; এক হাজার মন্ত্র জপ করা হয়, আর তিনি মাথা নাড়েন, এবং একটি করিয়া মটর জলে নিক্ষেপ করা হয়। জল না হইলে উঠিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইয়া গেল—ব্রাহ্মণ সেই জলে বসেই আছেন, ক্রমাগত জপ করিতেছেন। শেষে গ্রাম শুদ্ধ লোক সেখানে গেল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয় মনে করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে জপ হইতে তুলিতে গেল—তিনি উঠিলেন না—সকলে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িল। কিন্তু রাত্রি ১১টার সময়ে আকাশে কাল মেঘ দেখা গেল—মহা বৃষ্টিতে জলকষ্ট দূর হইল। যখন বৃষ্টি নামিল, তখন সকলে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে, তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে লইয়া গেল।

সেই জলনামা প্রাকৃতিক নিয়ম, আমরা বলিতে পারি। কিন্তু সেদিন সেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন।

অনাবৃষ্টির জন্য ব্রাহ্মণেরা ত সামান্য রকম জপতপ করিতে-ছিলেন, তবুও হ'ল না। তখন এক জন জীবন মরণ পণ ক'রে বসিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ, ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরবিশ্বাসী। তাঁহারা কি দুর্গতি দূর করিবার জন্য কেবল লৌকিক উপায় অবলম্বন করিবেন, আলোচনা করিবেন? সকলেই সব ত্যাগ ক'রে সাধনায় লিপ্ত হ'তে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মেরা কি, পাণ্ডবদের অর্জ্জুনকে বলার মত, এই আশ্রমের লোকদিগকে বলিতে পারেন না, যে, যাও তোমরা সব ছেড়ে তপস্যা কর, হাড় মাস সব দিয়ে তাঁর চরণে পড়, যতদিন তাঁর করুণা অবতীর্ণ না হয়।

কেন ওঁরা দাঁড়িয়েছেন? তাঁরা কি বিষয় কর্ম করিতে পারিতেন না? সে ত পাপ নয়! তবে কেন এঁরা ব্রাহ্মসমাজের

১লা আগষ্ট ১৯০৩; শনিবার। কলিকাতা সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত উপদেশ।

জন্য মত একটা ব্রত স্বীকার করিয়া লোকের কাছে দাঁড়াইলেন? আমাদের ওজর হ'তেই পারে না, আমাদের দ্বারা হইতেছে না বলিলে মাপ নাই।

ব্রাহ্মসমাজে তপস্যার ভাব জাগুক। ঈশ্বরের চরণে বসিবার মতি সকলের মনে জাগুক। সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ঘরে ঘরে উত্থিত প্রার্থনার মত, ব্রাহ্মসমাজের ঘরে ঘরে প্রার্থনা জাগুক। সাধনাশ্রমের সাধকগণ অর্জ্জুনের মত বিশেষরূপে তপস্যায় লিপ্ত হোন, নবশক্তি লাভ করুন।

পরলোকগত ঈশানচন্দ্র দেব।

পিতৃদেব শিশুকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া যদিও কোন কোন আত্মীয়ের সামান্য সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং বহুলোকের স্নেহ ভালবাসা পাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ও এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার পর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়াই বি এ পর্য্যন্ত পাশ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমশীল, অধ্যবসায়শীল ও কার্য্যতৎপর ছিলেন। তিনি যেরূপ ক্লেশস্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, অল্পলোকেই এরূপ সক্ষম হইয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বন্ধুপ্রিয় ছিলেন, পাঠ্যাবস্থা হইতেই অনেকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার অনেক বিশিষ্ট বন্ধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে সর্ব্বদা নানা কার্য্য উপলক্ষে এবং বন্ধুতাসূত্রে তাঁহার নিকট পত্রাদি লিখিতেন। লণ্ডন ও আমেরিকাতেও থিওসফি Theosophy সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তদ্দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বন্ধুতাসূত্রে পত্রাদি চলিত। তিনি বিক্রমপুরে বামন গাঁয়ে কিছু দিন গৃহ-শিক্ষক ছিলেন; সেই গৃহস্থ মাতা ও পুত্রগণ আজীবন তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়াছেন ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে স্মরণ করিয়া আসিয়াছেন। ২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দেরাদুনে ৬০৲, বেতনে Great Trigonometrical Survey office এ Computing কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি ঢাকাতে ব্রাহ্মপ্রচারক ও যুবকদলের সহিত মিশিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হন। দেরাদুনে আসিয়া তিনি মৎস্য মাংসাহার পরিত্যাগ করতঃ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে বিশেষ ভাবে উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে ব্রতী হন। তৎকালে এখানে ব্রাহ্ম Computer বাবু কালীমোহন ঘোষ, বাবু কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। পিতৃদেব তৎকালে এখানে আসিয়া শ্রীহট্ট হইতে বাবু নবীনচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র দাস প্রভৃতি কয়েক জনকে চেষ্টা করিয়া আনয়ন করেন। তৎসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা, প্রার্থনা, পাঠ ইত্যাদির দ্বারা মণ্ডলী গঠন করতঃ কিছুকাল উৎসাহ সহকারে তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি Theosophical Societyর সভ্য ও দেরাদুনস্থ উক্ত Societyর সম্পাদক হইয়া, অলকট ও ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববিদ্যা-সভার অধীনে ও মিসেস্ এনি বেসেণ্টের সহায়তায়, উক্ত তত্ত্ববিদ্যা-সভার কার্য্যে, বৎসরান্তে আফিসের কার্য্যে যে একমাস ছুটী পাওনা হয় তাহাতে, সমুদয় ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। তৎকালে T. Survey office এর কর্ম্মচারিগণ ৬ মাস দেরাদুনে ও ৬ মাস মশুরী পাহাড়ে থাকিয়া কর্ম্ম করিতেন। তিনি চাকরী করিবার সঙ্গে সঙ্গে এম এ পড়িতেছিলেন, এবং আসামে Extra assistant Commissioner হইবেন তাঁহার মনস্থ ছিল; কিন্তু দৈবক্রমে পশুপতি বাবাজী নামক একজন মহাত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, বিদ্যা ও আর্থিক উন্নতি করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, তিনি যোগশিক্ষা করিতে মনোনিবেশ করিলেন। যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ তিনি কিছু কাল স্বপাক আহার করা, কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ না করা, কোথায়ও নিমন্ত্রণাদিতে আহার না করা, লম্বা চুল ধারণ করা ইত্যাদি আরম্ভ করেন। মশুরী পাহাড়ে তিনি যথারীতি ৩ মাস যোগ সাধন করিয়াছিলেন। সেই সময় অন্নাহার পরিত্যাগ করতঃ কেবল দুধ ও ফল একত্র পাক করতঃ তাহাই আহার করিতেন। তিনি বিবাহ করিবেন না, সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি কারণে তাঁহার আত্মীয়গণ সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, হিন্দু বিধবা, ভ্রাতৃস্নেহে পাগলিনী হইয়া এই দূরদেশে আসিয়া ভ্রাতার অনেক প্রকার সেবা করেন এবং ২৯ বৎসর বয়সে যখন ভ্রাতা দেশে যান তখন সকলেই তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টা যত্ন করেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারেন নাই। পরে দেরাদুনে যখন জ্বর পীড়াতে তাঁহাকে একবার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তখন তিনি সেবা ও সহানুভূতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এবং ৩০ বৎসর বয়ক্রম কালে স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। বিবাহের দুই বৎসরাধিক পরে স্বীয় শ্বশুরালয় ধুবড়ী গমন করেন। তথায় পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী সমাবৃত পরিবারে অতি সমাদরে ৩ মাস বাস করিয়া পারিবারিক সম্বন্ধের মিষ্টতা ও পিতৃমাতৃ স্নেহ উপভোগ করেন। তদনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও একটী দেশীয় পরিচারককে আনয়ন করেন। আসাম যাইবার উপক্রমকালে তাঁহার প্রথম পুত্রের বিয়োগ হয়; তিনি শোকাকুলিত চিত্তে সপরিবারে কিছুদিন কাশীধামে বরুণা নদীর তীরে মাতাজীর আশ্রমে গিয়া বাস করেন, এবং তথা হইতে ধুবড়ী গমন করেন। তৃতীয় পুত্রের জন্মের পরেই তিনি ইচ্ছামত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবার ইচ্ছা করেন ও তদনুরূপ কার্য্য করেন। সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে তিনি পুনগাঁও গমন করেন ও কর্ম্মদক্ষতায় প্রশংসাভাজন হন। তিনি mathematics ভাল জানিতেন; ক্রমে আফিসে সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন।

৩০ বৎসর বয়সে তিনি ডাকওয়ালাতে জমী রাখেন; ক্রমে বাড়ী করা ও জমী রাখার দিকে ঝোঁক পড়াতে বসতবাটী ভিন্ন ৪ খানা ছোট বাড়ী ও একখানা বাগানবাটী প্রস্তুত করেন। বাগান করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নানা জনহিতকর কার্য্যে যেরূপ মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, কার্য্য-

(পুত্রকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

বাহুল্য গতিকে পরে আর তাহা পারেন নাই। সেই বাগানের জন্ত তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া নানা প্রকার ফলের গাছ রোপণ, ও ধান, যব, গম, মুশুর, কলাই, ভুট্টা, সরিষা, তুলা ইত্যাদী উৎপাদন করেন। ৫০০৲ ব্যয়ে তথায় বৃষ্টির জল রাখিবার জন্ত ছোট পুষ্করিণীর ন্যায় একটী কূপ বাঁধাইয়াছিলেন। প্রথমে উহা জনমনুষ্যের অগম্য জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই স্থান তিনি বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে দেবনগর (নয়া গাঁ) নাম দিয়া আশ্রমতুল্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে দলবল সহ তিনি সেখানে সকলকে লইয়া স্নান ভোজনাদি করিয়া আনন্দ করিয়াছেন। সময় সময় নিমন্ত্রণাদি করিয়াও তথায় সকলকে লইয়া উপাসনা, সংগীত ও বাগান ভ্রমণ ইত্যাদি দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি বনভ্রমণে ইচ্ছুক হইয়া সবান্ধবে ও সপরিবারে মথুরাওয়ালা, ভারুওয়ালা, রায়পুর, শ্রীপুর, হরাওয়ালা, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে গমন করতঃ উপাসনা গান বাজনা ও বনভোজনে আমোদ করিতেন। তিনি যেমন একাকী বাস করতঃ বিদ্যা চর্চ্চাতে সময় যাপন করিতে ভাল বাসিতেন, তেমনি সামাজিকতা ও স্বদেশপ্রিয়তাও তাঁহার মধ্যে বিলক্ষণ দেখিয়াছি। অনেকের সঙ্গেই তাঁহার সৌহার্দ্দ ছিল। পাড়ার ছেলেদের তিনি আপন জ্ঞান করিতেন ও স্নেহ করিতেন। পরিচিত না হইলেও স্বদেশের কোন লোকের নাম শুনিলেই তিনি তাহাকে আপন বাটীতে আহার করিতে ও নানা প্রকারে তাহার সাহায্য করিতে বাধ্য হইতেন। বিদেশস্থ বন্ধুবান্ধবদিগেরও চাকরী পাওয়া, বাড়ী ঠিক করা, চাকর ঠিক করা ইত্যাদি অনেক কাজের ভার তিনি গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পাদন করিতেন। কাহারও জন্ত বা জমী রাখিয়া দেওয়া, এবং তাহার তদারক করা, কেহ কোন বিপদে পড়িলে তাহার সাহায্য করা, ইত্যাদি পরোপকার কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ব্রতী দেখা গিয়াছে। তিনি থিওসফিষ্ট হইলেও ব্রাহ্মসমাজের যে কোন কার্য্য বিশেষ উৎসাহ সহকারে সম্পাদন ও সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন। বিবাহিত জীবনের আরম্ভ হইতে গত ২৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট মন্দিরের অভাববশতঃ তিনি আপন বাটীতে সামাজিক উপাসনা কার্য্য যথারীতি রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত দুই বৎসর যাবত উপাসনা কার্য্য অন্যান্য স্থানে হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এ বাটীতে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। তিনি কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি সমাজসম্বন্ধীয়, কি বৈষয়িক ব্যাপারে কি বিদ্যাশিক্ষায়, কি আতিথেয়তায়, কি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে, সকল বিষয়েরই পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা ও অগ্রণী ছিলেন। দেরাছুনে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সভা সমিতি, উৎসব প্রভৃতি যে কোন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, প্রায় যাবতীয় ব্যাপারেই তিনি অগ্রণী হইয়া কার্য্যসম্পাদনের জন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এখানে তত্ত্ববিদ্যা-সভার তিনি সম্পাদক ছিলেন; তৎসম্পর্কে অনেক কার্য্য তিনি করিয়াছেন। এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার হীনাবস্থা দর্শন করিয়া নারী জাতির উন্নতি কল্পে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি কয় বৎসর অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছেন। বর্ত্তমান কন্যা-পাঠশালা যাঁহাদের দ্বারা স্থাপিত হয় তিনি তাঁহাদের মধ্যে এক জন। এই কন্যা-পাঠশালায় বিবিধ কার্য্য সম্পাদনের জন্ত তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার উন্নতিবিধানার্থ তিনি সচেষ্ট ছিলেন; স্বয়ং মাসিক ৩৲ টাকা প্রদান করিতেন। দেরাদুনস্থ নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সকল প্রকার উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ কাঁদিত; এ জন্তই তিনি একটী নৈশবিদ্যালয় (Night School) স্থাপন করতঃ প্রাণগত আকাঙ্ক্ষার সহিত তাহার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। ইহাতেও তিনি সম্পাদক ছিলেন। দেরাদুনে হিন্দুস্থানী ব্যক্তিগণের সহিত তিনি যেরূপ মিশিয়াছিলেন, এরূপ কোন বাঙ্গালী এ স্থানে মিশিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই। তাঁহার দেহাবসানের পরে শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁহার দেবালয় নামক ভবনে, অনেক গণ্য মান্য ও সাধারণ হিন্দুস্থানী ব্যক্তিগণের আগমন হইয়াছিল। তাঁহারা বিশেষ ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "হিন্দুস্থানীকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে আপন ভাবিতে ও আপন করিতে আমাদের রায় সাহেবের ন্যায় আর কেহ পারেন নাই ও পারিবেন আশা করা যায় না।" মাদক সেবনে সাধারণের মধ্যে যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল ও ঘটিতেছিল, তাহা দেখিয়া তিনি সুস্থির থাকিতে পারেন নাই; তাঁহারই উদ্যমে এখানে মাদকনিবারিণী সভা Temperance Society স্থাপিত হয়; তিনিই ইহার সম্পাদক বা Secretary ছিলেন। এই Temperance Societyর জন্ত তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ তো দূরের কথা, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হইলেও বোধ হয় কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহার অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দেখিয়া এরূপই জ্ঞান হইত। এই সভার সহিত বিলাত ও আমেরিকার Temperance Societyর যোগ ছিল। দেরাদুনস্থ সাধারণ হিন্দুস্থানী ব্যক্তিগণ তাঁহার নামে নেশানাশিনীসভা হইতে এক খানা সঙ্গীত পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অনেককে শিক্ষাদান ও বিতরণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল অতি উৎসাহের সহিত পিতৃদেবের নামে মাদক নিবারণের এই সকল সংগীত সহরের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। যাঁহাদের যত্ন, চেষ্টা ও উৎসাহে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির লাইব্রেরী দেরাদুনে স্থাপিত হয়, তাহাদের মধ্যে তিনি এক জন প্রধান। ইহারও তিনি সম্পাদক ছিলেন এবং স্থানাভাবশতঃ তাঁহার নিজ বাটীর এক প্রকোষ্ঠেই লাইব্রেরী স্থাপিত করিয়াছিলেন। বৎসর বৎসর প্যারেড গ্রাউণ্ডে সাধারণ লোকের ও বালকদিগের শিক্ষা ও উৎসাহ ও নির্দ্দোষ আমোদের জন্ত হোলির সময় যে নানারূপ ক্রীড়া ও আমোদের বন্দোবস্ত হইত, তিনিই সেই উদ্যোগকারীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। নানাবিধ বিষয়ে পরিশ্রম সত্ত্বেও তিনি চিরদিন শারীরিক সুস্থতা রক্ষার জন্ত নিয়ম পালনের ও খেলার পক্ষপাতী ছিলেন। দূরস্থ বাগান করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তিনি অফিস হইতে বাটীতে আসিয়া বাটীসংলগ্ন বাগান ও গোয়াল ঘর দেখিয়াই, ব্যাট হাতে লইয়া Tennis খেলিতে যাইতেন। তিনি গাভী বড় ভাল বাসিতেন, আজীবন এক ঘর গাই বাছুর পালন করিয়াছেন। বিশ্বাসী ভৃত্যের উপরেও নির্ভর করিয়া গরুর কাজ কখনও ছাড়িয়া দিতেন না; এ বিষয়ে স্বয়ং সর্ব্বদা খবর লইতেন। তিনি নিজে নিরামিষাশী ছিলেন

এবং বাটীতেও মৎস্যাদির সংশ্রব পছন্দ করিতেন না। এ কারণেও বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধ তিনি প্রয়োজনীয় বোধ করিতেন। এবং সন্তান নির্ব্বিশেষে গাভীগণের সেবা করিতেন। জমী রাখা ও নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণের ঝোঁকের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বাটী হইতে ১॥ মাইল দূরে বেলপাশার ওপার ৪০ বিঘা জমী লইয়া একটী বাগান প্রস্তুত করেন। বাগানে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিয়া Tennis খেলা পরিত্যাগ করেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি অনেক সময়ে প্রায় দুই বেলা করিয়া বাগানে যাইতেন ও তথায় ৪।৫ জন বেতন-ভুক্ ভৃত্য নিযুক্ত রাখিয়া বাগানের কর্ম্ম পরিচালন করিতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহাকে যেরূপ পরিশ্রমশীল ও কার্য্যতৎপর দেখা গিয়াছে, কোন যুবককেও এরূপ দেখা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। স্বরূপ বিবেকানন্দের একটী কথার তিনি পোষকতা করিতেন, তাহা এই যে—অলসতা চুরী অপেক্ষাও দূষণীয়। কেননা, চুরী করিতে হইলে কিছু চেষ্টার (Energyর) প্রয়োজন হয়, ক্রমে সেই চেষ্টা ভাল দিকে ফিরাইলেই ভাল হইয়া যায়, কিন্তু যে অলস তার কোনই আশা নাই। তাঁহার যেরূপ কার্য্যশীল জীবন ছিল, তিনি যে অলসতার বিরুদ্ধে চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পরনিন্দা পরচর্চ্চাতেও তিনি ঐরূপ বীতরাগ ছিলেন; তাঁহাকে প্রায়শঃই অপরের চর্চ্চা করিতে শুনা যাইত না। যে কেহ অলস ভাবে সময় কাটায় ও পরচর্চ্চায় গা ঢালিয়া দেয়, তাহাকে তিনি মনুষ্যের বহির্ভূত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দোষগুণেই মনুষ্য জীবন গঠিত; তাঁহার দোষ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার গুণ আলোচনা করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। কেননা তাঁহার ন্যায় গুণবান পুরুষ সচরাচর হয় না।

১০।১২ বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত হেড কম্পিউটারের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া "রায় সাহেব" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অফিসের কর্ম্ম করিয়া পরিবার প্রতিপালন, সন্তানদের বিদ্যা-শিক্ষা ইত্যাদি নির্ব্বাহ করতঃ তিনি তাহাদিগের ভবিষ্যতের জন্য ৫ খানা বাড়ী ও ১ খানা বাগান-বাড়ী তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। এই দেশের উন্নতিকল্পে এতগুলি সৎকার্য্যের সূচনা করিয়া তাহা সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানালোচনা সম্বন্ধেও তাঁহার ন্যায় একজন গৃহস্থ ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয় না; নানাবিধ সৎগ্রন্থ, ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত, নানাবিধ শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ মহাভারত, ইত্যাদি গ্রন্থ, মাসিক পত্রিকাদি বাঁধান ইত্যাদিতে তাঁহার গৃহে কয়েক খানা আলমারি পুস্তকে পরিপূর্ণ। তথাপি পুস্তক রাখিবার স্থানের সঙ্কুলান হয় না। তাঁহার বাগান-বাটীতেও আলমারিপূর্ণ পুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি যে কেবল এতগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া লাইব্রেরী সাজাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নয়; তিনি অতিশয় অধ্যয়নশীল ছিলেন, এই সকল পুস্তক তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বন্ধু বান্ধবগণের সহিত যখন অনেকক্ষণ বসিয়া আলাপাদি করিতেন, প্রায়ই তিনি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল; ভগবদ্গীতা গ্রন্থ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। পূর্ব্বে প্রতিদিন প্রাতঃকালে সুরসংযোগে গীতা পাঠ করিতেন। গীতা পুস্তক তিনি বাঙ্গলা পদ্যে তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, ছাপান হয় নাই। তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে পূর্ব্বে অনেক প্রবন্ধ পত্রিকাদিতে লিখিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার বিলক্ষণ ছিল; বলিতেন, শাস্ত্র সম্বন্ধে আলাপ করিব দুঃখের বিষয় এমন লোক দেখি না, দুরূহ বিষয় সমুদায় বুঝিতে চায় বা বুঝিতে পারে, এমন লোক কোথায়? ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পুস্তক লইয়া থাকিতে পারিতেন। তিনি নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন, কোলাহলে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেন না। তিনি শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; যাহা ইচ্ছা করিতেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইতেন। যাবতীয় দোষের মধ্যে অলসতা দোষ তিনি যেমন অপছন্দ করিতেন, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। দানাদিতেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। মাসিক ও বাৎসরিক চাঁদা, তদ্ভিন্ন উপরি দান, তিনি সাধ্যমত সর্ব্বদাই করিতেন। তিনি কি যৌবনকাল, কি বৃদ্ধকাল, কোন দিনই বিলাসিতার পক্ষপাতী ছিলেন না। বেশভূষার জন্য সময়ক্ষেপণ তিনি ভয়াবহ জ্ঞান করিতেন। স্বয়ং কোন প্রকার মাদক সেবন করিতেন না, ইহার অপকারিতা অপরকেও বুঝাইতে সচেষ্ট থাকিতেন। বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ পানীয় জল, বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধ, তিনি স্বাস্থ্যের উপযোগী জানিয়া আপন বাটীতে যথাসাধ্য তাহার বন্দোবস্ত করিয়া সন্তানগণের স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছিলেন। তিনি নিয়মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; এ বিষয়ে ইংরেজ জাতির প্রশংসা করিতেন। তাঁহার চরিত্রের আর একটী বিশেষভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে,—তিনি ধনীর অধিক সমাদর করিতেন আর গরীবের করিতেন না, এমন নয়। তাঁহার বিদ্বান ও ধনীমানী বন্ধুদিগের যেরূপ যথেষ্ট সমাদর করিতেন, অপরদিকে বিদেশী সাধারণ ব্যক্তিগণের সহিতও তাঁহার অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল; এমন কি আহারাদি চলা ফেরা সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে সমান ভাব রক্ষা করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। এই নিমিত্ত ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র অনেকেরই তিনি প্রিয় ছিলেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। বাল্যকালের ছাত্রাবস্থার বন্ধুবর্গও অনেকে তাঁহার সহিত পত্রাদি প্রচলন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার আতিথেয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রে আছে "সর্ব্বদেবোঽতিথিঃ"। তাঁহার ব্যবহারে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। অতিথিসেবা তিনি স্বহস্তে করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—অতিথির সুখ সচ্ছন্দতা বিধানের জন্য তিনি অস্থির হইয়া যাইতেন। অতিথি তাঁহার বাটীতে প্রায়ই আগমন করিতেন। কখন বা পথে কাহারও সহিত আলাপ করিয়া প্রয়োজনবোধে তাহাকে বাটীতে আহারের নিমিত্ত ডাকিয়া আনিয়াছেন। এক বার ঐরূপে একটী পলাতক বালককে আনিয়া ৫।৬ দিন বাটীতে রাখেন; পরে জানা গেল কলিকাতার কোন পদস্থ ধনী ব্যক্তির একমাত্র পুত্র। সংবাদ পাইয়া পিতা আসিয়া বিশেষ ধন্যবাদের সহিত পুত্রকে লইয়া গেলেন, এবং মাতামহের পরিচয় জানিয়া বলিয়া গেলেন, আমরা একই বংশের লোক। পূর্ব্বে দেরাদুনে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হইত এবং তাঁহারা পিতৃদেবের নিকট আলাপাদি করিতে আসিতেন

এবং তিনি সর্ব্বদাই বাটীতে তাঁহাদের আহারের বন্দোবস্ত করিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি মাসে মাসে বন্ধু বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি না করাইয়া থাকিতে পারিতেন না। সময় সময় তিনি উৎকৃষ্ট ভাবে আহারের বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম না হইলেও সাধারণ ভাবে মনের প্রীতিতে আহার করাইতেন। কেহ বেড়াইতে আসিলে কিরূপে আদর করিবেন ঠিক পাইতেন না; বিশেষ ছোট ছেলে মেয়েরা যখনই আসিত তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ফুল ফল দিয়া হাসি গল্পে তুষ্ট না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

বাহিরের নানা সৎকার্য্যে শরীর মন ঢালিয়া দেওয়াতে তাঁহার আত্মসাধনা জ্ঞানালোচনার দিক হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। আবার বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি যখন অতিশয় ব্যাপৃত হইলেন, তখন সামাজিক বা সৎকার্য্যের দিক হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন যখন সকল ঝঞ্ঝাট হইতে, সকল কর্ম্ম হইতে, অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পুনরায় জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় আপনার সমুদায় শক্তি নিয়োজিত করিবেন। তিনি বাগানে সাধুদের বাসোপযোগী আর একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কখনও বা সেখানে "হরিসভা" প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্ম প্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। দেহত্যাগের ৯ মাস পূর্ব্বে শীতকালে তিনি যখন বাঙ্গলাদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন অযোধ্যায় যেদিন All India Sankirtan party এর ভারতীয় কীর্ত্তন ছিল, সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং স্বামী কৃষ্ণানন্দ গোস্বামী নামক একজন মহাত্মাকে দেরাদুনে আসিয়া হরিসভা স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার পাথেয় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি উদারপ্রাণ ছিলেন। কোন ধর্ম্মকেই অশ্রদ্ধা করিতেন না। আর্য্যসমাজের যে কোন কার্য্যে তিনি বিশেষ উৎসাহী হইয়া তাহাদিগের সহিত সমপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বেদপাঠ, হোম ও নিমন্ত্রণাদিতে সপরিবারে যোগদান করিয়াছেন। হিন্দুদের দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিজয়া-সম্মিলনে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া জলযোগ করিয়াছেন এবং বাটীতে আসিয়া যাঁহারা প্রণাম আলিঙ্গনাদি করিয়াছেন তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত প্রতিদানে এবং মিষ্ট দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সভা সমিতিতে যোগদান করিতে, এবং মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের কার্য্যাদিতে সহায়তা প্রদর্শন করিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই।

ঈশ্বর-ইচ্ছায় তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগের পূর্ব্বে একবার বঙ্গদেশে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় আত্মীয়গণের সহিত মাঘোৎসবে যোগদান করতঃ তিনি স্বীয় জন্মভূমি শ্রীহট্ট গমন করেন। তথায় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া বহুকাল পরে বন্ধু বান্ধব ও জন্মস্থান পরিদর্শন করিয়া আনন্দিত হন। তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে বেলুড় মঠের কীর্ত্তন দেখিয়া তিনি পুরী, ভুবনেশ্বর ও নবদ্বীপ গমন করেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি বেনারস, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া আসেন। এবার দেরাদুনে ফিরিয়াই তিনি একবার বদরিকাশ্রমে যাইতে ও বৃন্দাবন যাইয়া কিছুদিন বাস করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ হইল। এ সংসারে থাকিয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় যোগধর্ম্ম লাভ করা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কোন্ অলক্ষিত নীরব আদেশে অকস্মাৎ সেই কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল; কর্ম্ম করিতে করিতে সহসা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পৃথিবীর যাবতীয় আপন বস্তু প্রিয়বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উন্নততর লোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করা, তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করা, তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা, এক্ষণে তাঁহার প্রতি আমাদিগের পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অদ্য এই পবিত্র শ্রাদ্ধদিবসে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া তদীয় চরণে প্রণত হই এবং পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার সকল প্রকার দুঃখ দূর করিয়া তাঁহাকে নিত্যসুখে সুখী করুন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত আমাদিগকে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বুঝিতে সক্ষম করুন ও উন্নততর জীবন লাভে আকাঙ্ক্ষিত করুন এবং তাঁহার কৃপায় দুঃখ শোকে তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি এই পরিবারে প্রকাশিত হউক। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

অমর কথা

নিমেষে না ধীরে ধীরে মহাপ্রয়াণ বাঞ্ছনীয় ?

(Is slow decline or sudden death most desirable ?)

শান্তি-সলিল ঢাল্‌বে ব'লে
মরণ-বেদন-পথে
তাই কি তোমার বিজয় নিশান
ভক্তজীবন-রথে ?
শুভক্ষণটী ঘনায় যবে
মরণ-শয়ানপাশে,
তোমার বিভা-মাল্যকুসুম
সকল বেদন নাশে।
এ কি তোমার শান্ত লীলা,
কোমল পুলক পাখা
নিবিড় ক'রে ছাইল মোরে
প্রেমানন্দে মাখা।
বাড়াসনে পা, পাপের ছবি,
আমার শয়ান পাশে,
যেথায় জাগি মরণ-গানে
বিরাম-সুখের আশে
জীবন-আলো ফুরিয়ে এল,
সন্ধ্যা-সুরের গানে,
চোখের আলো নিবল যখন
মরণ-সখার তানে।

শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত এম এ কর্ত্তৃক Meditations on Death and Eternity গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ।

দেবলোকের আসন ছাড়ি'
আসে স্বরগ-বালা,
আনে তোমার শুভ্র করে
পুণ্য বিজয়-মালা।
আনন্দেতে পুণ্য গান
শান্তি-দোলার দোলে,
নিয়ে যাবে ব্রহ্মলোকে
প্রাণ-জুড়ানো কোলে।

এ কি নিদারুণ বাণী! এ কি বিনামেঘে বজ্রাঘাত! আজ যে ক'ঘণ্টা আগে আমার বুকের ধনের সঙ্গে কথা বলেছি! এই যে সেদিন তার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে! আহা! কি হৃষ্ট পুষ্ট কোমল তনুখানি তার! আহা! আর সে এ লোকে নেই? ও মা এ কি কথা! এ কি মর্ম্মান্তিক যাতনা! ভাষা পারবে কি এ কথা প্রকাশ করতে? শোকাতুর ভয়াতুর প্রাণ এ মরণকুহেলী মোচন ক'রে কোথায় ছুটবে? কেবলই ভয়! কেবলই ভয়! কি বোলছ তোমরা? আমারই মঙ্গলদাতা জীবনসখারই এই অমোঘ বিধান? যাঁর বিপুল বিধাতৃত্বের ভিতর বিশ্বকল্যাণ-বোধন বেজে উঠেছে, এ কি তাঁরই লীলা? ও গো বল, এ কি আমার প্রাণসখারই এ লীলা তবে?

হায়! হায়! তবে কেন মৃত্যুবিভীষিকা! এরই নাম কি রূপের খেলা? এ কি? প্রাণময়ী হাসি, অতি বুকভরা আশা, প্রাণ-জাগানো ভালবাসা, সব কি নিমেষে ফুরিয়ে গেল? কোন্ অজানার গোপন ঘরে তার ডাক পড়ে গেল! ও গো, সে কি বিচিত্র রহস্য! আমিও ত এক দিন ঐ চিরস্তব্ধতার ভিতর মৌনী হ'য়ে যাব। কে জানে কখন—আজ দিনের খেলা খেল্‌তেই হয়ত আবার ঘণ্টা বেজে যাবে! সে মরণসাগর-পারে পরম বিচিত্র রহস্যপুরে কোন্ নিমেষে আমিও ছুটব কে জানে? হবে কি নেওয়া প্রাণময় চিরন্তন বিদায়? কত সাধ আমার বুকের ধনদের কোমল পুলকস্পর্শ তৃষিত ব্যথিত বক্ষে জন্মের মত চেপে ধরি! কে জানে আনন্দে বিদায়-গান গাওয়া হবে কি না! ঐ যে আকুল-করা আহ্বান-বাণী! আর ত পারি না! ঐ মরণ-সাগর-পারেই আনন্দে পার হ'য়ে যাব। রইল তবে সব, দাও চিরন্তন বিদায়।

ঘরে ঘরে এ কি ছবি! মরণব্যাধির এ কি বিপুল প্রতাপ! কে গো মরণপথের যাত্রী এগিয়ে চলেছ? এ কি তোমার করুণ নয়নপাত! সাধ্য কে রক্ষা করে? ধীরে ধীরে চলেছ, এতেই কি আমার সান্ত্বনা? এ ক্ষীণ হাত দুখানা তোমার সেবা কোরবে, আর আমি বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হব? কোথায় আমার প্রস্তুতি? ওগো আমি যে আশা-মরীচিকা দর্শন করি। আমার প্রাণ-প্রিয়ের অনন্ত নিদ্রা আমি কেমন কোরে ভাবি? বল, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বাছা আমার বিদায়ের গান গায়, তবুও যে জননী-প্রাণ আশার মালা গাথে। আহা কি হাসি! এ কি মুক্তির আনন্দ! এই যে সত্যি সত্যি মরণ-বাঁশি বেজে গেল বুকের ঘরে। কই আমার বিদায়ের প্রস্তুতি? উঃ, এ কি তীব্র বেদনা! কোথায় আরাম, কোথায় শান্তি?

আবার ভাবি, সত্যি সত্যিই কি আনন্দধামের যাত্রী তুমি কালব্যাধির ভীষণ যাতনায় ক্লিষ্ট? তবে কেমন ক'রে ভীষণ রোগের অখণ্ড প্রতাপ? তবুও এমন হাস কেন? ও কি শুভ্র বিমল বিভার আনন্দে বদন জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠল! ও কি আনন্দ, ও কি স্নিগ্ধ মুগ্ধ আলোকজ্যোতি! আমি ত ভাবতে পারি না কেমন কোরে ফুটন্ত ফুল ঝ'রে পড়ে, কেমন কোরে রাঙা মুখখানি সাদা হোয়ে যায়, কেমন কোরে ঢল ঢল নয়ন দুটীর মাধুরীজ্যোতি ম্লান হ'য়ে আসে। উঃ এ কি মুক্তির বেদনা? এ ত সইতে পারি না! ওগো সকলদুঃখহরণ দয়ার ঠাকুর, মুক্ত কর, মুক্তির আনন্দ দান কর। শান্ত স্নিগ্ধ আনন্দময় চিরবিরামময় কোলেই স্থান দেও।

ওগো এমনি কোরে বিনা মেঘে যখন অশনিপাত হয় তখনও চম্‌কে উঠি। আবার মৃত্যুকালিমা যখন ধীরে ধীরে ছেয়ে যায়, সোনার তনু ম্লান হোয়ে যায়, তাতেই বা কোথায় শান্তি? তবুও ত পাগল বাঁশি বাজ্‌বেই বাজবে আমার ঘরে। যাব ত ঐ সুরেই পাগল হোয়েই আনন্দে আনন্দধামে।

তবুও কেন আর জটিল তর্ক? তবুও কেন বল এ যে নিমেষে বজ্রাঘাত? হায় হায়! বলা হোল না, সন্তানে আমার নাম বলা গেল না। কিসের বিচার কর দীন সন্তান তুমি? অনন্ত ভূমা মহানের মঙ্গল ন্যায়দণ্ডে বিশ্বলীলা নিয়ন্ত্রিত। কে তুমি ক্ষুদ্র মানব বিচার কর? যে করুণার বিচিত্র মহিমায় মানবের বুকে অপূর্ব্ব প্রাণকাহিনী ফুটে উঠছে, যে মঙ্গল ইচ্ছার ভিতর সমস্ত মহিমান্বিত, আমি কেমন কোরে বলি, ওগো এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল? এমনি কোরে সব শেষ হোয়ে যায়, তবু এ কি তোমার দয়ার পরিচয়?

ভয়চকিত বিরহবিধুর চিত্ত কেবলই চম্‌কে উঠে। কেবলই অমঙ্গল, কেবলই বিভীষিকা! ও কি খেলা? ঐ শোন ভূকম্পের ভীম গর্জ্জন, ভীষণ বন্যা। এ কি নিমেষে লক্ষ লক্ষ প্রাণ চ'লে গেল! পাপী তাপী সাধু অসাধু সবাই গেল ভেসে সে মরণ-পারাবারে! ন্যায় বিচারক কে তুমি এমনি কোরে সকলকেই একই পথে নিয়ে চল?

ওগো কে তুমি চাও ক্লান্ত রোগশয্যায় শায়িত হ'য়ে, অনু-তাপের ভীষণ অগ্নিতে পু'ড়ে, সোণা হ'য়ে সোণার দেশে জাগাতে? ওরে অবোধ মন, মরণক্ষণে হোমানল জ্বাল্‌লেই কি হোল? মরণক্ষণে অনুতাপ-অশ্রুজলেই কি সব ধুয়ে গেল? ওগো অমৃতের অধিকারি, তোমায় যে নিত্য জাগরণ-মন্ত্র শিখ্‌তে হবে, তোমায় যে নিশিদিন তপস্যার হোমানল জ্বালিয়ে প্রাণময় আহুতির ভিতর দেবগন্ধ মেখে চল্‌তে হবে। যতদিন যাত্রা রূপের দেশে, জাগ্রত গান গেয়েই চল্‌তে হবে, সেই মহীয়সী ইচ্ছারই জয়লীলা ঘোষণা করতে হবে। আমি কি জানি কিসে মঙ্গল? সেই ভূমা মহানের মহীয়সী মহিমার ভিতর, তাঁর আনন্দলীলার ভিতর, প্রতি প্রাণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আবার সেই ইচ্ছামঙ্গলের ভিতরই আমার শুদ্ধ আবেশ, অনন্ত সমাধির আয়োজন। ওগো কে আমায় জাগায়? কেন আমায় মরণ-দোলায় দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম-ভাঙানো দেশে নিয়ে যায়? কে আমার কর্ম্মক্লান্ত তনুকে সন্ধ্যার শান্ত স্নিগ্ধ নিবিড় অঞ্চলতলে চিরবিরামময় আশ্রয় দান করে? কার অজানা মুগ্ধ গোপন হস্ত আমায় শান্ত আনন্দ-কোলে স্থান দেয়? কে তুমি দীন অহঙ্কৃত মানুষ, তোমার ব্যর্থ বিচারের

মানদণ্ডে সব তুলনা করবে? ওগো তোমার বিচারের মাহাত্ম্য কতটুকু? সীমার ভিতরই যে তোমার আনাগোনা। সীমার বুকে বিচারের মাহাত্ম্য কোথায়? ক্লান্ত তপ্ত অনুতপ্ত মানুষ পুণ্যধারায় স্নিগ্ধ হ'য়ে দেবত্বের মহিমা লাভ করে। কিন্তু কই মানবের অপরাজিত ঔদার্য্য তাকে বুকের ঘরে টেনে নেয়? কেবলই ভুল-বোঝার দ্বন্দ্ব, কেবলই অপ্রেম, তীব্র শাসন। ঐ দেখ পাপী, তোমার জন্য অনন্ত নরক। কোথায় বেদনাভরা সহানুভূতি? কোথায় সবাইকে সে স্নিগ্ধ প্রেমগৌরবদান? তবে আর কেন অনুতাপের কথা মরণ-ক্ষণে! সমগ্র জীবন হেলা-ফেলা, এখন মরণ-মুহূর্ত্তে অনুতাপের কথা! এই কি মানবের চির সমাধান? যদি দেবত্বের অধিকার হোয়েছে, তবে সংগ্রাম-সাজে সেজে সেজেই, প্রবল প্রতিকূল ঝঞ্ঝার ভিতরই, আনন্দময়ের আনন্দ-পরিচয়পত্র বহন কোরতেই হবে।

যখন শক্তি সামর্থ্য, তখন আমার ব্যর্থ আস্ফালন। আর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ মন যখন, কেমন কোরে ব্যর্থ বোঝা বহন করি? তখনি কেবলই মৃত্যুভয়। যেদিন মরণবাঁশি বেজে উঠ্‌ল, গাইবে কেমন কোরে, 'মরণরূপে এসেছ প্রভু, চরণ ধরি' মরিব হে?' শুদ্ধতার ভিতরই মৃত্যুর আনন্দ পরিচয়। তাই আশৈশব শুদ্ধতার ভিতরই মৃত্যুর আনন্দ পরিচয়। তাই আশৈশব শুদ্ধতার মন্ত্রে জাগতে হবে। তাইত মৃত্যুর মঙ্গল আলোকে গৃহে গৃহে শান্ত স্তব্ধ সমাধি। তাইত ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু মাঝে অমৃতা হবার পিপাসা।

ওগো আর ত পারি না সংগ্রাম-সাজে সাজ্‌তে। আর ত চলে না আমার জীর্ণ তরি! নিত্য-তরি কবে আস্‌বে? আর ত পারি না নিন্দা গ্লানির তীব্র দাহন সহ্য কোর্‌তে! কোথায় আরামময় মৃত্যু? এস ওগো মরণ-সখা, এস নিমিষে চকিতে সকল জ্বালা জুড়িয়ে দাও। ওগো দীন ক্লান্ত যাত্রি, কেন এ অভিযোগ? কেন এ ব্যর্থ কপট ক্রন্দন? এ অভিযোগের নিবৃত্তি কোথায়? ব্যক্তিত্বের মহিমা তবে কোথায়? এই জ্ঞানময় লীলাযজ্ঞে ব্যথিত ক্লিষ্ট মানব, তোমার বেদনার দানই যে তোমার জয়পত্র। কেমন কোরে ইচ্ছা কোরে মৃত্যুর আবাহন-গান গাইবে বল? এমন সাধের জীবন-বীণাখানি তোমার, বাজাও আনন্দে বিচিত্র বেদন-গান। কেমন কোরে থেমে যাবে সব কে জানে? এত শোক, এত তাপ, তবুও ত চলেছে সব যাত্রীই সে মহাযাত্রার আয়োজনে। কে চায় শ্মশানের অগ্নিলীলা দেখ্‌তে! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাযজ্ঞেই আমার সমস্ত দুঃখবেদনার আহুতি নিবেদন কোরেই জাগরণ-প্রতীক্ষা। জানি তুমি মঙ্গলময়।

এই প্রাণময়ী ইচ্ছালীলার ভিতরই জীবাত্মার মঙ্গল মাধুর্য্য। কোথায় আমার মৃত্যু? আমার স্রষ্টা পাতা জীবন মরণের ভাগ্য-বিধাতা প্রাণময় সম্বল; ঐ অভয় চরণ বুকে ধোরেই আনন্দে ভবপারাবারে পার হোয়ে যাব: কোথায় ভয়? মানবতারণ ঐ নাম জপ কোরেই যে মাভৈঃ বাণী বেজে উঠেছে!

কোথায় আমার মরণ-সখা এস! এস আজ জরাব্যাধির কঠোর নিষ্পেষণের ভিতরে, এস আমার ব্যর্থ মোহ-সংগ্রামে, এস আমার আনন্দলীলা, জয়-দুন্দুভিতালে, বিজয়-গৌরবদানে, এস আমার অভয় নিদ্রা। ভয় কোথায়?

কেমন কোরে মহানিদ্রার আয়োজন হবে? জানি কি বিচিত্রময়ী নিদ্রার বিচিত্র সত্তা? জানি কি মরণকাটি কেমন কোরে আনন্দে জাগিয়ে দেবে? সে কি হিমস্পর্শ! আঃ শীতল হোয়ে গেল সব, সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল, সকল দাহন নিমেষে স্নিগ্ধ শীতলতা লাভ কোরল! ও কেমনতর মায়ের কোলে শিশুর নিত্য নির্ভয়ে বিশ্রামানন্দ!

আমার অস্তিত্বের লয় কোথা? কোথায় সে সন্দেহ-কুহেলী! নীরব সখার নীরব জয়-যান বিজয়গাথা শুনিয়ে যাচছে। সোণার দেশের খবর এসেছে, মঙ্গল ইচ্ছা বিশাদ আনন্দ-আলোক জাগিয়ে দিচ্ছে। তাইত মৃত্যুমাঝে অমৃতধাম। সে কি মঙ্গল প্রভাত! এ কি অনুভূতি! পরমাত্মার আনন্দ বুকে আমার অভয় আশ্রয়, আমার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। কোথায় আমার বিনাশ, কোথায় আমার বেদনদাহন?

অনন্তের পূজারি! পূজারিণি! মঙ্গল-চন্দনলেখা তোমাদের কপালে, অমৃতের ছাপ, তবে মৃত্যুভয় কেন? ব্যর্থ মর্ম্মান্তিক পীড়নে ক্ষুব্ধ হই, তাই দেবত্বের মহিমা ভুলে যাই। কেন এ জীবন-সংহারী মৃত্যুবিভীষিকা? তাইত অবসাদ, অথচ নিমেষে মৃত্যু-যবনিকা উধাও হোয়ে যাবে, কেমন কোরে কে জানে? অমৃতের সন্তানের কেন এ মহাসন্তাপ? আনন্দে তরি বেয়ে যাই। আনন্দ আমার এস। আনন্দে তোমাতেই নিত্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

এসেছ মৃত্যু তোমার যোগসুন্দর স্বরূপে। ভয় কি তবে জীবাত্মার? প্রাণময়ী আত্মার মৃত্যুসাগরপারে ধন্য অক্ষয় জাগরণ। আমি ত অভয়চরণতরি বুকে কোরে আনন্দে চলেছি গান গেয়ে। ঐ বুঝি মরণ-বাঁশি বেজে উঠ্‌ল—যে কাজ সাধ্‌তে আসা সেধে চল, দিনের আয়োজন নিষ্ঠার আনন্দে ভরিয়ে তোল। কল্যাণের ভিতর অনন্ত প্রতিষ্ঠালাভ হবে। কর্ত্তব্য নিষ্ঠা সব দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলি। এমনি কোরে রূপের খেলা খেল্‌তে খেল্‌তেই এগিয়ে যাব। মৃত্যুভয় কোথায়?

গৃহী তোমার গৃহকুঞ্জ আনন্দ-গানে ভরিয়ে তোল। ভক্তি প্রীতি শান্তি পুষ্প থরে থরে পুণ্য আমোদগন্ধে সব ভরিয়ে তোল। ঘৃণা হিংসা দ্বেষ কোথায়? কোথায় ঐহিকতা দৈহিকতা? বিশ্বপ্রাণেই আনন্দ-প্রণতি। কোথায় দৈন্য, কোথায় ভয়? জীবন-বীণা যে অভয় গানে রণিত হোয়ে উঠেছে। মহা প্রাণেই প্রাণ-লীলা। কিসের দৈন্য বেদনার লাঞ্ছনার দান? অন্তর্যামী ভব-তাপহরণ জানেন আশৈশব সংগ্রাম, জানেন কেমন কোরে ছুটি পাপ থেকে পুণ্যে, সীমা থেকে অসীমে, রূপ থেকে অরূপে। আমার উত্থান পতনের ভিতরেই, ধূলা কাদা মেখেই, চলেছি মায়ের ঘরে, মায়ের বুকে। কোথায় আমার লজ্জা ভয়, সঙ্কোচ দ্বিধা? চাই যে ভক্তপ্রাণের প্রাণময় নির্ভর, বরাভয় শান্ত আশ্রয়।

আসুক সে প্রেমোৎসর্গ। এস আমার অরূপরতন সবাইকে নিয়ে, নিমেষে সকল জটিল তর্ক ও প্রেম-গভীরে ডুবিয়ে দাও। ঐ যে শান্তিময়ী প্রাণময়ী মহানিদ্রা। এস আমার শান্তিসুধা। কোথায় কুহেলী স্বপ্নঘোর। বন্ধনমুক্তির বেদন-গানেই মৃত্যু-যবনিকার অন্তরালে শান্ত শুদ্ধ ধাম। বিশ্বকল্যাণেই সমস্ত বিকশিত, বিশ্বকল্যাণেই মহাযাত্রা। চিরকল্যাণময়, তোমারই জয়গানে আনন্দ বিশ্রাম।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ।

দীক্ষা—গত ১৬ই এপ্রিল ঢাকা নগরীতে উক্ত জিলার অন্তর্গত রাড়ীখাল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাসের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান সত্যভূষণ দাস পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। করুণাময় পিতা নব দীক্ষিতকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩রা বৈশাখ হাওড়া নগরীতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সাহার তৃতীয়া কন্যা কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ২১ শে জ্যৈষ্ঠ তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ২৭ শে এপ্রিল বেনারস নগরীতে কলিকাতা উপাসক

মণ্ডলীর সভ্য বাবু নগেন্দ্রনাথ দে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ৩০ শে মে কলিকাতা নগরীতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার নামে একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ৩০ সে মে বরিশাল নগরীতে পরলোকগত রায় বাহাদুর প্রেমানন্দ দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস শাস্ত্র ও জীবনী পাঠ এবং শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস প্রার্থনা করেন। তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতাগণ এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ৫০৲ বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ৫০৲ বরিশালে কাঙ্গালীদিগকে ৫০৲ পুরীতে কাঙ্গালীদিগকে ৫০৲ দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

প্রচার—গয়া—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত একটি বিবাহ উপলক্ষে গয়া গমন করেন। সেখানে উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায়, এবং কয়েক দিন একটি পরিবারে, উপাসনা করেন। পাটনা—গয়া হইতে পাটনা গমন করিয়া সেখানে ৫ই মে সন্ধ্যাকালে রামমোহন রায় সেমিনারীতে কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। তৎপরে ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা হয়। ৬ই মে সকালে রামমোহন সেমিনারীতে উক্ত স্কুলের বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে একটি গল্প বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। ৮ই মে গর্দ্দানীবাগে অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত তৃষিতকুমার দত্তেরগৃহে সম্মিলিত কয়েকটি মহিলা এবং বালকবালিকাগণকে গল্প বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে সম্মিলিত ব্রাহ্মবন্ধু ও মহিলাদিগকে লইয়া সাপ্তাহিক উপাসনা করেন। ৯ই মে রবিবার সকালে রামমোহন রায় সেমিনারী গৃহে সাপ্তাহিক উপাসনা করেন এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সাধন বিষয়ে উপদেশ দেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণে ডাক্তার পি, সি, রায়ের গৃহে মিলিত বালক বালিকাদিগকে গল্প বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যাকালে গর্দ্দানীবাগ বাঙ্গলা লাইব্রেরীতে একটি সভায় "রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভক্তিরস" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

শুভ বিবাহ—গয়া প্রবাসী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী মাধুরীর সঙ্গে চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করিয়াছেন।

গত ১৩ই মে ঢাকা নগরীতে রায় সাহেব প্যারীমোহন দাসের কন্যা কল্যাণীয়া অনুপমা ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাসের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান সত্যভূষণের শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ৫ ; কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ ; ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে ৪৲ ; বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ২৲ ; পূর্ব্ব বাঙ্গালা প্রচার আশ্রমে ৭৲ ; আসাম প্রচার কার্য্যে ৫৲ ; ঢাকা অনাথ আশ্রমে ১০৲ ; ঢাকা অনাথ ভাণ্ডারে ৫৲ এবং ঢাকা বিধবা আশ্রমে ৫৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ৩ রা জুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিকের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুষমা ও মহীশূর নিবাসী পরলোকগত রাও বাহাদুর রামস্বামী নাইডুর পুত্র শ্রীমান বি, প্রাণাকুশ দাস নাইডুর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে বর দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ১০৲ ও দাতব্য বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ১১ই জুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারীর দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া পুষ্পলতা ও পরলোকগত বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছেঃ—

১৪ই মে সায়াহ্নে মহিলাদিগের জন্য বিশেষ উৎসব ; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন। ১৫ই মে পূর্ব্বাহ্ণে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য। সায়াহ্নে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতা হইতে প্রেরিত শ্রীযুক্ত নিরুপম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় ব্রাহ্ম বন্ধু সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন।

বাণীবন ব্রাহ্মসমাজ—বাণীবন ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছেঃ—

২০শে মে সায়াহ্নে উৎসবের উদ্বোধন ; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন রায়। ২১শে মে প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কালী মোহন ঘোষাল। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় পশ্চিমবঙ্গবাসী একেশ্বর বাদিগণের সম্মিলন ; সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। সায়াহ্নে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন। ২২শে মে সমস্তদিন ব্যাপী উৎসব—আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ; মধ্যাহ্নে প্রীতি-ভোজন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পশ্চিমবঙ্গবাসী একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন। এই সভায় শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া একটী কমিটী গঠিত হয় এবং স্থির হয় যে আগামী বর্ষে বাণীবনেই পশ্চিমবাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। ২৩শে মে প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত এক কড়ি সিংহ রায়। মধ্যাহ্নে বাণীবন ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক সভায় আচার্য্য, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। অপরাহ্ণে বালক বালিকা-সম্মিলন। ২৪শে মে প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ।

নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা—ভাই সীতারাম মিয়ান-ওয়ালীতে পাঁচ দিন অবস্থিতি করিয়া প্রচারাদি করিয়াছেন। তাহার ফলে তথায় একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ২৩শে মে রবিবার বিশেষ কীর্ত্তন উপাসনাদি করিয়া ভাই সীতারাম এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ২৫জনের অধিক লোক সমবেত হইয়াছিলেন। মিঃ জেতানন্দ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নূতন সমাজের সভ্যগণ সকলের প্রার্থনা ও শুভাকাঙ্ক্ষা ভিক্ষা করিতেছেন। করুণাময় পিতা নূতন সমাজকে দিন দিন শক্তিশালী করুন ও উন্নতির পথে লইয়া যাউন।

ছাত্রীদের বৃত্তি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইস্কুল (মেট্রিকিউলেশন) পরীক্ষায় করুণাকণা দাস গুপ্ত ২০৲, টাকার সাধারণ প্রতিযোগিতার বৃত্তি, এবং স্নেহলতা গুহ ২০৲, টাকার, লতিকা সেন ১৫৲ টাকার, সুকৃতী দাস ও সুধাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲, টাকার ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১লা আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি-এ,

Registered NO 65.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥
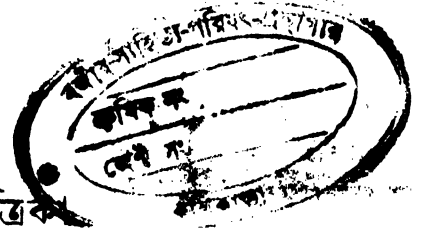
ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ১লা শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

৭ম সংখ্যা। 17th July, 1927. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় জীবনবিধাতা, আমাদের সকলের কল্যাণ, উন্নতি ও বিকাশের জন্যই, তুমি আমাদের উপর নানা গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার অর্পণ করিয়াছ—আপনাদের ক্ষুদ্র সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও অপর সকলের সেবায় ও কল্যাণবর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় করিয়া দিয়াছ। কিন্তু আমরা অনেক সময় সে ব্যবস্থার কথা ভুলিয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া নীচ আরামে ও সুখে মজি, অপরের উপর সে ভার প্রদান করিয়া উদাসীন ভাবে জীবন কাটাই। আমাদের ত্রুটিতেই যে সকল কার্য্য পণ্ড হইতেছে, অসম্পূর্ণ থাকিতেছে, তাহা না দেখিয়া অন্যের উপর সকল দোষের বোঝা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। ইহার দ্বারা যে সমাজ অপেক্ষা আমরা নিজেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হই, নিজের দ্বিগুণ অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা চিন্তাহীনতাবশতঃ একটুও বুঝিতে পারি না। তাই ত হে সর্ব্বদর্শী পিতা, তুমি দেখিতেছ দিনের পর দিন আমাদের জীবনে ও সমাজে তোমার মঙ্গল ব্যবস্থা কত বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইতে পারিতেছে না—অনেক কার্য্যই নিতান্ত মৃত ভাবে চলিতেছে। হে করুণাময় জীবনবিধাতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া না দিলে, প্রাণে শুভ সংকল্প না জাগাইলে, হৃদয়ে প্রেম ও শক্তি না দিলে, যে আর কোনও প্রকারেই আমরা দুর্গতি হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না, আমাদের জীবন ও সমাজ সুস্থ সুন্দর হইয়া উঠিতেছে না। তুমি আমাদের উপর যে কর্ত্তব্যভার প্রদান করিয়াছ, তুমিই কৃপা করিয়া তাহা পালন করিতে সমর্থ কর। আমাদিগকে ক্ষুদ্র স্বার্থে ও আরামে ডুবিয়া থাকিতে দিও না। আমরা যেন আর প্রকৃত কল্যাণ ভুলিয়া অসার সুখের পশ্চাতে ধাবিত না হই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

অসংযত আকাঙ্ক্ষা—কোনও জিনিষের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ পোষণ করিও না; ধন, জন, পদ, মান, মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে, তার জন্য দিন রাত ভাবে, দিন রাত পরিশ্রম করে। মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা ত পূর্ণ হয় না। কত ছুটা ছুটি, কত পরিশ্রম, সবই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। মনে অশান্তি উপস্থিত হয়, প্রাণ ছট্ ফট্ করে। যখনই কোনও বস্তুর জন্য ঐকান্তিক ব্যগ্রতা জন্মে, তখনই চিত্ত অস্থির হয়, তা না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণে শান্তি নাই। পেলেই কি শান্তি আসে? প্রাপ্ত বস্তু রক্ষণে কত বাধা বিপত্তি। আবার অশান্তি। তুমি কি শান্তি চাও? তবে কোনও বিষয়ের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ ত্যাগ কর। মানুষের জীবনধারণের জন্য কত সুদ্ধ প্রয়োজন! ঈশ্বরে প্রাণ দিয়ে অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাক। বাসনার পশ্চাতে ছুটিলে প্রাণের সুখ হারাবে, শান্তি হারাবে। সারা জীবন কেবল ছুটা ছুটি করবে, প্রাণ শীতল হবে না, হৃদয়ে আনন্দ আসবে না। প্রভুর দিকে তাকিয়ে তাঁরই নামে বাসনা সংযত কর।

আমার শূন্য ঘরে—একে একে সকলে যখন চ'লে গেল, আমার শূন্য ঘরে কে জেগে থাক্‌বে? একে একে সকল প্রদীপ যখন নিভে গেল, আমার আঁধার ঘরে কোন্ প্রদীপ

জল্‌বে? কে এসে নিরাশ প্রাণে আশা জাগ্রত কর্‌বে? কে এসে আমার প্রাণের ক্রন্দন থামাবে? আমি যে সব শূন্য দেখি; চারিদিক আঁধার দেখি! আমার যে বন্ধু নাই, বন্ধন নাই, সম্বল কিছুই নাই। প্রাণের কথা শুন্‌তে চায় এমন কেহ নাই। একে একে সকলে চ'লে গেল, একে একে সব বাতি নিভে গেল; ক্রমে ক্রমে সকল সম্পদ ফুরিয়ে গেল, একটি একটি ক'রে সকল আশা উড়ে গেল। এখন কে আমার সঙ্গী? কে আমার সম্পদ? কে আমার জীবনের আলোক ও আশা? আমি শূন্য ঘরে একা ব'সে কাঁদি। আর কে আছে? এই যে তুমি আছ। আঁধার ঘরে আলোক হ'য়ে আছ, নিরাশ প্রাণে আশা হ'য়ে আছ। আমি তবে একা নই; তুমি আমার বন্ধু, সখা, সাথী হ'য়ে দিবানিশি আমার সঙ্গে আছ। তবে আমার আর ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই, ভয় নাই। তোমাকে নিয়ে এই শূন্য ঘরে আমি থাক্‌ব। তোমার চরণে প'ড়ে থাক্‌ব; তোমার নাম দিবা নিশি জপ কর্‌ব। আমার আর কিছু কর্‌বার নাই।

ব্রহ্মকৃপা—ব্রহ্মকৃপাই আমাদের সম্বল। তাঁকে লাভ কর্‌ব, তাঁকে প্রকাশ কর্‌ব, এমন শক্তি ও সাধনা, এমন জ্ঞান ও প্রেম আমাদের কি আছে? প্রদীপ দিয়ে কি সূর্য্যকে দেখা যায়? তিনি করুণা ক'রে যখন প্রকাশিত হন, তখনই তাঁকে দেখা যায়। তবে আমাদের কি কিছু কর্‌বার নাই? আছে বৈ কি। আমরা প্রতীক্ষা কর্‌ব, তাঁর কৃপায় নির্ভর ক'রে, প্রতীক্ষা কর্‌ব; তাঁর আসার আশায় প্রতীক্ষা কর্‌ব। ট্রেনের যাত্রী যেমন পোটলা পাটলী গুছিয়ে নিয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে,—সেই রূপ প্রিয়তমের আসার জন্য প্রতীক্ষা কর্‌ব। তাঁর নাম কর্‌ব, তাঁর ধ্যান কর্‌ব, তাঁর প্রসঙ্গ কর্‌ব, পূত চিত্তে তাঁর স্বরূপ চিন্তা কর্‌ব, আর সর্ব্বোপরি প্রার্থনা কর্‌ব। "প্রভু, আর যে দিন চলে না, তুমি দেখা দাও," এই ব'লে কাতর প্রার্থনা কর্‌ব। ইহাই আমাদের কাজ। কত দিন, কত কাল প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে, জানি না। নির্ভর তাঁর কৃপার উপর। "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্‌" ইহাই জীবনের মূল মন্ত্র।

সম্পাদকীয়

কেন এরূপ হয়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সাম্বৎসরিকোৎসবের কথা বলিতে যাইয়া, আমাদের বিবিধ কার্য্যের জন্য যে যথেষ্ট অর্থের ও উপযুক্তসংখ্যক একনিষ্ঠ কর্ম্মীর অভাব রহিয়াছে এবং তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা যত্নের যে একান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, আমরা গত সংখ্যায় সে কথার কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে কোনও ফলপ্রদ উপায় অবলম্বন করিতে হইলেই, কেন এরূপ হইল তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত আমরা প্রকৃত পন্থাবলম্বনে সমর্থ হইব বলিয়া মনে হয় না। আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেরই অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, সকলেই দিন দিন দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। অপরে যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিতেছে, বহু সংখ্যক একনিষ্ঠ ত্যাগী কর্ম্মীও প্রাপ্ত হইতেছে। আর আমাদের মধ্যে কেন তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে, তাহা কি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ও গভীর রূপে চিন্তা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক নহে? সংস্কারার্থী ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য প্রচার। অপর যাহা কিছু সমস্তই প্রচারের আনুষঙ্গিক। যদি বিশুদ্ধ ধর্ম্মই প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত না হইল, তবে উহার প্রধান উদ্দেশ্যই অসিদ্ধ রহিল, উহার অস্তিত্বের বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয়তাই থাকিল না। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই অপর সকলের আবশ্যকতা। অন্য সমস্তই যদি পূর্ণ মাত্রায় সাধিত হয়, তথাপি এক ধর্ম্মের অভাবেই সকল বৃথা হইয়া গেল। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যই ধর্ম্মসমাজ। অন্যান্য সাধু কার্য্যের জন্য অপর বহু প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে এবং আছেও। তাহাদের যতই প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন, তাহারা কিছুতেই ধর্ম্মসমাজের স্থান অধিকার করিতে পারে না। আর ধর্ম্মসমাজের পক্ষে সে সকল কার্য্য যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, তাহা কিছুতেই যথেষ্ট নহে, শুধু তাহাতেই ধর্ম্মসমাজের কার্য্য পর্য্যবসিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় প্রচারের জন্য অজস্র ধারে প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকের স্রোত বহিয়া যাওয়াই ত জীবন্ত ধর্ম্মসমাজের পক্ষে স্বাভাবিক। যদি তাহা না হয়, তবে উহাকে কি নিতান্ত অস্বাভাবিকই মনে করা উচিত হইবে না? নিশ্চয়ই কোথাও কিছু প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে না? কাজেই এই সমস্যার একটা মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ যে সকল কথা শুনিতে পাই, তাহার একটু আলোচনা করিলে হয় ত আমরা এ সম্বন্ধে কিছু আলোক পাইতে পারি, একটা পথ দেখিতে পারি। তাই বর্ত্তমান বিষয়ের অবতারণা।

প্রথমতঃ, অনেকে বলেন যখন প্রচারকগণ নানা স্থানে ঘুরিয়া উৎসাহের সহিত প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তখন উক্ত কার্য্যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা লোকে অতি উজ্জ্বল ভাবে অনুভব করিতে পারিত এবং তাঁহাদের মধ্যে একটা উদ্দীপনাও সঞ্চারিত হইত। সুতরাং লোকে আগ্রহের সহিত প্রচারভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিত, কষ্ট স্বীকার করিয়াও এই জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না। শুধু ব্রাহ্মগণের নিকট হইতেই যে এই ভাবে অধিকতর অর্থ সংগৃহীত হইত তাহা নহে। তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা অন্যান্য লোকও অনেকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতেন এবং প্রচুর অর্থসাহায্য করিতেন। আজ কাল প্রচারকার্য্য এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে বলিলেই চলে—অনেক স্থলে উৎসবাদির সময় প্রচারক চাহিয়াও কাহাকে পাওয়া যায় না, অন্য সময়ও অধিকাংশ স্থানে কেহ বড় একটা যান না, কোথাও কোনও সময়ে গেলেও সামান্য কিছু কাজ করিয়াই চলিয়া যান,—অনেকেই সে সংবাদ

পায় না, তাঁহারাও যাইয়া নূতন কাহাকেও আকৃষ্ট করিবার কোনও চেষ্টা করেন না, সাধারণ ভাবেও লোকের প্রাণে কোনও প্রকার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হন না, বা তাহা করিতে পারেন না। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান করিবার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করেন না; যাঁহারা করেন তাঁহারাও তজ্জন্য সেরূপ আগ্রহান্বিত হন না। বাহিরের লোকের মধ্যে ত সে প্রবৃত্তি জাগেই না। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে প্রচারকগণ আরও নানা প্রকারে পরোক্ষভাবে অর্থসংগ্রহবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেন—তাঁহারা সমাজের পত্রিকা দুইখানার অনেক নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিতেন, ও সমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি লইয়া যাইয়া লোকের নিকট বিক্রয় করিতেন। ইহাতে প্রকারান্তরে প্রচারবিষয়েও বিশেষ সাহায্য হইত। এই সকল লোকের অনেকে চিরদিন ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতি ও সাহায্যকারী বন্ধু হইয়া থাকিতেন,—কেহ কেহ ক্রমে সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মও হইয়া যাইতেন। তাঁহারা উক্ত প্রকারে সমাজের আয় বৃদ্ধির সহায়তা করা ব্যতীত এই সকল স্থান হইতে প্রাপ্য চাঁদা ও পত্রিকাদির বাকী মূল্য সংগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ ভাবেও সমাজের অর্থাভাব অনেক পরিমাণে দূর করিতেন। এই সকল সহানুভূতিকারী বন্ধুর নিকট হইতে সমাজের নানা কার্য্যের জন্য সময় সময় অনেক দানাদি যাহা পাওয়া যাইত, তাহাও নিশ্চয়ই তাঁহাদের কার্য্যের ফল মনে করিতে হইবে। সুতরাং অর্থাগম বিষয়ে তাঁহাদের সহকারিতা যথেষ্টই ছিল, কিছুতেই উপেক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু আজ কাল প্রচারকগণ অনেক স্থানে যান না, গেলেও শেষোক্ত প্রকারের কোনও কার্য্যই করেন না। এরূপ অবস্থায় যে প্রচারকার্য্যের জন্য যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে না, সমাজের অর্থাভাব বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? বরং তাহা যে আরও বেশী হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে একেবারেই মিথ্যা, ভিত্তিহীন, উহার মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই, আমরা এরূপ কিছু বলিতে পারি না। তথাপি আমরা কিছুতেই তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদিগকে আমরা স্মরণে রাখিতে বলি যে, বর্ত্তমানে আমাদের প্রচারকসংখ্যা যেরূপ অল্প এবং তাঁহাদের অধিকাংশ যেরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য, তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য দেখিবার আশা করা যায় না। শুধু কার্য্য দেখিয়াই অর্থ দিব, যে পরিমাণ প্রতিদান প্রাপ্ত হইব, সেই পরিমাণ অর্থই প্রদান করিব, এই প্রকার বাণিজ্যনীতির অনুসরণ আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। যাঁহারা আমাদের সেবার জন্য এত ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি যে আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, সে কথা ভুলিলে অন্যায় হয়। এতদ্ব্যতীত টাকার অভাবই যে প্রচারকার্য্যের বর্ত্তমান অল্পতার একটা প্রধান কারণ, সে কথা ভুলিলেও চলিবে না। পাথেয় হিসাবে যদি আমরা অধিকতর অর্থব্যয় করিতে পারিতাম এবং অধিক সংখ্যক প্রচারক নিয়োগ করিবার যথেষ্ট অর্থ যদি আমাদের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে যে আমাদের প্রচারকার্য্য আরও বিস্তার লাভ করিতে পারিত, আমরা চারিদিকে আরও অনেক স্থানে প্রচারক পাঠাইতে পারিতাম, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অর্থাগমের জন্য প্রচার-কার্য্যের বিস্তারের যেরূপ আবশ্যক, প্রচারকার্য্যের বিস্তারের জন্যও উপযুক্ত অর্থের সেরূপ প্রয়োজন। উহারা সমানুপাতেই হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাঁহারা যথেষ্ট প্রচারকার্য্য হইতেছে না বলিয়া অর্থ দিতে চাহেন না, চারিদিকে প্রবল ভাবে প্রচারকার্য্য চলিতেছে দেখিলে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন বা করিবেন বলিয়া থাকেন বা মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বীজ রোপণ না করিয়াই ফলসমন্বিত বৃক্ষ দেখিতে চাহেন, বিনা মূলধনে বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইবার আশা করেন। যাহাতে প্রবল ভাবে প্রচারকার্য্য চলিতে পারে, পূর্ব্বে তাহার কোনও প্রকার বন্দোবস্ত না করিলে, তাহা যে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে, সে কথা তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? প্রচারকগণ অর্থের জন্য ভাবিবেন না বলিয়া কি তাঁহাদের কোনও অর্থের প্রয়োজন নাই? আর সমাজের পরিচালকগণও যদি তাঁহাদের ন্যায় অর্থের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, তবে কি কাজ চলে? "আমার কাজ আমি করিয়া যাই, যেখান হইতে হয় অর্থ আসিবে, আর যদি না-ই আসে, উপবাসীই থাকিব"—ব্যক্তিবিশেষ এই ভাব-দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে বটে, কিন্তু কেহই অপরকে এরূপ ভাবে কোনও কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারে না। ভাল কার্য্য হইতেছে দেখিলে লোকে আপনা হইতে অর্থ সাহায্য করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাও আরম্ভ করিতে এবং কিছু দূর চালাইতে অর্থ চাই। আমি যাহা দেখিতে চাই, তাহার জন্য আমার যেটুকু করণীয় আছে তাহা যদি আমি না করি, তবে কি আশা করিতে পারি যে অপর সকলেই তাহাদের কার্য্য করিবে, আর কার্য্যটাও সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে? এরূপ আশা করা কি নিতান্তই অযৌক্তিক নহে? আমার যেটুকু কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে আমাকে তাহাই করিতে হইবে, তাহার পর অপরেও তাহার কর্ত্তব্য করিবে, আর তাহা না করিলেও আমার কর্ত্তব্য হইতে আমি কিছুতেই মুক্ত হইতে পারি না, এই কথা অস্বীকার করিবার কি কোন উপায় আছে? সুতরাং যদি আমরা প্রচারকার্য্যের বিস্তার দেখিতে চাই, তাহা আবশ্যক মনে করি, তবে আমাদের প্রত্যেককে সর্ব্বাগ্রে নিজের কর্ত্তব্যটুকু অবশ্যই করিতে হইবে—যাহাতে সে কার্য্যের সুব্যবস্থা হয়, সে জন্য যথাশক্তি অর্থপ্রদান প্রভৃতির দ্বারা উহাকে সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা যদি নিজ নিজ কার্য্য ঠিক ভাবে করি, তবে অপরেও তাহাদের কর্ত্তব্য করিতেছে দেখিতে পাইব। তাহা না করিয়া অপরের নিকট হইতে কিছু আশা করিবার অধিকার আমাদের নাই। সূক্ষ্মভাবে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়ত দেখিতে পাইব, অনেক স্থানে আমরা আপনার ত্রুটি ঢাকিবার জন্যই উক্ত প্রকার মিথ্যা যুক্তি অবলম্বন করি, অপরের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিজ বিবেকের দংশনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করি।

আমাদের মধ্যে অতিরিক্ত সুখ স্বার্থ আরামের স্পৃহা প্রবল হওয়াতেই হয়ত আমরা অপর কোনও সদনুষ্ঠানের জন্য অর্থ-প্রদান করিতে পারি না, আর মুখে বলি বা মনকে বুঝাই সে সকল কাজ ভাল ভাবে চলিতেছে না বলিয়াই কিছু দিতেছি না, দিতে ইচ্ছা হয় না—কাজ আগে চলুক তখন যথেষ্ট অর্থ দিব।

প্রচারকগণ অর্থসংগ্রহবিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় সাহায্য না করায় যে অর্থাভাবের একটা কারণ উপস্থিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিলেও, এ বিষয়ে তাঁহারা যাহা বলেন তাহা স্মরণ করিয়াই আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহারা মনে করেন যে, অর্থসংগ্রহবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে গেলে তাঁহাদের প্রধান কার্য্যের পক্ষে ক্ষতিই হয়—প্রচারকার্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়। যদিও আমরা মনে করি প্রচারকার্য্যের কোনও রূপ ব্যাঘাত না জন্মাইয়াও এই কার্য্য করা অসম্ভব নহে, তথাপি তাঁহাদের কথার মধ্যে যে অনেকটা সত্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার জন্য লোকের অপ্রীতি-ভাজন বা ভয়ের কারণ হইবার যে কোনই সম্ভাবনাই নাই, আমরা এরূপ কথা বলিতে পারি না। উভয় দিক সামঞ্জস্য করিয়া কাজ করা সম্ভবপর হইলেও, উহা যে নিতান্ত কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, তাঁহারা যদি পূর্ব্ববর্ত্তীদের ন্যায় উভয় দিক রক্ষা করা সম্ভবপর মনে না করেন, তবে আমাদের কি বলিবার আছে? অর্থসংগ্রহের বিষয়ে সাহায্য করা তাঁহাদের মুখ্য কার্য্য নহে, গৌণ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইলে হইতে পারে; কিন্তু গৌণের জন্য মুখ্যকে নষ্ট করিতে ত আমরা বলিতে পারি না। তাহা ত কোনও প্রকারেই বাঞ্ছনীয়ও নহে। সুতরাং এবিষয়ে তাঁহাদের উপর বৃথা দোষারোপ না করিয়া তাহার জন্য অন্য প্রকার বন্দোবস্তই আমাদিগকে করিতে হইবে। এ বিষয়ে তাঁহারা কতটুকু করিতে পারেন বা না পারেন, সে মীমাংসার ভার তাঁহাদের উপরেই রাখিতে হইবে,—আমাদের মত ও চাপাইবার চেষ্টা কোনও প্রকারেই সঙ্গত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, আর একটি কথা অনেক সময়ই শুনিতে পাওয়া যায়—আজ কাল পূর্ব্বের ন্যায় ত্যাগী লোক প্রচারকার্য্যে আসিতেছে না, শুধু অর্থের দ্বারা লোক সংগ্রহ করিয়া প্রচারকার্য্য চালান যায় না। আমাদের সেই পরিমাণে প্রচুর অর্থও নাই, আর অর্থ থাকিলেও এই শ্রেণীর প্রচারক লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন না। যাঁহাদের মধ্যে প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচারোৎসাহ প্রবল নহে, তাঁহাদের দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। শুধু অর্থদ্বারা কাহারও মধ্যে প্রকৃত প্রচারোৎসাহ উৎপন্ন করা যায় না,—শুধু কর্ত্তব্যনিষ্ঠা থাকিলেই এই কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এই কার্য্যের প্রতিপদে ত্যাগ একান্ত আবশ্যক। আমাদেরও মত অনেকটা এই প্রকারেরই—শুধু অর্থবলে প্রচারক সংগ্রহ করা যায় না। কিন্তু ত্যাগেরও তারতম্য আছে, আকাঙ্ক্ষা উৎসাহেরও প্রভেদ আছে। পূর্ব্ববর্ত্তীদের সমান ত্যাগ ও অনুরাগ না থাকিলেই যে আর কেহ প্রচারকার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারে না, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং আমরা যদি একটা অতি উচ্চ আদর্শের দ্বারাই সকল লোককে বাছিয়া লইতে প্রয়াসী হই, তাহা হইলে হয় ত আমাদিগকে লোকের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে এবং কার্য্যক্ষেত্রকে নিতান্তই সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে। সুতরাং যেরূপ শ্রেণীর লোক আমরা পাইতে পারি তাহার মধ্য হইতেই, বিশেষ সতর্কতার সহিত, উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইতে হইবে—অর্থবলে যাকে তাকে ডাকিয়া আনিলেও চলিবে না, আবার অতি উচ্চ আদর্শের অনুরূপ হইল না বলিয়া সকলকে পরিত্যাগ করিলেও চলিবে না। এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে শ্রেণীর লোক পাইতে চাই, সে শ্রেণীর লোক যাহাতে আসে, সেরূপ লোক যাহাতে আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে আমাদেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে। নিজেরা ত্যাগের পরিবর্ত্তে আকণ্ঠ ভোগে ডুবিয়া থাকিব, আর অপরে সকল প্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ ত্যাগে ভূষিত হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা নিতান্তই অযৌক্তিক। ত্যাগের হাওয়ার মধ্যেই ত্যাগী মানুষ বিকশিত হইয়া উঠে—পূর্ব্বেও তাহাই হইয়াছিল। ত্যাগী মানুষ দেখিতে চাহিলে আমাদের মধ্যে ত্যাগের হাওয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, আমাদের প্রত্যেককেই অল্পাধিক ত্যাগী হইতে হইবে,—ভোগটা যে অবলম্বনীয় নহে, কল্যাণকর নহে, তাহা বুঝিতে হইবে, জীবন দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর, ভোগস্পৃহার খর্ব্বতা ও ত্যাগের প্রাবল্য ব্যতীত যে অর্থদানের প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে না, সমাজের বিবিধ কার্য্যের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তৃতীয়তঃ, অনেকে বলেন চারিদিকে যেরূপ তীব্র সমালোচনা ও অশ্রদ্ধার ভাব, লোককে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রভৃতির দ্বারা তুলিয়া ধরিবার পরিবর্ত্তে সামান্য ত্রুটীর জন্য নীচে টানিয়া নামাইবার প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কেহ সমাজের কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। সম্মান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না হয় এক জন পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু নিন্দা গ্লানি লাঞ্ছনা তিরস্কার বরণ করিয়া লওয়া অতীব কঠিন। এরূপ অবস্থায় এ ক্ষেত্রে লোক আসিবে কেন? তাহা অপেক্ষা সংসারের পথে থাকা সকল প্রকারেই লাভজনক—সুখ ও সম্মান দুই বেশী আছে। এই কথার মধ্যেও যে যথেষ্ট সত্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাধু উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত হইয়া যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিতে আসেন, তাঁহারাও মানুষই, তাঁহাদের মধ্যেও মানবীয় ত্রুটী দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, কেহই একেবারে দেবতা হইয়া আসেন না। সুতরাং এবম্বিধ অবস্থার মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহারা আপনার কাজ করিয়া যাইবেন, কোনও মতেই এরূপ আশা করা যায় না। বিশেষতঃ, এরূপ ক্ষেত্রে মনের সাধু ভাবগুলির পরিবর্ত্তে ক্রোধ বিরক্তি বিদ্বেষ মন্দ ভাব প্রভৃতি সকলই ফুটিয়া উঠে, প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেমই বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে যে শুধু নূতন উৎসাহী কর্ম্মীর আসিবার পথেই প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, অথবা যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকে সে পথ পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত

করে, তাহা নহে; মন্দ ভাবগুলি বর্দ্ধিত করিয়া ইহ জীবনের মহা অনিষ্টও সাধন করে। সংশোধনের জন্য প্রেম ও সহানুভূতির সহিত দোষ ত্রুটি প্রদর্শনের যে একটা উপকারিতা আছে তাহা স্বীকার করিয়াও, সকলকেই বলিতে হইবে ইহার ন্যায় অপকারী আর কিছু নাই। এরূপ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা অতি বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিবেন সত্য, কিন্তু অতিরিক্ত তাপের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করাই যে সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে, অনেককে যে তাহাতে বিনাশপ্রাপ্তই হইতে হয়, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং এই অবস্থা যে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত কর্ম্মী পাওয়ার পক্ষে গুরুতর প্রতিবন্ধক, ইহার পরিবর্ত্তন ব্যতীত যে আমাদের লোকাভাব কিছুতেই বিদূরিত হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত। আমাদের মধ্যে যাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রেম ও সহানুভূতি, পরস্পরের সাধুভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিবার ও মহৎ সংকল্পগুলিকে সুদৃঢ় করিবার শক্তি ও প্রয়াস দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য আমাদের সকলকেই বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে।

উপরে আমরা আমাদের অর্থের ও কর্ম্মীর অভাবের কারণ এবং তাহা দূর করিবার কয়েকটি উপায়ের আলোচনা করিলাম। বলা বাহুল্য যে, একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নিঃশেষে সকল বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। আশা করি সকলে এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও বিচার করিয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হইবেন। নতুবা কিছুতেই সমাজের কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেরও কল্যাণ নাই। শুভবুদ্ধিদাতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন এবং বল ও শক্তি দিউন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত জীবন

ধর্ম্মজীবনের দুই প্রকার অবস্থা অথবা ভাব আছে। প্রথম ভাব এই যে, আমি আমার স্থানে বসিয়া জগৎ দেখিতেছি, জগতের কাজ দেখিতেছি, মানুষ দেখিতেছি, ঈশ্বরকে দেখিতেছি—জগতের সহিত, জগতের কাজের সহিত, মানবের সহিত এবং ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ তাহা বিচার করিতেছি; জগতের প্রতি মানবের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি, আমার কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতেছি; এবং ঈশ্বরের সহিত আমার যোগস্থাপনের চেষ্টা করিতেছি। অপর সকলের সহিত সম্বন্ধ ও তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য বিচার করার ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গেও যোগসাধনের চেষ্টা করিতেছি। দ্বিতীয় ভাব এই যে—আমি ঈশ্বরের চরণে বসিয়া জগতের সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছি, ঈশ্বরকে দেখিতেছি এবং আমার সহিত জগতের, কাজের, মানবের এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছি এবং সকলের প্রতি আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছি।

এই দুই প্রকার অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। প্রথম অবস্থায় মানুষ মনে করে, অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্যের মত ঈশ্বরের প্রতিও তাহার একটা কর্ত্তব্য আছে। সে নিজেই তাঁর প্রভু। দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ দেখে তিনিই প্রভু, আগে তাঁর সঙ্গে যোগস্থাপন করা চাই, তিনি আলোক দিবেন তবে আমি দেখিব, তিনি শক্তি দিবেন তবে আমি কাজ করিব; আগে তাঁর সঙ্গে যোগ, তার পর আর সব।

আমরা যখন ব্রাহ্ম হইয়াছিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম যাহা বিধি বুঝিয়াছি, যাহা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি, আগে তাহা তো করি, তার পর যাহা হয় হইবে। তখন কি ভাবিয়াছিলাম যে, আত্মীয় স্বজন, পিতা মাতা, ভাই বন্ধু সকলের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম? তাহা নহে। তখন ভাবিয়াছিলাম, সর্ব্বাগ্রে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, তখন একমাত্র কর্ত্তব্যটী তো করি, তাহার পর যত প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে, সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, পরিবর্ত্তিত করিয়া, যাহা হয় করিব। আমি যে সত্যের আলোক দেখিয়াছি, তাহার অনুসরণ করিলাম, বিশ্বাসের নিশান হাতে করিয়া দাঁড়াইলাম। যাহার ইচ্ছা হয়, আমার কাছে আসুক, আমার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করুক, আমি কাহাকেও ত্যাগ করি নাই।

দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ বলে, আমি ঈশ্বরের চরণে বসিলাম, আমার পাঠ, ধ্যান ধারণা, কাজ, কর্ত্তব্য, অপরের সহিত সম্বন্ধ ও আকাঙ্ক্ষা, সব ঐ চরণে বসিয়া, ওখান হইতে উঠিয়া নয়। এই আধ্যাত্মিকতার, উপাসনার, যোগ সর্ব্বাগ্রে। আমার যাহা কিছু আলোক, যাহা কিছু জ্ঞান, যাহা কিছু কর্ত্তব্য, সব ঐ জাগায় বসিয়া, ওখান হইতে উঠিয়া নয়।

দুই রকমে কাজ করা যাইতে পারে। এক প্রকার এই—একটা সামান্য কাজ করিতে হইবে, দুটা কথা বলিতে হইবে, আমি কার সঙ্গে কথা বলিব লোক খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। মুটে ডাকিতে হইবে, গলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। দ্বিতীয় প্রকার এই—আমি ঘরে বসিয়া আছি, যাহার দরকার হয় আমার কাছে আসুক। এমন কি হয় না? যখন কাহারও পীড়া হয়, তখন সে ঘরেই থাকে, তাহার সহিত যার যে প্রকার কাজের সম্বন্ধ সে তাহার জন্য তারই কাছে আসে; শুশ্রূষাকারী এবং পাওনাদার সকলেই স্ব স্ব কার্য্যের জন্য তাহার কাছে আসে।

আমি ঈশ্বর চরণে বসিলাম, আমার যাহা কিছু ওখানে থাকিয়াই হোক, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম যিনি ঈশ্বরচরণে বসিয়াই সব করেন।

বিশেষ ভাবে, যাঁহারা সাধনাশ্রমে সান্নবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের ইহাই আদর্শ। তাঁহারা মানুষকে দেখাইবেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের চরণে বসিয়াই সব করিবেন। আমি জ্ঞানালোচনা, পাঠ, সদনুষ্ঠান প্রভৃতির খুব সমর্থন করি; কিন্তু যে পাঠ, যে সদনুষ্ঠান, যে জ্ঞানালোচনা, ঈশ্বরের চরণ হইতে উঠিয়া করিতে হয়, আমি তাহার বিরোধী। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাঁহার

১৩ই আগষ্ট, ১৯০৩, বৃহস্পতিবার, সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী প্রদত্ত উপদেশ।

চরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া সকল কাজ করিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। ব্রাহ্ম হওয়ার সময় ভাবিয়াছিলাম, আগে ত বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি, তাহার পর যাহা হয় হইবে।

আশ্রমের লোকেদেরও আগে এই উপাসনায় মন বসান চাই। এই যে ঈশ্বরচরণে বসা, এই প্রধান কাজটী, এই আসল কাজটাই সকলে ভুলিয়া যায়। আশ্রমের লোকেরা বিশেষ ভাবে এই আসল কাজটা করিবে। এই যে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপ্রধান কাজের ভার, এই মহৎ ব্রত আমরা লইয়াছি; ইহা ধরিয়াই আমাদিগকে থাকিতে হইবে। এইটি হইলেই, ইহা আমাদিগকে কাজ করাইবে, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। উহা ব্যতীত বিদ্যা বুদ্ধি, বাগ্মিতা, সকলই ফাঁকা; কিছুতেই কিছু হইবে না।

করুণাময় ঈশ্বর করুন, তাঁর চরণে বসিয়াই আমরা সব করি।

অমর কথা (৩)

মৃত্যুর বিভীষিকা

(Fear of Death—Part 1)

ফেলে দাও গো, খুলে ফেল গো
মৃত্যু মলিন সাজ,
মরণ-মাঝে বুকের ঘরে
হাসে হৃদয়-রাজ।
ধূলির দেহ ধূলায় যাবে
দুঃখ নিশা ভোর,
নিবিড় ব্যথা উধাও কোথা
মরণমোহ ঘোর।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ অশ্রুধারা
ফুরিয়ে গেল তবে,
ধূলার মাঝে ধূলির লীলা
মেশামেশি হবে।
মরণরূপে আস্‌লে কেন
শান্তি-কলস ভ'রে
জুড়িয়ে গেল ঐ পরশে
সুধা-গঙ্গা ঝরে।
রক্ত তালে বাজ্‌লো যবে
শেষ গানটী মরি,
স্বরগ হ'তে ব্রহ্মবালা
বাঁধে নিবিড় করি।
সমাধিপুর অন্ধকার—
জ্বলন্ত তবু আলো,
মুক্ত পাখী চিদাকাশে
ঘুচ্‌ল সকল কালো।
এ কি তোমার ধূলি-খেলায়
নিত্য সুখ-মেলা,
উথলে ওঠে হৃদি-সিন্ধু
ধন্য পিতার খেলা।
নামে যদি বেদনধারা
সকল উজাড় করি,
ধন্য আমি গাইব তবু
বিশ্ব ভুবন ভরি।
থামেও যদি ঐ সুরেতে
হাসি কান্নার গান,
তবুও সখা, গাইব আমি
ধন্য তব দান।

আর ত পারি না মহাযাত্রার স্বরূপ দর্শন কোরতে; আর ত এ বিরহ-বেদনা সয় না ঠাকুর, দুর্ব্বল ব্যথিত বক্ষে। তবুও ত কাতর বিহ্বল হ'য়েও ছুটতে হবে মরণসিন্ধুপারে। এ কি লীলা! এ কি ফুটন্ত ফুলের শুষ্ক মুদিত আঁখি! ও কি ক্লান্ত বৃদ্ধের মহাযাত্রা! এ কি সুকুমারী কল্যাণীর ভস্মমুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ যুবকের সকল আশা উৎসাহের বলিদান! হায়! হায়! এম্‌নি কোরেইত আমার দেহও এক দিন ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হবে।

কেন তবে এ রূপের খেলা? জন্ম মৃত্যু আমার ইচ্ছাতন্ত্রের ভিতর ত নিয়মিত নয়। এস আমার মরণসখা, এস তোমার মধুর মোহন সাজে। প্রাণনাথ! এ কি অব্যক্ত বেদনা! কোথায় আমার জীবনদয়িতের প্রাণময় সঙ্গ কঠোর বন্ধুর পথে। এ কি অনাথ সন্তানের আকুল বিলাপ! উঃ কাঙ্গালিনী জননীর একমাত্র বুকের ধন কোথায়? এ কি অদৃষ্টের পরিহাস?

কেন এ বিরহ-গান জগতে? মৃত্যুর অন্ধকারে কোথায় সবাই জেগে আছেন? যখন রজনীর শান্ত ছায়াতলে সবাই ঘুমিয়ে পড়েন, কই তখন ত বিলাপের গান গাই না! অথচ মরণজয়ী মহানিদ্রার অলস মুদিত নয়নে কেন এ চমকশিহরণ? ওগো এ যে সত্য, নব প্রভাতের নব আলোকে যে সব হেসে উঠ্‌ব, আবার মিলন-লীলা জেগে উঠ্‌বে। মৃত্যুর অন্ধকারে কই সে জাগরণের আশ্বস্তবাণী? বুকের ঘরে এ কে আলো জ্বাল্‌লো? আমি যে চোখের জলেই আশার মালা গেঁথে চলেছি। কে জানে কোন কোরে নব অরুণ-আলোকে আবার মিলনানন্দে জেগে উঠ্‌ব। ঐ যে সবাই সখার বুকে হাস্‌ছেন, আমিও হাস্‌ব, তুমি ও হাস্‌বে। কত দিনের জন্য এ খেলা? অশীতিবৎসর বৃদ্ধ কি কথা বলেন শোন, এই যে সেদিনকার খেলা চকিতে ফুরিয়ে গেল। কত কাল অপেক্ষা কোর্‌তে হবে কে জানে? তাই কি এ বিলাপ-ক্রন্দন?

না গো না, মৃত্যুর কালো রূপ দেখ্‌ব না, তার বিরহ স্বরূপ ভু'লে যাব। সন্ধ্যাবিদায়ের গান যেমন নির্ভয়েই গেয়ে যাই, তেমনি কোরেই মহাযাত্রার বিদায়গান গেয়ে যাব। তেমনি কোরেই মরণজয়ী মৃত্যু-মহিমা দর্শন কোরব। অমৃতধামের যাত্রীকে মহা আনন্দের বাণী শুনিয়ে উৎসাহিত ক'রে তুল্‌তে হবে।

যাও, মহোৎসবের আনন্দ-নিমন্ত্রণ হ'য়েছে, যাও। আমিও তোমারই মত অভয়-পদ বুকে ক'রে আনন্দে ভবপারাবার পার হোয়ে যাব।

মহাপ্রস্থানের গানে যে আমার প্রিয়ের প্রাণহীন হিমশীতল রূপখানি মনে পড়ে, তাই ত অশ্রুজলে বুক ভাসে। যদি এই মহানিদ্রার ভিতরই নব জীবনের স্বরূপ দেখ্তে পাই, তবে কোথায় আমার মৃত্যু-ভয়?

মরণসখার সংহার-স্বরূপেই যে আমি চমকে উঠি! যদি ভুল্তে পারি সে রুদ্ররূপ, যদি শান্ত প্রসন্ন রাগে সব রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে, তবে কোথায় ভয়? উঃ এ কি জন্মমৃত্যুর সংগ্রাম দিন রজনী! এ কি রুদ্রস্বরূপ জগতের বুকে! কে জানে সে কেমনতর যাতনার অনুভূতি, কত যাতনার অভিব্যক্তি মুমূর্ষ-জনের যাত্রাগানে—কত বিকার বিলাপ, বেদনার অব্যক্ত ক্রন্দন! তবুও ত চাই বুকে ধ'রে রাখ্তে, কত ব্যর্থ আয়োজনে তাদের আকুল কোরে তুলি! তবুও কেমন আনন্দে সবাই ঘুমিয়ে পড়্লেন! কোথায় আমার ভয়? ঐ মৃত্যুর স্বরূপে না ঐ মৃত্যুর বিকৃত আয়োজনে? কেমন কোরে রূপের পারে ছুটব আমি? কেমন কোরে অজানা লোকে আমার যাত্রা হবে? হায়! হায়! এমনিতর কত সংশয়-কুহেলী! এই রূপের দেশে রূপরসগন্ধ ব্যবহারিক সত্তা লাভ করি, আমার প্রতিষ্ঠা লাভ করি, আর যাহা নিত্য সত্তা, ধ্রুব সত্তা তারই মূল্য বুঝ্লাম না।

কখনও বলি ওগো সখা, যদি এ ভবিষ্যৎ কুহেলী আমার কাছে অবারিত উন্মুক্ত থাকৃত, তা হোলে ত এত সংশয়-বেদনা বহন কোরতে হোত না! আবার ভাবি ধন্য! তুমি ধন্য! যদি এ বেদনার চিত্র আমার কাছে প্রকাশিত হোত, তবে কি আমি আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কোরতে পারতাম?

এ যে অজ্ঞাত রহস্য অজানার বিচিত্র লীলা! কেমন কোরে নশ্বর জীবনেই মানুষ আনন্দ খেলা খেলে চলেছে, তা না হোলে কে চাহিত এ ব্যর্থ বেদনা বহন কোর্তে?

যতক্ষণ অনিশ্চিত ততক্ষণ সংশয়-বেদনা। কিন্তু যখন বাঁশি বেজে গেল, তখন তার কি বিচিত্র সুর, কি বিচিত্র সত্তা! তখন অতীতের যত কিছু সব স্বপ্ন হোয়ে গেল, আর অনাগত জীবনরহস্যই এক নবালোকে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠ্ল। অনন্ত পথের যাত্রী সব তখন সকলের সঙ্গে শেষ দেনা পাওনার হিসাব চুকিয়ে নিতে চায়, তখন বিদায়ের সুরেই তন্ময়তা, তখন আনন্দধামের যাত্রীর আত্মপুরে অতীতের ঘন কুহেলী মোচন কোরে, জন্ম মরণের সন্ধিস্থলে, এ কি অপূর্ব্ব আকুল আহ্বানে আনন্দে উৎফুল্ল!

প্রশ্ন এই, মানুষ কি সবাই আনন্দে মরণসখার চরণ বরণ কোরতে? ও কি পাপীর অব্যক্ত যাতনা! হায়! হায়! সংসারকে যে স্থিরভূমি মনে কোরল, যে বিশ্ববিধাতার বিজয়লীলা নয়ন মেলে একবার দেখ্বার অবসর পেল না, যার সংসারের ধন মান মর্য্যাদা ঐহিকতা দৈহিকতাই সার হোল, যার পার্থিব পিপাসা মেটাতে মেটাতেই দিন ফুরিয়ে গেল, অমর আত্মার পুণ্য মাধুরী বোঝা হোল না, তারই কাছে ত মরণক্ষণে ভয়াবহ মৃত্যুর রুদ্র প্রকাশ।

সংসারে ধনীর আজ এ কি বিড়ম্বনা! কোথায় গেল বিরাট ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য? আজ শিশুর মত অসহায় দীন যাত্রী কেবলই ভাবে কোথায় আমার ক্ষুদ্রে প্রতিষ্ঠা, আর কোথায় আমার আত্মসত্তা! আজ যে ধূলির দেহ ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হবে। আজ যে তার তরল ভঙ্গিমা, ব্যর্থ প্রগল্‌ভতা, সকল ভোগের আড়ম্বর, সবই বিফলে অবসান! আজ উপেক্ষিত আত্মসত্তা কেমন ক'রে উপলব্ধি করে এ কি অপূর্ব্ব বিচার জগতে!

তবুও শোন, ঐ শোন দীনাত্মার জন্য দেববালার আকুল ক্রন্দন। অনাদিকালবিকসিত জগতের বুকে যে ঐ বাণীই প্রচারিত হোচ্ছে—কোথায় মানবের যেতে হবে। কখনও মৃদু মধুর স্বরে, কখনও গুরুগম্ভীর নিনাদে, কখনও প্রসন্ন আলোকে, কখনও রুদ্র রূপে ঐ একই বাণী। ওগো তোমার নয়নে বচনে এত আনন্দ উচ্ছ্বাস কেন? ও যে প্রাণময়ের মঙ্গল অস্তিত্বলীলা। এ কি রূপ-কথা? এ কি স্বপ্ন? এ কি কুহেলী? আমি আমার অদৃষ্ট রচনা করি। আত্মার বিচিত্র মহিমা কেমন কোরে উপেক্ষা কোরবে আজ মৃত্যুমঙ্গল-বাসরে! আজ কোন্ দৈহিকতার গর্ব্ব আমায় রক্ষা কোরবে? আজ দেহের বিনাশে কোথায় আমার প্রতিষ্ঠা?

বর্ত্তমানের আনন্দপ্রকাশেই ভবিষ্যতের মহিমা। রূপের ভিতরেই আত্মসুন্দরের মঙ্গল মাধুর্য্য। যদি শাশ্বত শান্তির ভিখারী হোয়ে ছুটি, আত্মস্বরূপ দর্শন করি, তবেই ভক্ত প্রাণের বিমলানন্দ পরা শান্তি মোক্ষফল লাভ হবে। ওগো অনন্ত প্রেম যে আমায় রক্ষা করেছে, ঐ প্রেমের কোলেই আছি, ঐ প্রেমেই থাকব। আমার বিনাশ কোথায়? প্রকৃতির শান্ত বুকে ঐ প্রেমেরই পরিচয়। প্রতি নিয়ত বিশ্ব চরাচর ঐ একই গান গেয়ে চলেছে—কোথায় বিনাশ, অনন্ত পথের যাত্রী সব, অনন্ত জীবন লাভ হ'চ্ছে।

তাইত ভক্ত প্রাণের আনন্দ প্রয়াণ। দৈহিকতা ঐহিকতার ভিতরই ত্রাসকম্পিত হৃদয়। ভক্তপ্রাণের ওঁ নামে আনন্দে বৈতরণী পারের আনন্দগানে জ্যোতির্ম্ময় পুণ্য সভার পুণ্য কাহিনীই প্রচার হ'য়ে যাচ্ছে।

আমার সাধের দেহবীণায় আশৈশব কত সুর সাধনা করি! আজ তার ধূলিমুষ্টি পরিণাম, অথচ আত্মসুন্দর যেই হেসে উঠ্লেন দেহবীণার মধুর ঝঙ্কারে, তখন কোথায় মৃত্যু,—সব যে বিশ্বভুবন আমারই আনন্দ-আলোকে হেসে উঠ্ল, সব যোগা-নন্দে ভ'রে গেল।

যুগ যুগান্তর ধ'রে কত সংগ্রাম-লীলা, সাধতে হবে রণ জগতের বুকে! তবে কেন ভীতির ব্যর্থ ত্রাস? ওগো এ কি আমার চিরন্তন বিদায়? তা যদি, তবে কেন বুকের ঘরে প্রিয় জনদের মৃত্যুর যবনিকার ভিতরও আনন্দ প্রকাশ? ওগো প্রেম যখন ছুঁয়ে গেছ, প্রেমস্মৃতি-সুগন্ধে যখন সব ভরে উঠেছে, তখন তমিস্রা রজনীর পরপারে সুপ্রভাতে নবজ্যোতির্ম্ময় আলোকে মিলনানন্দ জেগে উঠবেই উঠবে। প্রেমময় প্রেমের খেলা খেল্তে এসেই ধরা পড়েছেন, তাইত মৃত্যুমাঝে অমৃতা নাম। পরম শুদ্ধ শান্ত নির্ম্মল প্রেম ত ধূলিতে পরিণত

হয় না। প্রাণের ঘরে চেতনালোকে প্রেমের এ কি শান্ত স্নিগ্ধ অমৃত স্বরূপ!

ওগো আমার নয়নলোভন প্রিয়সুন্দর, অনন্ত আহ্বানে তবে দাও বিদায়। অন্তিমশয্যায় তোমাদের প্রেমাশ্রুজল দেখ আমার যাত্রাকে কত মধুময় করেছে। ওগো ও প্রেম ফুরোবে না। স্বর্গরাজ্য যে প্রেমালোকেই হেসে উঠ্‌ছে। প্রেমের অর্ঘ্য রচনা কর, এপার ওপার এক হ'য়ে যাবে। ওগো প্রেম! তবে কেন ব্যর্থ ক্রন্দন? প্রেমের বুকেই অমৃত হেসে উঠেছেন। প্রেমের আনন্দ-আলোকেই শুদ্ধ পুণ্য শান্তি। প্রেমের আনন্দেই পুণ্য গন্ধে আনন্দ-মিলনধামে আমার মিলন-রাগিণী ঝঙ্কৃত হোয়ে উঠ্‌ছে।

ওগো আমার বিদেহী প্রিয়,"চোল্‌ব আমি চোল্‌ব, শান্ত শুদ্ধ হোয়ে এ বন্ধুর যাত্রা-পথে। ওগো শুদ্ধ শান্ত শিবস্বরূপ আলোকেই আমার সকল সংশয়জটিল জাল উধাও হোয়ে যাবে। সত্যগ্রাহী সত্যের মহিমা ঘোষণা কোরতে কোরতেই আনন্দে মরণসখাকে বরণ কোর্‌ছেন! ধন্য অমর আত্মা—তুচ্ছ দৈহিকতা ঐহিকতা, কেমন হাসিমুখে ত্যাগ কোরে ভোগের ভিতরই ত্যাগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কোর্‌ছেন। এ কি বিচিত্র লীলা, সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব আহুতিদান! তাইত জগতে পরিত্রাণের সমাচার। চাই সে সত্য সুন্দরের মহিমা উপলব্ধি কোর্‌তে। হোক্ জীবনে সততার সাধনা।

এ কি জটিল রহস্য? দুদিন দেওয়া ঘেরা ঘরে এত মায়া! কই ভক্তপ্রাণে সে কথা কই? দেহের ঘরে আত্মালোকেই আত্ম-সুন্দরের পরম সার্থকতা—নব নব ভাবে কেমন কোরে অনন্ত উন্নতির পথে জেগে থাকব কে জানে?

এই যে দেহেরই ঘরে এত আমন্ত্র-আয়োজন, এ কার দান? এ ত উপেক্ষার জিনিস নয়। কই দৈহিকতা ঐহিকতার ভিতর সে নিত্যশান্তিসুধার অবিমিশ্রিত নির্ম্মলানন্দ কোথায় রূপের ক্ষণিক লীলায়?

ওগো দীন দুর্ব্বল মানুষ, মরণত্রাসে এত ত্রস্ত কেন? যেতে ত হবেই. দীর্ঘ জীবন লাভ হোলেও ত শেষ কোরতে হবে এ খেলা। ঐ ত চলেছেন সকলে একে একে। এখন এ নিঃসঙ্গ যাত্রার কোথায় অবসান? ওগো এখনও উদাস আকুল আঁখি মৃত্যুযবনিকা ভেদ কোরেই ছুটবে দিন রজনী। জরামরণাতীত শান্ত জীবনালোকে নিত্যানন্দে সকলের ব্যর্থ জীবনভার এক দিন ত অবসিত হবেই হবে।

ওগো আমার প্রেমসুন্দর, পরিত্রাণ দেবে কি? বল তবে কেমন কোরে শুদ্ধ শান্ত হই, কেমন কোরে বিশ্বকল্যাণে জাগি? ভয় কোথায়! এ কোন্ নিত্য জাগরণলীলা! ওগো আনন্দ, এ কেমনতর অমৃত সুধাপান? ওগো প্রেমানন্দ! মরণদোলা আমায় ও কি শান্ত শুদ্ধ ধামে নিয়ে চল্‌ল! এ কি মরণসখার আনন্দ-আলোকেই যে নব প্রভাতের জয়-উদ্বোধন বেজে উঠ্‌ল। এ কি মিলনসঙ্কিক্ষণ!

ওগো আমার অগ্রগামী প্রিয় ধন সব, থাক জেগে স্মৃতির পুণ্য গন্ধে। ঐ গন্ধে আকুল হোয়ে ছুটি, প্রতীক্ষা করি। আমি প্রেমের গন্ধে পাগল হোয়েই নিত্য পূজার অর্ঘ্য রচনা কোরব। জেলে দাও প্রেমের আগুন—ঐ আগুনে পুড়ে পুড়েই শুদ্ধ হব, সুন্দর হব।' কোথায় আমার দ্বন্দ্ব-কুহেলী বল? আমার সকল দৈন্যতায় ঐ চরণ-দেউলমূলে উৎসর্গ কোরেই মৃত্যুমাঝে অমৃত নাম গেয়ে চোল্‌ব। ওগো প্রেমসুন্দর, তোমারই গৌরবে আমার সকল গৌরব দান কর।

কোন্ নিমেষে পলক-পাতে
ফুরিয়ে যাবে খেলা,
সখার বুকে বিরাম হবে
শান্তিসুখ-মেলা।
সবার মুখে জয়ের গান
তাইত গাই জয়,
তাইত ওগো মরণ-সুরে
নাইক কিছু ভয়,
(ওগো) তাই ত সে মোর জয়।
বিশ্ববীণা মরণগানে
বাজায় কি বা সুর,
তারই রাগে হাসে বুকে
নিত্য আশা-সুর;
তাই ত হোল জয়
(ওগো) তাই যে মোর জয়।'

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১০)

হে প্রভু করুণাময়, তোমার প্রিয় কার্য্য করি, এমন সম্ভাবনা আর দেখি না। শরীর মন সবই বিকল হইয়া পড়িতেছে—পড়িয়াছে। যাহা থাকিলে তোমার কার্য্য করিবার সুযোগ হয়, তাহা ত নাই বলিলেই হয়—তবে কি দিয়া এখন তোমার কার্য্য করিব? অথচ আছি যখন তখন কিছু করাও আবশ্যক। প্রভু,তবে দাও অন্তরশুদ্ধি। শুদ্ধ প্রীতি দেও। তাহা হইলে অন্তর হইতে যে চিন্তা প্রসূত হইবে তাহাতেই তোমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। দিব্য জ্ঞান দাও, শুদ্ধ প্রীতি দাও। তাহার প্রভাবে দৃষ্টি পবিত্র জ্যোতি বিস্তার করিবে। লোকে সেই দৃষ্টি দেখিয়া শুদ্ধতার ও কল্যাণের সংবাদ পাইবে,—শুদ্ধ হইতে, কল্যাণ লাভ করিতে, সুযোগ পাইবে। তাহা হইলে বাক্য এমন শুদ্ধ ও সরস হইয়া বাহির হইবে, যাহা শুনিয়া সকলেই শুদ্ধতার পক্ষপাতী হইবে, অনুরাগী হইবে। শুভ কার্য্যে সকলে মন দিবে। এখন যে সহজে বিরক্তি আসে, অসহিষ্ণুতা আসে, তাহা থাকিবে না। প্রেম ও সহিষ্ণুতা ও শুদ্ধতা সর্ব্বত্র প্রাণ হইতে মন হইতে বিকীর্ণ হইবে। প্রভু, এমন শুভ দিন কবে আসিবে? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

(১১)

রাবণ আপনার মৃত্যুবাণ সংগ্রহপূর্ব্বক স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু শুধু রাবণই যে মৃত্যুবাণ রাখিয়াছিলেন, তাহা ত নহে। মৃত্যুবাণ প্রত্যেক লোকেরই নিজ অন্তরে অবস্থিতি করে। যখন সে বাণ সে আপনার প্রতি প্রয়োগ করে, তখনই তাহাকে মৃত্যু আবার আক্রমণ করে, অধিকার করে। মৃত্যুবাণ হানিবার জন্য বাহির হইতে কেহ আসে না। অন্তরস্থিত রিপু বা প্রবৃত্তিকুল প্রবল হইলেই বা শাসনকে অমান্য করিলেই, তাহারা মৃত্যুর আকার ধারণ করে এবং মৃত্যুবাণ প্রয়োগ করিয়া মানুষকে মৃত্যুগ্রস্ত হইবার অবস্থায় লইয়া যায়। মঙ্গলবিধাতা যাহা বা যাহাদিগকে অন্তরে অনুকূল করিয়া, কল্যাণকর কার্য্যের—পূজার—সহায় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অনুকূল অনুচরেরাই সময়ে প্রতিকূল হইয়া পড়ে, মৃত্যুবাণরূপে পরিণত হয় কেন, ইহা এক আশ্চর্য্য রহস্য। মানুষ কাহার প্রেরণায়, প্ররোচনায়, যে অনুকূল বৃত্তিসকলকে এমন প্রতিকূল করিয়া তোলে, কে তাহার রহস্য ভেদ করিবে? কত লোক কত প্রকারে এ প্রশ্নের মীমাংসায় মন দিয়াছেন, মীমাংসা আর হয় না। তবে ইহা বুঝা গেল যে, মিত্র যে শত্রু হইল সে নিজ দোষেই। বাহির হইতে কেহ প্রমাদ ঘটাইতে আসে না। নিজেই অনুকূলকে প্রতিকূল করে।

(১২)

পাপের লক্ষণ কত জন কত প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন! কেহ বলেন ঈশ্বরবিস্মৃতিই পাপ। কেহ বলেন আদর্শচ্যুত হওয়াই পাপ। স্থূল ভাবে লোকের অহিতকর মিথ্যাকথন, চৌর্য্য, হিংসা, পরপীড়ন প্রভৃতিকে সকলেই পাপরূপে গণনা করেন। এইরূপে পাপের কত লক্ষণই আছে! কিন্তু সংক্ষেপে পাপের লক্ষণ এই রূপে বর্ণনা করিলেই হয় যে, যাহা ঈশ্বরবিমুখ করে, যাহা ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়, যাহা ঈশ্বরের বিরোধী, তাহাই পাপ। ঈশ্বর শুদ্ধস্বভাব—শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। যে সকল কারণে মানুষ এই শুদ্ধস্বরূপকে পাইবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা তাঁহার স্বরূপের বিরুদ্ধই হইবে। যাহা তাঁহার বিরুদ্ধ তাহা শুদ্ধতারই বিরুদ্ধ, তাহা শুদ্ধ স্বভাবেরই বিরোধী, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিসে মানুষকে ঈশ্বরচ্যুত করে? যাহা অনৈশ্বরিক, যাহা তাঁহার বিপরীত, তাহাই তাঁহা হইতে মানুষকে দূরে রাখে, তাহাই মানুষের ঈশ্বরের সহিত মিলনের পথে অন্তরায়, সুতরাং তাহাই পাপ। পাপই শুদ্ধতার বিপরীত। পাপই ঈশ্বরের বিরুদ্ধ। তাহাই মানুষের সমূহ বিপদ আনয়ন করে, পরা সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুর কবলে লইয়া যায়। তাহার মত ভীষণ আর কি আছে? আমরা কেন এমন শত্রুকেই সমাদর করি, তাহার সহিত সখ্যতা করি?

(১৩)

ঈশ্বরের পিতৃত্ব আর মানবের ভ্রাতৃত্ব সাধন আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। শুধু আমাদের কেন, অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই এ দুটী সাধনের প্রধান লক্ষ্য। ঈশ্বরের পিতৃত্ব স্বীকার করিলে মানবের সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাং মানবে মানবে ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্বীকার করিয়া তাহা সাধনও করিতেই হয়। কিন্তু এ সাধনপথে বহু অন্তরায়, বহু কণ্টক আছে। আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথাসকল স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আমাদিগকে অতি কুশিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছে। তাই যাহা বিচার বুদ্ধিতে বাঞ্ছনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, যাহা সাধনের প্রধান বিষয় বলিয়া মীমাংসিত হয়, সাধনের সংকল্প মধ্যে বিশেষ ভাবে গৃহীত হয়, তাহাও কার্য্যতঃ সাধনের বেলায় হইয়া উঠে না। বহু কালাগত ব্যবস্থার গুণে দেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সহজে তাহাদের সহিত সব বিষয়ে ঐক্য হওয়া যায় না। মিলেমিশে চলিতে পদে পদে বাধা পাইতে হয়। রুচিতে প্রবৃত্তিতে ভিন্নতা অতিশয়। কোনমতেই তাদের সহিত আর মিলিয়া মিশিয়া চলা যায় না। এ জন্য মতে যাহা উত্তম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, কার্য্যে তাহা পরিণত করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। দেশের লোকের সহিত ভ্রাতৃত্বসাধনে এ সকল প্রতিকূলতা। আবার বিদেশের লোকের সহিত ভ্রাতৃত্বসাধনের যে প্রতিকূলতা তাহা অতিক্রম করা যেন সম্ভবপরই নহে। তাহাতে মানুষের বিচারবুদ্ধিও অতিশয় প্রতিকূল। স্বদেশপ্রীতি তাহাতে বিশেষ ভাবে বাধা প্রদান করে। স্বদেশপ্রীতি স্বভাবতঃই মানবপ্রাণে অতি প্রবল। তাহার প্রাবল্য খুবই প্রার্থনীয়, কিন্তু তাহা যখন অতি প্রবল হইয়া উঠে এবং বিচারবুদ্ধিকে এবং বিশ্বমানবে যে প্রেম থাকা ধর্ম্মসাধনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তখনই সমস্যা অতি কঠিন হইয়া পড়ে। দেশভেদ হইতে যে জাতিভেদের উৎপত্তি, এ জাতিভেদকে লোকে রক্ষণীয় ও সমর্থনীয় বলিয়াই জানে। তাহা যে রক্ষণীয় তার সন্দেহ কি? কিন্তু তাহা যখন ধর্ম্ম-সাধনের অন্তরায় রূপে দাঁড়ায়, সাধনের প্রধান লক্ষ্যের প্রতিকূল হয়, তখন কর্ত্তব্য কি?

ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা জগৎগুরুরূপে পরিগণিত, যাঁহাদের উক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করিতে হয়, তাঁহারা এই বিষয়ে উদার ভাবের কথাই বলিয়াছেন। সহিষ্ণুতার সহিত সবই সহ্য করিতে হইবে, ক্ষমা করিতে হইবে। অপমানকারীরও অপমান করিবে না, বরং উপকার করিবে, শত্রুরও কল্যাণ চাহিবে, কল্যাণ সাধন করিবে, আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করিবে না—"ন পাপে প্রতিপাপস্যাৎ" ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। সাধুতাদ্বারা অসাধুতাকে পরাজিত করিতে হইবে, অক্রোধদ্বারা ক্রোধের পরাজয় করিবে, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। কিন্তু কার্য্যকালে লোকে তাঁহাদের প্রদর্শিত এই মহা কল্যাণকর বিধি মানিয়া চলে না—চলিতে পারে না। এ আচরণের অনুকূলে তাহাদের যুক্তি অনেক কথাই বলে। কিন্তু উপায় কি? যাহা লক্ষ্য, যাহা সাধনা করিতেই হইবে, বাধা আছে বলিয়া, কঠিন বলিয়া, কি তাহার সাধনে বিমুখ হইতে হইবে? তবে ত ধর্ম্মসাধন আর হয় না। তবে ত পরিত্রাণের সহায় বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করিতে হয় তাহাই গ্রহণ করা হয় না। এ কঠিন সমস্যার উত্তর কি?

উত্তর সহজেই আসে। তাহা যতই অপ্রিয় হউক, তাহা যতই দুঃসাধ্য বা অসম্ভবের মত মনে হউক, তাহাই সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের ত্যাগস্বীকারকেই এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে। কত ব্যক্তি যে প্রাণকে

পরিত্যাগ করিয়াও ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্ম্মকেই প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন, তাহাকেই মনে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। সকল ক্ষতিকে, সকল স্বার্থচিন্তা ও স্বার্থলাভকেই এ ক্ষেত্রে পরিহার করিতে হইবে।

আমাদের সম্মুখে এ বাধা পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা হইয়া আছে। আমরা বিদেশীয়ের অধীন হইয়া আছি। তাহাদিগকে প্রীতি করা কি সহজ কাজ? যেন অসাধ্য সাধন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাও করিতেই হইবে। উপায় কি আছে? আর যে পথ নাই। তাঁরা সাংসারিক ক্ষতি অনেক করিতে পারেন, হয়ত করিয়াছেন। লোকের বিশ্বাস এদেশকে তাঁরা দরিদ্র করিতেছেন। তাহা স্বীকৃত হইলেও অন্য পথ কি আছে অবলম্বনের? যাঁহারা দরিদ্রতাকে কল্যাণের কারণ মনে করেন, তাঁদের পক্ষে আমাদের শাসকগণকে এ বিষয়ে প্রতিকূল মনে করা উচিত নহে। তাঁরা যাহা চাহেন বিদেশীয়েরা তাহাতেই সাহায্য করিতেছেন। দারিদ্র্য যদি ধর্ম্মের পথের সহায় হয়, তাহা হইলে যাঁরা সে বিষয়ে সাহায্য করেন তাঁহাদিগকে প্রীতি করিতে পারাইত স্বাভাবিক। কিন্তু মানব অনেক সময়ে কি যে চাহে, তাহার অন্তস্তলের আসল প্রার্থনীয় যে কি, তাহা সে সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সিদ্ধান্ত করে এক রকম, কার্য্যতঃ ভাবিতে বাধ্য হয় অন্য রকম। তাই নানা গোলোযোগে পড়িতে হয়। সে যাহা হউক, ভ্রাতৃত্বসাধন যখন আমাদের সাধনের প্রধান বিষয়, তাহা যখন আমাদের পরিত্রাণের পথের একান্ত প্রয়োজনীয় সাধন ও অবলম্বন, তখন তাহা যতই অসাধ্য সাধন হউক, যতই অপ্রীতিকর হউক, যতই তাহা আপনাপন অন্তঃপ্রকৃতির বিরোধী হউক ও সাংসারিক ক্ষতির হেতু হউক, তাহাই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। এ বিষয়ে ইতস্ততঃ করিলে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেই বিচ্যুত হইয়া মহাবিনাশের পথে যাইতে হইবে। পরমপ্রভু এ বিষয়ে আমাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করুন। সকল বাধা দূর করিয়া, সকল আপত্তির হেতু দূর করিয়া, আমাদিগকে আসল লক্ষ্য সাধনে সুযোগ প্রদান করুন। আমরা তাঁহারই কৃপায় এ সাধনে সিদ্ধিলাভ যেন করিতে পারি।

আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।*

পিতৃতুল্য গুরুজন ভক্তিভাজন আচার্য্য এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বাল্য-কালেই এই মন্দিরে উপাসনা এবং বক্তৃতাতে নিরত দেখিয়াছি। তাঁহার জলদগম্ভীর স্বর, ব্রহ্মভক্তি, উদ্দীপনা এবং অখণ্ড যুক্তিদ্বারা যখন পরিপূর্ণ হইয়া, তাঁহার হৃদয়কে প্রকাশ করিত, তখন তাঁহার সেই ভক্তি উদ্দীপনা ও যুক্তির সহিত আমরা একপ্রাণ না হইয়া পারিতাম না।

তাঁহার বক্তৃতাতে যেমন তেজ, গাম্ভীর্য্য, যুক্তি, বিচার ও তাহার সরল মীমাংসা থাকিত, তেমনি মধ্যে মধ্যে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে তাঁহার ভাবের দিকে তিনি সহজেই আকর্ষণ করিতেন।

তাঁহার জীবন, কার্য্য, চাল চলন, আচার ব্যবহার, উপাসনা, বক্তৃতা, পোষাক পরিচ্ছদ, সবই তাঁহার খাঁটী, অনাবিল, জীবন্ত, একনিষ্ঠ ব্রহ্মানুরাগেরই পরিচয় দিত। তাঁর আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি কোন দিকে আর দৃষ্টিও দিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রাণ মন যে ব্রহ্মানুগত জীবন লাভের জন্য ব্যাকুল, কেবল তাহার দিকেই একান্ত ঝুঁকিয়া থাকিত। তাঁহার মহৎ আকাঙ্ক্ষার ভাবেই তাঁহার গাম্ভীর্য্য এবং তেজস্বিতা তাঁহার মুখশ্রী ও সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। আজ তাঁহার সে স্বর, সে গাম্ভীর্য্য, বাহিরের কিছুতেই আমরা দেখিতে পাইব না সত্য, কিন্তু তাঁহার আত্মিক বাণী, তেজস্বিতা, ব্রহ্মানুরাগে একান্ত বিহ্বল ভাব, আর কোন দিকে দৃষ্টি না থাকা, তাঁহাতেই একান্ত ঝুঁকিয়া থাকা, আর সকলই উপেক্ষা করার ভাব, নিশ্চয়ই অনুভব করিতে পারিব। পরব্রহ্মের জীবন্ত বাণী যেমন কখনও নীরব হয় না, তেমনি নগেন্দ্রনাথও যাহা আমাদিগকে বলিতে চান—সমগ্র প্রাণ দিয়া বলিতে চান—তাহা কখনও নীরব হয় নাই, তাহা তিনি এখনও বলিতেছেন। কেবল তিনি কেন, সাধু মহাত্মাগণ, ব্রাহ্মসমাজের সকল আচার্য্য প্রচারকগণ তাঁহাদের বাণী বলিয়া যাইতেছেন—ইহলোকে যেমন বলিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও অধিকতর তেজ, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতার সহিতই বলিতেছেন। কিন্তু কে শোনে সে বাণী? জীবন্ত ব্রহ্মবাণীও যেমন আমাদের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার অভাবে শুনিতে পাইতেছি না, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তজনের বাণীও তেমনি অশ্রুতই থাকিয়া যাইতেছে। তাঁহারা কিসের আশায় ধন, জন, পদ সব তুচ্ছ করিয়াছেন, আর আমরা কিসের মোহে ধনজন পদকেই সার মনে করিতেছি! আজ তাঁহাকে ভক্তি অর্পণ করিতে আসিয়া লজ্জায় মস্তক নত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার পরলোক-গমনতারিখে তাঁহাকে ভক্তি দিতে আসিয়া আমাদের জীবন ও তাঁহার জীবনের পার্থক্য অনুভব করিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছি। অন্তরের ভাব ত গোপন থাকিতে পারে না; আমাদের কার্য্য-কলাপে, আশা আকাঙ্ক্ষায়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে, সবই সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার জীবনের সহিত আপন জীবনের অমিল দেখিয়া কি করিয়া তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতে সাহস করিব? শুধু নিয়ম রক্ষা করিলে নিজেরাও জীবন পাইব না, পরলোকগত আত্মারও তৃপ্তি সাধন করিতে পারিব না। কারণ, তিনি এবং তাঁহারা আর কিছুই চাহেন না। চাহেন ব্রহ্মানুগত জীবন লাভের জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, একান্ত নিষ্ঠা, প্রাণপণ যত্ন এবং সে চেষ্টায় পূর্ণ আত্মনিয়োগ। ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্মানুগত জীবন যাপন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং এতদ্দ্বারা নিজ নিজ জীবন, পরিবার, সমাজ, স্বদেশ এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-সাধন, তাঁহার এবং তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। কারণ, তাঁহারা পরমপিতা পরব্রহ্মের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে এবং জীবনের নানা পরীক্ষায়, বুঝিয়াছিলেন ইহা ভিন্ন মানবের ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণের অন্য কোন পথ বা উপায় নাই। তাই ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মের প্রিয় কার্য্য সাধন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রতার অশেষ ক্লেশ বহন করিতে হৃদয়ের অসীম বল ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্ম-জীবনীতে এক স্থানে নগেন্দ্রনাথের বিষয় লিখিতেছেন—"এই সময়ে আবার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণনগর হইতে কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রচারকদলে যোগ দিবেন বলিয়া আসিলেন।" কিন্তু প্রচারকদলের সহিত অমিল হইতে লাগিল। "নগেনবাবুর প্রতি প্রচারকগণের অপ্রীতির এক প্রকার কারণ ছিল। নগেনবাবুর তখন এক প্রকার শিরঃপীড়া ছিল, যাহাতে তিনি অনেক সময় লোকের সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না। একাকী থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি যে একাকী বেড়াইতেন, অনেক সময় গভীর আত্ম-চিন্তাতে যাপন করিতেন। এক দিনের কথা মনে আছে। এক দিন আমরা সকলে কাঁকুড়-গাছীর বাগানে, ভারত আশ্রমে, সায়ংকালীন উপাসনার পর কেশববাবুর সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তাতে আছি, এমন সময়ে কেশববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "নগেন্দ্র কৈ"; অমনি নগেন-বাবুর অনুসন্ধান হইল। জানা গেল যে তিনি বৈকাল

* চতুর্দ্দশ স্মৃতিসভায় শ্রীমতী সুশীলা বসু কর্ত্তৃক পঠিত

হইতে নিরুদ্দেশ। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। আমি তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলাম, "আপনার খোঁজ হইয়াছিল, আপনি কোথায় ছিলেন ?" তিনি বলিলেন "আজ মনটা বড় খারাপ আছে, তাই তিন চারি ঘণ্টা মাণিকতলার খালের ধারে বেড়াইতেছিলাম ও একটা গান বাঁধিয়া গাহিতেছিলাম"। এই বলিয়া গানটা গাহিয়া আমাকে শুনাইলেন। সেটা এই :—

আমি কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর ?
আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে, তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ, বলব কি আর, কি আছে আর বলিবার ?
ওহে প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে ?
আপনি এস পাপীর দ্বারে, তাই পতিতপাবন নাম তোমার।

আমি শুনিয়া ভাবিলাম নগেন্দ্রবাবু যে সন্ধ্যার সময় আমাদের সঙ্গে না বসিয়া একলা ছিলেন, সে ভালই হইয়াছে।"

একাকী নির্জ্জনে তিনি কি করিতেন, এই গানটীতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। মন খারাপ হইলে যিনি এইরূপ আত্ম-পরীক্ষা, আত্মচিন্তায় ভুলিয়া যান, তিনি কিসের জন্য লালায়িত তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। আমরা কি শিরঃপীড়ার মধ্যে, মন খারাপের মধ্যে, আপনাকে পরীক্ষা করা অভ্যাস করিতে পারিব ? যদিও আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, ব্রাহ্মযুবকসমিতির সহিত আপনাকে এক না ভাবিয়া পারিতেছি না ; কারণ, আমিও ব্রাহ্মের সন্তান। গুরুজনগণের প্রতি, আচার্য্যগণের প্রতি সমুচিত ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে না পারিলেও, আজ যে সে জন্য যুবকসমিতির আহ্বানে তাঁহাদের সহিত সমবেত হইতে পারিয়াছি, তাহাতেই আশা হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আমরা তাঁহাদের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণের উপযুক্ততা লাভের জন্য অবশ্যই প্রয়াসী হইব। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হইবে না। প্রথমেই মনে হইতেছে, ভক্তি অর্পণের জন্য আমাদের আত্মপরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কত দুর্ভেদ্য সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার বিশ্বজনীন ভাবের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন! ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে সে সকল সংস্কারের ছায়াও আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু সেই উদার বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে আপনাকে কি ডুবাইয়া দিতে পারিয়াছি? ব্রাহ্মের সন্তান হইয়া অনেক সুযোগ পাইলেও আমরা তাহা পারি নাই। তাহার একমাত্র কারণ আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা তেমন জাগে নাই। ধনীর সন্তান সুখ সুবিধা আরামভোগ করিয়া যেমন মনুষ্যত্বের জন্য জাগ্রত, চেষ্টাপরায়ণ ও যত্নশীল না হইয়াও দিব্য আরাম ভোগ করে, আমরাও তেমনি আছি। আরামে আছি—মনুষ্যত্ব কোথায় ? ব্রাহ্ম হইতে হইলে মনুষ্যত্ব লাভের জন্য একান্ত প্রয়াসী হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত মনুষ্যত্ব উপার্জ্জন করিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন পথ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনগড়া ধর্ম্ম নয়। ইহা বিশ্ববিধাতা জীবনদেবতার প্রতিষ্ঠিত মানব জীবনের অনন্ত উন্নতির একমাত্র অদ্বিতীয় বিধান। আমাদের প্রকৃতিতে যে মনুষ্যত্বের বীজ রহিয়াছে, আমাদের নিজ চেষ্টায় তাহা বিকশিত করিতে হইলে আমাদিগকে যাহা হইতে হয়, যাহা করিতে হয়, তাহা কি আপনার জ্ঞান বুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা আমরা আয়ত্ত করিতে পারি ? সে চেষ্টা আসিলেই আমাদিগকে পরব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে ; তাহাই উপাসনা।

এই মণ্ডলীর আমরা আজ যে ভক্তি অর্ঘ্য পরলোকগত আত্মার জন্য উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি, ইহা সত্য ভাবে করিতে হইলে আমাদের পরব্রহ্ম ছাড়া গত্যন্তর নাই। চক্ষে যাঁহাকে দেখা যাইবে না তাঁহার প্রতি আপনাদের আকর্ষণ সত্যরূপে অনুভব করিব কেমন করিয়া ? সেই ব্রহ্মানুরাগী নগেন্দ্রনাথ কি তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে চাহিবেন ? কখনই না। তিনি যাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে আপনাকে এখানে এবং ওখানে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহারই গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে চাহেন —তাঁহাদের আনন্দ তাঁহাতেই।

আজ সেই স্বর্গগত সাধুজনের পবিত্র স্মৃতি-উৎসবে আমরা যদি এই সংকল্প করিতে পারি যে, আমরা পরলোকস্থ সাধু মহাজনগণের পবিত্র আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করিয়া তাঁহাদের সহিত এখানে থাকিয়াই মিলিত হইব, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত প্রকৃত অমিল যেখানে তাহা ধরিয়া মিলনের পথে, স্বাধীনতার পথে, মুক্তির পথে, উন্নতির পথে, মনুষ্যত্বের পথে, ব্রহ্মজ্ঞানের পথে, ব্রহ্মভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যদি এখানে আমরা জীবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাধুতা দর্শন করিতে না পারি, তবে পরলোকগত জনের মধ্যে সাধুতা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে। যখন এখানে, এই দেহে বাস করিতেই, সাধুতার প্রতি প্রাণের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে পারিব, তখন আমরা ব্রাহ্মযুবকমণ্ডলী, অপর সকল যুবকমণ্ডলীর প্রভাবে আপনারা মলিন হইয়া, মনুষ্যত্ব হারাইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত পথ পরিত্যাগ করিয়া, নিজের, পরিবারের, সমাজের, দেশের ও জগতের অকল্যাণ না করিয়া, ধ্রুব কল্যাণ সাধনই করিতে পারিব। কারণ, কল্যাণ দেশ কাল জাতি বর্ণে আবদ্ধ নহে। যাহাতে নিজের কল্যাণ তাহাতেই পরিবারের, স্বদেশের, স্বজাতির, সমস্ত জাতির, স্বসমাজ ও সমস্ত সমাজের, সমস্ত জগতের পূর্ণ কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। যাহাতে ইহলোকের কল্যাণ তাহাতেই পরলোকের কল্যাণ। আমাদের এই যে অনুষ্ঠান, ইহা আমাদিগকে ইহপরলোকব্যাপী সেই কল্যাণের পথে লইয়া যাউক, যাহাতে আমরা প্রভু পরব্রহ্মের মধ্য দিয়া সকলের সহিত মিলিত হইব এবং সকলের ভক্তির সহিত এক হইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পূজা আমাদের বাক্য কার্য্য চিন্তা ব্যবহার এবং জীবনের সকল সম্বন্ধ দ্বারা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

বসিবার পূর্ব্বে ভ্রাতৃমণ্ডলীর নিকট এই অনুরোধ করিতেছি যে, নগেন্দ্রনাথের বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই ত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখনও যাঁহারা এ লোকে আছেন, যুবক-মণ্ডলীর চেষ্টায় অর্থে ও যত্নে তাঁহাদের দ্বারা একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত যাহাতে হয়, সে চেষ্টা যেন তাঁহারা করেন। যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহাদের জানিবার জন্য, ইহা ব্রাহ্মসমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১১ই মে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী মালতী কলেরা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২০শে জুন কলিকাতা নগরীতে কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর নিয়মিত উপাসিকা সরলা ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৬ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার তেজেন্দ্রনাথ রায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৩ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা

ভোগ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ পরহিতরতা সুখদা নাগ (মিসেস আর সি নাগ) পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল অধ্যক্ষ সভার সভ্য ও ভারত মহিলা সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন।

পরলোকগত শ্যামাচরণ দের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিগত ১০ই জুলাই দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পারুলবালা রায় কর্ত্তৃক ও ১৩ই জুলাই পুত্র শ্রীমান প্রভঞ্জন দে কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। উভয় দিবসই শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে পুত্র দাতব্য বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৬শে জুন প্রাতঃকালে সামাজিক উপাসনাতে শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করেন। তাহাতে তাঁহার অমায়িকতা, নিরভিমান নীরব কর্ম্মশীলতা ও সাধননিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক ঘটনার উল্লেখ করেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ৩রা এপ্রিল গয়া গমন করিয়া উক্ত দিবস ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য এবং একটী পরিবারে দুই দিন উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। ৬ই এপ্রিল বুদ্ধ গয়া গমন করিয়া নৈরঞ্জনাতীরে কয়েকটী বন্ধুকে লইয়া বুদ্ধের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে আলোচনা, সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। সেখান হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া সাধনাশ্রমে এবং কয়েকটী পরিবারে উপাসনাদি করেন। তৎপরে বরিশাল গমন করেন। সেখানে এক দিন ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কাঁকিনা ব্রহ্মোৎসবে যাইবার পথে নারায়ণগঞ্জ গমন করিয়া তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং একটী পরিবারে দুই দিন ব্রহ্মোপাসনা করেন। ঢাকা গমন করিয়া পূর্ব্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ময়মনসিংহ গমন করিয়া একটি রোগীর কাছে বসিয়া উপাসনা ও সঙ্গীত করেন। কাঁকিনা গমন করিয়া তথাকার উৎসবের কার্য্য করেন—উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা ও কথকতাদি করেন। এক দিন যুবকদিগের একটী সভাতে সভাপতির কার্য্য করেন। তথা হইতে পাটনা গমন করিয়া গর্দ্দানিবাগ ব্রাহ্মসমাজে দুই দিন আচার্য্যের কাজ করেন। এক দিন বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্য করেন। গিরিডি গমন করিয়া দুই দিন ডাক্তার বি রায়ের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা ও সঙ্গীত করেন। একদিন সায়ংকালে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কথকতা করেন। মিহিজাম গমন করিয়া কয়েক দিন একটী শোকার্ত্ত পরিবারে ব্রহ্মোপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, সঙ্গীতাদি এবং এক দিন কথকতা করেন। পরলোকগত প্রেমানন্দ দাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। বাঁকুড়া গমন করিয়া তথাকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কাজ সম্বন্ধে আলোচনাদি করেন। তৎপরে বাঁকুড়া ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা, আলোচনা ও সঙ্গীতাদি করেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সাধনাশ্রমে ব্রহ্মোপাসনা ও সঙ্গীতাদি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে এক দিন আচার্য্যের কাজ এবং কয়েকটী পরিবারে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। ২৩শে জুন ভবানীপুর আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে কথকতাদি করেন। চট্টকাবাড়িয়া গমন করিয়া একটি বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শুভবিবাহ—বিগত ২রা জুলাই চট্টকাবাড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া মণিকা ও শ্রীমান শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৮ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত প্রসন্নকুমার দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া নলিনীবালা ও শ্রীমান বিপিনবিহারী দের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৮ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া মঞ্জুলা ও শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অমিয়কান্তের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ৩০শে চৈত্র হইতে ৪ঠা বৈশাখ পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব হয়। ৩০শে চৈত্র সায়ংকালে কীর্ত্তনাদি এবং উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা বৈশাখ দুই বেলা উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হয়, প্রাতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাত্রিতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২রা বৈশাখ সায়ংকালে বক্তৃতা নির্দ্ধারিত ছিল, ঝড় বৃষ্টির জন্য বক্তৃতা হয় নাই। সঙ্গীতাদি অন্তে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস প্রার্থনা করেন। ৩রা বৈশাখ সায়ংকালে সর্ব্বানন্দ-ভবনে আলোচনা সভা হয়। মনোমোহন বাবু সভাপতিরূপে সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। সত্যানন্দ বাবু "আমাদের স্বধর্ম্ম" এই বিষয়ে একটী লিখিত আলোচনা উপস্থিত করেন। বিশেষ ভাবে আলোচনা হইলে সভার কার্য্য শেষ হয়। ৪ঠা বৈশাখ দুই বেলার উপাসনায় প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ এবং রাত্রিতে সতীশ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উনপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য এবং ব্রাহ্মসমাজের বিকাশ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

চৈত্রমাসের মধ্য ভাগে মান্দ্রাজের ব্রাহ্মপরিচারক শ্রীযুক্ত জে, ভি, নারায়ণ এখানে প্রায় ৩ সপ্তাহকাল অবস্থিতি করেন এবং উৎসাহের সহিত মন্দিরে দুই দিন উপাসনা, বি এম স্কুলে, ব্রহ্মমন্দিরে, ব্রাহ্মবন্ধু সভায় এবং ব্রাহ্মিকা সমাজে ৪দিন বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ও পরিবারে উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করেন। তিনি সমস্ত কার্য্যই ইংরাজী ভাষায় সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহার ভিতরে তিনি পটুয়াখালি গমন করিয়া সেখানকার ব্রাহ্মসমাজে একটী বক্তৃতা করিয়া ছিলেন।

বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে ভৈরব-ভবনে স্বর্গীয় কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতিজলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়। বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রায় বাহাদুর প্রেমানন্দ দাসের আদ্য পারলৌকিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আচার্য্যের উপদেশ ও প্রার্থনান্তে, পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে একমাত্র পুত্র শ্রীমান অমলানন্দ কর্ত্তৃক পিতার দেহভস্ম স্থাপন করা হয়। সত্যানন্দ বাবু প্রার্থনা করেন।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে সর্ব্বানন্দ-ভবনস্থ সমাধিক্ষেত্রে স্বর্গীয় হরিচরণ দাসের কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয় সুরুচি দাস বি এর, দেহাবশেষ স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সত্যানন্দ বাবু উপাসনা ও জীবনপ্রসঙ্গ পাঠ এবং তাহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অশোকানন্দ ভস্মস্থাপন এবং মনোমোহন বাবু প্রার্থনা করিলে এই পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩১শে আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered NO 65.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ১৬ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

৮ম সংখ্যা। 1st August, 1927. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

তোমা না হারাই।

দুর্গম দুস্তর পথ—[illegible] মরু,—
তার মাঝে তুমি মোর বিশ্রামের তরু!
পড়ি' ভ্রমে, পথশ্রমে কাতর যখন,
তব হাতে কত বার শীতল ব্যজন,
পাইয়াছি, চলিয়াছি—হয়েছি সবল,—
মুছিতে মুছিতে পথে নয়নের জল!
দিশাহারা সঙ্গীহারা হ'য়ে কত বার,
দিবার আলোকে আমি দেখেছি আঁধার!
কি আর বলিব আমি? করেছ লজ্জিত,
বিতরি' পলকে পুনঃ জ্যোতিঃ অযাচিত!
সে আলোকে মরু পার হ'তেছি এখন,—
রক্তাক্ত আজিও যদি যুগল চরণ।
আছে ব্যথা, নাহি কথা বলিবার স্থান,
থাকিয়া থাকিয়া তবু কেঁদে ওঠে প্রাণ!
কত হারা'লাম পথে খুঁজিয়া না পাই,
চিরসঙ্গী! এই ভিক্ষা—তোমা না হারাই।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে পবিত্রস্বরূপ পুণ্যময় বিধাতা, তুমিই নিয়ত জগতে তোমার প্রেম ও পুণ্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছ, তোমার প্রাণপ্রদ ধর্ম্মের আশ্রয়ে সকলকে আনিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের নিকট যেমন তোমার পবিত্র ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছ, তেমনি তাহাকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া চারিদিকে তাহার বিস্তারে সহায়তা করিবার গুরুতর দায়িত্বও আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ। কিন্তু আমরা মোহবশতঃ অনেক সময় আলস্য উদাসীনতাতে ও অসার বিষয়ে মত্ত থাকিয়া, সে-কথা ভুলিয়া যাই, এবং আমাদের মলিন জীবনের দ্বারা তোমার ধর্ম্মের গৌরবকে খর্ব্বই করি। লোকে কোথায় আমাদের জীবনে তোমার ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান দেখিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবে, তাহার শক্তি ও মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে, না, আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা দর্শনে, শুধু আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হইয়া, মনে করে তোমার ধর্ম্মেরও বিশেষ কোনও শক্তি নাই, উহা মানুষকে চির কল্যাণ ও অনন্ত উন্নতির পথে, মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের দিকে লইয়া যাইতে সমর্থ নহে। আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, ইহাতে শুধু আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই না, আনন্দ শান্তি উন্নতি ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হই না, তোমার ধর্ম্মপ্রচারের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া অপরেরও মহা অনিষ্ট সাধন করি। হে জীবনবিধাতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথা বুঝিতে সমর্থ কর, আমরা যেন আর এই ভাবে তোমার পবিত্র কার্য্যে বাধা উৎপন্ন না করি। তুমি আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত করিয়া লও, আমাদের সকল মোহ দুর্ব্বলতা বিদূরিত কর। আমাদের জীবনে ও সমাজে তোমার ধর্ম্মই জয়যুক্ত হউক, আমরা জীবনদ্বারা তোমার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ধন্য হই। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

শেষের সম্বল—সংসারে বুদ্ধিমান্ যারা, তারা শেষের সম্বল সঞ্চয় ক'রে রাখে। যখন মানুষের শক্তি সামর্থ্য থাকে, তখন সে উপার্জ্জন করে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ যে সে জানে, আপদ

বিপদ আস্‌তে পারে, জরা বার্দ্ধক্য আস্‌তে পারে; তখন হয়ত সে কর্ম্মক্ষম থাকবে না, উপার্জ্জন করা সম্ভবপর হইবে না। তখন চল্‌বে কি রূপে? তাই সে শক্তি থাক্‌তেই সঞ্চয় ক'রে রাখে। যে সেরূপ না করে, তাকে মুস্কিলে পড়্‌তে হয়, ক্লেশ পেতে হয়। আধ্যাত্মিক জীবনেও সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। যে পর্য্যন্ত তুমি সুস্থ ও সবল থাক্‌বে, দশ জনের সঙ্গে মিশ্‌তে পারবে, তত দিন তোমার কোনও অসুবিধা না হ'তে পারে। কিন্তু জীবনে এমন সময় আস্‌তে পারে, যখন তুমি অচল হ'য়ে পড়্‌বে, চক্ষু দৃষ্টিহীন হবে, কোনও কাজ করতে পারবে না, পুস্তক পড়্‌তে পারবে না, হয়ত কাণেও শুন্‌তে পাবে না। তখন তুমি কি নিয়ে থাকবে? তখন কি জীবনকে ধিক্কার দিবে? তাই শেষের সম্বল সঞ্চয় কর, পরম ধনের সন্ধান কর; যাতে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় তার চেষ্টা কর। অন্তর-দেবতার সঙ্গে যোগ স্থাপন কর। বাহিরের দৃষ্টি যখন বন্ধ হবে, অন্তরের দিকে তাকিয়ে আনন্দ পাবে; বাহিরের কথা যখন শুন্‌বে না, অন্তরে তাঁর বাণী শুনে সুখী হবে; বাহিরের বন্ধুরা যখন আস্‌বে না, তখন তাঁর প্রেমে ডুবে কৃতার্থ হবে।

নামে রুচি—যিনি সত্যং শিবং সুন্দরং, তাঁর নাম কি মধুর! তাঁর নাম লইতে সহজেই ত রুচি হয়। যদি তা না হয়, তবে নিশ্চয়ই কোনও ব্যাধি আছে। এ ব্যাধির ঔষধ ঐ নাম। ব্যাকুল ভাবে, সরল অন্তরে, তাঁর নাম কর। সজনে নির্জ্জনে তাঁর নাম কর; চল্‌তে ফির্‌তে তাঁর নাম কর। "তেরা বনত বনত বনি যাই"—নাম করতে করতে, ব্যাকুল ভাবে একটু নির্ভরের সহিত নাম করতে করতে, নামে রুচি জন্মিবে। নাম নিতে ভাল লাগিবে। নামের সঙ্গে নামীর আবির্ভাব বুঝ্‌তে পারবে। নামে অনুরাগ জন্মিবে; তখন নাম না নিলেই কষ্ট বোধ হইবে, জীবন শুষ্ক বোধ হবে; ক্রমে আনন্দ আস্‌বে—সে আনন্দের তুলনা নাই। তখনই প্রেমের আরম্ভ। তাই বলি, প্রথমে নামে রুচি, পরে অনুরাগ, পরে আনন্দ। সুতরাং নাম লইতে থাক; মন বিক্ষিপ্ত হইলে নাম করতে থাক। মহর্ষি বলেছেন, "কর তাঁর নাম গান।"

দিনের শেষে—মাঝি যখন নৌকা বায়, সে দেখে দিনের শেষে সে কতদূর এসেছে। সে ক্রমাগত নৌকা বাইছে, দিন যায়, রাত্রি যায়, অথচ নৌকা এগোয় না; তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে নৌকা কোথায় বাঁধা রয়েছে। তুমি দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ, অথচ একটুও পথ অতিক্রম হয় নাই; সে কিরূপ কথা! তোমার সঙ্গে কোথা একটা বন্ধন রয়েছে তা ছিঁড়তে পাচ্ছ না। তুমি প্রতিদিন উপাসনা কর, শাস্ত্র পাঠ কর, সৎ প্রসঙ্গ কর; দিনান্তে ভেবে দেখ, কিছু অগ্রসর হচ্ছ কি না। অন্তরের মলিনতা কি কমেছে? রিপুকুল কি নিস্তেজ হয়েছে? ব্যবহার কি মিষ্ট হয়েছে? অন্যের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হ'তে কি পাচ্ছ? নামে কি রুচি, অনুরাগ জন্মেছে? তা যদি না হ'য়ে থাকে, দিনের পর দিন সাধন কচ্ছো, অথচ অগ্রসর যদি না হ'য়ে থাক, নিশ্চয়ই কোথাও গলদ আছে। সব অনুষ্ঠান গতানুগতিকের মত ক'রে যাচ্ছ, প্রাণে তা স্পর্শ করে নাই, নিষ্ঠা আসে নাই। প্রতিদিন আত্মপরীক্ষা কর। প্রতিদিন কিছু অগ্রসর হবে, নতুবা মৃত্যু আস্‌বে।

সম্পাদকীয়

প্রচারের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়—আবশ্যকীয় অর্থ ও যথেষ্ট সংখ্যক উৎসাহী কর্ম্মীর অভাবে আমাদের সকল কার্য্য, বিশেষতঃ প্রচারকার্য্য, কিরূপ ক্ষীণ ভাবে চলিতেছে, পঙ্গু হইয়া যাইতেছে, আমরা গত দুই সংখ্যায় তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। অর্থ ও লোকের যে কত প্রয়োজন, সে অভাব দূর করিবার জন্য আমাদিগের কিরূপ চেষ্টা যত্নে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা সকলেই অতি সহজে বুঝিতে পারে,—সে বিষয়ে অধিক কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু শুধু যথেষ্ট অর্থ ও লোকবল থাকিলেই, চারিদিকে বহুসংখ্যক প্রচারক ও বক্তা পাঠাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহতী বার্ত্তা সকল শ্রেণীর লোকের নিকট ঘোষণা করিতে পারিলেই কি, লোকে দলে দলে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, ইহার আশ্রয়ে আসিবে,—অপ্রতিহত গতিতে ইহা প্রচারিত হইবে? ইহার উদার বিশুদ্ধ মত মনোহর ভাষাতে, সুযুক্তির সহিত, সকলের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলেই কি উহা বহু বিস্তার লাভ করিবে? প্রচারপথে আর কোনও অন্তরায় থাকিবে না? ইহার দ্বারা প্রচার বিষয়ে যে বিশেষ সহায়তা হইতে পারে, ইহার অভাবে সে পথে যে গুরুতর বাধা উপস্থিত হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়াও, কিছুতেই বলা যায় না—তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল, আর কোনও বাধা বিঘ্ন রহিল না। সুমধুর ভাষাতে, অকাট্য যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে, বিশুদ্ধ মত লোকের নিকট উপস্থিত করিলে উহা সহজে গৃহীত হইতে পারে, মতে তাহার সত্যতা স্বীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে স্বীকার ও গ্রহণ শুধু বুদ্ধির রাজ্যে বাহিরেই আবদ্ধ থাকিতে পারে, হৃদয়কে কিছুমাত্র স্পর্শ না করিতে পারে, জীবন ও কার্য্যকে বিন্দুপরিমাণেও প্রভাবান্বিত না করিতে পারে। অথচ তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম গৃহীত বা প্রচারিত হইল বলিয়া মনে করা যায় না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোনও ধর্ম্ম যখন শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ের মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও পবিত্র ভাবগুলিকে জাগায়, তদনুসারে জীবন ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সকল কার্য্যে তাহার অনুসরণ করিতে, তদনুসারে আপনাকে গঠিত ও চালিত করিতে, প্রাণে দৃঢ় সংকল্প জন্মায় ও তাহাতে সমর্থ করে, আর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সকল বিষয়ে তাহাকেই জয়যুক্ত করিবার ইচ্ছা ও শক্তি প্রদান করে, তখনই সে ধর্ম্মকে গ্রহণ করা হইল বলিয়া মনে করা যায়, উক্ত ধর্ম্ম যথার্থরূপে প্রচারিত হইল বলিয়া বুঝিতে পারা

যায়। শুধু ভাষার পারিপাট্য বা বিশুদ্ধ যুক্তি বিচার দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। হৃদয়ই হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে, জীবনই জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, শক্তিই শক্তি সঞ্চার করিতে পারে। চরিত্রের মহত্ত্ব, জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যই শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। যেখানে তাহার অভাব, সেখানে কিছুতেই শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পিত হইতে পারে না। কাজেই চরিত্রে ও ধর্ম্মজীবনে হীন বা অনুন্নত সুবক্তা ও সুপণ্ডিত দ্বারা কোনও রকমেই প্রচারকার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না। অপর দিকে ধর্ম্মে উন্নত জীবন ও চরিত্রের প্রভাব কিছুতেই ব্যর্থ হয় না, শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও শক্তি চারিদিকে বিস্তার করিতে, অসমর্থ হয় না। নীরব থাকিলেও এরূপ জীবন সকলকে প্রবল ভাবেই প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই। এরূপ জীবনের প্রভাবেই চির দিন ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে—ধর্ম্মের দ্বারা মানবজীবন ও সমাজ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইয়াছে, সাধু ভাবসকল বর্দ্ধিত হইয়াছে, মন্দ ভাবসকল পরাভূত ও বিদূরিত হইয়াছে। কোনও ধর্ম্মের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত না হইলে যেমন উহা প্রচারিত হইতেছে বলা যায় না, সেরূপ এই শ্রেণীর জীবন ও চরিত্র ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েও এই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং অর্থাদির যতই প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন, ইহাদের দ্বারা প্রচারকার্য্যের যতই সহায়তা হউক না কেন, তাহারা যে প্রচারের সর্ব্বপ্রধান উপায়রূপে গৃহীত হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শুধু তাহাই নয়, এই সকল যে কোন কোন স্থানে প্রচারের অন্তরায়ও হইয়া উঠিতে পারে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত প্রচারের উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমরা এ বিষয়ের বিচার করি, তাহা হইলে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। অল্প অনুসন্ধানেই দেখিতে পাইব, অর্থ ও লোকের অভাব যেরূপ অন্তরায়, তাহাদের প্রাচুর্য্যও তেমনি অন্তরায় হইতে পারে। অনেক অর্থশালী ধর্ম্মসমাজ যেরূপ ভাবে প্রচার-কার্য্যে তাহাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইব। কিন্তু তাহা আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের যখন অর্থাদির যথেষ্ট অভাবই রহিয়াছে, কিছুমাত্র প্রাচুর্য্য নাই, তখন সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোনও লাভ নাই। আমাদের পক্ষে অর্থাভাব ও লোকাভাব গুরুতর অন্তরায়ই বটে। কিন্তু তাহা হইলেও, উহা সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় নহে। তাহা অপেক্ষাও অন্য প্রবলতর অন্তরায় আছে; তাহার আলোচনা করাই আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য।

নানা কারণে আজকাল ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্বসকল অনেকটা বহুল ভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। দেশে এখনও এ বিষয়ে যথেষ্ট অজ্ঞতা আছে সত্য, তবুও সাধারণ ভাবে শিক্ষিত লোকের মধ্যে এ বিষয়ের জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং নূতনত্ব হিসাবে লোকের মন আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা আজ কাল অতি অল্পই আছে। অপর পক্ষে, যে যত উচ্চ তত্ত্বের কথা বলে, মানুষ স্বভাবতঃই তাহার নিকট হইতে তত উচ্চ জীবন আশা করে, তাহাকে তত উচ্চ মাপকাঠীর দ্বারা বিচার করে, তাহার মধ্যে সে সকল মূর্ত্তিমান দেখিতে চায় এবং সেরূপ কিছু দেখিতে না পাইলে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাহাকে অশ্রদ্ধার সহিত পরিত্যাগ করে, অসার শূন্যগর্ভ বলিয়া অবজ্ঞার সহিত তাহা হইতে দূরে চলিয়া যায়। কাজেই ব্রাহ্ম প্রচারকগণ ধর্ম্মের যে উচ্চ আদর্শ লোকের নিকট প্রচার করেন, সকলে তাহাদের মধ্যে তাহার অনুরূপ জীবনই দেখিতে চাহিবেন, এবং তাহা দেখিতে না পাইলে তাহাদের ও তাহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি কিছুতেই শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারিবেন না, বরং অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞাই পোষণ করিবেন, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ অপরের সম্বন্ধে কঠোর সমালোচক হইলেও, মানবীয় ত্রুটি দুর্ব্বলতা যে কতকটা ক্ষমার চক্ষে না দেখে তাহা নহে। কিন্তু যে মুখে যত উচ্চ কথা বলিবে, তাহাকে নিশ্চয়ই লোকে তত কম ক্ষমা করিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ, অপর সকল ধর্ম্মের তুলনায় ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে গেলে, লোকে যে ব্রাহ্মের নিকট হইতে অপর সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবন আশা করিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই; কারণ, শ্রেষ্ঠতর জীবনপ্রদানদ্বারাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। কাজেই লোকে যদি ব্রাহ্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর জীবনের পরিচয় না পায়, ব্রাহ্মের জীবন যদি অপর দশ জনের জীবনের ন্যায়ই মলিনতা ও সাংসারিকতায় পূর্ণ দেখিতে পায়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবে কেন? ব্রাহ্মধর্ম্মকে অপর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিবে কেন? এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই লোকে ইহার সম্বন্ধে উদাসীনই থাকিবে। তাহার উপর যদি লোকে দেখিতে পায় ব্রাহ্মদের জীবন অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ না হইয়া অপকৃষ্টই, ইহারা মুখে যাহা প্রচার করে কাজে তাহা করে না, তাহা হইলে যে শুধু ইহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের সম্বন্ধে নয়, ধর্ম্মের সম্বন্ধেও, হৃদয়ে অশ্রদ্ধা জন্মিবে, তাহা বলা বাহুল্য। মানুষ যে ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটির জন্য শুধু ব্যক্তিকেই দায়ী করে তাহা নহে, তাহার আত্মীয় স্বজন পরিবার সমাজ প্রভৃতিকেও তাহার অংশভাগী করে, তাহাদিগকেও বহুপরিমাণে সে জন্য দায়ী করে। এরূপ করা যে মোটেই যুক্তি-সঙ্গত নহে তাহা কোনও ক্রমে বলা যায় না—ইহার যথেষ্ট যুক্তি-সঙ্গত কারণই রহিয়াছে। তদুপরি আমাদের ন্যায় একটা নূতন ও ক্ষুদ্র সমাজের একটী লোকের জন্য সমগ্র সমাজকে দায়ী করা আরও অধিক স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গতও বটে। আবার অধিকাংশ-স্থলেই ধর্ম্মটা প্রধানতঃ মতের বিষয়, জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অতি অল্পই স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা উহাকে সম্পূর্ণ জীবনেরই বিষয় বলিয়া প্রচার করিয়াছি। অপরে যাহাকে কঠিন বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, আমরা তাহাকে অবশ্যকরণীয় বলিয়া অবলম্বন করিয়াছি। কাঠিন্য স্বীকার করিলেও কখনও পরিত্যাজ্য বলিয়া স্বীকার করি নাই। ধর্ম্মকে চরিত্রে ও জীবনে, সংসারের যাবতীয় কার্য্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিতেই হইবে, ইহাই আমরা বিশেষরূপে ঘোষণা করিয়াছি।

সুতরাং আমাদের জীবনে তাহার বিপরীত ব্যবহার দেখিলে লোকে আমাদের কথাকে, আমাদের প্রচারিত মতকে অশ্রদ্ধেয়ই মনে করিবে। কাজেই আমাদের পক্ষে সে আদর্শ হইতে বিচ্যুতি লোকের নিকট অমার্জ্জনীয় হইবারই কথা—আমাদের প্রচারিত আদর্শটাই ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা। মতের ও জীবনের পার্থক্যের জন্য আমাদের ন্যায় আর কাহাকেও যদি লোকে দায়ী না করে, শুধু আমাদিগকেই যদি সে জন্য অপরাধী করে, তাহা হইলেও আমাদের কিছু বলিবার নাই। উহা যখন আমাদেরই প্রচারিত তত্ত্বের ফল, তখন আমাদের পক্ষে অন্যরূপ আশা করা কোনও ক্রমেই সঙ্গত হয় না। প্রচারকদের জীবনে এই প্রকার পার্থক্য থাকিলে তাহা যে সর্ব্বাগ্রে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং তদ্দ্বারা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অপর জীবনেও ইহা অল্প অনিষ্টকর নহে। নূতন ও ক্ষুদ্র সমাজের প্রত্যেক লোকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রচারকের দ্বারা অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হইলেও, প্রত্যেকের দ্বারাই কিছু না কিছু অনিষ্ট সাধিত হয়ই। ইহাই যে প্রচারপথে সর্ব্ব প্রধান অন্তরায় তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না।

সকল বিষয়ে আমাদের প্রচারিত ধর্ম্মের অনুরূপ জীবন যাপন করা, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম পালন করা, বহু লোকে অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। জীবনে উহাকে মূর্ত্ত না দেখিলে তাহাদের এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইতে পারে না। তাহার উপর আমাদের জীবনই যদি তাহার বিপরীত দেখিতে পায়, আমাদের জীবনেই উহা ব্যর্থ হইতেছে দেখিতে পায়, তবে ত স্বভাবতঃই এই ভ্রান্তি বদ্ধমূল হইবে। ব্যক্তিগত ক্রটি দুর্ব্বলতা দেখিয়া, কোনও বিষয়ে সাময়িক অক্ষমতা বা পতন দেখিয়াই, যে লোকের এই সংস্কার জন্মে, তাহা মনে হয় না। সেরূপ ক্রটি দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা পতন যে মানুষ আমাদের সম্বন্ধেও বুঝিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতি অল্প লোকেই তাহার জন্য সমগ্র সমাজকে বা আমাদের ধর্ম্মকে দায়ী করে। অধিকাংশ লোকই জীবনের সাধারণ গতি ও ব্যবহার দ্বারাই বিচার করিয়া থাকে। লোকে যেখানে দেখে কোনও জীবনে সাধারণ ভাবে ধর্ম্মটাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, প্রেম পুণ্য নিঃস্বার্থতা পরসেবা প্রভৃতির দিকেই গতি রহিয়াছে, হঠাৎ কোনও বিষয়ে কোনও অন্যায় করিলেও তাহার জন্য সরল অনুতাপ করিতেছে, সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে, নিজের দোষ ক্রটি স্বীকার করিতেছে, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, সেখানে কখনও শ্রদ্ধা হারায় না। বরং ধর্ম্মের প্রভাবটা আরও উজ্জ্বল ভাবেই দর্শন করে। কিন্তু যেখানে দেখা যায়, উচ্চ তত্ত্বের কথা ও নিয়মিত ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান সত্ত্বেও তাহার মধ্যে বিনয় ও দীনতার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের অহঙ্কারই যথেষ্ট আছে, ধর্ম্মানুরাগের পরিবর্ত্তে প্রবল সাংসারিকতা, প্রেমের পরিবর্ত্তে সংকীর্ণতা, নিঃস্বার্থ ভাবের পরিবর্ত্তে নীচ স্বার্থপরতা, সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতা, দোষ-সংশোধনের পরিবর্ত্তে কলঙ্ক ঢাকিবার চেষ্টা, এবং অনুতাপ, ক্ষমাভিক্ষা, ধর্ম্মানুগত জীবন লাভের সরল চেষ্টা প্রভৃতির অভাব প্রচুরই আছে, সেখানে নিশ্চয়ই কাহারও পক্ষে শ্রদ্ধা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। এরূপ স্থলে স্বভাবতঃই যে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় এবং ধর্ম্মকেই অসার শক্তিহীন মনে করা হয়, তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কি বলিবার আছে? যদিও প্রকৃত পক্ষে দোষটা ধর্ম্মের নহে, সাধকেরই, তথাপি সাধারণ লোক সেরূপ দার্শনিক প্রভেদ স্বীকার না করিয়া যদি ধর্ম্মের উপরই বীতশ্রদ্ধ হয়, তবে আমরা তাহাদিগকে তত দোষ দিতে পারি না। আর, ইহা যুক্তিযুক্ত হউক আর না হউক, প্রকৃত অবস্থাটা যে এই প্রকারই, তাহা ভুলিলে ত চলিবে না। আমাদিগকে তাহা স্মরণে রাখিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। কারণ, আমরা যাহা বলি না কেন, তাহারা এই সংস্কারদ্বারাই চালিত হইবে, সমস্ত প্রচার-চেষ্টার ফল তাহাদের সম্বন্ধে ইহার উপরই নির্ভর করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা কিছুতেই আমাদের অবলম্বিত বা প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। এতদ্ব্যতীত সাধারণ মানুষ যে জীবনে মূর্ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন তত্ত্বকে পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারে না, তাহাও সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে জীবন ও ব্যবহার তত্ত্বের বিরোধী কথাই প্রচার করে, সেখানে লোকে কখনও তত্ত্বের উপর বিশেষ কোনও আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, উহা বুঝিতেও পারে না। সুতরাং ধর্ম্মহীন জীবনই—শুধু প্রচারকদের নয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মের মলিন জীবনই—যে প্রচারের সর্ব্ব প্রধান অন্তরায়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা অনেক সময়ই এই বিষয়ে আমাদের যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে সে কথা ভুলিয়া যাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের অনুরূপ জীবন যদি আমরা লাভ না করিতে পারি, অথবা তৎবিরোধী জীবন যাপন করি, তবে তাহার দ্বারা শুধু আমরা নিজেই যে ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহা নহে; অপরেরও মহা অনিষ্টসাধন করিয়া থাকি; আমাদের প্রিয় ধর্ম্মের গৌরবও বিনষ্ট করিয়া থাকি। অন্যান্য অন্তরায়হেতু কখনও এত অনিষ্ট সাধিত হয় না। সুতরাং অন্য সকল অন্তরায় দূর করিবার জন্য যদি আমাদের বিশেষ চেষ্টা যত্ন করা আবশ্যক হয়, তবে এই উদ্দেশ্যে আরও কত অধিক চেষ্টা যত্নের প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা অবহেলা কোনও প্রকারেই শোভা পায় না। এই গুরুতর কর্ত্তব্যপালনে আমরা সকলে বদ্ধপরিকর হই। প্রত্যেক জীবনে ধর্ম্মকে জয়যুক্ত হইতে, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে দিয়া, প্রচারের সকল অন্তরায় দূর করি। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে শক্তি ও শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম আমাদের সকল জীবনে গৌরবান্বিত হউক। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

পাওয়া ও দেওয়া

আমরা সহরের লোকেরা একবার শুনিলাম যে সাঁওতাল পরগণার এক অজ্ঞাত জঙ্গলে অভ্রের খনি বাহির হইয়াছে। লোকেরা আগে এ বিষয়ে কিছুই জানিত না, হঠাৎ জানিতে পারিয়াছে। অভ্র তুলিয়া ব্যবসা করিবার জন্য দলে দলে লোক সেখানে যাইতে লাগিল। কিন্তু ঐ খনির কথা শুনিয়াও অনেকের মনে সেখানে শীঘ্র যাইয়া ব্যবসা করিবার জন্য তেমন উৎসাহ হইল না। কিছু দিন পরে সহরে, এমন দুজন লোক এলেন, যাঁরা সেই অভ্রের খনিতে দুই বৎসর ছিলেন, এবং অভ্রের ব্যবসায়ে টাকা লাগিয়ে, মূলধন বাড়িয়ে, ধনী হ'য়ে ফিরে এসেছেন। তখন যাঁহাদের ব্যবসায়ে টাকা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল, তাঁহারা সেখানে যাইতে উৎসাহিত হইলেন। এত বেশ লাভের উপায়, চল সেখানে যাই, এই বলিয়া ছোট ছোট Joint stock company করিয়া, কেও নিজেরই অর্থ লইয়া সেই খনিতে অর্থ বাড়াইতে গেলেন, লাভবান ও হইলেন। তখন দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বাস্তবিকই অভ্রের খনি আছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস হইল। দলে দলে লোক খনিতে যাইতে লাগিল। সকলে এখন দেখিয়াছে যে, যে সব লোক সেখানে গিয়াছিল, তারা কিছু পেয়েছে, তারা কিছু হয়েছে, তারা কিছু লাভ ক'রেছে, তাদের হাতে কিছু জ'মেছে। অমনি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, সেই দিকে যাইতে উৎসাহ হইল।

রাণীগঞ্জে যখন প্রথম কয়লার খনি হয়, তখন কয়েক জন মাত্র ব্যবসা করিতে গিয়াছিল। যখন সকলে জানিল যে সেখানে গিয়ে, লোকে কিছু পেয়েছে, কিছু হয়েছে, তাদের হাতে কিছু জমেছে, তখন দলে দলে লোক ব্যবসা করিতে ছুটিল।

শুধু জনরবে হয় না, শুধু কথা উঠাইলেই হয় না, মানুষ দেখ্‌তে চায়, লোকে কিছু পেয়েছে, কিছু হ'য়েছে, কিছু হাতে জ'মেছে। তা' না হ'লে, মানুষের মন লাগে না, মানুষ কোথাও যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাগপুরে সোণার খনি বাহির হইয়াছিল। সেই খনিতে ব্যবসা চালাইবার জন্য একটি Company গঠিত হয়। তাহাতে আমার কয়েকজন বন্ধু টাকা দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, কেও কেও হতাশ হইয়া মারা গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Bombay তে Back Bay boom উপলক্ষে এক Company গঠিত হয়। সকলে মনে করিয়াছিল Back-bay পাথর দ্বারা বুজাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহাতেও অনেকে টাকা দিয়া নির্ধন হইয়াছেন, এবং হতাশ হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন।

শুধু কথায় হয় না, জনরবে হয় না, হৈঃ হৈঃ ক'রে দল বেঁধে ঢাক বাজালে হয় না। তাতে লোক আকৃষ্ট হয় না। লোকে কিছু পাওয়া দেখ্‌তে চায়। এই নগদ পাওয়ার মত তত্ত্ব আর নাই। এই কারণে, আমাদের চা-বাগানের সাহেবরা কুলি সংগ্রহ করিবার এইরূপ উপায় অবলম্বন করেন। যে সব কুলি চা-বাগানে কিছুকাল কাজ করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়া নিজেদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত ও স্বচ্ছল করিয়াছে, যা'দের হাতে কিছু জমিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের গ্রামে কুলী সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। গ্রামের লোকে দেখে, যারা গরিব ছিল, দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিল, তাদের স্ত্রীর গলায় সোনার দানা, হাতে সোনার বালা, ট্যাঁকে টাকা হ'য়েছে। আর কি চাই? এর চেয়ে কুলী আকর্ষণ করিবার প্রধান উপায় আর নাই। তাই এইরূপ কুলিদিগকে গ্রামে পাঠায় যে, সকলে দেখুক চা-বাগানে গিয়ে, যাদের কিছুই ছিল না তাদের কিছু হ'য়েছে, তাদের হাতে কিছু জ'মেছে।

আমাদেরও প্রচার করিবার জন্য এমন লোক পাঠাইতে হবে, যাঁদের দেখেই লোকে বুঝ্‌বে, এ কিছু পেয়েছে, হাতে কিছু পেয়েছে, কিছু দেখেছে। তা যদি না হয়; আমাকে দেখে যদি লোকের মনে হয়, আমি কিছু পাই নাই, দেখি নাই, তবে ঢাক বাজালে কি হবে? ও যে Back Bay boom, ও যে নাগপুরের ফাঁকা খনি, ও তো দাঁড়াতে পারবে না, ও টিকবে না, ও ফেঁসে যাবেই যাবে। যদি কেও কিছু পেয়ে থাকে, তা' হলেই তার দ্বারা প্রচার হবে।

আমি যদি এখন আমাদের গ্রামে যাই এবং যাঁরা ছেলে-বেলায় আমাকে দেখেছেন, তাঁরা যদি এখন দেখেন যে আমি হতভাগা, আমি কিছু পাই নাই, এতগুলা বৎসর গিয়েছে, আমি কিছুই জমাতে পারি নাই, তা' হলে কি হবে? আমার মুখ যদি বলে 'এস এস, স্বর্গরাজ্য এসেছে, পাপীর পরিত্রাণ এসেছে'—সে কথায় কে কাণ দেবে? ব্রাহ্মসমাজকে দেখাতে হবে, তাঁরা কিছু পেয়েছেন, ব্রাহ্মেরা কিছু পেয়েছে। তাঁরা আগে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ছিলেন, এখন কিছু পেয়েছেন।

যদি কেও কিছু পেয়ে থাকেন, তাঁহার দ্বারা প্রচারও হবে। সেই অভ্রের খনি এবং চা-বাগান হইতে লোকে বড় লোক হ'য়ে, কিছু পেয়ে, কিছু হাতে ক'রে ফিরে এলে, তা দিকে দেখে যেমন লোকে সেই খনি এবং চা-বাগানের পানে ছোটে, তাঁদের কথা শুনেও তেমনি লোক আকৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচার হয় না, কারণ, ইহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয় না যে ইহারা কিছু পেয়েছে। কাজেই লোক আকৃষ্ট হয় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, 'পাওয়া টাওয়া আবার কি? নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করি, ধর্ম্মের আলোচনা করি, ধর্ম্মের কথা বলি, উপাসনায় আসি যাই, এর মধ্যে আবার 'পাওয়া' 'হওয়া' কি যা মানুষে দেখ্‌বে? এ ঠিক কথা নয়!"

'পাওয়া', 'না পাওয়া' বুঝ্‌তে বিলম্ব লাগে না। Zoological garden এর সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ আহারের পূর্ব্বে একটুও স্থির হ'য়ে থাকে না, ঘোরে ফেরে, ছট্ ফট্ করে। যেই মাংস পেলে, তাহার উপর বসিয়া, আহার করিলে পর, আর ছুটাছুটি নাই, তখন সে গম্ভীর ভাবে বিশ্রাম করিতেছে। বুভুক্ষিত প্রাণী এবং ভুক্ত প্রাণী দেখ্‌লে বোঝা যায়, তা কাউকে তর্ক ক'রে বুঝাতে হয় না।

২০ এ আগষ্ট, ১৯০৩, বৃহস্পতিবার, সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত উপদেশ।

ধর্ম্ম সাধন ক'রে কিছু পেয়েছে যে মানুষ, এবং যে কিছু পায় নাই,—তা কি বুঝ্‌তে পারা যায় না? কিছু না পেয়ে যদি কেহ কিছু বলেন, তবে কথায় কিছুই হবে না।

কিছু-পাওয়া মানুষ চেনা যায়। মহর্ষি এবং আমাদের মধ্যে প্রভেদ কি? তিনি কিছু পেয়েছেন, কিছু দেখেছেন, কিছু হ'য়েছেন। তিনিও, আমরা যে সব কথা বলি, সেই সব কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা এবং আমাদের কথার শক্তির এত প্রভেদ কেন? পাওয়া না পাওয়ায় তফাত আছে। ব্রাহ্মেরা বেশ করিয়া বুঝুন যে তাঁরা কি পাওয়ার দলের মানুষ? তাঁদের অন্তরাত্মা যদি বলে "না," তবে তাঁহাদের কথায় কি প্রকারে কাজ হইবে? যদি বলে "হাঁ," তাহা হইলে আরও কাজ হওয়া উচিত ছিল।

বিশেষতঃ আশ্রমের লোকদের বোঝা উচিত, তাহারা কেন দাঁড়িয়েছে! কিছু দেবার জন্য। কে দিতে পারে? যে নিজেই খেতে পায় না, এক মুষ্টি অন্ন পায় না, যার হাতে দুটো পয়সা নাই, সে কি প্রকারে অপরকে খাইতে দিবে, গরিবকে দুইটা টাকা দিবে? যার কিছু নাই, সে কি দেবে? আমাদের অন্ততঃ কিছু পাওয়া চাই—লোকে যেন বুঝ্‌তে পারে, আমাদের হাতে কিছু জ'মেছে, এ মানুষগুলো জমে গিয়েছে, একটা কিছু দেখেছে। যে কিছু পায় নাই, যে কিছু দেখে নাই, তাহার দ্বারা কিছুই হবে না।

যে নিজে জলে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে সে কি অপরকে তুলে নিয়ে যেতে পারে? যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, আপনার কাপড়খানা ফেলে দিয়ে, অপরকে টেনে তুল্‌তে পারে। তোমার নিজের পা-ই মাটিতে নাই, তুমি নিজেই মাটি পাও নাই, দাঁড়াতে পার নাই, নিজেই ডুবে মরছ, হাবুডুবু খাচ্ছ, তুমি অন্যকে তুল্‌বে কি ক'রে?

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পাগলনাথ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। দলে দলে লোক কেন তার পেছনে ছোটে, তার কাছে যায়? পাগলনাথ সিদ্ধ মানুষ, সে কিছু দেখেছে, সে কিছু পেয়েছে, হাতে ধরেছে, তাই লোকে তার কথা শুনে ছুটছে।

বেশ ক'রে সকলে চিন্তা ক'রে দেখুন,—আত্মপ্রতারিত হবেন না—দেখুন কিছু হাতে পেয়েছেন কি না, কিছু দেখেছেন কি না, যে বল্‌তে পারেন—"কৃতার্থোস্মি, "ধন্যোস্মি" "আমি ধন্য হ'য়েছি, আমি কৃতার্থ হ'য়েছি",—আমি খাঁটি জিনিষ পেয়েছি!

যে কয়জন লোক কিছু পেয়েছেন, তাঁহাদের দ্বারাই প্রচার হইয়াছে। পাওয়া ও দেখা মানুষের দ্বারাই প্রচার হয়। বক্তৃতা-দ্বারা কিছুই হয় না। প্রাণ দেওয়া মানুষ, আগুনে পোড়া মানুষ,—মানুষ দ্বারাই কাজ হয়।

এই জন্য, সব ব্রাহ্মেরই, বিশেষতঃ আশ্রমের লোকদের, বিশেষ-ভাবে মন দেওয়া উচিত। যদি আশ্রমের উদ্দেশ্য, আশ্রমের কাজ, প্রাণ দিয়ে ধর্‌তে না পারি, চ'লে যাওয়া উচিত। শিথিল ভাবে, হাল্‌কা ভাবে এ কাজে হাত দেওয়া পাপ। এ কি "ঝিলিমিলি" খেলাতে এসেছ? এ নিয়ে যে ছেলেখেলা করে, সে পাপী। যাঁদের সাধন বিষয়ে শিথিলতা হ'য়েছে, তাঁহাদের সময় এসেছে যে, আপনিই আপনাদের পিঠে চাবুক মেরে জাগ্রত হ'ন যে, কিছু পেতে হবে।

ঈশ্বরের কথা ঠোঁটে রাখ্‌ব, আর দল বেঁধে ধর্ম্মের কথা উড়িয়ে জ্যাঠাম কর্‌ব, তা হ'লে কি হবে?

প্রচার ধীরে ধীরে হয়, তাতে ক্ষতি নাই। খাঁটি জিনিষ পাওয়া চাই

অমর কথা (৪)

ঈশ্বর প্রেমময়

(God is Love)

সবাই যদি থামিয়ে দিল
ভালবাসার গান,
ওগো হে প্রেম! শুন্‌ব তবু
নিত্য তোমার মান।
চাঁদ হাস্‌বে, ফুল ফুটবে,
ঐ গানটী গেয়ে,
তখন তারা সেই সুরেতে
আস্‌ল কি বা ধেয়ে!
প্রেমময়ের গানের ধারা,
রূপের ঘরে কার,
ধরার বুকে নিত্য লীলা
প্রেম-কুসুমের হার।
স্বর্গ ভুবন পাতাল জুড়ে
মৌনী হ'য়ে রই,
উচ্চে নীচে, নাইক কথা
প্রেমে মজা বই।
আত্মপুরে পিরীত-লীলা
নিত্য ধুমধাম্
নীরব হ'য়ে রইল জাগি
বিশ্বজয়ী নাম।
করম-লীলা শান্তি-সুধা
ঐ সুরেতেই হাসে,
হাসি কান্না তাইত ওগো
ধরার বুকে ভাসে।
আমি কোথায়, কার দানেতে
আমার লীলা বল,
কোন্ ধারাতে ভাস্‌ল ধরা
প্রেমে টল টল।
কোন্ চাহনী, নীরব বাণী
কিসের কথা বলে,
বুকের ঘরে, সকল সুরে,
কাহার লীলা চলে?
ঐ ভাবেতেই ভাবুক আমি
নীরব গানে গানে,

উঠ্‌ল তা'রে হৃদি-অর্ঘ্য
প্রেমের দানে দানে।
ওগো হে প্রেম! ঐ সুরেতে
নত হ'য়ে যাই,
প্রেমময়, তোমার কোলে
সবার হোল ঠাঁই।
আমার সুরে তোমার পূজা
হৃদয়-ফুলে ফুলে,
প্রেম-যোগেতে বিশ্বগানে
হাস্‌বে সবে দুলে।
স্বর্গ থেকে জীবন আনে
প্রেমগঙ্গা-জলে,
শিবময়ের শিবগঙ্গা
নাম্‌ল ধরাতলে।

জানি তুমি মঙ্গলময়। সকল শাস্ত্রে, সকল বাক্যে, ঐ একই কথা—ওগো তুমি প্রেমময়। তবে কেন ভীত চঞ্চল মানবের এ ব্যর্থ বেদনা? 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে'—তবুও কেন এ অবিশ্বাসের মোহ!

জাতীয় ইতিহাসের ছত্রে ছত্রেই প্রেমময়ের লীলা। কত উত্থান পতন, কত প্রবল প্রলয়, কত সংহার-লীলা! ওগো হে প্রেম! এ কেমনতর হোল? সকল ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরও এ কি বিশ্বকল্যাণ সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত কোরছে! বিশ্বকল্যাণের ভিতর নিত্য সরস পূজার আয়োজন! কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আকুল বেদনা-ঝঞ্ঝার ভিতর আমি প্রেমের আলো দেখি কই? তাইত অভিযোগের ব্যর্থ বেদনা বহন করি,—কত দারুণ শিহরণ! সংগ্রামের ভীষণ দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ। এও কি প্রেমের খেলা, এও কি প্রেমময়ের জয়-বিষাণ? প্রাণ চম্‌কে ওঠে; কত প্রলয় ঝঞ্ঝা, কত অগ্নিলীলা, কত সংহার-স্বরূপ, কত অরাজকতা, কত অশান্তি, কত সংশয়-দোলা! এও কি প্রেমময়ের বিচিত্র বিধান?

না গো, না, এ প্রেমের খেলা নয়—বুকের ঘরে কে যেন গেয়ে ওঠে। তবু যে বুকের ঘরে সে বিভীষিকার স্বরূপ জেগে থাকে! তাই শিশু জ্ঞান এই বিচিত্র জটিল কুহেলী ভেদ্ কোর্‌তে গিয়ে আর এক বিরাট রুদ্র সংহারস্বরূপকে দেবতার অস্তিত্বদানে পূজা ক'র্‌তে চাইল, তবু প্রেমময়কে তার নিয়ন্তা বিধাতা বোলে পূজা কোর্‌তে পার্‌ল না! ওগো প্রেমের ঠাকুর, তোমায় ভালবাসি, তোমার চরণে নিত্য কৃতজ্ঞতা প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে আসি, আর ভীত ত্রস্ত হ'য়ে ভয়ে ভয়ে পূজা করি ভীষণ রুদ্রস্বরূপকে, শত্রুসংহারীকে। ওগো তোমার রুদ্ররূপ সম্বরণ কর।

এম্‌নি কোরে পৃথিবীর বুকে অমঙ্গলের জগৎবিধাতাকে এক বিভিন্ন স্বরূপের ভিতর তার পূজা কোর্‌তে চেয়েছে শিশু জ্ঞান, তবু প্রেমের ঠাকুর যিনি তাঁর প্রেমের স্বরূপের ভিতর অপ্রেমের কথা ভাব্‌তে পারে নি।

ধীরে ধীরে কেমন সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় দেবতার ওতপ্রোত প্রকাশের ভিতর এ দ্বৈত পূজার আয়োজন আপনা হোতে উধাও হ'য়ে গেল। একমেবাদ্বিতীয়ম্ জন্মমরণের ভাগ্যবিধাতা নিয়ন্তা জগৎপাতার আনন্দ-পূজায় আনন্দ-সঙ্গীত বেজে উঠ্‌ল। কিন্তু হায়! কই সংশয়-বেদনায় ব্যথিতচিত্ত ভীত ত্রস্ত প্রাণ, সকল শোকে দুঃখে প্রেমের ঠাকুর যিনি তাঁর চরণে প্রেমের অর্ঘ্য সাজাতে শিখ্‌ল? কত অভিযোগ! কে তুমি মঙ্গলময় ন্যায়বান বিধাতা? তোমার জগতে তবে কেন এত হিংসা প্রতিহিংসা? কে তুমি মানবের ক্ষণিক ত্রুটী দুর্ব্বলতার জন্য এ ভীষণ অনন্ত অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন কর? কোন্ অপরাধে পিতৃপুরুষের পাপের বীজাণু আমার জীবনে অনুক্রামিত কর? কেবলই অন্তহীন প্রশ্নের জটিলতা আমাদের দুর্ব্বল বুককে ব্যথিত ক'রে তোলে।

চিরদিন যেমন মানবের ব্যক্তিগত আদর্শ শিক্ষা দীক্ষা, তেমনই ভাবে তার দেবতার স্বরূপখানি প্রতিমূর্ত্তিরূপে যুগে যুগে ফুটে উঠেছে। যখন ভক্তপ্রাণের প্রাণময় সমাধির ভিতর পরিপূর্ণ শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান স্থাবর জঙ্গম চরাচর পূর্ণ ক'রে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তখনও ঐ প্রশ্ন, ঐ একই অভিযোগ—কেন এ ত্রিতাপ-জ্বালা সংসারে!

যাঁর শান্ত শিবস্বরূপ, তাঁর ভিতর ক্ষুদ্রতা অশান্তি জাগে কেমন কোরে, এই সংশয়-দোলা সংসারপীড়িত ক্লান্ত প্রাণকে কেবলই দোলায়িত কোরে তুল্‌ছে। সন্দিগ্ধচিত্ত দীন মানবের এ জটিল প্রশ্নের একমাত্র মীমাংসা এই যে, তারই স্বকৃত পাপই সকল সর্ব্বনাশের কুহেলী সৃষ্টি করে। যেদিন থেকে মানুষ দেব-অধিকার পেল, সেদিন থেকে তার বিবেকের ঘরে ভালমন্দের বিচারের আয়োজন হোল।

দেবলীলার ভিতর বিশ্ব-কল্যাণ। যা কিছু অকল্যাণ, যা কিছু অসত্য, সত্যের ঘরে তার স্থান নেই। মানুষ যখন সত্যভ্রষ্ট হোল, তখনই তার বেদনার জন্ম হোল। এ বেদনাও মুক্তির আয়োজন করে। তার অন্ধকার মলিন চিত্তে সত্যের আলো জ্বলে উঠ্‌বার সহায় হয়। বিশ্বপাতার কল্যাণ বিধান অনাহত ভাবে জড়ে চেতনে বিধৃত হ'য়ে আছে। সে অখণ্ড নিয়ম কে খণ্ডন করে?

অন্ধ বাসনার ক্ষণিক উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে আন্দোলিত হ'য়ে হ'য়ে এ কি আমার বুকফাটা বেদনার অনুভূতি! অনন্ত ভূমা মহান্ শান্ত শিবময়ের শান্তলীলা বিশ্বব্যাপী শান্ত সুরেই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত। অথচ এ কি অজ্ঞানতার দীন অভিজ্ঞতার ভিতরই মানুষের ভবিষ্যতের কল্যাণ-দৃষ্টি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে।

দেবলীলা দেবনিয়ম, সংসারে দেবজ্যোতির অক্ষয় মঙ্গল শুদ্ধতার ভিতর সাধুতার ভক্তি প্রেমে নিত্য নূতন উদ্বোধন গান রণিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। আমাদের নিজহাতে গড়া কত বেদনা দুঃখ যাতনা আবার আমাদের চরম কল্যাণময় নিত্য সত্য পথেই নিয়ে চলেছে। কোনও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সত্যপথের নিয়ামক হয় না, যতক্ষণ না নীরব সুরটী সত্যভাবে মানবপ্রকৃতিতে বেজে ওঠে।

সত্য, মানুষ মোহদ্বন্দ্বের জটিল বন্ধনের ভিতর কত অশান্তি কুহেলী জমিয়ে তোলে, আবার সেই অশান্তির ঘন ব্যথার ভিতরই চিরশান্তির পথ ফুটে ওঠে! যখন প্রকৃতির বুকে ধ্বংসের বিজয়ভেরী প্রলয়পাথারে মরণসাগরে ভেসে যায়, অবাক হ'য়ে থাকে মানুষ, ভাবে ইহার ভিতরও ত পরমকল্যাণ প্রকৃতির বুকে

নব নব স্বরূপে জেগে ওঠে—এই কি প্রেমময়ের প্রেমলীলা!

এই মরণগানে কিসের সুর বাজে? এ কি বিনাশের কথা বলে? এ কি আমার জড় রূপখানি ভেঙে চুরে আমার অবিনাশী স্বরূপকেও বিনষ্ট কোর্‌বে? কেমন কোরে তা মনে করি! মৃত্যুই কি চরম সমাপ্তি? না, এই মৃত্যুমঙ্গল-বাসরেই আমার মহীয়সী লীলার প্রকৃত জন্মদান! ব্যাধির ভীষণ প্রকোপে, কি আকস্মিক ঘটনার ফলেই হউক, লক্ষ লক্ষ মানুষ কালের করাল কবলে পতিত হবেই হবে। সবই চলেছে সে অনন্ত সত্তার ভিতর। তবে মরণবীণায় কেন এ ভীতি-করুণ রাগিণী বেজে ওঠে? দেবাদিদেব মহাদেব পরম কল্যাণদাতার কল্যাণস্বরূপে প্রাণময় আত্মসমর্পণের অভাবেই কি তবে এই বেদনার সৃষ্টি? যা কিছু সবই কল্যাণের পথেই নেবে। কেন এ সন্দেহ সংশয়? এ কি স্পর্দ্ধা! বিশ্বরাজের বিশ্বনিয়মে অবিশ্বাস?

এ জগতের ব্যর্থ বেদনার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরই কি করুণাময়ের নিত্য লীলা ফুরিয়ে গেল! দেখ্‌ছি ত প্রকৃতির বুকে এই দৈহিকতা-প্রসূত বেদনার ক্ষণিক অস্তিত্ব। যখন অসহনীয় বেদনা দেহকে নিষ্পেষিত কোরে ফেল্‌তে চাইল, তখনই যাত্রীর সকল বেদনার শান্তি হোয়ে এল। দেহ অবশ হ'য়ে গেল, জুড়িয়ে গেল সকল জ্বালা। এ কি! প্রেমময়ের করুণা-লীলা! এই পার্থিবজীবনে এ কি বহুরূপীর খেলা—কেবলই পরিবর্ত্তন, কেবলই এক থেকে আর এক হওয়া, কেবল নিত্য নূতন সুরে এগিয়ে চলা!

আবার এও ত দেখ্‌ছি যাকে দৈহিকতা বলি, ঐহিকতা বলি, যা বেদনার আগুন জেলে তোলে, সেই বজ্রবেদনাই হোমানলের ভিতর নবদীক্ষার আয়োজন করে। যত কিছু বেদনার অভিজ্ঞতা সবই চুপে চুপে ব'লে যায়, অনিত্য থেকে, অসত্য থেকে নিত্য লোকে, ঊর্দ্ধলোকে, সত্য পথেই ছুট্‌তে হবে—এ কথাই জানিয়ে যায়। এ অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর আয়োজনের অন্তরালে নিত্য শাশ্বত মঙ্গলের পথেই আপনাকে সমর্পণ কোরতে হবে। নিত্য পথের পথিক, পরম সাধক, পরম মঙ্গলে নির্ভরপ্রাণ যাঁদের, কোথায় তাঁদের দুঃখ গ্লানি শোক তাপ দীন দৈন্য?

অনন্ত ভূমা মহান্ অসীম সত্তা। সীমার ঘরে বাস করি, সীমার ভিতরই জড় দৃষ্টি সকল অভিজ্ঞতার পরিচয় লাভ করে, তাই সীমার ভিতরই এ ব্যর্থ অভিযোগ। অসীমের বিচিত্র লীলা এ ক্ষুদ্র জ্ঞান কতটুকু উপলব্ধি করে? তাই সসীম দৃষ্টি সীমার ভিতরই সব বিচার করে।

কত সময় হয়ত বুঝি এ ক্ষণিক তুচ্ছ ব্যর্থ বেদনা আমায় কল্যাণের পথেই নিয়ে যাবে, তবুও যে দুর্ব্বল বক্ষ কেঁপে ওঠে, অশান্তি-আগুনে পুড়ে মরে! মনে হয়, কোথায় চলেছি নিঃসঙ্গ যাত্রী একা একা, কোন্ অন্ধ কুহেলী-ঘোর রচনা ক'রে চলেছি! এম্‌নি দীন চিন্তা সসীমের কুহেলী-সংশয়জাল রচনা করে, পরম পরিপূর্ণ কল্যাণ তার বোঝে না, তাই পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের অভাবেই এ আত্মদৈন্যের ব্যর্থ পীড়ন।

ক্ষুদ্র জ্ঞান ভূমা মহানের মহামঙ্গল ভাব, অনন্ত সত্তা, ধারণ ক'রতে অক্ষম, তবুত একথা বুঝি—পরম সত্য আছেন তাইত আমি আছি! আমার মঙ্গল বিকাশের ভিতরই যে পরিপূর্ণ শান্ত শুভের প্রকাশ! যত কিছু খণ্ড অপরিপূর্ণ অসীম পদার্থ, সবই সে পরম পরিপূর্ণেরই বিচিত্র প্রকাশ।

যখন আমাদের দীন বুদ্ধি পরম ভূমা মহানের অনন্ত সত্তা বিচার কোর্‌তে বসে, তখনই সীমার সংকীর্ণ মোহদ্বন্দ্বের ভিতর তার পরম দৈন্যই জেগে ওঠে। ততই জটিল সমস্যা, জটিল রহস্যের ভিতর সংশয়জাল ঘিরে ফেলে। আবার মনে হয়, প্রাণের ঘরে কে কথা বলে? এ বিবেকবাণীর জন্ম কোথায়? তাই প্রতি মানবের অন্তস্থলে নিভৃত লোকে নীরবে নীরবেই এক আদর্শ মহিমা জাগিয়ে তুল্‌ছেন; মানুষ ছুটেছে সেই আদর্শ রচনায়, তাই তার প্রতিদিনের উত্থান পতনের আয়োজন আর ঊর্দ্ধলোকে কল্যাণযাত্রা।

ক্ষুদ্র চিন্তার কত কল্পনা জল্পনা! অসীমের পরিপূর্ণ বিরাট স্বরূপখানি কেমন ক'রে এ ক্ষুদ্র চিন্তামুকুরে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌বে? কত ভাবে তার অর্ঘদান! কেউ ভাবল তবে বুঝি এসব অন্ধলীলার অণুপরমাণুর বিচিত্র যোগাযোগের খেলা। আবার মানুষের বুকে ও কি চেতনার আলো উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, তখনই বোল্‌তে চাইল সকল প্রকাশের অন্তরালে এ কি অবশ্যম্ভাবী পরম আদর্শরচনার পরমকল্যাণ-লক্ষ্য? সেই কল্যাণ-লক্ষ্যেই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত। এ কি অচেতনের লীলা? এ যে চেতনময় পরিপূর্ণ সত্তা মঙ্গল শিবসুন্দরেরই শিবজ্যোতি, কল্যাণ-সুষমা—হায়! হায়! কোথায় ইহার ভিতর অন্ধ জড়তার শক্তি-মহিমা?

আবার এ কি কথা! বিশ্বরাজ আমারও হৃদিরাজ! তখন দেবত্বের মঙ্গলবিভায় এ দীন বক্ষও আনন্দে পুলকিত, স্তম্ভিত, হ'য়ে যায়। অনন্ত প্রকাশ, অগণ্য নক্ষত্রখচিত জ্যোতিষ্কলোক, আমার দীন নয়ন-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এ কি আমার দুর্ব্বল আঁখি-আলোকে অনন্তের ছবি প্রতিফলিত! ধন্য লীলা! ধন্য এ আয়োজন! ক্ষুদ্র ভাষা কি আর বোল্‌বে হায়!

আত্মপুরে বিচিত্র মহিমাসুরে বিশ্ববুকে যা কিছু সুন্দর মঙ্গল পবিত্র, তারই জন্য প্রাণ রণিত হ'য়ে ওঠে, আকুল হ'য়ে ওঠে—যে শুন্‌তে পেল সে সুরে সুরে প্রেমময়ের প্রেমরাগিণী বাজিয়ে গেল, আত্মবীণায় নিত্য নবীন ঝঙ্কারে। তাইত ভক্ত-প্রাণের মঙ্গললীলা! কোথায় সেখানে অবিশ্বাস?

প্রাণসখা, আমার বুকেও তোমার এত প্রেমসোহাগের উচ্ছ্বাস কেন? এ ত আমার সৃষ্টি নয়। কে তুমি প্রাণারাম মহাপ্রাণ এমন ক'রে সুরসাধিনী গানটী তোমার আমার প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত কর, বল। তাই আমার দেহী বিদেহী সব ভালবাসার ধনদের সঙ্গে এক হোতে চাই। এ ক্ষুদ্র জীবনও যে তোমার কথা বোল্‌তে চায়! ভক্তবুকে এ কি গান গাও, বলত।

অনন্ত প্রেম! তুমি যে আমায় তোমার ক'রে নিয়েছ, তাইত আর ভয় নেই। কে এ নিবিড় বন্ধন ছিন্ন কোরবে? ভক্ত প্রাণের আনন্দ-গানে এই মিলন-গানই যে গেয়েছ! তাইত আমার কথা সংসারে। যা এ লোকে আমার হোয়েছে, তা লোকলোকান্তরেও আমার হোয়েই থাক্‌বে। তোমার বুকেই অনন্ত মিলন। তুমি

আমাদের মধ্যবিন্দু, তোমারই করুণা মঙ্গল আশীর্ব্বাদ ভরসা। এই প্রাণময়ী আশা অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোল—"জানি তুমি মঙ্গলময়,"—তোমার প্রেমময় বুকে অভাগারও স্থান আছে।

সমর্পণ।

তোমার প্রসাদে লভিনু যে ধনে,
লইনু যাহারে অমূল্য জ্ঞানে,
কতই সোহাগে, কতই আদরে,
লালিনু পালিনু বুকের মাঝারে,
কত আশা ভালবাসা দিলাম তাহারে—
সে স্নেহসম্ভার, জননী আমার,
মনোমত তাও হোল না তোমার।
সমধিক স্নেহে, অধিক যতনে,
রক্ষিবে তাহারে অন্য ভুবনে,
টেনে নিলে তাই ক্রোড়-প্রসারণে—
লও লও ও মা, সঁপিনু তোমায়
তোমারি গচ্ছিত ধনে।
যথা ইচ্ছা হয়, লোক লোকান্তরে,
রাখ মা, ক্রোড়েতে তুমি কৃপা ক'রে;
পাপ পরিতাপ বিষাদ বেদনা
মুছে দাও মাতঃ মধুর সান্ত্বনে।

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪)

সময় সময় দেখা যায়, বোঝাই করা নৌকা এক স্থানে নোঙ্গর করিয়া স্থির হইয়া থাকে। অনেক অনুকূল স্রোত ও অনুকূল বাতাস সে পায়। কিন্তু নোঙ্গরে আবদ্ধ আছে বলিয়া সে আর চলিতে পারে না; এক স্থানে বদ্ধ হইয়াই থাকে। সুযোগ-সমুদায় পাইয়াও চলিতে পারে না, এক স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকে। নৌকা সম্বন্ধে যেমন দেখা যায়, অনেক মানবাত্মা সম্বন্ধেও তাহাই হয়। তাহারা এক স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কারণ, তাহাদের জীবনতরী সময় সময় আসক্তির নোঙ্গরে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সংসারাসক্তিরূপ নোঙ্গর তাহাদিগকে এক স্থানেই আবদ্ধ করিয়া রাখে। অনেক সুযোগ তারা হারায়, অনেক অনুকূল বাতাস পাইয়াও চলিতে পারে না। জীবন্মৃত হইয়া কাল কাটায়। এ অবস্থা যে আমাদের অনেকের পক্ষেই ঘটিয়াছে!

(১৫)

চাহিয়া চাহিয়া যখন কেবলই চাহিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া চলে, তখন অবস্থাটা যে ভালই হয়, এমন ত মনে হয় না। আবদারে আদুরে ছেলেরা কেবলই ইহা দেও, উহা দেও, এ বলিয়া চাহিয়া নিজেরাও হয়রাণ হয়, আত্মীয় জনদিগকেও অস্থির অধীর করিয়া তোলে। তখন চাওয়াটা রোগের মধ্যে পরিগণিত হয়। আমরাও অনেক সময় চাহিবার জন্যই চাই, পাইবার জন্য চাই না, ইহাও রোগ বিশেষ। অনেক সময় এমনও হয় যে, কেবলই চাহিয়া চলিয়াছি, পাই কি না সে দিকে খেয়াল নাই। আবার পাইলেও যত্নপূর্ব্বক প্রাপ্ত সম্পদকে রক্ষা করিবার দিকে মন নাই। এ ভাবে চাওয়াই হয়, পাওয়া হইল কি না এবং যাহা পাওয়া গেল তাহা রহিল কি না, সেদিকে মোটেই খেয়াল থাকে না। ইহা ভাল নয়। পাইবার আছে অনেক, চাহিবার আছে অনেক, দাতার দিবার আছে বহু। আমরা পাইয়াছি অতি অল্প, দাতাও দিয়াছেন অল্প। তাঁহার ভাণ্ডারে রত্ন অক্ষয় হইয়াই আছে। সুতরাং চাহিতে হইবে, কিন্তু সমনস্ক ভাবে চাহিতে হইবে এবং প্রাপ্তকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

(১৬)

বহির্জ্জগতে সৌন্দর্য্য আছে, নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য চারিদিকে ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এ সব দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে ঈশ্বরই এ সকলে বিকাশ পাইতেছেন। তিনিই এরূপে ব্যক্ত হইতেছেন। কিন্তু তাহাই যদি হইবে, তবে এ সৌন্দর্য্য দেখিয়া ত কাহাকেও একেবারে চিরমুগ্ধ হইতে দেখা যায় না—এরূপ শোভাকে কত সহজেই ভুলিয়া যাওয়া যায়! চিরসুন্দর পরমসুন্দরকে কি এমন সহজে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভবপর? তবে আর তাঁহার মহিমা এমন বেশী কি হইল? এজন্য মনে হয়, এ যে শোভা তাঁহার আংশিক শোভা হইতে পারে। তিনিই এ রূপে, এমন ভাবিলে ভুল সিদ্ধান্ত হয়।

(১৭)

ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা এক মহৎ দান মানবের জন্য। ইহা অজ্ঞাত অনধিগত সত্যের জ্ঞান দান করে। যাহা জানা যায় নাই তাহার পরিষ্কার আভাস এখান হইতে পাওয়া যায়। এ দান অমূল্য দান।

(১৮)

অন্য কাহারও হইতে হইলে নিজের যাহা আছে, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সবই, পরিত্যাগ করিতে হয়। নিজের বলিয়া কিছু থাকিলেই তাহার প্রেরণায়, তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট, তাহা-দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়, তাহাদের উপর মমতাও থাকিয়া যায়। এই জন্য অন্যের হইতে হইলেই নিজের যাহা কিছু আছে তাহার মমতা পরিহার করিতে হয়। এ বিষয়ে অনিচ্ছুক হইয়াই বুঝি প্রভুর হইতে পারিলাম না। তা না হইলে প্রভুর হইবার আকাঙ্ক্ষা ত ছিল অনেক দিন হইতে। যদিও সে আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা, তথাপি তাহা ছিল। এরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও যখন তাঁহার হইতে পারি নাই, এখনও আপনার হাতে জীবনের ভার রাখিতে ইচ্ছা আছে, তখনই বুঝা যাইতেছে যে কেন প্রভুর হইতে পারিলাম না। হে প্রভু, যদি তোমার হইয়াই কৃতার্থ হওয়া আবশ্যক, যদি তোমার না হইতে পারিলে কোন-

* বিভুপ্রসাদ ঘোষের শ্রাদ্ধ বাসরে গীত।

যতেই নিস্তার নাই, সুগতি নাই, জীবনের সার্থকতা নাই, তবে আর কেন আমার দুর্ব্বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেও, কেন সেই কুবুদ্ধি হইবার সুযোগ দেও। এবার একেবারে আমাকে তোমার করিয়া লও। আমার সব যাউক। তোমার হইয়া ধন্য হই।

(১৭)

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই নিষ্কল পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ চিত্ত না হইলে যদি পরমপ্রভুর দর্শন না মিলে, তবে আমার মত লোকের গতি কি হইবে? কত দিকে কত ভাবে অশুদ্ধতার সহিত যোগ রহিয়াছে! মন কত প্রকারেই মলিন হইতেছে! তবে কেমন করিয়া তাঁহার দর্শন মিল্‌বে? হে প্রভু, শুদ্ধচিত্ত হইবার উপায় বলিয়া দেও এবং শুদ্ধচিত্ত করিয়া তুমিই তোমাকে দেখিবার উপযুক্ততা দেও। তা ভিন্ন আর ত কোনই ভরসা পাই না। করুণা কর, করুণা কর। তোমার প্রসাদে তোমাকে পাইবার, তোমার হইবার, উপযুক্ততা লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

উমেশচন্দ্র স্মৃতিসভা

ব্রাহ্মযুবক সমিতির উদ্যোগে বিগত ৫ই আষাঢ় (২০শে জুন) সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিংশতিতম বাৎসরিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। একটি বেদগান ও সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন—নীরব কর্ম্মসাধন ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি তাহা দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁহার সকল কর্ম্মই তিনি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি গৃহশিক্ষকের কাজ ও স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া বি এ পরীক্ষা পাশ করেন। নানাস্থানে কার্য্য করিয়া ১৮৭৯ সালে সিটি স্কুলের হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হন এবং স্কুল কলেজে পরিণত হইলে তাঁহার অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি অল্প বেতনে কাজ করিয়া দেশের তরুণ তরুণীদের শিক্ষার জন্য জীবন দিয়েছেন—কখনো ১৫০৲ টাকার বেশী বেতন পান নাই। নারীদের সুশিক্ষার জন্য "বামাবোধিনী পত্রিকা" সম্পাদন করেন ও ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন। তিনি কংগ্রেস্ ও রাজনৈতিক চর্চ্চায় সর্ব্বদা যোগদান করিতেন। বর্ত্তমান Deaf and Dumb School এর উৎপত্তি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সিটি স্কুলের মূক বধির বিদ্যালয় হইতে, এবং উমেশবাবুই হেড্‌মাষ্টার যামিনীবাবুকে নিজ চেষ্টায় বিলাতে পাঠান। তিনি গরীবদের সাহায্যের জন্য "দাতব্য ভাণ্ডার" খোলেন। "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ" এইটি ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। ঈশ্বরের ধ্যানে, আরাধনা ও উপাসনায় এবং মানবের সেবায় তাঁহার সমস্ত জীবন কেটেছিল। "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর, এইভাবে দিন কাটুক আমার" এই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। ঈশ্বরে প্রীতি থাকার দরুণই সকল কর্ম্মে তিনি প্রেরণা পেতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কার্য্য, শিক্ষকতা ও নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বর-প্রীতিতে মগ্ন থেকেই ক'রে যেতেন।

প্রথমে পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, সে সমস্তই তাঁহার 'সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত' এই নামের মধ্যেই রহিয়াছে বলিয়া, তিনি তাঁহার উক্তি বিস্তারিত ভাবে নানা শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। যিনি পরহিত সাধন করেন তিনিই সাধু। যিনি পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করেন, তিনিই সাধু। সাধু বল্‌তে গেরুয়াবসন-ধারীকে বুঝায় না—যাঁর নিজের কোনরূপ বাসনা নাই, শুধু পৃথিবীর লোকের মঙ্গল হোক ইহাই চান, তিনিই সাধু। উমেশচন্দ্রের সত্যপরায়ণতা ছিল—তিনি ছিলেন মহাবীর, তাঁহার সৎসাহস যথেষ্ট ছিল। উমেশচন্দ্র সকল সহ্য করিয়াও কর্ত্তব্য ক'রে যেতেন এবং অবশেষে সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। তিনি যে কাজে হাত দিয়েছেন সে কাজেই সিদ্ধিলাভ করেছেন! তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রকার সভা সমিতিতে যোগদান করতেন। তিনি হরিনাভিতে সে সময়কার সকল মহাপুরুষদিগকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময়ে যত প্রকার ভাল ভাল অনুষ্ঠান হোতো তাঁহার মূলে থাকতেন—অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ ও ও পথ্য সকল শ্রেণীর অভাবগ্রস্ত রোগীদের দান করবার জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, এবং সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করতেন। উমেশচন্দ্র ইহলোকে সর্ব্বদা স্বর্গভোগ করেছেন এবং এখনও তিনি পরলোকে স্বর্গভোগই করছেন।

দ্বিতীয় বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৭৮ সনে ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটে "ভারত সংস্কারক" পত্রিকায় লিখিতে যাইয়া দত্ত মহাশয়ের চরিত্রের যে পরিচয় প্রাপ্ত হন, তাহার বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ, সত্যমপ্রিয়ং" ইহাই ছিল উমেশ বাবুর নীতি। যতক্ষণ পারতেন, অপ্রিয় সত্য বল্‌তে চাইতেন না। তিনি কাউকে আঘাত দিতে চাইতেন না। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় "ভাল মানুষ" ব'লে শাস্ত্রী মহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটি উমেশবাবুকে লক্ষ্য ক'রে লিখা হয়েছিল। তাঁহারা সমাজের ও ধর্ম্মের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। এই বিপ্লবের ভিতর দিয়ে উমেশবাবুও এসেছিলেন। এখন সমাজ যে অবস্থায় এসেছে, সেটা এই বিপ্লবের দরুণ। তখন ছিল সব জিনিষ বিশ্লেষণ ক'রে নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা যে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহাকেই অনুসরণ করা। উমেশবাবুর মত নিষ্ঠাবান্ আর একজনও ছিলেন কি না তিনি জানেন না। উমেশবাবু ভক্ত ছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে দুই রকম ভক্তির কথা আছে (১) বৈধী ভক্তি (২) রাগানুগা ভক্তি। উমেশবাবুর ভক্তি ছিল "বৈধী ভক্তি"। "কর্ত্তাভজা" সম্প্রদায়ের সাধন যাঁহারা অবলম্বন করতে গিয়েছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে শুধু ছেড়ে গিয়েছেন, তা নয়, ব্রাহ্মসমাজকে আঘাতও করেছেন। কিন্তু উমেশবাবু দুই দিকই বজায় রেখে গিয়েছেন, এবং এইটী মনে না রাখলে, তাঁকে সম্যক্ বুঝা যাবে না।

তৃতীয় বক্তা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস একটি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার ঋণের উল্লেখ করিয়া বলেন, ভক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপাসনায় যোগদান করিয়া তিনি বুঝিতে পেরেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের

ধর্ম কত মধুর ও সুন্দর। উমেশচন্দ্রের উপাসনায় যোগদান ক'রে, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধৈর্য্য ও বল পেয়েছেন। উপাসনার গভীরতা ও রস মাধুর্য্য তাঁহার চরণে ব'সে পেয়েছেন।

শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ বলেন—তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা উপাসনাশীল ছিলেন। তিনি ভগবানে তন্ময় হ'য়ে সকল কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তেন। আমি অনেক রাত্রি তাঁহার সাথে এক শয্যাতে কাটিয়েছি। অনেক দিন দেখেছি গভীর রাত্রিতেও তিনি ধ্যানে মগ্ন থাক্‌তেন। তিনি ধর্ম্মকে জীবনব্যাপী সাধনায় পরিণত করেছিলেন। এত বড় দরদী লোক আর দেখা যায় না।

সভাপতির সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ও প্রার্থনান্তে "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি" সঙ্গীতটী গীত হ'য়ে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী

দীর্ঘকালের এই সম্মিলনীর কার্য্য এখন একটী সম্মিলন এবং ব্রহ্মোৎসবে পরিণত হইয়াছে। ইহার আলোচনা, প্রসঙ্গ ও প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে যে কার্য্যতঃ কিছু হইতেছে না, এমন কথা বলাতে কোন অপরাধ হইবে মনে হয় না। যাই হউক, সম্বৎসর অন্তে বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্ম নরনারীগণের এই সম্মিলিত উৎসবের যে একটা খুব বড় দিক্ আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ৮।১০ বৎসরের ভিতরে সম্মিলনী উৎসব অঙ্গে বেশ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার প্রধান কারণই কলিকাতাবাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের উপস্থিতি, সহানুভূতি ও সাহায্যদান প্রভৃতি। ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল ও চট্টগ্রাম এই চারি স্থানে অনেক বার ইহার অধিবেশন হইয়াছে, কুমিল্লা, সিলেট, ধুবড়ী এবং বৈজগাতেও এক একবার হইয়াছে। এখন আবার এই সকল স্থানে হওয়ার পক্ষে অন্তরায় ও অসুবিধা না আছে তাহা নহে। তার পরে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা একান্তই কম; অর্থাভাবের কথা বলাই বাহুল্য, উৎসাহী ও উদ্যমশীল কর্ম্মীর সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। এ জন্য আমার মনে হয়, কলিকাতার নেতৃস্থানীয় পূর্ব্ববঙ্গবাসী ব্রাহ্মবন্ধুগণ যদি কলিকাতায় একবার সম্মিলনীর উৎসবের আয়োজন করিয়া আহ্বান করেন, তাহা হইলে কোন কারণেই তাহা কাহার বিশেষ আপত্তিকর ও অসুবিধাজনক হইবে না। এ বিষয়ে আমি অনেকবার কলিকাতায় বন্ধুগণকে গোপনে বলিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁদের অসম্মতি বুঝি নাই। সম্মিলনীর নিয়মাবলিতেও কোন বাধা হইবে মনে হয় না। হইলেও বিশেষত্ব দিয়া ইহার বিধান হইতে পারে।

সম্মিলনীর অধিবেশন-স্থান কলিকাতার সংলগ্ন কোন বাগান-বাড়ীতে করিতে পারিলে তাহা সর্ব্ব প্রকারেই আকর্ষণীয় ও অনুকূল হইবে। কলিকাতাবাসী নরনারীগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে গমনাগমন করিতে পারিবেন। শতাধিক বিদেশবাসী অতিথির স্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিলে হইবে। এক হাজার টাকাতে সুন্দর ব্যবস্থা হইতে পারে। এ টাকাও ইচ্ছা করিলে দুই একজন সহৃদয় ধনবান্ দাতা সহজেই দিতে পারেন। শত বার্ষিকী এবং সাধারণ সমাজের অর্দ্ধ শতাব্দীর উৎসবের এখনো বিলম্ব আছে। এই সম্মিলনীতে এই দুইটী উৎসবেরও প্রারম্ভিক আলোচনা ও কর্ম্মনির্দ্দেশ প্রভৃতির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় হইবে না।

শিলংএ একবার সম্মিলনীর অধিবেশন হইলে বেশ হয়, সঞ্জীবনীতে সম্মিলনীর সম্পাদক এরূপ একটী প্রস্তাবের আভাস দিয়াছেন। শিলং ভাল স্থান, অনেক ব্রাহ্মও আছেন, সে হিসাবে খুবই সুন্দর; কিন্তু গমনাগমনের খরচ এবং দূরত্ব অনেক; এই অর্থে জনসমাগম অধিক হইবে মনে হয় না। তবে একবার হওয়া ভালই।

সম্মিলনীর উৎসব অঙ্গ সফল করিবার চেষ্টার সঙ্গে অনাথব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধন ভাণ্ডারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এইটী একটী কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান।

সম্মিলনীর সম্পাদক মহাশয়ের বৃদ্ধ বয়সেও নিষ্ঠা ও উৎসাহের অভাব ঘটে নাই। তাই অনুরোধ করি, তিনি কলিকাতায় গমন করিয়া তথায় এবার অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হইবে মনে হয়।

বরিশাল শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৮শে জুন বোম্বাই নগরীতে মিঃ নরসিংহম্ গান্ডি পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ৭ই জুলাই তাঁহার আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে; এই উপলক্ষে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কুমুদিনী গান্ডি মিশন ফণ্ডে ১০০৲ ও পুত্র শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গান্ডি ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ১১ই জুলাই বর্দ্ধমান নগরীতে বাবু বিনোদবিহারী বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মী ছিলেন।

বিগত ১লা জুলাই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সমাদ্দারের পত্নী মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২১শে জুলাই ভারতমহিলা সমিতি পরলোক-গতা সুখদা নাগের স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করেন। শ্রীমতী সুশীলা বসু আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীমতী সুশীলা ঘোষাল, শ্রীমতী অবন্তী দেবী ও শ্রীমতী সুদেবী মুখোপাধ্যায় প্রার্থনা ও চরিত্র বর্ণন করেন।

শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর অন্যতম পৌত্র (শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার বসুর পুত্র) সুধীন্দ্রকুমার বিগত ১০ই জুন গয়া নগরীতে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে মহীশূর নগরীতে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জামাতা বাবু শরৎচন্দ্র সেন পরলোকগমন করেন। বিগত ২৫শে জুন কলিকাতা নগরীতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲, ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজে ২৫৲, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালস্থিত চিররোগী কাঙ্গালীদিগের জন্য ২৫৲, এবং দুঃস্থদের সাহায্যার্থ ভবানীপুর সেবক সমিতির হস্তে ২৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৭শে জুলাই বেথুনকলেজ-ছাত্রীনিবাসের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ তাঁহাদের পরলোকগতা মেট্রন মিসেস সরলা ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য এবং একটি ছাত্রী একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের দ্বারা ও অপর একটি ছাত্রী একটি কবিতা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধার্পণ করেন। এই উপলক্ষে শিক্ষয়িত্রীগণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ৭৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং ছাত্রীগণও দরিদ্রের সাহায্যার্থ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

বিগত ৩১শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে বাবু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতিগুণে অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ৮ই জুলাই নারায়ণগঞ্জ নগরীতে শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকুমার দাসের কন্যা কল্যাণীয়া সুশীলা ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাসের লিখিত একটি উপদেশ পাঠ করেন।

বিগত ১১ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত কুঞ্জবিহারী গুহের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া মাধুরীলতা ও শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ দত্তের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২রা জুলাই শিলংস্থ খাসি হিল্স্ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পরলোকগত বাবু নবগোপাল দত্তের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাকণা ও শ্রীযুক্ত প্যারীকান্ত মিত্রের প্রথম পুত্র শ্রীমান অমিয়কান্তের শুভ বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে কন্যার মাতা শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, শিলং ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, খাসি হিল্স্ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, শিলং মহিলা সমিতিতে ২৲ টাকা এবং শিলং রামমোহন রায় পুস্তকালয়ে ৩৲ টাকা মোট ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২০ শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুপ্রীতিবালা ও শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র মুস্তফির শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দীক্ষা—গত ১৭ই জুলাই চেরাপুঞ্জী ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত ডোঙ্গেন রায়ের মাতা শ্রীমতী রাজেবন এবং তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বেরিলা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—আমরা ছাত্রীদের নিম্নলিখিত কৃতিত্ব দর্শনে বিশেষ সুখী হইলাম:—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তি—চারুপমা বসু ২৫৲ টাকা, বিভাবতী সেন ও কনকলতা চৌধুরী ২০৲ টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি—রমা বসু ও উষা রায় ২৲, মীরা দে, অমিতা দত্ত, ননীবালা দাসগুপ্ত, বীণা দাস ও শান্তিলতা দাসগুপ্ত ১৫৲ সরস্বতী দত্ত, অমিয়া সেনগুপ্ত, সুহাসিনী দত্ত, অঞ্জলী দাস, হিরণ বসু, চামেলী দত্ত, জ্যোতিপ্রভা দাসগুপ্ত, তারা মজুমদার, রমলা ঘোষ ও অমিয়া দাসগুপ্ত ১০৲।

সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষা—রেণু দেবী (মুগ্ধবোধ, ১ম বিভাগে ১ম), সীতা বাই (কাব্য, দ্বিতীয় বিভাগে), দুর্গাপুরী দেবী ও সুতপা পুরী দেবী (সাংখ্য প্রথম বিভাগে), চারুপ্রভা সেনগুপ্ত (কলাপ, ১ম বিভাগে), সুলভসুন্দরী রায় (ঐ দ্বিতীয় বিভাগে)।

সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষা—রেবা দেবী ও অমিয়াবালা দেবী (মুগ্ধবোধ, ২য় বিভাগে), হীরাকুমারী জৈন (সুপদ্ম, ১ম বিভাগে), সরযূবালা বসু (সারস্বত ব্যাকরণ, দ্বিতীয় বিভাগে), সুব্রতাপুরী দেবী, ললিতাপুরী দেবী, সুতপাপুরী দেবী ও দুর্গাপুরী দেবী (সাংখ্য ১ম বিভাগে), পান্না দেবী (বেদান্ত, ১ম বিভাগে), গিরিবালা দেবী (কলাপ, ২য় বিভাগে), কমলা দেবী (লঘুকৌমুদী, ১ম বিভাগে), মিসেস রমা বাই (ঐ দ্বিতীয় বিভাগে)।

প্রিলিমিনারী সায়েন্টিফিক এম. বি.—সুপ্রভা ঘোষ।

বি. এস্. সি.—সুহাসিনী দেবী (কৃতিত্বের সহিত)।

বি. এ.—ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স—দ্বিতীয় বিভাগ—ডরোথী ক্লেটন, মালতী দত্ত, লীলিয়ান কুক, সুলেখা রায়, মেরী মার্গারেট সালধানা, ফ্লোরেন্স মরিসন, মনোরমা বসু, আইরীন্ সিল্ভিয়া উইনক্রেস্ত, অশ্রুকণা সান্ন্যাল, মার্জ্জরী খাঁ। সংস্কৃতে অনার্স—প্রথম বিভাগে প্রথম—আভা সেন। দ্বিতীয় বিভাগে—মৃন্ময়ী দত্ত। ইতিহাসে অনার্স—প্রথম বিভাগে প্রথম—স্নেহময়ী এনিদ্ সেনগুপ্ত। দর্শন শাস্ত্রে অনার্স—দ্বিতীয় বিভাগে—পদ্মাসনা সিংহ। গণিতে অনার্স—দ্বিতীয় বিভাগে—অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশংসার সহিত—হিরণপ্রভা দাসগুপ্ত, মীরা দত্তগুপ্ত, জ্যোৎস্না দে, প্রভাবতী দে, জেনেট এলিস্ কার্কপেট্রিক, অরুণবালা নন্দী, পরিমল সরকার, এমা সুইনী, জুলেখা বানু। পাশ—শীতলাতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দাকিনী চট্টোপাধ্যায়, অলকা চৌধুরী, পুর্ণাপ্রভা দাস, অণুকণা দাসগুপ্ত, অরুণা দাস, মৃণালবালা দাসগুপ্ত, রেণু দাসগুপ্ত, স্নেহলতা দাসগুপ্ত, হেমাঙ্গিনী দেবী, হেলিয়ন ডিঙ্গডো, সীতা খীলনানী, মা পোয়া টুই, সুবর্ণলতা পুরকায়স্থ, বনজিনী শাহ, অমিয়া সেন, ললিতা সেনগুপ্ত ও প্রতিভা সেনগুপ্ত।

ব্রাহ্ম ছাত্রদের কৃতিত্ব—বিগত বি. এ. ও বি. এস্. সি. পরীক্ষাতে নিম্নলিখিত (আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি) ব্রাহ্মছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম:—

ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স—দ্বিতীয় বিভাগে—অশোকচন্দ্র মৈত্রেয়; অর্থনীতি শাস্ত্রে অনার্স—প্রথম বিভাগে—সুশীলকুমার দে (প্রথম স্থান অধিকার করিয়া), ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া)। পাশ—অমরকুমার দত্ত, প্রবোধানন্দ চক্রবর্ত্তী। বি. এস্. সি.—রণেন্দ্রনাথ চন্দ।

দান—শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ দত্ত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে দাতব্য বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন গুপ্ত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ১০৲ দান করিয়াছেন। এ সকল দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল শান্তি লাভ করুক।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে দান—ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বামাসুন্দরী চন্দ বর্ত্তমান বর্ষে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন কার্য্যে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। আশা করি অপর সকলে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

১। গত কার্ত্তিক মাসে তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের ৫০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই বিশেষ দিনের স্মরণার্থে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরের তিন দিকে টীনের বারেণ্ডা এবং মহিলাদের উপাসনার স্থান বৃদ্ধির জন্য দুইটী নূতন কোঠা নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয় ৮৫০৲

২। পণ্ডিত মহাশয়ের পত্নীর সঙ্কটজনক রোগ হইতে মুক্তি উপলক্ষে বিদ্যাসাগর বাণীভবনের বিল্ডিং ফণ্ডে দান ৫০৲

৩। একজন শ্রদ্ধেয় প্রচারকের পথ্য ও গৃহনির্ম্মাণ জন্য ১৫৲

৪। তাঁহাদের প্রথম পৌত্র শ্রীমান রণেন্দ্র নাথ চন্দের বি, এস্ সি, পরীক্ষায় সফলতার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডের ঋণ শোধার্থে ১০৲৫। নবদ্বীপ চন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে ২৫৲

৬। ব্রহ্ম-সাধক স্বর্গীয় চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়ের স্মৃতিরকার্থে ঢাকা অনাথ ব্রাহ্ম ধনভাণ্ডারে তাঁহার নামে একটী স্থায়ী ফণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রারম্ভিক মূলধন ৫০৲। মোট ১০০৫৲ টাকা।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৬ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered NO 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ।	১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
৯ম সংখ্যা।	18th August, 1927.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

কিসে আর বুঝিব বলো ?

(কাফি [illegible]—বং তালে গীত হইতে পারে)

তোমার হাতের দণ্ড আমার
আজও তো লাগে না ভালো,
তাই, এ অপরাধী নিরবধি
কেঁদে কেঁদে দিন ফুরা'লো।
নিবিড় ক'রে আনুছ আঁধার,
ঘিরিয়ে আমার চারিধার,
আমি ভয়ে মরি, ওহে হরি,
না দেখে তার পিছে আলো।
এ অন্তরের মলিনতা,
অন্তর্য্যামী জানিয়ে তা,
বুঝি পোড়াইতে নিজের হাতে
এমনি ক'রে আগুন জ্বালো ?
খাঁটি ক'রে নিতে মোরে,
ফেল্‌ছো যে পরীক্ষা ঘোরে,
এতেও যদি নাহি বুঝি,
কিসে আর বুঝিব বলো ?

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে ধর্ম্মের চিরপ্রস্রবণ প্রেমময় পিতা, তোমারই অসীম প্রেমে, আমাদের কল্যাণের জন্যই, তোমার পবিত্র ধর্ম্মকে তুমি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তোমার পূজা পরিত্যাগ করিয়া এ দেশ যখন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তখন তুমিই দয়া করিয়া, আমাদের উদ্ধারের জন্য, তোমার সত্য উপাসনার পথ দেখাইয়া দিয়াছ। তোমাকে ভুলিয়া এই দেশ যে দিন দিন মহামৃত্যুর আবর্ত্তেই ডুবিতেছিল, তাহা কেহ বুঝিতেও পারিতেছিল না, একবার চিন্তা করিয়াও দেখিতেছিল না। তুমি পথ না দেখাইলে আমরা এখনও সেই পথেই ধাবিত হইতাম। আজ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার সে করুণা স্মরণ করিতেছি। এবং যাহাতে আমরা সমগ্র মন প্রাণের সহিত তোমাকে জীবন্ত ভাবে পূজা করিয়া ধন্য হইতে পারি, তাহার জন্য তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। সর্ব্বদর্শী দেবতা তুমি, আমাদের সকল ত্রুটিই তুমি দেখিতেছ। প্রায় একশত বৎসর হইতে চলিল, তোমার এই তত্ত্ব দেশে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ এ পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকই ইহাকে অনুসরণ করিল! আমরা যাহারা ইহাকে জীবনে অবলম্বন করিবার বিশেষ ভার প্রাপ্ত হইলাম, আমরাও উপযুক্ত ভাবে সে কর্ত্তব্য পালন করিতেছি না—ইহার বিস্তারের বিশেষ কোন আয়োজনই করিতেছি না! আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতাই ত তুমি জানিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে সে আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ দেও, যাহাতে আমরা জীবন্ত ভাবে তোমার সত্য উপাসনাতে নিযুক্ত হইয়া, আমরা নিজেরা কৃতার্থ হইতে পারি এবং অপর সকলে যাহাতে ইহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে তাহাতেও সহায়তা করিতে সমর্থ হই। তাহা না হইলে যে আমাদের শতবার্ষিক উৎসবের সকল আয়োজন কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইবে! তোমার কৃপা ভিন্ন যে আমাদের অন্য সম্বল নাই। তুমি সকলকে কৃপা কর, আমাদের জীবনে ও সমাজে তোমার সত্য পূজা প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

তাঁর সাক্ষাৎ—প্রিয়জনের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন মনে কি আনন্দ হয় কোনও কথাতে কি তা প্রকাশ করা যায়? তখন যে তার সঙ্গে কথা চলে তা প্রাণ-খোলা। তার সঙ্গে কেবল "কেমন আছ" জিজ্ঞাসা ক'রে তৃপ্ত হওয়া যায় না; লোককোলাহলের মধ্যে দুটা কথা ব'লে প্রাণের আশা মিটে না। তাকে একান্তে চাই; অন্য দশ জনের অগোচরে প্রাণ খু'লে তার সঙ্গে কথা বলা চাই। প্রিয়তম যিনি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লেও প্রাণ মনের ভাব বদ্‌লিয়ে যায়, দৃষ্টি নূতন হয়, মুখশ্রী আনন্দে পূর্ণ হয়, ব্যবহারও মিষ্ট হয়। আর, তাঁর কাছে কত কথাই বল্‌তে ইচ্ছা হয়! নিজের সুখ দুঃখ কিছুই ত গোপন রাখা যায় না! নিজের দোষ দুর্ব্বলতাও তাঁকে জানাতে হয়। প্রাণটা খু'লে তাঁর চোখের সম্মুখে ধর্‌তে হয়। আর, তিনিও কত আবেগভরে দৃষ্টি করেন!—হাত বুলিয়ে সব ব্যথা জুড়িয়ে দেন। এই ভাবেই সাক্ষাৎ কর্‌তে হয়। নতুবা দূর হ'তে একটু দেখা, পরোক্ষে একটু জানা, তাতে প্রাণের তৃপ্তি নাই। তিনি যে অন্তরতর অন্তরতম, তিনি যে প্রিয় বন্ধু, হৃদয়নাথ। প্রাণে প্রাণে তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে হয়।

আমার অপরাধে—আজ জীবনের সব কথা একটি একটি ক'রে মনে পড়্‌ছে—কোন্ দিন কোন্ অপরাধ করেছি, কোন্ দিন তাঁর কোন্ আদেশ অমান্য ক'রে বিদ্রোহী হয়েছি, কোন্ দিন কোন্ কলঙ্কে ডুবেছি; কোন্ দিন কোন্ ভাইএর প্রাণে ব্যথা দিয়াছি—সব অপরাধ কলঙ্ক আমার স্মৃতিপথে আস্‌ছে। আর, তাই আমার এত দণ্ড, তাই আমার এত দুঃখ দৈন্য! আজ তাই আমি সকলের পরিত্যক্ত, প্রিয়জনেরও উপেক্ষিত! আমার মুখে যে সব কলঙ্কের দাগ পড়েছে! অপরাধের দণ্ড আজ তবে মাথা পেতে গ্রহণ করি। আমি পাপের শাস্তি এড়াতে চাই না—তাঁর বিচারে যে দণ্ড হয়, তাহাই অম্লান চিত্তে গ্রহণ কর্‌ব; তিনি যে দুঃখ বেদনা দেন তাহাই বিনা বিচারে বহন কর্‌ব। এই বেদনা, এই দুঃখও যে তাঁরই প্রেমের দান! এই দুঃখ বেদনার ভিতর দিয়াই যে তাঁর ক্ষমা পাব, তাঁর প্রেমস্পর্শ অনুভব কর্‌ব! অনুতাপের অশ্রুজলেই যে সব কলঙ্ক ধৌত হবে—তাঁর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যাবে! তখনই তাঁর স্পর্শ লাভ ক'রে কৃতার্থ হব।

তিনি দেখ্‌ছেন—আমি তবে ভয় করি কেন, নিরাশ হই কেন? তিনি আমাকে যতটা ভালবাসেন, আর কেহ ত সেরূপ ভালবাস্‌তে পারে না। তিনি যে আমার সঙ্গেই আছেন, তিনি যে আমার সবই দেখ্‌ছেন, তিনি যে আমার দিকে চেয়েই আছেন! আমার দোষ ত্রুটিও যেমন দেখ্‌ছেন, আমার দুঃখ বেদনাও তেমন দেখ্‌ছেন। কখন কোন্ আঘাতটি পেয়েছি, কখন কেন ক্রন্দন করেছি, সবই তিনি জানেন। আমার উঠা পড়া তিনি জানেন, আমার সংগ্রাম তিনি বোঝেন। তিনি আমার দুঃখে ব্যথিত হন, আমার আঘাতে তিনি হাত বুলিয়ে দেন। আমার নীরব ক্রন্দনও তিনি শোনেন। তিনি ত কাছেই রয়েছেন। তাঁরই প্রেমের ভিতরে বাঁধা রয়েছি। আমার সকল কাঁটা ফুল হ'য়ে ফুটে উঠবে। আমার সকল অশ্রু মুক্তা হ'য়ে কণ্ঠের হার হবে। আমার সকল বেদনা আনন্দের গানে ভেসে যাবে। তিনি সবই দেখেন, সবই জানেন।

সম্পাদকীয়।

ভাদ্রোৎসব—ভাদ্রোৎসবের পূর্ণ গুরুত্ব আমরা এখনও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহের বিষয়। ১৭৫০ সালের ৬ই ভাদ্র (১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট) বুধবার শুধু ব্রাহ্মদের পক্ষে নয়, জগতের অপর সকলের পক্ষেও একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন যেমন সম্মিলিত ভাবে একমেবাদ্বিতীয়মের বিশুদ্ধ সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি উহা উদার বিশ্বজনীন ভিত্তির উপরও স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম দিনের ব্যাখ্যানেই এই উপাসনার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখান হইয়াছিল যে, অপরে যে যে-বস্তুর উপাসনাই করুক না কেন, সকল ভুল ভ্রান্তির মধ্যেও তাহারা যখন পরোক্ষভাবে ব্রহ্মবোধেই তাহার উপাসনা করে, তাহা ব্যতীত যখন পূজাই হইতে পারে না, তখন ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে কাহারও বিরোধ থাকিতে পারে না এবং ব্রহ্মোপাসকেরাও কাহাকেই দ্বেষ করিতে পারে না—যে দ্বেষ ও বিরোধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত দূষণীয় তাহার স্থান এখানে নাই। প্রথম হইতেই যেমন এক দিকে একমাত্র বিশুদ্ধ সত্যধর্ম্মই ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্যস্থানীয় হইয়াছিল, মিথ্যার সহিত ইহা বিন্দুপরিমাণেও কোনও বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত হয় নাই, তেমনি অপর দিকে অন্যত্র যেখানে যেটুকু সত্য আছে তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত উদার ভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিতেও ইহা সর্ব্বদা যত্নশীল ছিল,—ভ্রমপ্রদর্শন ও মিথ্যাবর্জ্জনে দৃঢ়ভাবে নিযুক্ত থাকিয়াও ইহা কাহারও প্রতি কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ করে নাই। ইহা ধর্ম্মের অসার খোসা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণপ্রদ শাঁস গ্রহণ করিবার জন্যই সকলকে আহ্বান করিয়াছে, সার সত্যের দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা কখনও কোনও সম্প্রদায় বিশেষের জন্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আকারে জন্ম গ্রহণ করে নাই। দেশকালের আবরণ সত্ত্বেও, দেশাতীত ও কালাতীত প্রকৃতি লইয়াই ইহা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যদিও শৈশবাবস্থায় ধাত্রীদের হস্তে ইহার আকৃতি কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা উহার মূল প্রকৃতিকে নষ্ট করিতে পারে নাই—অল্প দিনের মধ্যেই উহার স্বীয় প্রকৃতি আপনাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এবং পরবর্ত্তী বিশ্বস্ত সেবকদের গভীর সাধন-নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক সেবাতে দ্রুত বিকাশ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে, এই শতবর্ষে পদার্পণের সময়ে, আমরা কি বলিতে পারি যে, সে গতি অব্যাহতভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, সে

উন্নতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই? একটু গভীর ভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বৎসরান্তে যে শতবার্ষিক উৎসবের ও নূতন শতাব্দীতে পদার্পণের জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি, তাহার সফলতা ইহার সদুত্তরের উপরই প্রধান ভাবে নির্ভর করিতেছে। বাহিরটাই সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সুতরাং বাহিরের অবস্থার দ্বারাই আমরা অধিকাংশ সময় বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা কোনও ক্রমেই সমীচীন নহে। কারণ, ধর্ম্মকে বাহির হইতে ভিতরে আনয়নেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব। এই ভিতরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ত আমরা নিঃসংশয়িত-রূপে বলিতে পারি না যে, আমরা অব্যাহত ভাবে উন্নতির দিকেই চলিয়াছি, অন্ততঃ, পশ্চাৎপদ না হইলেও স্থির অবস্থায়ই অবস্থিতি করিতেছি। বরং আমরা যে ভিতর ছাড়িয়া বাহিরের পশ্চাতেই ছুটিয়াছি, বিরুদ্ধ পথেই যে আমাদের গতি দেখা যাইতেছে, ইহা বলিলে কিছু অন্যায় হইবে না—বাস্তবিক ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভিতরের জিনিষের মধ্যেও আবার মুখ্য ও গৌণ দুই প্রকারের ভেদ আছে। গৌণ যদি মুখ্যের স্থান অধিকার করে, তবে তাহা নিতান্তই বিসদৃশ হয়, তাহাতে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই সাধিত হয়। আমরা যে অনেক বিষয়ে মুখ্যের পরিবর্ত্তে গৌণকেই অধিকতর সমাদর করিয়া থাকি, তাহাও স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা যে সকল বিষয় লইয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি, যে সকল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করি, তাহার ও আমাদের জীবনের দিকে দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আমরা যাহাই বলি না কেন, আমাদের বর্ত্তমান জীবন কোনও ক্রমেই উন্নতির পরিচয় প্রদান করে না, বরং বিপরীত সাক্ষ্যই দিতেছে। কাজেই ইহাই যে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভাদ্রোৎসবের কথা ভাবিতে গেলেই মনে হয়, উদার ভাবে একমেবাদ্বিতীয়মের সমবেত আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রতিষ্ঠাই এই দিনের সর্ব্বপ্রধান কাজ। ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার অন্য দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল না। আর যাহা কিছু এই বীজ হইতে অঙ্কুরিত বৃক্ষের শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প ফল প্রভৃতিরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে এই বীজ হইতে উদ্গত বৃক্ষ ও তাহার ফলরূপে কল্পনা করিলেও, আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এক দিন উপ্ত হওয়াতেই, একটি বৃক্ষ সৃষ্ট হওয়াতেই, বীজের কার্য্য শেষ হইয়া যায় নাই। অন্য বীজের ন্যায় ইহা বিলুপ্ত হইবার বস্তু নহে, একদিন উপ্ত হইলেই যথেষ্ট হয় না—ইহাকে প্রতিদিনই প্রতি হৃদয়ে যত্নের সহিত রোপণ ও পরিচর্য্যার দ্বারা পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে, এবং তাহা হইতে নিত্য নূতন বৃক্ষ উৎপাদন ও ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। এক দিন রোপণ করিয়া বহু দিন পর্য্যন্ত ফলভোগ করা, অথবা একজনের রোপিত বৃক্ষ হইতে বহু জনের ফল সংগ্রহ করা, এ ক্ষেত্রে বিধাতার ব্যবস্থা নহে। মোটেই যে ওরূপ ফল পাওয়া যায় না, তাহা নহে। উক্ত গৌণ ও পরোক্ষ ফলে জীবনের প্রকৃত কল্যাণ নাই, উহাতে জীবন যথার্থভাবে গড়িয়া উঠে না। প্রত্যেককে নিত্য সাক্ষাৎভাবে এই উপাসনা সাধন করিয়া, নূতন জীবনপ্রদ ফল লাভ করিতে হইবে, একমাত্র তাহাতেই জীবন অপ্রতিহত গতিতে উন্নতি ও বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে। ইহা ব্যতীত জীবন নিশ্চয়ই শুষ্ক হইয়া যাইবে, মৃত্যুপথে ধাবিত হইবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় প্রকার জীবন সম্বন্ধেই এই কথা। সমাজ-দেহের অঙ্গস্বরূপ ব্যক্তি জীবন্ত না হইলে যে সমাজও জীবন্ত থাকিতে পারে না, তাহা অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। ইহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু এই উন্নতি ও তল্লাভের উপায় সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদিও অন্তরের উন্নতি ও বিকাশ যাহাদের লক্ষ্য তাহারা সকলেই সাধারণ ভাবে জ্ঞান প্রেম পবিত্রতার উন্নতিই চায়, তথাপি এ বিষয়েও সকলের আদর্শ এক নহে। এমন লোকও অনেক আছে, যাহারা ইহার সঙ্গে জীবন-দেবতার কোনও সম্বন্ধই দেখিতে পায় না। তাহারা পরমেশ্বরকে বাদ দিয়াও এই সকলকে অবশ্যলভনীয় বলিয়া গ্রহণ করে। তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে নিযুক্ত থাকিতে পারে, সকল দেশের ও লোকের জন্য তাহাদের হৃদয়ের প্রেম ধাবিত হইতে পারে, বিবিধ প্রকার লোকহিতকর কার্য্যে তাহারা আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতে পারে, বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্র রক্ষা করিবার জন্যও তাহারা বদ্ধপরিকর হইতে পারে, তথাপি তাহাদের আদর্শ ও উপায় যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা যে পূর্ণ উন্নতির আদর্শ নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ পথে তাহারা যতই উন্নতি সাধন করুক না কেন, তাহাতে মানব-জীবনের চরিতার্থতা নাই। এই সকল তত্ত্বালোচনার মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, ঈশ্বরসম্বন্ধীয়, নানা তত্ত্বেরও আলোচনা থাকিতে পারে, তথাপি উহার মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম না থাকিতে পারে, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিতে পারে। সুতরাং তাহাদের উপায়ের মধ্যে যে ব্রহ্মোপাসনার কোনও স্থান থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অপর লোকের নিকট, পরব্রহ্মকে জানা, তাঁহাকে ভালবাসা ও সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অনুগত জীবন যাপন করাই মানবের একমাত্র লক্ষ্য, তাহার জন্যই আর সকল যাহা কিছু অনুসরণীয় ও অবলম্বনীয়। তাহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সমস্তই অপূর্ণ, অবান্তর। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানার্জ্জন, লোকশ্রেয়ঃসাধন ও চরিত্রগঠন। যদিও ইহারা বাহিরের নানা উপায়ও অবলম্বন করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা জানেন যে, যাঁহাকে জানিলে সকল অবিজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান হয়, যাঁহাতে হৃদয় অর্পিত হইলে সর্ব্বত্র প্রেম বিস্তার লাভ করে, যাঁহার অনুগত হইলে পূর্ণ পবিত্রতা ও শুদ্ধতা অর্জ্জিত হয়, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ স্থাপনই মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য, তাহাই সর্ব্ব-প্রকার উন্নতি ও বিকাশের প্রকৃষ্ট উপায়। আর কোন উপায়েই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। অন্য সকল উপায়ের দ্বারা যতটা বাহিরের সাহায্যই হউক না কেন, প্রকৃত কার্য্য-

সাধনে তাহারা একেবারেই অসমর্থ। অপর দিকে যাঁহারা এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁহারা এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল বাহিরের বিষয়েও বহু পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছেন—পণ্ডিত না হইয়াও জ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও চরিত্রের বিশুদ্ধতার কথা বলাই বাহুল্য। মূর্খ নিরক্ষর লোককেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-হেতু যেরূপ জ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞ, উদার প্রেমিক ও উন্নতচরিত্র হইতে দেখা যায়, বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও পরোপকাররত কর্মীদের কাহাকে শুধু তাহার ফলে সেই স্থানে পৌঁছিতে দেখা যায় না। যেখানে উভয়ের সম্মিলন ঘটে, তাহার কথা স্বতন্ত্র, তাহার ফল যে সর্ব্ব-প্রকারেই শুভকর হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং আর যাহা করা হউক বা না হউক, সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মোপাসনাকে অবলম্বন করিতেই হইবে। শুধু নির্জ্জনে ব্যক্তিগত ভাবে ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত হইলেই যথেষ্ট হইল না। সামাজিক বা সম্মিলিত উপাসনাও একান্ত আবশ্যক। তাহা ব্যতীত জীবনের পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না। সকল ধর্ম্মের ইতিহাসেই তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই অতি উচ্চ শ্রেণীর নির্জ্জন সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের উচ্চতা ও গভীরতা সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে অপূর্ণতা ও সংকীর্ণতার পরিচয়ও যথেষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দিকে বিকশিত উদার প্রশস্ত জীবন তাহার মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, সম্মিলিত সাধনও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে, ক্ষুদ্র একটি গণ্ডীকে কখনও অতিক্রম না করিতে পারে। এরূপ ক্ষুদ্র গণ্ডীর অনিষ্টকারিতাও উপেক্ষণীয় নহে। ক্ষুদ্র সাধন-গোষ্ঠীর যে কোনও উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা নাই, আমরা সেরূপ কথা বলিতেছি না। শিশুজীবন, বিশেষ আবেষ্টনের মধ্যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়া, এবং তাহার পোষণোপযোগী বিশিষ্ট প্রকারের আহার প্রদান করিয়াই, বর্দ্ধিত করিতে হয়। তাহা না করিলে তাহার বিকাশের পক্ষে বাধাই উপস্থিত হয়। কিন্তু কাহাকেও চিরকাল সেই ব্যবস্থার মধ্যে রাখিলে, তাহার শিশুজীবন আর কখনও ঘুচিতে পারে না, সে কোনও দিন পূর্ণগঠিত মানবপদবীতে আর আরোহণ করিতে পারে না। তাহার পূর্ণ উন্নতি ও বিকাশের জন্য এক সময় তাহাকে সে সকল সীমা ও গণ্ডীর বাহিরে যাইতে দিতেই হয়। তেমনি ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমভাবাপন্ন ক্ষুদ্র সাধন-গোষ্ঠীর যতই প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন, তাহাতে যাহারা চিরজীবন আবদ্ধ থাকে তাহাদের জীবন নিশ্চয়ই পঙ্গু ও অপূর্ণ থাকিয়া যায়, কখনও সংকীর্ণতার হস্ত হইতে তাহারা মুক্ত হইতে পারে না। ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। একটা বিশেষ দিকে যতই উন্নতিলাভ করা যাউক না কেন, শুধু তাহাতে মানবজীবনের পূর্ণতা সাধিত হয় না। আমরা ভ্রান্তিবশতঃ অনেক সময় মনে করি, যেমন ফলপুষ্পাদির প্রত্যেকের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা কিছুতেই দূর হইবার নহে, দূর করা বাঞ্ছনীয়ও নহে, তেমনি দেশ কাল প্রকৃতি ভেদে মানবমণ্ডলীর মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়, তাহাও চিরন্তন, তাহাকে রাখিয়াই মানবজীবনের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। বাস্তবিক মানব-জীবনকে এরূপ খণ্ড ভাবে দেখিলে, তাহাকে কখনও সম্যক্ প্রকারে দেখা হয় না। মানবজীবনের বিকাশের কোনও সীমা বা গণ্ডী নাই। তাহাকে যাহারা সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন, তাহারা নিশ্চয়ই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান অপূর্ণ অবিকশিত অবস্থাতে উহাকে যতই দেশকালের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হউক না কেন, সে সকল সীমাকে অতিক্রম করিয়া, সকল বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করিয়াই, পূর্ণ বিকাশের পথে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা ব্যতীত অন্য কোনও অবস্থায়ই উহার পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। যে পরিমাণে উহা উদার ভাবে সকল গ্রহণ করিয়া, দেশকাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সীমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই উহা প্রকৃত পূর্ণ জীবনের পথে অগ্রসর হইবে। এই সকলের সম্পূর্ণ অতীত হওয়া অতি কঠিন সন্দেহ নাই, হয়ত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারেই সম্ভবপর নহে; তথাপি উহাদিগকে অতিক্রম করিবার জন্যই আমাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে,—কোনও ক্রমেই রক্ষা করিবার জন্য নহে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা। যাহা আমাদের অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতার অনিবার্য্য ফল, তাহা যথাসম্ভব নিবারণের জন্যই কল্যাণার্থী ব্যক্তি যত্ন করিবেন—রক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য নহে। অপূর্ণতা বৃদ্ধির পক্ষে চেষ্টা করিলে আর উন্নতি সম্ভবপর হয় না। এই কথা ভুলিয়া চলিলে আমরা কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ভাদ্রোৎসবের প্রকৃত মর্ম্ম, উদারতা ও বিশ্বজনীনতা, শ্রেষ্ঠতা ও গৌরব, হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব না। আশা করি, এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। আমরা যেন সকলে এ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হই। আমাদের দ্বারা যাহাতে এই উন্নত ধর্ম্মের গৌরব খর্ব্ব না হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ভাবে যত্ন করিতে হইবে। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করুন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

সব চেয়ে বড় কাজ

কোনও গৃহস্থের গৃহিণী মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা আছেন; এক দিন শেষ রাত্রি হইতে তাঁহার শ্বাস আরম্ভ হইল। চিকিৎসকেরা বলিলেন, আর কয়েক ঘণ্টার বেশী বাঁচিবেন না, শীঘ্রই সব ফুরাইয়া যাইবে। বন্ধুদিগকে রাত্রিতেই এই সংবাদ দেওয়া হইল। সংবাদ পাইবামাত্র মহিলাগণ গৃহিণীকে দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া আসিতে লাগিলেন—এ সময় যদি কোনও প্রকারে একটু সাহায্য করিতে পারেন। প্রাতঃকালে তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, গৃহিণীর তিন চার মেয়ে, দু তিন ছেলে,

৬ই আগষ্ট ১৯২৩, আশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত উপদেশ।

পুত্রবধূগণ, এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সকলে ধূলায় পড়িয়া অনবরত কাঁদিতেছে। মেয়েরা বুক চাপড়াইতেছে—"ওমা, কোথা যাও?"—চারিদিকে গোলমাল কান্নাকাটি—কে কাহার খবর লইবে, সকলেই শোকে অধির—শোকে গৃহ পরিপূর্ণ। অনেকে শয্যার পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িয়াছে, যাহারা শয্যার কাছে নাই, তাহারাও গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছেন।

যে মহিলাগণ গৃহিণীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জন বড় ধীরপ্রকৃতিবিশিষ্টা। তিনি অপর এক জন মহিলাকে বলিলেন, "দেখ, এদের তো সকলেই ব্যস্ত, কে কা'র খোঁজ নেবে? এখন আসল কাজ ছেলেদিগকে খাওয়ান। এস আমরা রেঁধে বেড়ে ছেলেদিগকে এবং অপর সকলকে একে একে খাইয়ে দিই।" এই স্থির করিয়া তিনি মেজো মেয়েকে বলিলেন—"কি ক'র্ছ? সকলকে খাওয়াতে হবে তো, দাও ভাড়ারের চাবি দাও"—এই ব'লে চাবি নিয়ে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করিয়া রন্ধন করিলেন, এবং প্রথমে ছেলেদের সকলকে ধরিয়া বাঁধিয়া স্নান করাইয়া, পরে অপর সকলকেও একে একে স্নান আহার করাইলেন, এবং সকলের শেষে নিজেরাও আহার করিয়া, সেই রোগীর কাছে গেলেন। পরে যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা ব্যাপার দেখিয়া বলিতে লাগিলেন "ভাগ্যে এঁরা এসেছিলেন, তা' না হ'লে কি হ'ত? আজ আর এদের খাওয়া হ'ত না!"

এই ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে, আসল কাজে প্রথম কেও মন দেয় নাই—সকলেই ছুটাছুটি করিতেছিল, কাঁদিতেছিল, স্নান আহারের প্রতি মনোযোগ করিবার অবসর হয় নাই;—সকলেই রোগীকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজেও বিষয় কর্ম্মের প্রতি বড় বেশী মন দেওয়া হইয়াছে। সকলের অবস্থাও তত স্বচ্ছল নয়; সাংসারিক দুশ্চিন্তায়, অন্নচিন্তায় অনেকেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। এ অবস্থায় সব চেয়ে বড় কাজটা ভুলিবার সম্ভাবনা আছে। সবচেয়ে বড় জিনিষ, আসল কাজ, সমাজের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করা ও বর্দ্ধিত করা—এ দিকে মন দেওয়া সকলের পক্ষে কঠিন। কারণ, ইহা প্রধান কাজ হইলেও একটু আড়ালে আছে। বিষয় কর্ম্ম, সংসার, সর্ব্বদা তাহাদের দ্বারের কাছে; তাহাতেই তাহারা সমস্ত মন ঢালিয়া দেয়।

এ অবস্থায় এমন কতকগুলি লোক চাই যাঁহারা, অপর সকলে যে অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ভুলিয়া যায় এবং ভুলিয়া থাকে, সেই বিষয়েই বিশেষভাবে মন দেবেন। সমাজের আধ্যাত্মিকতায় মনোযোগ দিতে পারে, তাহার রক্ষা ও উন্নতিসাধনে তৎপর থাকিতে পারে, এমন এক শ্রেণীর লোক থাকা চাই। নতুবা সমাজের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা পাওয়া ও বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়ে একটী মণ্ডলী অথবা medium এর প্রয়োজন আছে, ইহা মনে করিলে, আশ্রমের মত ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়।

শুধু থাকিলেই হয় না, "আমরা এই কাজে আছি গো," বলিলেই হয় না। তাহাদের এমন তৎপর হওয়া চাই যে সমাজের গতি ফিরাইয়া দিতে পারে।

এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। খুব বৃষ্টির পর যদি উঠানে জল দাঁড়ায়, এক কোণের একটী নালার মুখ খুলিয়া দিলেই উঠানের সব জলের গতি হয় সেই এক দিকে। আর একটা কথা সকলেই জানেন,—যদি কোনও স্থানে খুব আগুন জ্বালা যায়, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকের বায়ুর গতি হয় সেই স্থানাভিমুখে। এই আধ্যাত্মিকতা সাধনের মণ্ডলীর যদি এমন শক্তি না থাকে যে সমগ্র সমাজের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকর্ষণ করিতে পারে, তবে সে মণ্ডলী থাকা বৃথা। ঐ নালার মুখ খুলিয়া দেওয়ায় যেমন সমস্ত জলের গতি হইয়াছিল সেই এক দিকে, জীবনে ধর্ম্মভাবের গভীরতাসাধন করিতে পারিলে, সমস্ত জীবনের গতি হয় ধর্ম্মের দিকে, এবং জীবনে নিষ্ঠার আগুন জ্বালিতে পারিলে, চতুর্দ্দিকের কর্ম্মপ্রবাহেরও গতি হয় সেই নিষ্ঠার অভিমুখে। যে মণ্ডলী এইরূপে আপনাকে গঠন করিতে পারে যে, তাহাদের দৃষ্টান্ত সমাজকে আধ্যাত্মিকতার দিকে লইয়া যায়, সেই মণ্ডলীই সার্থক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যতে জগতের ধর্ম্ম হইবে, এ কি কেও বিশ্বাস করেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানানুগা ভক্তিকে জাগাইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশে আধ্যাত্মিকতা বাঁচাইবে, এ যদি কেও ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে কিসে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতা বাড়ে।

এমন এক মণ্ডলী চাই, যাহার প্রধান কার্য্য হইবে ঐ আধ্যাত্মিকতা সাধন করা, এই সাধনকেই জীবনের সর্ব্বস্ব করা। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও আচার্য্যগণ সেই শ্রেণীর হইবেন সন্দেহ নাই। ইহারা যে পরিমাণে এক হইয়া কাজ করিতে পারিবেন, যে পরিমাণে গভীরতা ও নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা লাভ করিবেন, সেই পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিকতা জাগিবে। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যও সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ হইবে। এই দুইএর এক ছাড়িয়া অন্যের দাঁড়ান অসম্ভব।

এই সব মনে করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দেখিয়া, মস্তক ভাঙ্গিয়া পড়ে; কেবল মঙ্গলময়ের পানে তাকাইয়া মাথা তুলিয়া ধরি; কারণ, দুর্ব্বল হওয়া নাকি নাস্তিকতা, পাপ। কিন্তু আমাদের অবস্থা শোচনীয়। কোথায় সে মণ্ডলী যাঁহারা আধ্যাত্মিকতার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াছেন?

এই আশ্রম সেই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আছে; কিন্তু বহু দূরে। কোথায় দেহ মন প্রাণের একাগ্রতা, আত্মদৃষ্টি ও গভীরতার জন্য দুরন্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা? কোথায় সে সেবা? আমরা কত দূরে রহিয়াছি! ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতার মূল আমাদের মধ্যে—প্রধানতঃ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এই কার্য্যের জন্য দাঁড়াইয়াছেন। যেমন, যখন জুলিয়াস্ সিজার (Julius Cæsar) কে, সকলে ছোরার আঘাত করিতে লাগিল, তখন তিনি আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ব্রুটাস্ (Brutus) তাঁহাকে আঘাত করিল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—"Et tu Brute"?—"ব্রুটাস্, তুমিও? জগত জানে তুমি আমার বন্ধু, তুমিও আমাকে রক্ষা না করিয়া, হত্যা করিতে উদ্যত?" তেমনি আমরা যদি ঈশ্বরের বাণী শুনিতাম, তবে শুনিতে পাইতাম ঈশ্বর বলিতেছেন—"তোমরাও, তোমরা বিষয় কর্ম্ম ছেড়ে সব করিবে বলিলে, তোমরাও এতে সব দিলে না!" যদি আমরা সে বাণী শুনিতাম, ঈশ্বর এইরূপে লজ্জা দিতেন। কৈ তাঁহাদের

উৎসাহ উদ্যম, সর্ব্বস্বত্যাগ? কৈ তাঁরা প্রধান মনোযোগী? কৈ তাঁদের বিশেষ ব্যগ্রতা? কৈ সে সাধন-নিষ্ঠা? সাধে কি ব্রাহ্মসমাজ দুর্ব্বল? লোকে বলে, ব্রাহ্মসমাজ উঠে গেল, আর টেঁকে না, এর আর কোন কাজ নাই! এ কথা লোকে বল্‌তে পারত না যদি দেখ্‌ত যে গুড়্ গুড়্ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ঢাক বাজিতেছে, আধ্যাত্মিক প্রাধান্যের বিজয়-নিশান উড়িতেছে! যদি ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক সাধন থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা উত্তপ্ত লৌহ-গোলকের ন্যায় চতুর্দ্দিকের নরনারীর হৃদয় ভেদ করিত, কাহারও ক্ষমতা হইত না যে ইহার গতি রোধ করে।

দুর্ব্বলতা আমাদেরই ভিতরে। ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উদ্দেশ্য আমরা বড় লঘুভাবে ধরিয়াছি। যে এক দিন কাজ করিতে আসিল, সেই বলিল ও "কিছুই নয়।"—এতই দুর্ব্বল ভাবে ধরিলাম!

যদি ঘরের দ্বারে ঢোল বাজাইয়া সকলকে ডাকি আর বলি, "সকলে এস ভাই, বড় মজা আছে, এমন জিনিষ কেও দেখে নাই।," তা হ'লে সকলেই ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু আসিয়া যদি দেখে কিছুই নাই, কেবল ভাঁটা গড়াইয়া খেলা করিতেছে, তাহা হইলে সকলেই চলিয়া যাইবে, বলিবে, "দূর, ও কিছুই না, কেবল ছেলেখেলা!" প্রচার হবে কি করিয়া? এত হাল্‌কা ভাবে ডাকিলে, বা কাজ করিলে কি হবে?

এ বিষয়ে প্রধান কয়েদী, আসল আসামী, আমরা আচার্য্যগণ, প্রচারকগণ এবং আশ্রমবাসিগণ।

অমর কথা (৫)

দুঃখীর সান্ত্বনা।

কোন্ নিমেষে ফুরিয়ে যাবে
সাধের লীলা-ঘর!
কেন তবে দাও গো সখা,
অমর-হওয়া বর?
আকুল-করা দুখের মাঝে
কে দেবে গো বল?-
বেদন-রাঙা কাঁদন-গানে
আঁখি ছল ছল।
কেমন ক'রে জাগ্‌ব বল,
ধুলায় মিশি ধূলি,
কেন তবে বুকের মাঝে
নিত্য জাগায় বুলি?
আঁধার পথে সাথী কে গো
বস জীবনরথে?
জ্বালাও সখা, সত্য আলো
নিত্য নবীন পথে।

ফুরিয়ে যাবে নিশার স্বপন
পলক মধুর পাতে,
অশ্রুমাখা ও-কি গায়
দুঃখ-বেদন রাতে?
বিশ্ব আমার সখার লীলা,
আনন্দেরি মেলা,
জগৎ জুড়ে ঐ বুকেতেই
চল্‌ছে রসের খেলা।
তাই ত আমি সেই গানেতে
ভুলি বেদন-গান,
সবার সুরে আস্‌ছে নেমে
সত্য পথের দান।
ন্যায় সত্য প্রীতি ভক্তি
গাঁথে মিলন-মালা,
উধাও হোল দুখের নিশি
পরাণ-গোপন আলা।
কোন্ কুহেলী ভোলায় মোরে
পাগল দোলার দোল,
কে থামাবে পরাণ-বীণায়
প্রাণ-জাগানো বোল?
সকল ভুলের মোহের পারে
হাস্‌ছে প্রেমময়,
কোথায় হাসি মন-গোপনে
জয় ব্রহ্ম জয়।
খেল্‌বে যদি আমার সাথে
নিত্য মধুর খেলা,
বাজাও তবে পাগল বাঁশি,
ফুরিয়ে এল বেলা।
বাঁশির সুরে যাই গো ছুটে,
পাগল করে মন,
ফুটিয়ে এস পরাণ-প্রিয়,
হৃদি-কুঞ্জবন।

কে তুমি আকুল সাধক সাধনার গানখানি গেয়ে চল? দেব-আশীর্ব্বাদ ধরণীর বুকে পরম সুখে ত সুখী হোতে পার; তবে কেন এ বেদনার গান? সত্যধর্ম্মের বিমল আনন্দ তোমার বুকে ত অক্ষয় আনন্দ-শান্তি-প্রলেপ দান কোরতে পারে, তোমার সরস পূজার আনন্দ গানে গানে সকল দুঃখের নিবিড় ব্যথার মাঝখানেই শান্ত আসনখানি পাতা হোয়ে যাবে। মঙ্গল পূজার অমৃত আলো ঘোর অন্ধকার ভীষণ প্রলয়-ঝঞ্ঝার ভিতরও ধ্রুবতারা হোয়ে পথ দেখায়। তবে কেন মাঝে মাঝে এ অন্ধ মুহূর্ত্ত? চতুর্দ্দিক অন্ধকার। নয়নের জ্যোতি তাও বুঝি হারিয়ে গেল। কোথায় চলি? কোথায় সে সত্য আলো? কেমন কোরে অতীন্দ্রিয় পথে যাত্রা করি? কই সে প্রাণের নিবিড় শান্তি? এ কি বেদনা! মনে হয় ধূলোর মানুষ তবে ধূলোতেই মিশে যাই, কখনও অশ্রু-বিন্দু বুঝি রক্তবিন্দুতে পরিণত হোতে চায়। কোথায় সখা তুমি?

ব্যর্থ আকুল ক্রন্দনে বুক ভেঙ্গে যায়। এ দুর্দ্দিনে কি তুমিও পরিত্যাগ কোরবে তবে?

সময় সময় সংসারে অসহনীয় ব্যথা এমনই নিবিড়তর হোয়ে আসে যে, প্রাণে আকুল বিশ্বাসের অটল ভূমিও বুঝি বা ভেঙ্গে পড়ে। প্রাণসখার চরণে আত্মনিবেদন কোরতে চাইলাম। যখন বিশ্বকল্যাণে আহুতি দেবার আয়োজন, তখনই এই কঠোর বেদনা লাঞ্ছনার আঘাত! অথচ যাঁরা তেমন কোরে তোমায় ধোরতে চাইল না, কই তাদের সে পরীক্ষা? তারা ত নির্ব্বিবাদে চলেছেন সংসারে হেসে খেলে। এ আকুল সাধনার কি এই চরম সার্থকতা? কি হোল তবে নীরস কঠোর সংযম-সাধনায়, শুদ্ধতার কল্যাণ উদ্বোধনে? পাপের এত জয় হয় সংসারে, আর পুণ্যের এ অভিশাপ, এ অট্টপরিহাস কেন জীবনে? কেন জগতে সহানুভূতির অভাব? বল, প্রাণের ঠাকুর, কি জন্য তবে সৃষ্টি কোরলে! চাইলাম শান্ত হোতে, শুদ্ধ হোতে, সে বুকে এত ব্যথার বজ্রবাণ বিদ্ধ কোরলে কেন? কত নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা মানুষের, অথচ বেশ ত সসম্মান যাত্রা তাঁদের; অথচ যে সাধনপথে যেতে চাইল, তারও কি মর্ম্মন্তুদ বেদনার আঘাত! কেমন কোরে নীরবে সহ্য করি বল? মনে হয় সময় সময়, ওগো নিত্য করুণাময়! ও করুণা থেকেও কি তবে বঞ্চিত হোলাম? এই কি সাধনার বিচিত্র পরিণাম? কেন এ আকুল যাত্রা বল? যে দুঃখ বেদনা-লাঞ্ছিত চিত্ত, সাধন-অঙ্কিত পথে চল্‌তে যায়, ভক্ত প্রাণের চরণেই ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন কোরতে চায়, তারই কেন এ বিড়ম্বনা সংসারে? তারই একমাত্র আনন্দ-পুতলী, আশা ভরসা, সংসার থেকে চোলে যায়, তার জন্যেই যত কিছু লাঞ্ছনা বেদনার আয়োজন! দীন ভিখারী হোয়ে তাকেই রিক্ত ঝুলি নিয়ে ঘুরতে হয়! হায়! হায়! এমনি কোরে সহায় সান্ত্বনা হারা হোয়ে শেষ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরতে হবে! কেন তার জীবনের একমাত্র সম্বল সুকোমল স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সুন্দর একমাত্র সন্তানের মহাযাত্রার আয়োজন? কি হবে তবে প্রাণব্রহ্মে জীবন আহুতিদানে? কি হবে জগৎ-হিতৈষণায়—ব্রহ্মসাধনায়? এমনি কোরেই বেদন-লাঞ্ছিত চিত্ত বিশ্বকল্যাণের মহীয়সী লীলাতত্ত্ব বুঝতে না পেরে, কত অভিযোগের বেদনা জমিয়ে তোলে প্রাণের ঘরে। বিশ্বাস আনন্দ হারিয়ে ফেলে, কি ঘনতম দুঃখ বিষাদের ভিতরেই বাস করে!

আবার এমনিতর নিবিড় হোয়ে আসে যখন দুঃখ বেদনার ঘন অন্ধকার, যখন তপ্ত বুক রক্তাক্ত হোয়ে ওঠে, তখনইত দেখি ঘোর অন্ধকারের ভিতর ভক্তপ্রাণের বিচিত্র গান, ত্রিদিব ঝঙ্কৃত কোরে, বিদ্যুতের মত আমারই বুকে আলোকিত হোয়ে ওঠে। কে গায় অন্তরালে বোসে? এস এস তপ্ত ক্লান্ত ব্যথিত মানুষ! এস এস এখানেই নিত্য বিশ্রাম, সান্ত্বনার উৎসধারা। কোথায় জুড়োবে ত্রিতাপজ্বালা? প্রেমময়ের সরস লোভন কোমল বুকেই ব্যথিতের চিরন্তনী সান্ত্বনা।

আসুক তবে প্রচণ্ড আঘাত, বহুক তবে আকুল ঝঞ্ঝাপ্রবাহ, বন্ধ হউক সকল দ্বার, যাউক্ নিভে সকল সহায় আলো, যাক্ চোলে সকল বন্ধু আত্মীয় স্বজন দূরে সুদূরে, আসুক জীবনে মৃত্যু, উত্থান পতনের ঘোর সংগ্রাম, চরম লাঞ্ছনা। জানি জানি বিশ্বপাতা স্রষ্টা বিধাতা আমারও জীবনপাতা, বিধাতা। জানি যা কিছু সবই বিশ্বকল্যাণে নিয়ন্ত্রিত। যা কিছু হারাই সকলই ক্ষণভঙ্গুর; এই অস্থির চঞ্চলতার ভিতরই শাশ্বত ভূমির সন্ধান পাই। সকল বিচ্ছেদ বিরহের ভিতরই নিঃসঙ্গ প্রাণ প্রাণসখার পরম সঙ্গের আনন্দ-সহবাস লাভ করে।

তাই যতই রিক্ত কাতর বেদনা তিক্ততা ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌বে, ততই যেন দৃঢ় সঙ্কল্প, সৎসাহস, পরম বিশ্বাস জেগে ওঠে। বিশ্বকল্যাণ ঘিরে আছে—ভয় কি? যতই কেন ঐহিক সুখে বঞ্চিত হই না, ঐ শাশ্বত বুকেই আছি। সবই অনিত্য, ঐহিকতা দৈহিকতা কেমন কোরে নিত্য মাধুর্য্যের পরিচয় দান কোরবে?

সাধক নম্র ভক্ত সর্ব্বস্বহারা শোকের ও কি মাভৈঃ বাণী! যা হারালাম, যা বিনাশের পথে গেল, তা ত শুধু ধূলি, শুধু ছাই! সবই তাঁরই দান, তাঁরই বুকে টেনে নেওয়া।

কই সে জীবন্ত বিশ্বাস? যদি সত্য বিশ্বাস জাগ্রত থাকে, প্রাণব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভরসা, তিনি সঙ্গে আছেন, নিকটে আছেন, জীবনাধার হোয়ে আছেন, প্রেমসোহাগে তাঁরই বুকে চেপে ধোরে আছেন। যখন দৃষ্টি ক্ষীণ হোয়ে আসে, মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনিয়ে আস্‌বে, তখনও ঐ ভরসা, চরম গতি, পরম মুক্তি, —অনন্তেই মহাপ্রয়াণ, অনন্তেই নিত্য সহবাস।

ধন্য সাধক, যদি শেষ দিন শ্রান্ত ক্লান্ত রক্তাক্ত হোয়েও তন্ময় চিত্তে ব্রহ্মসাধকের চিরবাঞ্ছিত সাধনার ধন ব্রহ্মধনে ধনী হোয়ে, ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি কোরে, উঠ্‌তে পারে। ধন্য এ সাধনা সংগ্রাম, ধন্য এ একান্ত প্রাণময় জাগরণ, ধন্য এ অটল নির্ম্মল বিশ্বাস।

হায়! হায়! এ কি ভ্রম! সাধনার পুরস্কার ঐহিকতা দৈহিকতায়, ধন ধান্যে, পেতে চাই! যা ধূলিমুষ্টি তাই দেবতার দান বোলে বুকে ধোর্‌তে চাই! আত্মার পরম গৌরব আধ্যাত্মিক আত্মরত্ন লাভে। আত্মা অমর, তার সে দেবত্বের মহিমাও অক্ষয় ধনে নিত্যানন্দে। দেহী দুর্ব্বল, তাই দৈহিক ঐহিক সুখসম্ভোগে তৃপ্ত হোতে চাই। হায় হায়! যদি একবার দেহাতীত দেবধর্ম্ম পুণ্য-মঙ্গল গন্ধে সমস্ত আমোদিত হোয়ে যায়, তবেই চিরমুক্তির আনন্দ-পরিচয় লাভ করি। বিধাতার মঙ্গল আশীর্বাদে দেবশক্তির বিমল প্রভাবে মানুষ দেহাতীত ধর্ম্ম লাভ করে; তাই এ ব্যর্থ গ্লানি বেদনাতে সাধকের শাস্তি নয়—সাধুতার পুরস্কার সাধুতায়। কে জানে এ আসক্তির আড়ম্বরে কি ভাগ্যবিড়ম্বনা প্রতীক্ষা করে? কই ক্ষণিক দৈহিক সম্ভোগে পরম পরিতৃপ্তি?

ঘরে ঘরে জনক জননি! ও কি কথা শেখাও শিশুর কোমল মধু কণ্ঠে! শিশুর কোমল বুকে ও কি দৈহিকতা ঐহিকতার ক্ষণিক আদর্শ এঁকে দেও! কোথায় পুরস্কার? সততার মঙ্গল-দানে, না, ধন ধান্যে, মান সম্ভ্রমে? সততার পুণ্যজ্যোতি সত্তায় সমস্ত উদ্ভাসিত কোরে তোল। তখন সকল কর্ম্ম সকল ছন্দ পুণ্যপ্রভায় উজ্জ্বল হোয়ে উঠবে। সকল কর্ম্মে সততারই বিমল প্রভাব। কে রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ রাজধর্ম্ম পালন কোর্‌তে চাও? চাই সততার পুণ্য জ্ঞান। তা না হোলে রাজার সত্য রাজধর্ম্ম পালননীতি কোথায় সুপ্রতিষ্ঠিত? কেমন কোরে প্রজাদের সে প্রাণময় নির্ভর আশা জেগে উঠবে?

আবার এও ত দেখি কেবল ধন মান কত জীবনকে সর্ব্বনাশের

পথেই নিয়ে চলেছে। অর্থই কি অনর্থের মূল হোল—এ কি প্রায়শ্চিত্ত জীবনে জীবনে! আবার কত জীবনে ধন মান পুণ্য-পথের সহায়! ধন্য রহস্যময়ের রহস্য-লীলা। সকল ঘটনাই সত্য পথের সহায়। কোন দুঃখ বেদনা লাঞ্ছনা ব্যর্থ নয়, সকল ব্যথাই সত্য আলো জেলে ভগবদ্ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করে। এইত সাধনার সত্য পুরস্কার।

এ কি প্রেমময়ের বিচিত্র বিধি! দুঃখ আছে; কিন্তু কোন্ দুঃখ চিরস্থায়ী? অভ্যাসের বিচিত্র শক্তির অন্তরালে সমস্তই সরল সহজ হোয়ে আছে, সকল ব্যথার নিবিড় অনুভূতিই কালে সান্ত্বনার মঙ্গল পরিচয় বহন করে। রাত্রি অবসানেই প্রভাতের আলো উজ্জল হোয়ে উঠে, প্রলয়-ঝঞ্ঝার ভীষণ প্রলয়পারে প্রকৃতির বুকে শান্ত গম্ভীর স্নিগ্ধ ছটা ফুটে ওঠে। ক্ষণস্থায়ী সংসারে সুখ দুঃখ অভাব অনাটন সবই ভাসমান মেঘমালার মত নিত্য নূতন রূপে ভেসে চলেছে। কোথায় হৃদয়-আকাশে তার স্থির প্রকাশ?

তাইত আশা বিশ্বাস সকল বেদনা দুঃখের অন্তরালে জেগে ওঠে। তাইত ভক্তপ্রাণের আনন্দ গান অমৃতময়ের অমৃত সংবাসে চির গৌরবমুকুট লাভ কোরেই আনন্দে বিহ্বল হোয়ে ওঠে।

কি ভীষণ দারিদ্র্যনিষ্পেষণ! কোথায় তার শেষ? সততার পথে চলে, খেটে মরে। তবু কই স্বচ্ছলতা? বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা জেগে ওঠে, প্রত্যেকটী দান কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে গ্রহণ করি, তবু কেন এ ব্যথার আয়োজন—তবু কেন এ দীনতার ক্লেশ বহন করি? তবুও চল ক্লান্ত যাত্রী, সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে; যদিও আশার শতদল জীবনে বিকশিত হোয়ে উঠ্‌ল না, তবুও গেয়ে চল প্রাণব্রহ্মনাম, জেগে থাক নির্ম্মল আত্মা আলোকে, বিধাতার বিচিত্র বিধানে। বেদনার ভিতরই এক দিন মুক্তির আনন্দধারা নেমে আস্‌বে। সংগ্রাম-সাজেই সেজে চল ভগবদ্বিশ্বাসী। নিঃসঙ্গ যাত্রার ভিতরই সাধনার ধন হৃদয়রতন পরব্রহ্মের প্রেমসঙ্গ লাভ হবে। এইত বেদনার পুরস্কার।

কত মানুষ ঐহিক সুখে পরম সুখী হোল, কত হিতানুষ্ঠানের সুযোগ হোল, তবু কেন তার প্রাণের ঘরে নিত্য অভিযোগ অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে? চতুর্দ্দিকে কত দুর্ব্যবহার, কত অশান্তির আগুন, কত কঠোর বিচার! তবু বলি সত্যের গান গেয়ে চল, সকল কঠোর বিচারে নিষ্পেষিত হোয়েও সেই অনিমেষ আঁখির দিকেই চেয়ে থাক—সে আঁখিতে যদি এ আঁখি জাগ্রত হ'য়ে থাকে, তবেইত পুরস্কার লাভ হোল। তাইত জগৎজুড়ে ভক্তপ্রাণের এ নিত্য পূজার আয়োজন।

হয়ত আশৈশব কত ব্যাধির প্রকোপে ক্লান্ত যাত্রী, তবু বলি ভয় নাই, এ ব্যাধির বেদন-বাসরেই শাশ্বত গান বেজে উঠ্‌বে। রোগ শোক দৈন্য সবই একমেবা দ্বিতীয়ম্ মন্ত্র শেখাবে। হায়! হায়! কত ঘরে দারিদ্র্যের ভীষণ ভ্রূকুটি—দুধের শিশুর দিন উপবাসে কাটে—জননী-প্রাণ কেমন কোরে শান্ত হয়? তবু বলি ওগো দুঃখিনী জননি, শান্ত হও, বিধাতার ঘরেই আছি সকলে, অটল বিশ্বাসের জয়-কবচ পরিধান ক'রেই চল্‌তে হবে, নীরবেই সাধনার গান বিশ্ববুকে রণিত হ'য়ে উঠছে। এস এস ক্লান্ত পথিক, কে নিত্য সঙ্গী এস; পরম আশ্রয় চিরকল্যাণময়ের কল্যাণ ক্রোড়ে।

এ কি বল? আপন-ভোলা প্রেমে পাগলিনী নারী প্রেমাস্পদের বুকেই মাথা রাখ্‌তে চায়, আর সেই নিবিড় আরাম আশ্রয়খানি ভেঙে যায়! যেখানে প্রেমের অর্ঘ্য নিত্য নূতন ক'রে ঢেলে দিতে চায়, সেখানে এ কি ব্যর্থ বঞ্চনার ঘোর বিষাদ-গান! এ কি মর্ম্মন্তুদ ব্যথা, এ কি বিশ্বাসঘাতকতার অট্ট পরিহাস! সত্য, এ ব্যথা কোমল প্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করে—বিশ্বাসের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ কোর্‌ছে, ঘৃণা অবহেলা জেগে উঠ্‌ছে—তবুও একাই জীবন গড়ে তুল্‌তে হবে। তবুও বলি মানুষের মতই তা সহ্য কোরতে হবে, সংগ্রাম-সাজে সাজ্‌তে হবে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাধুতার পুণ্য সাধন কোরতে হবে। যদি বিশ্বভুবন ভুল বোঝে, ভয় নাই; তিনি ন্যায় সত্য প্রীতির উৎস, তাঁর প্রেমের নিত্য লীলা আমার মন-গোপনেও চুপে চুপেই গেয়ে যায়, বিশ্ববুকে রঞ্জিত রক্তাক্ত হ'য়েও সেই অনন্ত সত্তা ঘিরে আছে,—এ যে তাঁরইকরুণা!

সকলে পরিত্যাগ কোর্‌ছেন, কঠোর বিচারে নির্ম্মম আঘাতে অপমানে বুক ভেঙে পোড়্‌ছে, তবু ভয় নেই—আমি সেই অভয় সত্তার অভয়-কোলে, সেই অভয়-পদে, মাথা রেখেই নিশ্চিন্ত নির্ভয়।

ওগো অভাগিনী পতিপ্রাণা সতি! জীবনদয়িতের বিদায়-শয্যায় এ কি ক্রন্দন বিলাপ! ওগো পিতৃহীন সন্তান, পিতার সমাধিবুকে এ কি অশ্রুজল! ওগো পাগলিনী জননি, সন্তানের শবশয্যায় এ কি বেদনার বুকফাটা কাহিনী! এ কি, এ কি জড়ের আবরণ! এখন জড়ের সে বিচিত্র প্রভাব কই? তবু ঐ হিমশীতল দেহখানি বুকে কোরেই বুক জুড়োতে চাই! যে রূপের খাঁচা শূন্য ক'রে প্রাণপোষা পাখী উড়ে গেল, সেই শূন্য খাঁচা বুকে ধ'রতে চাই! কোথায়, কোথায় ধূলি থেকে চৈতন্যের জাগরণ? কোথায় সীমা থেকে অসীমের বুকে অনন্ত প্রয়াণ? এ কি বিচিত্র রহস্য-লীলা! এই কি সে প্রাণ-মাতানো চেতনায় বিচিত্র খেলা-ঘর? এই চিরনিমীলিত নয়নমণিতেই কি হাস্য-জ্যোতি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল! এই চিরস্তব্ধ বাণী-স্বরেই কি প্রাণের সুরলহরীলীলা জেগে উঠেছিল! এখন তবে কোথায় সে চেতনলীলা? এখন অনাদি বুকে মুক্তির আনন্দ গানে সচ্চিদানন্দ-আকাশে জীবাত্মার না জানি কি আনন্দ বিহার! এই ধূলিমুষ্টিই কি মোক্ষপথের দান? এ কি পরিণতি! ক্ষণিক লীলাঘরে এ কি ঐন্দ্রজালিক প্রভাব! কত বিচিত্র কর্ম্মনিষ্ঠার নিবিড় সাধনা!

এখন খেলা শেষ হোল, কৃচ্ছ্র সাধনার ব্রত উদ্‌যাপিত হোল, এখন অনন্তে প্রয়াণ। কে জানে কেমন কোরে নব প্রভাতে মঙ্গল জ্যোতি সত্তার ভিতর এ ক্লান্ত যাত্রীরও বরণ হবে—এ কি প্রেমময়ের প্রেম সিংহাসন!

ওগো পিতা পাতা পরিত্রাতা সখা সুহৃদ, কেন তবে এত বুক-ফাটা কান্না? কেন তবে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে কর্ম্মপথে আর ছুটতে পারি না মনে হয়, আকুল বিশ্রামের প্রার্থনা জেগে ওঠে? দাও সখা বুকে বল দাও, শক্তি দাও, সকল ব্যথা বুক পেতে গ্রহণ করি। সব ব্যথাই সইব; বন্ধু, জানি আমি তোমারই, তোমারই কাছে আছি।

ভবের নাটে আনন্দ-গান,
প্রেমবাহিনী তান,
ধন্য সখা পূজার ফুলে
ভ'রুল হৃদি-থাল।

ঢাল্লে কত বেদন-ধারা,
ব্যথার সুরেই জাগি,
তবুও সখা ধন্য তুমি,
চরণ-সুধাই মাগি।
কান্না হাসি উধাও হোল
তোমার গানে গানে,
উঠ্‌ল ভ'রে হৃদি-অর্ঘ্য
সখার বেদন-দানে।

আমায় ঘিরে দাঁড়ায় যবে
প্রিয় জনের রূপ,
হৃদয়-দেউল গন্ধে আকুল
ক'রল মধু ধূপ।
মিটিয়ে যত দাও না সখা,
নিত্য নূতন আশা,
নিমেষে দাও পরাণ ভরি'
কতই ভালবাসা!
তবুও দেখে উদাস আঁখি
নয়নজলে ভাসি,
ফুরিয়ে যাবে সাধের খেলা,
সোহাগ রাশি রাশি।

কি আছে গো ধরার বুকে
আসে আলো জ্বেলে,
কালের বুকে মিলন আনে
হাসির খেলা খেলে।
সকল ফাঁকি, কেবল জাগে
আত্ম-যোগে যোগী,
অমোঘ বলে তাইত জয়
ব্রহ্মসুধা-ভোগী।
নিত্য সুখ যে কোথায় জাগে,
কোন্ আলোকে ধাই,
শুদ্ধরূপে সখার হ'য়ে
তবে জীবন পাই।

কোন্ নিমেষে পলকপাতে
ফুরিয়ে যাবে খেলা,
পিতার কোলে বিরাম লভি
শান্তিসুখ-মেলা।
লক্ষ জন গায় যে জয়,
তাইত ওগো মরণ-সুরে
নাইক কিছু ভয়।
তাইত হোল জয়,
(ওগো) তাইত মোর জয়।

বিশ্ববীণা মরণ-গানে
বাজায় কি বা সুর,
তারই তালে হাসে বুকে
নিত্য অমর পুর।
তাইত হোল জয়,
(ওগো) তাইতে মোর জয়।

এই আশা যে আছে বুকে
পিতার ঘরে রই,
নাই-ক কিছু জীবন-সাঁঝে
প্রেমে মজা বই।
সেই আশাতে জাগছি আমি,
বিরাম হবে মোর—
যাক্ না ভেঙ্গে মায়ার বাঁধ
দুখ-নিশি ভোর।
আছে আমার সত্য সখা,
সেই বুকেতে ঠাঁই,
তাইত আমি ধরার বুকে
একা নয়রে ভাই।

কোথায় সখা জীবনদাতা,
কর করুণপাত,
চোখের জলে বুক যে ভাসে,
এস প্রাণনাথ।
পড়ে গেছি, চম্‌কে উঠি,
সহ্য করা ভার,
একা একা চল্‌ব কত,
এস প্রাণাধার।
ধর সখা, ঢাল শান্তি
মন-গোপনে আজ,
নিত্য আরাম দাওগো বুকে,
এস হৃদিরাজ।

নাই বা সখা ফুট্‌ল আমার
আশা-শতদল,
হোক্ তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ—
ঐ বলেতেই বল।
ভক্ত-গাথার আনন্দ গান
বাজ্‌ছে জীবনরথে,
সখা আমার সাথেই আছ
নিত্য আরাম-পথে।
শেষে যবে ভেঙ্গে গেল
ভবের খেলা-ঘর,
তারই মাঝে জয়-সঙ্গীত
দিল মোক্ষ বর।

প্রেরিত পত্র।

[পত্র প্রেরকের মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন।]

শ্রদ্ধাস্পদ,

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমার নিম্নলিখিত পত্রখানি ১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া, এবং সম্ভব হইলে সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিষয়ে পাঠকগণের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্তিভাজন স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি জীবনচরিত সংকলনে আমি কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমার প্রতি নিতান্ত স্নেহ প্রযুক্ত বহুদিন পূর্ব্বে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন আত্মীয়ের এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার আকাঙ্ক্ষা জানিয়া, আমি তাঁহার প্রস্তাবে তখন সম্মত হইতে পারি নাই। পরে উক্ত বন্ধু সংকল্প পরিত্যাগ করায় এবং তাঁহার সংগৃহীত উপকরণ আমার নিকট প্রেরণ করিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় আমি সম্মত হই। কিন্তু নানা কারণে এতদিন পরে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। পাঠকগণের নিকট আমার অযোগ্যতার পরিচয় যদিও ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, তবু অপর কেহ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করায়, অগত্যা আমাকেই হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য সাধুজীবনী আলোচনায় আন্তরিক অনুরাগ আমার এই প্রকার উদ্যোগের একটি প্রধান কারণ।

২। যাঁহাদের আমার প্রতি একটু স্নেহ আছে, তাঁহারা যদি আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া, অন্ততঃ স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্রের জীবনীর মত যাহা হয় একটু সংগৃহীত হইয়া থাকুক এই বিবেচনা করিয়া, আমার সহায়তা করেন, আমি পরম উপকৃত হইব। ভক্ত নগেন্দ্রনাথের অনুরাগী বন্ধু বান্ধবের অনেকে এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাদের নিকট এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবক কর্ম্মী ও প্রাচীন বন্ধুদের নিকট আমার সবিনয়ে ও নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র হইলেও যে ঘটনার বিষয় অবগত আছেন আমাকে জানাইবেন। আমি তাঁহাদের সহায়তার ভিখারী। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মসমাজের এই প্রকার ত্যাগী কর্ম্মীদের জীবনী সংগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের উপকরণই সংগৃহীত হইবে। সুতরাং এ কার্য্যকে তুচ্ছ মনে করা যাইতে পারে না।

৩। ব্রাহ্মসমাজের ত্যাগী কর্ম্মীদের জীবনী প্রকাশের গুরুত্ব অনুভব করিয়াই গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসবের উদ্যোগিগণের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এবং শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীযুক্তা সুশীলা বসু মহোদয়া এবং আরও কেহ কেহ নগেন্দ্রনাথের চতুর্দ্দশ বার্ষিক স্মৃতিসভায় ভক্তিভাজন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি জীবনী প্রকাশের ঐকান্তিক আগ্রহ সভার উদ্যোগিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। তবে এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, ধর্ম্মসাহিত্য এবং সাধুভক্তের জীবনীর পাঠকসংখ্যা, ততোধিক ক্রেতার সংখ্যা, বড় অল্প। এই জন্যই এক বৎসরের মধ্যেও ব্রাহ্মসমাজের প্রিয় সেবক নবদ্বীপচন্দ্রের জীবনীর মুদ্রণব্যয় অদ্যাপি সংগৃহীত হয় নাই। ইহা কেবল লেখকের অযোগ্যতার জন্য নয়, কেননা অনেক ভাল ভাল গ্রন্থেরও এমনি দুর্দ্দশার কথা সর্ব্বদাই শুনা যায়। গল্প উপন্যাস পড়ার ইচ্ছাই পাঠকগণের মনে প্রবল। যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকামী এবং যাঁহারা ঐ সকল সজ্জন বন্ধুদের সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধুতার সূত্রে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সহানুভূতি আমরা অবশ্য আশা করিতে পারি।

ঢাকা, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ। বিনীত শ্রীবঙ্কবিহারী কর।

[আশা করি বঙ্কবাবুর এই প্রশংসনীয় চেষ্টায় যথাসাধ্য সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই সকলে বিবেচনা করিবেন। আমরাও এ বিষয়ে সকলকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি। তঃ সঃ]

ব্রাহ্মসমাজ।

ভাদ্রোৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে একোনশততম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইবে। সকলে উৎসবে যোগদান করিয়া আপনাদের প্রার্থনা ও ব্যাকুলতার দ্বারা তাহাকে সফল করিয়া তোলেন, এই বিনীত প্রার্থনাঃ—

৪ঠা ভাদ্র (২১শে আগষ্ট রবিবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় মহিলাদের আলোচনা সভা। সন্ধ্যায় উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) সোমবার—প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস। সন্ধ্যায় বক্তৃতা, বক্তা—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। বিষয়—ভারতের ধর্ম্মধারা।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) মঙ্গলবার—প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের সম্মুখস্থিত কমললোচন বসুর বাটীর নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দির পর্য্যন্ত নগর-পথ উষাকীর্ত্তন ও পরে মন্দিরে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

৭ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) বুধবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। সন্ধ্যায় সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে আলোচনা। সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত আলোচনা উত্থাপন করিবেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৫শে জুন হরবালা দেবী তাঁর ঢাকা কায়েতটুলীর গৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান গত ৩রা জুলাই তাঁর কন্যা শ্রীমতী মৃণালবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ল্যান্সডাউন রোডের গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য এবং কন্যা মাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে কন্যা ঢাকার অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডারে ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। হরবালা দেবী বিক্রমপুরের মাঝপাড়া গ্রাম হইতে ১২৭৭ সনে ব্রাহ্মসমাজে আগতা কুলীন বিধবা স্বর্গীয়া নিত্যকালী দেবীর পুত্রবধূ। নিত্যকালী দেবী দুইটি কন্যা, পুত্র ও পুত্রবধূসহ ব্রাহ্মসমাজে আসেন। সাতান্ন বৎসর পূর্ব্বে মেয়েদের শিক্ষাপ্রদান ও সৎপাত্রস্থা করার উদ্দেশ্যে একটি বিধবার ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না।

বিগত ২৭শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসের পত্নী (শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের দ্বিতীয়া কন্যা) সুরুচিবালার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৪ঠা আগেষ্ট লক্ষ্নৌ নগরীতে শ্রীযুক্ত নীলমণি ধরের পত্নী পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১২ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা সুখদা নাগের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস শাস্ত্র পাঠ, বোনঝি শ্রীমতী শোভনা ঘোষ জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা, ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী মণিকা ঘোষ একটি কবিতা পাঠ, পুত্রস্থানীয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রার্থনা ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় চরিত্রপ্রসঙ্গ করিয়া প্রার্থনা করেন। শ্রাদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে, মিসেস নাগ প্রচারার্থ ৫০০৲, ও দুঃস্থদের সাহায্যার্থ ৫০০৲, ব্রাহ্মসমাজের জন্য এই এক হাজার, গ্রামের স্কুলের জন্য ১০০০৲, পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থ ৫০০৲, শ্বশুর শাশুড়ীর স্মৃতিরক্ষার্থ ৫০০৲, বাণীভবনের জন্য ২০০৲, এবং আরও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের জন্য কয়েক শত, সর্ব্বসমেত প্রায় ৪০০০৲ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। সায়ংকালে পুনরায় উপাসনাদি হয়। তাহাতে শ্রীমতী সুশীলা বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৪ই আগষ্ট পরোলোকগত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রপাঠ করেন। পুত্র শ্রীমান দেবপ্রসাদ কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী জীবনবালা দত্ত লিখিত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করিলে পর, পত্নীও প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবিধান করুন।

ছাত্রীদের বৃত্তি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ ২০৲ টাকার বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম—

বীণাপাণি চক্রবর্ত্তী, সুবর্ণা ঘোষ, সন্ধ্যালতা সরকার, কণিকা দাস গুপ্ত, সিসিলিয়া মণিকা জর্জ্জ, প্রভাবতী বসু, ষ্টেলা বেঞ্জামিন, প্রতিমা মুখার্জ্জি, অনিলা বসু, প্রীতিলতা গুপ্ত, লক্ষ্মী চক্রবর্ত্তী, ডায়েনা ডেবিড, ও লীলা মুখার্জ্জি। পূর্ব্ব প্রকাশিত ছাত্রীগণ ব্যতীত আসী মজিদ নামে আর একটি মুসলমান ছাত্রী ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দান—শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যকুমার মুখোপাধ্যায় তাহার নবনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুঃস্থ পরিবার ভাণ্ডারে ৫৲ দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক এবং নবগৃহ প্রেমময়ের পুণ্য-ভবন হউক।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দে তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। প্রেমময় নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৯শে আষাঢ় সায়ংকালে সর্ব্বানন্দ-ভবনে বান্ধবসভার ৩য় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা হইতে আগত ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম 'সামাজিক উপাসনা ও স্বরূপসাধন" বিষয়ে একটী আলোচনা উপস্থিত করেন। সভাপতির মন্তব্যান্তে প্রীতি-জলযোগে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ৭ই শ্রাবণ সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্রসমাজের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু সুশীলকুমার বসু এম্ এ "বঙ্গ সাহিত্যে ব্রাহ্মসমাজের স্থান" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাধারণ আলোচনা এবং সভাপতির বিশেষ মন্তব্য অন্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ২৫শে আষাঢ় অপরাহ্নে মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেনের মৃত্যুর দিনে তাহার নির্দ্দেশ মতে ৬০৲ টাকার পয়সা ও বস্ত্র কাঙ্গাল এবং অন্ধ আতুরদিগকে বিতরণ করা হয়। কাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত হইবে। সায়ংকালীন মন্দিরের উপাসনায় মনোমোহন বাবু উপরত আত্মায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রার্থনা করেন।

বিগত ১৪ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাসের গৃহে তাঁহার হাজারিবাগস্থ ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু কুঞ্জমোহন দাসের পরলোক-গমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস পারলৌকিক তত্ত্বপাঠ এবং মন্মথ বাবু উপরত আত্মার সরলতা ও সততা বিষয়ে প্রসঙ্গ করিয়া প্রার্থনা করেন।

বিগত ৩০শে আষাঢ় প্রাতে বাবু বিনয়ভূষণ গুপ্তের গৃহে তাঁহার মাতার বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সত্যানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতি-জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিগত ২৩শে শ্রাবণ সায়ংকালে সর্ব্বানন্দ ভবনে স্বর্গীয় হরিচরণ দাসের বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য এবং মনোমোহন বাবু জীবন-প্রসঙ্গ করিয়া প্রার্থনা করেন। প্রীতিজলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আনন্দময়ী দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য ডাক্তার কালীনাথ ঘোষের অসুস্থতার সময়ে ৩ মাস কাল বাবু সুশীলকুমার বসু এম এ, সম্পন্ন করিয়াছেন। কালীনাথ বাবু অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া কিছুদিন হইল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী—মঙ্গলময় পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছায় ডিব্রুগড়ের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর আগামী সপ্তত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন শারদীয় অবকাশের সময় ডিব্রুগড়ে সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্মগণের এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিগণের বর্ষমধ্যে ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগের উত্তম ক্ষেত্র। আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি, এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য এখন হইতে সকলে প্রস্তুত হইবেন। উপযুক্ত সময়ে উৎসবের কার্য্যপ্রণালীসম্বলিত নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইবে।

উৎসব—নূতন স্থাপিত বালিগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব গত ৪ঠা আষাঢ় সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্যের গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে প্রমুখ সভ্যগণ সংগীত ও সংকীর্ত্তন করেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন—অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধাই ২৲, কাপড়ে বাঁধাই ৩৲। বিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থ। ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধন উভয় দিকই ইহাতে বিস্তারিত ভাবে গভীর চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে। সত্যান্বেষী ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি মাত্রই ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। রাজর্ষি রামমোহনের মত ও শিক্ষা, এবং শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার পার্থক্য, অতি সুন্দর ও বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অনেক বাদ প্রতিবাদও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে গ্রন্থের পারম্পর্য্য ও মৌলিক যোগ একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও অনেক ভ্রান্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে যে ভাষার তীব্রতা, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ ও ব্যক্তিগত ইঙ্গিত লক্ষিত হইল, তাহা এরূপ দার্শনিক বিচার-গ্রন্থের গৌরবকে কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে তিনি যে দুই একটি অপ্রাসঙ্গিক ভিত্তিহীন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার ন্যায় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষে শোভা পায় না। যিশুর জীবনে লব্ধ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জন্য লোকে দলে দলে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত আছে বলিয়া ত আমরা অবগত নহি। তাঁহার জীবদ্দশায় শিষ্যসংখ্যা যে অতি অল্পই ছিল তাহা জানে না এরূপ কোনও লোক, ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের একটুও খবর রাখেন তাঁহাদের মধ্যে, কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না। "খৃষ্টধর্ম্ম যে নৈতিক বলে প্রচারিত হইয়াছিল, এই কুসংস্কার বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সমূহ অনিষ্ট করিতেছে", এরূপ মন্তব্যের কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। সকল ধর্ম্মেরই দলবৃদ্ধির ইতিহাসের সঙ্গে নানা অন্যায় অত্যাচার প্রভৃতি জড়িত রহিয়াছে—এমন কি হিন্দু ধর্ম্মও তাহা হইতে মুক্ত নহে। খৃষ্টধর্ম্ম-বিষয়ে এই খবর, যাহাদের ইতিহাস সম্বন্ধে (বহু অধ্যয়ন ও গভীর গবেষণা না থাকিলেও) অতি সামান্য জ্ঞানও আছে এবং যাহারা বর্ত্তমানে চারিদিকে কি হইতেছে তাহার একটু সংবাদ রাখে, তাহাদের সকলেই জানে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ কখনও ধর্ম্মপ্রচার বলিতে দলবৃদ্ধি বুঝেন না—বুঝিতে পারেন না। প্রকৃত ধর্ম্ম কোথাও কোনদিন নৈতিক বলে ভিন্ন অন্য উপায়ে প্রচারিত হয় নাই, হইতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, যিশু বলিয়া কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি থাকুন আর না থাকুন, পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে উহা সংগৃহীত ও পরিপুষ্ট হউক বা না হউক, উহার মধ্যে যেটুকু নৈতিক সৌন্দর্য্য আছে তাহার উপরই যে উহার প্রকৃত প্রভাব ও প্রচার নির্ভর করিয়াছে ও চিরদিন করিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—এই বিশ্বাসের মধ্যে একটুকুও কুসংস্কার নাই। আর, এই সংস্কারদ্বারা বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের কিছুমাত্র অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে না। বরং ইহার বিপরীত সংস্কারকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেই—খৃষ্টীয় ও অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণ যে সকল অন্যায় উপায়ে দলবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তাহার দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে মনে করিলেই—সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। কারণ, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের এই যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলেও ঐ সকল উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে; আমরা যে মনে করি শুধু নৈতিক বলেই, সত্যের শক্তিতেই উহা প্রচারিত হইবে তাহা নিতান্তই ভ্রান্ত, মিথ্যা কুসংস্কার মাত্র। এরূপ হইলে যে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মপ্রচারের কোনই আশা থাকে না, এবং উহা বাঞ্ছনীয়ও নহে, তাহা বলা বাহুল্য। দুই একটি বিষয়ে ব্যক্তিগত ঝোঁকবশতঃ যে একটু একদেশদর্শী ওকালতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে মুক্ত থাকিয়া সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টি রক্ষিত হইলেই সর্ব্ব প্রকারে শোভন হইত, এরূপ গ্রন্থের উপযুক্ত হইত। তাঁহার দার্শনিক বিচার, অজ্ঞেয়বাদ, অবতারবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির অসম্প্রদর্শন ও খণ্ডন যে সুযুক্তিপূর্ণ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার মধ্যে জীবতত্ত্বের কোনও সুমীমাংসা দৃষ্ট হইল না। জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথা অনেক বলিয়াছেন, ভেদেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভেদটা যে কোথা হইতে কি প্রকারে আসিল, জীবের অস্তিত্ব যে কি করিয়া সম্ভবপর হইল, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই। আশা করি ভবিষ্যতে এই অপূর্ণতা দূর করিবেন।

সাধনপ্রসঙ্গে উপাসনা সম্বন্ধে অনেক সুসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। তাহার দ্বারা সাধকগণ উপকৃতই হইবেন। তাঁহার সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই আমরা একমত। কিন্তু তিনি ধ্যান কথাটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া একটু গোল বাঁধাইয়াছেন। ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অর্থে ধ্যান কথা ব্যবহার করিয়া তিনি বলিয়াছেন, আরাধনার পূর্ব্বেই ধ্যানের স্থান, পরে উহার কোনও স্থানই নাই। আরাধনার পূর্ব্বে যে ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার আবশ্যক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা কোনও মতেই খুব গভীর উপলব্ধি বা সম্ভোগের অবস্থা নয়। আরাধনা যে পৃথক পৃথক স্বরূপেরই উপলব্ধি বা সম্ভোগ তাহা তিনিও বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে! ইহার স্বভাবিক ফল যে সমগ্রের গভীরতর উপলব্ধি ও সম্ভোগ বা ব্রহ্মে একেবারে ডুবিয়া যাওয়া, তাহা ব্যতীত যে আরাধনার কোনও প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা থাকে না, তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত যে যথেষ্ট হইল না, সে বিষয়ে কি কোনও সংশয় আছে? ইহাকেই ব্রাহ্মসমাজে ধ্যান বলা হয়। ইচ্ছা করিলে তিনি ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কথা ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু দার্শনিক বিচারে এই অবস্থাটার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার পরেই সাধারণ প্রার্থনার স্বাভাবিক স্থান, পূর্ব্বে নহে—ইহাকে অতিক্রম করিয়া নহে। প্রত্যেক স্বরূপ উপলব্ধির পরে প্রার্থনার উদয় হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা তদ্বিষয়ক বিশেষ প্রার্থনা বা খণ্ড প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অখণ্ড ভাবে তাঁহাকে অধিকতররূপে পাইবার ও তাঁহার হইয়া যাইবার প্রার্থনা উক্ত অবস্থার পরে ভিন্ন পূর্ব্বে হইতে পারে না।

আমাদের বিবেচনায় যে দুই একটি সামান্য ত্রুটি লক্ষিত হইল, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু তদ্দ্বারা এই মূল্যবান গ্রন্থের মূল্য বিশেষ কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইল বলিয়া মনে করি না। এই চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থের দ্বারা বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচার বিষয়ে অনেক সাহায্যই হইবে। তাই আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। সকলকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রার্থনা পত্র।

অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার সংস্থান-ধনভাণ্ডার।

এই ফণ্ড হইতে, কেবল বঙ্গদেশের নয়, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশেরই অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার সাহায্য পাইয়া থাকে। অতএব আমরা নানা প্রদেশেরই ব্রাহ্ম এবং সহৃদয় অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট এই ফণ্ডের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ফণ্ডের মূলধন ব্যয়িত হয় না, কেবল সুদ ব্যয়িত হয়। সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদন অনুসারে সাত জন ট্রাষ্টীর সম্মতি লইয়া সাহায্য প্রদত্ত হয়। মাসিক কি এককালীন যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত এবং ব্রাহ্মসমাজের কাগজে স্বীকৃত হইবে।

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ১৫ই জুলাই, ১৯২৭	শ্রী বঙ্কবিহারী কর সম্পাদক অনাথ ব্রাঃ পঃ সং ধনভাণ্ডার।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩২শে শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered NO 65

তত্ত্ব-কৌমুদী

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ১০ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮
2nd September, 1927.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

আঁখি মম ঝরে !

ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু মাঝে কি পরশ তব !
হে অনন্ত ! সিন্ধুসম এ কি রূপ নব !
দিনান্তে একটী বার পেলে এ পরশ
কে মাগিত তব পদে তোমার দরশ ?
সুখে কাঁদি, দুঃখে কাঁদি, কাঁদি পেয়ে ভয়,
বিচ্ছেদে মিলনে কেঁদে গণ্ড অশ্রুময় !
কোথা হ'তে নেমে আসে শীতল বাতাস,
জুড়ায় তাপিত হিয়া, নাশে হা হুতাশ !
কি শান্তি সান্ত্বনা মানে অশান্ত জীবন,
কে বুঝিবে এ রহস্য না করি ক্রন্দন ?
বিরলে বিজনে তাই ভ্রমি আশা-ভরে,
পুনঃ যদি কোনরূপে আঁখি মম ঝরে !

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে মঙ্গলময় জীবনবিধাতা, তুমিই জান তুমি কেন আমাদিগকে নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে রাখিয়া আমাদের জীবনকে এত সংগ্রামময় করিয়াছ, কল্যাণের পথকে এত কঠিন করিয়াছ। উপযুক্ত সীমার মধ্যে ব্যবহার করিলে যে সকল বৃত্তি বা বস্তু আমাদের কত কল্যাণের কারণ হয়, তাহাই আবার সীমার বাহিরে কেন মহা অনর্থ উৎপাদন করে, বিনাশের পথেই লইয়া যায়, তাহার মর্ম্ম ত আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। শুধু এইটুকু বুঝি যে, তাহা ব্যতীত আমাদের কোনও গৌরব থাকিত না, আমরা হয়ত আপনাদের অক্ষমতা দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতাম না, তোমার অনেক আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হইতাম। কিন্তু হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি ত আমাদের সকল দুর্ব্বলতাই দেখিতেছ, আমরা যে মোহে কি প্রকার অভিভূত হইয়া পড়ি জানিতেছ। তোমার সে গৌরব ও আনন্দ লাভ করা যে আমাদের পক্ষে অনেক সময়ই প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে! তোমার পুণ্য প্রেমের এই সংসারকে যে আমরা কি ভীষণ পাপ ও অশান্তির লীলাক্ষেত্র করিয়া ফেলি, তাহা তুমি সবই দেখিতেছ। তুমি এই মৃত্যুর পথ দিয়াই, দুঃখ ও বিপদের মধ্য দিয়াই, তোমার জীবন ও কল্যাণের পথে আমাদিগকে নিয়া যাও, আমাদের চৈতন্যের উদয় কর জানি। কিন্তু আমাদের যে সহজে চৈতন্যোদয় হয় না! হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সত্যদৃষ্টি খুলিয়া দেও, হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেও। আমরা আর কত কাল এই অশান্তিতে পুড়িয়া মরিব ? তোমার সুন্দর সংসারকে মরুময় করিব ? তুমি সকলকে তোমার পথে ডাকিয়া লও। আমাদের সকল বিরুদ্ধ-গমন রুদ্ধ করিয়া দেও। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকল জীবনে ও জগতে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

তিনি ও তুমি—তুমি যে তাঁর দয়া ভিক্ষা কর্চ্ছো, তোমার প্রারব্ধ কাজে সফলতার জন্য তাঁর কৃপার ভিখারী হয়েছ, নিজেকে আগে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, তুমি এ জন্য কি ক'রেছ, তুমি এ জন্য কি দিয়েছ। তুমি যে কাজ হাতে নিয়েছ, তার জন্য তুমি কি সকল শক্তি দিয়েছ ? তুমি কি তোমার সকল অর্থ ঢেলে দিয়ে রিক্ত হ'তে পেরেছ ? নতুবা তাঁর দ্বারে

ভিখারী হ'য়ে দাঁড়াবে কি ক'রে? যে সব দেয় নাই, যার শক্তি সামর্থ্য সম্পদ আছে অথচ তা ব্যয় করে নাই, সে ত ভিক্ষা করতে গেলে অন্যায় হয়। আগে আপনাকে দাও আগে আপনার ভাণ্ডার কাজে ঢেলে দাও। আপনার সমস্ত দিয়ে রিক্ত হও; তখন তাঁর কাছে করুণা ভিক্ষা কর। তিনি ত দিবার জন্যই ব্যস্ত; অযাচিত ভাবে ত তিনি দেন, কিন্তু তুমি যে আপনাকে চাইবার উপযুক্ত করতে পার নাই, প্রকৃত রিক্তহস্ত ভিখারী হ'তে পার নাই! আগে আপনাকে ঢেলে দাও, তবেই তাঁর কাছে কৃপার ভিখারী হ'য়ে যোড়-হস্তে দাঁড়াতে পারবে।

আমি ত প'ড়ে আছি—যারা যারা তোমার পথে এসেছিল, তোমার কাজ করবে ব'লে ব্রত নিয়েছিল, তোমার মহিমার গান গাইতে চেয়েছিল, একে একে তাঁরা সকলেইত চ'লে গেল! তাদের ওজর কত, তাদের অজুহাত কত! তারা নানা কথার ছলে তোমার দ্বার হ'তে স'রে গেল; আমি ত যেতে পারলাম না! তুমি যে আমাকে সেই জীবনের উষা-কালে ডেকেছিলে, আর সেই ডাক শু'নে কত সংগ্রাম অগ্রাহ্য ক'রে, কত দুঃখ বরণ ক'রে, কত চোখের জল উপেক্ষা ক'রে এসেছিলাম, আর আজও এখানেই প'ড়ে রইলাম! আর কেহ তোমার কাজে আসুক আর না আসুক, আমি আছি; আমি চোখের জলের মধ্যও ঐ পদে প'ড়ে আছি; আমি নিন্দা অপমানের ভিতরেও তোমার চরণে আছি; আমি সকল বেদনা, সকল দুঃখ দারিদ্র্য, সকল উপেক্ষা ও লাঞ্ছনার বোঝা বহন ক'রে তোমার চরণে মাথা রেখে প'ড়ে আছি। আর কোথাও আমি যাব না। তুমি যা বলবে তা করব, যা দিবে তা নেব, যে ভাবে রাখবে সে ভাবেই থাকব।

কখন তোমাকে পেয়েছি?—জীবনে কত সুখ দিয়েছ, কত আনন্দ দিয়েছ, তার ভিতরে তোমাকে আমি খুঁজি নাই, তোমার স্পর্শ আমি পাই নাই; কিন্তু যখন দুঃখ দিয়েছ, বেদনা দিয়েছ, তার ভিতরেই তোমার স্পর্শ অনুভব করেছি। কত বন্ধুর ভালবাসা, আত্মীয় স্বজনের প্রীতি, প্রিয় জনের আদর পেয়েছি, তখন তোমাকে স্মরণ করি নাই। তখন তোমার প্রেমের ডাক শুনি নাই। কিন্তু যখন প্রিয়জনের নিকট উপেক্ষা পেয়েছি, আপনার জনও পর হ'য়ে গিয়াছে, যখন বন্ধুজনেরও ভালবাসা হারাইয়েছি, তখনই দেখেছি, তুমি প্রাণে এসেছ, তুমি এসে ক্ষতস্থানে হাত বুলাইতেছ, তুমি শান্তি ও সান্ত্বনা দিতেছ। যখন সম্পদ ছিল, অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, সুখে দিন কাটিত, তখন তোমার কথা মনে আসে নাই; কিন্তু যখন দুঃখ দারিদ্র্য এসেছে, অন্ন জোটে নাই, মাথা রাখবার স্থান থাকে নাই, ভাণ্ডার রিক্ত হ'য়ে গেছে, তখনই তোমার প্রেমমুখ দেখে আনন্দ পেয়েছি, আমার পরম সম্পদ লাভ হয়েছে। তবে বলি, যদি দুঃখ দৈন্যের ভিতরে, উপেক্ষা ও অপমানের ভিতরেই, তোমার মুখ দেখতে পাই, তোমার সহবাস সম্ভোগ করতে পারি, তবে আমাকে তাহাই দাও—সুখ সম্পদ, আদর ভালবাসা, আমি চাই না।

সম্পাদকীয়।

অর্থলিপ্সা—যদিও সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য দেব বলিতে পারেন "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং", তথাপি সংসারে থাকিতে গেলে যে অর্থ না হইলে কিছুতেই চলে না, সংসারী লোকের পক্ষে অর্থের যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অবশ্য এমন এক দিন ছিল, যখন অর্থের আবিষ্কার হয় নাই, তাহার কোনও অস্তিত্বই ছিল না, তখন সংসারী লোকেও অর্থ বিনা আপনাদের সকল প্রয়োজনই সাধন করিতে সমর্থ হইত—বিনিময়ের দ্বারাই তখন প্রত্যেকে আপনার আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাতে নানা প্রকার অসুবিধাও ঘটিত বলিয়াই সে দিন চলিয়া গিয়াছে, সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন আর সে দিন ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নহে। ইহা সভ্যতার বা উন্নতির যেমন একটি প্রধান ফল, তেমন কারণও বটে। অর্থের আবিষ্কার না হইলে বর্ত্তমান উন্নতি কখনও সম্ভবপরই হইত না। কাজেই মানুষের মধ্যে বর্ত্তমানে যে একটা অর্থলিপ্সা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বাভাবিকই, উপযুক্ত সীমার মধ্যে থাকিলে তাহাকে কোনও প্রকারেই দূষণীয় বলা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল সময় উহা সীমার মধ্যেও থাকে না, স্বাভাবিক বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না—অধিকাংশস্থলেই উহা সীমা লঙ্ঘন করিয়া অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নিতান্ত বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। তখন আর কেবল প্রয়োজন-সিদ্ধিই অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্য থাকে না, শুধু অর্থের জন্যও, অত্যধিক পরিমাণে অর্থসঞ্চয়ের জন্যও, অর্থলিপ্সার উদয় হয়, আর প্রয়োজনেরও কোনও যুক্তিসঙ্গত সীমা রক্ষিত হয় না—যাহার কোনই স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা নাই তাহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, একেবারে অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এরূপ অবস্থায় উহা যে উন্নতি ও কল্যাণের কারণ না হইয়া, অবনতি ও অকল্যাণেরই হেতুভূত হয়, এমন কি মহামৃত্যুর পথেই লইয়া যায়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়,—চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই চারিদিকে তাহার অসংখ্য প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্প্রতি জেম্‌স্ হোয়াইট নামক একজন মহা ক্রোড়পতি ইংরাজ আত্মহত্যা করিবার প্রাক্কালে সাণ্ডে এক্‌স্‌প্রেস' নামক কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে ও অনুবাদসহ 'সঞ্জীবনী' কাগজে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে ইহার একটি অতি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বর্ত্তমান সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহাতে যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই, সে কথা উহা পাঠে

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র প্রবন্ধটি প্রকাশ করিবার স্থান আমাদের নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এক দিবস ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনাতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উহা উপাসক মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিয়া যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিষয়টা সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করিব। জেমস্ হোয়াইট নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে, আত্ম চেষ্টায় অতি উন্নত অবস্থায় উঠিয়াছিলেন, এবং অতিলোভবশতঃ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মহত্যা করিয়াছেন। সম্রাট প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ তাহার হইয়াছিল। সুতরাং তাহার সকল প্রকার অভিজ্ঞতাই ছিল। অর্থাভাবে অনাহারে তাহাকে দিন কাটাতে হইয়াছে, আবার অন্য দিকে এক দিনে লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি উপার্জ্জন ও ব্যয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "জীবনের যে সকল বিভিন্ন দৃশ্য একটির পর একটি আমার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি এখন এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, বর্ত্তমান মানবজীবন অতিলোভ বা অত্যধিক অর্থলিপ্সা, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ক্ষমতাপ্রিয়তার একটি উত্তপ্ত কটাহ। সন্তোষ ও মধুর ভাবসকল বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার স্থলে জ্বরবিকারগ্রস্ত উত্তেজনাময় অস্তিত্ব বিরাজ করিতেছে। এক দিকে ক্ষমতাপ্রিয়তা, অর্থলালসা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি অপর দিকে বলসেভিকদিগের নূতন করিয়া পৃথিবী গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, দুই সমান ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। দিনের পর দিন একই বৈচিত্র্যহীন ভাবে চলিয়া যায়—রাত্রিজাগরণ, ইয়ারদের সঙ্গে আহার বিহার ও বিভিন্ন নামে একই প্রকার কুৎসার আলোচনাতে দিনের পর দিন চলিয়া যায়। প্রতিদিনই প্রত্যেকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু—অধিকতর অর্থ, স্বল্পতর কর্ম্ম, অধিকতর আমোদপ্রমোদ। এত লোককে অর্থের পূজা করিতে দেখিয়া আত্মা পীড়িত বোধ করে। বর্ত্তমানে উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র পুরুষ ও গর্ব্বিতা রমণী, এই দুই শ্রেণী জগতে এক নারকীয় নৃত্যের পরিচালক, আর তাহাদের অনুসরণকারীদের সংখ্যা করা যায় না—জগতের ইতিহাসে আর কখনও এত বহুসংখ্যক লোক পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর অনুসরণ করে নাই। এক নূতন Midas (ধনকুবের) আসিয়াছে, সকলে তাহার পশ্চাতে ছুটিতেছে, সর্ব্বত্র তাহারই আলোচনা হইতেছে, সে মনে করে একমাত্র ঈশ্বরের নীচেই তাহার দ্বিতীয় স্থান। কিন্তু অর্থ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেই সে দেখিতে পাইবে, অনুতাপ ও অনুশোচনা ব্যতীত তাহার আর কোনও সঙ্গী থাকিবে না। অর্দ্ধ জগৎ নিত্য নূতন সুখ ও পাপানুষ্ঠান খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অপরার্দ্ধ তাহাদের দুর্দ্দশার চাপে পিষ্ট হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। উপরোক্ত এই অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় না যে, কেহ চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইলে তাহার বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়।" কিন্তু ঠিক এই সময় লেখা বন্ধ করিয়া মাথা তুলিয়া সম্মুখে স্ত্রী ও তিনটি পুত্র কন্যার ছবি দেখিতে পাইলেন। তাহাদের মুখে স্নেহ ভালবাসার নিদর্শন পরিস্ফুট দেখিয়া তিনি "বুঝিতে পারিলেন প্রকৃত জীবন কি এবং কেন মানুষ ইহা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। ভালবাসার জনদের সম্মুখে জীবনের যত লোভ পাপ মোহাদি ভুলিয়া যাইতে হয়।" এ পর্য্যন্ত লিখিলে তাঁহার চক্ষু আবার ছবি খুঁজিতে গেল, কিন্তু এই সময় মধ্যে 'ক্লোরোফর্ম' বিষের ক্রিয়া বলবতী হইয়া উঠাতে "মস্তক ঘুরিতে লাগিল, হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন তিনি যে জুয়া খেলিয়া মহা অপরাধ করিয়াছেন এবং তাহার শাস্তি যে ভোগ করিতেই হইবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, হাঁটু গাড়িয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।" এই সকল কথা বর্ণনা করিয়া এবং স্ত্রী পুত্র কন্যা ও অপরাপর বন্ধুদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া তিনি প্রবন্ধটি শেষ করিয়াছেন। ইহার অল্প পরেই যে তাহার জীবনবায়ু বহির্গত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায় এবং কিরূপ অবস্থায় কি প্রকার ভাব লইয়া তিনি প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার মধ্যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জনের লেশমাত্রও যে নাই তাহা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। আত্যন্তিক অর্থলিপ্সার ভীষণ পরিণামের এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই যে আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে বর্ত্তমান, তাহা নহে। উহার পশ্চাতে ওরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের ত কথাই নাই—তাহা যে অত্যধিক অর্থলিপ্সা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও সুখাসক্তি এবং ক্ষমতাপ্রিয়তার উত্তপ্ত কটাহে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে মহামৃত্যুর ও বিনাশের পথে ধাবিত হইতেছে, তাহা নিতান্ত মোহান্ধ ব্যতীত সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পারে—পুরাকালের রোমীয়দের জীবনেও তাহার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোমসাম্রাজ্য যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, উহার অখণ্ড প্রতাপ যখন প্রায় অর্দ্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, উহার ধনৈশ্বর্য্য প্রতিপত্তির সীমা ছিল না, তখন রোমীয়গণ আপনাদের পূর্ব্ব গৌরবান্বিত চরিত্র হারাইয়া, ইন্দ্রিয়সেবায় এবং বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদ ও বিলাসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া, একেবারে মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হয় এবং অচিরকাল মধ্যে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। তৎসঙ্গে তাহাদের সকল ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি, বিশাল সাম্রাজ্য, এমন কি স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়—তাহাদিগকে অসভ্য জাতির পদানত হইতে হয়। লক্ষাধিক টাকা থাকিতেও, তাহা তাহাদের এক দিনের আমোদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না মনে করিয়া, তাহারা আত্মহত্যা করিয়া জীবনলীলা শেষ করিত। তাহাদের এক একটি ভোজে যে কত প্রকারের আয়োজন হইত, কত অর্থ ব্যয় হইত, তাহাদের আমোদ প্রমোদের যে কত প্রকার ব্যবস্থা ছিল, তাহার তালিকা পাঠ করিলে অবাক হইতে হয়। এ সকলের পরিণামও তেমনি ভীষণই হইয়াছিল। আমাদের দেশও অনাদিকাল হইতে আগত আর্য্য ঋষিদের ও বুদ্ধদেবের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শিক্ষা ভুলিয়া, বর্ত্তমানে এই বিষময় ভোগের পথে—অর্থ বিত্ত ক্ষমতা প্রতিপত্তি ও ইন্দ্রিয়লালসার পশ্চাতে দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, মোহান্ধের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে, একবারও ভাবিয়া দেখিতেছে না অচিরে কোন্ মহামৃত্যুর অগ্নিময় সাগরে নিমজ্জিত হইয়া দগ্ধ বিদগ্ধ হইবে, ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ হইবার ইতিহাস কি ভীষণ অবস্থাই প্রকাশ করিতেছে—আত্যন্তিক অর্থলিপ্সা সুখাসক্তি

ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা মানুষকে সত্য ন্যায় দয়ামায়া কোমলতা হইতে বঞ্চিত করিয়া কি নরকের কীটেই পরিণত করে! এখন পর্য্যন্ত ইহারা কেহ অনুতাপে ও অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে নাই বটে, হয়ত চাতুরীবলে স্বীয় পাপের শাস্তিভোগ হইতে রক্ষা পাইবার যথেষ্ট উপায় করিয়াছে মনে করিয়া, বেশ আরামে আনন্দেই দিন কাটাইতেছে, হয়ত বা ভাবিতেছে এই অসদুপায়ে সংগৃহীত অর্থবলেই তাহারা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে পারিবে; তথাপি তাহাদের পরিণাম যে অতীব ভীষণই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিশ্ববিধাতার অমোঘ নিয়মকে কেহ কোন দিন কোনও দেশে ব্যর্থ করিতে পারে নাই, এ ক্ষেত্রেও পারিবে না, কোনও ক্ষেত্রেই কোনও দিন পারিবে না। মানুষকে এক দিন বুঝিতেই হইবে "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" বিত্ত মানুষকে কখনও চিরতৃপ্তি দিতে পারে না। তাঁহার বিধিলঙ্ঘন করিয়া তৃপ্তি ও সুখ খুঁজিতে গেলে, সুখের অন্বেষণে পাপে রত হইলে, মহা দুঃখ বেদনার আঘাত পাইতেই হইবে, ভীষণ শাস্তিভোগ করিতেই হইবে। The wages of sin is death—পাপের পরিণাম-ফল মৃত্যু। আত্মার মৃত্যু শারীরিক মৃত্যু অপেক্ষাও ভীষণ। যদিও এরূপ ঘোরতর প্রবঞ্চনা প্রতারণার দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় নাই, তথাপি এই ব্যাপারে সংসৃষ্ট কয়েক ব্যক্তির মধ্যেই যে এই মহাপাপ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে। কি ব্যবসা বাণিজ্যে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি দেশ-সেবায়, সর্ব্বত্রই এই ব্যাধি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মজীবন যে অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তির লালসার দ্বারা কি প্রকার কলুষিত হইয়াছে, নৈতিক চরিত্র কিরূপ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, মোহান্ধ হইয়া বহুসংখ্যক লোক যে কি প্রবল বেগে মহামৃত্যুর পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়—ভয়ে ত্রাসে ও নিরাশায় হৃদয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। ভদ্রসমাজেও আর লোকের লজ্জা সরম নাই—বিদ্বজ্জনসমাজেও শিক্ষিত লোক আপনার দুষ্কৃতির গর্ব্ব করিতে সাহসী হইতেছে! ইহাদিগকে দেশের নেতা ও চালক করিতে আবার অধিকাংশ লোকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না! কেন না, তাহাদের সকলেরই গতি ঐ দিকে, সকলেই একই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়া ছুটিতেছে—সকলেই চায় অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তি—সত্য ন্যায়, নীতি ধর্ম্ম যায় যাউক, সেদিকে কাহারই ভ্রূক্ষেপ নাই, ইহার ভীষণ পরিণামের কথা কেহ একবারও ভাবিয়া দেখে না। সকলে মিলিয়া দেশের মধ্যে কি পৈশাচিক নৃত্যলীলাই খুলিয়া বসিয়াছে! পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রকে কি নরকেই পরিণত করিতেছে! আজ কে এই মহামৃত্যুর ভীষণ স্রোতকে রোধ করিবার জন্য ঐরাবত হস্তীর ন্যায় প্রবলপরাক্রমে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে? সন্ন্যাসের দিন চলিয়া গিয়াছে। আর, সন্ন্যাসে প্রকৃত কল্যাণও নাই। অর্থ বিত্ত শক্তিকে একমাত্র অনর্থের মূল মনে করিলে চলিবে না,—তাহারা এই সংসারে অপরিহার্য্যরূপেই আবশ্যক। মানবজীবনের পূর্ণ উন্নতি ও বিকাশের জন্য এই সংসারও অপরিহার্য্য। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম করিতে হইবে, শুধু এ কথা নহে, সংসারে না থাকিলে কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম হইবে না, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা। সংযমের দ্বারা উপযুক্ত সীমার মধ্যে রাখিয়া প্রত্যেক বৃত্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত না করিলে পূর্ণ উন্নতি ও বিকাশ সম্ভবপর হয় না। উপযুক্ত সীমার মধ্যে প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতিকে সর্ব্বোপরি স্থান দিতে হইবে, কিছুতেই তাহাদিগকে বিন্দু পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ হইতে দিলে চলিবে না। সত্য ন্যায় প্রেম ভক্তি পুণ্য পবিত্রতাই জীবনের সার বস্তু, পরম লোভনীয় ও লভনীয় সম্পদ। জেম্‌স্ হোয়াইট শেষ সময়ে প্রেমের মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পৌরাণিক Midas ও বুঝিয়াছিলেন স্বর্ণ অপেক্ষা হৃদয়ের প্রেম অধিকতর মূল্যবান—"স্বর্ণ-স্পর্শ" অপেক্ষা "প্রেমস্পর্শই" অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান কালের Midas দিগকেও এক দিন তাহা বুঝিতে হইবে। এই প্রেমই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহাই মানবজীবনকে মধুময় করে। ইহাতেই মানবজীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতা। ভগবদ্ভক্তি ও বিশুদ্ধ মানবপ্রীতির দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিলে আর বিপথগামী হইবার কোনও আশঙ্কাই থাকে না, সীমালঙ্ঘনও ঘটিতে পারে না, সংযম সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায়, কঠোর সাধনের বিষয় থাকে না। ব্রাহ্মসমাজকে ইহা জীবনদ্বারা দেখাইতে হইবে। অর্থের যতই প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন, আত্যন্তিক অর্থলিপ্সা নরকের দ্বারস্বরূপ, ধর্ম্ম ও নীতির সীমা লঙ্ঘন করিলেই উহা মহা মৃত্যু আনয়ন করে। দেশকে এই মহা বিনাশের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কর্ত্তব্য। অর্থ বিত্ত মান প্রতিপত্তি, ইন্দ্রিয় সুখ প্রভৃতি অপেক্ষাও অধিকতর এবং শ্রেষ্ঠতর কল্যাণ ও সুখের বস্তু যে কিছু আছে, তাহা বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজকেই দেখাইতে হইবে। সংসার ও ধর্ম্মের মিলন সাধনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব অতি গুরুতর। আমরা কি আমাদের এই কল্যাণপ্রদ কর্ত্তব্যপালনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব না? এ বিষয়ে কোনও প্রকার উদাসীনতা অবহেলা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না, উহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। আমাদের সকলের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হউক। করুণাময় পিতা আমাদিগের প্রাণে শুভ সঙ্কল্প জাগ্রত করুন, হৃদয়ে বল ও শক্তি দিউন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও ব্রাহ্মসমাজে জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজ ও সেবা।

সমাজ আছে সেবা নাই, ইহা সামঞ্জস্যের কথা নহে। সেবা সমাজ-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। কেননা, প্রেমই সমাজ বন্ধনের সূত্র। এজন্য, প্রেম আছে, সেবা নাই, ইহাও অযৌক্তিক বাক্য। তবে কর্ত্তব্যের পথেও কতকগুলি কার্য্য থাকে, তাহাকে সেবা না বলিয়া কর্ত্তব্য বলিলেই গোলমাল চুকিয়া যায়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সেবার স্থান অতি উচ্চ এবং বিধানও বিবিধ। ব্রাহ্মসমাজ মূলতঃ জ্ঞান ও বিচারপ্রধান সমাজ; কেননা, সংস্কারের অস্ত্র হাতে করিয়া ইহাকে দাঁড়াইতে ও চলিতে হইতেছে ও হইবে। কিন্তু "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" এই

মহর্ষিবাণী শ্রবণ ও আবৃত্তি এবং চিন্তা ও অনুধ্যান করিলে প্রীতি ভিন্ন কার্য্যই নাই বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক, সে কার্য্য উপাসনার অঙ্গেও স্থান পায় না, ধর্ম্মলাভের ঘরেও জমা হয় না। সুতরাং ভগবানের প্রিয় কার্য্য যে সমাজের আদর্শ নহে, সে সমাজ ধর্ম্মসমাজ-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ আদর্শ ধর্ম্ম-সমাজ হইবে, ইহাই তাঁহার জন্মগত উচ্চ লক্ষ্য। যে সংস্কারকার্য্যকে শুষ্ক কঠোর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা সত্য নহে—ঐ কার্য্যের মূলেও নিগূঢ় জনহিতৈষণা ও মানব-প্রীতিই লুকায়িত রহিয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ সেবক উপাসকই তাহা গভীররূপে অনুভব করিতে পারিবেন। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার, নরনারীর সমান অধিকার দান, অনুন্নত জাতির উন্নয়ন, জাতিভেদ দূরীকরণ, বিধবাবিবাহ-প্রচলন, কুলীদিগের দুরবস্থামোচন, নিম্ন শ্রেণীর ভিতরে শিক্ষা-বিস্তার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রতিকার, প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের ভিতরে ব্রাহ্মসমাজের প্রবল প্রাণশক্তির উন্মেষ দেখা গিয়াছে। আজ সে উন্মেষ লোকনেত্রের তেমন গোচরীভূত হইতেছে না। তাহার কারণ, ব্রাহ্মসমাজেরই অনুকরণে দেশের লোক বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে এই সেবাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহায় হইয়া, অথবা ব্রাহ্মসমাজের অগ্রেই চলিতেছে। ইহা দেশের পক্ষে বড় একটী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। তবে ব্রাহ্মসমাজ মুষ্টিমেয় লোকের স্থান, এ স্থান হইতে আর কত লোকই বা বাহির হইবে! কিন্তু সত্যের অনুরোধে এ কথা বলিতেই হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজ যেন পরের হাতে কার্য্য রাখিয়া নিজের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছে, এ বিষয়ে পিছনে পড়িয়া যাইতেছে। সেবাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচার মনে করিতে পারিলে, ব্রাহ্মসমাজেরই সকলের অগ্রে নেতৃত্ব নেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

যাক্ এখন উচ্চ অঙ্গের দেশের ও দশের সেবা ছাড়িয়া, নিজ ক্ষুদ্র সমাজ-মধ্যেও সেবার শক্তি দিন দিন যে হ্রাস পাইতেছে, তাহা আমাদের ভাল করিয়া চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সকল বিভাগে সর্ব্ব প্রকারেই যে সেবার অঙ্গে ব্রাহ্ম নিজেদের ভিতরেই নিজেরা বড় নিঃস্ব ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে! পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুচরণ মহলানবিশ, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, কেদার-নাথ কুলভি প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নাম-করা সেবকদল, ব্রাহ্মপরিবারপরিদর্শন, ছাত্রী বোর্ডিংএর তরে বাজার করন, উপাসনা, সমাজ আফিস্, ব্রাহ্মমিশন প্রেসের কার্য্য ও তত্ত্বাবধান, তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জার পরিচালন, দরিদ্রের জন্য, সমাজের জন্য, অর্থভিক্ষা, ইহার যে কোন কার্য্য ইঁহারা সম্পন্ন করিতেন। জীবিত পুরুষদিগের ভিতরে আজ এই শ্রেণীর লোক বেশি নাই। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদার-নাথ মুখোপাধ্যায়, তত্ত্বভূষণ, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি মনে রহিয়াছেন! ইঁহারা সকলেই বৃদ্ধ এবং রুগ্ন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী আসন্ন বার্দ্ধক্যে উপনীত কতিপয় ব্যক্তি কায়মনবাক্যে যাঁরা সমাজের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নাম আর উল্লেখ করিলাম না। পরবর্ত্তী আশার স্থল যুবক বন্ধুদিগের ভিতরে সমাজের সেবা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে এবং আশাপ্রদও নহে। তা না হইলে, আজ ব্রাহ্মসমাজের সকল দিকে একটা প্রবল ভাঁটার টান পড়িল কেন? এক এক করিয়া সেবার সূত্রে কয়েকটী দিক্ দেখান মন্দ নয় মনে হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের কাগজ পত্রে গুরুতর অর্থাভাবের কথা প্রতি-নিয়ত পড়িয়া আসিতেছি। প্রচারবিষয়ে কিছু লিখিতে গেলে প্রাণে গভীর বেদনা উপস্থিত হয়। কেবল কি অর্থাভাবের জন্যই প্রচার বন্ধ হইয়া আসিতেছে? আমি তাহা মনে করি না। আমরা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটী মুক্তি-বিধান মনে করিয়া তাঁর পতাকা লইয়া বাহির হইতে পারিতাম, এবং টাকা পয়সার চুক্তি না করিয়া যদি এক দল এ ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতে পারিতেন, তবে টাকার অভাব হইত, এমন কথা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পরে, এই পথে কে কত দিন এই সেবাক্ষেত্রে উপবাস করিয়াছেন জানি না। তবে এ কথা বলিতেই হইবে ব্রাহ্মসমাজ যখন একটী ব্যবস্থার অধীন, তখন সেই সূত্রে অর্থসংগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। খৃষ্টানসমাজের দিকে তখন স্বতঃই দৃষ্টি না দিলে চলিতে পারে না। অর্থ দিয়া যাহা করিবার তাহা করিতেই হইবে। মনে বড় ব্যথা লাগে বলিতে, গোবর্দ্ধন দাসের লক্ষ টাকা দানের সঙ্গে আরো লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহের সঙ্কল্প হইয়াছিল এবং বহু সহস্র টাকার প্রতিশ্রুতি এবং স্বাক্ষরও পাওয়া গিয়াছিল। শক্তি ও সময় দিয়া তেমন এক দল লোক এই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে অর্থাভাব অনেক পরিমাণে দূর হইত। কিন্তু তাহা হইল কই? তত্ত্ব-কৌমুদী ও মেসেঞ্জার পত্রিকার স্থান দেশের ভিতরে অতি অল্পপরিসর। তত্ত্ববোধিনী ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির অবস্থাও তাই। চেষ্টা করিলে নানা স্থানে গিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিলে প্রত্যেক কাগজের হাজার গ্রাহক হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার নাই। সঞ্জীবনী সমাজের কাগজ না হইলেও, উহা ব্রাহ্মসমাজেরই প্রচারের মুখপত্র বলিতে দ্বিধা নাই। নব্যভারতও এক সময় দেশের ভিতরে ঐ প্রকারই ছিল। উমেশচন্দ্রের বামাবোধিনীও কি সুন্দর কাজ করিত! এই সকল কাগজের জন্য এক সময়ে গ্রাহকসংগ্রহ ও মূল্য-আদায়ের নিমিত্ত লোক প্রেরিত হইত। তাতেও কত কার্য্য হইত। মফঃস্বলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের চাঁদা আদায়, পুস্তক বিক্রয় প্রভৃতি সেবার বিবিধ অঙ্গ ছিল। আজ কিন্তু সে সকলের কোন নাম গন্ধও নাই। সমাজের পুস্তক বিভাগ লুপ্ত হইবার মত হইয়া চলিল। এখনো মনে পড়ে, হরিমোহন বাবু, কাশী বাবু, কুঞ্জ বাবু, অমৃতবাবু, ভাই প্রকাশদেব এবং ভাই সুন্দর সিং রাশি রাশি পুস্তক সঙ্গে লইয়া সমাজের বিবিধ কার্য্য লইয়া মফঃস্বলে বাহির হইতেন। আজ সে দিক্ লুপ্ত। আমরা মফঃস্বলে থাকিয়াও অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি এই সকল কার্য্যে যথাসাধ্য ব্যবহৃত হইয়াছি।

আজ কলিকাতায় বলিয়া নহে, প্রায় সর্ব্বত্রই আচার্য্যের সংখ্যা কম বলিতে পারি না, কিন্তু উপাসনার শ্রেষ্ঠ পরিপোষক সঙ্গীতের জন্য তেমন উৎসাহী, ভাবপূর্ণ সুগায়কের একান্তই

অভাব। গায়কের অন্বেষণে এবং অনুরোধ উপরোধের ব্যাপারে, সম্পাদককে হয়রাণ হইতে হয়। এই মহতী সেবার জন্য ব্রাহ্ম পুত্র কন্যাগণকে প্রস্তুত করিতে না পারাতে, উপাসকমণ্ডলী দিন দিন সর্ব্বত্রই শুষ্ক এবং দীনদশাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, আরো পড়িবে।

ব্রাহ্মদের হাতে যেখানে যেখানে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস আছে, সেবার অঙ্গে সেখানে অনেক করিবার আছে! এগুলি কেবল সেবাক্ষেত্র নহে, প্রচারক্ষেত্রও বটে। ব্রাহ্ম পরিবার-সকলের রোগে শোকে, অভাবে অনটনে, কিছু না হইতেছে এমন কথা বলিতে পারি কি করিয়া? তবে এ ক্ষেত্রে আরো সেবক আবশ্যক। বিদ্যালয়গুলিতে নীতিধর্ম্ম প্রচারের প্রভাব নাই বলিলেই হয়।

ব্রাহ্ম কন্যাগণ উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর গৃহকার্য্যও শিক্ষা করিতেছেন। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম গৃহে তাদের অনেক কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু তাঁদের সেবাক্ষেত্র পরিবারের বাহিরেও প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। অতীতের কথা কতই মনে পড়ে—নিজেরাই দেখিয়াছি, কোন কোন পরিবারে গৃহিণী অসুস্থা কিম্বা সূতিকা-গৃহে আবদ্ধ থাকিলে, প্রতিবেশী কন্যাগণ এক এক ক্রমে ১০।১৫ দিনও রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য করিয়া প্রফুল্লমুখে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম যুবকদল ভৃত্যের কার্য্যের মত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিয়াছেন। আজ সে দিন আছে কি? থাকিলেও নিতান্ত অন্তরঙ্গ মধ্যে ছাড়া বাহিরে বেশি নহে।

মফঃস্বলে থাকিয়া ভক্ত কর্ম্মিদলের যে চিত্র দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে প্রাণে যুগপৎ হর্ষবিষাদ উপস্থিত হয়। অন্যান্য মফঃস্বলের কথা অধিক আজ লিখিতে পারিতেছি না, কেবল বরিশালের কয়েকটী দৃষ্টান্তই দিতেছি। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রতি ব্রাহ্ম পরিবারে গিয়া মহিলাদিগকে শিক্ষাদান করিতেন, সমাজের বাহিরে রোগীর শিয়রে রাত্রি ভোর করিতেন, আত্মীয়স্বজনশূন্য মৃতদেহের সৎকার করিতেন। ভক্ত সেবক সর্ব্বানন্দ দাস ২০ বৎসরের অধিক কাল সমাজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি সেবা অঙ্গে প্রতিদিন ব্রাহ্মপরিবারের খবর লইতেন, অভাবগ্রস্তকে গৃহে আনিয়া স্থান দিতেন, মন্দিরপ্রাঙ্গণে নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করিতেন, প্রচারক কালীমোহন দাস বিপন্নের জন্য অর্থভিক্ষা করিতেন, নিজের হাতে মন্দিরের ভিত্তির ইট পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়াছেন, আমাদের বক্তৃতার বিজ্ঞাপনগুলি নিজ হাতে সহরের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া প্রফুল্লমুখে বিলি করিয়াছেন। পিরোজপুরের গোবিন্দচন্দ্র বসু এখানে অবস্থানকালে এক পরিবারের শিশুর অসুস্থতার মধ্যে (অভাবগ্রস্ত) নিজ হাতে দিনের মধ্যে এক খানি ছোট মশারি সেলাই করিয়া দিলেন; স্বপ্রণোদিত হইয়া সহরের বাড়ী বাড়ী গিয়া ব্রহ্মবাদী পত্রিকা বিলি করিতেন। একনিষ্ঠ বামনচন্দ্র গাঙ্গুলী উৎসবাদিতে যে কোন প্রকারের ভৃত্যের কার্য্য করিয়া এবং রোগীর শিয়রে থাকিয়া নানা ভাবে প্রফুল্লমুখে সেবা করিয়াছেন। আজ তেমন লোক কোথায়?

ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শিলং প্রভৃতি স্থানে, বরিশালের ন্যায়, বিবিধ ভাবে বহু সেবক যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এখনো কেহ কেহ একনিষ্ঠ হইয়া সকল অভাব, অসুবিধার ভিতরে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতেছেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দল কোথায়? অর্থ বিত্ত পদ খ্যাতি এই সকলের দিকে একটা ঝোঁক নব্যদলের মধ্যে গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইহাদের ভিতরেও কোন কোন যুবক সময় ও শক্তি অর্পণ করিতেছেন। কিন্তু তাহা আশাপ্রদ নহে।

গানের ভিতর দিয়া, অর্থসংগ্রহে মন দিয়া, ছাত্রসমাজের সম্পর্কে, ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা পুস্তক প্রভৃতি বিক্রয়, বিলি ও বিতরণের ভিতর দিয়া, তেমন কাউকে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে কেহ গৌরবের কার্য্য ভাবিতে পারিতেছে না। বরং অনেক ব্রাহ্ম পুত্র কন্যা যেন ইহাকে লজ্জাজনকও মনে করিয়া থাকেন। ইহার জন্য অভিভাবক-গণই অনেকটা দায়ী বলিয়া মনে হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সেবকগণ প্রফুল্ল মুখে ঝুলি কাঁধে লইয়া সর্ব্বত্রই চাউল পয়সা ভিক্ষা করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছেন, রোগীর শিয়রে জাগিয়া ধন্য মনে করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে এই সেবার ভাব আবার জাগ্রত না হইলে, এ সমাজ ধর্ম্মসমাজের দাবি বহুদিন রাখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ঘরের কথা লিখিয়া ভাল মন্দ দুইই হয়, তা জানিয়াও জীবনের শেষ ভাগে, এসকল কথা লিখিলাম। কোন অসভ্য থাকিলে ক্ষমাই হইব। সকলে আবার সেবার কথা ভাবি, তাতে কল্যাণই হইবে, এইতো বিশ্বাস।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

অমর কথা (৬)

পীড়িত

চুপে চুপেই সইব সখা,
দহন-দুখ-রাতি,
দাও না কেন দুখের বোঝা,
ল'ব আঁচল পাতি'।
বাজে বুকে বজ্রকঠোর
আগুন-ঢালা বাণ,
জানি সখা, তাও তোমার
ভালবাসার দান।
জানি ওগো তুমি আছ
নিত্য নূতন হ'য়ে,
দয়ার ঠাকুর, শান্তিধারা
যাচ্ছে সদা ব'য়ে।
তাইত গাই আনন্দগান,
সবার সাথে জাগি',
নিত্য ধেয়ান, নিত্য গেয়ান,
চরণসুধা মাগি।

ডুব্‌ল যবে দেহতরি
রূপ-সাগরে হায়,
তবুও আমি তোমার সখা,
পেলাম পরিচয়।

কত কিছু দুর্দ্দশা সংসারে! তার উপর আবার যখন স্বাস্থ্য হারিয়ে যায়, তখন কি ভীষণ পরীক্ষা! যতই আমোদ প্রমোদে গৃহ ভ'রে উঠুক না কেন, রোগীর সে আনন্দসম্ভোগ কোথায়? দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুম-কোমল শয্যাই পাত, কিন্তু নিদ্রা কোথায়? হউক না মানুষ দীন ভিখারী, হোক্ তার পাষাণশয্যা, আহা তবু তার কি শান্তিময়ী নিদ্রার গভীর আনন্দভোগ! হউক না নিত্য নূতন সুখকর রুচিকর আহারের সুব্যবস্থা, কোথায় ক্ষুধার উদ্রেক? দীন অন্ন শাকান্নও যে শ্রেয়! যদি ক্ষুধার সঙ্গে পরম আনন্দে সে অন্ন গ্রহণ করে, মানুষ কি পরিতৃপ্তি লাভ করে! হোক্ না কেন রাজপ্রাসাদ রাজ-আসবাব, মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণাসন—অসুস্থ জনের আরাম কোথায়? দীনের তৃণাসনও যে পরম আনন্দের কারণ! তার সুস্থ সরল দেহখানির কি আনন্দ আরাম সেখানে!

রোগের কি ভীষণ যাতনা! আহা কি ম্লান শুষ্ক মুখখানি তার! রুগ্নজনের কাতর দৃষ্টি কি বেদনাব্যঞ্জক! কার না প্রাণ তাতে আকুল হ'য়ে ওঠে! আহা রোগী শোকী কি কৃপার পাত্র! কি পবিত্রতার আদর্শ ছবি! তাইত রোগীর সেবার ভিতরে নিত্য পুণ্যসঞ্চয়!

হায়! হায়! এক দিন আমারও ত এ দশা হোতে পারে! কি কৃপার পাত্র হব কে জানে? তাই অপরের রোগশয্যার পাশে দাঁড়াতে চাই, তাই নিরাশ কাতর হৃদয়ে আশার বাণী শোনাতে চাই। রোগশয্যায় কত সাধ হয়, প্রিয়জনের সেবা ভালবাসার ভিতরই ভীষণ শয্যাও মধুময় হোয়ে উঠুক্। তাইত রুগ্ন জনকে ভাল বাস্‌তে চাই!

এত ব্যাধি কেন সংসারে? অভিযোগ প্রাণে কেবলই আসে। কেন পরিপূর্ণ মঙ্গল তোমার সংসারে, এ কঠোর বিধান? পরিপূর্ণ কল্যাণের ভিতর যদি আশৈশব মানুষ মাখামাখি হ'য়ে চল্‌তে পারে, তবে কই ব্যাধির নিষ্পেষণ? কত মানুষ ত সুস্থতার আনন্দ সম্ভোগ কোর্‌তে কোরতেই সহসা আনন্দে দেহত্যাগ ক'রে চলে যান—কোন ব্যথার অনুভূতি নেই তাঁদের, জীবন-প্রদীপের শান্ত নির্ব্বাণের অবসানেই আনন্দে কি মহানিদ্রা!

কেন এত ব্যাধি কে জানে! হয়ত বা পিতা পিতামহের রোগের বীজাণু বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হোল, আর তারই ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হ'য়ে ব্যর্থ জীবনভার বইতে হোল, জীবাত্মার আনন্দ বিকাশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল না। কত ব্যর্থ নিয়মভঙ্গের ভিতর কত যুগ যুগান্তরের রোগের বীজ দেহের ঘরে জমে ওঠে! ক্ষণিক ব্যক্তিগত লালসা, আত্মবিস্মৃতি, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে সংসারে! এ দেহ ত দেবতার দান। এক দিন এ দানের অধিকার শেষ হবে। জীবাত্মা এই দেহযন্ত্রের বিপুল সাহায্যে, এ রূপের দেশে, কত মঙ্গল কর্ম্ম সাধনের ভিতর নব নব ভাবে ফুটে উঠ্‌বে, তাইত রূপখানির এত আয়োজন! তুচ্ছ অন্যায় পাপের জন্য কত শাস্তিভোগ! অতি ক্ষুদ্র নিয়মভঙ্গের জন্যও কত অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল ভোগ কোর্‌তে হয়। এমনি কোরেই ত পরিবারে মানবসমাজে কত অকাল মৃত্যুর আয়োজন হোচ্ছে! দেবস্বভাব মানুষের সময়মাদির তাচ্ছিল্যতায় বংশপরম্পরায় কি নরকযাতনা ভোগ কোর্‌তে হয়! পিতৃ-পিতামহের ক্ষণিক অসাবধানতার ফলও যে ভবিষ্যতে ভোগ কোর্‌তে হয়! তাইত কেবলই সতর্কতার বাণী। সাবধান! সাবধান! জীবনপ্রভাতেই সাবধান।

ঘরে ঘরে কত করুণ দৃশ্য! তবু কি চেতনা জাগ্রত হয় না? তবু আত্মসংযমের পুণ্যদীক্ষার ভিতর দেহমন আত্মাকে পবিত্র কোর্‌বে না মানুষ! তবু কি প্রতিবাসীর, আত্মীয় স্বজনের, প্রাণে সে পবিত্রতার আলো জ্ব'লে উঠ্‌বে না! কেবল তুচ্ছ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগে মরণ-পথে এগিয়ে চল্‌বারই ব্যবস্থা হবে সংসারে? হায়! হায়! কি বিষময় ফল!

রোগীর কাছে কে আস্‌তে চাও? এস, শান্ত হ'য়ে সান্ত্বনার কোমল করুণ বাণী শুনিয়ে যাও। ভালবাসার আনন্দ আহ্বানেই এস। ভালবাসায় গদ গদ হ'য়ে যদি সেবা কোর্‌তে পার, এস। আহা! বিশ্ব-উদার প্রেমিক ভক্ত প্রাণ কেমন ক'রে কুষ্ঠ রোগীকেও বুকে টেনে নেন্! এ কি ভাবে দয়া, মানবে সেবা! এইত বিশ্বপ্রেম। ক্ষুদ্র মানুষ আমাদের তা ধারণা কর্‌বার শক্তি কোথায়? ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্ত সংসারে কোন বিশেষ কর্ম্ম না কোরতে পারে, তবে নীরবে পীড়িত জনের শয্যাপাশে সহানুভূতি ত প্রকাশ কোরতে পারে! দুটী মিষ্ট কথাও তার নির্ব্বাপিত জীবনে আশার আলো হয়ত ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে! রুগ্ন হ'য়ে দিনের পর দিন কাটে, কই কেউ ত কাছে আসে না, আশার কথা, ভালবাসার কথা শুনতে পাই না! কে কাকে সাহায্য কোরবে? পথে পথে কত রুগ্ন জনের আর্ত্তনাদ! কে তুমি ধনবান বিধাতার পরমদানের অধিকারী, এস, রোগীর রোগযাতনা উপশমের ব্যবস্থা করবার আয়োজন কর—ধন্য হোক্ রত্নাগার।

কে বোঝে সে কথা? যা কিছু পাই সবই বিশ্বের পাই, যা কিছু দিই সবই বিশ্ব কাছে সঁপে দিই, সবই মঙ্গলময়ের মঙ্গল-বিধানই মেনে চলা। কত ক্রন্দন! কত হাহাকার! কে সেবা করে, কে সান্ত্বনা দেয়, কে পথ্য দেয়? কত প্রিয়জন বুক খালি ক'রে চোলে যায় সেবার অভাবে! কি মর্ম্মভেদ যাতনা বোঝে কে? কে দেবে উদার দান? কোথায় সে বিশ্বপ্রেম? দুঃখীর ঘরে এক মুষ্টি অন্ন মেলে না, রোগে পথ্য মেলে না, অথচ জগতের বুকে কত আমোদ প্রমোদসম্ভার, কত রঙ্গাভিনয়, কত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের আয়োজন! এ কি রহস্য জগতে! কত সলজ্জ প্রাণ দারিদ্র্যের ভীষণ পীড়নে নিষ্পেষিত! তবুত পারে না তার রিক্ত ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে! কে বোঝে সে বেদনা? ধন্য দয়ালু ধনী, যদি পার দাতব্য ভাণ্ডার খুলে দাও, উচ্চবংশের গৌরবমহিমা ফুটিয়ে তোল. ধন্য হোক্ তোমার করুণার দান।

অতীতের ইতিহাসে কত আতিথ্যের আয়োজন, কত আতুরের নিত্য সেবা! কই এখন নিত্য সেবা? কই এখন সে পুণ্য ব্যবস্থা? যদি সে পুণ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, কি অক্ষয় অমর কীর্ত্তিতে ধনীর মহা মাহাত্ম্য লাভ হয়! কেবল বিলাসসম্ভোগে

সে আনন্দকীর্ত্তি কোথায় পাবে মানুষ? কত কৃতজ্ঞ হৃদয় দাতার চরণে নিত্য অঞ্জলি নিবেদন করে! সে জয়ধ্বনি লোক লোকান্তরেও কেমন রণিত হ'য়ে ওঠে, কে জানে? আসুক সে অতীতের পুণ্য প্রতিষ্ঠান এই ভোগ বিলাসের দিনে, আসুক আবার সে বিশ্বপ্রেমের মঙ্গল অনুপ্রেরণা, ভক্ত আঢ্য জনের দেবলব্ধ ধন দেবসেবায় উৎসর্গীকৃত হউক।

কেমন ক'রে এ জীবনযাত্রায় পরস্পরকে শ্রদ্ধাদান করি? হয়ত সুদিনে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, দুর্দ্দিনে কই সে প্রাণবিনিময়? কই শত্রু মিত্রে সম জ্ঞান? কই শত্রুকে প্রাণ খুলে ক্ষমা কোরতে পারি? কত সাময়িক উত্তেজনায় পরস্পরে কি ব্যবধান রচনা ক'রে ফেলি! পারি কি ক্ষমার শান্ত মন্ত্রে নত হ'য়ে বিদায়-মঙ্গল ভিক্ষা কোরতে? তাইত এ অশান্তি সংসারে! জানি না কবে ক্ষমার উদ্বোধনে মানুষ শান্ত হবে, নত হবে।

ঐ যে অমুক তার শেষ শয্যা পেতেছে, চলেছে চিরবিদায় নিয়ে, তবু কি পারি কল্যাণকামনা কোরতে? মৃত্যুর পরপারেও কি এই প্রাণের বিক্ষোভ দীর্ঘনিশ্বাস জেগে থাকবে? কই সে অনন্ত বিশ্বাসে বিনত নম্র হৃদয়, কই আত্মনিবেদন? কি চাই? চাই কি অনন্ত সুপ্তি? অসংখ্য প্রাণ ত আসছে যাচ্ছে, তবে কেন মৃত্যুভয়? প্রতিদিনই নিদ্রাবেশ, দেহ অবশ হ'য়ে পড়ে, কে জানে আবার জাগরণের গান কেমন ক'রে দিকে দিকে গেয়ে উঠবে! আত্মার সে মহানিদ্রা কেমন? এ কি মহাজাগরণের আয়োজন! অনন্তবুকে মৃত্যুমঙ্গলবাসরে অনন্ত মিলন-উদ্বোধন। কত সময় হয়ত ভীষণ ব্যাধির পীড়ন হোতে মুক্ত হই! কিন্তু তাতেই কি অনন্ত মুক্তি? এক দিন ত যেতেই হবে। এই কুহক স্বপ্নলীলা এক দিন ত ফুরিয়ে যাবেই যাবে। কে জানে কোন্ নিত্য চেতন-লোকে জেগে উঠ্‌ব? ছুটতেই হবে চির-কল্যাণসাধনায়, সেই মঙ্গলবাণী শুন্‌তেই হবে। সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, নিষ্ঠার আনন্দব্রতে ব্রতী হোতেই হবে। মহাযাত্রার আনন্দব্রতে ব্রতী হোতেই হবে। মহাযাত্রার আনন্দ প্রস্তুতি প্রতিদিনের যাত্রায় হোল কি? কোথায় তবে অনন্ত নির্ভর, অনন্ত আশা?

যদি সকালে সন্ধ্যায়, সকল কর্ম্মে সকল ধর্ম্মে, আমার মহা-যাত্রারই প্রস্তুতির আয়োজন হয়, তবে কোথায় ভয় ভাবনা? বিধাতার দান ভোগ করি, এ যে ন্যায্য অধিকার। জীবনের প্রতি ঘটনা তাঁরই ব্যবস্থা, তাইত নিত্য বরাভয়স্বরূপে সকল ঘটনার ভিতর মঙ্গল বাঁশরি বেজে ওঠে! হে বিশ্বমঙ্গল, অনন্ত মঙ্গল, এম্‌নি ক'রে ক্ষুদ্র থেকে মহানে, ঊর্দ্ধে, তোমারই দিকে ছুটতে চাই। তোমারই হে'তে দাও, মৃত্যুর চির মঙ্গল ছবি আমার সহায় হউক যাত্রাপথে, আমার সে শান্ত নিয়মিত জীবন বরণীয় হউক। এমনি কোরেই পরম প্রতিষ্ঠা দান কর ভক্তজীবনে, তাঁদের উদার প্রেমিক হৃদয়খানি দীন দুঃখী পীড়িতের চির সান্ত্বনাস্থল। কই এ ক্ষুদ্র শক্তির সে কল্যাণ সাধনা?

ওগো পিতা, এস আমার
নিত্য আরাম-গেহ,
শোকে দুখে তপ্ত বুকে
শান্তিসুধা দেহ।

রোগের মাঝেই নিত্য লীলা
পেলাম তোমার বরে,
বেদন-রাঙা দহন-দুখ
ডাক্‌ছে সবে ঘরে।
সকল দুখে রোগে শোকে
ভালবাসার গান,
বাজ্‌ল ও কি বুকের ঘরে
সখার মধুর তান?

(২)

ভক্ত বুকে জাগ্‌ছে বাণী
শান্তিসুধা-ধাম,
জুড়িয়ে যাবে ঐ গানেতে
বুক-জুড়ানো নাম।
নিবিড় ব্যথা আকুল করে
দহন-দুখ-রাত,
ঐ গানেতেই জুড়িয়ে গেল
করুণ নয়নপাত।
দুখের মাঝেই নিয়ে এলে
পারিজাতের হার,
চোখের জলেই নাম্‌ল বুকে
মন্দাকিনী-ধার।

(৩)

আশার গানে সখা আমার
বুকের ঘরে রাজে,
প্রেম কখনো ফুরোবে না,
প্রাণের তারে বাজে।
আসুক না মোর রোগ শোক
পরাণ-পাখী জাগে,
প্রেম-লগনে উঠ্‌ব গেয়ে
নিত্য মধুর রাগে।
ধন্য তুমি প্রেমের ঠাকুর,
ধন্য মম গান,
সইব সখা, ভাল মন্দ
তোমারইত দান।

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২০)

সঙ্গীতে আছে "তাঁর কাছে খাঁটি হ'য়ে, থাকরে তুমি নির্ভয়ে, বিশ্বাসের দুর্গে ব'সে বল জয় জয় দয়াময়"। তাঁর কাছে খাঁটি হ'য়ে থাকতে পারলে আর কোন ভয় ভাবনা থাকে না, তাহা ত ঠিক কথা। কিন্তু চারিদিকের আন্দোলন আলোড়নে মন চঞ্চল হইয়া উঠে। আমাদের সজন উপাসনা অতীব কল্যাণকর হইলেও,

সময় সময় তাহাতে বিঘ্ন আসে। কথায় এমন কিছু থাকে, মন তাতে সায় দিতে চায় না। তখন ইচ্ছা হয়, এ সব হ'তে দূরে প'ড়ে থাকি। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সংগীতের অনুরূপ কথা মনে আসে। তাঁর কাছে খাঁটি হ'য়ে সুস্থির চিত্তে নিরাপদে বাস কর, ইহাই সার কথা। পারিলে, এমন নিরাপদ অবস্থা আর নাই।

(২১)

মানুষে মানুষে মনের ভিন্নতা, রুচির ভিন্নতা, জ্ঞান ও আশা আকাঙ্ক্ষার ভিন্নতা কত! সমভাবের লোক কোথায় পাওয়া যায়? ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত বাস করিয়া মন উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তখন মনে হয় কোথায় নিরালা গিয়া বাস করি। এরূপে বিরক্ত হইয়া মনকে কোনও মতে প্রবোধ দিয়া, আত্মগোপন করিয়া, থাক্‌তে গেলে অনেক সময় ক্ষতিও হয়। কি যে উপায় বুঝা যায় না। সমভাবের লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? যাদের সহিত প্রধানতঃ সব বিষয়ে মিল হয়, এমন সঙ্গ কোথায়? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি কেন হয়, কে তার রহস্য-ভেদ করিবে? আমার প্রকৃতি কেন এমন হইল, কোন বিষয়ে প্রায় কাহারও সঙ্গে ঐক্য হয় না? বাহিরের মোটা মোটা বিষয়েই মিল হয় না। ভিতরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের ত কথাই নাই। কেন এমন হইলাম? আত্মীয়গণ হইতে, সহৃদয় সুহৃদ্‌গণ হইতে, কেন মতে ভাবে কার্য্যে ভিন্ন হইয়া পড়িলাম? এরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্জ্জনে বাস করি বাহিরে, তার মত সহিষ্ণুতা অন্তরে ত নাই। সহজে মন ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া পড়ে। অথচ লোকের সাহায্য সহানুভূতিরও একান্ত কাঙ্গাল হইয়া আছি। তাহার জন্য আকুল! কি যে হইবে, উপায় যে কি আছে, তাহা কে জানে? প্রভু সকল আপদ বিপদের মধ্যেই সুব্যবস্থা করিবার কর্ত্তা। তিনি তাহা করিয়াছেন বহু। এখনও তিনিই ভরসা। তাঁহার উপরই যেন নির্ভর থাকে।

(২২)

মানকে যদি বেশী ক'রে চাই, সুখপ্রিয়তা যদি প্রবল হইতে থাকে, আদর সমাদরের প্রত্যাশী হই, সহিষ্ণুতার যদি অভাব হয়, তবে আর কোথায় স্থান পাইব? কেমন করিয়া জীবন যাপন করিতে সুযোগ পাইব? নানা দিক হইতে নানা প্রকারের আঘাত আসিবেই। আঘাত যখন দিতে পারি, তখন তাহা ফিরিয়া পাইবই। তাহাকে সহিয়াই লইতে হবে। তাহা ভিন্ন আর কি রূপে বাঁচা যায়?

(২৩)

প্রভু, নিরাপদ অভয়-দুর্গ কোথায় আছে? সে নিরাপদ অভয়দুর্গের পথ দেখাইয়া দেও এবং সেই দুর্গেই লইয়া যাও। তুমিই সেই অভয়দুর্গ! তবে তোমাতেই স্থান দেও। অশান্তকে শান্ত কর। সহজে চঞ্চলচিত্ত হইয়া আছি। এ অধীরকে তুমিই ধীরতা দেও। অতি দীন, অতি হীন, অতি ক্ষীণ আমি। আমি যে কি তাহা তুমিই জান ভাল। আমি আর কি জানি? তুমি প্রভু গতি কর। শান্ত হইবার, তোমার হইবার, নির্ভর নিরুদ্বেগ হইবার, সন্ধান বলিয়া দেও।

(২৪)

প্রেমময় শুদ্ধ সুন্দর পরমেশ্বরের সঙ্গে ত সকলকেই থাক্‌তে হইতেছে। তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন জীবের আর থাকিবার স্থান কোথায়? তাঁহার নিত্য মঙ্গল ক্রোড়েই বাস করিতেছি। তবে আমাদের এত হাঁহাকার কেন? অজ্ঞতা, অন্ধতা, অনুভূতির অভাবই এ বিপত্তির কারণ; তাই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ধ্যানযোগে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিলেই নিরাপদ হওয়া যায়। সাধন ভজনের সেই প্রয়োজনীয়তা।

(২৫)

সংগীতে আছে—"তব প্রেম-নিকেতনে, দেখ ব যত সাধুগণে"। পিতার প্রেমনিকেতনে কি সাধুগণই বাস করেন? অপর যাহারা সাধু তেমন নয়, তাদের থাকিবার স্থান কোথায়? পিতার প্রেম-নিকেতন ছাড়া কি আর একটা থাকিবার স্থান আছে নাকি? তাহা হইলে ত নরক নামক কোন স্থান আছে মানিতে হয়। তাহা কেমন করিয়া মানিব? পুণ্যময় শুদ্ধ সুন্দর আনন্দময় যে সর্ব্বত্রই আছেন। নরক অন্ধকারময় দেশ, আনন্দহীন দেশ। তাহার আর অস্তিত্ব কেমন করিয়া মানিব? সেরূপ স্থান নাই। আর যদি শুধু সাধুরাই প্রেমনিকেতনে থাক্‌বার অধিকারী, আমি সেই প্রেমনিকেতনের ভিতরে যাইবার জন্য কেমন করিয়া প্রার্থনা করি? আমার কি সে প্রেমনিকেতনে প্রবেশের অধিকার আছে? আমি ত সাধু নই। তবে আমার এ সাধ কেন? আমার যদি প্রেমনিকেতনে স্থান না হয়, অসাধুর যদি সেখানে স্থান না হয়, তবে তাহা প্রেমনিকেতন নয়। প্রেমনিকেতনে সকলেরই স্থান আছে।

(২৬)

অনেক পাইবার আছে, তাহার ত পরিমাণই হয় না। তিনি দান করিতেই ইচ্ছুক, তাহা হইলেও যে সকল সময় সকল সম্পদ পাই না বা লোকে পায় না, তাহার কি হেতু আছে? দৈন্য এবং অভাব সর্ব্বদাই আছে এবং দানশীলতা আমাদের পিতাতে বর্ত্তমান। তবে দৈন্য যায় না কেন, সকল সময় পাওয়া যায় না কেন? এই প্রকারের প্রশ্নের উত্তরে অনেক প্রকারের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। তাহার মধ্যে একটী এই যে, দান পাইবার উপযুক্ত না হইলে দান পাওয়া যায় না। প্রলুব্ধ জন লোকের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই সে পায় না। পাইবার উপযুক্ততা লাভ করিতে হয়। যে দান পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করে না, দানের মর্য্যাদা ও গৌরব জানে না, সেও তাহা পায় না। এ জন্য পাইবার উপযুক্ত অবস্থাতে যাইতে হইবে, তবেই পাইয়া ধন্য হওয়া যাইবে। প্রভু, আমাদিগকে সেই পাইবার অবস্থাতে লইয়া যাও। পাইয়া যাহাতে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারি, আমাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া যাও।

(২৭)

ফুলের সৌরভ আপনা হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। ফুল যদি নিজে সৌরভ দান না করিত, যদি আপনা হইতেই চারিদিকে সৌরভ ছড়াইয়া না পড়িত, তবে কে এমন আছে যে, সেই সৌরভকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত বা উপার্জ্জন করিতে পারিত? সে সৌরভ আপনা হইতে বিকীর্ণ

না হইলে তাহা খুঁজিয়া উপার্জ্জন করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। ফুল নিজে দেয় বলিয়াই আমরা তাহা প্রাপ্ত হই। এখানে যেমন দেখা গেল, তেমনি দাতা দয়ালু প্রভুর ব্যবহারেও দেখা যায়। তিনি যদি তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি আপনাতে আবদ্ধ রাখিতেন, কে তাহা অন্বেষণ করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিত? দাতা দয়ালুই দিবার জন্য ব্যগ্র আছেন, তাঁহা হইতে মহা সম্পদসমূহ বিকীর্ণ হইতেছে—তাই তাঁর সন্তানেরা তাহার সন্ধান পাইতেছে এবং পাইয়া কৃতার্থ হইতেছে। ফুলের সৌরভ বরং দান করিয়া করিয়া ফুরাইয়া যায়—দয়ালুর ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ ভাণ্ডার, তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্পদসমূহ অফুরন্ত, তাই চির দিনই লোকে তাহা পাইতেছে। নাসিকাকে অবরুদ্ধ রাখিলে যেমন সৌরভ পাওয়া যায় না, তেমনি পাইবার আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে, পাইবার জন্য উৎসুক না হইলেও, পাওয়া যায় না। দাতার দানের ইচ্ছা নিয়ত বর্ত্তমান আছে; তাহা হইলেও পাইবার ইচ্ছা করিতে হয়, পাইবার জন্য উৎসুক হইতে হয়। প্রভু, সেই ইচ্ছা সতত আমাদিগের প্রাণে চির জাগ্রত করিয়া রাখ।

(২৮)

"সার্থক জনম মা গো জন্মেছি এ দেশে"—যখন এ সংগীত লোক-মুখে শুনি, তখন মনে হয় এ দেশের লোকের এ সংগীত গানের সার্থকতা কি? এ দেশে এমন কি আছে যে জন্য বলিতে পারা যায়—"সার্থক জনম মা গো জন্মেছি এ দেশে"। এখানে দেখি নিত্য হাহাকার বর্ত্তমান। অপমান, পরাজয়, লাঞ্ছনা, সবই ত আছে এ দেশে; দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগ লাগিয়াই আছে। তবে কেন উক্ত গান গাওয়া হয়—কি আছে এ দেশে এমন? তখন মনে হয়, এ দেশে এমন কিছু আছে যাহা অন্যত্র নাই—যার জন্য এদেশ ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, সকলের উপরে যার জন্য এ দেশ স্থান পাইয়াছে। সে হইতেছে—ব্রাহ্মধর্ম্ম। এমন মহা সম্পদ যে দেশে আছে, সে দেশইত ধন্য ও গৌরবান্বিত। অন্য দেশে জন্ম গ্রহণ করিলে কি হইতাম জানি না,—হয়ত বা পার্থিব ধন সম্পদে সম্পদবান হইতে পারিতাম, হয় ত বেশী বিদ্যা বুদ্ধি পাইতে পারিতাম, হয় ত লোকমান্য হইয়া ক্ষমতা ও ধনৈশ্বর্য্য পাইতে পারিতাম। এ প্রকার বহু সম্পদ পাইলেও এ দেশ হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহা অন্যত্র পাইতাম কি না কে জানে? এ দেশে জন্মিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের সংবাদ পাইয়াছি, বিদ্যা বুদ্ধিতে হীন হইয়াও এমন কিছু পাইয়াছি যাহার তুলনা হয় না। জগতে ইহাপেক্ষা পরম সম্পদ আর কি আছে? তাই উক্ত গান সার্থক হইয়াছে। অদ্যকার দিনে ইহা বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া মন প্রফুল্ল হইতেছে।

(২৯)

মানের ভিখারী হইয়া অনেক কাল কাটিল। মান মর্য্যাদা সকলের জন্য প্রার্থনীয় নহে। তাহাই পথের কণ্টক হইয়া লোকের বিষম শত্রুতা করে। আমার পথে সে সব কণ্টক কম বাধা দেয় নাই। অযোগ্য হইয়াও অনেক মান মর্য্যাদা পাওয়া গিয়াছে, তাহা না পাইলেই ভাল হইত। সে সবই যেন এখন প্রার্থনীয় হইয়া আছে। প্রভো, এ সকল লইয়া আর ভুলিয়া থাকিতে দিও না। তোমার করিয়া লও। তাহাই আমার জন্য এবং সকলের জন্যই আবশ্যক। তাহাই কর। তোমার হইয়াই সুস্থ ও ধন্য হই। ভয় উদ্বেগের অতীত হই। তুচ্ছ যাহা তাহার পশ্চাতে আর ছুটিয়া ছুটিয়া হয়রাণ হইতে দিও না।

(৩০)

নানা দিক হইতে ব্রাহ্মসমাজের কেবলই পরাভব ও পতনের বার্ত্তা আসিতেছে—কেবলই ভাঙ্গার সংবাদ, অকৃতকার্য্যতার সংবাদ আসিতেছে। কেন এমন হইল? কাহার অপরাধের এ ফল? বিধাতা কি ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন? আমাদের অপরাধে কি তাঁহার অভিপ্রায়ের অন্যথা হইবে? তিনি যে তাঁহার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাদ্বারা কল্যাণ সাধন করিতেই চান! তিনি যে তাঁহার পূজাপ্রতিষ্ঠাদ্বারা আমাদিগকে তাঁহার করিতে চাহেন! তবে এমন হইতেছে কেন? প্রভো, এ রহস্য ভেদ করিয়া আমাদিগকে সত্য জ্ঞান দেও। সকল অবসাদ ও পতন হইতে এ মণ্ডলীকে রক্ষা কর। তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

একোনশততম ভাদ্রোৎসব

প্রেমময় উৎসব দেবতার কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে একোনশততম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

৪ঠা ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) রবিবার—প্রাতে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন্ নগরে মাসাধিককাল ব্যাপিয়া কিরূপ আত্মচিন্তা, আত্মপরীক্ষা, আকুল প্রার্থনা প্রভৃতির দ্বারা ব্রহ্মোৎসবের জন্য সকলে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং তাহাতে কি প্রকার ফললাভ হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া, কি ভাবে এই উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহা তিনি বিশেষ ভাবে তাঁহার উপদেশের মধ্যে বিবৃত করেন। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় মহিলাদের সম্মিলন। তাহাতে শ্রীমতী সুশীলা বসু উপাসনা, শ্রীমতী মণিকা মহালানবীশ সভানেত্রীর কার্য্য, এবং শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য, শ্রীমতী সুদেবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, ও শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায় "ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রাহ্ম মহিলাদের কর্ত্তব্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভানেত্রীও লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। সায়ংকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ৬ই ভাদ্র তারিখের গুরুত্ব ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার বিশ্বজনীন ভাব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) সোমবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী ও ব্রহ্মকৃপা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "ভারতের ধর্ম্মধারা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) মঙ্গলবার—উৎসবের বিশেষ দিন। প্রাতে জোড়াসাঁকো আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের সম্মুখস্থিত কমললোচন বসুর বাটীর নিকট হইতে উষা-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস প্রার্থনা করিলে পর, কীর্ত্তন করিতে করিতে অপার চিৎপুর রোড, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, বলরাম দে ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, মাণিকতলা স্পার-জেলিয়া টোলা রোড, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, সিমলা ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি প্রথম শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের উল্লেখ করিয়া, দ্বিতীয় শতাব্দীতে যাহা করিতে হইবে বিশেষ ভাবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেন। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সামাজিক উপাসনাই যে ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যের প্রাণ, সকল শক্তির মূল, সে বিষয়ে তিনি উপদেশ প্রদান করেন।

৭ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) বুধবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি পূর্ব্বকার কয় দিবসের উপদেশের উল্লেখ করিয়া সামাজিক উপাসনাকে অধিকতর ফলপ্রদ করিতে হইলে কি করিতে হইবে, সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সায়ংকালে 'সামাজিক উপাসনা' বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম এবং শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহও আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলেন। অনেকে সামাজিক উপাসনাতে না আসাতে যে ক্ষতি হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া, তাহা বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে সভাপতি মহাশয় সকলকে আগ্রহ-সহকারে অনুরোধ করেন।

এতদ্ব্যতীত ৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) বৃহস্পতিবার আলবার্ট হলে তিন শাখার মিলিত উৎসব হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্বোধনের, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আরাধনার ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপদেশের অঙ্গ সম্পন্ন করেন। অপরাহ্ণে মহিলাদের সম্মিলনে আলোচনা পাঠ প্রার্থনাদি হয়। শ্রীমতী মণিকা মহলানবীশ সভানেত্রীর কার্য্য এবং শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রভৃতি প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ভক্তবাণী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং পরে সংকীর্ত্তন হয়।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৩শে আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে প্রশান্ত রাও চারিটী সন্তান, বিধবা পত্নী, বৃদ্ধা মাতা ও বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজনদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ২৯শে আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-কুমার মিত্রের পত্নী হৃদ্‌রোগে ভুগিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২১শে আগষ্ট লক্ষ্ণৌ নগরীতে শ্রীযুক্ত নীলমণি ধরের পত্নী পরলোকগতা নির্ম্মলা ধরের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। জামাতা শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যা শ্রীমতী সরলা দত্ত প্রার্থনা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শর্ব্বরীকান্ত ধর মাতার জীবনী পাঠ করেন। প্রায় ৪০০ শত কাঙ্গালীদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয় ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রায় ১৫০ শত অনাথ বালক বালিকাদিগকে ভোজন করান হয়। এই উপলক্ষে পুত্রগণ নিম্নলিখিতরূপে ১০০৲ দান করিয়াছেন:—অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে, লক্ষ্ণৌ ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মিশন ফণ্ডে ৫০৲, দাতব্য বিভাগে ২৫৲, ও সাধনাশ্রমে ১৫৲ টাকা। শ্রীমতী ইন্দিরা সরকার মাতামহীর স্মরণার্থ জেনারেল ফণ্ডে ১০৲ দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২১শে জুলাই গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া বিমলার সহিত, গয়াপ্রবাসী পরলোকগত গঙ্গাপ্রসাদ মৈত্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান বিশ্বমোহন মৈত্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করেন।

দান—শ্রীমতী সরোজিনী সরকার, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এস্‌সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়াতে, শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ২৲ টাকা নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে ২৲, প্রচারফণ্ডে ২৲ বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ২৲, রাঁচি-ব্রাহ্মসমাজে ২৲, ও গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ২৲, দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক।

দেহভস্ম রক্ষা—পরলোকগত মতিলাল হালদারের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার কার্সিয়াংস্থিত বাড়ীতে তাঁহার নিজের, এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী হিমলতিকা হালদার, কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী স্নেহলতিকা হালদার ও ভাগিনেয় জ্ঞানরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এর ভস্মাবশেষ নব নির্ম্মিত উপাসনা-গৃহে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হয় এবং প্রতি আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে নানা বিভাগে ৫০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন।

গৃহপ্রবেশ—ঢাকুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। তাঁহার নবনির্ম্মিত পাকা বাটী প্রবেশ উপলক্ষে দুই দিন উৎসব অনুষ্ঠান হইয়াছে। গত ২৪ শে আষাঢ় উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং সুরেশচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ উদ্বোধন ও উপাসনাদি করেন এবং বাবু ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য সংগীত ও কীর্ত্তনাদি করেন। পরদিন বহু ব্রাহ্ম ও হিন্দু ভদ্রলোকদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হয়।

জাতকর্ম্ম—ঢাকুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ঘোষের নবজাত কন্যার জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত ৮ই শ্রাবণ প্রাতঃকালে উপাসনাদি হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে এই প্রথম অনুষ্ঠান। তিনি অনেক ত্যাগস্বীকার এবং গত ৪ বৎসর ধরিয়া অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি ললিত বাবুর হাতে ব্রাহ্মসমাজে কিছু দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দাসের মধ্যমা কন্যার ১ম পুত্রের [শ্রীমান অজিতকুমার ঘোষের ২য় সন্তান (জন্ম ১৯২৭, ৪ঠা জুন)] জাতকর্ম্ম উপলক্ষে শিশুর মাতামহের কাঁথিস্থ বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর মাতামহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১৲ দাতব্য বিভাগে ১৲ সাধনাশ্রমে ১৲ কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে ১৲ কাঁথি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ১৲ ও কাঁথি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

করুণাময় পিতা শিশুদিগকে সতত রক্ষা করুন।

কালীঘাট প্রার্থনাসমাজ—কালীঘাট প্রার্থনা-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে :—২৩ শে আষাঢ় সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত, প্রকৃত ভক্তি কি ও তাহার লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলেন। ২৪শে আষাঢ় সন্ধ্যায় উপাসনা ও সংকীর্ত্তন ; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং" এই সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ২৫ শে আষাঢ় সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রকৃত উৎসব ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

উৎসব—কুমিল্লা। গত ১২ আগষ্ট হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কুমিল্লায় গমন করিয়া উৎসবের উপাসনা এবং "ধর্ম্মসমাজে অধর্ম্ম ও উচ্চ সাধন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মিসেস্ মুক্তকেশী দত্ত মহিলাদিগের উৎসবে উপাসনা করিয়াছেন। উৎসবের মধ্যেই এক দিন সমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভ্যগণ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন ঘোষকে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। উৎসবে প্রতিদিনই রাত্রে অনেক ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া—গত ৪ঠা ভাদ্র হইতে ৭ই ভাদ্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় দুই দিন উপাসনা ও "বুদ্ধদেব" বিষয়ে কথকতা এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত দুই দিবস উপাসনা এবং "ভক্তি ও মুক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অমৃত বাবু আলোচনাসভায় উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, দেশের লোক "ব্রাহ্ম" নাম গ্রহণ করিতেছেন না বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত আদর্শ অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ দেশের মধ্যে, সর্ব্বজাতির পিতা একমাত্র নিরাকার অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা ও জাতিভেদের পরিবর্ত্তে উদার ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং নারীদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিয়া উচ্চ অধিকার প্রদান করিতে চাহিতেছেন। দেশের লোক জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ঐ তিনটি কার্য্যেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। প্রকৃত দেশের উন্নতি ঐ তিনটি কার্য্যের উপরই অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। উৎসবের মধ্যেই বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মেঘনাথ চৌধুরী সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কোন রকমে সমাজটিকে রক্ষা করিতেছেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উৎসব উপলক্ষে কুমিল্লা গমন করিয়া দশদিন সেখানে বাস করিয়াছিলেন। কয়েকদিন সকালে সন্ধ্যায় উৎসবমন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্তা কুসুমমালা দত্ত, শ্রীযুক্ত কালীকিশোর চৌধুরী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মুন্সেফ ও মিসেস্ কমনীয় সিংহের গৃহে উপাসনা, বালিকাদিগের ইংরাজী স্কুলে গল্প বলিয়া উপদেশ প্রদান এবং আরও কয়েকটি পরিবারের বালক বালিকাদিগকে একত্র করিয়া গল্প ও জীবন-চরিত্র বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অমৃত বাবু ব্রাহ্মণবেড়িয়া গমন করিয়া উৎসবে উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

ছাত্রীদের বৃত্তি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ আসাম হইতে ২০৲ টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম—বাসন্তী দাস, বিন্দুবাসিনী দেব, সুশীলা দেবী, বিয়েট্রীস্ এস্ ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দুসরা ভাগ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত টীকাকা হিন্দী অনুবাদ। লাহোর ব্রাহ্মসমাজ কী প্রচার-সমিতি দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ বা অনুশাসন অংশের হিন্দী অনুবাদ। এই অনুবাদকার্য্য অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাষা এমন সরল হইয়াছে যে, আমাদের ন্যায় হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকেও ইহা সহজে বুঝিতে পারে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ইহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সহায়তা হইবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। এই কার্য্যের জন্য লাহোর প্রচারসমিতি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

বন্যাপীড়িতদের সাহায্য

বোম্বে (গুজরাট), উড়িষ্যা (ভদ্রক) ও কাঁথিতে জল প্লাবনে সহস্র সহস্র লোক কিরূপভাবে গৃহহীন ও অন্নহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এই সকল স্থানে সামান্য সাহায্য ইতিপূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কর্ম্মী প্রেরণ করা আবশ্যক এবং বিগত বর্ষের ন্যায় অর্থের প্রয়োজন। বিগত বর্ষে আমরা প্রায় নয় হাজার টাকা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া কাজ করিয়াছিলাম। এইবারও তদনুরূপ কাজ করা আবশ্যক। অতএব সানুনয় প্রার্থনা, সকলে আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করুন। অর্থ আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট (৯২ নং আপার সারকুলার রোড) বা রিলিফ কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত (৯৫ নং গড়পার রোড) মহাশয়ের—বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়ের (২১১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) নিকট প্রেরন করিতে হইবে।

নিবেদক

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়
" কৃষ্ণকুমার মিত্র
" সীতানাথ দত্ত (সভাপতি, সাঃ ব্রাঃ সমাজ)
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (মেয়র)
" পার্ব্বতীনাথ দত্ত (সম্পাদক রিলিফ কমিটী)

শ্রী হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়
" ললিতমোহন দাস
" প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য
" হেমচন্দ্র সরকার
" ব্রজসুন্দর রায় (সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ)

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৭ই ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ

Registered NO 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ১লা আশ্বিন রবিবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১১শ সংখ্যা। 18th September, 1927. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

সন্তাপিত জনে?

আজিও উঠিছে তাপ, হয়নি বারণ,
আমাতেই আছে জানি লুকানো কারণ।
তাপিত চিত্তের সমাধানে,
ক্ষীণ ম্লান আত্মদৃষ্টি দানে,
কত দিবা বিভাবরী কাটিতেছে মোর;
পেয়েছি সন্ধান, তবু নাহি কাটে ঘোর!
ওঠে তাপ, পোড়ে মন, চিত্ত জ্বলে' যায়,
কালিমা জমিয়া ওঠে এ নিত্য আত্মায়!
বড় ভয় সাথী হ'য়ে যায় সাথে যদি,
ঘুচিবার নহে তবে, রবে নিরবধি।
চিরবন্ধু ওহে গুরু স্বামী,
জানি তো অদাহ্য আমি,
ভস্ম না হইয়া তবু জ্বলিব দহনে;'
এই কি শাসন তব সন্তাপিত জনে?

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তুমি আমাদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য কত ব্যবস্থাই করিতেছ!—অন্তরে যেমন নিয়ত তোমার মহান্ আদর্শ প্রকাশ করিতেছ, তেমনি বাহিরেও তোমার ভক্ত সন্তানদের জীবনে তাহা মূর্ত্ত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতেছ! তোমার কত সন্তানের নিকট যে আমরা কত ঋণী তাহার সীমা নাই। তথাপি আমরা তাঁহাদের কাছে ও তোমার নিকটে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না, সে সকল সুযোগের সম্যক্ ব্যবহারও করি না। বিশেষ ভাবে তোমার যে দুই সন্তানের নিকট হইতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদের পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক সময়ে আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি বটে, কিন্তু তুমি জান তাহা কত অকিঞ্চিৎকর। আমরা তোমার সে দানের যদি সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্নশীল হইতাম, তবে জীবনে তাঁহাদের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া ত কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিতাম না। এত পাইয়াও যে আমরা নিতান্ত উদাসীন ভাবেই জীবনযাপন করিতেছি—সংসারের নানা ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াই মত্ত রহিয়াছি! তাঁহাদের মহা ত্যাগের এক বিন্দুও জীবনে আয়ত্ত করিতে সেরূপ আগ্রহান্বিত হইতেছি না! হে জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু ও কর্ত্তা, আমরা যে তোমার প্রদত্ত এই অমূল্য জীবনের কিছুই সদ্ব্যবহার করিতেছি না, তাহা ত তুমি দেখিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে বল ও শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, আমরা তোমার প্রদর্শিত কল্যাণ ও মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। আমাদিগকে আর ক্ষুদ্রতা ও অসারতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে দিও না। আমাদের সকলকে তোমার উপযুক্ত সন্তান করিয়া লও, তোমার পবিত্র ধর্ম্মকে আমাদের জীবনে ও সমাজে গৌরবান্বিত কর। আমাদের জীবনে তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক, তোমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক।

নিবেদন।

তাঁর কাছে—তুমি যে তোমার "আমিত্ব" নিয়ে ব'সে আছ—কে তোমাকে ডাক্‌ল না, কে তোমাকে অপমান কর্‌ল, কে তোমাকে আদর কর্‌ল না, তা ভাব্‌ছ—তুমি কি তাঁর

আহ্বান শোন নাই? তিনি যে তাঁর কাজে তোমাকে ডাক্‌ছেন! মানুষ তোমাকে চায় না তাতে তোমার কি? তুমি প্রভুর দাস, প্রভুর কাজ কর্‌বে, তাঁর কাজে আপনাকে দিয়ে দিবে। যেখানে "আমি" সেখানে "তিনি" ত আসেন না! "আমি"কে বিলয় কর। করুক অন্যে তোমার অনাদর, করুক অন্যে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার, অন্যে তোমার মূল্য না বুঝুক, তাতে কি আসে যায়? তুমি যে প্রভুর ডাক শুনেছ, তাঁর কাজে ত তোমাকে আস্‌তে হবে। তুমি কেন "আমি" "আমি" ক'রে ঘুরছ? এ ত জীবনের পথ নয়; মৃত্যুকে ডেকে এন না। তাঁর কাজে লেগে যাও; তাঁতে চিত্ত রেখে, তাঁর নাম গেয়ে, তাঁর কাজ ক'রে যাও—তাতেই জীবন, তাতেই অমৃতত্ব লাভ।

মানুষকে বিশ্বাস কর—দশজনে বলে, মানুষকে সহসা বিশ্বাস ক'রো না—আগে সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌বে, পরীক্ষা ক'রে বিশ্বাস কর্‌বে, নতুবা ঠক্‌তে হবে। আমি বলি, সংসারের এই বিজ্ঞতার কথা মেনে চ'লো না। মানুষের ভিতরে ব্রহ্ম রয়েছেন, মানুষ তোমার ভাই; ভাইকে যদি বিশ্বাস কর্‌তে না পার, তবে দাঁড়াবে কোথায়? তাতে মধ্যে মধ্যে ঠক্‌তে হ'তে পারে; কিন্তু ঐ ঠকাতে লাভ আছে, বিশ্বাস কর্‌তে যেয়ে যদি ঠক্‌তে হয়, তবুও আরও বিশ্বাস কর্‌বে। অবিশ্বাসে যে মৃত্যু—অবিশ্বাস কর্‌তে কর্‌তে চিত্ত বিকার-প্রাপ্ত হয়! জীবনের মাধুর্য্য চ'লে যায়; সরলতা থাকে না, প্রেম শুকিয়ে যায়। বিশ্বাসের অবমাননা যদি কেহ করে, তবুও বিশ্বাস কর্‌বে; আরও প্রেমে তাকে আলিঙ্গন কর্‌বে; প্রেম দিয়েই অপ্রেমকে জয় কর্‌বে; বিশ্বাস দিয়েই অবিশ্বাসকে জয় কর্‌বে। ব্রহ্ম আছেন, হৃদয়ে হৃদয়ে তিনি জাগ্রত আছেন; বিশ্বাস ক'রে যাও, প্রবঞ্চিত হ'লেও তার ভিতরে অমৃতের সন্ধান মিল্‌বে।

অপ্রেমেও প্রেম—প্রেমের পরিবর্ত্তে প্রেম সকলেই দেয়, কিন্তু যেখানে অপ্রেম, যেখানে উপেক্ষা, যেখানে বিদ্বেষ, সেখানেও প্রেম দিবে। যে আঘাত করে তাকেও আলিঙ্গন কর্‌বে। লোকে বলে প্রেমের জয় হয়; প্রেম কর্‌লে, এক দিন সে এসে বিদ্বেষ ভুলে প্রেমের হাতে আত্মসমর্পণ কর্‌বে। সে একদিন আস্‌বে, এই ভেবেই যে প্রেম দিতে হবে, তা নয়। সে যদি নাও আসে, তবুও প্রেম দিতে হবে। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও যদি সে বিদ্বেষ পোষণ করে, তবুও চির দিন সমান ভাবে প্রেম দিতে হবে। এই অপ্রেমের মধ্যেই যে প্রেম দিতে পারা, ইহাইত প্রেমের জয়। সে যদি ফিরে আসে, তাতেই যে কেবল প্রেমের জয় হলো, তা নয়; সে যদি চিরদিনই ব্যথা দেয়, অপমান করে, তবুও যে প্রেম দিতে পারা, এখানেই প্রেমের জয়। প্রেম কখনও পরাজিত হ'তে পারে না। আমার প্রিয়তম যিনি, তাঁর প্রেমও এই রূপই। আমাকেও এই রূপ ভাবেই প্রেম দিয়ে যেতে হবে।

সম্পাদকীয়।

পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবরক্ষা—পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সকল দেশে ও সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে যত দীর্ঘকালাগত গৌরবান্বিত পূর্ব্বপুরুষশ্রেণীর নাম করিতে সমর্থ, সে তত অধিক সমাদৃত ও সম্মানিত। ইহার বিকৃতি হইতে বহু সমাজে নানা প্রকার কুফল উৎপন্ন হইলেও, এই স্বাভাবিক ভাবটা যে বিশেষ কল্যাণেরই কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই—ইহা উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সাহায্যই করিয়া থাকে। পূর্ব্বগৌরবস্মরণে অহঙ্কৃত বোধ না করিয়া, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সর্ব্বত্রই মানুষ সাধারণতঃ সে জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হইয়া থাকে—আপনার জীবন ও চরিত্রদ্বারা সে গৌরবকে কোনও প্রকারে খর্ব্ব করিতে লজ্জাই বোধ করে। শুধু আপনার অপেক্ষা পূর্ব্বপুরুষদের সুনামরক্ষা বিষয়ে যে লোকের মধ্যে অধিকতর আগ্রহ রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু আপনার মুখে কালিমা লেপন করিতে মানুষ যতটা না লজ্জিত হয়, পূর্ব্বপুরুষদের শুভ্র যশকে মসীলিপ্ত করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক সঙ্কুচিত হয়। এই জন্যই দেখা যায়, যাহাদের পশ্চাতে একটা গৌরবময় ইতিহাস রহিয়াছে, তাহাদের উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়া যেমন সহজ ও অবনতির দিকে ধাবিত হওয়া যত কঠিন হয়, অপরের পক্ষে কখনও ততটা হয় নাই। ইহা যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও সত্য। এ দেশে জাতীয় জীবন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাই জাতীয় জীবনে ইহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। নূতন জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে অপর দেশের অনুকরণে সামান্য কিছু চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। তাহা যে সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে, এরূপ কথা কিছুতেই বলা যায় না। সকল জীবন্ত ও উন্নতিশীল জাতির মধ্যেই কিন্তু ইহার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা হয়ত এই দেশ এক দিন বুঝিয়াছিল। তাই পিতৃপুরুষগণের তর্পণ একটা দৈনিক কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তবে ঠিক এই ভাবে কর্ত্তব্যটি গৃহীত হইয়াছিল কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাহার মধ্যে অন্য ভাবের প্রাবল্য অধিকতর রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, কোনও দিন সত্যরূপে উহা অনুভূত হইলেও, বর্ত্তমানে উহা একটি অর্থশূন্য মৃত অনুষ্ঠানেই পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশের দৈনিক বা বার্ষিক শ্রাদ্ধ তর্পণের মধ্যে আর শ্রদ্ধারও কোন স্থান নাই, তর্পণেরও নাই—তর্পণ বলিতে শারীরিক তৃপ্তির অতিরিক্ত কিছুই এ দেশ বুঝিতেছে না। অন্নগতপ্রাণ জীব এখানে অন্নময় কোষেই আবদ্ধ। তাই জলীয় তর্পণ জলে জল দিয়াই সম্পন্ন হয়, তাহার সঙ্গে হৃদয়ের বা আত্মার কোনও সম্বন্ধই নাই। দ্বিতীয়তঃ যদিও সাধারণ ভাবে পরলোকস্থ সকল আত্মারই প্রীত্যর্থে তর্পণ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তথাপি

পিতৃপুরুষ বলিতে প্রধানতঃ স্বীয় বংশের পূর্ব্ব পুরুষদিগকেই বুঝায় —বুদ্ধদেব রাজা শুদ্ধধনের উত্তরে যে আধ্যাত্মিক পূর্ব্বপুরুষদের কথা বলিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনও দূরতম ইঙ্গিতও ইহার মধ্যে নাই—জাতীয় পূর্ব্বপুরুষদের কথা ত নাই-ই। নব জাতীয়তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশসমূহের অনুকরণে আমরা কিছুদিন হইতে জাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের অনেকের পরলোকগমনদিবসে বার্ষিক স্মৃতিসভায় অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছি। তাহার মূলেও কিন্তু অধিকাংশস্থলেই আত্মীয়স্বজনের ও নিকট বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টাই প্রধান ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়—সাধারণ জাতীয় ভাবের পরিচয় অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এই সকল বার্ষিকী সভার অনুষ্ঠান ও ফল শূন্যগর্ভ বাক্যময় রাজ্যকে অতিক্রম করিয়া কতটা সত্য রাজ্যে, অন্তর রাজ্যে, প্রবেশ করে—বাঙ্ময় কোষ ভেদ করিয়া মনোময় কোষে কতটা পৌছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেন না অনেক সময় সরলতার নিতান্তই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়,—দেখা যায় যে, তাঁহারা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনপাত করিয়া গেলেন, জাতীয় জীবনে যাহা তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, তাহা ভুলিয়া, জাতীয় কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেহ কেহ এই উপলক্ষে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বশতঃ প্রকারান্তরে তদ্বিরোধী অকল্যাণকর পথে দেশকে চালাইবার অসরল ইঙ্গিত করিতে, সম্মানের নামে অসম্মান প্রদর্শন করিতেও, লজ্জাবোধ করেন না। সকলের সকল দিক অবলম্বনীয় না হইতে পারে, মহাপুরুষেরও কোনও বিষয়ে দোষ ত্রুটি থাকিতে পারে। তাহা নিশ্চয়ই বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত মহত্ত্ব যাহা থাকে, গ্রহণীয় যাহা থাকে, তাহা সরল অন্তরে পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে—অনুসরণ করিতে হইবে। শুধু প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিয়া, অথবা তাহাকে বিকৃত ভাবে গ্রহণ করিয়া, কখনও কল্যাণ নাই। কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ না করিলেও, তাহার মহত্ত্বটা গ্রহণ করিয়াই আমরা উন্নত ও মহৎ হইতে পারি, অন্য কোনও উপায়ে নহে। বিরুদ্ধপক্ষেরও যেটুকু মহত্ত্ব আছে, তাহা পূর্ণ ভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াই আমরা উন্নত হইতে পারি—তাহাকে খর্ব্ব করিয়া নহে। যেখানে যেটুকু মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেখান হইতেই তাহা সংগ্রহ করিয়া বড় হইতে হয়। সকল কার্য্যের মূলে সরলতা ও আন্তরিকতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। যাহা হউক, সাধারণ ভাবে দেশের কথা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা আজ বিশেষ ভাবে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের কথাই ভাবিতেছি। এই কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের অনেক ভক্ত সেবকদের পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক-দিন পড়িয়াছে। তাঁহাদের দ্বারা সত্যই ব্রাহ্মসমাজ গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাঁহাদের কাহারও কাহারও জন্য অনেক সময় বা নিয়মিত ভাবে স্মৃতিসভার আয়োজন আমরা করিয়া থাকি, আর অপর অনেকের সম্বন্ধে আমরা সামাজিক-ভাবে কিছুই করি না। এ বিষয়ে যে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্যক্ প্রকারে সম্পন্ন করিতেছি, এরূপ বলা যায় না। নিয়মিত ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহাদের চরিত্র অনুধ্যান ও অনুসরণ করিলে আমরা বিশেষ উপকৃতই হইতাম—আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনগঠনে সাহায্য প্রাপ্ত হইতাম, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যও অধিকতর উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হইত। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদিগকে আমরা কখনও সামাজিক ভাবে স্মরণ করি না, তাঁহাদের নিকটও আমরা বহু পরিমাণে ঋণী, তাঁহাদের দ্বারাও আমরা গৌরবান্বিত। স্বভাবতঃই এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের সকলের কথাই স্মরণে আসিলেও, যাঁহাদের নিকট আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী, যাঁহাদের লইয়া আমরা সর্ব্বদাই গৌরব করিয়া থাকি এবং নিয়মিত ভাবেই প্রতিবৎসর এই মাসে আমরা যাঁহাদের স্মৃতিতর্পণাদি করিয়া আসিতেছি, আজ আমরা বিশেষভাবে সেই রাজর্ষি রামমোহন রায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দের কথাই বলিতেছি। তাঁহাদের প্রতি আমরা ২৭শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর যে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করি, তাহা যে মৌখিক নহে আন্তরিকই, শুধু বাঙ্ময় নয় প্রাণময়ও, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহাদের মহত্ত্ব যে আমরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা যথার্থরূপেই পালন করিতেছি, এরূপ কথা কিছুতেই বলিতে পারি না। যদিও মনে করি, তাঁহাদের গৌরবে গৌরাবান্বিত বোধ করে না, তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি পোষণ করে না, তাঁহাদের অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করে না, এরূপ কেহ আমাদের মধ্যে নাই, তথাপি আমরা যে সকলেই তাঁহাদের উপযুক্ত আধ্যাত্মিক বংশধর হইবার জন্য, তাঁহাদের অনুসরণ দ্বারা, তাঁহাদের আদর্শানুরূপ জীবনগঠনদ্বারা, তাঁহাদের গৌরবকে অম্লান ভাবে সংরক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, তাহা কি বলিতে পারি? আমরা অনেকেই কি আমাদের উদাসীনতা ও অবহেলা বশতঃ এরূপ ভাবেই চলিতেছি না, যাহাতে তাঁহাদের অগৌরবই হয়? যাহার জন্য তাঁহারা সকল প্রকার ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক প্রাণপাত করিয়া গেলেন, আমরা অনেকে কি সে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদাসীন নহি? অনেকে কি তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া, অসার ধন মানের পশ্চাতেই অন্ধভাবে ছুটিয়া চলিতেছি না? আর, যাহারা সেরূপ বিরুদ্ধপথে যাইতেছি না, তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে একটু আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিতই আছি, তাহারাও কি তাঁহাদের আদর্শকে জীবনে ও সমাজে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা যত্ন, ত্যাগ ও ক্লেশস্বীকার করিতেছি? আজ এই সকল প্রশ্নই স্বভাবতঃ মনে উদয় হইতেছে —আমরা কতটা সত্য ভাবে তাঁহাদিগকে বুঝিয়াছি, গভীরভাবে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেছি, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে।

রাজর্ষি রামমোহন এই অধঃপতিত দেশের পক্ষে বিধাতার এক অপূর্ব্ব দান। তিনি এ দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও শুধু এই দেশের নহেন। তিনি যে বিধাতার নিকট হইতে কি এক সর্ব্ববিষয়ে বিশাল ও পূর্ণ আদর্শের বার্ত্তা পাইয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাকে বহুপরিমাণে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমরা অনেক সময় তাঁহাকে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র করিয়াই দেখি, তাঁহার উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত করিয়া ফেলি। যাহা তাঁহার বিশেষত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব, তাহাকেই যদি খর্ব্ব করিয়া বসি, তবে যে তাঁহাকে আমরা মোটেই ধরিতে পারিলাম

না—তাঁহার অবমাননাই করিলাম! তাঁহার মধ্যে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা যত গভীর ভাবেই থাকুক না কেন, তাহা যে তাঁহার গভীরতর বিশ্বজনীনতা ও সার্ব্বদেশিকতারই একাংশ মাত্র, অনুপ্রকাশ মাত্র, তাহা বুঝিতে না পারিলে তাঁহাকে কিছুই বুঝা হইল না, সম্পূর্ণ ভুলই বুঝা হইল। তাঁহার ধর্ম্ম যে জীবনের কোনও বিশেষ অংশে আবদ্ধ নহে, সমগ্র জীবনকে ব্যাপিয়াই অবস্থিত, জীবনের সমস্ত দিক, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য, সকল চিন্তা, সকল ভাবকে যে তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, সে কথার গভীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনপথে চলা সহজ নহে। উচ্চতম তত্ত্ব ও ক্ষুদ্রতম অনুষ্ঠানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা না করিতে পারিলে প্রকৃত ধর্ম্ম হইল না। বিশুদ্ধ জ্ঞান, উদার প্রেম, ও পবিত্র ইচ্ছার সমন্বয় ব্যতীত ধর্ম্ম নিতান্তই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বহু অধ্যয়ন দ্বারা শুধু কতকগুলি উচ্চতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় তিনি যথেষ্ট দিয়াছেন সন্দেহ নাই—তিনি যে শঙ্করের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াও শঙ্করকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রকাশিত বেদান্ত ও উপনিষদাদি গ্রন্থ বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত করিতেছে—কিন্তু কতকগুলি শুষ্ক তত্ত্বে তিনি কখনও আবদ্ধ ছিলেন না; গভীর যোগ সাধনেও নিযুক্ত ছিলেন। সে যোগ আবার শুধু জ্ঞানযোগ নহে, তাঁহার জীবনে গভীর ভাবেরও উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—সে ভাব প্রাণহীন শূণ্যগর্ভ ভাবুকতা নহে, তাহার মধ্যে প্রেম ও ভক্তি, মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরভক্তি, দুই সমানরূপেই ফুটিয়াছিল, এবং নানা প্রকার সেবাকার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। সে প্রেমে উচ্চ নীচ, স্বদেশ বিদেশের ভেদ ছিল না—তাঁহার বিশাল হৃদয়ে রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বালক বৃদ্ধ, সকলেরই স্থান ছিল, রাস্তার মুটে মজুর, কয়লার খনির শ্রমিক, দুর্ব্বলা অসহায়া নারী, বিবিধ-প্রকারে অত্যাচরিত পরাধীনতার চাপে প্রপীড়িত, সকল দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিযুক্ত বিভিন্ন জাতি ও লোকসমূহ, কেহই তাঁহার প্রেম ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত নহে। তাঁহার হস্তও সর্ব্বদাই সকলের সাহায্যের জন্য সম্প্রসারিত ছিল,—তিনি দেশের কল্যাণের জন্য শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া ফকীর হইলেন, শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত ক্ষয় করিলেন। তাঁহার অসাধারণ শারীরিক শক্তি কি সহজেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অকালে—মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে—কালগ্রাসে পাতিত করিয়াছিল? তাঁহার ন্যায় বিশাল দেহ, অনন্যসাধারণ শারীরিক বল, এ দেশে কয় জনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? তাহা কি সামান্য পরিশ্রমেই বিনষ্ট হইয়াছিল? আর, তাঁহার কার্য্য কি কোনও এক বিভাগে আবদ্ধ ছিল? মানব জীবনের এমন কোন্ বিভাগ রহিয়াছে, যাহার জন্য তিনি আপনার শক্তিকে নিয়োগ করেন নাই? দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও কল্যাণের জন্যই কি তিনি প্রাণপণে খাটিয়া যান নাই? সকল অন্ধকারপূর্ণ পথকেই কি তিনি আলোকিত করিয়া যান নাই—সকল দিকেই নূতন পথ খুলিয়া দেন নাই? এই বিবিধ বন্ধনে প্রপীড়িত দেশের সকল প্রকার বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহার ন্যায় আর কে খাটিয়াছে? এমন সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার উপাসক আর কে আছে? তাঁহার স্বাধীনতা কোনও দেশবিশেষ, শ্রেণীবিশেষ বা জীবনের অংশ-বিশেষে আবদ্ধ ছিল না; অথচ তাঁহার মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতাও পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, কোনও প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতাই ছিল না। এমন বিশুদ্ধ পূর্ণ স্বাধীনতার জীবন্ত মূর্ত্তি আর কোথায় পাইব? আবার, সকল প্রকার মহত্বের সঙ্গে তাঁহার মধ্যে কি বালকোচিত সরলতা ও বিনয়ের, অপূর্ব্ব দীনতা ও কোমলতার সমাবেশই ছিল! সর্ব্বোপরি তাঁহার কি অতুলনীয় সাধননিষ্ঠাই ছিল—গৃহে মন্দিরে, পথে ঘাটে, চলিতে ফিরিতে, নির্জ্জন ও সজন উপাসনাতে হৃদয়ের কি গভীর আবেগ ও আকুলতার সহিত, প্রেম ও ভক্তির সহিত, স্মরণে মননে, প্রার্থনায় গুণানুকীর্ত্তনে, ধ্যান ধারণাতেই নিযুক্ত থাকিতেন! এরূপ একটা জীবনের আদর্শ সম্মুখে পাইয়াও যদি আমাদের জীবন নিতান্ত ক্ষুদ্র ও মলিনই থাকিয়া যায়, তবে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনের কোনও মূল্যই থাকে না।

রাজর্ষিকে আমরা দেখি নাই। সুতরাং তাঁহার চরিত্র আলোচনা ও গ্রন্থাদি পাঠ ব্যতীত তাঁহার দ্বারা আমরা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারি না। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে ত সে কথা বলা যায় না। তাঁহাকে আমরা প্রায় সকলেই দেখিয়াছি, অনেকে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবেই তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছি। তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য কোনও দিনই ভাল ছিল না, কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়াই তিনি তাহাকে কতকটা কার্য্যক্ষম রাখিয়াছিলেন; অথচ এই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই তিনি আমাদের জন্য কিরূপ অক্লান্ত ভাবে খাটিয়া গিয়াছেন! আমরা কি তাঁহার অপরিশোধনীয় ঋণের জন্য উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিতেছি? তিনি আমাদের জন্য কি মহা ত্যাগই না করিয়াছেন! আপনার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য, সাংসারিক সুখ সুবিধা, মান প্রতিপত্তি, এমন কি অসাধারণ প্রতিভা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সেবায় বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে যে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ছিল, তাহার পরিচালন ও বিকাশের আনন্দও তাঁহাকে এই কার্য্যের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অর্থ বিত্ত পরিত্যাগ অপেক্ষাও ইহা বহু গুণে কঠিন। তিনি রাজর্ষির উপযুক্ত বংশধরই ছিলেন। তাই তাঁহার গৌরবকে নানা প্রকারে বর্দ্ধিতই করিয়াছেন, আমাদের সম্মুখে সেই আদর্শকে উজ্জ্বল ভাবেই ধরিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে সাধন ও প্রচারের কি প্রবল উৎসাহই ছিল! কি কঠোর প্রতিজ্ঞা-বলে, অসাধারণ সংযমের বন্ধনে আপনার চরিত্রকে গড়িয়া তুলিতে তিনি সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন! তাহার সঙ্গে কি প্রবল স্বাধীনতার সংগ্রামেই না ব্যস্ত ছিলেন! রাজর্ষির উপযুক্ত শিষ্যের ন্যায়, তিনিও সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার জন্যই আপ্রাণ খাটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যও কোনও ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার ধর্ম্মও কোনও সংকীর্ণ গণ্ডীর অধীন ছিল না। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যে দৃঢ় নিষ্ঠা, মানবে প্রীতি, ঈশ্বরে ভক্তি, শুধু তাঁহার আদর্শের বিষয় ছিল না, জীবনে বহু পরিমাণে সাধিতও হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে এই যুক্ত গুণই বিশেষ ভাবে মূর্ত্ত হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে কঠোরতার সঙ্গে কোমলতার অপূর্ব্ব সমাবেশই ঘটিয়াছিল। তাঁহার মধ্যে যে বালকোচিত সরলতা ও বিনয়, পাপের প্রতি তীব্র

ঘৃণার সঙ্গে পাপীর জন্য গভীর সহানুভূতি, সকল প্রকার আর্ত্ত ও দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য প্রবল আগ্রহ ও যত্ন, নিজে সকল ক্লেশ বহন করিয়াও অপরের ভার লাঘব করিবার প্রয়াস, দেখা গিয়াছে, তাহা আর কয় জনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? কত অসহায়কে তিনি আপনার গৃহে স্থান দিয়াছেন! সর্ব্বোপরি কি প্রাণস্পর্শী উপাসনা প্রার্থনা ও উপদেশাদির দ্বারা তিনি সকলকে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে কি না সহায়তা করিয়াছেন! নিজ জীবনে কি গভীর সাধননিষ্ঠাই না ছিল! কি অপূর্ব্ব যোগ ভক্তি কর্ম্মই না ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন! আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতার জন্য তিনি যেমন আপনাকে দায়ী করিয়া গভীর বেদনা অনুভব করিতেন, সমাজের অবস্থা দেখিয়া আমরা কেহ কি সে রূপ করিয়া থাকি? আমরা যদি তাঁহার হৃদয়ের সে গভীর বেদনার কথা স্মরণ করি, তবে কি উদাসীন ভাবে সংসারস্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে পারি? তাঁহার পথই যদি আমরা অনুসরণ না করিলাম, তবে কি সে জীবন স্পষ্ট প্রমাণ করিবে না যে, আমরা প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে কিছুই শ্রদ্ধাভক্তি করি না—সবই একটা বাহ্যিক ভদ্রতা বা নিয়মরক্ষা মাত্র?

বাস্তবিক এই বার্ষিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। তাঁহারা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনপাত করিয়া গেলেন, আমাদিগকে যে পথ দেখাইয়া গেলেন, তাঁহাদের যে অসমাপ্ত কার্য্যভার আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়া গেলেন, আমরা যদি তাহার প্রতি কোনও প্রকার উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন করি, তাহাকে সমগ্র মন প্রাণ দিয়া গ্রহণ না করি, তাহাকে জীবনে পরিবারে ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা না করি, তবে আমরা তাঁহাদের নিতান্ত অযোগ্য বংশধর বলিয়াই গণ্য হইব, আমরা গুরুতর কর্ত্তব্যলঙ্ঘনজনিত পাপেই লিপ্ত হইব। তাহাতে আমরা ত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবই, তদতিরিক্ত তাঁদের গৌরবকেও বহু পরিমাণে খর্ব্ব করিয়া, তাঁহাদের নির্ম্মল যশকেও অনেকটা মসীলিপ্ত করিব। এই সময়ে আমরা আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথা একবার বিশেষ ভাবে স্মরণ করি। করুণাময় পিতা আমাদের প্রাণে শুভ সঙ্কল্প জাগ্রত করুন, আমাদিগকে তাঁহার উন্নতি ও কল্যাণের পথে চলিবার বল ও শক্তি দিউন।

ব্রহ্মোপাসনা

প্রণালী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

ব্রাহ্মসমাজে ৪টি উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত। ১ম—আদি-সমাজের প্রণালী, এই প্রণালীর মধ্যে উপাসনার বিবিধ অঙ্গ সন্নিবিষ্ট আছে। প্রণাম, স্বাধ্যায়, সমাধান, আরাধনা, ধ্যান স্তোত্র ও প্রার্থনা সবই আছে। শাস্ত্রের উক্তির সহায়তায় এই উপাসনা অতি গভীর ও গম্ভীর ভাবে সাধনীয়।

২য়—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী। এই প্রণালীতে আরাধনামন্ত্র এবং সমবেত প্রার্থনা ব্যতীত আর সবই ব্যক্তিগত সাধনা ও তাহার উপর নির্ভর করে। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যানের উদ্বোধন, ধ্যান, সমবেত প্রার্থনা, স্তোত্র, জগতের জন্য প্রার্থনা, পাঠ, বা স্বাধ্যায় এবং প্রার্থনা, এই প্রণালীর অঙ্গ।

৩য়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীর সঙ্গে একই, কেবল (১) ধ্যানের উদ্বোধন নাই, (২য়) জগতের জন্য প্রার্থনা নাই। এবং (৩) অষ্টোত্তর শত নাম নাই। কেহ কেহ নাম পাঠের জায়গায় আদি ব্রাহ্মসমাজের স্তোত্র ব্যবহার করেন।

৪র্থ—সাধনাশ্রমের প্রণালী এইরূপ—উদ্বোধন ও উপদেশ একসঙ্গে, তার পর আরাধনা, ধ্যান, সমবেত প্রার্থনা; তার পর আচার্য্যের প্রার্থনা, শেষে স্তোত্র।

আরাধনামন্ত্র এবং সমবেত প্রার্থনা তিন সমাজেই এক। তিন সমাজে তিনটি স্তোত্র প্রচলিত (১) নমস্তে সতে তে (২) নমোঽকিঞ্চননাথায় (৩) নমো নমস্তে ভগবন্।

সঙ্গীত তিন সমাজের উপাসনারই একটি প্রধান অঙ্গ।

উপাসনার গাম্ভীর্য্য এবং মিষ্টতা সাধনার উপর নির্ভর করে। আরাধনামন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট ছন্দ আছে; সেই ছন্দ অনুসারে উচ্চারিত না হওয়ায় মন্ত্রের গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য দুই নষ্ট হয়। এও সাধনের বিষয়। সমবেত প্রার্থনা বাংলাতেই হওয়া উচিত,—অনেক জায়গায় বাংলাতেই হয়—তারও স্বাভাবিক ছন্দ মাত্রা থাকা উচিত। কেহ অস্বাভাবিক দীর্ঘমাত্রা দিয়ে উচ্চারণ করেন, কেহ অতি দ্রুত উচ্চারণ করেন—এ দুই ঠিক নয়। এতে গাম্ভীর্য্য ও স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। স্তোত্রের তো ছন্দ সহজ, কিন্তু সাধন-অভ্যাস না থাকায় স্তোত্রও এক যোগে এক ছন্দে উচ্চারিত হয় না ব'লে খারাপ শোনায়। সঙ্গীতে সুর তাল মান লয় ঠিক না থাকলে সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সফল হয় না। যে কোন সঙ্গীত কোন সুরে গাইলেই উপাসনার অঙ্গ হয় না; সঙ্গীতের ভাব ভাষা, সুর তাল, গলা ও যন্ত্রের মিল, বিভিন্ন গায়কের গলার মিল, সাধনার বিষয়। এ সাধনা না ক'রে সঙ্গীত করায় উপাসনার বিঘ্নই হয়।

প্রচলিত উপাসনাপ্রণালী অনুসারে উপাসনা করার মধ্যেও এই সব বিঘ্ন আছে। উপাসনার প্রতি, উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গের প্রতি আমাদের লঘুভাবই এরূপ হওয়ার কারণ। ভগবান এ বিষয়ে আমাদের চিত্তকে জাগ্রত করুন।

অনেকবার কথা হয়েছে যে, বর্ত্তমান উপাসনাপ্রণালী বড় কঠিন; বাহিরের লোক, নানা অবস্থার লোক, যে উপাসনায় সমবেত হন, সে উপাসনার প্রণালী আরও সহজ সরল হ'লে ভাল হয়; সমবেত উপাসনায় সমবেত প্রার্থনাদি আরও বেশী থাক্‌লে ভাল হয়, আরাধনা ও ধ্যান আরও কম হইলে ভাল হয়। এইরূপ কথা ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয়কেও বল্‌তে শুনেছি। অনেকবার এই বিষয়ে এইরূপ প্রসঙ্গ তাঁর সঙ্গে হয়েছিল।

পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তমান চারিটি প্রণালী তো আছেই; আর একটি প্রণালীর প্রস্তাব করছি—তা এই—(১ম) সঙ্গীত, তার পর (২য়) সকলে যে কোন ভাষায় (মাতৃভাষায় হওয়াই শ্রেয় মনে করি) একটি শ্লোক বা বচন সমস্বরে উচ্চারণ ক'রে প্রণাম করবেন, যেমন, "পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু," অথবা "যো দেবোঽগ্নৌ যো অপ্‌সু"...অথবা "যো অন্তঃপ্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং........"। (৩) শাস্ত্র পাঠ বা অন্য উপায়ে উদ্বোধন,

(৪) সঙ্গীত, (৫) সকলে সমস্বরে আরাধনামন্ত্র উচ্চারণ—এই মন্ত্র বৈদিক ছন্দ অনুসারে উচ্চারণ সাধারণের পক্ষে কঠিন। সহজ করা যায়, যেমন—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপং অমৃতং, শান্তং শিবং অদ্বৈতং, শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ কর্‌লে সকলের পক্ষে যোগ দেওয়া সহজ, মানে বোঝাও সহজ হয়। (৬) আরাধনা, (৭) ধ্যান—ধ্যানে ২।৪ মিনিট সময় দেওয়াই ঠিক। ধ্যান উপাসনার হৃৎপিণ্ড। (৮) ধ্যানের পর সকলে সমস্বরে স্তোত্র (৯) স্তোত্রের পর বন্দনাসূচক সঙ্গীত—যাতে ঈশ্বরের মহিমা ব্যক্ত হয়। স্তোত্র এবং বন্দনার একটি বাদও দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু দুই এর একটি সকলে সমস্বরে করা চাই। এজন্য স্তোত্র এবং বন্দনার গান নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। ৪ ৫টি প্রচলিত বন্দনার যে কোনটি অবস্থা অনুসারে গীত হইতে পারে। (১০) শাস্ত্র পাঠ, উপদেশ এবং জগতের জন্য ও মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা। (১১) সকলে সমস্বরে সাধারণ প্রার্থনা "অসত্য হইতে," (১২) প্রার্থনাসূচক সঙ্গীত।

প্রণাম-মন্ত্র, আরাধনা-মন্ত্র, স্তোত্র বা বন্দনা এবং সাধারণ প্রার্থনা—এই চারটি বিষয় সকলে সমস্বরে উচ্চারণ কর্‌বেন। প্রণাম আরম্ভে, সাধারণ প্রার্থনা সব শেষে, এবং আরাধনামন্ত্র এবং স্তোত্র আরাধনার আরম্ভে এবং শেষে। এই প্রণালীতে উপাসকগণের সকলের সমবেত ভাবে কর্‌বার চারটি কাজ আছে।

একখানি পুস্তিকায় এই প্রণালীর সঙ্গে কয়েকটি ক'রে গান, স্তোত্র, প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি ছেপে দিলে, অনেকের কাজে লাগ্‌তে পারে। অথবা একটি পুস্তিকায় তিন সমাজের উপাসনা-প্রণালীর সঙ্গে এই প্রণালীটি এবং কয়েকটি ক'রে এক এক অঙ্গের উপযোগী আদর্শ সঙ্গীত, শ্লোক এবং স্তোত্রাদি দিলে অনেকের সহায়তা হ'তে পারে। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা-প্রণালীর অভিব্যক্তির ইতিহাসও দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে সমাজের জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠগণের মনোযোগ প্রার্থনা করি।

সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

অমর কথা (৭)

অমৃত পান

(১)

গাও আজি সবে যে যেখানে আছ,
বিশ্বপিতার জয়,
নিবিড় তন্ত্রে, মধুর মন্ত্রে,
গাও রে বিশ্বময়।
জাগা'য়ে পুণ্য প্রেমের ছন্দ,
মঙ্গল মধু নাম,
শুভ্র বিমল আনন্দময়
সে অমৃতময় ধাম।

(২)

মরমে বেদনে, আঁধারে বিপথে,
করুণা আসিছে নামি',
ব্যথিত চিত্ত আকুল আবেগে
ভরেছে দিবস যামি
আছে সদা ঘিরে নিবিড় করিয়া,
করুণ সোহাগ মরি,
বুঝেছি বন্ধু, ঢেলে দেবে বুকে
তোমারি করুণা ভরি'।

(৩)

সাধ হয় আজ যে যেখানে আছ,
গাও রে তাঁহারি জয়,
প্রেমে বাঁধা আছি নিবিড় নিগড়ে,
জয় জয় প্রেমময়।
দেবলোকে যত দেব পূজারি
পেতেছে পূজার আসন,
সেই হোল সুখী যে জন হেরেছে
সে প্রেমমধুর আনন।

(৪)

সঁপে দেব আজ দেহ প্রাণ মন,
সখার চরণে মোর,
দেবলোকে যথা বাঁধে নিতি নিতি
মঙ্গল প্রেম-ডোর।
সৃজন করেছে, রেখেছে আমারে,
তোমারি করুণ পাত,
তব মঙ্গলরসমধুধারা
ঝরিছে দিবস রাত।

(৫)

ধন্য সে জন যে জন বরেছে
সখার মোহন রূপ,
ধূলি হ'য়ে গেল স্বর্ণরেণুকা,
ছড়ায়ে পুণ্যের ধূপ।
ঐ কোলে আমি আছি যে জাগিয়া,
নিত্য ভরসা মোর,
মিটি যাবে হায় যতেক পিয়াসা,
ঘুচিবে নয়ন-লোর।

এ সংসারে কত জটিল জঞ্জাল! তার মাঝখানেই জীবাত্মার কি জ্যোতির্ম্ময় সত্তা! চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝাপ্রলয়-সাগরদোলার ভিতর এ কি শান্ত সুনির্ম্মল অক্ষয় আনন্দের আয়োজন! সকল কোলাহলের মাঝখানেই আমার 'আমি'র এ কি নিভৃতে শান্ত আরাম-গেহ! আলোক আছে, তাই ছায়ার অস্তিত্ব; দুঃখ আছে, তাই সুখের মাহাত্ম্য। সুখ দুঃখ, আঁধার আলোর মাঝখানেই আমার শাশ্বত স্বরূপে জাগ্রত হ'য়ে থাকি। সকল নিরাশা বেদনা মর্ম্মন্তুদ যাতনা, সুখ দুঃখের বিচিত্র লীলামাহাত্ম্যের মাঝখানেই আমার 'আমি'র এ কি জয় গান! ভাগ্যবিধাতা কে তুমি? তোমার এ কি কল্যাণ ব্যবস্থা! এ কি আমার অপূর্ব্ব নিয়তি বল! সকল নিঃসঙ্গ উদাস প্রতীক্ষায় তোমার প্রাণময় সঙ্গ ভোগ কোরতে দিলে! হায়! হায়! সাধ হয় এ আনন্দ-অনুভূতি একবার বুকের ঘর খুলে দেখাই সকলকে। কি মঙ্গল-

মুহূর্ত্ত! আহা! জানি না ত নিত্য সেই আনন্দসম্ভোগ, তবু ক্ষণিকের সে বিচিত্র স্বাদ সাধ হয় বোঝাই সকলকে। হায়! হায়! যারা এ রসের স্বাদ এক দিনও পেল না, কৃপাপাত্র তাঁরা। সাংসারিক প্রগল্‌ভা চঞ্চলতার ঘোরে যতই কেন মানুষ ঘুরে মরুক্ না, এক দিন এমন মুহূর্ত্ত আস্‌বে যখন সে সত্য সঙ্গের জন্য প্রাণ আকুল হবেই হবে। যখন কোন সামাজিকতা ঐহিকতায়, ক্ষুদ্রতায়, প্রাণের অতৃপ্ত সাধ কিছুতে মেটে না,—কি যেন চায় অনন্তপিয়াসু প্রাণ অনিত্যতার ঊর্দ্ধে। তখনই, তখনই নবজীবনের নব উদ্বোধনের পিয়াসা জেগে ওঠে।

এম্‌নি ক'রে পিপাসা জাগে কই, যাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সত্য আয়োজন হয়? সেই বিচিত্র ভূমা মহানের আনন্দবুকে, পবিত্রতার নির্ম্মললোকে, আমার কেমন ক'রে স্থান হবে? এম্‌নি কোরে এক অব্যক্ত প্রাণময় জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র সত্তা আশৈশব হৃদয়নিভৃতে জেগে থাকে, অথচ তাহার সে সুস্পষ্ট বিকাশ কই হয় জীবনের বিচিত্র ছন্দে? ব্যর্থ দীন যাত্রার অভ্যস্ত চঞ্চল দোলায় কেবল দোলায়মান! কেবলই ক্লান্তি, কেবলই অতৃপ্তি!

কত সাধনার গান, কত ভক্তগাথা ত শুনি জীবনে জীবনে, মন্দিরে মন্দিরে! তবু কই সে আদর্শ মহিমার পরম অভিব্যক্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনে? যে প্রাণময় জাগরণ, ধর্ম্মপিপাসা, অনুপ্রাণনা, ভক্ত যিশু শ্রী গৌরাঙ্গ প্রভৃতির জীবনে জেগেছিল—কি সত্য জ্যোতিসত্তা!—সে ত কেবল স্মৃতির পূজা নয়, সে ত কেবল দৈনন্দিন নিয়মতালিকারচনা নয়—সে যে আত্মা-পরমাত্মার মহাসত্তার ভিতর আপন সত্তার প্রাণময় প্রেমসম্মিলন!

কালের স্রোতে ভেসে চলেছে মানুষ কর্ম্মপ্রবাহে, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। যেন আকস্মিক নিয়মতন্ত্র জীবনকে নিয়মিত কোরে চলেছে। এই সকল চঞ্চলতার ভিতরই যে চিদ্‌শক্তি শান্ত স্নিগ্ধস্বরূপ দেবলোকের বিমল শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোতিছটায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে! এমন সময় আসে মানবের জীবনে, যখন ঐহিক আমোদ আহ্লাদে আর বুক ভরে না,—সকল বিষয়েই এক অতৃপ্ত অবসাদে প্রাণ মন অবসন্ন হোয়ে পড়ে।

আবার কত মানুষ সংসারের এই ক্ষণিক ব্যবস্থার ভিতর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে,—হয়ত এক মঙ্গল ক্ষণ আসে যখন তার প্রাণকে এক অব্যক্ত স্বর্গের আনন্দ-অনুভূতির আভাসে আলোকিত কোরে তোলে। কিন্তু সে অনুভূতি চিরস্থায়ী হয় কই? স্বপ্নের মত নিমেষে কোথায় উধাও হোয়ে যায়। এমন কি সে আনন্দ-স্মৃতিও মনের ঘর থেকে লুপ্ত হোয়ে যায়। আবার একই কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের ভিতর শুষ্ক তৃষিত হ'য়ে ওঠে, সমস্ত মরুভূমির মত নীরস হোয়ে যায়।

তাই জীবনের প্রতিদিনটী ভাব্‌তে হয়, কোন্ দিনটী আমার পরম সুখের দিন; কোন্ দিনটী মধুময়, আনন্দময়। কারুর হয়ত মনে হয়, আহা, শৈশবের মত এমন নির্ম্মল পবিত্র সময় বুঝি আর নেই! শৈশবের মঙ্গল উষায় অতি তুচ্ছ বস্তটীও কি বিচিত্র স্বরূপে প্রকাশিত হয়! একটী পুষ্পদলের ভিতরই কত কিছু উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে, চতুর্দ্দিকে পারিপার্শ্বিক যা কিছু সব কিছুর ভিতর কি মঙ্গলমাধুরী ফুটে ওঠে! প্রাণ সব কিছুর ভিতরই কি সরস আনন্দে ভরপুর; শৈশবের কান্নাহাসি, খেলাধূলো সবই কি সরল সহজ সুন্দর! তখন জীবনপত্রে পত্রে ভবিষ্যতের কত আশার ছবি অঙ্কিত হোয়ে ওঠে! তাইত শৈশব এত সুখময়।

আবার যখন জীবন-ইতিহাসের প্রতি পরিচ্ছেদ তন্ময় হোয়ে পাঠ করে, মানুষ দেখে প্রতি পরিচ্ছেদের বিচিত্র পরিবর্ত্তনের ভিতর তার স্বতন্ত্র মহিমা, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র আনন্দমহিমা। তাই শৈশবের খেলাধূলা চিরদিন জীবনে বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক শিশুই কেমন আকুল হোয়ে বড় হোতে চায়! শৈশবে কোন্ জিনিস বরণীয়? তখন কই পার্থিব ধনলিপ্সা? তখন রাজ-প্রাসাদও খেলাধূলার বালুকাপুঞ্জের ভিতরই গড়ে ওঠে! ক্ষুদ্র খেলাঘরের আসনখানিই রাজ-আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়! তার অস্ফুট কোমল হৃদয়খানি অল্পের ভিতরই ভূমা আনন্দ সাফল্য লাভ করে! কেন এমন হয়? অন্তরের আনন্দই নির্ম্মল আনন্দ। যা পাই তাতেই সন্তোষ, ভবিষ্যতের ভাবনা নেই, যা কিছু পায় তাতেই আনন্দ। তাই অল্প আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প হাসিকান্নাই জড়িত হোয়ে থাকে। আবার যখন বয়োবৃদ্ধির উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, তখন তারই জন্য অনেক চোখের জল ফেল্‌তে হয়। অনেক সংগ্রাম, অনেক কিছুর ভিতর যেতে হয়। যাতে বেদনা দুঃখ তা বেশীক্ষণ বুক পেতে নিতে পারি না, যাতে আরাম সুখ তা পেতেই ছুটে চলি। হয়ত সেজন্য কত অনুতাপের আগুন জ্ব'লে ওঠে। কিন্তু যখন শুদ্ধ সরল মন, তখন যা কিছু ভোগ করি সব শুদ্ধ ভাবেই গ্রহণ করি; তাই সেখানে কোন অনুশোচনা নেই, বেদনাক্রান্ত মুহূর্ত্ত তেমন ভয়াবহ হয় না। যখন হিতাহিতের জ্ঞান জাগে, যখন ভাল মন্দের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হয়, তখন অতি সামান্য আচরণের সঙ্গে সঙ্গেই কত ভীতি, কত অশান্তি! এই ভীতির অমঙ্গল চিন্তাই আবার সত্য পথে, মঙ্গল পথে, নিয়ে যায়। আবার, কুবাসনা হয়ত কুপথেই নিয়ে চলে।

কেন যৌবনের জ্ঞানগরিমা ব্যর্থ হবে, কেন বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা বিফল হবে, আর কেনই বা শৈশবস্মৃতির এত মাহাত্ম্য? আত্মপুরেই সকল আনন্দস্মৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সকল শান্তি-উৎস হৃদয়কন্দরেই উৎসারিত। সুশোভন চরিত্রজ্যোতি আত্মজ্যোতি-মহিমাতত্ত্বেই উদ্ভাসিত।

কেন মন ক্ষণে ক্ষণে এই অশান্ত অশোভন তৃপ্তিসাধনার ভিতর আরাম সম্ভোগ কোরতে গিয়ে অশান্তির আগুনে পু'ড়ে মরে—নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট হোতে পারি না? কেন অধিক আকাঙ্ক্ষা, অধিক ধন মান যশের জন্য ব্যতিব্যস্ততা? এক সময় তৃণকুটীরই কত আরামদায়ক! তা কেন সকল সময়ে সুখকর হয় না? কেন অবিমিশ্রিত নির্ম্মল আনন্দসম্ভোগ জীবন হোয়ে ওঠে না?

শৈশবের স্বাভাবিক সরলতা আমরা হারিয়ে ফেলি, তাই পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থার ভিতর সকল মনোজগতে একবিচিত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। অসত্যের ভিতর কত মহা অনর্থের সূচনা হয়! বহির্ম্মুখীন ভোগসম্ভোগের জন্য চিত্ত পিয়াসু হোয়ে ছোটে, তাই ব্যর্থ হোয়ে ফির্‌তে হয়। কোথায় সে নির্ম্মল আনন্দ? কত অসরলতা, দ্বেষ হিংসায়, শৈশবের সরল সহজলব্ধ

দেবপ্রকৃতি হাসিয়ে বসে? তাইত ভক্ত গেয়ে ওঠেন, 'ওগো কে চাও পূজা কোর্‌তে, তবে এস সরল শিশু হোয়ে পূজার মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে'। সে শান্ত স্নিগ্ধ সরল অমল জ্যোতি জীবনের প্রতি অবস্থাতেই লাভ করা কি সম্ভব নয়? একবার সে সরলতা পবিত্রতা যদি জীবনে ফুটে ওঠে, তবেই নির্ম্মলানন্দ, পুণ্যানন্দ।

হয়ত কতজনের শৈশবকালই ব্যর্থ হোয়ে গেল, হয়ত ব্যাধি-নিষ্পেষণে, হয়ত বা বিমাতার কুটিল কঠোর ব্যবহারে, তাহার শৈশবের নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করা হোল না। তাই যে দিন মঙ্গলমুহূর্ত্তে প্রথম ভালবাসার স্নেহের আস্বাদ পেল তরুণ জীবনে, সেদিনই তার হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠ্‌ল। সেদিন কত সরলতা জীবনে, নিত্য নূতন প্রেমের অর্ঘ্যে হৃদয়-থাল ভ'রে ওঠে। তখন তার প্রেমজ্যোতিতে সব জ্যোতির্ম্ময় হোয়ে ওঠে, প্রতি ভাবকুসুম মঙ্গল সুবাসে সুবাসিত হোয়ে ওঠে, প্রতি দৃষ্টি, প্রতি সুরলহরীর ভিতর, নবছন্দলহরী উদ্বেলিত হোয়ে ওঠে। প্রেমাস্পদের প্রেমের অর্ঘ্য কি আনন্দ-সুষমা রচনা করে! জীবন তখন কি মধুময়, কি আনন্দময়! যা কিছু ভালবাসার ধন, সব কিছুর ভিতর কি পুণ্যমাধুরী! প্রেমে উৎফুল্ল জীবনখানি কি শান্ত বিনতির মঙ্গলশ্রীতে ভ'রে ওঠে—কত উন্নত আকাঙ্ক্ষা কত নব নব সদগুণ সদ্ভাব সাধনা! তখন সকল দুঃখ বেদনা কি শান্তির উদ্বোধনমন্ত্রে দীক্ষিত করে! তখন অতি তুচ্ছ ত্রুটীও সংশোধন কোরতে কি নবোৎসাহ, নব আনন্দ! তখন প্রেমের সম্মানে কুকর্ম্ম কুভাব কোথায় উধাও হোতে চায়!—প্রেমের এমনই জলন্ত পুণ্যমহিমা! এম্‌নিতর প্রেমকাহিনীর মঙ্গলস্মৃতি-গন্ধ কেবলই পুণ্য পবিত্রায় আমোদিত কোরে তোলে।

আবার যেদিন মানুষ তারও উর্দ্ধে, সকল কুহেলীর পরপারে, যোগসুন্দরের নিত্য পরিচয় লাভ করে, শান্ত যোগাসন পাত্‌তে শেখে, সেদিন কি পরিপূর্ণ পরমানন্দের সত্য উপলব্ধি! সেদিন বোঝে মানুষ কোথায় ভুল ত্রুটি, সেদিন বোঝে কই আমার প্রিয়ধনদের জীবনকমলে সে মঙ্গল-আভা ফুটে উঠ্‌ল? এ আনন্দ-অনুভূতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোথায়? সেদিন মর্ম্মগুহায় হৃদয়নিভৃতে নিত্য প্রেমধারা নীরস পাষাণ-বুকের তলে নেমে আসে। তখন সে গোপন আনন্দধারার আনন্দলহরী কে তুলনা কোরবে? তখন যা কিছু সব যে আনন্দময়, মধুময়! এই পুণ্য জাগরণ শৈশবের সরলতার পবিত্রতায়, দেবত্বের মহিমায়, যখন মোহকুহেলী সব ঢেকে ফেলে, তখনই সংসার অন্ধকার।

কেন এ চঞ্চলতার মোহ সংসারে? কেন সে সহজ দেব-বাঞ্ছিত ধনে বঞ্চিত হই? কেন হৃদয়মন্দিরে সে পুণ্য ছবি উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে না? কেন ক্ষীণশক্তি এমনই ব্যর্থ হোয়ে ফেরে? কোথায় সে পুণ্যব্যসন? কোথায় বাহিরে তাহার প্রকাশ দেখ্‌তে চাই, দেখাতে চাই? কেন নির্ম্মললোকের জন্য প্রস্তুতি জাগে না? স্নেহ প্রেমের শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপসাধনাতেই নন্দনের বিমল জ্যোতিচ্ছটা।

আত্মালোকে সে দেবজ্যোতি কই উদ্ভাসিত? তাই ত এ দীনতার গ্লানিমা! প্রাণসখা, দয়া কর। যদি ধূলিমুষ্টিকেই বিচিত্র অধিকারে ত্রিদিবের সুনির্ম্মল সুধারসে ভরিয়ে তুলবে তবে তোমারই নিত্য সত্তা দান কর। দেবত্বের পুণ্যজ্যোতিশ্ছটার ভিতর সার্থকতা দান কর, লুব্ধ দৃষ্টিকে আকুল কর, তোমার দানের যোগ্য কর।

ওগো বন্ধু, দয়া কর; তোমার ত্রিদিবের আনন্দদ্বার খু'লে এস বক্ষপুরে তোমার মাভৈঃ-বাণী ধ্বনিত কর। যদি এ প্রাণ কেবলই সুখের ভিখারী হোয়ে ঘোরে, তবে নিত্যসুখপিয়াসু কর। স্বর্গের উজ্জ্বল সুষমায় সমস্ত আলোকিত কর

পরলোকগতা সুখদা নাগ।

দেবী!

"যাহার কৃপায় লভেছিলে ধরায়
দুর্লভ 'ব্রহ্মজ্যোতি,'
তাঁহারই বলে, হাসিমুখে তেয়াগিলে
এ ভববন্ধন অতি।"

আজ যে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিবার জন্য আমরা এই শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত হইয়াছি, তিনি আমার পরমারাধ্যা স্নেহময়ী মাসীমা ছিলেন। কিন্তু তিনি আমার স্বামীর মাতৃস্থান পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এমন কি, তদপেক্ষা অধিক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাসীমা আমাদের পরম হিতৈষিণী শ্রেষ্ঠতম বান্ধব ছিলেন। নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার নিকট আমরা পরম যত্ন, অপরিসীম স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়াছি। তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। আমরা তাঁর অধম সন্তান, বিনিময়ে তাঁহাকে কিছুই করিতে পারি নাই। আজ এক মাস হইল আমরা তাঁহার অমূল্য স্নেহাশ্রয় হইতে ইহজন্মের মত বঞ্চিত হইয়াছি। যদিও জানিতাম তিনি অনন্তধামের যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, তথাপি এত শীঘ্র যে তাঁহার অমূল্য জীবনের অবসান হইবে তাহা এক দিনের তরেও কল্পনা করিতে পারি নাই। তাঁহাকে হারাইয়া বুঝিতেছি, তাঁহার স্থান অধিকার করিবার বান্ধব আর আমাদের নাই! আমরা আজ অকূল সংসারে কাণ্ডারীবিহীন।

মাসীমার জীবিতাবস্থায় আমরা তাঁহার চরিত্রের মর্য্যাদা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বুঝিতেছি, সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা তাঁহার আসন অতি উচ্চে ছিল। তাঁহার মত উন্নত চরিত্রের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাঁহার মহৎ হৃদয় এবং উন্নত চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। তিনি ক্ষণজন্মা নারী!

তিনি হিন্দু পিতামাতার সন্তান; বালিকাবয়সে রমেশচন্দ্র নাগের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রমেশচন্দ্র ছাত্রজীবন হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। মাসীমারও ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল। বালিকাবয়সেই স্বামীগৃহে গমন করিয়া তাঁহার মধুর চরিত্রদ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ বয়সেই তাঁহার ভিতর সর্ব্বপ্রকার গুণ অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে উহা

শ্রাদ্ধবাসরে বোনঝী শ্রীমতী শোভনা ঘোষ-কর্ত্তৃক পঠিত।

পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি মহা প্রাণ লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, সরলতা এবং উদারতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। রমণীর কমনীয়তা তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। তিনি কর্তব্যপরায়ণা, দয়াবতী এবং দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। কি বড় কি ছোট, কদাপি কেহ প্রার্থী হইয়া প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তিনি দান করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি প্রায় সমগ্র ভারতে নানা বিভাগে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত কর্মিষ্ঠা ছিলেন এবং রন্ধনকার্য্যে অত্যন্ত সুনিপুণা ছিলেন। সকলকে খাওয়ান ও স্বহস্তে পরিবেশন করা তাঁহার একটি প্রিয় কার্য্য ছিল। যখনই যে স্থানে গিয়াছেন, কাহাকে না খাওয়াইয়া তিনি প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন না—তাঁহার মনকে যেন বাধা দিত। কাহাকেও খাওয়াইতে গেলে তিনি আত্মবিস্মৃত হইতেন। সকলেই তাঁহার হস্তে ভোজন করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিতেন। তিনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, উদ্যম ও উৎসাহ নিয়া শীঘ্র উহা সমাধা করিতেন। 'কাল করিব' বলিয়া কোনও কাজ ফেলিয়া রাখিতেন না। কোনও কারণে যদি তাঁহার কার্য্যসমাধানে বিলম্ব ঘটিত, তিনি তাহাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেন।

তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী ছিলেন। পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করিতে ভালবাসিতেন না। এইরূপ স্থান অতি ঘৃণার সহিত অবিলম্বে ত্যাগ করিতেন। অন্যায় আচার ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে যেন উহা তীব্রভাবে দংশন করিত, তিনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেন। তাঁহার ভিতর হইতে ভীষণ তেজ উদ্দীপ্ত হইত, তাঁহাকে দমন করা কাহারও সাধ্য হইত না। যাহা তিনি ন্যায় জ্ঞান করিতেন, তাহা বলিতেনই। কিন্তু তিনি বড়ই আত্মভোলা ছিলেন; কেহ ক্ষমাপ্রার্থী হইলে আনন্দে আত্মহারা হইতেন এবং ক্ষমা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। তিনি সদা প্রসন্না ছিলেন। সরলতা এবং নির্ম্মল হাসি তাঁহার প্রকৃতির মাধুর্য্য ছিল। কুটিলতাকে তিনি অত্যন্ত হীন চক্ষে দেখিতেন। চরিত্রের প্রবল দৃঢ়তা তাঁহাতে ছিল। এই সকল নানা প্রকার গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল। তিনি বৃদ্ধা জননীর সহিত শিশুর ন্যায় আবদার করিয়া অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন।

তিনি ঐশ্বরিকশক্তিসম্পন্না নারী ছিলেন। উপস্থিত বিপদে অনেক স্থলে তিনি সৎসাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলাম:—বাঙ্গলা ১৩১৬ সালের শ্রাবণ মাসে আমার পূজনীয় মাতামহ স্বর্গগত লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষের শ্রাদ্ধোপলক্ষে আমরা দেশের বাড়ীতে সম্মিলিত হইয়াছিলাম। একদিন বাড়ী হইতে নৌকাযোগে ঢাকা রওনা হই। আমার পূজনীয় মামা ডাক্তার জে এন ঘোষ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পরলোকগতা আমাদের স্নেহময়ী দিদি বিভাবতী বাহিরে উপবিষ্ট ছিলেন। আমাদের নৌকা নদীর সম্মুখীন হইলে দৈবক্রমে বিভা দিদি জলমগ্ন হইলেন এবং মামাও তৎসঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মাসীমার কর্ণে পতনের শব্দ পশিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনিও ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া দিদিকে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে তিনি উপস্থিত বিপদে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিতে অনেক ঘটনায়ই দাঁড়াইয়াছেন।

সত্যই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শৈশব হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা বদ্ধমূল হইতে থাকে। জীবনে কয়বারই তিনি ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার তখনকার অবস্থার সমুদয় বৃত্তান্ত তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ১৩২১ সনের ৬ই ভাদ্র তিনি দ্বিতীয় বার ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করেন। দৈববলে এমন দুর্লভ রত্ন লাভ করিয়া তিনি আত্মবিহ্বল হন। দিবানিশি অশ্রুজলে আপ্লুত থাকিতেন। স্বরচিত গান গাহিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন। তিনি বহু গান এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তদুত্তর সহ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর দিন কয়েক পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণে নিম্নলিখিত গানটী জাগে:—

"লওহে আমারে পিতা, তোমারি ক'রে চির দিনের তরে,
অসহায় অবলা কন্যা তৃষিত হৃদয়ে যাচে তোমারে॥
লহ লহ লহ মোরে, পদধূলি দেহ শিরে,
দাসী, নাথ! হবে ধন্য তোমারি মহিমা গেয়ে॥
এ অধম পাতকী পড়িলে কূলে, কলঙ্ক র'বে ও পরশে,
নিজ গুণে দিয়ে ধরা, নাথ! লুকা'য়ো না অনাথ ক'রে॥"

তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা এই ক্ষুদ্র গান হইতেই উপলব্ধি হয়। ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

এই ৬ই ভাদ্র তাঁহার জীবনে একটী স্মরণীয় দিন ছিল। এই দিন তিনি অত্যন্ত শুদ্ধাচারিণী ভাবে অতিবাহিত করিতেন। ইহাই তাঁহার বৈরাগ্যের প্রারম্ভ। এই সময় হইতেই অত্যন্ত নিষ্ঠাবতীর ন্যায় ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ভোগ্য বস্তু সমুদয় ত্যাগ করিলেন, সংসারের প্রতি আসক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল, নিরামিষাশী হইয়া একবেলা আহার করিতে লাগিলেন।

আমার পূজনীয় মেসোমহাশয় অত্যন্ত তেজস্বী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সরল বিশ্বাসী এবং কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, স্বীয় উন্নতিকল্পে কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি ভীষণ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। মাসীমার উদাসীনতা দেখিয়া মনঃক্ষুন্ন হইতেন, কিন্তু কিছু প্রকাশ করিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এত সাধন ভজন করিয়াও তিনি স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে বিরত হন নাই। ইহাই তাঁহার চরিত্রের অন্যতম গুণ পরিলক্ষিত হইত। স্বামীর প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল এবং আমাদের প্রতিও তাঁহার শেষ উপদেশ:—

"স্বামীর প্রতি মেয়েদের ভক্তি ও বিশ্বাস রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য, নতুবা সেই সংসারে শান্তি বিরাজ করিতে পারে না। আমার এই উপদেশ স্মরণ রাখিও।"

বাং ১৩২৫ সনের ভাদ্র মাসে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর নিকট গিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি চোখের সামনে পরলোক দেখিতেছি, শীঘ্রই আমাদের দুইজনের ভিতর একজনের বিয়োগ ঘটিবে, তাই তোমার নিকটে কতকগুলি কথা বলিতে আসিয়াছি।" তখন তাঁহাদের উভয়ের স্বাস্থ্য ভাল ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সোমবার তিনি ইহা ব্যক্ত করিয়া আসিলেন তাহার পরের সোমবারই মেসোমহাশয় মহাপ্রস্থান করিলেন। মাসীমা গুরুগম্ভীর ভাবে এই কঠোর বিধানকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া অতি শান্ত হৃদয়ে তাঁহার বৈধব্য জীবন বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন! ৭ দিন শোক তাপ মোহ হইতে অতি উচ্চ অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার ২।৩ জন আত্মীয় ও শ্রদ্ধেয় গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন:—

"আমি সুধাসাগরে আছি, এখানে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি কিছুই নাই। এমন কি তাপ উত্তাপও বোধ নাই। সুধাসাগরে অবগাহন করিয়া অবিরত শান্তিসুধা পান করিতেছি। আমার জগৎগুরু পরমস্বামীর ক্রোড়ে আমার প্রিয়তম সর্ব্বধন স্বামীকেই

দিব্যচক্ষে দেখিতেছি! তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা যায় নাই, নশ্বর দেহ আমার নিকট ছায়াবাজীর ভেল্‌কি বলিয়া উড়িয়া যায়। আজ আপনারা আমার প্রাণের গভীরতম আধ্যাত্মিক যোগে যুক্ত হউন।"

এই পত্রের উত্তরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এই........"বহু বহু সুকৃতির ফলে ইহা লাভ হয়। তোমার জীবন ধন্য এবং আমাদেরও কত কত জন্মের পুণ্যের ফলেই তোমার ন্যায় ভগ্নী আমাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শাস্ত্রে আছে, যে কুলে সৎপুরুষ কি নারী জন্ম গ্রহণ করেন, সে কুল উদ্ধার হইয়া যায়।"

স্বামীর মৃত্যুর পর পদতলে বসিয়া যে প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল:—

"পিতা, এইত তোমাকে মঙ্গলময় বলিয়া ডাকিবার উপযুক্ত সময়। এইত তোমার মঙ্গল হস্ত উপলব্ধি করিবার দিন। আজ এই অভাগিনী আমি সমগ্র প্রাণ দিয়া তোমাকে মঙ্গলময় বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তুমি মঙ্গল, মঙ্গল, তুমি চিরদিনের মঙ্গল,—আজ তোমার নামের বিজয় নিশান আমার হাতে দাও। হে প্রাণপ্রিয়তম স্বামী, আমাকে ফেলে চলিলে! তোমার কাছে শত অপরাধে অপরাধী, এই অনুতাপে প্রভু আমাকে দগ্ধ করিয়া শোধন কর। আমি ক্ষমা চাহি না, মুক্তি চাহি না, আমাকে যত ইচ্ছা পোড়াও। আমি যেন সেই সঙ্গে চিরদিন তোমাকে মঙ্গলময় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, এই ভিক্ষা মাগি।" তাঁহার এই সময়ের অবস্থায় অনেকে মনে করিলেন তিনি পাথর হইয়াছেন। তাঁহার কোনও বন্ধু কাঁদিয়া বলিলেন "ভাই কাঁদ, তোমাকে কাঁদিতে আমি দেখি।" এই কথার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে ঐ বন্ধুটী স্তম্ভিত ও গম্ভীর হইলেন।

স্বামীর মৃত্যুর সপ্তাহান্তে শাস্ত্রীমহাশয়ের অনুরোধে তিনি যে প্রার্থনা করেন, তাহা এই—"হে প্রভু, তুমি আজ এই নিঃস্ব দুঃখিনী কন্যার একমাত্র সম্বল। তুমি আজ আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। যেথানে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি কিছুই নাই, সেই অমর নিত্যধামে আমার প্রিয়তমকে মহার্ঘ্যরূপে নিবেদন করিতেছি।"

এই দিনই তিনি স্বামীশোক শেলসম বক্ষে লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "কি ভীষণ স্বামীশোক অবলার পক্ষে বুঝিলাম! তখন অগতির গতি অনাথের নাথ কাঙ্গালশরণকে ডাকিতে লাগিলাম.........আমাকে সংসারে মৃত্যুশেলও তিনি নিকটে থাকিয়া অনুভব করিবার সুযোগ দিলেন......তা না হ'লে প্রিয়তমের শোক যে কত যাতনার কিছুই উপলব্ধি হইত না।"

তাঁহার এই অবস্থা শুনিয়া স্বামীবিয়োগের পর কেহ কেহ তাঁহাকে নিকটে পাইতে চাহিয়াছেন। বোলপুরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখন পরলোকগমন করেন সেই সময় তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে তাঁহার নিকটে পাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার তৃপ্ত্যর্থে তথায় গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় অসুস্থ হইয়া অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসেন।

স্বামীবিয়োগের পর হইতেই তিনি তাঁহার পবিত্র বৈধব্য জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে স্বামীস্থাপিত "রেগুলার হোমিওপ্যাথি কলেজ"টার স্থিতিকল্পে তিনি প্রাণ মন উৎসর্গ করিলেন। উহা বিলোপ হইবে ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। বহু ঝঞ্ঝাবাতের পর পুত্রসম বিশ্বাসে শ্রদ্ধেয় ডাঃ কে কে রায় ও ডাঃ জি দীর্ঘাঙ্গীর হস্তে উহা অর্পণ করিয়া দেন। তাঁহারাও শেষ পর্য্যন্ত মায়ের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য তাঁহারা উভয়ে প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু হায়! সবই বিফল হইল।

তিনি শেষ জীবনে মাতৃস্নেহ বিতরণ করিয়া হৃদয়ের আরও প্রসার করিয়া গিয়াছেন। নিঃসন্তান ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধুর স্নেহে অনেকেই তাঁহার পুত্র কন্যার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল ভালবাসার আবিলতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার অভাবে আজ অনেকেই মাতৃহীন হইয়াছেন।

গত দুই বৎসর কঠিন রোগে আক্রান্ত হইবা মাত্র প্রথম কিছুকাল বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য শিলং প্রেরিত হন। তথায় প্রায় আড়াই মাস বাস করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়াই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। অবিলম্বে তাঁহাকে মধুপুর স্থানান্তরিত করা হইল। প্রায় দেড়বৎসর তথায় বাস করিয়া তথায় অনেকের নিকট পরিচিত হইলেন। সেখানকার সাধু সজ্জনগণ তাঁহার দেবোপম চরিত্রের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

তথায় বাসকালীন একটি প্রতিবেশী বিধবা ভদ্রমহিলা রুগ্ন পুত্র ও বধূ প্রভৃতি লইয়া অবিলম্বে বাড়ী ত্যাগ করিবার জন্য বাড়ীর মালীক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তিনি তাঁহাদিগকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দান করিয়া মহা উপকার করিলেন। তাঁহার মহানুভবতার অনেক দৃষ্টান্তই জলন্তভাবে প্রাণে জাগিতেছে।

ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি চিকিৎসার্থে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। কলিকাতাই তাঁহার কাল হইল। এখানে আসিয়াই শয্যাশায়ী হইলেন।" প্রায় ৪ মাস কাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ২৮শে আষাঢ় বুধবার বেলা ৮-৫৩ মিনিটের সময় সকল জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইয়া চিরশান্তিময়ের ক্রোড়ে স্থান লইয়াছেন। তিনি পুণ্যাত্মা ছিলেন; মৃত্যুভয় তিনি বহু পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। গত বৎসর মধুপুরে অবস্থিতিকালে রোগশয্যায় থাকিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন:—

> "যক্ষ্মারোগ দিয়ে যদি মোরে পাঠাইয়াছ মৃত্যুর দূত,
> ভয় কি বা! তব আশিস্ মানি' তাই করি আলিঙ্গন।
> বিশ্বাস মাগি প্রাণে যাতনা সহিতে,
> ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী দাও তোমাকে পূজিতে।
> মঙ্গলময় পিতা তুমি, মঙ্গল তব বিধান,
> মৃত্যুতেও রেখেছ প্রভু অমৃত-সোপান।"

তাহার পূর্ব্বে ফেব্রুয়ারী মাসে (রোগের মধ্যেই) এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন:—

> "ত্যজিয়ে অসার ভজহ সার,
> আনন্দে মন করহ বিহার।
> কি করিতে পারে, আনন্দময় হৃদে বিরাজিলে?
> দিবানিশি জপ, জপ অবিরাম,
> পরব্রহ্ম-নাম—পাবে পরিত্রাণ।"

তাঁহার মৃত্যু এক অপরূপ ঘটনা। তিনি বলিয়াছিলেন সংসারে আমার সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে। যখনই রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইতেন তিনি "দয়াময়কে" আকুল ভাবে ডাকিতেন। তিনি বলিতেন, দয়াময় নাম যার সঙ্গে আছে তার আবার ভয় কি? দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল, বাক্‌শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল, কিন্তু দয়াময় নাম অস্ফুটস্বরে বলিতে কাতর হইতেন না। তিনি মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন "তোমরা আমার মৃত্যুসময় কাঁদিও না, দয়াময় নাম করিও।" ভক্তের আকাঙ্ক্ষা দয়াময় শুনিয়াছেন এবং সেই ভাবেই তাঁকে তুলিয়া নিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন, ছেলেমেয়ে সব রাখিয়া যাইতেছি, আমার মত ভাগ্যবতী কে?" তাঁহার বৃদ্ধা জননীর অবস্থা স্মরণ করাইলে বলিলেন, "মার কপাল"। ক্রমে তাঁহার অন্তিমকাল আসন্নপ্রায় হইল, তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন "সকলকে ঘরে ডাক শীগ্‌গির।" আত্মীয় স্বজন সকলেই পরিবেষ্টিত করিয়া দাঁড়াইলেন। দুই চারিটি বন্ধুবান্ধবকেও তিনি প্রত্যুষে খবর পাঠাইয়া আনাইয়াছিলেন। সকলেই উপস্থিত—তিনি শিশু হইতে একে একে সকলের নিকট "চল্লাম" এই বলিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন এবং অস্ফুটস্বরে "দয়াল, দয়াল," নাম উচ্চারণ করিয়া অতি শান্তভাবে সহাস্যবদনে সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুদৃশ্য অতি মনোরম পবিত্র, এমন মৃত্যু দেখাও পুণ্য। তিনি মানবী ছিলেন না, ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী দেবী ছিলেন। দেবীর মতই চলিয়া গেলেন। দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাঁহার মুখে কালিমা পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মৃত্যুর অল্পপরেই তাঁহার মুখের দীপ্তি প্রস্ফুটিত হইল। কি শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য নির্ম্মল মূর্ত্তি! স্বর্গীয় বিমল আভায় উহা আরও উজ্জ্বলতর হইল। শুভ্র বসন ও পুষ্প দ্বারা তাঁহার দেহ ভূষিত করা হইল। ইহাই তাঁহার যোগ্য বেশ বলিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রতীয়মান হইল।

এমন কন্যারত্ন যে পিতামাতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশ ধন্য। তাঁহার মত হিতৈষিণী যে আমরা লাভ করিয়াছিলাম আমরাও ধন্য। কিন্তু তিনি তাঁহার বৃদ্ধা জননী এবং চিরসাথী কনিষ্ঠা ভগিনীকে শোকে ভাসাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সান্ত্বনার অবলম্বন কিছুই নাই। জগদীশ! তোমার বিধান মঙ্গলের জন্য, এই বিশ্বাস রাখিবার শক্তি আমাদের দাও। আমাদের পরমারাধ্যা মাসীমার পুণ্যাত্মা তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে চিরশান্তিতে থাকুন। আমরা যেন তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আজীবন আদর্শ করিয়া সংসারক্ষেত্রে চলিতে পারি। আজ ইহাই আমাদের সন্তপ্ত প্রাণের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১ঘটিকার সময় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রচারক গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একটু সুস্থ হইয়াও, আবার হঠাৎ অল্প কয়েক দিনের অসুখে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিগত মাঘোৎসব হইতে ৬।৭ মাস যেরূপ কাতর ছিলেন, তাহাতে অনেক সময়ই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; তবুও আবার অনেকটা সুস্থ হইয়া কয়েকদিন ব্রাহ্মবালিকা স্কুলে যাইয়া উপাসনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ভাদ্রোৎসব-উপলক্ষে সমাজে একদিন আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন, এরূপ আশা হইয়াছিল। কিন্তু আবার হঠাৎ রোগবৃদ্ধি হওয়াতে তাহা সম্ভবপর হইল না। তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়াছেন। কঠোর সংগ্রামের মধ্যদিয়াই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে আসিতে হইয়াছিল। তৎপর ১৮৯২ সনে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় তিনিই সর্ব্বপ্রথমে তাহাতে যোগ প্রদান করেন; এবং তাহার পরিচারক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপে দীর্ঘকাল তাহার সেবা করিয়াছেন। বিহারে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠায়, রামমোহন সেমিনারী স্থাপন প্রভৃতিতে তিনি প্রধানভাবে কার্য্য করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদে নিযুক্ত হইয়া তিনি দীর্ঘকাল পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যের গুরুতর দায়িত্ব বহন করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে যেরূপ প্রচারোৎসাহ ও সাধননিষ্ঠা ছিল, গভীর যোগের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার অভাব আমরা তীব্ররূপেই অনুভব করিতেছি। তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তই হইল। তাঁহার পরলোকগমনের পরেই রাত্রিতে সেখানে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় সংকীর্ত্তনাদি ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস উপাসনা প্রার্থনা করেন। পরদিবস শুক্রবার প্রাতে আবার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনা করিলে পর, তাঁহার মৃতদেহ সাধন আশ্রমে নেওয়া হয়। সেখানে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। তৎপরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত শব শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে অগ্নিসংস্কারের পূর্ব্বে আবার শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় উপাসনা করেন। বহুলোক মৃতদেহের অনুগমন করেন এবং কেহ কেহ শ্মশানে যাইয়া সম্মিলিত হন। দুঃখের বিষয় উপযুক্ত সময়ে সংবাদ না পাওয়াতে, অনেকে ইহাতে যোগ দিতে পারেন নাই।

বিগত ২২শে আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়ার পত্নী (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী) লতিকা দেবী তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া ৩৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ১লা সেপ্টেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। ২রা তারিখে আবার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস বিশেষ উপাসনা করেন। তদুপলক্ষে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে ১০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর কটকে ও কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত প্রশান্তরাওএর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য উপাসনাদি কার্য্যনির্ব্বাহ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী অবন্তী দেবী জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন।

বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-কুমার মিত্রের পত্নী ইন্দুপ্রভা মিত্রের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও স্বামী জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবু সম্মিলন ব্রাহ্ম-সমাজে ৫০৲ টাকা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ২৫৲ সাধারণ বিভাগে ১৫৲ বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ ১০৲ ও সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয়ে ২৫৲টাকা দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালী ক্রমে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—৬ই ভাদ্র প্রাতে উপাসনা। ডাঃ বি, রায় উপাসনা করেন! সন্ধ্যায় বক্তৃতা, মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি "অমঙ্গল রহস্য" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৭ই ভাদ্র প্রাতে মিঃ ডি. এন মুখার্জ্জি উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ডাঃ বি রায় "প্রার্থনায় বৈচিত্র্য" বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

গিরিডিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যসরণ দাসের কন্যাদ্বয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা হয়। এতদুপলক্ষে কন্যার জনক জননী ঢাকা অনাথ আশ্রমে ৪৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে ২৲ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৪৲ এবং গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ২৲ মোট ১২৲ দান করিয়াছেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ১৩ই শ্রাবণ ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ সভা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুমারী শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায় বি এ প্রবন্ধ পাঠ, এবং শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বিগত ২রা ভাদ্র প্রাতে কল্যাণকুটীরে মনোমোহন বাবুর খুল্লতাত কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বি এ'র পরলোকগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। সহরের ব্রাহ্ম এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকল উপাসনায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য, মনোমোহন বাবু পারলৌকিক তত্ত্ব এবং উপরত আত্মার জীবনপ্রসঙ্গ পাঠ ও প্রার্থনা, এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আশুতোষের জীবন সম্বন্ধে দুইচার কথা বলিয়া প্রার্থনা করেন। এই অনুষ্ঠানে মনোমোহন বাবুর কন্যা কুমারী লীলাময়ী আনন্দময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ে, ১৲ একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৲ এবং কোটালীপাড়া সেবাশ্রমে এক টাকা, মোট তিন টাকা দান করেন।

বিগত ৭ই ভাদ্র প্রাতে মনোমোহন বাবুর গৃহে তাঁহার প্রীতিভাজন বন্ধু বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেনের পত্নীর বার্ষিক পার-

লৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য ও পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ করেন। প্রীতি জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

নিম্নলিখিত ভাবে বরিশাল ব্রাহ্মমন্দিরে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হয়—

৩রা ভাদ্র সায়ংকালে স্মরণার্থ সভায় "ভারতে আনন্দমোহন বসুর স্থান" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ৪ঠা ভাদ্র প্রাতে এবং সায়ংকালে উপাসনা কীর্ত্তনাদি হয়। প্রাতে মন্মথবাবু এবং রাত্রিতে সত্যানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৫ই ভাদ্র সায়ংকালে আলোচনাসভা হয়; সত্যানন্দ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "ব্রাহ্মসমাজ—অতীত এবং ভবিষ্যৎ" এই বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন। বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন এই বিষয়ে কিছু বলিলে সভাপতির মন্তব্যান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। ৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার সায়ংকালে উৎসবের বিশেষ দিনে কীর্ত্তনাদি ও উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী—আগামী ১৯এ ২০এ ও ২১এ আশ্বিন (৬ই, ৭ই ও ৮ই অক্টোবর) বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর সপ্তত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন ডিব্রুগড় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্পন্ন হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণের এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিকারিদিগের ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিবার সম্মিলনক্ষেত্র। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধবে এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৫ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর) মধ্যে, ডিব্রুগড় অভ্যর্থনা কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইবেন। বিদেশ হইতে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত ডিব্রুগড় অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ হইতে করা হইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলে বিছানা সঙ্গে আনিবেন।

সম্মিলনীর অধিবেশনের সময় মহিলাদিগের স্বতন্ত্র সম্মিলন হইবে।

আলোচ্য বিষয়।

(১) ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন। (২) পরিবারে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা। (৩) আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদনের জন্য লোক প্রস্তুত করার উপায় নির্দ্ধারণ। (৪) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। (ক) আসামবাসী ও আসামের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। (৫) ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসব। (৬) অনাথ ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান ধনভাণ্ডার। (৭) বিবিধঃ—(১) Brahma Census, (২) অন্যান্য।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—বিগত প্রাথমিক বি এল পরীক্ষাতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অরুণকুমার প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম।

বন্যাপীড়িতদের সাহায্য—ভদ্রকের নিকট কাননজাদিয়াতে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে একটী সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ২৫ খানা গ্রামের ৩০০ লোককে নিয়মিত ভাবে সাহায্য করিতে হইতেছে। পরে আরও অধিক লোককে সাহায্য করিতে হইবে। ব্রাহ্মযুবকগণ নিম্নলিখিত সংগীতটি দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়া বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ দান সংগ্রহ করিতেছে:—

ওরে শোন্ আজ গগন ভেদিয়া ওঠে যে আর্ত্ত স্বর—
ভগ্ন ভিটায় কাঁদে গৃহহীন, কাঁদে কত ক্ষুধাতুর,
কাঁদে উড়িষ্যা, কাঁদে গুজরাট,
ভেসেছে প্লাবনে হাট মাঠ বাট,
দেবতা বিমুখ, আনন্দ-নাট
সহসা হয়েছে চুর।
ওগো গৃহবাসী, কাণ পেতে শোন কাঁদে কত ক্ষুধাতুর॥

(২)

সোণার আগারে জাগে হাহাকার, মার বুকে কাঁদে ছেলে,
কোন্ সে দেবতা দিল অভিশাপ, বন্যার জল ঢেলে?
গেছে সঞ্চয়, গেছে ঘর দ্বার,
অন্ন-অভাবে কাঁদে পরিবার,
অভাব দৈন্য ঘেরে চারিধার,
শান্তি হয়েছে দূর।
ওগো গৃহবাসী, ওই শোন কাঁদে গৃহহীন ক্ষুধাতুর।

(৩)

অন্ন বস্ত্র গৃহহারা চায় তোমাদের মুখপানে,
হে নগরবাসী, দাও ওগো দাও যার যা সাধ্য দানে।
দুঃস্থ মাগিছে তব কৃপাকণা,
দাও দাও সবে বিমুখ করো না,
ক্ষুদ্রের দান তাই হবে সোণা
বেদনায় সুমধুর।
ওগো গৃহবাসী, শোন শোন কাঁদে গৃহহীন ক্ষুধাতুর॥

(৪)

ওগো সুখী জন, জাগ' জাগ', দেখ দুঃখে কাহারা কাঁদে,
ওগো সুখী জন, করিবে কি হেলা দু'খের আর্ত্তনাদে?
যার যা সাধ্য তাই কর দান,
দুঃখ তাদের কর কর ত্রাণ,
দাওগো ভিক্ষা, শুধু কর প্রাণ
করুণায় ভরপুর।
ওগো গৃহবাসী, ওই কাঁদে শোন গৃহহীন ক্ষুধাতুর॥

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী।

আগামী ১৯২৮ সালের ভাদ্র মাসে ব্রাহ্মসমাজের শত বর্ষ পূর্ণ হইবে। ঐ সময়ে শত বার্ষিকী উৎসব সম্পাদনের বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। এই সময়ে অনেকগুলি পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইবে। ব্রাহ্মসমাজসমূহেরও এই শত বৎসরের ইতিহাস প্রকাশ করার প্রস্তাব হইয়াছে। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজসমূহের সম্পাদকগণকে তাঁহাদের সমাজের এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে তাঁহাদের জেলার বা প্রদেশের ব্রাহ্মসমাজসমূহের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস ৩১এ জুলাই এর মধ্যে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় সকলে এ পর্য্যন্ত বিবরণ পাঠান নাই। এই বিবরণে সমাজস্থাপনের তারিখ, স্থাপয়িতাগণের নাম, যে অবস্থাতে সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, কি ভাবে ইহার উন্নতি হইয়াছে, ইহার সংস্রবে কোনও প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ কার্য্যক্ষেত্রে এসে থাকিলে তাহার বিবরণ, সমাজমন্দির আছে কি না, থাকিলে কবে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ট্রাষ্ট ডিড আছে কি না, থাকিলে তার প্রধান প্রধান সর্ত্তগুলি কি, বর্ত্তমান ট্রাষ্টীগণের নাম কি, বর্ত্তমানে সভ্যসংখ্যা কত, কি কি প্রতিষ্ঠান আছে, সম্পাদকগণের পর্য্যায়ক্রমে নাম প্রভৃতি বিবরণ দিতে হইবে। যাঁহারা এখনও এই সব বিবরণ পাঠান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে তাহা পাঠাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, } শ্রীহেমচন্দ্র সরকার
সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩১শে ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু এম এ

Registered NO 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ১২শ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন সোমবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮
3rd October, 1927.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তুমি আমাদিগকে সত্যে ও কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিয়তই নানারূপে কার্য্য করিতেছ। তোমার জগতে অসত্য ও অকল্যাণের স্থান রাখ নাই—তাহা তোমার অমোঘ নিয়মে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবেই হইবে। তথাপি আমরা মোহবশতঃ অনেক সময় মিথ্যা ও অসারের ভগ্নস্তূপকেই আঁকড়িয়া ধরিতে ব্যস্ত থাকি, তাহার স্থানে তুমি যে সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও তাহা বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হই না। এই জন্যই আমরা তেমন দ্রুত উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমরা ত নিয়তই দেখিতেছি, আমাদের উদাসীনতা ও অবহেলার জন্য আমরা কত দুর্গতি ভোগ করিতেছি; তবু যে কেন আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না জানি না। আমাদের এই প্রিয় দেশ এখনও মহা মোহের আবেশে কিছুতেই মিথ্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, নানা আকারে তাহাকে রাখিবার বৃথা প্রয়াসেই নিযুক্ত আছে! আর, আমরা যদিও তাহা করিতেছি না, সকল প্রকার মিথ্যার দুর্গকে ভাঙ্গিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছি, আমরাও অনেক সময় কেবল ভাঙ্গিয়াই যাইতেছি, শূন্য লইয়াই তৃপ্ত থাকিতেছি, তাহার স্থানে কিছু গড়িতেছি না, সার সত্যকে বরণ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি না। তাই তুমি যে কাজে আমাদিগকে ডাকিয়াছিলে তাহা অসম্পন্নই থাকিয়া যাইতেছে, আমাদেরও দুর্গতির অবসান হইতেছে না—আমরা মহা শূন্যতার মধ্যেই পড়িয়া থাকিতেছি। হে করুণাময় সত্যস্বরূপ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের চিন্তা কার্য্য জীবন সমস্ত সত্য হউক। আমরা সত্য ভাবে তোমার হইয়া গড়িয়া উঠি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

আমার প্রাপ্য—আমি কেবল অভিযোগ করি, আমাকে কেহ সম্মান করে না, আমাকে কেহ ভাল বাসে না, আমি যার যোগ্য তাহা আমার লাভ হলো না। আমি চিরদিন অযত্ন উপেক্ষা পেয়ে গেলাম, দশ জনের কাছে অনাদরই পেলাম! দেশের ও দশের কাজ ক'রে ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে পড়ি, কেহ দেখে না, কেহ সাহায্য করে না, আদর করে না, একটা সহানুভূতির কথা কয় না। এই যে অভিযোগ, ইহাতেই মানুষকে অসুখী করে। আমি কেবল কে কি করিল না, তাহাই দেখি। কিন্তু আজ প্রভু আমাকে নূতন দৃষ্টি দিয়েছেন, আজ আমি নূতন আলোক পেয়েছি—আজ দেখ্‌ছি, মানুষ আমাকে কত আদর কর্‌ছে, কত স্নেহ ভালবাসা দিচ্ছে; আমি যে পদের যোগ্য নই তাহা দিচ্ছে, যে সম্মানের যোগ্য নই তা দিচ্ছে। আমি যা পেলাম, তা যে আমার পক্ষে অতিরিক্ত। আগে দৃষ্টি ছিল কি পাই নাই তাতেই নিবদ্ধ; আজ নূতন আলোকে কি পেয়েছি ও পেতেছি তা দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। তাই আজ আমি কত সুখী! কত আনন্দ আমার! আমার যা প্রাপ্য তার চেয়ে ভগবান্ অনেক বেশী দিয়েছেন। তাই আজ কৃতজ্ঞতা ভ'রে তাঁর চরণে প্রণাম করি, সকলকে প্রীতি জানাই।

কতটা দিবে?—প্রভুর ডাক এসেছে—কত দুঃখ দৈন্য কত রোগ শোক, কত অত্যাচার উৎপীড়ন, কত পাপ ও

কুসংস্কার! কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। প্রভু তাঁর ভৃত্যদিগকে ডাকছেন—'এস এস যার যা আছে, তা নিয়ে এস, এই উদ্যানে এসে কর্ম্মে লেগে যাও।' প্রভুর ডাক কি শুনছ না? তাঁর ডাকে সাড়া দিবে না? অন্যে এল কি না, তাই দেখছ? জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা কি করছেন, তাই দেখছ? পদ মান যাঁদের আছে, তাদের দিকে তাকাচ্ছ? ডাক যে তোমার জন্য এসেছে। আর কে কি দেয় না দেয় তা দেখবার প্রয়োজন কি? ঈশ্বর তাঁদের দেখবেন। তুমি কতটা দিবে? তিনি যখন ডাকেন, তখন সব নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে হয়। এতটা দিব এতটা দিব না, একথা এখানে বলা চলে না। তিনি জীবনের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁর ডাকে সব অর্পণ করতে হয়, তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়।

তাঁর প্রেমের পরিচয়—যখন সুখে থাক, আনন্দে দিন চলে, দশজনে ভালবাসে, দশজনে প্রশংসা করে, তখন মনে কর, তাঁর কত করুণা, তাঁর কত প্রেম! কিন্তু যখন দুঃখ দৈন্য আসে, প্রিয়জন কাঁদা'য়ে চ'লে যায়, আপনার জন পর হ'য়ে যায়, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা আসে, অপমান নির্যাতন আসে, তখন—তখন কি তাঁর প্রেম ও করুণার পরিচয় পাও না? ঐ দেখ, তোমার প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়ে তিনি তোমার শূন্য প্রাণ পূর্ণ করতে চাচ্ছেন; ঐ দেখ সব ধনে বঞ্চিত ক'রে তাঁর প্রেমধনে তোমাকে ধনী করতে চাচ্ছেন; ঐ দেখ লোকে যখন তোমাকে পরিত্যাগ করে, উপেক্ষা করে, অপমান করে, তখন তার ভিতরে তিনি তোমার জীবননাথ হ'য়ে এসে দাঁড়াচ্ছেন। দুঃখে তাঁর স্পর্শ পাই; নয়নের জলে তাঁর প্রেমের ছবি প্রতিভাত হয়। প্রাণ যখন ভেঙ্গে পড়ে, তখন তাঁর কোমল স্পর্শ অনুভব করি। সুখের দিনে তিনি নিকটে; দুঃখের দিনে তিনি আরও নিকটে। তাঁর প্রেমের তুলনা নাই। সর্ব্বত্র তাঁর প্রেমের পরিচয় পেয়ে কৃতার্থ হই।

সম্পাদকীয়।

ভাঙ্গা ও গড়া—প্রকৃতির রাজ্যে নিয়তই ভাঙ্গিবার ও গড়িবার কার্য্য সমান ভাবে চলিয়াছে—যাহা কিছু জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে তাহা অবিশ্রান্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং তৎ পরিবর্ত্তে নূতন জীবন ও শক্তি লইয়া যাহা কিছু কল্যাণকর ও উন্নতির পরিপোষক তাহা আসিতেছে। আবার তাহাও চলিয়া যাইতেছে, তাহার স্থানে অপর কিছু আসিতেছে, এই ভাবেই ক্রমোন্নতির প্রবাহ সম্ভবপর হইতেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, দুইটি বিরুদ্ধ স্রোত যেন একই সময়ে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে তাহা সত্য নহে,—এখানে একই স্রোতের দুই প্রকার কার্য্য হইতেছে মাত্র, অগ্রসর হইতে হইলেই পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিতে হয়, গড়িতে হইলেই ভাঙ্গিতে হয়, গড়িবার গতিতেই জীর্ণ যাহা তাহা, নূতনের ভার, প্রবলের চাপ, সহ্য করিতে না পারিয়া, আপনা হইতেই চূর্ণ হইয়া যায়, অপসারিত হয়। প্রকৃতিরাজ্যে একই মাত্র শক্তি কার্য্য করিতেছে; সুতরাং সেখানে একটি অপরটির অবশ্যম্ভাবী ফল রূপেই আবির্ভূত হয়, কখনও একের বর্ত্তমানতা ও অপরের অভাব দেখা যায় না। মানবজগতে কিন্তু সকল সময় ঠিক সেরূপ ঘটে না—সেখানে একটি কার্য্য দ্রুত বেগে চলিতেছে, অপরটি হয়ত এত ধীর গতিতে ঘটিতেছে যে, তাহার কোনও অস্তিত্ব বুঝিতেই পারা যাইতেছে না, আর তাহা বুঝিতে পারা গেলেও দুই এর মধ্যে বহু দূরত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মানবজগতে দুইটি শক্তি কার্য্য করিতেছে—বিশ্ববিধাতা মানুষকে কতকটা স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আপনার সাহচর্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। যদিও তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তিকে ব্যর্থ করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, তবুও মানুষ আপনার সহায়তা বা বিরোধিতার দ্বারা তাঁহার কার্য্যকে কিছু সময়ের জন্য কতক পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিতে পারে—সে গতিকে দ্রুততর বা মন্দতর করিতে সমর্থ হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, সময় সময় মানবসমাজ যেন গতিহীন নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, আবার কোন সময় হয়ত তাহার মধ্যে ভাঙ্গিবার স্রোত প্রবল বেগেই বহিতেছে, কিন্তু গড়িবার স্রোত নিতান্তই ক্ষীণপ্রবাহে চলিতেছে, গড়িবার কোনও লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছে না, অথবা অপর সময়ে উন্নতির স্রোত, গড়িবার স্রোত, বেশ স্বাভাবিক দ্রুত গতিতেই অগ্রসর হইতেছে। মানব সমাজের সকল দিক সম্বন্ধেই—জ্ঞান বিজ্ঞান, সামাজিক রীতি পদ্ধতি, নীতি ও ধর্ম্ম, সকল বিষয়েই—ইহা সত্য। মানবজীবনে ধর্ম্মই সকল কার্য্যের মূল প্রস্রবণ, অপর সকলই ইহা হইতে উদ্ভূত; সুতরাং আজ শুধু ধর্ম্মক্ষেত্রেই আমরা ইহা প্রয়োগ দেখিতে চেষ্টা করিব—তাহাতেই আমাদের আলোচনা আবদ্ধ থাকিবে। বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের ধর্ম্মের স্রোত মলিন ও পঙ্কিল হওয়াতেই, রুদ্ধগতি, মৃতপ্রায় হওয়াতেই, সকল প্রকার জাতীয় দুর্গতি ও অধঃপতন উপস্থিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে এদেশের ধর্ম্ম সত্যকে ছাড়িয়া মিথ্যা ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহার ফলে ইহাতে নানা কুসংস্কারের জঞ্জাল সঞ্চিত হইয়া ইহাকে বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্যই এই দেশের ধর্ম্ম উন্নতি ও কল্যাণের কারণ না হইয়া গুরুতর অকল্যাণ ও অবনতির হেতুভূত হইয়াছে। কিন্তু বিধাতার মঙ্গল বিধানে এরূপ অবস্থা চিরকাল চলিতে পারে না। পুঞ্জীকৃত জঞ্জালরাশি বিদূরিত করিয়া প্রাণপ্রদ ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য বিশ্ববিধাতার কার্য্য জগতে প্রতিনিয়তই চলিয়াছে। এ দেশ তাঁহার সে কার্য্যের বাহিরে নয়—এখানেও তাঁহার সে কার্য্য পূর্ণমাত্রায়ই চলিয়াছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, মঙ্গলবিধাতা বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার ও আবর্জ্জনাসকলকে দূর করিবার নানা প্রকার ব্যবস্থাই করিয়াছেন—এ দেশের জীর্ণ পুরাতন ধর্ম্মসৌধ নানাদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ধূলীসাৎ হইতেছে এবং তাহার স্থানে নূতন উন্নত সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণের সূচনাও তিনি করিতেছেন। বন্ধু ও শত্রু যাঁহারা জ্ঞাতসারে এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের ছাড়া অপর অনেক শক্তিও অজ্ঞাতসারে এই কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। তাই চারিদিক হইতে আক্রান্ত

হইয়া ইহা অতি দ্রুতবেগেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাকে এইরূপ-ভাবে বিলোপ প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, এক শ্রেণীর লোক আশঙ্কা করিতেছেন ধর্ম্মই বুঝি চিরকালের তরে লুপ্ত হইতে চলিল সুতরাং এই পতননিবারণের জন্য তাঁহারা আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে নানা প্রকার চেষ্টা যত্ন করিতেছেন, বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইঁহারা তাহাকে ভিতরে বাহিরে আস্তর করিয়া, রং চং দিয়া, একটু সুদৃশ্য আকারে দণ্ডায়মান রাখিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। এই ভাবে যে উহাকে রক্ষা করা সম্ভবপর নয়, কিছুতেই সে পতন নিবারিত হইবার নয়, যাহা অন্তঃসারশূন্য তাহা যে কিছুতেই দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, এই কথা তাঁহারা মোটেই ভাবিয়া দেখেন না। যাহাতে উহা একেবারে কদর্য্য না দেখায় এবং লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহার জন্য ইঁহারা যতটা ব্যস্ত, উহাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও প্রকৃত পক্ষে কল্যাণজনক করিয়া রাখিবার জন্য ততটা চেষ্টিত নহেন। যদি সে ভাবনা ও চেষ্টা থাকিত, তবে অসার মিথ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, সারকে কুসংস্কারাদি আবর্জ্জনা রাশি হইতে মুক্ত করিয়া, যাহা সুদৃঢ় সত্যে প্রতিষ্ঠিত শুধু তাহা উপযুক্ত সংস্কারের সহিত রাখিয়া, অপর সমস্ত ভাঙ্গিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া, উহাকে স্থায়ী কল্যাণকর আশ্রয় করিয়াই লইতেন। এই সময়ে আমাদের দেশে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে মত্ত হইয়া থাকে, তাহা মিথ্যা কল্পনা ও অজ্ঞানতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পূর্ব্বে উহার মধ্যে কিছু সারবত্তা ছিল, জীবনপ্রদ শক্তি ছিল। তাই তখন উহার দ্বারা কিছু কল্যাণও সাধিত হইত। উহার মধ্যে যে সরল বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, তাহা অন্ততঃ লোকের ধর্ম্মভাবকে অনেকটা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে সে বিশ্বাস ভক্তিও নাই, ধর্ম্মভয়জনিত যে সাধারণ সততা ও সাধুতা ছিল তাহাও নাই।

এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে পুরাতন অন্ধবিশ্বাস, কাল্পনিক দেবদেবীতে আস্থা স্থাপন আর কোনও ক্রমেই সম্ভবপর নয়। নানা দিকের প্রবল আক্রমণে সে জীর্ণ অট্টালিকা আর কিছুতেই দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। সাক্ষাৎ আক্রমণ অপেক্ষাও অলক্ষিত পরোক্ষ আক্রমণ, ভিত্তিকে শিথিল করিয়া, উহার ধ্বংসসাধন দ্রুততর করিতেছে। নানা প্রকার মিথ্যা যুক্তি, আপাতমনোরম ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিবার চেষ্টা কিছু কালের জন্য লোকের চক্ষে ধূলী নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেও, তদ্দ্বারা উহা বিন্দুপরিমাণেও দৃঢ়ীকৃত হইবে না, বরং উহার ভিত্তি অধিকতর শিথিলীকৃতই হইবে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বাহিরের হৈ চৈ ও বহ্বাড়ম্বর সত্বেও, বর্ত্তমানের পূজা অনুষ্ঠান একেবারেই প্রাণহীন, তাহার মধ্যে তামসিকতা ভিন্ন একটুও সাত্ত্বিকতা নাই, সরল বিশ্বাস ভক্তির, প্রকৃত ধর্ম্মভাবের, লেশ মাত্র নাই—সকলই অন্যকে দেখাইবার ও বুঝাইবার অভিনয়মাত্র। বর্ত্তমান ধর্ম্মহীনতা ও সাংসারিকতার স্রোতদর্শনে ভীত হইয়া সরল ভাবেই যে অনেকে এই প্রকারে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও, অবলম্বিত উপায় কোনও মতেই ফলপ্রদ নহে। ধর্ম্মকে একেবারে লুপ্ত হইতে দেখিয়া ভীত হওয়া স্বাভাবিক। পুরাতন ধর্ম্মের সৌধসকলকে ভূমিসাৎ হইতে দেখিয়া স্বভাবতঃ মনে হইতে পারে, সবই বুঝি চির দিনের জন্য লুপ্ত হইল, তাহার স্থানে আর কখনও দৃঢ়তর ও সুন্দরতর ধর্ম্মসৌধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বোধ হয় সম্ভবপর হইবে না। এই জন্যই ইঁহারা তাহাকে যে কোনও উপায়ে দণ্ডায়মান রাখিবার জন্য এত ব্যস্ত। কিন্তু ইঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, এরূপ বৃথা চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া, সত্য ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে যত্নশীল হইলেই অধিকতর সফলতা ও কল্যাণলাভ সুনিশ্চিত। ধর্ম্মভাব মানুষের প্রকৃতিনিহিত, উহাকে লুপ্ত ও বিনষ্ট করিবার শক্তি কাহারও নাই। বরং ধর্ম্মাবহ মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার বিধানে তাহাকে বিকশিত ও বর্দ্ধিত করিবার আয়োজনই জগতে নিয়ত চলিয়াছে—জগতের প্রত্যেক ঘটনা সেই মঙ্গল বিধাতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্য কোনও বিরুদ্ধ শক্তি হইতে এ জগতে কিছু ঘটে না। এই যে ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা, ইহাও তাঁহারই মঙ্গল বিধানের অন্তর্গত, তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইহাতে সমস্ত ধূলিসাৎ হইলেও ভয়ের কোনও কারণ নাই। এই পথে সাময়িক ভাবে মহা শূন্যতা আসিতে পারে,—আসিয়াও থাকে। ইহা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয় প্রকার জীবন সম্বন্ধেই সত্য। ঘোরতর সন্দেহ ও অবিশ্বাস জ্ঞান ও বিশ্বাসেই উপনীত করে, সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে। ঘোর ধর্ম্মহীনতা ও সাংসারিকতার মহা দুঃখ ক্লেশ ধর্ম্ম ও ত্যাগের পথেই লইয়া যায়, তাহার মূল্য ও আনন্দ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ করে। সুতরাং আমাদিগকে নির্ভয়ে বিধাতার প্রাকৃতিক কার্য্যে সহায়তাই করিতে হইবে—যাহা ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তাহাকে ভাঙ্গিতেই দিতে হইবে, তাহাতে বৃথা প্রতিবন্ধকতা করিতে হইবে না; অপর দিকে, তাহার স্থলে যাহা গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাকে সুদৃঢ় সত্যের ভিত্তির উপর সুন্দর ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে খাটিতে হইবে, অবহেলা ও উদাসীনতাবশতঃ কোনও অংশকে অসম্পূর্ণ ভাবে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না, অথবা ভ্রান্তি ও মোহ বশতঃ মিথ্যা কুসংস্কারাদির সঙ্গে জড়িত করিয়া দুর্ব্বল করিলেও চলিবে না। সরল সংশয় ও অবিশ্বাস, এমন কি বিদ্রোহিতা, হইতেও বেশী ভয়ের কারণ নাই। তাহার আক্রমণে অসার মিথ্যাই চূর্ণ হইবে। তৎসঙ্গে কিছু সার সত্যও যদি সাময়িক ভাবে পতিত হয়, তাহাতেও আশঙ্কার বিশেষ কোনও হেতু নাই। কেননা, সরল সংশয় অবিশ্বাস বা বিদ্রোহিতা চিরদিন থাকিবার নহে; চিন্তা পরীক্ষা, আলোচনা অনুসন্ধান, সংগ্রাম ও ঘাত প্রতিঘাতের ফলে উহা অল্পদিনের মধ্যেই বিদূরিত হয়, সহজেই গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এবং সরল সাধু আকাঙ্ক্ষা ও জীবনীশক্তি থাকাতে, তখন প্রবল বেগে নূতন পথে সকল চেষ্টা যত্ন ধাবিত হয়, সমগ্র হৃদয় মনের সহিত গঠনকার্য্যে তাহা নিয়োজিত হয়। পরিবর্ত্তিত নবজীবনপ্রাপ্ত সাধকদিগের জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। উদাসীনতা ও অবহেলাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক অবস্থা—উহা মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র, উহাতে জীবনীশক্তির কিছু মাত্র

পরিচয় নাই। উহা ভাঙ্গেও না গড়েও না, বর্জ্জনও করে না গ্রহণও করে না, যাহা যেরূপ আছে তাহাকে সেই ভাবেই থাকিতে দেয়—ঘোরতর মিথ্যা অসারতার মধ্যে, প্রাণঘাতী অকল্যাণকর দুর্নীতি ও কুসংস্কারের মধ্যে, বাস করিয়াও কোনও প্রকার অস্বস্তি বোধ করে না, বেশ আনন্দ আয়াসেই কাল কাটায়। ইহা অপেক্ষা দুর্গতির অবস্থা আর কিছু নাই। এরূপ জীবনে পরিবর্ত্তন বা উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। গতি থাকিলে ত গতি পরিবর্ত্তিত হইবে, জীবনী শক্তি থাকিলে ত উন্নতি সম্ভবপর হইবে। আমাদের চারিদিকে এরূপ শ্রেণীর লোকই যে বেশী তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কেহ কেহ গতানুগতিক ন্যায়ে প্রাণহীন ভাবে চির প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। অধিকাংশ লোক তাহাও করিতেছে না, শুধু খাওয়া পরা, আমোদ প্রমোদ লইয়াই ব্যস্ত আছে,—এ সকল অনুষ্ঠানের কোনই ধার ধারে না, প্রকৃত ধর্ম্মের ত নয়ই। ইহা যে শুধু বাহিরেরই অবস্থা তাহা নহে। আমাদের মধ্যেও দিন দি এই শ্রেণীর সংখ্যা যে বাড়িয়াই যাইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং আমাদের অবস্থা যে নিরাপদ, এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। বাহিরের ও ভিতরের সকলের অবস্থাই নিতান্ত বিপদসঙ্কুল। এ বিষয়ে উভয়ের সম্বন্ধেই আমাদের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, আমাদের পক্ষে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। ইহার বিষময় ফল হইতে সমাজ ও দেশকে রক্ষা করিবার জন্য যদি আমরা এখন আপ্রাণ চেষ্টা না করি, তবে অবিলম্বে দেশও রসাতলে যাইবে, আমাদিগকেও মহামৃত্যুর মধ্যেই ডুবিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে ইহা অনেক পরিমাণে আমাদের কার্য্যেরই পরোক্ষ ফল। অসার মিথ্যা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, দীর্ঘকালাগত অনিষ্টকর কুসংস্কারজর্জ্জরিত, অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক অনুষ্ঠানের জীর্ণ প্রাণঘাতী ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে, সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, প্রাণপ্রদ বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্যই আমরা আহূত হইয়াছি। বিশ্ববিধাতার নিকট হইতেই তাঁহার এই কার্য্যে সহায়তা করিবার ভার আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমরা আমাদের কর্ত্তব্য উপযুক্তভাবে সম্পন্ন করিতে পারি নাই। সত্য ধর্ম্মকে সম্যক প্রকারে সাধন ও প্রচার করিতে সমর্থ হই নাই। আমরা যতটা ভাঙ্গিয়াছি ততটা গড়ি নাই—আমাদের অধিকাংশ শক্তি ভাঙ্গাতেই ব্যয়িত হইয়াছে, গড়ার জন্য আর বিশেষ কিছু বাকী থাকে নাই। ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি সমান ভাবে গড়িতে পারিতাম, তবে কখনও এরূপ দশা হইত না। আমরা নিশ্চয়ই লোকের সম্মুখে এমন কিছু ধরিতে পারিতাম, যাহা পাইবার ও অনুসরণ করিবার জন্য লোক স্বভাবতঃই আগ্রহান্বিত হইত। তাহারা কখনও এই জীবনপ্রদ সত্যধর্ম্মকে গ্রহণ ও অনুসরণ না করিয়া উদাসীনতা ও অবহেলার সহিত দূরে রাখিয়া দিতে পারিত না। সত্যের শক্তি সর্ব্বত্রই অজেয়। সত্য আপনার প্রভাব বিস্তার করিবেই। আর ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ভাঙ্গা কার্য্যটাও আমরা বর্ত্তমানে তেমন ভাল করিয়া করিতে পারিতেছি না। দুর্ব্বলতা বশতঃ আমরা অসত্যের দুর্গকে যেন পূর্ব্বের ন্যায় প্রবলভাবে আঘাত করিতে পারিতেছি না—সন্ধি স্থাপন করিতে যাইয়াই হউক বা ক্লান্তি ও নিরাশা বশতঃই হউক, আঘাত করিলেও অতি কোমল হস্তেই আমরা আঘাত করি; তাহাতে সে সকল জীর্ণ দুর্গও ভূমিসাৎ হয় না, আর সেজন্য লোকের প্রাণে বিশেষ উৎসাহও জাগে না। অনেকেই যেন মনে করে, উহা থাকিলেও যা না থাকিলেও তা, বিশেষ কোন ইষ্ট বা অনিষ্টের কারণ কোথাও নাই। এই ভ্রান্তির ফলে অনেক মিথ্যা কুসংস্কারের অন্তঃরসারশূন্য দুর্গ বেশ মাথা উচু করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে, অনেকে তাহার প্রতি একটু মমতাও পোষণ করিতেছে, আমরাও দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছি, আমাদের শক্তি কিছুমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না—সত্য ও কল্যাণের, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের, অট্টালিকা একটুও গড়িয়া উঠিতেছে না, আমাদের মধ্যে প্রকৃত প্রচারোদ্যম ও সাধননিষ্ঠা কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। আশা করি এ দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। আমরা আর নিশ্চেষ্টভাবে শক্তি ও সময় নষ্ট করিব না। সমগ্র হৃদয় মন দিয়া অবিলম্বে এই উভয় প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত হইব এবং বিশ্ববিধাতার মঙ্গলকার্য্যে সহায়তা করিবার, সংসারে সত্য ও পুণ্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার, বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে সাধন ও প্রচার করিবার, যে গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যভার আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সম্যকরূপে পালন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব

সাধনে দৃঢ়তা।

বর্ত্তমানকালে নানা প্রকার চিত্তবিক্ষেপকারী কারণ চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান। নানা প্রকার উদ্বেগ, শত প্রকার আলোচনা, এ সকলের মধ্যে থেকেও কি প্রকারে জীবনের প্রধান কাজ ধর্ম্মসাধন এবং প্রচারে মনোযোগী থাকা যায়, এই চিন্তা করিতে করিতে একটা কথা অনেকবার মনে পড়েছে। Railway station এ train ছাড়িবার পূর্ব্বে যেখানে Luggage করা হয়, সেখানে দাঁড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহাদের Luggage ওজন হয়েছে তাঁহাদের অবস্থা এবং clerk এর অবস্থায় কত প্রভেদ। যাঁহাদের Luggage এর ticket কর্ত্তে হবে, তাঁহাদের এক সেকেণ্ড দেরী সয় না, মহা ব্যস্ত, সকলেই বলিতেছেন "আমার টিকেটটা লিখে দেন মহাশয়, আর দেরী নাই, আমার Luggage এর এত ওজন।" ব্যস্ততা, কোলাহল, ডাকাডাকি। clerk কিন্তু pencil নিয়ে একমনে হিসাব করছেন, খাতা বার করছেন; ডাকাডাকিতে জবাব নাই, কাণ দেওয়া নাই, আপন মনে কাজ করিতেছেন। অত লোকের ডাকাডাকি, কার কথায় কাণ দেবে? একটু উত্তেজিত হ'লে হিসাবে ভুল হ'তে পারে, তাহ'লে তাকে তিরস্কৃত হ'তে হবে, হয়ত সাজা পেতে হবে। এই জন্য, এত কোলাহল ও ব্যস্ততার

---

৩ রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯০৩ খৃঃ, সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত।

মধ্যে ধীরভাবে আপন কাজটী করিতেছেন। তোমার দেরী সয় না, তা সে জানে না। একটি Luggage এর হিসাবাদি শেষ না হইলে সে আর কোন কথায় কাণ দিতে পারে না।

অনেকবার এই একাগ্রতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। এইরূপেই সংসারে কাজ করিতে হয়। সকলের কথায় কাণ দিলে সেই clerk একখানা Ticket ও করিতে পারিত না। প্রধান কাজে মন থাকা চাই।

আমাদের প্রধান কাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, পরিবারে ও সমাজে ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। এই যে কঠিন ব্রত ব্রাহ্মেরা এবং আশ্রমের লোকেরা লইয়াছেন, তাহাতে যদি মানসিক বলের সহিত, একাগ্রতার সহিত লাগতে না পারেন, তবে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

সভ্যজগতের নানাপ্রকার বিক্ষিপ্ততার মধ্যে থেকেও, আমাদের প্রধান কাজ ছাড়া অন্যান্য কোলাহলাদির প্রতি বধির ও অন্ধ হ'তে হবে। এরূপ মনের জোর না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের মত ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মসাধন সম্ভব নহে।

অর্থোপার্জ্জন, পরিবারপালন প্রভৃতি সবই করিতে হইবে, কিন্তু আসল কাজে মন রাখা চাই। ঐ clerk এর মত দৃঢ়ভাবে, ব্রাহ্মদের এবং আশ্রমের লোকদের, আসল কাজটী ধরিয়া বসিতে হইবে। নতুবা সব বৃথা।

লোক খাওয়াবার সময় অনেকবার দেখা গিয়েছে, পরিবেশন করিবার লোকের অভাব নাই, তবু ঠিক মত কাজ হইতেছে না, একদিকে একবারও তরকারী পড়ে নাই, অপর দিকে দুইবার পড়িয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ঐ পরিবেশনকারিগণ আপন কাজ স্থির করিয়া লন নাই। সকলেই সকলের কথা পালন করিতে প্রস্তুত। কেও নিজের একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ ধরিয়া নাই। তরকারী দিচ্ছেন, একজন জল চাহিবামাত্র তরকারী ফেলে জল দিতে গেলেন; কেও লুচি দিচ্ছেন, একজন লবন দিতে বলিবামাত্র লুচি রাখিয়া লবন আনিতে গেলেন! কাজেই যত বেশী লোক, তত বেশী গোল।

আমাদের ধর্ম্মসাধন ঐরূপ। পাঁচজনায় বসিয়া আলোচনা করি; কাল যাহা ধরিয়াছি, আজ তাহা পরিত্যাগ করি। সকলের কথায় কাণ দিই! এমন মনের বল নাই, এমন শক্তি নাই যে, আসল কাজটাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখি। মানবের জিহ্বার আগায় উড়িয়া বেড়াই। এইরূপে অনেকদিন গিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচার জন্য মনের বল চাই। মন দৃঢ় করিয়া না ধরিলে সাধন হচ্ছে না। ব্রহ্মো পাসনা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। ব্রহ্মো পাসনা ব্রাহ্মেরা ধ'রে রাখতে পারছে না।

সংসারের সাধারণ কাজেও দৃঢ়তার দরকার হয়। আহারের জন্যও জোর ক'রে একটা নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়। একটা নিয়ম রাখ্‌তে হ'লে, কিছু মনের জোর চাই। এইরূপ নিয়ম না থাকিলে—পড়ার সময় Exercise, খেলার সময় পড়া, এরূপ হইলে—এক দৃঢ়তার অভাবে পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলার অভাবে সুখ থাকে না।

ধর্ম্মসাধনের জন্যও ঐরূপ মনের দৃঢ়তা চাই—নির্দ্দিষ্ট নিয়ম চাই, শৃঙ্খলা চাই। দৃঢ়ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময় রাখা চাই—যে সময় বিশেষ বিপদ ব্যতীত কোনও মতেই অন্য কাজ করিব না। এই দৃঢ়তা না থাকলে সব ভেঙ্গে যায়। এই দৃঢ়তার অভাবে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মসাধন হচ্ছে না। আমাদিগকে ঐ কেরাণী বাবুর মত সকল প্রকার কোলাহলে বধির হ'য়ে, একাগ্রমনে আসল কাজটি লইয়া থাকিতে হইবে।

পরলোকগত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহের অন্তর্গত রায়পুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে পিতৃদেবের জন্ম হয়। তিনি পিতামহ স্বর্গগত রামলোচন চক্রবর্ত্তীর অষ্টম সন্তান। পিতৃদেবের ৯।১০ বৎসর বয়সের সময়ই তিনি পরলোকগমন করেন। যদিও তাঁহার সহিত পিতার সংসর্গ খুব অধিক দিনের হয় নাই, তথাপি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অতি বাল্যকালেই পিতৃদেবের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। পিতামহ রামলোচন অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে প্রায় চার ঘটিকার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বহু দেব দেবীর স্তুতি পাঠ করিতেন। যদি কোন দিন সেই সময়ে পিতৃদেবের নিদ্রাভঙ্গ হইত, তাঁহাকে কাছে বসাইয়া মুখে মুখে শ্লোক মুখস্থ করাইতেন। তাহার পর প্রায় এক মাইল দূরে নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। নদীতে যাইবার সময় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যাইতেন। আসিবার সময়ও সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। তখন প্রায় ৭টা কি ৭॥ টা হইত। তাহার পর কার্য্যক্ষেত্রে যাইতেন। প্রায় ১১টার সময় কার্য্য হইতে ফিরিতেন। আসিয়াই পূজায় বসিতেন। প্রায় ২টার সময় পূজা শেষ হইলে ভোজন করিতেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আবার কার্য্যক্ষেত্রে যাইতেন। সন্ধ্যার পরে আসিয়া পাঠ ও জপে বসিতেন। গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবৎ প্রভৃতি পাঠ করিতেন। পিতামহের এইরূপ জীবনের প্রভাব অতি বাল্যকালেই পিতার হৃদয়ে গভীর ভাবে বসিয়া যায়।

পিতৃদেব অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি প্রায় সকল সময় মাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিতেন। অল্প বয়সেই পিতৃদেব পিতৃহীন হওয়াতে, তাঁহার মাতাই পিতা ও মাতা উভয়ের স্থান অধিকার করেন। তিনিই তাঁহার ধর্ম্মগুরু। পিতা কোন দেবতা বা গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। সমস্ত দিন উপবাসের পর তাঁহার মাতাই তাঁহাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। পিতামহী দেবদেবীতে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সর্ব্বদাই বলিতেন, "সবই এক। আসল দেবতার ত কোন মূর্ত্তি নাই, আসল দেবতা ভক্তের নিকটই দর্শন দেন।" পিতাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। গৃহ হইতে কখন আসিবার সময় প্রণাম করিয়া বিদায় লইলে, তিনি নিজের হাতে তাঁহার পায়ের ধূলি পিতার কপালে মাখাইয়া

শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সুকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পঠিত।

দিয়া বলিতেন, মায়ের পদধূলিতে সব নিরাপদ হইবে। বৃদ্ধ বয়সেও কখনও গৃহে গেলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে তাঁহার হাতে মাথা রাখিয়া শয়ন করিতে বলিতেন।

বাল্যকালে গৃহবিগ্রহের উপর পিতার অতিশয় ভক্তি ছিল। নিজ হস্তেই তিনি ঠাকুরঘরের সমুদয় কার্য্য করিতেন। সেই জন্য তাহাকে অনেকে শ্রদ্ধা করিত। সে সময়ে গ্রামে এখনকার মত কোনও বিদ্যালয় ছিল না। পিতৃদেব কিন্তু একটি টোলে অধ্যয়ন করেন। ময়মনসিংহের বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার জন্য (১৮৭৫ খৃঃ অব্দে) সর্ব্বপ্রথম ময়মনসিংহ নগরে গমন করেন। এবং সেখান হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সেখানে নানা বাধাবিঘ্ন ও কষ্টের মধ্যে Zilla school হইতে Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি প্রথম ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত পরিচিত হইলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পূর্ব্বে কোনও সহপাঠী বন্ধুর নিকট তিনি সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম ও রাজা রামমোহনের কথা শ্রবণ করেন। ময়মনসিংহে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ক্রমে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা করিতে দেখিয়া গ্রামের কোনও লোক এই সকল কথা বাড়ীতে জানায়। মাতা মরণাপন্ন, হঠাৎ তাঁহাকে এই সংবাদ দেওয়া হয়। পিতা প্রায় ৪০ মাইল পথ হাঁটিয়া অনাহারে ক্লেশে বাড়ীতে গেলেন। যাইয়া দেখেন সব মিথ্যা। বাড়ীতে যাইয়াই তিনি বন্দী হইলেন। ১৭ দিন পরে অনেক সংগ্রামের পরে, মাতা জীবিত থাকিতে পৈতা ফেলিবেন না এই প্রতিশ্রুতি দিয়া, ময়মনসিংহে ফিরিবার অনুমতি পাইলেন। ভবিষ্যতে এই প্রতিশ্রুতি রাখিতে পারেন নাই। একদিন কলিকাতা মাঘোৎসবের উদ্যানসম্মিলনের উপাসনার পর তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিল, পৈতা রাখা কি তাঁহার নিকট কপটতা নয়? তিনি কি আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছেন না? একদিন পিতা বলিয়াছিলেন, সেইদিন মাতার নিকট প্রতিশ্রুতি রাখিতে পারি নাই, কিন্তু পরম মাতার কথাই জয়যুক্ত হইল। তিনি পৈতা ফেলিয়া দিলেন।

Entrance পরীক্ষা পাশ করিবার পর ঢাকা কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া আনন্দমোহন বসুর সিটিকলেজ হইতে এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর বিএ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; পরীক্ষার মাত্র তিন মাস বাকী এমন সময়, কোন ঘটনাবশতঃ পাঠ ত্যাগ করিয়া, ময়মনসিংহে আনন্দমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত সিটি স্কুলে শিক্ষকতাকার্য্য লইয়া ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইতে হয়। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় কেদার নাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত কলিকাতায় পিতার বিবাহ হয়। বিবাহের পর ময়মনসিংহেই অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মপল্লীতে একটি গৃহ ও জমি ক্রয় করিলেন।

ময়মনসিংহে আসিয়া তিনি নানা প্রকার কার্য্যের সহিত যুক্ত হইলেন এবং শীঘ্র সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। স্কুলের কার্য্য, সমাজের কার্য্য, ছাত্রদের কার্য্য, মিউনিসিপালিটির কার্য্য প্রভৃতি সকল কার্য্যে তিনি মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। পিতা যে কতদূর জনপ্রিয় ছিলেন একটি ঘটনায় তাহা জানা যায়। একবার মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্ব্বাচনের সময় পিতা কমিসনারের পদপ্রার্থী হন। একজন অর্থশালী, অপর একজন গভর্ণমেণ্ট অফিসারও, সেই পদপ্রার্থী ছিলেন। পিতা সেই অফিসার অপেক্ষা অনেক বেশী ভোট পাইয়া কমিশনার নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই সময়ে পিতার ক্রমে তিনটি সন্তান হইয়াছিল। হঠাৎ মাত্র দুই দিনের রোগে দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু হয়। ইহাই পিতার জীবনের প্রথম পুত্রশোক। ইহা তাঁহার প্রাণে অতি নিদারুণ ভাবে বাজিয়াছিল। ইহার উপরে জ্যেষ্ঠপুত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল। পিতা তখন সকলকে মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লইয়া গেলেন। সেখানে তিন মাস অবস্থান করেন। পিতা তাঁহার ডায়ারীতে লিখিয়াছেন, এই তিন মাসের নির্জ্জন বাস তাঁহার জীবনের একটী প্রধান অধ্যায়। ছাত্রজীবনে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বাহিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর ভিতর দিয়া আজ যেন তাহা অন্তরে প্রবেশ করিল। এতদিন শুধু মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল, দেবতার আসন পাতা হয় নাই। মৃত্যুর বেদনায় দেবতা হৃদয়মন্দিরে আসন বিছাইয়া লইলেন। পিতা নির্জ্জনে বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেন এই দৃশ্যমান জগৎ কি? যে শিশুকে এত ভালবাসিতেন তার দেহ নাই, তবে কি আছে? এই সন্তানের সন্ধান করিতে গিয়া পিতা অনন্তের সন্ধান পাইলেন। সেই জন্য পিতা পরে এই মৃত সন্তানের নাম দেবকুমার রাখিয়াছিলেন।

পিতা ব্রহ্মের চরণে জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। সে বৎসর উৎসবের সময় কলিকাতায় থাকিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে এই সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। সেই বৎসরই ১৮৯২ খৃঃ অঃ শাস্ত্রী মহাশয় সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি পিতাকে আশ্রমের প্রথম পরিচারক রূপে গ্রহণ করিলেন। ময়মনসিংহের কার্য্য ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় পূজনীয় প্রকাশ দেব ও সুন্দর সিংজী আশ্রমে যোগ দিলেন। তখন হইতে পশ্চিমে একটি মণ্ডলী গঠনের কথা হয়। পরে ইহাদের ও পিতৃদেবকে প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা প্রায় দুই বৎসর আরায় থাকিয়া কার্য্য করেন। ইহার পর ১৮৯৫ সনে বাঁকিপুরে গমন করেন। সেই স্থানে একটি আশ্রম স্থাপিত হয়।

পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোনও স্কুলে ভর্ত্তি করিতে গিয়া শিক্ষকদিগের ভিতর নৈতিক জীবনের অভাব দেখিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। এই সময় শাস্ত্রীমহাশয় আসিয়া বাঁকিপুর স্কুল স্থাপনের কথা তুলিলেন। পিতা নূতন বল পাইয়া কার্য্যে লাগিলেন। বহু পরিশ্রমের ফলে রামমোহন রায় সেমিনারি সংস্থাপিত হইল। বাঁকিপুরের নানা ঘটনায় ও কার্য্যে পিতার নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ সেবা ও ত্যাগের যে সকল পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অতুলনীয়। বাঁকিপুরে একবার ভয়ঙ্কর প্লেগ রোগ দেখা দেয়। অনেকে সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহারা কোথাও যাইতে পারিল না তাহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল। ঘরে ঘরে কেবল ক্রন্দনের রোল। শেষে ক্রন্দনও বন্ধ হইল, কাহারও জন্য শোক করিবারও কেহ রহিল না। কোনও গৃহে

মৃত দেহ পড়িয়া আছে দাহ করিবার কেহ নাই। কোনও গৃহে মৃত মাতার বুকে মুখ গুজিয়া শিশু কাঁদিতেছে, দুগ্ধ দিবার কেহ নাই। শাস্ত্রীমহাশয় পিতাকে বাঁকিপুর ছাড়িয়া আসিবার জন্য টাকা পাঠাইয়া দিলেন। পিতা লিখিলেন বাঁকিপুরকে এই অবস্থায় ফেলিয়া আসিতে পারিবেন না। সরকার এই প্লেগ প্রতিরোধের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারিল না। খৃষ্টীয় মিসন তাহাদের দ্বার রুদ্ধ করিল। পিতা নিজের ও সন্তানদিগের জীবন বিপন্ন করিয়া দ্বারে দ্বারে ঔষধ ও পথ্য দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। শ্রান্তি নাই, নিদ্রা নাই, পিতা যেন দৈব বলে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহার বছর দুই পরে এই দুরন্ত প্লেগ রোগে দ্বাদশ বর্ষ বয়সের একটি সন্তানের মৃত্যু হইল। হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন; কিন্তু কার্য্যে বিরত হইলেন না। পিতার অক্লান্ত সেবার কাহিনী পাটনার দরিদ্র জন সাধারণ আজও ভুলিতে পারে নাই।

এই সকল কার্য্য ব্যতীত Behar Institute, Temperance Society, Night Schools প্রভৃতি স্থাপনের সহিত পিতা বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৭ সনে যখন পিতা বাঁকিপুর ছাড়িয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন, তখন সকলেই পিতার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। ঢাকায় আসিয়া Female Education Enquiry Committee এর সদস্য রূপে অনেক কার্য্য করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ঢাকায় রামমোহন রায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া ঢাকার নানা কার্য্যের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। পিতা পারতঃ পক্ষে কোনও রাজনৈতিক কার্য্যে যোগ দিতেন না; কারণ, তাহা তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল না। কিন্তু বঙ্গবিচ্ছেদের পর নানা প্রকার অবিচার দেখিয়া পিতা স্থির থাকিতে পারিলেন না। এক দিন প্রকাশ্য সভাতে গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গবর্ণর ও অনেক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী পিতার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারের পর পিতা তাঁহাদের সম্পর্ক প্রায় এক প্রকার ছাড়িয়া দিলেন। কোনও কমিশনার পিতাকে এক দিন লিখিয়া পাঠান "আপনি আমার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় কেন আর আসেন না? রাজনৈতিক মত যাহাই হউক না কেন, আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের পথে তাহা কোন রূপেই বাধাস্বরূপ হইতে পারে না।" পিতা নিজের ব্যক্তিগত প্রভাবে অনেক রাজবন্দীকে মুক্তি দানের চেষ্টা করেন এবং সফলকাম হন।

ঢাকা ছাড়িয়া পিতা পুনরায় আশ্রমের ভার লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি পুনরায় ঢাকায় প্রেরিত হন। কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার শরীর অল্প অল্প করিয়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ করাতে একেবারে ঢাকা ছাড়িয়া আসিলেন। সুভাস বসু প্রভৃতির অবরোধের বার্ত্তা শুনিয়া জীবনে শেষবার রাজ নৈতিক সভাতে যোগদান করেন। গত বৎসর রঞ্জিৎকুমারের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার জীর্ণ দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক বৎসর কাল যাইতে না যাইতে পিতা ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন।

বাহিরের নানা কার্য্যের সহিত যুক্ত হইয়াও পিতা জীবনের প্রধান ব্রত ও কার্য্য হইতে কোনও দিন বিরত হন নাই। ছাত্রজীবনে যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসেন ও প্রথমে পুত্রশোকে যে অনন্ত জীবনের আস্বাদন পান, তাহাই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ছিল। এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি অনেক দুঃখ দারিদ্র্য লাঞ্ছনা পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোনও দিন তাহাতে বিরক্ত হন নাই। তিনি তাঁহার সমস্ত প্রাণ মন ও দেহ ব্রহ্মের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন। অতি দীন দাসের ন্যায় তিনি জীবনের কার্য্য সমাপন করিয়াছিলেন।

পিতা একভাবে আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ গৃহী ছিলেন। পিতা আমার মাতাকে সহধর্ম্মিণীরূপেই পাইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হইয়া মাতাকে পাইয়া ধর্ম্মজীবনে যথেষ্ট সহায়তা পান। পিতা মাতার নিকট প্রায় সকল কথাই বলিতেন ও প্রায় সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন।

পিতা শত অভাবের মধ্যেও আমাদিগকে যেরূপ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পিতা আমাদের একাধারে বন্ধু ও গুরু ছিলেন। রোজই অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কাছে ডাকিয়া বসিতে ভাল বাসিতেন। আমাদের সহিত পিতা বন্ধুর ন্যায় গল্প করিতেন ও অনেক বিষয় লইয়া আমাদের সহিত অনেক সময় তর্ক করিতেন। অনেক সময় তিনি আমাদের খেলাতেও যোগ দিয়াছেন। তিনি আবার নানা বিষয় লইয়া গভীর উপদেশ দিতেন। ঢাকায় থাকিতে অনেক সময় রাত্রিতে Astronomy শিখাইতেন। অন্ধকার রাত্রিতে আমরা আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতাম, তিনি আমাদিগকে বুঝাইতেন কোন গ্রহ কত বড়, কোন নক্ষত্র কত দূর। রাত্রি গভীর হইত। পিতা বলিতেন তোমাদের জ্ঞান যত বাড়িবে, যত জানিবে এই সৃষ্ট জগৎ কত বড়, ততই বুঝিবে ভগবান কত বড় ও অনন্ত। নানা কার্য্যভার থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের এত কাছে আসিতেন ও এত ভালবাসিতেন যে প্রকাশ করা যায় না।

গৃহের প্রত্যেক বিষয়েই পিতার দৃষ্টি ছিল। গৃহের সকলকেই তিনি সমান ভাবে আদর করিতেন। এমন কি ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত সে আদর হইতে বঞ্চিত হইত না। পিতা ভালবাসিয়া সকলকে আপনার করিয়া লইতেন।

এক কথায় পিতা আদর্শ ব্রাহ্ম গৃহী ছিলেন। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন কি করিয়া করিতে হয়, তিনি তাহার উজ্জ্বল । তিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। সংসারী হইয়াও তিনি চিরসন্ন্যাসী। দুঃখ বিপদে তিনি কখনও অধীর হইয়া পড়েন নাই। ভগবানের উপর অটল বিশ্বাস তাঁহার একমুহূর্ত্তের জন্যও শিথিল হয় নাই।

তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল--সময়ের অপব্যবহার করিতেন না ও অপব্যবহার করিতে দিতেন না। কোন অনুষ্ঠান কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হইবার কথা থাকিলে, ঠিক সেই সময়ে কার্য্য আরম্ভ না করিলে বলিতেন, এই সময় সুবিধা হইবে না জানিলে অন্য সময় দিলেই ভাল হইত। এত দেরী করিয়া

অনেককে অসুবিধায় ফেলা ঠিক নয়। ঘড়ির কাঁটার ন্যায় তাঁহার জীবন নিয়মিত করিয়াছিলেন।

চিঠি পত্র লেখা বিষয়েও তাঁর সুন্দর পদ্ধতি ছিল। দেখিয়াছি এক এক দিন তাঁহার নামে ১০।১৫ খানা পর্য্যন্ত চিঠি আসিয়াছে। তিনি প্রত্যেক চিঠির উত্তর যথা সময় দিতে কখনও ভুলিতেন না।

তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুরা খুব ভাল বাসিতেন। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও তাঁর বন্ধুর অভাব ছিল না। অনেক গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান, খৃষ্টান ও European পিতাকে খুব শ্রদ্ধা করিত। হিন্দু সমাজের অনেক মহিলা ও যুবক পিতাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন।

পিতা চিরক্ষমাশীল ছিলেন। যারা তাঁহার খুব নিন্দা ও ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেন, তাদের তিনি বিশেষভাবে উপকার করিতেন। কখন কোন শত্রু কি মিত্র পিতার নিকট হইতে কোনও বিষয়ে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান নাই। মৃত্যুর তিন চার দিন পূর্ব্বেও একটি মুসলমান ও একজন নমশূদ্র ছাত্রের সাহায্য করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন এবং সেই জন্য নিজ হস্তে চিঠি দিয়াছিলেন।

পিতার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল :—"ভগবানকে প্রাণ দিয়া ভাল বাস ও সকল নরনারীকে আত্মবৎ প্রীতি করিও।" "প্রাণ ব্রহ্মপদে ও হস্ত কার্য্যে তাঁর।" তাঁহার সমস্ত জীবনে ছোট বড় কার্য্যের মধ্যে এক ভাব সকল সময়ই দেখা যাইত।

ভগবানে তাঁর কি অটল বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল, তাহা এই দুটো ঘটনায় বেশ বুঝা যায়—যাহা আমার ভ্রাতা অজিৎকুমার এবং রণজিতের মৃত্যুতে ঘটিয়াছিল। ১৯০৫ সালে অজিতের যখন প্লেগ রোগে মৃত্যু হয়, সেই দিন প্রাতের এক ঘটনা এখনও আমার মনে জাজ্বল্যমান রয়েছে। আমার ভ্রাতার মৃত্যুর ১ ঘণ্টা পরে, যে ডাক্তার আমার ভাইটিকে দেখিতে আসিতেন তিনি আসিলেন। বাবা তখন আমাদের বাংলার বারাণ্ডায় এক চেয়ারে বসিয়া ছিলেন এবং ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা করিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার উপর কাল তাঁহার সহিত নানা কথা বার্ত্তা বলিলেন। এমন কি পিতাকে খুব জোরে জোরে ২।১ বার হাসিতেও শুনিয়াছি। কিন্তু ভিতরে মাতার ও অন্যান্য আত্মীয়ের অল্প অল্প কান্না শুনিয়া ডাক্তার মাঝে মাঝে বিচলিত হইতেছিলেন। তখন হঠাৎ ডাক্তার পিতাকে বলিলেন "চলুন, একবার রোগীকে দেখি।" বাবা হাসি মুখে বলিলেন "আর দেখে কি হবে? এখন সে নিরোগ, যাঁর জিনিস তিনি তাকে নিয়ে গিয়েছেন।" এই কথা শুনে সেই ডাক্তার একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং পরে কয়েকজন বন্ধুর কাছে বলিলেন, গুরুদাস বাবু সাধারণ মানুষ নন, দেবতুল্য এবং প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি।

আমার আর এক ভ্রাতা যখন ২১ বৎসর বয়সে গত বৎসর মারা যান, তখনও পিতা এতটুকু বিচলিত হন নাই। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চিৎকার ক'রে বার বার বলিতে লাগিলেন, দয়াময় দীনবন্ধু দয়াল পিতা, তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হোক। সকলকে কি ভাবে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন তাহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

যতদিন জীবিত ছিলেন কোনও দিন উপাসনা বাদ দেন নাই। এমন কি মৃত্যুর ঠিক আগের দিনের এক ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে একরূপ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন—কাউকে ভাল চিনিতে পারিতেছিলেন না, কাহার সহিত কোনও কথা বলিবার শক্তি ছিল না। এবং একটি কথাও কাহারও সহিত বলেন নাই। সেই দিন বিকেল চারটা সময় আমি এবং আরও দুইজন সেই ঘরে বসিয়া ছিলাম, ঘরের সব জানালা বন্ধ ছিল—বেশ অন্ধকার—হঠাৎ বাবা বেশ পরিষ্কার স্বরে গান আরম্ভ করিলেন

"তুমি যদি কাছে থাক মা,
তবে কি আমি দুঃখেরে ডরি—

এই সঙ্গীত সম্পূর্ণ গাহিলেন এবং বার বার পূর্ণাঙ্গ উপাসনা, উদ্বোধন, আরাধন ও প্রার্থনা সব করিলেন এবং শেষ কালে বেশ জোরে জোরে 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্' বলিয়া হাত তুলিয়া ২।৩ বার প্রণাম করিলেন। সেই সময় মা ঘরে আসিলেন; তখন বাবা মাকে কাছে ডাকিয়া কি বলিতে গেলেন; তাহা বলা হ'ল না, শুধু শোনা গেল "আর ২৪ ঘণ্টা"। তার ১০ মিনিট পর হইতে হিক্কা আরম্ভ হইল এবং মৃত্যু অবধি আর জ্ঞান হয় নাই।

পিতা যখন উপাসনার সময় আরাধনা করিতেন তখন মনে হইত তিনি এই মর্ত্তলোক ত্যাগ করিয়া অন্য কোন রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মুখের সরল জ্যোতি ও ব্যাকুলতা সকলের প্রাণ স্পর্শ করিত।

পিতার গুরুদাস নাম সার্থক হইয়াছিল—যে ভগবানকে যৌবনে গুরুপদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, চিরকাল তাঁহার দাস ভাবেই সেবা করিয়াছেন, কখনও এতটুকু অবহেলা ত্রুটি করেন নাই।

আমাদের স্নেহময় পিতা আজ আর ইহ জগতে নাই। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্ত লোকে যাত্রা করিয়াছেন—তাহার জীবনের ইতিহাসের কর্ম্মপ্রবাহের পশ্চাতে যে দেবতাকে তিনি হৃদয়ের অতি নিকটে পাইতে তৃষিত ছিলেন, আজ তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন তাঁহার পদানুসরণ করি, তাঁহার সন্তানের যোগ্য হইতে পারি।

হে মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি যা কর সব মঙ্গলের জন্যই কর। আমরা অতি ক্ষুদ্র, অতি অবুঝ; তাই সকল সময় তোমার লীলা বুঝতে পারি না। আমি আজ তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তোমার প্রিয় সন্তান যিনি সংসারের সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল তোমারই সেবা করিয়াছিলেন—তাঁহাকে তুমি আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান কর এবং উন্নত হইতে উন্নতর লোকে লইয়া যাও। আর যাঁহারা তাঁহার প্রিয়জনেরা এখানে রহিলেন, তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন কর। আমার পিতা যে পতাকা লইয়া চলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বহন করিবার জন্য উৎসাহ এবং বল দাও—যেন আমরা সেই পিতার উপযুক্ত সন্তান হইয়া তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারি।

স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্ত্তী

ভবলীলা সাঙ্গ করি—'ভক্ত গুরুদাস'—
গিয়াছেন দিব্যধামে মায়ের আহ্বানে,
নিত্য সুখ নিত্য শান্তি যথা বার মাস,
জরা মৃত্যু শোক তাপ নাহিক যেখানে।
উৎসর্গীলা আপনারে সমাজের কাজে,
পবিত্র প্রচার ব্রত করিয়া গ্রহণ,
জীবন করিলা পাত বিভিন্ন সমাজে,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন।
সাধারণ সমাজের আচার্য্যের পদে
ব্রতী হ'য়ে বহুদিন সাধিলা সে কাজে,
এতদিন মহাসুখে কাটি নিরাপদে,
শুনিলা মৃত্যুর ডাক হৃদয়ের মাঝে!
এমন মধুর ভাব সংসারে বিরল
পর প্রেমে আত্মহারা, আত্মপরজ্ঞান
ছিল না তাঁহার কভু, এমনি সরল,
পরহিতে একেবারে ঢেলে দিত প্রাণ!
এক সঙ্গে মিলিয়াছি মোরা কত বার
এমনি চরিত্রবান—মধুর প্রকৃতি,—
সংসর্গে অসাধু ভাব থাকিত না আর,
শান্ত শিষ্ট সাধু ভক্ত ধর্ম্মে সদা মতি।
হারা'য়ে এ হেন জনে সমাজের ক্ষতি,
একে একে অনেকেই গিয়াছেন চ'লে.
লোকের অভাব তাই সমাজেতে অতি,
বড়ই ব্যথিত মন শোকের অনলে!
বর্ত্তমানে কর্ম্মী যাঁরা আছেন সমাজে,
অধিকাংশ জরাজীর্ণ নাহি সুস্থকায়,
তারাও যাওয়ার মুখে মরণের মাঝে,
কে কখন চ'লে যাবে বলা নাহি যায়!
যাও যাও 'গুরুদাস' সুখ শান্তি ধামে,
অনন্ত আরামে সেথা ভুঞ্জ চিরকাল,
র'জে থাকো মধুমাখা দয়াময় নামে,
ব্যবধান নাহি যথা ইহ পরকাল॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

অমর কথা (৮)

অমৃত পান

(২)

ভয়ের কথা কোথায় বল?
সবার বুকে হাসি,
তিনি আর আমির মাঝে
সকল গেল ভাসি।
যাক্ না কেন ছাই হ'য়ে
ধূলির দেহ ধূলায়,
দিবানিশি প্রেমসোহাগে
সকল দুখ ভুলায়।
প্রেমপুলকে মধুপরশে
আনন্দগান বাজে,
উধাও হোল দুখনিশি
শান্তি সুখ রাজে।
প্রেম-আশীষে উঠ্‌ল ভ'রে
হৃদি-অর্ঘ্যথাল,
রইল পড়ে সকল খেলা,
ছেড়ে দিনু হাল।
প্রেম-উজানে যাব ভেসে
প্রেম-তীর্থধাম,
প্রেমঘরেতেই রইব ম'জে,
বুক জুড়ানো নাম।
কোথায় গেল ভবের খেলা,
যতেক দুখ-গান,
ফুরিয়ে গেল মোহদ্বন্দ্ব,
ছিঁড়্‌ল সকল টান।
দাঁড়ানু আজ সবার কাছে,
বঁধুর ঘরেই মোর,
বুকের মাঝে আনন্দরাজ,
দুখ-নিশি ভোর।
মরণমাঝে শরণ জাগে,
অমর হওয়া বর,
মিল্‌ল যত হারানিধি
মিলনমধু-ঘর।

বিশ্বাস ত করি জীবনে জীবনে প্রতি ঘটনায় প্রকৃতির বুকে বিচিত্র রহস্য লীলার দেবতার দেবমন্দিরে কত অসংখ্য প্রাণ! সবই সে আনন্দলীলা—সবই বিধাতার পরম সৃষ্টি। এই অনিত্য লীলাপুরেই নিত্য লীলার আনন্দ আভাসে প্রাণ মন পুলকিত। সুখ দুঃখ আমাদেরই পাপ পুণ্যের পরিণতি ফল।

ধন্য সে ভাগ্যবান মানুষ, যাঁর হৃদয় শান্ত গম্ভীর, কোন পরিবর্ত্তন হৃদয়কে আন্দোলিত করে না—যাঁকে কোন দুশ্চিন্তা, কোন উচ্ছ্বসিত ভাব আকুল করে না, যাঁর হৃদয় নিবিড় শান্ত শুদ্ধ জ্যোতিপ্রভায় উদ্ভাসিত। সে আনন্দ চঞ্চল মোহমুগ্ধ মানুষের উপলব্ধি কর্‌বার শক্তি কোথায়?

প্রকৃতির আনন্দবুকে কি নব নব সুষমা! মধুমাসে মঙ্গল অরুণ উষার কি মঙ্গল ছটা! বালার্কের অমল জ্যোতিছটা শ্যাম কুঞ্জবনে, তার কি উজ্জ্বল কান্তি! প্রভাতমর্ম্মর-হিল্লোলে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলবালার কি মৃদুমধুর লীলা মাধুরিমা, শিশিরসিক্ত শ্যামল পত্রদলের কি স্নিগ্ধ পুণ্য জ্যোতিপ্রভা! গিরিপ্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর সুমধুর কল্লোলধ্বনিতে পর্ব্বত বন কান্তার আনন্দে মুখরিত। উচ্চে নীচে বিহগ-কলসঙ্গীত, ভ্রমরের গুঞ্জনগান প্রাণের ঘরে কিসের ভাব যেন জাগিয়ে তোলে! বুকের ঘরে

ও কি অব্যক্ত আনন্দসঞ্চার। তন্ময়তার ভিতর সমস্ত দেহ মন স্তব্ধ হ'য়ে যায়! আর দুনয়নে অশ্রুসলিল ঝর ঝর ধারে যখন ঝরতে থাকে, ও কি মন্দাকিনী ধারা! তখন মনে হয় সে মঙ্গল উষায় উধাও হ'য়ে যাই। গম্ভীর শ্যামশোভায়, নীলাম্বরের নীলিমায়, নীলসাগরের কোন অজানা পারে যেন ভেসে যাই। এম্‌নি কোরে প্রাণের অব্যক্ত প্রেম বিশ্ববুকে ছড়িয়ে যেতে চায়।

যখন ক্লান্ত শয়ানে অনন্ত আকাশে কাননে কান্তারে প্রকৃতির বনচ্ছায়ে শান্ত সরল গ্রাম্য ছবিতে এ দীন উদাস আঁখি উধাও হ'য়ে যায়, তখন কোথায় দুঃখ, কোথায় ব্যর্থ বোঝার উৎপীড়ন? সকল কোলাহল স্তব্ধ, অব্যক্ত শান্তিপ্রবাহিনী নেমে আসে, অশান্তি কুহেলী ঘনঘটা কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়! ধন্য এ শাশ্বত বিমল আনন্দ সম্ভোগ।

ধন্য প্রকৃতির শান্ত নীরব কোমল ছবি, তপ্ত বুকে কি আরাম এনে দেয়! ধন্য ভক্তপ্রাণ যাঁরা সকল সংসারের দৈন্য কোলাহলের ভিতরই শান্তযোগে যোগী হন। আর কর্ম্মপীড়িত মানুষ যদি বা প্রকৃতির শান্ত বুকে মাথা রেখে ক্ষণিকের জন্য সব ভুলে যায়, যেই কোলাহলে কর্ম্মস্রোতে ভেসে যায়, আবার সেই দৈন্য ক্লান্তি। কেন এ অশান্তির আগুন বুকে জ্ব'লে ওঠে! এ কি আমারই অসংযত প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল?

ভগবদ্বিশ্বাসী প্রাণসকল অশান্তি কোলাহলের ভিতরও শান্তি আনন্দ আরাম লাভ কোর্‌তে চান শান্তিময়ের শান্ত সহবাসে —বিশ্বপিতা পাতা পরিত্রাতা পতিতপাবন দীন দুঃখী কাঙালের আশ্রয়; তাই ত আশা, তাই ত দুঃখ ঝঞ্ঝার ভিতর আশার আনন্দ-হিল্লোল ব'য়ে যায়। আজ ঘনতম অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে, জানি আবার জ্যোতিষ্কলোকে সব হেসে উঠ্‌বে। মঙ্গলদাতা সকলের মূলে। ধনাই হই আর নির্ধনী হই, নিন্দিত হই কি প্রশংসনীয় হই, সবই কল্যাণ নিয়ে আস্‌বে। জানি বহির্জ্জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত নয়, আমার অন্তর্জ্জগতে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। যদি ঈশ্বরসহবাস আমার নিত্য সহবাস হয়, যদি শুদ্ধ মন প্রাণ হয়, জানি স্বর্গধনে বঞ্চিত হব না।

প্রতি জীবনেই দেব-আশীর্ব্বাদে এক মঙ্গল মুহূর্ত্ত আসে যখন আপনা হোতে তার পথ কত স্নিগ্ধ সুন্দর উজ্জ্বল হোয়ে উন্নত লোকে যায়। যা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করি, যা কিছু আহার করি, পরিধান করি, কেহ আমায় প্রশংসাপত্র দিল কি না দিল, কিছুতে এসে যায় না, কিছুতে অন্তরের শান্তি বিনষ্ট হয় না। যদি আমার অন্তরাত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই নির্ম্মল আনন্দ ভোগের অধিকারী হয়।

কত উপাখ্যান মানবের ইতিহাসে, কত নিষ্কলঙ্ক নিরপরাধী সাধুজীবনে অগ্নিপরীক্ষা, উপেক্ষা, ব্যর্থ কলঙ্কদান, নির্য্যাতন, নিষ্পেষণ; কিন্তু একদিন আসে যেদিন ভুল ভেঙে যায়, ন্যায়ের আলো জ্বলে ওঠে। সেদিন সে ভুলের জন্য কে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করে? কত ভুলবোঝার কঠোর বিচারে কত মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হোয়ে যাচ্ছে! তবুও যদি হৃদয়ে শান্তি থাকে, তবে কে নিষ্পীড়িত কোরবে? নীরব অশ্রুপাতের ভিতরই যদি নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ কোরতে পারি, তবেই শুদ্ধ মঙ্গল স্বভাব লাভ হয়। তাইত সকল বেদনায় পীড়িত হোয়েও চিত্ত সাধনা কোরতে হয়, ক্ষুদ্রতার ঘন অজ্ঞানরাশি দূরে ফেলে নিত্য শাশ্বত আনন্দলোকে যাত্রা কোরতে হয়।

শৈশবে যৌবনে বার্দ্ধক্যে সেই একই দেবজ্যোতি, দেবসত্তা, জীবনে জীবনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌তে চায়। এই মানবের দীন যাত্রায়ও সে দেব-আনন্দজ্যোতি ফুটে ওঠে; তাইত শুভমুহূর্ত্তে তার শুভলোকের যাত্রার আকুল আয়োজন।

জননীবুকে মাতৃস্নেহ-পীযূষধারায় কি পুণ্যধারা প্রবাহিত হয়! প্রাণপুত্তলীর মধুর আননজ্যোতিতে জননীপ্রাণ স্নেহ-চুম্বনের ভিতর শিশুর কি পুণ্য সত্তা আপন সত্তাতে উপলব্ধি করেন! শিশুর নিত্য নূতন ভঙ্গিমার ভিতর কিসের মঙ্গল সুষমা উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে? জনকজননীর এ নির্ম্মল আনন্দসম্ভোগের সঙ্গে কোন্ ঐশ্বর্য্যসম্ভোগের তুলনা হবে? দুঃখ আসে, ব্যথা আসে; শিশুর কমনীয় মুখজ্যোতিতে সকল ব্যথা হরণ করে। ভিখারীর ঘরে যে আনন্দমেলা, হয়ত রাজরাণীও সে সুখে বঞ্চিতা।

এই যে হৃদয়ের ভাবলহরী, কত ভাবে তা কর্ম্মতন্ত্রকে স্পন্দিত করে। শান্ত শুদ্ধ প্রেমের আনন্দ প্রকাশই জীবনে জীবনে। সভ্য অসভ্য সকলেই শিশুর সরল স্নিগ্ধ কোমল পবিত্র মুখ-জ্যোতিতে আকৃষ্ট হন। সে শুভ্র জ্যোতি আশৈশব উজ্জ্বল হোয়ে থাকে! তবে চিরদিনই তাহা আকর্ষণের বস্তু। মানবমন স্বভাবতই সরলতাপ্রিয়; তাই শিশুর সরল সহবাসে দেহমন সরস হোয়ে ওঠে। কত দৈন্য অসরলতা! তাই নিয়ে কোন্ সাহসে শিশুর সম্মুখীন হোতে চাই? কত দুর্ব্বলতা, কত ত্রুটী, শিশুর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ্‌তে হয়!

জীবনে সকল অভিজ্ঞতার ভিতর এ ব্যথাই পরিস্ফুট হোয়ে উঠ্‌ছে—হৃদয়ের শান্তি বহির্ম্মুখীন ধন জনে প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতি মানবের শুদ্ধ শান্ত স্বভাবেই তার সকল শান্তি। এক এক শুভক্ষণে আমাদের সদ্ভাবকুসুম কি মধুর সুবাসে ভ'রে ওঠে! তখন যা কিছু ভাবি, যা কিছু দেখি, সব সুগন্ধে আমোদিত হ'য়ে ওঠে, তখন সকল হিংসা দ্বেষ দূরে চোলে যায়, তখন বিশ্বের সুখ দুঃখে আমার সুখ দুঃখ জড়িত হোয়ে আসে, তখন সকলের আনন্দে আমার আনন্দ, তখন শত্রু মিত্র ভেদাভেদ চ'লে যায়, তখন বিশ্বপ্রেমের নব উদ্বোধনে প্রাণ উদ্বোধিত হোয়ে ওঠে। সত্য ধর্ম্মপ্রেরণাই ইহার প্রাণধন, তাইত ভক্তমুখের বাণী "নির্ম্মল আত্মারা ধন্য, তাঁহাদের হৃদয়ে দেবতার পুণ্য আসন চির-বিরাজিত।

নির্ম্মল চিত্তের নিত্য সাধনার ভিতরই শান্তি! ক্ষণে ক্ষণে সত্যভ্রষ্ট হই; তাইত ব্যর্থ দৈন্য বেদনার বোঝা বহন কোরতে হয়। বহির্ম্মুখীন জগতে শান্তি খুঁজ্‌তে গিয়ে সত্যভ্রষ্ট হই, অসত্যের অন্ধকারে আত্মজ্যোতি হারিয়ে ফেলি। দেখি ত সংসার চিরদিন আরাম দিতে পারে না, পাগলের মত দিশেহারা হোয়ে ঘুরে মরি—কোথায় আরাম, কোথায় আনন্দ? পরাধীনতার ভিতর স্বাধীনতা, অবিবেচনার ভিতর বিবেকের মাহাত্ম্য, ভয়ের ভিতর অভয় সত্তা খুঁজ্‌তে চাই, তাইত এ দুর্দ্দশা! জাগুক্ প্রার্থনা—ওগো দেবতা, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত কর। দেখ ক্রোধের বশবর্ত্তী হোয়ে ভাই ভাইকে কত পীড়িত করি, কত অসত্যের ভিতর দিন যাপন করি, হৃদয়নিভৃতে কত হিংসা দ্বেষ জটিল দ্বন্দ্ব জমে ওঠে! কত ব্যর্থ আকুল পিয়াসায় ছুটে চলি। যশের গৌরবে, ধনে

জনে মাঁনে সংকীর্ণ মন ক্ষুব্ধ হোয়ে ওঠে। এম্নি কোরে কি নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ হবে? কোথায় হৃদয়ে সে ক্ষুদ্রাতীত শাশ্বত ভূমানন্দের আকাঙ্ক্ষা?

যদি নিত্য শান্তি লাভ হয়, তবে অপরের আনন্দে যে আমারও আনন্দ। ধন জন মানেই যদি শান্তি থাকবে, তবে চিরদিন ধরে মানুষ আর কিছু পেতে চেয়েছে কেন? কেন তবে এ ইন্দ্রজাল? শান্ত হও, স্তম্ভিত হও, করজোড়ে দাঁড়াও, যা ক্ষুদ্রে মেলে না, সেই ভূমানন্দের ভিখারী হোয়ে এস। পরমানন্দে বিশ্বপিতার সঙ্গে শিশুর মত মুক্ত হোয়ে বাস করি। বহির্মুখীন ভোগের ভিতর কেন আর ছুটোছুটি? বিবেকের মঙ্গলবাণী শুনে মঙ্গলদাতার চরণে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন কোরতে শিখি। সকল দৈন্য ক্ষুদ্রতা দূর হোয়ে যাক্, বিধাতার বিচিত্র দান আত্মপ্রভাবে কঠোর ব্রতপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, সাধনার নিত্য জাগরণমন্ত্র গ্রহণ করি। দীনাত্মায় দেবজ্যোতি উদ্ভাসিত হোয়ে উঠুক, আত্মলোক আত্মজ্যোতিচ্ছটাতে জ্যোতির্ম্ময় হউক্।

প্রেমময় দয়াময়, তোমার স্নেহ প্রেম সবই যদি আনন্দ তবে এ মৃত্যুবিভীষিকা কেন? আমি যে তোমার বরাভয় আশ্রয়ে বাস করি। কোথায় অনিষ্ট, অমঙ্গল? সকল ধনে বঞ্চিত হোলেও যে তোমার অভয় সত্তায় বাস করি। সে অধিকার থেকে কে বঞ্চিত কোরবে? প্রিয়ধন সব একে একে বুক ছিঁড়ে চ'লে যায়, তবু আছি সে অমৃতবুকে। মরণসখা যে প্রাণসখারই মঙ্গল দূত। তারই বুকে আমার সকল কিছু; সেই আশাতেই ঐ বুকেই মাথা রাখ্‌তে চাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক--বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান তদীয় পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ শাস্ত্রপাঠ, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সুকুমার জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সান্ত্বনা রায় প্রার্থনাপাঠ ও পত্নী প্রার্থনা করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর সাধনাশ্রামে তাঁহার স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়; তাহাতেও শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রপাঠ করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে এক স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন, অক্ষয়বাবু প্রার্থনা করেন এবং দশ বৎসর কাল ঘনিষ্ঠযোগে যুক্ত থাকিয়া তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মভাব বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার যে পরিচয় পাইয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন।

গত ৯ই ভাদ্র ঢাকা নগরীতে পরলোকগতা সুখদা নাগের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রায় সাহেব সতীশ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী উপাসনা ও পাঠ, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ পত্রপাঠ এবং ভ্রাতা প্রার্থনা ও জীবনী বিবৃত করেন।

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ঢাকা নগরীতে মিঃ আর কে দাস তাঁহার ভ্রাতা পরলোকগত ভবানীচরণ দাসের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী শাস্ত্রপাঠ করেন। এই উপলক্ষে অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডারে ৫৲ নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে ৫৲ ও ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

রামমোহন স্মৃতি সভা—বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর 'টাউন হলে' রাজাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ উপলক্ষে এক বিরাট স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্কুল কলেজ আফিস ২৭শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই বন্ধ হইবে বলিয়া, ঐ তারিখ সভা আহূত হয়। সহরের গণ্য মান্য ভদ্রমণ্ডলী সভায় উপস্থিত ছিলেন। রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় (C. I. E.) গভর্ণমেণ্ট উকিল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ রাজার স্বরচিত গান—'ভাব সেই একে'—গীত হওয়ার পর, রায় বাহাদুর দীননাথ সান্যাল রাজার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। খাঁ বাহাদুর মৌলবী আজিজল হক উকিল (M. L. C.) রাজার ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি কিরূপ উদার মত ও গাঢ় শ্রদ্ধা ছিল তৎসম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অবশেষে বাবু গোলোকচন্দ্র দাস রাজার ধর্ম্মসম্বন্ধে সার্ব্বভৌমিক মতের উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিশ্বজনীন উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জনৈক নির্দ্দিষ্ট বক্তা পীড়িত হইয়া সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় ইংরাজীতে একটি লিখিত মন্তব্য সভায় প্রেরণ করেন। অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার দাস উহা পাঠ করেন। উপসংহারে সভাপতি মহাশয় রাজার সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া-দৃষ্টান্তস্থলে সতীদাহনিবারণ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বর্জ্জন, স্ত্রীশিক্ষাপ্রচলন এবং হিন্দু কলেজ সংস্থাপন প্রভৃতি দেশহিতৈষণার উল্লেখ করেন এবং রাজার যে স্বদেশপ্রীতি ও দেশানুরাগ একান্ত ছিল তাহা প্রদর্শন করেন। অবশেষে গিরীন্দ্রনাথবাবু সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

রাজর্ষি রামমোহন রায়ের পরলোকগমনের চতুরাধিক নবতিতম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে সাধারণব্রাহ্মসমাজমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে এলবার্ট হলে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে একটি সঙ্গীত হইলে পর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস প্রার্থনা করেন। অনন্তর সভাপতি মহাশয় ইংরাজীতে তাহার অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা এবং শ্রীমতী কুমুদিনী বসু একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সময়ে রামমোহন রায় লাইব্রেরী গৃহে এবং ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজেও দুইটি সভার অধিবেশন হয়।

শিবনাথ স্মৃতিসভা—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনের অষ্টম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে স্মৃতিসভার অধিবেশন তাহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত সমাজের ঊনপঞ্চাশত্তম বার্ষিক উপাধি বিতরণ সভায় রায়সাহেব সতীশচন্দ্র

ঘোষের পুত্রবধূ শ্রীমতী পদ্মিনী ঘোষ পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত সমাজের সংস্কৃত কাব্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "সাহিত্য সরস্বতী" উপাধি ও নানা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষাতে ফাজিলতন নেছা নাম্নী একটি মুসলমান ছাত্রী গণিতে প্রথম বিভাগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় মালতী চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান ও শান্তি দে ইতিহাসে প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

কৃতী ছাত্র—বিগত এম এ পরীক্ষাতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র সুধেন্দুকুমার ইংরাজি সাহিত্যে (বি গ্রুপ) ও গুরুদাস বাবুর দ্বিতীয় জামাতা সরোজেন্দ্রনাথ রায় ভারতীয় ইতিহাস ও শিক্ষায় (দ্বিতীয় গ্রুপ), প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমার বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ১৪ই আগষ্ট কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া খুলনা যান। দুইদিন তথায় পরিবারে উপাসনা করেন, একদিন খুলনা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন, আর একদিন মন্দিরে কথকতা করেন। বাগেরহাট গমন করিয়া দুই দিন শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেনের বাড়ীতে উপাসনা করেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া গমন করিয়া তথাকার বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন। ৬ই ভাদ্র তথাকার উপাসনাসমাজ স্থাপনের দিন প্রাতঃকালে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে কথকতা করেন। ৭ই প্রাতঃকালে নৌকারোহণে কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে নদীবক্ষ দিয়া উপাসকদিগকে লইয়া শ্মশানঘাটে উপস্থিত হন। সেখানে উপাসনা করিয়া রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাদুরের মাতৃদেবীর সমাধিস্থানে মঠের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। সায়ংকালে মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসুর ভবনে মহিলাদের অনুরোধে কথকতা করেন। কুমিল্লা—পরলোকগত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গমন করিয়া তিনটী পরিবারে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। ২৮শে আগষ্ট রবিবার ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরদিন প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরীর বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। নোয়াখালি—গমন করিয়া তিনটী পরিবারে পারিবারিক উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। এক দিন নোয়াখালী ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। একদিন কথকতা করেন।

ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তি—বিগত ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় লক্ষ্মীরাণী সান্যাল ও কমলা মিত্র মাসিক ১০৲ টাকার ব্রহ্মময়ী-তারাসুন্দরী-কৃপাময়ী বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিলাম।

উৎসব—বিগত ৫ই ৬ই ৭ই ভাদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপাসনা মন্দিরের ষড়্‌বিংশতিতম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ও কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় যাইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এবারের উৎসবের বিশেষত্ব এই ছিল যে, অমৃত বাবু "মুক্তি ও ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ও বরদা বাবু "বুদ্ধদেবের সাধনপ্রণালী" বিষয়ে কথকতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। উৎসবের শেষ দিবস নৌকাযোগে নদীবক্ষে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাদুরের মাতৃদেবীর শ্মশানমন্দিরে যাইয়া উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া উৎসব শেষ করা হইয়াছে।

দান—মিসেস এম এম বসু পতির বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫০৲, সাধনাশ্রমে ২৫৲ টাকা ও শত বার্ষিকী ফণ্ডে ২৫৲, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী পিতামহ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ ও সাধনাশ্রমে ৫৲, মিসেস হিমাংশুমোহন গুপ্ত মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ১০৲, এবং মিঃ আনন্দমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্রগণ এ এম্ বসু ফণ্ডে ১০০৲ টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। এই সব দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মুসলমান্ ভক্ত বৃন্দের ভগবদ্ নির্ভর—শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা। যাঁহারা "তাপস মালা" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা মুসলমান সাধুদিগের উচ্চ ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে পরিচিত হইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু সে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ত অনেকে পাঠ করেন নাই। বিশেষতঃ তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবনের কাহিনী ও প্রত্যেক সাধুর উক্তি পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অমর বাবু সর্ব্ব সাধারণের জন্য সে বৃহৎ গ্রন্থ মন্থন করিয়া তাহার সার স্বরূপ এই অমৃত ভাণ্ড লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অল্পের মধ্যে বিশেষ ভাবগুলি একত্র সংগৃহীত হওয়াতে ইহাদ্বারা জীবন সহজে প্রভাবান্বিত হইবে এবং পুস্তক খানার মূল্য অতি সুলভ হওয়াতে সকলের পক্ষে ইহা সহজপ্রাপ্যও হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে ইহা পাঠ করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি। ইহা পাঠে নিশ্চয়ই সকলে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন। মুসলমান সাধকগণ ধর্ম্মজীবনের কোন্ উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া পরোক্ষভাবে মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে এবং নিজেদের সংকীর্ণ অহঙ্কারটাও কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। উদার ভাবে সকল স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ না করিলে কখনও জীবনের পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না! বিশ্ববিধাতার প্রেমের বিচিত্র লীলা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যে পরিমাণ এই বিচিত্রতার সঙ্গে পরিচিত হইব, সেই পরিমাণই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। তাই আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

ভোরের পাখী—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। ইহাতে স্বরলিপি সহ নির্ম্মল বাবুর ২৫টি সংগীত প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি সুকবি ও সুগায়ক। তিনি যে নিবেদনে লিখিয়াছেন "ভোরের পাখীর আশা ও আনন্দের সুর এ গানগুলির মধ্যে প্রবাহিত বলিয়া আমার বিশ্বাস" সে কথা সত্যই। তাঁহার গানগুলির মধ্যে যে একটা সরলতা ও স্বাভাবিকতা এবং সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব আছে তাহা বড়ই মিষ্ট ও প্রাণমুগ্ধকর। তিনি সরল ভাষায় প্রাণের সরল গান গাহিয়া থাকেন, কৃত্রিম অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার চাপে তাঁহার ভাবগুলি পিষ্ট হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয় না। বর্ত্তমান কালে এরূপ গানের অভাব আমরা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়া থাকি। তাই, তিনি যে স্বরলিপিসহ তাঁহার গানগুলি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি ইহা সকলের চিত্তাকর্ষণ ও ধর্ম্মভাববর্দ্ধনে সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে এবং বহুল ভাবে প্রচারিত হইবে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৬ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বিএ

Registered NO 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১৩শ সংখ্যা। 18th October, 1927. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হই যেন পার।

মনে হয় পারে নিতে ভুলেছে আমায়!
নিশ্চিত দিনের কথা হায় রে অনিশ্চিত!
ফিরবে কবে আবার তরী, সদাই ভাবে চিত।
নিশ্চিন্ত নিরালা তাই নাহি যায় থাকা,
কোথাও মাথার বোঝা নাহি যায় রাখা।
প্রতিদিন সন্ধ্যা আসে, অস্ত যায় ভানু,
আঁধারে ঢাকিয়া ফেলি' অণু পরমাণু।
আমারেও ডুবাইতে চায় সে আঁধার,
অন্তরের আলো যেন নিভে বার বার!
স্থিরজ্যোতিঃ! কর স্থির আলোক আমার,
তরী এলে অবহেলে হই যেন পার!

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে আনন্দস্বরূপ, তোমার আনন্দ দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছ, জগতকে শোভা সুখে পূর্ণ করিয়া গড়িয়াছ এবং তোমার অসীম প্রেমে আমাদের গৃহ পরিবার সংসারকে নানা আনন্দ ও সুখের আকর করিয়াছ। তথাপি আমরা আপনার দোষেই সে আনন্দ সুখে বঞ্চিত হইয়া জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলি। তোমার অনন্ত জ্ঞানে ও প্রেমে যে ব্যবস্থা কর, তাহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ও কল্যাণকর, সকল সময় সে বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিতে সমর্থ না হইয়া, আমরা অনেক সময় তাহাতে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না এবং আপনার ইচ্ছা ও বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া নিত্য অসন্তোষ বশতঃ তাহাকেও দুঃখের কারণে পরিণত করি। তোমার ব্যবস্থায় যদি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার প্রতি দিনের অসংখ্য দানের মধ্যে আমরা কত আনন্দ ও তৃপ্তিই পাইতে পারিতাম!—আমাদের হৃদয় সকল অবস্থায় কৃতজ্ঞতায় উথলিয়া উঠিত, কিছুই আমাদের দুঃখ ক্লেশের কারণ হইতে পারিত না। আমাদের অতৃপ্তি ও অসন্তোষই যত দুঃখের কারণ। আপনার ইচ্ছা ও বাসনাই তোমার আনন্দ ও সুখ উপভোগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধক। তবুও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমার প্রেমের দান-সকল উপভোগ করিতে পারিতেছি না! হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি দূর কর, আমাদের হৃদয়ে তোমার অসীম প্রেমে বিশ্বাস ও নির্ভর প্রদান কর—আমরা যেন আর বৃথা এই আনন্দময় সংসারকে নিরানন্দময় করিয়া না তুলি; অনর্থক জীবনকে ভারবহ না করি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে পরিবারে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

কপটাচার—যীশু পতিতা রমণীকেও কৃপার চক্ষে দেখেছেন, তাকেও করুণ বচনে বলেছেন, 'যাও ঘরে যাও, আর পাপ ক'রো না'। কিন্তু ভণ্ড যে, কপট যে, তাকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করেছেন। কে ভণ্ড, কে কপটাচারী? তুমি যে বল, একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা কর, তুমি যদি অন্য কাহাকেও ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চ স্থান দাও, অন্য কোনও দেবতার উপাসক

হও, ধন জন পদ মানকে শ্রেষ্ঠ স্থান দাও, তবে তুমি কপট। তুমি উপাসনা করতে বস, লোকে দেখে তুমি ধ্যানে মগ্ন; আর তুমি যদি, যা তা চিন্তা কর, মনকে ফিরাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না কর, তবে তুমি কপট। তুমি যদি সৎ কথা বল, সদুপদেশ দাও, আর নিজে যদি সে উপদেশের অনুসরণ না কর, অন্ততঃ তদনুরূপ চল্‌বার চেষ্টা না কর, তুমি ভণ্ড, তুমি কপট। তুমি যদি লোকের উপকার করতে যেয়ে প্রত্যুপকার আকাঙ্ক্ষা কর, দান করতে যেয়ে প্রশংসা পেতে চাও, তা হ'লে তুমি কপট। তুমি যদি দেশের ও দশের সেবা কর, আর মনে মনে ভাব, তুমি অন্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, তবে তুমি কপট। কপটতা সকল পাপের মূল। সরল হও; খোলা প্রাণে প্রভুর সেবা ক'রে যাও; অপরাধ হ'লে স্বীকার কর। যেখানে মন বিক্ষিপ্ত হয়, বার বার সরল ভাবে তাকে টেনে আন। তবেই তোমার সাধনা সফল হবে; ঈশ্বরের পূজার অধিকার তোমার জন্মিবে।

নির্ভরের সহিত প্রতীক্ষা—মানুষ কত রকমে প্রতীক্ষা করে! বন্ধু আস্‌বে, সময় চ'লে যায়; কতবার বাহিরে যাই, আবার ভিতরে আসি; মন উদ্বিগ্ন, কত ব্যস্ততা! ট্রেণে যেতে হবে, খুব প্রয়োজন; ট্রেণে যেতে না পার্‌লে চল্‌বে না, কাজের ক্ষতি হবে। পোটলা বেঁধে ব'সে আছি; সময় যায়; ট্রেণ আসে না; এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি; কি উদ্বেগ, কি ব্যস্ততা! এই এক রকম প্রতীক্ষা। কত উদ্বেগ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম! আবার আর এক রকম প্রতীক্ষা আছে। জানি, বন্ধু আস্‌বেই; সেও যে আমার জন্য ব্যস্ত; সেও যে আমাকে পেতে চায়; আমি নিরুদ্বেগে ব'সে আছি; সে আস্‌বে জানি; আমি তার অভ্যর্থনার, তার আহারের বন্দোবস্ত কর্চ্ছি; কোনও উদ্বেগ নাই। ট্রেণ আস্‌ছে; আমাকে নিয়ে যাবেই; কোম্পানীর আমার দ্বারা প্রয়োজন আছে। আমি নিরুদ্বেগে ব'সে আসি। একেই বলে নির্ভরের সহিত প্রতীক্ষা। আমি তাঁর আসার আশায় অনেক সময় উদ্বেগের সঙ্গে প্রতীক্ষা করি; কত সংগ্রাম করি! কিন্তু যখন মনে এই ভাব জাগে, তিনি যে আমাকে ভালবাসেন, তিনি যে আমাকে চান, তখন আর উদ্বেগ থাকে না। নিশ্চিন্ত মনে হৃদয় পেতে দিয়ে বসে থাকি। তিনি আস্‌বেনই। আমি যে তাঁর প্রিয়, এখন না হয় একটু পরে তিনি আস্‌বেনই।

মিষ্ট চাও, তিক্ত চাও না?—মানুষ কি কেবল মিষ্ট খেয়েই বাঁচে? জীবনধারণের পক্ষে তেঁতোর কি প্রয়োজন হয় না? বরং মিষ্ট অপেক্ষা তেঁতোরই প্রয়োজন বেশী। বন্ধু-সমাগমে যে আনন্দ, তার সঙ্গ পেয়ে, তার সঙ্গে কথা ব'লে যে সুখ, কেবল কি তাই চাও? বন্ধুর জন্য কি দুঃখ বরণ করতে পার না? তার পীড়াতে কি রাত জেগে সেবা করতে পার না? তার বিপদের সময় কি প্রাণ দিয়ে তার উপকার ক'রতে পার না? তবে তোমার কি রূপ ভালবাসা? সে তোমার কি রূপ বন্ধু? যিনি পরম প্রিয় তাঁর সঙ্গে খুব আনন্দ, তাঁর নামকীর্ত্তনে খুব সুখ। তুমি কি কেবল এই আনন্দ ও সুখই সম্ভোগ করতে চাও? তাঁর বিরহ বেদনা বহন করবে না? তিনি যদি দুঃখ দেন, সে দুঃখ মাথা পেতে নিবে না? তাঁর দেওয়া রোগ শোক আনন্দে গ্রহণ করবে না? তাঁর আদেশ পালন করতে যেয়ে কষ্ট বরণ করবে না? তোমার জীবনের পক্ষে যে দুঃখের প্রয়োজন, সংগ্রামের প্রয়োজন, তিক্ততার প্রয়োজন। কেবল সঙ্গসুখেই জীবনের কল্যাণ হবে না। তাঁর জন্য দুঃখ বরণ করতে হবে, তাঁর কাজে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তাঁর দেওয়া বেদনা বুক পেতে নিতে হবে। মাধুর্য্যরস চাই, তিক্ত রসেরও প্রয়োজন আছে।

সম্পাদকীয়।

আপন দোষে দুঃখ পাই—আমাদের একটি সঙ্গীতে আছে—"আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভা-সুখ-পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী"। যদিও কথাটা অতীব সত্য, তথাপি সকল সময় ইহা আমাদের স্মরণে থাকে না, ইহার মর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই আনন্দময়ের এই শোভা সুখ আনন্দে পূর্ণ বিশ্বে বাস করিয়াও, গৃহ পরিবারে সমাজে সর্ব্বত্র প্রেমময়ের শান্তি ও আরামের অসংখ্য প্রকার ব্যবস্থা সত্ত্বেও, আমরা অধিকাংশ সময়ই সেই আনন্দ সুখ শান্তি ও আরামের পরিবর্ত্তে কেবল দুঃখ ক্লেশ বেদনা ও অশান্তিই ভোগ করি, জীবনকে নিতান্ত ভারবহই করিয়া তুলি এবং প্রেমময় বিশ্ববিধাতার বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ করিতে ক্ষান্ত হই না। আমাদের প্রতি তাঁহার ও বিশ্বসংসারের সকলের কত অপ্রেম অবিচারের কল্পনা করিয়া বৃথাই সমস্ত নিতান্ত তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া থাকি! আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, আমরা "আপন দোষেই দুঃখ পাই," এই অবস্থার জন্য আমরা নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী,—মঙ্গলময় বিধাতার বা অপর লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কোন যুক্তি-যুক্ত কারণই নাই, এই জীবন ও সংসারটাকে আমরা যেরূপ দুঃখময় ও ভারবহ বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক পক্ষে তাহা সেরূপ নহে, সেরূপ ভাবিবারও কোনও সুসঙ্গত হেতু নাই। একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব উহা আমাদেরই স্বেচ্ছাচারিতা, মোহান্ধতা ও অকৃতজ্ঞতার ফল।

এই জগত যে নানা শোভা সুখ সৌন্দর্য্যে পূর্ণ তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? চক্ষু কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়ের পরম তৃপ্তিকর, অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে পূর্ণ, অসংখ্য প্রকার দ্রব্যসম্ভারে ভরা, এই বিশ্ব-সৃষ্টির ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় পদার্থই কি অফুরন্ত আনন্দ ও সুখের প্রস্রবণ নহে? ইহার মধ্যে কোনও ইন্দ্রিয়ের পীড়াদায়ক কিছু কি আছে? অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বিন্দু পরিমাণ হানিকর অতি সামান্য অসামঞ্জস্যও কোথাও নাই। এ বিষয়ে সকলের অনুভূতি সমান নহে সত্য, —যাহার ইন্দ্রিয় যে পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে তাহার অনুভূতি

তত গভীর ও স্পষ্ট সন্দেহ নাই,—কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কাহারও নিকটই উহা অন্যরূপ প্রতিভাত হয় না, হইতে পারে না। এখানে শুধু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের এরূপ আনন্দ ও তৃপ্তিকর ব্যবস্থাই যে রহিয়াছে তাহা নহে; হৃদয় মনের, উন্নত জ্ঞান ও প্রেমের জন্যও তদনুরূপ বিধানই আছে—বরং তাহাদের জন্য আরও শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর আয়োজনই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও হৃদয় মনের উন্নতি ও বিকাশের তারতম্যের উপরই অনুভূতির গভীরতা ও পূর্ণতা নির্ভর করে—সকলে সমান পরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ না হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় কেহই একেবারে বঞ্চিত হয় না। এতদ্ব্যতীত আমাদের শরীর মন এরূপ ভাবে গঠিত যে, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, শক্তি ও বৃত্তির, যথাযথ ব্যবহার ও পরিচালনাতে প্রচুর আনন্দ আরাম ও তৃপ্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে—স্বাভাবিক নিয়ম-লঙ্ঘনজনিত অপব্যবহার ব্যতীত কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না, বিন্দু পরিমাণ দুঃখ ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বোপরি, প্রেমময়ের আপন প্রকৃতিতে গঠিত প্রেমের গৃহ পরিবার সমাজকে তিনি যে কি আনন্দ আরাম শান্তির অফুরন্ত উৎস, দুঃখী তাপী শ্রান্ত ক্লিষ্ট নরনারীর পরম আশ্রয়স্থান, নিরাপদ দুর্গ, করিয়া গড়িয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সৃষ্টির মধ্যেই যে তাঁহার সকল ব্যবস্থা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে তাহাও নহে। এ সকলের উপরে, তিনি সকল প্রকার শোভা সৌন্দর্য্য, আনন্দ আরাম, সুখ শান্তির অনন্ত প্রস্রবণ আপনাকে দেওয়ার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছেন এবং অসীম প্রেমে, নানা ভাবে নানা উপায়ে, নিয়ত তাহার বিবিধ আয়োজন ও ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহার এই প্রেম ও করুণা হইতেও কেহই বঞ্চিত নহে—যাহারা ইহা দেখে না বুঝে না, অগ্রাহ্য করিয়া দূরে চলিয়া যায়, তাহারাও অলক্ষিতে অজ্ঞাতে অল্পাধিক পরিমাণে ইহা উপভোগ করে। যাহারা দেখে ও বুঝে তাহাদের গভীর আনন্দ সুখ শান্তি ত কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না—ঘোর দুঃখ বিপদ, ঝড় ঝঞ্ঝা, এমন কোনও অবস্থাই নাই যাহা ইহাকে বিন্দু পরিমাণেও বিনষ্ট করিতে পারে। অপর সকল প্রকার সুখ শান্তির পশ্চাতেও তাঁহাকে দেখিলে যে তাহা শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হয়, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। তাঁহাকে ভুলিয়াও সে সকল উপভোগ করা যায় সত্য—অধিকাংশ লোকেই তাহা করে, সন্দেহ নাই—তথাপি প্রেমময়ের প্রেমের সাক্ষাৎ দান বলিয়া গ্রহণ করিলে সে আনন্দ ও সুখ যে কত অধিক হয়, তাহার প্রচুর প্রমাণ আমরা সর্ব্বদাই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই, ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। ঘোর নাস্তিক ও অবিশ্বাসী যাহারা তাহারাও যে ইহা হইতে বঞ্চিত হয় না, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রেমময়ের অসীম প্রেমের অপূর্ব্ব নিদর্শন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও সংসারের সকল লোক যে বেশ আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিতেছে, কোনও প্রকার দুঃখ ক্লেশ পাইতেছে না, এরূপ কথা ত কিছুতেই বলা যায় না; বরং অধিকাংশ লোকই বিবিধ প্রকার অশান্তি নিরানন্দেই জীবন কাটাইতেছে, অশেষবিধ দুঃখ তাপেই জর্জ্জরিত হইতেছে, বলিতে হয়। ইহার কারণ কি? এখানে বলা আবশ্যক যে, জগতে অনিবার্য্য দুঃখ ক্লেশ অশান্তি যদি কিছু থাকে, তাহা আমাদের আলোচনার অন্তর্গত নহে। থাকিলেও উহা অতি সামান্য এবং উহার মধ্যেও শান্তি ও কল্যাণ আছে। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব অধিকাংশই—পোনে ষোল আনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না—নিবার্য্য, মঙ্গলবিধাতার ব্যবস্থার বহির্ভূত। একমাত্র তাহাই আমাদের আলোচ্য।

এই কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্ব প্রথমেই অধিকাংশ দুঃখ বেদনা নিরানন্দ অশান্তির মূলে মানুষের অতৃপ্তি ও অসন্তোষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। মানুষ যে সুখ শান্তি আনন্দ মোটেই পায় না তাহা নহে, বরং প্রচুর পরিমাণেই পায়; কিন্তু যাহা পায় তাহাতে সে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত নয়, তাহা যথেষ্ট মনে করে না, আরও অনেক বেশী চায়, আরও বিভিন্ন প্রকারে সুখ পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়। সাধারণ লোকের সুখের ধারণা সম্বন্ধে কার্লাইল একটি অতি সুন্দর সত্য কথা বলিয়াছেন—"সুখ সম্বন্ধে আমাদের যে খেয়াল আছে তাহা অনেকটা এই প্রকারের—আমরা নিজের গণনা অনুসারে কতকটা গড় ও মূল্য কষিয়া এই পার্থিব জীবনের সুখ সৌভাগ্য সম্বন্ধে একটা গড় নির্দ্ধারণ করি। আমরা মনে করি, ইহা আমাদের প্রকৃতিগত প্রাপ্য, অলঙ্ঘনীয় অধিকার। ইহা আমাদের প্রাপ্য উপযুক্ত বেতন মাত্র; ইহার জন্য কোনও ধন্যবাদ বা অভিযোগের দরকার হয় না; এতদতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, তাহাকেই আমরা সুখ এবং তাহার ন্যূনতাকেই দুঃখ মনে করি। এখন ভাবিয়া দেখ, আমাদের উপযুক্ততার বিচার আমাদেরই হাতে, আর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কতটা অহঙ্কার রহিয়াছে—এরূপ অবস্থায় পাল্লার ঝোঁকটা যে অধিক সময় অন্যায় দিকেই নামিয়া পড়িবে এবং অনেক মূর্খ যে বলিয়া উঠিবে—'দেখ কি বেতন দেওয়া হইয়াছে! কোনও উপযুক্ত ভদ্রলোক কি কখনও এরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে?'—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলি, 'মূর্খ, ইহা তোমার মিথ্যা অহঙ্কারের, তুমি যাহা তোমার উপযুক্ত প্রাপ্য বলিয়া কল্পনা কর, তাহারই ফল; মনে কর তুমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবার উপযুক্ত (যাহা খুবই সম্ভব), তাহা হইলে গুলির আঘাতে মরাটাই সুখকর মনে করিবে; ভাব তুমি চুলের দড়িতে ফাঁসি ঝুলিবার উপযুক্ত, তাহা হইলে শণের দড়িতে মরাটা বিলাসিতা বলিয়া অনুভূত হইবে'। কাজেই ইহা সত্য যে, হরের হ্রাস দ্বারা তোমার জীবনরূপ ভগ্নাংশের মূল্য যতটা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তোমার লবের বৃদ্ধিদ্বারা ততটা পারে না। শুধু তা নয়, আমার বীজগণিত যদি আমাকে প্রতারিত না করে, একমাত্র একককে শূন্য দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হয় অনন্ত। কাজেই শূন্যকে তোমার বেতনের দাবী কর; তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী তোমার পদানত হইবে। বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ঠিকই বলিয়াছেন, একমাত্র ত্যাগ হইতেই প্রকৃত পক্ষে জীবন আরম্ভ হয় বলা যায়।" 'বহুল-সংগ্রহের' উপর যে প্রকৃত সুখ নির্ভর করে না, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই, সকল প্রকার দাবী ছাড়িয়া দিয়াই, সুখ বর্দ্ধন করা সম্ভবপর, তদ্ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই, ইহা সকল দেশেরই পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞতার কথা। এ দেশেরও জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, "কাম্য বস্তুর উপভোগদ্বারা কামনা শান্ত হয় না, ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত

অগ্নির ন্যায় তাহা কেবলই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়," "একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।" এসকল যে শুধু জ্ঞানীদেরই উক্তি তাহা নহে, আমাদের প্রত্যেক জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা যদি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলেও আমরা ইহা ব্যতীত অন্য কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। যে সদা অসন্তুষ্ট, নিত্য অতৃপ্ত, সে যত অধিকই প্রাপ্ত হউক না কেন, কিছুতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইতে পারে না, সুখী হইতে পারে না,—তাহার দুঃখ অভিযোগ অশান্তি কিছুতেই ঘুচিবার নহে। আর, যে সহজে তৃপ্ত, সদা সন্তুষ্ট, তাহাকে যাহাই দেও না কেন, তাহার প্রাপ্তি যত সামান্য ও অকিঞ্চিৎকরই হউক না কেন, তাহাতে তাহার হৃদয় সন্তোষ ও তৃপ্তিতে, আনন্দ শান্তিতে ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যায়, তাহার সুখের সীমা পরিসীমা থাকে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ব্যবহারে, শক্তি ও বৃত্তিসমূহের পরিচালনাতে, সর্ব্বপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, অনিচ্ছা ও অসন্তোষের সহিত নিযুক্ত হইলে, তাহা আর সুখকর ও আরাম-দায়ক থাকে না, দুঃখকর ও পীড়াদায়কই হইয়া উঠে, তজ্জনিত স্বাভাবিক আনন্দ ও সুখ দুঃখ বেদনাতেই পরিণত হয়। অথচ বিরক্তি ও অনিচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া, একটু আগ্রহের সহিত সন্তুষ্টচিত্তে তাহা করিলে, সে সকল হইতে সুখ ও কল্যাণ প্রচুর পরিমাণেই লব্ধ হয়। গৃহ পরিবারে, সমাজে, জগতের যাবতীয় প্রেমের ব্যবহারাদি সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা। সেখানেও দাবী করিতে গেলে, অধিক চাহিতে গেলে, অসন্তোষ ও অতৃপ্তির অধীন হইলে, কিছুতেই আনন্দ সুখ তৃপ্তি শান্তি লাভ করা যায় না, দুঃখ ক্লেশ অভিযোগ অশান্তি ঘুচিতে পারে না। কত লোক যে আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের অশেষ স্নেহ ভালবাসা পাইয়াও, এই একই দোষে গৃহ সংসারের সকল সুখ শান্তি আনন্দ আরাম হইতে বঞ্চিত হইয়া, জীবনকে ভারবহ করিয়া ফেলে, তাহার সীমা করা যায় না। আর, ইহা হইতে মুক্ত জীবন যে কত সুখ শান্তি আনন্দ আরামে দিন কাটাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও সীমা নাই। অধিকারের দাবী লইয়াই যত কলহ বিবাদ অশান্তির উৎপত্তি। সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া প্রত্যেকে আপনার কর্ত্তব্য করিয়া গেলে কোনও দুঃখ সন্তাপের কারণই উপস্থিত হয় না। পাওয়া না পাওয়ার উপর যাহার প্রেমের পরিচয় নির্ভর করে না, সে সর্ব্বত্রই প্রেমের অসংখ্য নিদর্শন দেখিতে পায়। ভালবাসার জনের স্মরণে বা উপস্থিতিতে, একটা দৃষ্টিতে বা বাক্যে তাহার হৃদয় আনন্দ সুখে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাহাকে কিছুতেই কখনও দুঃখ ক্লেশ অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, 'আপন দোষেই', বাসনা কামনা অনুগামী বলিয়াই, দুঃখ ক্লেশ পাইতে হয়। এত আনন্দ সুখের মধ্যে দুঃখ বেদনা পাইবার উহাই প্রধান হেতু।

দ্বিতীয় কারণ—অন্ধতা ও দৃষ্টিহীনতা, সংশয় ও অবিশ্বাস। যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, অথবা যাহার অপর কোনও ইন্দ্রিয় বিকল, সে জগতের এত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কি প্রকারে দেখিবে বা অনুভব করিবে? তাহার নিকট সবই নিরর্থক. সমস্ত থাকিয়াও কিছুই নাই। কিন্তু এমন কেহই নাই যাহার সকল ইন্দ্রিয়ই বিকল,—কোনটা অকর্ম্মণ্য হইলেও অপর কয়েকটা সকলেরই থাকে। আর এরূপ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, একের অভাবে অন্য গুলি প্রখরতরই হয়, আনন্দ উপভোগের নূতন দ্বার খুলিয়া যায়। ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এমন বহু লোক আছে, যাহারা চক্ষু থাকিতেও দেখে না, কর্ণ থাকিতেও শুনে না, ইন্দ্রিয় থাকিতেও তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করে না। তাহারা এই সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আনন্দ শান্তি হইতে যে আপন দোষেই বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ উদাসীন ও অলস ব্যক্তি ছাড়া অপর আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের হৃদয় সংশয় ও অবিশ্বাসেই পূর্ণ। সত্যনির্দ্ধারণের জন্য সংশয় সন্দেহের কিছু আবশ্যকতা থাকিলেও, তাহার প্রাবল্য সে পথের পরম পরিপন্থী। বিনা প্রমাণে কখনও কিছু সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত না হইলেও, সত্য প্রমাণে যদি অবিশ্বাস করা যায়, সন্দেহের রঙ্গীন চশমা দিয়াই সব দেখা যায়, তাহা হইলে কোনও ক্রমেই সত্যনির্দ্ধারণ সম্ভবপর হয় না। বিনা বিচারে কিছু গ্রহণ না করিবার ভাব ও সন্দেহ, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। প্রথমটিতে সত্য গ্রহণের জন্য হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত, কিছুই অস্বীকার করা হয় না, দ্বিতীয়টিতে সমস্তই অস্বীকার করা হয়, কিছুই নাই। একটি সত্যপথের সহায়, অপরটি ঘোর শত্রু। সন্দেহ ও অবিশ্বাসে পূর্ণ হৃদয় কখনও জগতের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহা হইতে আনন্দ সুখও পাইতে পারে না। উহা এত সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয় যে, একবার 'নাই' বলিলে তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গৃহ পরিবারে সংসারে যে প্রেম ও আনন্দ সুখ শান্তি রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এই কথা আরও অধিক সত্য। সেখানে সংশয় ও সন্দেহের কীট যদি একবার প্রবেশ করে, তবে সমস্তই উহা ধ্বংস করিয়া ফেলে, তাহাদের কোনও অস্তিত্বই সেখানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেননা, এরূপ স্থলে সমস্তই বিকৃত আকারে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, কোনটারই সত্য রূপ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না, সকল প্রেমের পরিচয়ই আমাদের নিকট অন্ধকারাবৃত হইয়া যায়। হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা প্রেমের অকাট্য পরিচয় প্রদান করে, তাহাই হয় ত অপ্রেমের নিদর্শন বলিয়া ভ্রম জন্মে। কত প্রেমিক দম্পতির গভীর প্রেম ও সুখের জীবন, কত শান্তিপূর্ণ গৃহ পরিবারের সুখ শান্তি আরাম যে এই হেতু চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে, কত সোণার সংসার ভস্মস্তূপে, ভীষণ মরুভূমিতে, পরিণত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। গ্রীক আখ্যায়িকায় বর্ণিত ইরস ও সাইকীর কথা হয়ত অনেকেই জানেন। সাইকী যখনই ইরসের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেল, তখনই চিরদিনের তরে তাহাকে হারাইল। মানব জীবনের সর্ব্ব প্রকার সুখশান্তিবিনাশকারী এমন ভীষণ শত্রু আর দ্বিতীয় কিছু নাই। অথচ সামান্য একটু বিশ্বাস ও নির্ভর লইয়া, আপনার সংকীর্ণতা ও অনুদারতা প্রসূত বিশেষ কোনও ঝোঁক হইতে মুক্ত হইয়া, প্রেমের সত্য পরিচয় পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে, কাহাকেও কখনও ভ্রান্তিতে পড়িতে হয় না, মিথ্যা অশান্তি

দুঃখ ক্লেশের আগুনে পুড়িয়া মরিতে হয় না, অপরকেও দগ্ধ বিদগ্ধ করিতে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রেমপ্রকাশের রীতি বিভিন্ন প্রকারের; তথাপি স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা বুঝিতে কখনও ভুল হয় না। জগতে সত্য অপ্রেম বিদ্বেষ অতি অল্পই আছে। সামান্য একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই আমাদের কল্পনা ও ভ্রান্তি প্রসূত। আমরা নিজে যখন স্বাভাবিক হৃদয় লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হই, তখন দেখি তাহার অধিকাংশই অদৃশ্য হইয়া যায়। সংশয় সন্দেহের কুহেলিকার মধ্য দিয়া দৃষ্টি করাতেই সমস্ত বিকৃত ও বিকটাকার দেখায়। কথিত আছে, একদা কোন লোক দূরে কুয়াশার মধ্যে পর্ব্বতগাত্রে একটি বিকটাকার দানবকে নড়িতে চড়িতে দেখিতে পায়, কিন্তু কিছু নিকটে আসিলে তাহাকে মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, আরও কাছে আসিলে আপনার ভাই বলিয়া চিনিতে পারে। এরূপ ঘটনা জগতে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। অধিকাংশ স্থলেই আপনার ভাইকে, পরম বন্ধুকে, দানব ভাবিয়া আমরা অনর্থকই দুঃখ ক্লেশ ভোগ করি, আনন্দ শান্তি ও আরাম হইতে বঞ্চিত হই। এখানেও আমরা আপনার দোষেই দুঃখ কষ্ট পাই। অপর দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে, অপরের সত্য দুর্ব্ব্যবহারও প্রকৃত পক্ষে আমাদিগকে দুঃখ ক্লেশ দিতে পারে না। তাহা আমাদের অদ্যকার আলোচনার অন্তর্গত নহে বলিয়া এখানে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা যে সকল সুখ শান্তি পাইতে পারি, তাহা হইতে যে আপনার দোষেই বঞ্চিত হইয়া বৃথা দুঃখ পাই, এক্ষেত্রেও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

সর্ব্বশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে প্রেমময় মঙ্গল-বিধাতার দানরূপেই সকল সুখ সম্পদ আনন্দ শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাকে ভুলিয়া সে সমস্ত উপভোগ করিতে যাইয়াই আমরা পূর্ণ আনন্দ সুখ হইতে বঞ্চিত হই এবং অনেক স্থলে সুখ শান্তির পরিবর্ত্তে দুঃখ ক্লেশ অশান্তি ভোগ করি। তাঁহার মঙ্গলময় প্রেমে অবিশ্বাস, সকলের পশ্চাতে তাঁহার হস্ত না দেখা, তাঁহাতে বিশ্বাস ও নির্ভর না রাখাই সকল দুঃখের সর্ব্বপ্রধান কারণ। সর্ব্বত্র তাঁহার প্রেম ও করুণার অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিয়া যখন হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন আর আনন্দ সুখের সীমা থাকে না।

"তোমাতে যখন মজে আমার মন
তখনি ভুবন হয় সুধাময়।"
"আমি তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকি যে সময়ে,
কিছুতে আনন্দ পাই না হৃদয়ে।"

সঙ্গীতের এই দুইটি বাক্য কবিকল্পনা নহে, সর্ব্বজন-অভিজ্ঞতা লব্ধ নিখুঁত সত্য। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহার যে একটা পরোক্ষ ফলও আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। মঙ্গলময় বিধাতাতে অবিশ্বাস হইতেই অপরের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরবিশ্বাসী সকলের মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পায়, সর্ব্বত্র তাঁহার প্রেমের পরিচয় পায়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ আছে তাহাই দেখিতে পায়, যাহার নিকট হইতে যাহা কিছু পায়, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়, সে সমস্তকে প্রেমস্বরূপ মঙ্গলবিধাতারই ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করে। সুতরাং সে কখনও কাহাকেই বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে পারে না, বিধাতানিযুক্ত হিতকারী বন্ধু ও সহায় ব্যতীত অনিষ্টকারী শত্রু বলিয়া মনে করিতে পারে না। বাস্তবিক সে লোক যেরূপই হউক না কেন, তাহার নিকট হইতে আমার কাছে যাহা কিছু আসে সমস্তই প্রেমস্বরূপ মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার বিধানেই, তাঁহার ইচ্ছা ও ব্যবস্থা অনুসারেই আসে, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই আসিতে পারে না—ইহা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা যত অপ্রেম বিদ্বেষ প্রভৃতি কল্পনা করি ও বৃথা দুঃখ ক্লেশ ভোগ করি। ঈশ্বরবিশ্বাসীর কখনও এ বিষয়ে কোনও ভ্রম হয় না। সুতরাং এ স্থানেও আমরা "আপন দোষেই" দুঃখ পাই। তাঁহার প্রেম ও মঙ্গল ভাবে বিশ্বাস থাকিলে, তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী সত্য দুঃখ তাপ যাহা আসে তাহাও হৃদয়ের শান্তি সুখ বিনষ্ট করিতে পারে না, আমাদিগকে দুঃখ বেদনায় অভিভূত করিয়া নিরানন্দে পাতিত করিতে পারে না —মিথ্যা ত পারেই না। বিশ্বাসী হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিত্য শান্তির উৎস চির উৎসারিত থাকে। তাঁহার প্রেম ও মঙ্গলভাব দেখি না বলিয়াই আমরা এরূপ দুঃখ শোকে, অশান্তি নিরানন্দে, নিমজ্জিত হই—

"তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না,
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি' তাই শোকসাগরে নামি!"

ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছু নাই। আমরা যে মঙ্গল-স্বরূপ প্রেমময়ের এত প্রেম ও করুণা পাওয়া সত্ত্বেও বৃথা "আপন দোষে দুঃখ পাই," "সুখের অন্ন দুঃখ করিয়া ভোজন করি", আনন্দময় জীবনকে নিরানন্দময় করিয়া ফেলি, শান্তিপূর্ণ গৃহ-সংসারকে অশান্তিতে দগ্ধ বিদগ্ধ করি, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। এই দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা যে অপর কাহারই নাই! আমরা যেন আর বৃথা জীবনকে দুঃখময় না করি; সকল প্রকার অতৃপ্তি অসন্তোষ, বাসনা কামনা, মিথ্যা সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, প্রেমস্বরূপ মঙ্গলময় বিধাতার প্রেমের অপূর্ব্ব দানসকল কৃতজ্ঞ চিত্তে উপভোগ করি এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল কার্য্য করিয়া আনন্দময়ের সংসারে আনন্দেই বিচরণ করি। শুভবুদ্ধিদাতা পিতা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি দূর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রদত্ত আনন্দ সুখ শান্তি পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিতে সমর্থ করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

বিশ্বাস ও নির্ভর।

"The Lord is my shepherd; I shall not want, * * * * and I will dwell in the house of the Lord for ever." Psalm xxiii.

"আমি মেষ, প্রভু পরমেশ্বর আমার মেষপালক। আমার

১৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ১৯০৩, সাধনাশ্রমে
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত

কিছুরই অভাব হইবে না। তিনি আমাকে সুশ্যামল হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রে শয়ন করান, তিনি আমাকে প্রশান্ত সলিলপূর্ণ জলাশয়ের নিকট লইয়া যান। এমন কি আমাকে যদি মৃত্যুর অন্ধকারপূর্ণ উপত্যকা দিয়াও যাইতে হয়, তথাপি আমি ভয় করিব না, কারণ তুমি আমার সঙ্গেই আছ। তোমার শাসন-দণ্ড এবং চালন-যষ্ঠি দেখিলেও আমার সুখ হয়। (তুমি আমার বিপক্ষগণের সমক্ষে আমার জন্য সুখাদ্য সকল প্রস্তুত করিয়াছ। তুমি আমার মস্তককে সুবাসিত তৈলে অভিষিক্ত করিয়াছ)। আমার জীবনপাত্রে সুখ ধরিতেছে না। তোমার কৃপা ও মঙ্গলভাব যে চিরজীবন আমার সঙ্গে থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি চিরদিন প্রভু পরমেশ্বরের গৃহেই থাকিব।

ধর্ম্মের সার—বিশ্বাস ও নির্ভর। নির্ভরের আদর্শ মেষ ও মেষপালক। মেষ কিছুই জানে না, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পালকের উপরে। মেষ জানে না, কোথায় তাহার খাদ্য আছে; সে জানে না, কোন্ পথ দিয়া তাহাকে খাদ্য আহরণে যাইতে হইবে; সে জানে না, কি প্রকার খাদ্য তাহার জন্য রহিয়াছে। সে সকল বিষয়েই নির্ভর করে মেষ-পালকের উপর। তাহার দুইটি চক্ষু ঐ মেষ-পালকের চালন-যষ্টির উপর রহিয়াছে; সে যেদিকে যাইতে বলিতেছে, যে রাস্তা দিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারই অনুসরণ করিতেছে, তাহার কর্ণদ্বয় পালকের আদেশের প্রতি সর্ব্বদা উৎকর্ণ। মেষের সম্পূর্ণ নির্ভর ঐ পালকের উপরে অবস্থিত। তেমনি যাঁহারা প্রকৃত বিশ্বাসী, ঈশ্বরভক্ত, ভগবানকে যাঁহারা প্রতিপালকরূপে বুঝিয়াছেন, ধরিয়াছেন, তাঁহার আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারাও ঠিক ঐ মেষের মত সকল বিষয়ে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়াছেন।

ধর্ম্মের ভিতরকার কথাই এই। এই বিশ্বাস, নির্ভর, অটল প্রেম, এ ছাড়া ধর্ম্ম কিছুই না। খুব সারগর্ভ বচন বলিলে ধর্ম্ম হয় না, শাস্ত্র হইতে অতি উপাদেয় শ্লোক উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিলেও ধর্ম্ম হয় না, খুব সুন্দর করিয়া স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারিলেও ধর্ম্ম হয় না। ও সব বাহিরের জিনিষ।

আমাদের কি তেমন প্রেম আছে? মেষপালকের উপর মেষের যেমন নির্ভর, প্রভুর উপর কুকুরের যেমন বিশ্বাস ও প্রেম, আমাদের কি ঈশ্বরের প্রতি তেমন প্রেম আছে? প্রাণ চলিয়া যাওয়ার পরেও, জীবদেহে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণের কার্য্য থাকে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন নিষ্ঠুর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, একদিন তাঁহার প্রিয় কুকুরের গলা কাটিয়া মুণ্ডুটা টেবিলের উপর বসাইয়া দিলেন, এবং "Taby Taby" করিয়া ডাকিলেন; সেই দ্বিখণ্ডিত-অবয়ব, মুণ্ডুতে সংলগ্ন চক্ষু দুইটি চির-পরিচিত প্রভুর আদরের আহ্বানধ্বনিতে সপ্রেমে হাসিয়া উঠিল, চাহিবার চেষ্টা করিল। নৃশংস মানব চিরপ্রিয় বিশ্বাসী কুকুরের গলা কাটিল; কিন্তু সেই চিরবিশ্বাসী সারমেয়, সেই অসহ্য যন্ত্রণার চরম সীমায় পৌঁছিয়াও, স্বীয় প্রভুর প্রতি প্রেম ত্যাগ করিতে পারে নাই। কি গভীর প্রেম! কুকুরকে খুব করিয়া প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দাও, আবার 'আয়' বলিয়া ডাক, সে তৎক্ষণাৎ লেজ নাড়িয়া তোমার পায়ে পড়িবে, প্রেম জানাইবে।

আমাদের মধ্যে কি এই প্রকার প্রেম, বিশ্বাস ও নির্ভরযুক্ত লোক কেও আছেন? কৈ তেমন মানুষ? আমরা কথা বলেছি অনেক। আমরা মুখে বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা বলিতে পারি, আমরা গান বাঁধিয়াছি "দাও দুখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি"; কিন্তু কাজে তেমন জীবন কৈ?

অমর কথা (৯)

অমৃতের আভা

রাজে রাজে বিশ্বরাজ,
মধুর মোহন রাজ;
সাজে সাজে রঙীন সাজে
মঙ্গল মধু সাজ।
যুগে যুগে, নিমেষে নিমেষে,
অনন্ত সুখ গান;
দানে দানে উঠেছে ভরিয়া
তাঁহারি মধুর দান।
হাসে হাসে বিশ্ব হাসে
ও কি রে সোহাগ হাস!
গানে গানে পুলক গানে
আকুল মধুর ভাষ।
নাচে নাচে অনন্তে নাচে
নিত্য মধুর তান;
ভাসে ভাসে অনন্তে ভাসে,
গাহে অনন্ত গান।
তালে তালে নিত্য দোলায়
অসীম সাগর দোল;
পাতে পাতে বসুধাজননী
অমৃত মধুর কোল।

আর কত কাল সইবে সখা,
সবার অবহেলা।
হায় গো দেখ ভুলায় মোরে
মিথ্যা মায়ার খেলা।
তোমার উদার মুক্ত প্রেম
নীরবে রয় জাগি,
ক্ষমার সুরে টান্‌ছে বুকে
নিত্য মিলন লাগি।
ক্ষুদ্র আমি সীমার মাঝে
অন্ধ আঁখি মেলি,
তাই ত সখা দিন রজনী
ব্যর্থ খেলা খেলি।

কে তুমি গো ভূমা মহান্,
দিয়ে দহন-দোল,
দণ্ডদাতা বিশ্বপাতা
ডাক্‌ছ পাতি কোল?
রুদ্ররূপে আগুন ঢেলে
মারতে পার বাণ,
কিন্তু সখা, গাইলে ওকি
ভালবাসার গান!
ঐ বুকেতেই বিশ্ব হাসে,
তোমারই নাথ জয়,
তাইত সবার বুক ভরেছে
শান্তি সুধাময়।

যুগে যুগে ভক্তপ্রাণের আনন্দগাথার মধুর জয় সাম্য গানে গানে, জীবনে জীবনে, প্রকৃতির বিচিত্র সুষমার ভিতর কি এক পরম ঐক্যতান মঙ্গল সুরে নন্দিত হোয়ে উঠ্‌ছে! আত্মপুরে তাঁরই লীলা—কি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক রহস্য! সবই রহস্যময়—অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল শূন্যে কি বিচিত্র নিয়ম-কৌশলে যথাস্থানে ভ্রাম্যমাণ! আবার অমর আত্মার বুকে এ কি ছবি? সে আনন্দ-আহ্বানে সকল প্রাণতন্ত্রীকে আনন্দের সুরে রণিত কোরে তুল্‌ছে! কার অখণ্ড ন্যায়তন্ত্র সমস্ত নিয়ন্ত্রিত কোরছে, কি দ্যুলোকে ভূলোকে সর্ব্বত্র একই প্রাণময় সত্তা! যতই ভক্ত-প্রাণের আনন্দকাহিনী প্রাণকে আকুল করে, ততই অনন্ত বিশ্ব প্রকাশের বিচিত্র কৌশল তাঁরই পুলক সহবাসে হৃদয় মনে উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে। এ ত অন্ধ শক্তি নয়।

অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক সেই ভূমা মহানেরই চিরমঙ্গল লীলা—কে তা বর্ণনা কোর্‌বে? অতল অসীম জ্ঞানসিন্ধুকূলে বাস, কে লহরীলীলা গণনা কোরবে? কে আমার আমিত্বের এ বিচিত্র চেতনসত্তাই বা উপলব্ধি কোরবে? সবই প্রহেলিকাময়। যাকে তুচ্ছ বলি, তাওত অক্ষয় অব্যক্ত মাধুর্য্যের পরিচয়। পরম জ্যোতির্ম্ময় সত্তার ভিতর দুর্ব্বল আঁখি মেল্‌তে চায়—ক্ষণিক দৃষ্টি সে জ্যোতিসত্তা ধারণ কোরতে পারে কই? সসীম জ্ঞান অন্ধ আবরণে সব আচ্ছন্ন। কতটুকু সত্যস্বরূপ দেখ্‌তে পাই? যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি, সবই সীমার সুরেই বাঁধা পড়ে গেছে। তবুও অনন্তের বিশ্বাস আশা ও করুণাময়ের করুণামাহাত্ম্যেই অসীমের আনন্দ গান। এই বসুন্ধরার বুকে দুদিনের খেলা খেল্‌তে এলাম—তার ও কি অনন্ত প্রকাশ! এম্‌নি কোরেই দেবাদিদেবের আনন্দমহিমায় জীবাত্মার আনন্দসত্তা এই ঘন তমসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট সসীম জ্ঞানলীলার ভিতরই বিকশিত হবে। এই ঘন তমসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট সসীম জ্ঞানলীলার ভিতরই অসীমের মহিমা—জগৎপাতা প্রেমদাতার অনন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব, অনন্ত লীলাপ্রবাহ, অনন্ত বিশ্বে অনন্ত মিলনগান। ইহকাল পরকাল সেই অনন্ত মহিমায় মহিমান্বিত।

কেমন ধীরে ধীরে বিরাটের প্রকাশ! ক্ষুদ্র বীজদলেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের প্রাণসত্তা! সমস্তই ক্রমবিকাশের পূর্ণতার মহিমালোকেই ছুটেছে। সেই প্রাণময়ী শক্তি বিশ্ববুকে অনুপ্রাণিত, সর্ব্বত্রই তাহার প্রকাশ। দুর্ব্বল আঁখি সে পূর্ণ স্বরূপ দেখ্‌তে পারে কই? যা কিছু পরিবর্ত্তনের ভিতর চলেছে, মনে করে এই বুঝি ধ্বংস লীলা। কোথায় ধ্বংস? অণু পরমাণুর বিচিত্র যোগাযোগে, সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণে নব নব শক্তি নব নব স্বরূপেই ফুটে উঠল! এ কি অব্যক্ত শক্তির ভিতর বিরাট বৃক্ষের কাহিনী ঐ ক্ষুদ্র বীজে সন্নিবদ্ধ! কেমন কোরে ভূতলে নিহিত অনাদিকালসঞ্চিত ধূলিকণার ভিতরই প্রাণের খাদ্য সংগৃহীত হোয়ে বিশ্ববুকে নয়নলোভন ফল ফুলে শোভিত মোদিত কুঞ্জ-কানন, কত গন্ধে কত বরণে কত রসে কত ছন্দে সমস্ত আমোদিত কোরে তুল্‌ছে! এই প্রাণময়ী শক্তি জড়ে চেতনে—যাকে অংশ বলি সে ত পরিপূর্ণের ভিতর জেগে আছে, কেমন কোরে তার ভিন্ন সত্তা দান করি? সকল ধ্বংস প্রলয়লীলার মাঝখানেই নবতর মাধুর্য্যবিকাশেরই আয়োজন।

এই পার্থিব তনু—তারও প্রকাশ ঐ সেই চেতনময়ী সত্তাতেই প্রকাশিত! প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সেই চৈতন্যপ্রবাহ, ধমনীতে ধমনীতে সেই প্রাণের সাড়া, জীবাত্মার দেহমন্দিরে নিত্য নূতন ভাবেই নিত্য চেতনলীলা। কোন্ প্রাণশক্তি শিরায় শিরায় রক্তছন্দতালে প্রাণের খাদ্য নিত্য পরিবেশন করে, আর শক্তি সঞ্চার করে? তাইত তাঁর নয়নজ্যোতিবিন্দুর ভিতর ভুবনমোহন দৃশ্যমাধুরী ফুটে ওঠে, তাইত তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুগন্ধ সুবাসে বিশ্বের আনন্দগন্ধ সম্ভোগ করে। বিশ্বের সকল রূপ রস গন্ধ প্রতি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ভিতর জীবাত্মাকে কেবলই আনন্দে অনুপ্রাণিত কোরে তুল্‌ছে। আর যেদিন এ খেলা ফুরিয়ে যাবে, সে দিনও জ্ঞানময়ী আত্মা পরম জ্ঞানময়েই জেগে থাক্‌বে, আর ধূলির দেহ ধূলিতেই পরিণত হবে।

যেমন চেতনের আনন্দ প্রকাশ জড়ের বিচিত্র উপাদানে, তেমনই অমর আত্মার প্রাণসত্তা ঐ পরম প্রাণেই! কোথায় তার অনন্ত নিদ্রা? কোথায় মৃত্যু? মৃত্যুর ভিতরই অমৃতত্ত্ব-লাভ। জীবন থেকে নব জীবনে অধিকতর সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ প্রকাশের ভিতরই প্রকাশবান। বিনাশ কোথায়? এ ত কেবল ক্ষণিক পরিবর্ত্তন! যে ফুল ঝরে পোড়ল, সে বসুধাবুকে ভবিষ্যতের প্রাণসঞ্চয়ের আয়োজন কোরতে চোল্‌ল। তেমনই এই চেতনশক্তি বিধাতার অনন্ত বুকে অক্ষয় নিয়ম পালন কোরে অনন্ত চৈতন্যপ্রবাহে দেহের আবরণ মুক্ত কোরেই ছুটল অনন্ত লীলাসাগরে।

সসীম দৃষ্টি অসীমের শক্তি দেখবে কেমন কোরে? কোন্ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দূরাদপি দূরস্থ জ্যোতিষ্কলোকের সীমা নির্দ্ধারণ কোরবে? অথচ এই সসীম প্রকাশেই অসীমের আলো জ্বেলে দিয়ে যায়। কি দ্রুত স্পন্দনের ভিতর আলোকস্পন্দন বিশ্ব-বুকে খেলা করে! গ্রহ উপগ্রহ অগণ্য অগ্নিগোলককুণ্ডে এক থেকে আর একে বিচিত্র আলোকস্পন্দনলীলা চলেছে, কে তার দূরত্বের মহিমা বর্ণনা করে? নক্ষত্রমালা জ্যোতিষ্ক-সভায় কেমন ঝক্ ঝক্ করে, কোন্ ঊর্দ্ধলোকে তার বসতি কে জানে? কত কোটী কোটী শশী ভানু কে জানে কেমন কোরে বিরাটের প্রাণগর্ভে জেগে আছে, আজও তার আলোকস্পন্দন-প্রবাহ বিশ্ববুকে নেমে এল না! এ কি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! কতটুকু দেখ্‌বে মানুষ? গণিতের গণনা সাহায্যেই অগণ্য জ্যোতিষ্ক-

মণ্ডলের গণনা কোরতে গিয়ে স্তব্ধ হোয়ে যায় ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান! চলেছে খরতর গতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে,—কে নিয়ন্ত্রিত করে? অথচ এ নৃত্যতালের ভিতর এ কি শান্তস্বরূপসত্তা! দেবাদিদেব মহাদেবের বিচিত্র সিংহাসনতলে কোটী শশীভানুর অনন্ত আরতি। ধন্য আদি কবির কবিত্বমাধুরী, আর ধন্য মানব কবির সৌন্দর্য্যবর্ণনা। সুদূরাদপি সুদূরে বাস কোরেও ভূলোক দ্যুলোক এক প্রাণময় নিবিড় আকর্ষণে আবদ্ধ—তাই চন্দ্রমার আকর্ষণে সিন্ধুবুক উদ্বেলিত হোয়ে ওঠে! ভাষার সাধ্য কোথায় প্রকাশ করে সে অনন্ত মহিমা! আবার খণ্ড খণ্ড প্রকাশেই অখণ্ডের বিচিত্র প্রকাশ। হায়! হায়! বাসুধা-জননীবুকে বাস করি, স্তনসুধা পান করি, ভোগ করি, লীলা করি, জানি কত টুকু? অনন্ত অস্তিত্বের মাঝখানেই অনন্ত মন্দিরের আমিও দীন প্রজা। প্রতি জীবনের জীবননাথ যে বিশ্বনাথ সকলেরই সঙ্গী সাথী। প্রতি মুহূর্ত্ত মাস বৎসর সব অনন্ত কালসূত্রে গ্রথিত। বিশাল জলধিবক্ষে প্রতি জলবিন্দু তার খণ্ড প্রকাশ—কে স্বাতন্ত্র্য দান কোরবে? অথচ স্বাতন্ত্র্যমহিমার ভিতরই পরিপূর্ণের অনন্ত অস্তিত্ব।

যখন সকল শক্তি পরাহত হয়, যখন বৈজ্ঞানিকের দীন আবিষ্কার স্তব্ধ হোয়ে যায়, তখন বিস্মিত প্রাণ করজোড়ে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি ভরে অবনত হোয়ে পড়ে।

বিশ্বময়ের বিশ্বগান আমারই হৃদয়বীণাতে বেজে উঠ্‌ল? ওগো! কি অব্যক্ত তার সুর মূর্চ্ছনা! এ কি অনন্ত যোগ-সম্মিলন! অনন্ত জ্ঞানসিন্ধুকূলে এ কি দুর্ব্বল অজ্ঞানের স্তম্ভিত জাগরণ! যুগযুগান্তরবিকশিত এ কি অনন্ত মাধুরীছটা! ক্রমবিকাশের নিত্য নব উদ্বোধনে নিত্য মঙ্গল বিকাশ, সহজ থেকে বিচিত্রে, কদর্য্য থেকে সৌন্দর্য্যের বিমল জ্যোতিসত্তা। যে দিকে চাই সেদিকেই সে বিকাশতত্ত্ব। উদ্ভিদ জগৎ, প্রাণী জগৎ, সর্ব্বত্রই সেই পূর্ণ মঙ্গলেরই আনন্দ মাধুর্য্য মহিমা। কেমন কোরে ধারাবাহিক লীলা চলেছে! ধীরে ধীরে আজ অমর আত্মার মঙ্গল জ্যোতির্মহিমা কেমন কোরে ফুটে উঠ্‌ল কে জানে? আবার যুগ যুগান্তর ধরে ভবিষ্যতে কি পরিপূর্ণ মঙ্গল সুষমা উজ্জ্বলতম হোয়ে উঠ্‌বে কে বোল্‌বে? এই কি দেবলীলা, শেষ গাত? কে জানে কোন্ বিচিত্র লোকে বিচিত্র দেবের সৃষ্টিকাহিনী জেগে উঠ্‌বে? অনন্ত উন্নতি,—ধূলিকণা হোয়েই বিশ্বপ্রবাহে ছুটেছি। কে জানে কেমন কোরে আনন্দময় পবিত্র পুণ্য কাহিনী লোক লোকান্তরে উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌বে।

দেবতার আশীর্ব্বাদে কত দেবত্ব লাভ, আর দেবদেবীর শান্ত সুনির্ম্মল আনন্দ সত্তা! অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অসীম রহস্য কে ভেদ করে? ক্ষুদ্র তৃণ আমি কোথায় ভেসে চলেছি এ অনন্ত প্রবাহে? এ কি চির চেতনময়ী জাগরণ! ক্ষুদ্র ঘরে বাস করি, তবু ক্ষুদ্র বুকেই অসীমের ছটা? আমার চেতনজ্যোতির্মহিমায় এ কি দেবত্বমহিমা!

এমন বিচিত্র অধিকার, দেবতার দান, অনন্ত জীবনলাভ। আমি কোথায়? কেন আমার বেদনার গান? কেন তবে পশু প্রকৃতির এ অসহ্য তাড়না? আত্মশক্তিপ্রভাবে অতীন্দ্রিয় শাশ্বত লোকে ছুটে চলি কেমন কোরে? সে অনিমেষ আঁখি যে দৃষ্টি রেখেছে এ ক্ষুদ্র আঁখিতে! আর কেমন কোরে ভালমন্দ গোপন করি? সব জেনেছেন আমার অন্তর্য্যামী। সমগ্র কালের লীলা আমি কেমন কোরে জানি? জানি কি ভবিষ্যতে কি কল্যাণমহিমা অপেক্ষা কোরছে? জানি বিশ্বকল্যাণ কল্যাণের পথেই নিয়ে চলেছে। সত্য ন্যায় দেবতার অধিকার লাভ হবে, তাইত দিন রজনী এ সংগ্রাম সাধনা—কেন ক্ষুদ্র পার্থিব নিন্দা প্রশংসায় আন্দোলিত হই? কবে নিন্দা প্রশংসার উর্দ্ধে শান্ত লোকে, দেবলোকে, অগ্রসর হব? কবে শুদ্ধ হব, মুক্ত হব, কবে শত ঐহিক বাসনার উর্দ্ধে ভক্ত প্রাণের আনন্দ-গান গেয়ে যাব? কবে সখার আনন্দ মুরলীধ্বনি আমার মুগ্ধ কোরে তুলবে? হায়! হায়! ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্ষুদ্র বিচার বুদ্ধি সসীমের জটিল জালে আবদ্ধ প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমতত্ত্ব বুঝল না! ওগো আমার দেববালা, এস এস, আনন্দ আলো জ্বেলে এস, এ অন্ধ যাত্রীকে সত্য পথে নিয়ে চল। বলদাতা, বল দাও, এ আকুল পিয়াসা অমৃতের আস্বাদনে ভরিয়ে দাও—রিপুপরতন্ত্রতা থেকে রক্ষা কর, যদি দেবত্বের অধিকার দিলে তবে দুর্দ্দিনে পরিত্যাগ কোরো না। সত্য ধনের জন্য সমস্ত উৎসর্গ করবার শক্তি দাও। ওগো চিরবাঞ্ছিত! এ দীন লাঞ্ছিতের প্রতি কৃপা কর। ওগো পুণ্যময় জ্যোতির্ম্ময়! প্রেম-উৎস! শান্ত পূর্ণ ব্রহ্ম! ঐ প্রেমে দীক্ষিত কর—তোমারই হই, তোমায় ভালবাসি, অনন্ত প্রেমের জন্য লালায়িত কর। একবার যদি ও প্রেমরসে মজতে পারি তবে ত এখানেই স্বর্গ, যদি প্রাণব্রহ্মে প্রাণ সঁপে দিই দুঃখ কোথায়?

পরলোকগত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন পরমারাধ্য পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী প্রায় এক সঙ্গে অমরধামে প্রস্থান করেন—সেই ঘোর দুর্দ্দিনে যে অগ্রজের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং অকৃত্রিম স্নেহ আমাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল—গভীর শোকের সময়ে যাঁহার সান্ত্বনাবাক্য প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিয়াছিল—আজ তাঁহার অভাবে চারিদিক শূন্য ও অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। অন্তর্য্যামী জানেন আজ প্রাণের মধ্যে কি হাহাকার উঠিতেছে। জন্মাবধি সেদিন পর্য্যন্ত যাঁহার স্নেহ যত্নে পরিতৃপ্ত হইয়াছি, আজ তাঁহার তিরোধানে প্রাণে যে শোকাগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা সেই শান্তিদাতা ভিন্ন আর কে নির্ব্বাপিত করিবে?

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ শে আগষ্ট আমার অগ্রজ ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কোন্নগর গ্রামে, মাতামহ স্বর্গীয় মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; পিতা স্বর্গীয় সাধু দুকড়ি ঘোষ মহাশয়, এবং জননী সাধ্বী দেবী রমাসুন্দরী। প্রথম শিশুপুত্র এক বৎসর বয়সে দিব্যধামে চলিয়া যাওয়াতে, পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী ইঁহাকে লাভ করিয়া অনেক সান্ত্বনা পাইলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার চরিত্রে বাধ্যতা, নিঃস্বার্থতা,

ভগ্নী শ্রীমতী জীবনবালা দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত ও
শ্রাদ্ধবাসরে পুত্র কর্ত্তৃক পঠিত।

পরদুঃখকাতরতা এবং পিতৃমাতৃভক্তি পরিলক্ষিত হয়। "Child is the father of man"—পরজীবনে যে সকল সদ্গুণ তাঁহার চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তাহা বাল্যকালেই দেখা যায়। তিনি সর্ব্বগুণের আকর ছিলেন—এক সঙ্গে এত গুণ সংসারে প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার পবিত্র চরিত্রের যথাযথ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। অল্প কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি হেয়ার স্কুলে প্রথম অধ্যয়ন করেন, পরে মেট্রোপলিটন কলেজে B. A. পর্য্যন্ত পড়িয়া ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে B. A. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার খুব ব্যুৎপত্তি ছিল। পরে ইংরাজী সাহিত্যে M. A. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়িত হওয়ায় পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। আইন ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহার কোনদিন অনুরাগ ছিল না; কোন কলেজের অধ্যাপক হইয়া সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করেন। কিন্তু M. A. পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হওয়ায় আত্মীয় বন্ধু সকলে আইন পাঠ করিতে পরামর্শ দিলেন। অগত্যা সকলের পরামর্শমত তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং তিন বৎসর পরে ঐ পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হন। চারি বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। কিন্তু মাতৃদেবীর স্বাস্থ্য কলিকাতায় ভাল থাকিত না বলিয়া কলিকাতার বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার মনস্থ করিলেন এবং ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাগপুরে গিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

ছেলেবেলা হইতে তিনি শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার অনুরাগী ছিলেন—তাঁহার কোন জিনিষ কখনও বিশৃঙ্খল বা অপরিষ্কার দেখা যায় নাই। কাহারও বিশৃঙ্খলা বা অপরিচ্ছন্নতা দেখিলে প্রাণে বড় ক্লেশ পাইতেন। কোন কাজ কখনও অবহেলা করিয়া করিতেন না—যে কাজে লাগিতেন, তাহা ভালরূপে না করিয়া ছাড়িতেন না। প্রত্যেক কাজটীর খুঁটি-নাটি পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া করিতেন; এজন্য সময় বা স্বাস্থ্য কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার বাল্যাবস্থায় একবার জননীদেবী খুব পীড়িত হ'ন; তখন তিনি যথাসাধ্য মায়ের সেবা করেন এবং ভাই ভগ্নীকে পালন করেন। তখন আমরা তিন ভাইবোন ছিলাম। তাঁহার মাতৃভক্তি দেখিয়া মাতৃদেবী বড় সন্তুষ্ট হইতেন। ৯।১০ বৎসরের বালকের এমন কর্ত্তব্যজ্ঞান ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। শৈশবে তাঁহার প্রশস্ত ললাট এবং ধীর স্থির মুখ দেখিয়া মাতামহদেব বলিয়াছিলেন "এই পুত্র বড় জ্ঞানী হইবে, ইহার নাম আমি জ্ঞানচন্দ্র রাখিলাম" সাধুর বাণী সত্য হইয়াছিল। মনে পড়ে খাবার জিনিষ যখন ভাগ করিতেন আমাদের বেশী দিয়া নিজে কম লইতেন। জননীদেবীর শিক্ষায় তিনি সেই বাল্য বয়সেই স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনখানি স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্তে পূর্ণ। প্রবীণ বয়সেও দেখিয়াছি, কখনও কোন ভাল ফল বা অন্য কোন দ্রব্য তাঁহাকে দিলে, পরিবারের প্রত্যেকের জন্য না রাখিয়া আহার করিতেন না। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় একদিন কোন আত্মীয় তাঁহার জন্য নিজের গাছের একটী আম পাঠাইয়া দেন। তিনি সেই আমটী টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে বলিলেন—পরিবারের সকলের জন্য যখন সমান ভাগ করা হইল, তখন তিনি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। এরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ে কি সকলে দৃষ্টি রাখিতে পারেন? যখন তাঁহার খুব অল্প বয়স দাসদাসী বা পাচক অনুপস্থিত থাকিলে, গৃহকর্ম্মে আপন সাধ্যমত মায়ের সাহায্য করিতেন। আত্মীয়গণ পরিহাস করিয়া মাতৃদেবীকে বলিতেন "জ্ঞান তোমার কন্যা—পুত্র নয়—পুত্র হ'লে কি এমন ক'রে মায়ের সেবা ও মায়ের সাহায্য ক'রতে পারে?"

বাল্যকাল হইতে তিনি বন্ধুপ্রিয় ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় অনেকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। প্রতিবেশী বালকেরা তাঁহাকে আদর করিয়া "দাদু" সম্বোধন করিত। ছেলেবেলার বন্ধুদের তিনি সর্ব্বদা চিঠিপত্র লিখিতেন। বন্ধুর জন্য কোন কাজ করিতে হইলে তিনি কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। পরেও আমরা দেখিয়াছি, তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বন্ধুর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং নিজের অর্থ ও সময় দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

পাঠ্যাবস্থার একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র তাঁহার চেয়ে ২ বৎসরের ছোট ছিলেন—দু' ভাই অকৃত্রিম স্নেহে আবদ্ধ ছিলেন—আহারে, শয়নে, পাঠে, খেলায় দুজনে দুজনার সঙ্গী ছিলেন। কখনও ভায়ে ভায়ে কলহ হইতে দেখি নাই। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ই ডিসেম্বর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুরন্ত কলেরারোগে দেহত্যাগ করেন। বিধাতার ইচ্ছায় তিনি এখন সঙ্গীহারা হইলেন, এবং ভ্রাতার বিচ্ছেদ যাতনা অসহ্য বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২১ বৎসর এই অল্প বয়সেই তাঁহার মনে সংসারের প্রতি অনাস্থা এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়—জীবনের নশ্বরতা যেন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলেন। এই প্রথম শোক সম্বরণ করিতে তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। এই সময় হইতেই তিনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হইলেন, এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হইবেন না এইরূপ মনস্থ করিলেন।

কলেজ হইতে বাহির হইবার পর পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য জেদ করেন; প্রথমে তিনি সম্মত হ'ন নাই। পরে যখন দেখিলেন গৃহে মাতৃদেবীর একা থাকিতে কষ্ট হয়, তখন তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য মাতৃভক্ত পুত্র তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন। ধার্ম্মিক পরিবারের কন্যা গৃহে আসিলে সকলে সুখী হইবেন, এই আশায় তিনি ১৯৯৪ সালে ২রা জুন বাঁকিপুরনিবাসী সাধু প্রকাশচন্দ্র রায় ও দেবী অঘোরকামিনীর কনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনীকে বিবাহ করেন। নববধূ শ্বশুরগৃহে আসিয়া সেবায় ও যত্নে চিরদিন সকলকে সুখী করিয়াছেন, এবং শ্বশুর শাশুড়ী তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। এই বিবাহে তাঁহার দু'টি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্মে। প্রথম পুত্র ৫ মাস বয়সে বাঁকিপুরে তাহার শিশুলীলা সংবরণ করে। সংসার প্রবেশের পর এই প্রথম আঘাতে তাঁহার কোমল মনে বড় আঘাত লাগিয়াছিল।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে তিনি পিতামাতা স্ত্রী, পুত্র দেবপ্রসাদ এবং কন্যা অমিয়াকে লইয়া নাগপুরে গিয়া বাস

করিতে আরম্ভ করেন। জীবনের অবশিষ্ট দিন তাঁহার নাগপুরেই কাটিয়াছে। এই নাগপুর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহারে এবং সহৃদয়তার গুণে সেখানে তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় এবং বাঙ্গালী উকিল ব্যারিষ্টারগণ তাঁহাকে "দাদা" সম্বোধন করিতেন—তিনিও আপন ভ্রাতার ন্যায় সকলের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতেন।

তাঁহার চরিত্রে ভক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল—মাতামহ মাতামহী, পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীকে তিনি দেবতা জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের ছবি সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে থাকিত—প্রতিদিন প্রাতে তাঁহাদের উদ্দেশে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া তবে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন। রোগশয্যায়ও পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীর ছবি সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে থাকিত; কখনও একটু অন্তরাল হইতে দিতেন না। আমাদের মাতৃস্বসা ক্ষীরোদা দেবী গৃহস্থ হইলেও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণা যোগিনী ছিলেন। তিনি তাঁহাকে চিরদিন গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং যতদিন তিনি জীবিতা ছিলেন, তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইতেন ও তাঁহার আদেশ পালন করিতেন।

তাঁহাকে মানববন্ধু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নাগপুরের ধনী দরিদ্র জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার প্রিয় ছিলেন। সকলের সুখে দুঃখে আপনাকে মিশাইয়া দিয়া, সহানুভূতির গুণে সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি দুঃখীর সমদুঃখী, বিপন্নের সহায়, ও শোকার্ত্তের সান্ত্বনাদাতা ছিলেন। তাঁহার পরদুঃখকাতর হৃদয় অন্যের দুঃখ দেখিলেই ব্যথিত হইত। একদিন তিনি একটি বালিকাকে উপদেশ দিতেছিলেন "মা, জগৎ যে তোমার জন্য, তা মনে ক'রো না—তুমি জগতের জন্য, ইহা সর্ব্বদা মনে রেখো। সাধ্যমত অন্যকে সুখী ক'রো, এবং অন্যের সেবা ক'রো।" তাঁহার নিজের জীবনের ইহাই আদর্শ ছিল। নিজের সুবিধা অসুবিধা চিন্তা না করিয়া কত দরিদ্র গৃহস্থকে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, রোগে বিপন্ন ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রেম জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।" তিনি নিজের স্নেহ ভালবাসার গুণে পরকে আপন করিয়াছিলেন—নাগপুরের অধিকাংশ লোক তাঁহার নিকট আত্মীয় হইয়া গিয়াছিলেন।

তিনি যখন দান করিতেন, কেহ জানিতে পারিত না—কাহাকেও জানাইতে ভালবাসিতেন না। একবার একটি হিন্দুমহিলার স্বামী গুরুতর রূপে পীড়িত হওয়াতে বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন—চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তাঁহার কাছে কেহ সাহায্য প্রার্থনা করে নাই—তিনি লোক-পরম্পরায় জানিতে পারিয়া ঐ ভদ্রমহিলাকে গোপনে একশত টাকা দিয়া আসিলেন। আমরা পরে এ বিষয় জানিতে পারিয়াছি। ঐ মহিলা চিরদিন তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। নাগপুরে একজন ব্যারিষ্টার স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য কিছু সংস্থান না করিয়া অকালে মারা যান; তিনি এই দুস্থ পরিবারকে কত প্রকারে যে সাহায্য করেন তাহা বলা যায় না। তিনি যে সব Case আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা শেষ করিয়া fee গুলি তাঁহার স্ত্রীর হাতে দিয়া আসেন। এরূপ উদারতা সংসারে বিরল—তাঁহার জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক দেখা গিয়াছে।

একজন উকিল অনেকদিন পর্য্যন্ত পীড়িত ছিলেন। দাদা সেই সময় তাঁহার কাজগুলি করিয়া fee এবং পুরস্কারের টাকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেন। নিজের জন্য তিনি ভাবিতেন না—অন্যের দুঃখ দেখিলে নিজের স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন।

অর্থ ও মান উপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই। যিনি নিত্যধনের প্রয়াসী। ঐহিক মান ঐশ্বর্য্যের জন্য তিনি কেন ব্যস্ত হইবেন? সাংসারিক লাভক্ষতি তিনি গণনা করিতেন না। পদ্ম-পত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকিতেন। গত ১৯৮ সালের মে মাসে গ্রীষ্মাবকাশে তিনি যখন কলিকাতায় আসেন, দুইদিন পরে তার আসিল "তোমার বসতবাটী সমস্ত জিনিসপত্র সহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে।" অকস্মাৎ এই সংবাদে আমরা সবাই অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম—কিন্তু তাঁহার সেই সময়কার শান্ত ধীর ভাব দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ এবং আমরা সকলে অবাক্ হইয়াছিলাম। তিনি হাঁসি মুখে বলিলেন "সবই একদিন ধ্বংস হইবে—ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন কোন ঘটনা হয় না, তাঁহার ইচ্ছায় যাহা হইয়াছে তাহার উপর অভিযোগ করিবার কিছু নাই।" মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানের উপর কি গভীর বিশ্বাস! মায়ের হাত হইতে যাহা আসে তাহাই আমাদের মঙ্গলের জন্য, বিপদেয় সময়ে এ বিশ্বাস রাখা কত কঠিন!

বাল্যকাল হইতে দাদার বিলাসিতা বা বেশভূষার দিকে দৃষ্টি কখন ছিল না। নিজে যখন অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, তখনও তিনি সামান্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন; কিন্তু পরিবারস্থ আর সকলকে ভাল বস্ত্রাদি দিতে এবং পরাইতে ভাল বাসিতেন।

গৃহপালিত জন্তুদের প্রতি তাঁহার বড় দয়া ছিল। প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে তাঁহার পালিত কুকুর এবং বিড়াল আসিয়া উপস্থিত হইত; তিনি তাহাদের খাইতে না দিয়া কখনো নিজে আহার করিতেন না—কাচারী যাইবার তাড়াতাড়ির সময়েও ইহার ব্যতিক্রম হইত না; আজীবন নিষ্ঠার সহিত এই কাজ করিয়াছেন।

প্রতিদিন প্রভাতে তিনি নিজের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে বায়ু-সেবন করিতেন এবং কোথায় কোন্ গাছটীর অযত্ন হইতেছে, কোথায় তৃণ ও আগাছা জন্মিয়াছে, কোন্ লতাটী আশ্রয় পাইতেছে না, সব দেখিতেন এবং তাহার সংস্কার করিতেন। ফুল তাঁহার বড় প্রিয় বস্তু ছিল, তাই তাঁহার বাগান সব ঋতুতেই নানা প্রকার পুষ্পে শোভা পাইত ও সুগন্ধ বিকীর্ণ করিত। সদ্যোপ্রস্ফুটিত শিশিরস্নাত কয়েকটী ফুল লইয়া দাদা নিজের বসিবার গৃহে প্রতিদিন প্রাতে রাখিতেন। তাঁহার বসিবার গৃহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর রূপে সাজানো থাকিত। কতদিন দেখিয়াছি নিজে সম্মার্জ্জনী হাতে লইয়া ঘর ও জিনিষ পত্র ঝাড়িতেছেন। আমরা বলিতাম "দাসদাসী সত্বে তুমি নিজে কেন এসব কর?" তাহাতে বলিতেন "কি ক'রবো, ওরা ভাল ক'রে পরিষ্কার করে না যে।"

নাগপুর সহরে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মমন্দিরের অভাবে তিনি আপন বাটীতে সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য করিতেন। নাগপুরের ব্রাহ্মের সংখ্যা অত্যন্ত কম; কিন্তু অনেক হিন্দু পুরুষ এবং মহিলা আগ্রহ সহকারে ঐ উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেন। তাঁহার তিরোধানে হয়তো নাগপুরে ব্রহ্মোপাসনা বন্ধ হইয়া গেল। একটী মহিলা শোকপ্রকাশ করিয়া সেদিন লিখিয়াছেন "আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যদেবকে এত শীঘ্র হারাইব তাহা ভাবি নাই......তাঁহার ভক্তিপূর্ণ অমৃতময় বাণী আর শুনিতে পাইব না মনে করিয়া গভীর দুঃখে হৃদয় পূর্ণ হইতেছে।" তিনি নীরব সাধক ছিলেন—নীরবে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

প্রয়োজন হইলে স্থানীয় ব্রাহ্মদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কাজ করিতেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারে ব্রহ্মনাম শুনাইতেন। তাঁহার গৃহসংলগ্ন জমিতে সম্প্রতি একটী বড় হলবিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—অতিথিসেবা এবং সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার জন্য। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় কালরোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এই অভিলাষ অপূর্ণ রহিয়া গেল। অতিথিদের তিনি যে কিরূপ প্রাণপণ যত্ন এবং আদর করিতেন, যিনি একবার তাঁহার গৃহে গিয়াছেন তিনিই জানেন।

একটী ব্রাহ্ম মহিলা পুত্রকন্যাসহ তাঁহার গৃহে দেড় মাস অবস্থিতি করেন। তিনি সান্ত্বনা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, "তাঁহার গৃহে আমরা যেরূপ স্নেহ যত্ন পাইয়াছি, আপন পিতা মাতা ভগ্নী সেরূপ আর কোথাও পাই নাই। তাঁহার স্নেহ ভালবাসার কথা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।" কি স্নেহশীল অন্তঃকরণ লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন, যাহাতে এমন করিয়া পরকে আপন করিতে পারিয়াছিলেন! নাগপুরের লোকেরা কেহ মামা, কেহ জেঠামশায়, কেহ 'পিসেমহাশয়' এইরূপ তাঁহাকে সম্বোধন করিত। যথার্থ আত্মীয়ের মত তাঁহাকে দেখিত ও তাঁহার কাছে আবদার করিত। নাগপুর সহরে দুইবার অত্যন্ত প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। নিজের গৃহ সহরের বাহিরে ছিল বলিয়া জনৈক বন্ধুকে পরিবার সহ নিজের কাছে আনিয়া প্রায় দুইমাস রাখিয়াছিলেন। আজ তাঁহাকে হারাইয়া নাগপুরের লোকেরা পরমাত্মীয় হারানোর বেদনা অনুভব করিতেছেন এবং শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন।

Depressed class এর ছেলেদের জন্য নাগপুরে কএক বৎসর ধরিয়া একটী বিদ্যালয় হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে ছেলেদের নিকট গিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া তৃপ্তির সহিত তাহাদের আহার করাইয়া আসিতেন।

গত ক'এক বৎসর ধরিয়া তিনি নাগপুরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহার উদ্যোগে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐ সভায় সর্ব্ব ধর্ম্ম এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের পুরুষ এবং মহিলা যোগ দিতেন এবং রাজার জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। এই সভার জন্য তিনি ক'এক দিন পূর্ব্ব হইতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেন।

তিনি পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র, আদর্শ পিতা ও ভ্রাতা, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রেমময় পতি ছিলেন। তাঁহার পবিত্র জীবনখানি আলোচনা করিলে মনে হয়, তাঁহার মত সৎপুত্র জন্মগ্রহণ করাতে পিতৃকুল ধন্য হইয়াছে—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"।

গীতা তাঁহার বড় প্রিয় গ্রন্থ ছিল—অবসর পাইলেই গীতা এবং অন্য সৎ গ্রন্থ পাঠ করিতেন, কখনো বাজে বই পড়িয়া সময় নষ্ট করিতেন না। দেহত্যাগের দুইদিন পূর্ব্বে আমাদের ভক্তি-ভাজন খুল্লতাত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত 'ভগবৎগীতিমালা' গ্রন্থ ক'একখানি কিনিয়া ক'এক জন আত্মীয় ও বন্ধুকে প্রেরণ করেন। নিজে ঐ 'গীতিমালা' পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন; তাই উহা বন্ধুদের দিয়া সুখী হইলেন।

গত নভেম্বর মাসে তিনি গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া চিকিৎসার জন্য নাগপুর হইতে কলিকাতায় আসেন। স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া, তিনি নিজের জন্য কাহাকেও কষ্ট দিতে ভালবাসিতেন না—আজীবন নিজের কাজ নিজেই করিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকালব্যাপী রোগে স্ত্রীপুত্রের সেবা লইতেও যেন কুণ্ঠা বোধ করিতেন। নয়মাস কাল রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ভগবানে ও পরলোকে কি অনন্ত বিশ্বাস দেখাইয়া গিয়াছেন—নীরবে হাসিমুখে অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। একদিন আমাকে বলিলেন "ঈশ্বরে এবং পরলোকে যদি বিশ্বাস কর, তবে আমার জন্য এত ভাব কেন? একদিন সকলকেই তো যেতে হবে।" গত মে মাসে আমাকে একখানি পত্র লেখেন—তাহাতে লিখিয়াছেন "আমি অমৃতধামের যাত্রী, আমার মন আনন্দে পূর্ণ।" 'আমি সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করিব, প্রিয় অপ্রিয় হে' এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহার জীবনে সত্য হইয়াছিল।

অমৃতধামে যাইবার জন্য তিনি অনেক দিন হইতে প্রস্তুত ছিলেন। সাংসারিক সকল কাজ—পরিবার পরিজনদের মধ্যে যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, সব যেন শেষ করিতেছিলেন। কোন কাজই অপূর্ণ রাখিয়া যান নাই। পাছে আমাদের প্রাণে ক্লেশ হয়, তাই তিনি যে শীঘ্রই পরপারে যাত্রা করিবেন, সে কথা কচিৎ উল্লেখ করিতেন, কিন্তু মনে বুঝিয়াছিলেন যে, দয়াময় অচিরে তাঁহাকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিবেন। পুত্র শ্রীমান্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিয়া দিবারাত্র তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তাহাকে শেষ উপদেশস্বরূপ এই পত্র-খানি লিখিয়া গত ৮ই জুন তারিখে তাহার হস্তে দেন।

My darling Deb,

Never be elated with joy or depressed with sorrow. Both joy and sorrow are sent by our Divine Father. So always be calm and serene. He tests our strength in affliction, and weakness in joy.

Deal in business with men like your relations. Be always straight with everybody.

Trust these words of advice as if I am living and speaking to you.

Yours most affly.
J. C. Ghosh.

ঐ পত্রের বাংলা অনুবাদ:—প্রাণাধিক দেব,

কখনও আনন্দে উন্মত্ত বা দুঃখে অভিভূত হইবে না। পরমপিতা আমাদের পরীক্ষা করিবার জন্য দুঃখ এবং সুখ দেন। দুঃখে বিপদে আমাদের মনের বল পরীক্ষা করেন এবং সুখে সম্পদে দুর্ব্বলতার পরিচয় লন। এজন্য সর্ব্বদা শান্ত সমাহিত ভাব ধারণ করিবে। কার্য্যগতিকে যে সকল লোকের সহিত মিশিবে তাহাদের প্রতি নিকট আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিবে। এই কথাগুলি চিরদিন স্মরণ রাখিও এবং মনে করিও যেন আমি জীবিত আছি, ও তোমাকে উপদেশ দিতেছি।

রোগের প্রথম অবস্থায় একদিন বলিয়াছিলেন "এবার ভগবান যদি আমার প্রাণ রক্ষা করেন, ত' ভাল ক'রে তাঁর কাজ ক'রবো।" বিধাতার চক্ষে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে দুঃখ তাপের অতীত চির শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন।

দেহত্যাগের কয়েক দিবস পূর্ব্বে আমাদের সাধ্বী মাতামহী দেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনে, দুর্জ্জয় রোগকে অগ্রাহ্য করিয়া কত আগ্রহ এবং ভক্তির সহিত নিজেই উপাসনার কার্য্য করিলেন! আত্মীয় স্বজন সকলে দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

তিনি বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। কেহ ভক্তির সহিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিলে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে কেহ গান করিলে মুদিত নয়নে, জোড় করে সেই সঙ্গীত শুনিতেন। ভক্ত কালীনারায়ণের একটী সঙ্গীত তাঁহার কাছে গীত হওয়ায় বলিলেন, "আমিও তো তাঁদের কাছেই যাচ্ছি, তাঁর কাছেই তাঁর গান শুনবো।" পরলোকে কি অনন্ত বিশ্বাস! এই জন্যই তিনি একদিনও সকলকে ছাড়িয়া যাইতেছেন বলিয়া কাতরতা প্রকাশ করেন নাই।

বিধাতার নীরব আদেশে তাঁহার পুণ্যময় জীবনের অবসান হইল; চিকিৎসকদের সুনিপুণ চিকিৎসা, স্ত্রী পুত্রকন্যা ও আত্মীয় স্বজনের প্রাণপণ সেবাও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। দয়াময় আপন কোলে প্রিয় সন্তানকে তুলিয়া লইলেন। এখানে হাহাকার, ও স্বর্গরাজ্যে জয়ধ্বনি উঠিল।

আজ এই পবিত্র দিনে তাঁহার এই পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হই। তিনি আমাদের সকল ত্রুটী ও অপরাধ মার্জ্জনা করুন। তাঁহার পুণ্যময় জীবনের পুণ্য প্রভাব আমাদের পরিবারে অক্ষুণ্ণ থাকুক। মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার অমরাত্মাকে শাশ্বত আনন্দ ও শান্তি বিধান করুন। এবং আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন শোকে দুঃখে সর্ব্বদা মঙ্গলময়ের মঙ্গলমূর্ত্তি দেখিতে পাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২রা অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রভাত-রঞ্জন ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা নীলিমা দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া ২১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি কৃতী ছাত্রী ছিলেন এবং বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিগত ১৬ই অক্টোবর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য এবং ভ্রাতা শ্রীমান প্রশান্ত-কুমার জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲, প্রচার বিভাগে ৩৲, বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ ৩৲ ও দরিদ্রের শিক্ষার্থ ৩৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২রা অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন সপ্তাহ বয়সের একটি শিশু পুত্র (কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্র) পরলোক গমন করিয়াছে। বিগত ৯ই অক্টোবর তাহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২রা অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায়ের গৃহস্থিত রাণী পালিত হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৯ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেবের ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেব তাঁহার পরলোকগতা মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীমতী বিভুবালা মিত্র কন্যালিখিত মাতৃ-স্মৃতি পাঠ করেন। এই উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১১ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত চন্দ্র-প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র, বিধবা মাতার আশ্রয়স্থল, ইন্দ্রজিৎ কয়েকমাস ক্ষয়রোগে ভুগিয়া ১৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয় স্বজনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেনের পুত্র শ্রীমান যতীশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চাটার্জ্জির দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া মালতীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেবের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান আলোকচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চাটার্জ্জির চতুর্থকন্যা কল্যাণীয়া রমার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১লা অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া সাধনা ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের পুত্র শ্রীমান সুধেন্দুকুমারের এবং চতুর্থকন্যা কল্যাণীয়া সুমনা ও পরলোকগত জংকৃষ্ণ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১লা অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত উমাপদ রায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলকুমার ও শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শান্তিলতার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র নন্দীর কন্যা কল্যাণীয়া নীহারকণিকা ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রীতীন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী—বিগত ৬ই হইতে ৯ই অক্টোবর ডিব্রুগড় নগরীতে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। আলোচনাদি ব্যতীত প্রতিদিন উপাসনা হইয়াছে; তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। মহিলাদের ও যুবকদের সম্মিলনও হইয়াছিল।

মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার—এই ভাণ্ডার হইতে দুঃস্থ রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্যাদি বিষয়ে সাহায্য করা হয়। সম্পাদিকা শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী মিত্রের নিকট ৬৫।৪ হ্যারিসন রোড ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

শিবনাথ স্মৃতিসভা—বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে যে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস বক্তৃতা করেন। ভবানীপুর সম্মিলনব্রাহ্মসমাজেও একটি স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ১লা আশ্বিন ব্রহ্ম-মন্দিরে স্বর্গীয় শ্রদ্ধাভাজন গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর পরলোক গমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং গুরুদাস বাবুর জীবন সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় কথা বলেন। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস গুরুদাস বাবুর জীবন সম্বন্ধে কিছু বলেন। রাত্রিব সামাজিক উপাসনান্তে কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে একটী শোকসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩১শে ভাদ্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্তের ভবনে তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রী কঙ্কলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিগত ২রা আশ্বিন সায়ংকালে ছাত্র সমাজের এক অধিবেশনে পুরুলিয়ার স্বদেশসেবক বাবু নিবারণচন্দ্র দাস বি এ 'সত্যের প্রতিষ্ঠা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। বক্তৃতা সম্বন্ধে মনোমোহন বাবু, সত্য বাবু এবং সভাপতির আলোচনা ও মন্তব্যান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বিগত ৭ই আশ্বিন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর স্মরণার্থে একটী সভা হয়। মনোমোহন বাবু সভাপতি রূপে সঙ্গীত ও সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিলে সত্যানন্দ বাবু এবং বাবু রসরঞ্জন সেন জীবন প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন। সভাপতির বক্তৃতান্তে কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর ১০ই আশ্বিন সায়ংকালে যুগপ্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত প্রার্থনান্তে রায় গণেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, ডাক্তার সাহদ্দিন মহম্মদ সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ সেন এবং শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন বক্তৃতা করেন। সভাপতি প্রারম্ভে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত এবং অন্তভাগে অক্ষয়কুমার দত্তের লিখিত অভিমত পাঠ করিয়া নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলে রাত্রি ৯॥ টায় সভার কার্য্য শেষ হয়।

ভুল সংশোধন।

বিগত ১লা আশ্বিনের তত্ত্ব-কৌমুদীতে ১১শ সংখ্যা, ১৩০ পৃষ্ঠা, ৩৯ ছত্রে "দ্বিজেন্দ্রনাথ" স্থলে "দ্বিপেন্দ্রনাথ" হইবে।

Registered N0 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ 2nd December, 1927. | প্রতি সংখ্যার মূল্য /৴০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

বিফল ক'রো না।

আজিও ধ্যানের আসন হ'ল না অটল,
কি বাতাসে এক্ নিমেষে ক'রেছে চঞ্চল!
প্রভাত সন্ধ্যা নিশীথে অ-ই তব পদ-তলে,
আসন বিছানো মোর ধ্যানে পাব ব'লে।
কিন্তু হায়! কোন্ সুদূরে সূক্ষ্ম কর্ম্মজাল
আছে ঘেরা, সদাই টানে—নাহি কালাকাল।
অধীর চিত্ত করিতেছে কাটিতে বন্ধন,
যে সংগ্রাম, কে বুঝিবে হে অন্তর-ধন?
পদে পদে পরাজিত! দুঃখ অবিরাম,
কে ঘুচাবে দুর্ব্বলের দারুণ সংগ্রাম?
বড় ব্যথা—আছে পাতা ধ্যানের আসন,
বসিতে শকতি নাই, কেমন শাসন?
দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায় চ'লে,
আজিও জড়া'য়ে জালে ভাসি অশ্রুজলে!
কর নাথ! কর নাথ, এ জাল-মোচন,
বিফল ক'রো না রচা ধ্যানের আসন।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে প্রেমময় জীবনবিধাতা, তুমি নিয়ত আমাদের সঙ্গে থাকিয়া, তোমার অসীম প্রেমের আমাদিগকে হাত ধরিয়া, পথ দেখাইয়া, অনন্ত জীবনপথে লইয়া চলিয়াছ। ক্ষীণদৃষ্টি দুর্ব্বল-প্রাণ আমরা অতি অল্প পথই দেখি, সামান্য দূরই অগ্রসর হইতে পারি। এই অন্ধকারময় বন্ধুর পথে যখন আমরা, তোমার আলোক পরিত্যাগ করিয়া দূরে দৃষ্টিপাত করি, তোমার হাত ছাড়িয়া আপনার বলে দৌড়িতে যাই, তখন আমরা কেবলই অন্ধকার দেখি, পদে পদে বিভ্রান্ত ও পদস্খলিত হই। আমরা ত প্রতিনিয়তই ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি। তথাপি কেন যে আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ দেখিতে যাই, সম্মুখস্থ পথ ও কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া সুদূর গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হই, জানি না। হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদের এই দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্গতি দূর কর। তুমি আমাদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছ তাহার অনুগত হইয়া, সুনিশ্চিত ভাবে জীবনপথে চলিতে ও প্রতিপদক্ষেপে উন্নতি ও কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ কর। তুমিই আমাদের সকলের একমাত্র প্রভু ও চালক হও। তোমার ইচ্ছাই ইহলোকে পরলোকে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

ঘর সাজান হলো না—আমার বাগানে কত ফুল ফোটে—অন্যে নিয়ে যায়, অন্যের ঘর গন্ধে আমোদিত হয়, আর আমার ঘর সাজান হয় না! আমার কত আলোক আছে—অন্যের ঘর আলোকিত হয়, আমার ঘর অন্ধকার থাকে! আমার কত ধন ঐশ্বর্য্য আছে—অন্যে তাহা লইয়া ধনী—তাহাদের ঘরে কত আসবাব, কত বিভব; আর আমার ঘরে একটা আসবাব নাই, একটা জিনিষ নাই—আমার ঘর শূন্য! আমার কত আপনার জন আছে—তারা অন্যের কাছে যায়, তারা আমার ঘরে আসে না; আমার ঘরে তাদের কথা শোনা যায় না! আমার প্রিয় জনদের কত বিদ্যা আছে, সঙ্গীতশক্তি আছে—তারা অন্য স্থানে কত

গান করে, কত আলাপ আলোচনা করে; আমার ঘরে একটি সঙ্গীতের সুর উঠে না, কোন জ্ঞানের কথা শোনা যায় না! এ কি হলো! আমার সব থাকৃতে এমন দশা কেন হলো? ওগো, তোমরা তোমাদের আপনার ঘর ফেলে কোথায় যাও? তোমরা আপনার জনকে চিন্‌লে না! আপনার এত জিনিষ থাকৃতে ঘরখানা সুন্দর ক'রে সাজালে না! নিজের ঘর আঁধার রইল! এস, তোমরা ঘরে ফিরে এস; প্রভু ডাকৃছেন, ঘরে ফিরে এস; আপনার ঘর শোভা সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত কর! আপনার ঘর সঙ্গীতের ধ্বনিতে, পুষ্পের গন্ধে, পূর্ণ কর! তাহাতেই জীবন, তাহাতেই মুক্তির আনন্দ।

কিসের গৌরব কর?—তোমার ধন আছে, জন আছে, মান প্রতিপত্তি আছে, উচ্চ পদ আছে। তার গৌরব কর? কিন্তু তুমি সার ধন চিন্‌লে না, তুমি যে স্পর্শমণি পেয়েছ. তা জান্‌লে না! আজ অন্তরের দিকে তাকাও; আজ কোথায় এসেছ, কাঁ'র আশ্রয়ে এসেছ, তাহা অনুধাবন কর। জীবনের উষাকালে কাঁ'র ডাক শুনে ছুটেছিলে? কাঁ'র চরণে এসে ব'সেছিলে? কোন্ আদর্শ দেখে সব ছেড়ে এসেছ? যা পেলে আর কিছু পাবার থাকে না, যা দেখ্‌লে সকল দেখার সাধ মিটে, যাঁর বাণী শুনলে আর কিছু শোনা বাকী থাকে না, তিনি যে তোমার প্রাণে! আজ তাঁর কথা বল্‌তে, তাঁর নাম কর্‌তে লজ্জা বোধ কর? আজ তুমি যে তাঁর দাস হয়েছ, তা স্বীকার কর্‌তে কুণ্ঠা বোধ কর? বিশ্বরাজ যিনি, তাঁর যে তুমি প্রিয়, এ কথা স্বীকার কর্‌তে সঙ্কুচিত হচ্ছ? প্রাণের দেবতা যিনি, জীবননাথ যিনি, তাঁর চরণে আত্মা মন বিলিয়েছ, তা বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে? ব্রহ্মের দাস তুমি, ব্রহ্মের প্রিয় তুমি, ব্রাহ্ম তুমি, তা স্বীকার কর্‌তে গৌরব বোধ কর না? তবে কিসের গৌরব কর্‌বে? ব্রহ্মের জন্যই আমাদের গৌরব, ব্রহ্মের দাস ব'লেই আমরা সুখী, অন্য সুখ, অন্য গৌরব, চাই না।

দুঃখ পেয়েও সুখ বিলাব—

আমি বড় দুঃখী, তাতে ক্ষতি নাই,
পরে সুখী ক'রে সুখী হ'তে চাই;
আপনি কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব
সবার আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।

আমার দুঃখ আসুক, তবুও যেন অপরকে সুখী কর্‌তে পারি। আমার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হউক, আমি যেন অপরের চোখের জল মুছাতে পারি। রোগে শোকে দুঃখে আমার জীবন পাত হউক, আমি যেন অপরের সেবা কর্‌তে পারি। আমাকে আমার প্রিয়জনেরা যেন অপ্রেম করে, উপেক্ষা করে, বেদনা দেয়, আমি যেন তবু প্রেমে আলিঙ্গন কর্‌তে পারি। লোকে আমার অনিষ্ট করুক, আমি যেন ইষ্টকামনা ইষ্ট-সাধন কর্‌তে পারি। লোকে আমার কলঙ্ক রটা'ক, তবু যেন সকলের কল্যাণ কামনা কর্‌তে পারি। আমাকে নিন্দা করুক, আমি যেন তাদের হস্ত চুম্বন কর্‌তে পারি। আমার সুখ চাহি না, আরাম চাহি না; আমি যেন অপরকে সুখী ক'রে, প্রেম বিলিয়ে, কল্যাণ ক'রে, চ'লে যেতে পারি।

সম্পাদকীয়

ইহলোক না পরলোক—আমাদের এই দেশ পরলোকের জন্য ইহলোককে উপেক্ষা ও পরিত্যাগ করা চিরকাল অতি গৌরবজনক মনে করিয়া আসিয়াছে; অপর সকলকে অবজ্ঞাসূচক 'ইহ-সর্ব্বস্ব' নাম প্রদান করিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রতিপাদনের চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি ভোগ করিয়াছে। ইহার ফলে যদি তাহার ইহলোক বিনষ্টই হইয়া থাকে, তবে তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কাচখণ্ডের বিনিময়ে যদি বহুমূল্য মণি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে কোন্ মূর্খ তাহাতে আনন্দিত না হইয়া দুঃখিত হয়? আর, যে কাচখণ্ড পাইয়াই সন্তুষ্ট হইল, তাহাকে কৃপার পাত্র মনে না করে? এই জাতিটা যদি পার্থিব ধন সম্পদে অতি দরিদ্র হইয়াও প্রকৃত ধর্ম্মধনে যথার্থই ধনী হইত, তাহা হইলে ইহ সংসারেও যে একটা গৌরবজনক স্থান লাভ করিতে পারিত, এরূপ ঘৃণিত লাঞ্ছিত পদদলিত হইয়া থাকিতে হইত না, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আর তাহা না হইলেও, আনন্দচিত্তে সে ক্ষণিক দুঃখকে বরণ করা যাইত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এ দেশ পরলোকের জন্য শুধু ইহলোকের ধন সম্পদই বর্জ্জন করে নাই, পরমসম্পদ্ ধর্ম্মধনকেও পরিত্যাগ করিয়াছে। কথাটা নিতান্ত অদ্ভুতই শুনায় বটে, কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। এখানে মুক্তি (যে অর্থেই ব্যবহৃত হউক না কেন) বা পরলোকে সদ্গতিই ধর্ম্ম-সাধনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া চিরদিন পরিগণিত হইয়াছে, এবং সেই ভাবেই ধর্ম্ম সাধিত হইয়াছে। সুতরাং এদেশে যোগ ভক্তি প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাধনের যে যথেষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, জগতে এ পর্য্যন্ত সেরূপ পরাকাষ্ঠা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না, তাহা হইলেও তাহার সহিত আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। তাহা মানিয়া লইয়াও কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইবে, সে সমস্তই জীবনের একাংশ—এক প্রকার বহির্ভাগ—লইয়াই ব্যস্ত ছিল, ইহলোকের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না—চিন্তা ও ভাবরাজ্যের অত্যুচ্চ শিখরে অবস্থিত হইলেও, উহা জীবনের মূল ভিত্তি ইচ্ছা ও কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল; সুতরাং জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি মুহূর্ত্তের অসংখ্য সাংসারিক কর্ত্তব্য উচ্চ তত্ত্ব ও ভাবের দ্বারা যথোপযুক্তরূপে প্রভাবান্বিত ছিল না। মানবজীবনকে এরূপ বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ করা যে সম্ভবপর নহে, উহা কোনও ক্রমেই স্বাভাবিক নহে, নিতান্তই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক, তাহাতে কাহারও বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ থাকিতে পারে না—এ অকাট্য সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একমাত্র চিন্তা ও কল্পনা

বলেই এরূপ বিভাগ সম্ভবপর। যুক্তি বিচার চিন্তা বলে নানা বিষয়ে, এমন কি ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়েও, অনেক উচ্চ তত্ত্ব লাভ করা যাইতে পারে। এরূপ এক ব্যক্তি, জ্ঞানে খুব উন্নত হইয়াও, ভাবে ও ইচ্ছাতে অত্যন্ত অনুন্নত, অতি নিম্নভূমিতে অবস্থিত থাকিতে পারে। অপর এক জন উচ্ছ্বাসময় ভাবের চরম সীমাতে পৌঁছিয়াও, অপর দুই বিষয়েই হীন হইতে পারে। কিন্তু ইহার কোনটিকেই মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকাশের দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে আর একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে—এ স্থলে মানুষ এক অঙ্গের অতিরিক্ত পরিচালনা করিয়া তাহাকে অত্যধিক বিকশিত করিয়াছে, ও অপর অঙ্গকে পঙ্গু করিয়াছে, তাহার সমগ্রটা কিন্তু বিশেষ উন্নত হয় নাই। ইহা প্রকৃতির বিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বাভাবিক নিয়মের বিকাশ এ প্রকারের হয় না, তাহাতে সকল অঙ্গই সমভাবে বিকশিত হইয়া সমগ্রকে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যায়। আরও স্মরণে রাখিতে হইবে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় মানবাত্মার বিভিন্ন অঙ্গ নাই, উহা এক অখণ্ড বস্তু। বিশেষ ভাবে ইচ্ছার উপরই প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব নির্ভর করিতেছে সত্য, মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব বলিতে প্রধানতঃ চরিত্রের উৎকর্ষ্যই বুঝায় বটে, আর ইচ্ছা ও কার্য্যই চরিত্রের প্রাণ, মূল ভিত্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞান প্রেম ভাব প্রভৃতি তাহার বাহিরে নয়। চরিত্র বলিতে সমগ্র জীবনেরই সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থা, জ্ঞান ভাব কার্য্য সকল বিষয়েই সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা ও বিধাতার বিধি বা ইচ্ছার আনুগত্য বুঝায়। এই আনুগত্য বা ইচ্ছাধীনতা ব্যতীত চরিত্র, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, মানবাত্মার উন্নতি বা বিকাশ, ইহার সকল কথাই প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন। জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতার প্রস্রবণ জীবনদেবতা ব্যতীত মানুষের জ্ঞান প্রেম ইচ্ছার যে অপর কোনও বিষয় নাই, তাহা নহে। সে সকল বিষয়ের সঙ্গে যোগে তাহার জীবনের কোনও বিকাশ হইতে পারে না, বা হয় না, আমরা এরূপ কথা বলিতেছি না—কেহই এমন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু সে উন্নতি বা বিকাশকে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ধর্ম্ম ও নীতিই যে মানুষের বিশেষত্ব, উহাই যে তাহাকে অপর সকল জীব হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়াছে, এ বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ নাই। সুতরাং ধর্ম্মজীবন ব্যতীত প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ সম্ভবপর নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। উক্ত প্রকার জীবন যে ধর্ম্মজীবন নহে, জীবন-দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সত্য যোগ, তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত যে ধর্ম্মজীবনের অপর কোনও অর্থ নাই, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্ম্মটাকে যদি জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন বাহিরের একটা কিছু ব্যাপার মনে করা যায়, তবেই উক্ত প্রকার বলা সম্ভবপর হইতে পারে। পূর্ব্বে যে সেরূপ মনে করা না হইত, এমন নহে—বরং উক্ত প্রকারই সাধারণ ধারণা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আর কেহ সেরূপ কথা বলিতে পারে না। এখন সামান্য একটু চিন্তা ও বিচার করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, সত্য ঈশ্বরের সঙ্গে যদি সত্য যোগ হয়, তবে তাহার দ্বারা, জীবনের কোনও এক অংশমাত্র নহে, সমগ্র জীবনটাই, কিছু না কিছু উন্নত হইবে, প্রভাবান্বিত হইবে। অভিজ্ঞতাও এই সাক্ষ্যই দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহার অনন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে—আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায়ও আমরা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। জীবন-দেবতাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিলে যেমন তাঁহাকে ভাল বাসিতেই হয়, তেমনি খাঁটী প্রেম জন্মিলে তাঁহার অনুগত হইতেই হয়,—প্রিয়কার্য্য-সাধনে, পুণ্যময়ের অভিপ্রেত পবিত্র জীবনলাভে, জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যে ও কর্ত্তব্যে তাঁহার ইচ্ছাপালনে নিযুক্ত হইতেই হয়। কিছুতেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। যখন অন্যরূপ দেখা যায়, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে সত্য সাক্ষাৎকার ঘটে নাই, আপনার বিচার বুদ্ধি চিন্তার দ্বারা সৃষ্ট, ভাবের দ্বারা গঠিত, কাল্পনিক দেবতা লইয়াই আমরা তৃপ্ত আছি। এই উপায়ে যে তত্ত্ব ও ভাবাবেগে অনেক উচ্চ স্তরে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত ভক্তি ভিন্নও ভক্তির বহিলক্ষণ—অশ্রু পুলক কম্প নৃত্য প্রভৃতি—প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনবিধাতাকে ভুলিয়া, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ না করিয়া, যে চরিত্র কিছু মাত্র উন্নত করা যায় না, আমরা কখনও এরূপ কথাও বলিতেছি না। ধর্ম্মব্যতীতও উন্নত নৈতিক জীবন লাভ যে সম্ভবপর, চারিদিকে তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেখিয়া কেহই এ কথা বলিতে পারে না। শুধু বিবেকপরায়ণতা হইতে মানুষ চরিত্র হিসাবে যে উন্নত জীবন লাভ করে, তাহাকেও ধর্ম্মজীবন বলা যায় না। কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতীত চরিত্রের উন্নতি সম্ভবপর হইলেও, চরিত্রের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি ব্যতীত সত্য ধর্ম্মজীবন কোনও প্রকারেই লব্ধ হয় না। চরিত্রেই ধর্ম্মজীবনের সত্য ভিত্তি। ভিত্তিহীন অট্টালিকা যেমন আকাশ-কুসুমবৎ অলীক স্বপ্নময়, তেমনি চরিত্রে, জীবনের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যে, যে ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা একান্তই কাল্পনিক, একেবারেই অসার—তাহা হইতে মানবজীবনের প্রকৃত বিকাশ ও উন্নতি, খাঁটি মনুষ্যত্ব লাভ কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে, দেবত্বলাভ, মুক্তি, ঈশ্বরপ্রাপ্তি ত অনেক দূরের কথা। সুতরাং ইহলোককে উপেক্ষা করিয়া, ইহলোকের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যসকল অবহেলা করিয়া, পরলোকে সদ্‌গতি লাভের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যে ভিত্তিহীন উচ্চ সৌধ নির্ম্মাণপ্রয়াসের ন্যায় অবশ্যম্ভাবীরূপেই ব্যর্থ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঘোর অন্ধকার ও কার মধ্যে, নিকটস্থ পথের পরিবর্ত্তে দূরস্থিত গন্তব্য স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে গেলে, অথবা পদতলস্থ ভূমির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ না করিয়া ঊর্দ্ধদিকে আকাশপানে চাহিয়া পথ চলিতে গেলে, যেমন পথনির্ণয় করা যায় না এবং পদে পদে পদস্খলিত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত বা ভূপতিত হইতে হয়, এ ক্ষেত্রেও যে সেরূপই ঘটে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে ধ্রুবকে পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ায়, তাহার অধ্রুব ত নষ্ট হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবও যে নষ্ট হয়, তাহাতে কি কিছু সন্দেহ আছে? সুতরাং পরলোকের জন্য ইহলোককে অবহেলা করিলে, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই

যে অনিবার্য্যরূপেই বিনষ্ট হইবে, তাহাতে বিন্দুপরিমাণও সংশয় থাকিতে পারে না। অপর দিকে, মৃত্তিকার নীচ হইতে এক খানা এক খানা করিয়া ইট গাঁথিয়া সুদৃঢ় প্রশস্ত ভিত্তির উপর গৃহ-নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলে, ধীরে ধীরে এক দিন সুনিশ্চিতরূপেই যে আকাশস্পর্শী, উন্নতশীর, আনন্দে আরামে বাসের যোগ্য, সুন্দর সৌধমালা গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নিয়মিত ভাবে যথাযথ রূপে কার্য্য করিয়া গেলে, আপনা হইতেই উহা কালে সুসম্পন্ন হইবে; এ বিষয়ে আর কোন চিন্তাই করিতে হয় না,—বরং বৃথা চিন্তা ও ব্যস্ততা অনেক সময় কার্য্য পণ্ডই করে। কেন না, ব্যস্ততাবশতঃ কোনও এক খানা ইট ভাল করিয়া না গাঁথিলেই সমস্তটা যেমন সুদৃঢ় হইতে পারে না, দুর্ব্বল থাকিয়া যায়, এবং কালে উহাই তাহার পতনের কারণ হইয়া উঠিতে পারে, ঠিক সেই প্রকার ইহ সংসারের প্রতি দিনের, প্রতি মুহূর্ত্তের, কর্ত্তব্যগুলি, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা চালিত ও প্রেমভক্তিতে অনুরঞ্জিত হইয়া, নিখুঁততার সহিত পালন না করিলে, জীবন যে অপূর্ণ থাকিয়া যায়, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন বা উন্নতি ও বিকাশের পথ যে রুদ্ধ হয়; এবং অপর পক্ষে তাহা করিলে যে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের কল্যাণই সুরক্ষিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইহলোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, ধীর পাদক্ষেপে বিধাতানির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে গেলে, পরলোকে সদ্গতি লাভের জন্য কোনও চিন্তাই করিতে হইবে না, উহা আপনা হইতে স্বাভাবিক ভাবে অবশ্যম্ভাবী ফলরূপেই আসিবে। খৃষ্টধর্ম্ম পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়নের কথা বলিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা অপেক্ষাও বিস্তৃততর অর্থে ধর্ম্মকে আমাদের ইহলোকস্থিত প্রতি মুহূর্ত্তের জীবনের—অসন বসন, চাল চলন, চিন্তা ভাবনা, স্নেহ ভালবাসা, যাবতীয় ব্যাপারের—বিষয় করিয়া দিয়াছে। এই কথাটা আমাদিগকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং তদনুরূপ জীবন গঠনে, প্রকৃত ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে। বিধাতা যাহা আমাদের হাতে দিয়াছেন, তাহা ফেলিয়া যদি যাহা দেন নাই তাহার জন্য ব্যস্ত হই, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধই হয়। এই পতিত দেশের উদ্ধারের জন্য দেশবাসী সকলের নিকটও এই তত্ত্বটা উজ্জ্বল ভাবে ধরিতে হইবে। সমস্ত জগতকেই ইহা গ্রহণ ও অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা যখন ব্রহ্মকৃপায় ইহা বিশেষ ভাবে জানিয়াছি, তখন এ বিষয়ে আমাদেরই দায়িত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। আমরা যেন সকলে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হই। করুণাময় জীবনবিধাতা আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করুন। আমরা সর্ব্বাগ্রে ইহলোকের সকল বিষয়ে তাঁহার অনুগত জীবন যাপন করিয়া জীবন সার্থক করি। পরলোকের ভার তাঁহারই হস্তে অর্পিত থাকুক। তাঁহার পুণ্যময় রাজ্য সর্ব্বতোভাবে আমাদের প্রতি জীবনে সমাজে ও জগতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩১)

জগৎটা কি করিয়া হইল, অনেকের সেই ভাবনাই প্রবল! বিশেষ যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহাদেরই সেই ভাবনা বেশী। এ ভাবনা অপেক্ষা আমি কি হইয়াছি এবং আমার কি হওয়া আবশ্যক, তাহাই বেশী পরিমাণে ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত। আমি যে অক্ষম ও দুর্ব্বল হইয়া আছি! যাতে আমার অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতার হ্রাস হয়, তাহাই ত বাস্তবিক ভাবনার বিষয়। অনেকে আবার মনে করেন ব্রহ্মই এরূপ হইয়াছেন—আমি সেই ব্রহ্ম। কিন্তু তাঁহারা এটা ভাবেন না যে, তাঁহারা কত দুর্ব্বল ও অক্ষম। যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, যাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, যাহা হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা যে করিতে পারেন না, জানিতে পারেন না, হইতে পারেন না, তাঁহাদের এ চিন্তার উদয় হয় না? ব্রহ্ম কি এমন যে, যাহা করিতে চাহেন তাহা করিতে পারেন না, যাহা জানিতে চাহেন তাহা জানিতে পারেন না? তিনি ত সেরূপ নহেন। যদি তিনিও সেইরূপই হবেন, তবে আর তাঁকে ব্রহ্ম বলিবার হেতু কি আছে? এক সাধু বলিয়াছিলেন যে, "তোমরা আমাকে ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিতেছ—আমি যে গলায় ঘায়ের যন্ত্রণায় মরিতেছি তার কি? ঈশ্বরের কি এমন দশা হয়?' যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ব্রহ্মই, তাঁদের সে কথাই জানা উচিত। কত দুঃখ, অজ্ঞতা, কত দৈন্য যে তাঁহাদের আছে! এ সকল কি ব্রহ্মে সম্ভবে?

(৩২)

পরীক্ষা ত হইতেছেই। কাহার প্রতি ভালবাসা অধিক, কাহার প্রতি অনুরাগ প্রবল, সে কথা ত জানা কথা। তার জন্য আবার পরীক্ষার প্রয়োজন কি? নিদ্রাসুখকে অধিক ভালবাসি কি ঈশ্বরের নাম ও তাঁহার স্মরণ মননকে অধিক ভালবাসি, তাহার পরীক্ষা ত নিয়তই চলিতেছে। রাত্রিতে ঘটনাক্রমে নিদ্রা হইল না—অনেক চেষ্টা করা গেল, কিন্তু নিদ্রার আগমন হইল না, তখন মনে হইল এইত পরীক্ষা আসিয়াছে। নিদ্রার আগমন হইল না, জাগিয়া থাকিয়া প্রভু পরমেশ্বরের নাম করি, তাঁহার স্মরণ মননে রাত্রি যাপন করি। যদিও ভাবনা এরূপ হইল এবং চেষ্টাও একটুকু হইল, কিন্তু মন নিদ্রার জন্যই ব্যস্ত রহিল। তবেইত বুঝা গেল কার প্রতি অনুরাগ অধিক, নিদ্রাসুখ কি ঈশ্বরের নাম কোন্‌টি বাঞ্ছনীয়, কোন্‌টিতে অধিক আরাম পাই। ধিক্ আমাকে, ধিক্ আমার নিকৃষ্ট প্রকৃতিকে। কেবলই তুচ্ছ বিষয় লইয়া রইলাম! প্রভু দুর্গতিহরণ, এ দুর্গতি হরণ কর। তুমিই প্রিয় হও, তুমিই নিকট হও।

(৩৩)

মহোৎসবের পরে অনেক স্থান হইতেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, উৎসবে পাই ত অনেক, কিন্তু যাহা পাওয়া যায়

তাহা রাখিতে পারা যায় না। এরূপ যে হয় তাতে ভুল নাই। কেন এরূপ হয়? পাইয়া যদি তাহা ভোগে না আসে, যদি তাহা কাজে লাগাইবার মত না হয়, তবে সেরূপ পাওয়ায় লাভ কি? শুধু কি সাময়িক তৃপ্তিতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে? এমন ত হইবার নয়। তাতে ত দাতার দানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। রাখিতে না জানাতে, উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না জানাতে, অনেক ধনী গৃহের সন্তানও কালে দরিদ্রতার দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হয়। তার দুরবস্থা আরও বেশী হয় এ জন্য যে, সে ধনের মধ্যে, পৃথিবীর সম্পদ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, এক সময়ে বাস করিয়া আপনার চাল চলন প্রভৃতিকে ধনী লোকের মত করিয়াছিল। তাহার অভ্যাস অনুরূপ ছিল, সে দরিদ্র হইয়া তখন মহাসঙ্কটেই পড়িয়া যায়। আমাদিগকেও সেই দশায় উপস্থিত হইতে হইবে। একবার উচ্চ সম্পদের সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া তাহা রাখিতে না পারিয়া কি ক্ষোভেই আমাদিগকে কাল কাটাইতে হইবে। রাখিতে জানার সন্ধানটি জানিয়া রাখাই ত উচিত; কৃপণেরা যেমন পার্থিব সম্পত্তির রক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হইয়া থাকে, আমাদিগকেও সেইরূপই করিতে হইবে। প্রাপ্ত সম্পদকে বেশী মূল্যবান জ্ঞান হইলে, সে চেষ্টা আপনা হইতেই আসে ও আসিবে। দাতার দানকে মহামূল্য জ্ঞান করিতে পারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। দাতার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া দানের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। কোন মতেই তাঁহার বিরোধী হইলে চলিবে না। বিরুদ্ধাচার-রূপ অপরাধই গুরুতর, অবাধ্যতাতেই সব নষ্ট হইয়া যায়। যদিও রাখা সব সময় হইয়া উঠে না, তবু সে সব আমাদিগকে উপার্জ্জনের জন্য কিছু লুব্ধ করে, পাথেয় হইয়া থাকে।

পরলোকগত ভুবনমোহন সেন

জন্ম—১৮৪৮ সালের ২০শে জুলাই।
মৃত্যু—১৯২৬ সালের ৩রা অক্টোবর।

প্রায় চলিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। ফরিদপুর জিলা স্কুলে আমার সহপাঠী ও খেলার সাথীদের সহিত আমার আজীবন সৌহার্দ্দ্য। তাহাদের মধ্যে দুই জন সহরে অনেকের নিকট নিন্দনীয় হইলেও, তাহারা আমার বন্ধু। দুই জনই ব্রাহ্মণ, বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিল, পড়াশুনা করিত না। খেলার সময় বা অপর সময় জনতার মধ্যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত স্থানীয় কারাগারের প্রহরীদের (Jail Warders) বা পুলিশ পাহারা-ওয়ালাদের ছোট খাট সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই তাহারা তাহাদের শারীরিক শক্তির ও বিপদে বুদ্ধিমত্তার ও নির্ভীকতার পরিচয় দিত। ভিড়ের মধ্যে দাঙ্গাকারীর বা পুলিশের তোয়াক্কা রাখিত না বলিয়া ও নির্জন অন্ধকার পথে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিবার সময় সাপ ও ভূতের ভয় করিত না বলিয়া, আমি মনে মনে তাহা-দিগকে বেশ খাতির করিতাম। তাহারাও চিরদিন আমার প্রতি স্নেহশীল। তাহাদের মধ্যে ভাদুড়ী বাস্তবিকই নির্ভীক ও শক্তিশালী ছিল। ক্লাশে একদিন হেড্‌মাষ্টার আসিয়া তাহাকে শাসন করেন ও শাস্তির জন্য ভাদুড়ীকে দাঁড়াইতে বলেন। রাগ হইলে ভাদুড়ী কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না, নিজের পিতাকেও নয়। হেড্‌ মাষ্টার যখন তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলেন, সে আদেশ অমান্য করিবার সাহস ভাদুড়ীর হইল না। দুই হাতের আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া টেবিল ধরিয়া রাগে গস্‌ গস্‌ করিতে করিতে সে দাঁড়াইল, হেড্‌ মাষ্টার তাঁহার কাজে চলিয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল রাগে অজ্ঞান হইয়া ভাদুড়ীর ফিট হইয়াছে। ভাদুড়ী আমাকে বলিত—"পৃথিবীতে আমি দুই জনকে ভয় করি—হেড্‌ মাষ্টারকে ও আমার কাকাকে। আর কাহাকেও ভয় করিও না, করিবও না।" ভাদুড়ী কিন্তু তাহার সহপাঠীদের প্রতি দৌরাত্ম্য বড় একটা করিত না। সে প্রয়োজনানুসারে মারপিট করিত সহরের লোকের সাথে। কিন্তু আমার অপর সহপাঠী মুখুর্য্যের দৌরাত্ম্য তাহার সহপাঠীদের অনেক সময় সহ্য করিতে হইত। ভূগোলে সম্যক্‌ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই কোন মুসলমান সহপাঠীর উপর বিরক্ত হইয়া প্রহারোদ্যত মুখুর্য্যে বলিত—"বেটা মোসল্‌, পিটাইয়া তোরে মস্‌লিপট্ট-টম্‌ করবো।" অধিক বয়স্ক এক হিন্দু সহপাঠী কয়েকদিন মুখুর্য্যের দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া অবশেষে হেড্‌ মাষ্টারের নিকট নালিশ করিল যে সে হীনজাতির লোক বলিয়া, যখন তখন, অকারণ মুখুর্য্যে তাহাকে "কাছিম পিঠা কুত্তু, তোরে পিটাইয়া ঠিক করবো" ইত্যাদি সাদর সম্ভাষণ করিয়া থাকে। হেড্‌ মাষ্টার আমাদের ক্লাশে আসিয়া মুখুর্য্যেকে শাস্তি দিলেন—সাত দিন ক্লাশের প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি নিষেধ রহিল কেহ মুখুর্য্যের সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না, আর প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া মুখুর্য্যে দাঁড়াইয়া থাকিবে। মুখুর্য্যের বা সেই শ্রেণীর অপর কোনও ছাত্রের সাহস হয় নাই যে হেড্‌ মাষ্টারের সেই আদেশ অমান্য করে। বড় হইয়া মুখুর্য্যে প্রায়ই আমার সহিত দেখা করিতে কলিকাতায় আসিত। তাহার ছেলের সুশিক্ষার জন্য আমার সহিত অনেক পরামর্শ করিত—অবসর-প্রাপ্ত হেড মাষ্টার মহাশয়ের পদধূলি নিত ও আক্ষেপ করিয়া বলিত "সে স্কুলও নাই, সে মাষ্টারও নাই।"

ছেলেবেলার এই সব ও অপর অনেক কথা মনে রাখিয়া এক দিন এক কলেজের অধ্যক্ষের সহিত ছাত্র-শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। বাবা তখন ঢাকা কলিজিয়েট্‌ স্কুলের হেড মাষ্টার। আমি বলিতেছিলাম যে ছাত্রদের যেমন শাসন করিতে হইবে, তেমনই ভালবাসা দিয়া তাহাদের মন আকর্ষণ করিতে হইবে—শাস্তা ও সখা একাধারে মিলিলে তবেত প্রকৃত গুরু। অধ্যক্ষটী আমাকে বলিলেন—"ও বড়ই দুঃসাধ্য আদর্শ। আপনার পিতার নিকট আমি পড়ি নাই। কিন্তু তাঁহার বহু বন্ধু বান্ধব ও ছাত্রদের নিকট তাঁহার ছাত্রশাসন সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় আপনার পিতার সিংহ রাশিতে জন্ম। সিংহ রাশিতে জন্মিয়া ছাত্রজীবন গঠন করিতে আসে কয় জন?"

কোন্‌ রাশিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না—১৮৪৮ সালের ২০শে জুলাই ঢাকা জিলায় মহেশ্বরদি পরগণার ভাটপাড়া গ্রামে মাতামহের বাটীতে ভুবনমোহন জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রাদ্ধ-বাসরে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন কর্ত্তৃক পঠিত।

তাঁহার পিতা আমদিয়া গ্রামের গুরুদাস সেনের পূর্ব্ববাঙ্গালায় সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল। সেতারী গুরুদাস রায়ের সেতার বাজনার অশেষ সুখ্যাতি আমরাও বড় হইয়া অনেকের নিকট শুনিয়াছি। রাত্রিতে আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া লোকে তাঁহার সেতার বাজনা শুনিত। ডাঙ্গার ঘাটে নৌকায় চড়িবার জন্য যাত্রা করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া আমাদিয়া গ্রামে সন্ধ্যাবেলা সেতার বাজনা ও মালসীর গান শুনিতে বসিয়া জমিয়া গিয়াছে ও সে রাত্রিতে আর যাত্রীর নৌকায় চড়া হয় নাই, এমনও শুনিয়াছি। গুরুদাস সেন মাণিকগঞ্জ সবডিভিশন আফিসে কার্য্য করিতেন। তাঁহার বাঙ্গালা ও পারসী লেখা খুব সুন্দর ছিল ও তিনি খুব তাড়াতাড়ি লিখিতে পারিতেন। তিনি স্বভাবতঃ শান্ত ও ধীর ছিলেন। এই সব কারণে মাণিকগঞ্জে কর্ম্মস্থলে লোকে তাঁহাকে আদর ও সম্মান করিত। পরলোকগত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর যখন ২৪ পরগণায় আলিপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তাঁহার নিকট গুরুদাস সেনের সুখ্যাতি শুনিতাম।

বাল্যকালে আমদিয়া গ্রামে নিজ বাটীতে মাতা জয়মালা গুপ্তার তত্ত্বাবধানে ভুবনমোহন বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। জয়মালা গুপ্তা লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু সন্তানদিগকে শাসনে রাখিতে জানিতেন। তাঁহার মনের জোর, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রবল স্মৃতিশক্তির পরিচয় আমরাও পাইয়াছি। কোন্ প্রজা কয় বৎসর খাজানা বাকী রাখিয়াছে, তাহার হিসাব তিনি মুখে মুখে দিতেন ও হিসাবে ভুল হইত না। কাহার সহিত কিরূপ আচরণ বিহিত, কোন্ স্থলে কি সাজে, তাহা জয়মালা গুপ্তাকে বুঝাইয়া দিতে হইত না; তাঁহার নিকটই অপরে তদ্বিষয়ে পরামর্শের জন্য যাইত। পরলোকগত নবকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন দার্জ্জিলিংএ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তিনি আমাকে বলিতেন "তোর ঠাকুরমাকে সমাজে বা গ্রামে কেহ ভয় দেখাইতে বা জব্দ করিতে পারিত না। খুব Strong personality ছিলেন।"

প্রায় বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভুবনমোহন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই। গ্রামে বাড়ীতে যেরূপ শিক্ষাদান তখন ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তদ্রূপ শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। তুলট কাগজে বাঙ্গালা লিখিতেন, গ্রাম্য প্রণালীতে কড়া, পণ, নামতা ইত্যাদি শিক্ষা করিতেন। মহাভারত ও রামায়ণের মূল বৃত্তান্ত তাঁহার বিধবা পিসিমার নিকট গল্প শুনিয়া শিখিতেন। চিঠি পত্র লিখিতে ও ছাপান বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে শিখিলেন। সাত বৎসর বয়সের সময় আমদিয়া হইতে তাঁহার পিতাঠাকুরের সহিত প্রথমে মাণিকগঞ্জে যান। অল্প কয়েকমাস তথায় থাকিয়া আবার আমদিয়া গ্রামে বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। তাহার পরেও মাণিকগঞ্জে গিয়াছিলেন।

স্বীয় গ্রামে বা মাণিকগঞ্জে এইরূপ কয়েক বৎসর কাটাইয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ কি এপ্রিল মাসে ঢাকা নগরে পোগোজ স্কুলে (Pogose school) ভর্ত্তি হইয়া ভুবনমোহন উক্ত বিদ্যালয়ে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে শিক্ষালাভ আরম্ভ করেন। এই তাঁহার ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। পোগোজ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িবার সময় তাঁহার ঢাকার অভিভাবক হরিমোহন সেনের সঙ্গে এক রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনার সময় ব্রাহ্মসমাজে যান। তথায় আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পুস্তক পাঠ করা হইত ও একজন বেতনভোগী গায়ক গান করিত। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ভুবনমোহনের এই প্রথম প্রবেশ। প্রথমে এই ব্রহ্মোপাসনাই তিনি জানিতেন; ইহার পর কয়েক বৎসর তিনি ব্রাহ্মসমাজে একেবারেই যান নাই। পোগোজ স্কুলে পড়িবার সময় তাঁতীবাজারে থাকিতে নিকটে পোগোজ স্কুলের সুযোগ্য হেডমাষ্টার দীননাথ সেনের বাটীতে বঙ্গচন্দ্র রায়, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর ঘোষাল প্রভৃতির সংশ্রবে আসিয়া ভুবনমোহন ব্রাহ্মসমাজের অনেক কথা তাঁহাদের নিকট, বিশেষতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ বঙ্গচন্দ্র রায়ের নিকট, জানিতে পারেন। তখন দীননাথ সেন (পরে পূর্ব্ববাঙ্গালার স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (পরে সদ্ভাবশতক প্রণেতা কবি), গোবিন্দপ্রসাদ রায় (ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক), অভয়চন্দ্র দাস, অভয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় আসিয়া তেজস্বিনী ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও হিন্দুসমাজের নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকার ব্রাহ্মদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া যান ও সেই সূত্রে আর্ম্মাণিটোলায় ব্রজসুন্দর মিত্রের বাটীতে ব্রাহ্মদের পরিচালিত বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া অঘোর নাথ গুপ্ত পরে ঢাকায় আসেন। অঘোরনাথ গুপ্ত ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজে উপাচার্য্যের কাজও করিতেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে যান। ঢাকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে নানা প্রকার দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিজাশঙ্করের জন্য তিনি একজন অভিভাবক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে দীননাথ সেনকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে দীননাথ সেন, বঙ্গ চন্দ্র রায়কে গিরিজাশঙ্করের অভিভাবক স্থির করিয়া, তাঁতীবাজারে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া গিরিজাশঙ্করকে তথায় রাখেন। কিছুদিন পরে ভুবনমোহন ও তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী গিয়া ঐ বাটীতে বঙ্গচন্দ্র রায় ও গিরিজাশঙ্করের সঙ্গে বাস করেন। বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহিত পরিচয় হইবার পরে, তাঁহার সহযোগিতায়, অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁতীবাজারে গিরিজাশঙ্কর সেনের উক্ত বাটীতে ভুবনমোহন প্রভৃতিকে লইয়া সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। বলা বাহুল্য, এই ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বোক্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পুস্তক-পাঠ মাত্র ছিল না। অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনাতে ক্রমশঃ উপাসকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি ঢাকা ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। তিনি যে সতেজ ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা কিন্তু আর নিস্তেজ হইল না। যুবকদের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল ও কিছুদিন পরে তাঁতীবাজারের ঐ বাটীতেই তাঁহারা "সঙ্গত সভা" প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যতদিন গিরিজাশঙ্কর সেন ঢাকায় ছিলেন ততদিন ঐ বাটীতেই "সঙ্গত সভার" কার্য্য হইত। গিরিজাশঙ্কর ঢাকা পরিত্যাগ করিলে বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন ও অপর কয়েকটী যুবক ঢাকায় অন্যত্র বাস করিতে যান, তখন তথায় "সঙ্গত সভার" কাজ হইত।

সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় কলিকাতা চলিয়া যান। পুনরায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে ১৮৬৫ সালের শেষ ভাগে ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। সে বার ভালবাজারে জীবন বাবুর বাড়ীতে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কয়েকটী বক্তৃতা করেন, তাহার ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া ঢাকার ভদ্রসাধারণের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন হয়। একদিকে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বক্তৃতার ফল, অপর দিকে যুবকদের মধ্যে নূতন ধরণের ব্রহ্মোপাসনার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। আর, ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য "সঙ্গত সভার" সাপ্তাহিক অধিবেশন। এই সব ব্যাপারে ক্রমে ক্রমে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন নেতাদের ও যুবকদলের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পুরাতন নেতাগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, আচার্য্যের কাজ করিতেন, যুক্তি তর্কে ব্রাহ্ম মতের সমর্থন করিতেন। কিন্তু জীবনের প্রতি ব্যাপারে সেই মতানুযায়ী কাজ করিতে হইলে হিন্দু সমাজ ও অপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যে দারুণ সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাহা প্রাচীন নেতাগণ এড়াইয়া চলিতেন। উপাসনা ও সঙ্গতের আলোচনার ফলে যুবকদল জীবনের প্রতি ব্যাপারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা পালনে প্রাচীন নেতাগণ যুবকদের সহায়তা না করিয়া বরং বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

তাঁতীবাজারে গিরিজাশঙ্কর সেনের বাটীতে ও পরে অন্যত্র যে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা ও "সঙ্গত সভার" অধিবেশন হইত, তাহা ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। "সঙ্গত সভার" অধিবেশন শনিবার সন্ধ্যায় আরম্ভ হইত, কোনও কোনও অধিবেশন রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত চলিত। সভ্যগণ সকলেই অতি সরলভাবে উপাসনা, সঙ্গীত ও আলোচনা করিতেন। আলোচনা শুধু মত লইয়া হইত না, সভ্যদের নিজ নিজ জীবনের দোষ ত্রুটী লইয়া প্রায়ই আলোচনা হইত। আলোচনায় কোনও প্রকার কৃত্রিমতা বা কপটতা থাকিত না। কেমন করিয়া স্বীয় জীবনে ব্রাহ্মমত প্রতিপালিত হইতে পারে তাহাই ছিল সঙ্গত সভার প্রধান লক্ষ্য। আলোচনার এক একটী বিষয় জীবনে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রতিদিন সভ্যগণ চেষ্টা করিতেন ও সপ্তাহের চেষ্টায় কতদূর কৃতকার্য্য বা বিফল হইতেন তাহা প্রত্যেকে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। দৈনিক উপাসনা প্রত্যেক সভ্যের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। সপ্তাহান্তে সঙ্গতের অধিবেশনে ডায়েরী পাঠ ও নিজেদের দোষ ত্রুটীর আলোচনা হইত ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল প্রার্থনা ও সঙ্গীত। ব্রাহ্ম-জীবন গঠনের জন্য ব্যাকুল যুবকগণ সরল মনে এই ভাবে "সঙ্গত সভায়" যোগ দিতেন। "সঙ্গত সভার" সভ্য ও ভুবনমোহনের বন্ধুদের মধ্যে কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—রজনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, কালীনারায়ণ রায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বরদানাথ হালদার।

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই, পাঁচ বৎসর নয় মাস মাত্র ইংরাজী শিক্ষা করিয়া, ভুবনমোহন ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে সেই বৎসর শারদীয় পূজার ছুটীতে, আমদিয়া গ্রামে স্বীয় বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা ও সঙ্গীত করার দরুণ গুরুজনের নিকট ভুবনমোহনকে কিছুটা শাসিত হইতে হইয়াছিল। কতকটা শাসনের হাত এড়াইতে ও কিছুটা নিজ বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনা করিলে বাড়ীর লোকের উপর হিন্দু প্রতিবেশীদের সমালোচনা ও সামাজিক উৎপীড়নের সম্ভাবনা দূর করিবার ইচ্ছায়, ভুবনমোহন দুই বৎসর কাল আমদিয়া গ্রামে যান নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পর ও এফ্, এ, (First examination in Arts) পরীক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি বাড়ী যান নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়াতে ঢাকায় পড়িবার ও থাকিবার খরচের জন্য ভাবনা রহিল না। সে সময় ঢাকার ছাত্রগণ অতি অল্প খরচে চালাইত। ভৃত্যের সহিত বন্দোবস্ত থাকিত, দিনে রাত্রিতে দুইবেলা আহারের জন্য ভৃত্যকে প্রতিদিন ৴৫ পয়সা হারে মাসে ২।৴১০ দুই টাকা সাড়ে পাঁচ আনা দিলেই ভৃত্য প্রতিদিন দুই বেলা খাইতে দিত। পরে খরচের হার একটু বাড়িয়াছিল, তখন ৴১০ পয়সা হারে মাসে ২৸৴০ দুই টাকা তের আনা দিতে হইত। দুই বেলার ভোজন ছাড়া জল খাবার প্রভৃতির স্বতন্ত্র খরচ ছিল। ইহা ছাড়া বাড়ী ভাড়া লাগিত। মোট ৬৲ কি ৭৲ টাকা মাসিক ব্যয়ে একজন ছাত্র স্কুলে পড়িতে পারিত। ধর্ম্মমতে ও ধর্ম্মজীবনে পিতার কথা অমান্য করাতে, পিতা গুরুদাস সেন ভুবনমোহনকে কিয়ৎ কাল খরচ দিতেন না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবার পরে খরচের জন্য পিতার নিকট ভুবনমোহনের টাকা চাহিবার প্রয়োজনও ছিল না। বৃত্তির টাকায় ঢাকা সহরে নিজের ও অনুজ কালীমোহন সেনের খরচ চলিয়া যাইত।

এ দিকে মহেশ্বরদিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। আমদিয়া গ্রামে শরৎচন্দ্র সেন, বঙ্গচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেন; পাঁচদোনায় গিরীশচন্দ্র সেন, প্রসন্নচন্দ্র সেন; ভাটপাড়ায় কালীনারায়ণ গুপ্ত ও তাঁহার পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মমত গ্রহণ করাতে দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই সময় একটী ঘটনাতে ভুবনমোহনকে হিন্দু সমাজ হইতে তাড়িত হইতে হইল। সেই ঘটনাটী ভুবনমোহনের নিজের কথায় বিবৃত করিতেছি। "জালাল উদ্দিন নামক একটী দরিদ্র মুসলমান ছাত্র আরমাণিটোলাস্থিত (ব্রজসুন্দর বাবুর বাড়ীতে যে মধ্য বাঙ্গালা স্কুল ছিল) ব্রাহ্মস্কুলে পড়িত। নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া সে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাহায্য পাইত। সে বালক এক মুসলমান বাড়ীতে খাইত ও ব্রজসুন্দর বাবুর ঐ বাড়ীতে থাকিত। সেই বাড়ীতে যে দুইটী মেস্ ছিল তাহার বাসিন্দাদের সহিত জালালের ক্রমে আলাপ পরিচয় হইল। সে অনেক সময় আমাদের সহিত জলযোগও করিত। জাতিভেদের বন্ধন ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল। কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তদের ভৃত্য মদনের সহিত জালালের আত্মীয়তা হয়। সেই মেসের এক জন যুবক বিবাহ করিয়া আসিয়া একটী ভোজ দেয়; সেই ভোজে আমাদের দেশীয় কোন কোন লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

জালাল সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে মিশামিশি করে, তাহাকেও খাইতে বলা হইয়াছিল। শুনিতে পাইলাম যে জালালকে ভিন্ন ঘরে বসাইয়া খাওয়ান হইবে। এই কথা শুনিয়া আমার ভাল লাগিল না। আমি বঙ্গ বাবুকে বলিলাম যে 'জালালের সঙ্গে আমরা আহারাদি করিয়া থাকি, আজ তাহাকে ভিন্ন ঘরে খাইতে দেওয়া কি উচিত?' বঙ্গ বাবু আমার কথায় সায় দিলেন। আমরা কয়েক জন স্থির করিলাম যে অন্ততঃ আমরা কয়েকজন জালালকে নিয়া খাইব, যাহাদের ইচ্ছা না হয়, না খাইবে। বঙ্গ বাবু, আমি, আরও ৪।৫ জন জালালকে নিয়া খাইলাম। আমাদের বাড়ীতে এই কার্য্য হইল, বিশেষ কেহ জানিতও না। কিন্তু ভগবান আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন এই কথা স্পষ্ট করিয়া দিলেন। একজন উগ্র প্রকৃতির যুবক আমাদের দেশীয় এক বাসায় গেলে পর, তাহার গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ তাহাকে উপহাস পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—'তোরা না নাকি মুসলমানের সঙ্গে খাস্?' সেই যুবক উত্তেজিত হইয়া বলিল—'খাই তো। বামন কি করিবে?' এই কথা নিয়া মহেশ্বরদি সমাজে খুব আন্দোলন হইল। আমাদের যুবক বন্ধুদিগের অনেককে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে হইল।" বলা নিষ্প্রয়োজন যে ভুবনমোহন ও বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় তাহাতে রাজি হন নাই। তাঁহারা সমাজচ্যুত হইলেন।

তখন (Brennand) ব্রেন্যাণ্ড্ সাহেব ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভুবনমোহন বলিতেন যে কলেজের অধ্যক্ষের চরিত্রবল, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শ্রমশীলতা ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। অধ্যক্ষের চরিত্র পবিত্র ছিল, ছাত্রদিগের চরিত্র যাহাতে পবিত্র হয় তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। তাঁহার একদল ছাত্র যে ধর্ম্মসাধনের জন্য ও চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছিল ও পুরাতন সমাজের হস্তে তজ্জন্য নির্য্যাতন ভোগ করিত, তাহা তিনি জানিতেন। আর একজন ছাত্র ঐ ছাত্রদের দলে মিশিয়া নূতন মতাবলম্বী হইতেছে জানিতে পারিয়া তাহার পিতা অধ্যক্ষ ব্রেন্যাণ্ড্ সাহেবকে তাঁহার অভিযোগ জানান। ভুবনমোহন প্রভৃতি তাঁহার পুত্রকে অবাধ্যতা শিখাইতেছে ইত্যাদি অভিযোগ অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে, অধ্যক্ষ অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন—তাঁহার নিজের পুত্রগণ যদি এদেশে থাকিত ও এ দেশীয় যুবকদের সহিত যদি তাহাদের মেশা প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে ঐ অভিযুক্ত যুবকদের সংসর্গেই তিনি নিজের পুত্রদিগকে রাখিতেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ইংরাজি শিখিয়া বিধর্ম্মী হইতে চলিল দেখিয়া, গুরুদাস সেন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কালীমোহনকে আর ইংরাজী পড়াইবেন না স্থির করিয়া তাঁহাকে ঢাকা হইতে আমদিয়া গ্রামে লইয়া গেলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর এফ্ এ পরীক্ষায়ও ভুবনমোহন বৃত্তি পাইলেন। অনুজ কালীমোহনের লেখা পড়া বন্ধ হইয়া গেল, ইহাতে ভুবনমোহন বড় ব্যথিত হইলেন। তাহাকে বাড়ী হইতে ঢাকায় ফিরাইয়া আনিতে ভুবনমোহনকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বাড়ী যাইয়া তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীকে নানা রকম বুঝাইয়াও পিতা মাতার মত করাইতে পারেন নাই। অনুজ কালীমোহন ও কনিষ্ঠ রাজমোহন উভয়েই দাদার সঙ্গে ঢাকায় আসিয়া ইংরাজী পড়িতে ইচ্ছুক, কিন্তু পিতামাতার অমতে তাহা সম্ভব হইতেছিল না। ভুবনমোহন বলেন—"এক মাস বাড়ী থাকিয়া অনেক বুঝাইবার পর মা কালীমোহনকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃতা হইলেন। খরচ পত্রের কথা আমি তাঁহাদিগকে কিছু বলি নাই। বৃত্তির টাকা হইতে আমার ও আমার ভাই কালীমোহনের খরচ এক প্রকার চলিয়া যাইত। কখনও কখনও গৃহশিক্ষকতাও আমাকে করিতে হইত। [মাকে রাজী করাইবার জন্য] আমি মাকে বলিয়াছিলাম যে, কালীমোহনকে জোর করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতে বলিব না। ঢাকায় আসিয়া কালীমোহন আমাদের দেশীয় একজনের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল।" ব্রাহ্মযুবকদের মেসে তাঁহাকে রাখা হইত না। ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্যামাচরণ রায় মহাশয় ভুবনমোহনের পরলোকগমন সংবাদে শোক প্রকাশ করিয়া আমাকে লেখেন—তোমার পিতার ধর্ম্মজীবন ও পবিত্র মনের সংস্পর্শে যে কেহ আসিত, সেই তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিত। আমার সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা একটী ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবে। পাছে তাঁহার পিতার ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগে সে কারণ ভুবনমোহন তাঁহার অনুজ কালীমোহনকে নিজের তত্ত্বাবধানে না রাখিয়া আমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১৮৬৮।১৮৬৯ সালে কিছুকাল ঢাকায় অবস্থিতি করেন। তখন ভুবনমোহন তাঁহার সহিত এক বাড়ীতে থাকিতেন। ভুবনমোহন বলেন "তাঁহার সজীব ধর্ম্মভাব ও জাগ্রত বিবেকের সংস্পর্শে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল।" পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির দীননাথ সেনের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত হইল। দীননাথ সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয়চন্দ্র দাস, কৈলাসচন্দ্র দাস প্রভৃতির হস্তে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃত্ব ছিল।" সঙ্গত সভার যুবকদল পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হইল। পাটুয়াটুলিতে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া সেই গৃহে কিছুদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কর্তৃত্বে সঙ্গতের যুবকদল উপাসনা করিত।

১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাসে বি এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবার পর জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইবার সময় আসিল। এ বিষয়ে ভুবনমোহন বলেন—"আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত অবস্থাপন্ন একজন আমার বন্ধু বঙ্গবাবুকে লিখিলেন, ভুবন যেন আইন ব্যবসায় অবলম্বন করে। বঙ্গবাবু সেই পত্র আমাকে পড়াইয়া শুনাইলেন। আমার যুবক বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও ইঙ্গিত করিতেন যে, আমার পক্ষে প্রচারক হইলে ভাল হইতে পারে। আমি আমার নিজের জীবনের বিষয় চিন্তা করিয়া এবং নিজের শক্তি সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া আমার দ্বারা ভগবান্ কি কাজ করাইতে ইচ্ছা করেন ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে প্রাণে প্রকাশ হইতে লাগিল যে শিক্ষকতা কার্য্যেই আমার জীবনের মঙ্গল হইতে পারে। প্রথম জীবন সুশিক্ষা ও সৎদৃষ্টান্তের অভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। জীবনের কৃপায়

যে সৎসঙ্গ ও শিক্ষা মিলিল তাহা শিরোধার্য্য করিয়া, দেশের অন্ততঃ অল্পসংখ্যক যুবকের জীবনে যদি শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের সাহায্য করিতে পারি, আমার জীবন সার্থক হইবে। এই অনুপ্রাণনা হৃদয়ে নিয়া জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। ভগবানের আশীর্ব্বাদ আমার মস্তকে বর্ষিত হইল। আমি ধনী হইলাম না বটে, কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। অধিক অর্থ উপার্জ্জন করি নাই বলিয়া একদিনের জন্যও দুঃখ করি নাই।"

বি এ উপাধি লাভ করিয়া কয়েক মাস ঢাকায় কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভুবনমোহন কাজ করেন। দুই ভাইয়ের ও নিজের ব্যয় সঙ্কুলন করিতে কিছু কষ্টও হইয়াছিল। অর্থাভাবে মনকে খাটো না করিয়া সমাজসংস্কার ও জনহিতকর কার্য্যে ভুবনমোহন নিজেকে নিযুক্ত করিলেন! ঢাকায় পাড়ায় পাড়ায় উপাসনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন কোন সময়ে বঙ্গচন্দ্র রায় ও কোন কোন সময়ে ভুবনমোহন আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। কিছুদিন ভুবনমোহনকে "শুভসাধিনীর" সম্পাদকতাও করিতে হইয়াছিল। বঙ্গচন্দ্র রায়, রজনীকান্ত ঘোষ, বাঙ্গালা বাজারের গোবিন্দচন্দ্র দাস, ভুবনমোহন ও অপর কয়েকজন মিলিয়া একটা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় (Boys' Academy) স্থাপন করেন। কিছুদিন চলিয়া বিদ্যালয়টী উঠিয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্র দাস, ভুবনমোহন ও রামচন্দ্র সেন তাহার দরুণ ২৫০৲ কি ৩০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ করেন। ১৮৭১ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ব্রেণাণ্ড (Brennand) সাহেব ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলের এক নিম্ন শিক্ষকের পদে ৪০ টাকা বেতনে ভুবনমোহনকে নিযুক্ত করেন। শরীর পুনরায় অসুস্থ হওয়াতে ঢাকা ছাড়িতে ইচ্ছুক হইয়া, ভুবনমোহন ময়মনসিংহ সরকারী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদপ্রার্থী হন। ভুবনমোহনের কলেজের পড়াশুনা শেষ হইতে না হইতেই অবস্থাপন্ন ব্রাহ্ম অভিভাবকের নিকট হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে। সে প্রস্তাবে সম্মত হইলে বিবাহ করিয়া অর্থাভাবের দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ ছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন সে প্রস্তাব মুহূর্ত্ত কালও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ১৮৭১ সালে ২৪শে আগষ্ট ময়মনসিংহে ৭০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য আরম্ভ করিয়া তথায় ব্রাহ্মসমাজের কাজে লাগিলেন। তখন গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ময়মনসিংহ সরকারী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন ও ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কাজ করিতেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, অমরচন্দ্র দত্ত, কালীশঙ্কর সুকুল ও সারদারঞ্জন রায় তখনও ছাত্র ছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেন কিছুদিন পরে চাকুরী ছাড়িয়া প্রচারক হইলেন। ভুবনমোহন, মধুসূদন সেন ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মিলিয়া ময়মনসিংহে এক নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, দোকানদার প্রভৃতি যাহারা দিনের বেলা জীবিকা উপার্জ্জন করিত, তাহাদিগকে রাত্রিতে শিক্ষা দিতেন। ভুবনমোহনের সামান্য বেতন হইতে প্রতি মাসে পিতামাতাকে ও দুই ভাইয়ের শিক্ষার খরচ বাবদ টাকা পাঠাইয়া যাহা বাঁচিত, তাহাদ্বারা নিজের খরচ চালাইয়া আর কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত না। বিবাহ স্থির হইবার পর আন্দাজ প্রায় দুই বৎসর কাল অর্থাভাবে তাঁহার বিবাহ স্থগিত ছিল। ১৮৭২ সালের তিন আইন পাশ হইবার পরে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুরোধে, উক্ত আইনানুযায়ী বিবাহ রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য ব্রাহ্ম রেজেষ্ট্রার নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া, ১৮৭২ সালের ২১শে জুন যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একমাত্র ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবীর সহিত ভুবনমোহনের বিবাহ হয়। উক্ত আইনানুযায়ী ঐ প্রথম বিবাহ। বিবাহে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপাসনা করেন ও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় উপদেশ দেন। ভুবনমোহন বলেন—"বিবাহপ্রতিজ্ঞা পালন করা সহজ নহে। এই প্রতিজ্ঞা আমি অনেক সময় নূতন করিয়া মনে করিয়াছি এবং প্রতিপালন করিতে প্রার্থনা করিয়াছি।" মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—"সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, ধর্ম্মে অর্থে ও ভোগে আমি তোমাকে অতিক্রম করিব না, তোমার মার কাছে এই প্রতিশ্রুতি রাখিবার জন্য আমি সারাজীবন চেষ্টা করিয়াছি।"

দুই বৎসরের অধিককাল ময়মনসিংহে থাকিয়া ১৮৭৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী একশত টাকা বেতনে নোয়াখালী সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ময়মনসিংহে কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু ছিলেন; তাঁহাদের কয়েকটীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আরও কয়েকজনের নাম করা উচিত—গোপীকৃষ্ণ সেন, শরচ্চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দুর্গা নাথ রায়। তখন কলিকাতার বাহিরে জাতিচ্যুত ব্রাহ্মদিগের পক্ষে বাঙ্গালি হিন্দু ভৃত্য পাওয়া অতি দুরূহ ছিল। ভুবনমোহন তাঁহার এক বেহারী ভৃত্য ভোলারামের কথা অনেক সময় বলিতেন। তখন কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেলে আসিতে হইত। তথা হইতে সপ্তাহে একদিন জাহাজ ঢাকায় যাইত। ঢাকা হইতে নৌকাযোগে ময়মনসিংহ যাইতে হইত। ময়মনসিংহ হইতে নৌকায় চাঁদপুর ও রায়পুরা হইয়া ভবানীগঞ্জ যাইয়া, তথা হইতে গরুর গাড়ীতে নোয়াখালীতে যাইতে হইত। ভোলারাম কিছুতেই নোয়াখালী যাইতে স্বীকৃত হইল না। কিন্তু গোপনে আমগাছের তলায় বসিয়া "রামজী হো! বাবুকা বদলিটী ফিরাও হো" বলিয়া প্রায়ই কাঁদিত। চারি বৎসরের অধিক কাল নোয়াখালীতে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়া ১৮৭৮ সালের ৮ই জুন নোয়াখালী হইতে ফরিদপুর রওনা হন ও দেড়শত টাকা বেতনে ফরিদপুরের প্রধান শিক্ষকের কাজ উক্ত সনের ২২শে জুন তারিখ আরম্ভ করেন। ফরিদপুরে প্রায় সাড়ে আঠার বৎসর প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়া ১৮৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকায় গিয়া তথায় কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই তিনি শিক্ষকের কার্য্য হইতে অবসর নেন। আমার মাতাঠাকুরাণীর স্বাস্থ্যের জন্য ১৯০৬ সালের শারদীয় পূজার ছুটীর সময় ঢাকা ছাড়িয়া সকলে দেওঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জীবনের শেষভাগে ভুবনমোহন দেওঘরে বিশ বৎসর বাস করেন।

তিন শত টাকার অধিক বেতন কোনও মাসে পান নাই।

অথচ সারাজীবন পিতা মাতা, ভাই বোন, পুত্র কন্যা, ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদিগের প্রতি যখন যাহা কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা করিতে ভুবনমোহন কখনও দ্বিধা বোধ করেন নাই। আমার পিতা ঠাকুর ও পিতৃব্যের কথা নিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের কোন ধনী মহিলা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—'এত অল্প আয়ে ইঁহারা কি করিয়া সন্তানদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়া ও সামাজিক অপর কর্ত্তব্য পালন করিয়া, প্রয়োজন হইলে পরের সেবার জন্য অর্থব্যয় করিতেন তাহা ভাবিয়া অবাক্ হই।' আমরা কিন্তু ইঁহাদের জীবনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাতে বিস্ময়ের কিছু পাই নাই; শুধু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, আজ কাল সে আদর্শের অনাদর হওয়াতে তদনুযায়ী জীবনযাপনের চেষ্টা আমাদের যুবকদের মধ্যে কমই দেখিতে পাই। পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা ইঁহাদের আদর্শের যেমন একাংশ ছিল, স্বীয় পরিবারের বাহিরে অপরের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন করিবার জন্য নিজের সুখভোগস্পৃহা খর্ব্ব করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও সেই আদর্শের আর এক অংশ ছিল। নিজের উপর যত কম খরচ করা হইবে, পরের জন্য ঠিক ততটা বেশী খরচ করা যাইতে পারিবে—এই সত্যটী মনে রাখিয়া ইঁহারা নিজেদের জীবনকে নিয়মিত করিতেন।

আমরা একটু বড় হইয়া কলেজে পড়িতে যাইবার পরই টের পাইলাম যে আমাদের পরিবারের কর্ত্তা ভুবনমোহন আদেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাহা পরিবারের সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে, এ নিয়ম তিনি আমাদের জন্য করেন নাই। তাঁহার অভিপ্রেত যাহা তাহা তিনি বলিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়াই আমাদিগকে তাহা শিরোধার্য্য করিতে হইবে, তিনি কখনও এরূপ মনে করিতেন না। যুক্তি ও বিচারে তাহাই যে প্রকৃষ্ট তাহা আমাদের সহিত আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিতেন। পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যাপার লইয়া পিতার সহিত মন খুলিয়া বিচার ও আলোচনা করিবার সৌভাগ্য আমাদের প্রায়ই হইত। তাঁহার সহিত মতের অনৈক্য হইলেও তিনি মনক্ষুণ্ণ হইতেন না। আমাদের সুবিচারিত মতের প্রতি তিনি কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না। আর সেই জন্যই তাঁহার সহিত মত সব সময়ে ঠিক না মিলিলেও তাঁহার অভিপ্রেত নির্দ্ধারণ আমরাও উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। আলোচনা ও বিচারের পর মনান্তর কখনই হইত না, মতান্তরও প্রায়ই হইত না।

বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সময় জাতিভেদের লেশমাত্রও তথায় স্থান পাইবে না, এই যে প্রতিজ্ঞা ভুবনমোহন যৌবনকালে করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার পরিবারে সেই নিয়মই যাহাতে অটুট থাকে তাহার জন্য তিনি আমাদের সহিত আলোচন করিতেন। তিনি নিজে যেমন অর্থলাভের ইচ্ছাকে স্ত্রীর অপমানজনক বলিয়া ঘৃণা করিতেন, আমাদের সহিত সময়ে সময়ে আলোচনা করিয়া তাঁহার সেই মত যে প্রকৃষ্ট ও ন্যায়ানুমোদিত তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এক পুত্রের যখন সংসারের সংগ্রামে প্রায় হার মানিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাকে বিবাহ দিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্বশুরের খরচে বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাব পিতা পুত্র উভয়ের নিকটই উপস্থিত হয়। পিতা তখন পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাবার সঙ্গতি তাঁহার নিজের নাই; তাহা জানিয়া পুত্র যেন স্থির বুদ্ধিতে নিজ কর্ত্তব্য স্থির করে। তৎসম্পর্কে ইহাও লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমার আদর্শ কি তাহা তুমি জান। বিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ তোমাকেই করিতে হইবে। এ দায়িত্ব তোমারই। কিন্তু দেখিও আমাকে যেন মাথা হেঁট করিতে না হয়।"

ফরিদপুরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম সকল ধর্ম্মের লোকের সহিত মিশিয়া তিনি কাজ করিতেন। বিদ্যালয়ের ও ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ ছাড়া মিউনিসিপাল কমিশনার ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভ্য হইয়া কাজ করিতে হইত। তদুপলক্ষে সহরের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি মিশিতেন। ১৮৯১ সালের নির্ব্বাচনে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ অম্বিকাচরণ মজুমদার চেয়ারম্যান্ হইতে অস্বীকৃত হওয়াতে ভুবনমোহনকে ফরিদপুরের মিউনিসিপাল কমিশনারগণ চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। সেই নির্ব্বাচনে জেলার কালেক্টারের নামও চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে কমিশনারগণ ভুবনমোহনক নির্ব্বাচিত করাতে কালেক্টার সাহেব মনোক্ষুণ্ণ হন। নূতন নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান্‌কে কালেক্টার এক অনুরোধ করেন। তাহা রক্ষা করিলে মিউনিসিপালিটির অর্থ অযথা ও আইনবিগর্হিত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইত। ভুবনমোহন সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া কালেক্টারকে জানান। কালেক্টারের সহিত প্রধান শিক্ষকেরও কিছুটা সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের ভরসা করিয়া কালেক্টার চেয়ারম্যান্‌কে এক দিন বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন ও বলিলেন যে নূতন চেয়ারম্যানের উপর সাধারণের যে প্রভূত আস্থা, তাহাতে কালেক্টারের কথা রাখিতে চেয়ারম্যান্ ঐ সামান্য অর্থব্যয় করিলে সাধারণ তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করিবে না। চেয়ারম্যান্ উত্তরে বলিলেন—"সাধারণের যে আমার প্রতি আস্থা আছে তাহা আমি জানি। কেন, তাহাও জানি; সেই জন্যই আমি নিজের নিকট খাঁটি থাকিতে চাই; আর সাধারণের সেই প্রগাঢ় আস্থা হারাইবার মত কাজ করিবার দুঃসাহস আমি রাখি না। আমাকে ঐরূপ অনুরোধ করা বৃথা।" কালেক্টার অপরের নিকট বলিয়াছিল—নূতন চেয়ারম্যান সরকারী কাজ করে। সে কি করিয়া নিজেকে এমন স্বাধীন মনে করে? ১৮৯৬ সালে ভুবনমোহন যখন ফরিদপুর ছাড়িয়া যান তখন প্রকাশ্য বিদায়সভায় অম্বিকাচরণ মজুমদার উপরোক্ত ঘটনা ও অপর ঘটনা স্মরণ করিয়া ভুবনমোহনের শিক্ষকতার অশেষ প্রশংসা করিয়া, পরে বলেন যে সর্ব্বসাধারণের কাজের কর্ণধার হইয়া ভুবনমোহন যে কর্ম্মকুশলতা, স্বাধীন চিত্ত, চরিত্র-বল ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাহিরের লোকে জানিত না বটে, কিন্তু তিনি সেজন্য তাঁহার প্রিয় সুহৃদকে কতই না সম্মান করিতেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে আমি যখন রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কিছু কাজ করিয়াছিলাম, অম্বিকাচরণ তখন অনেকের সম্মুখে একদিন বলিয়াছিলেন—"ভুবনের ছেলে দেশের জন্য খাটিবে না? ওর বাপ কি দরের লোক ও দেশের জন্য কত খাটিত তাহা কি আমি জানি না?"

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ভুবনমোহন স্বীয় মত ও বিশ্বাস জীবনের প্রতি কার্য্যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে নিয়ত যত্নবান্ হইলেও, সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতেন। ধর্ম্মবিশ্বাসে ও সামাজিক ব্যাপারে প্রথমে পিতা-মাতার মনস্তুষ্টি করিতে না পারিলেও, তিনি সমাজচ্যুত হইবার পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমনই অতি অল্পকালের মধ্যেই পিতা-মাতার ও হিন্দুসমাজস্থিত অপর আত্মীয়গণের প্রিয়ভাজন হইলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত ও আপন বলিয়া মনে করিত। ফরিদপুরে হিন্দু ভৃত্য না পাইয়া বহুবৎসর মুসলমান ভৃত্য রাখিয়াছিলেন। ছোট সহরে হিন্দু সমাজের ভয়ে সেখানে কোন হিন্দু তাঁহার বাড়ীতে প্রকাশ্যে জল গ্রহণ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু তাঁহাকে আপন বলিয়া মনে করিত না এমন হিন্দুভদ্রলোক ফরিদপুর জেলায় কেহ ছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। দোল দুর্গোৎসবে যখন সহরের গণ্য মান্য ভদ্রলোকদিগের নিমন্ত্রণ হইত, প্রতি বৎসর তাঁহারও নিমন্ত্রণ হইত। কোনও নিমন্ত্রণে তিনি উপস্থিত হইতেন না, তবুও প্রতি বৎসর তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি যখন "বঙ্গবাসী" পত্রিকার

সাহায্যে হিন্দুসমাজের পুনরুত্থানের জন্ম দেশব্যাপী আন্দোলন করেন, তখন সমাজচ্যুত হেডমাষ্টারের প্রতি ফরিদপুরের লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধা হ্রাস পায় নাই। অথচ ফরিদপুর ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দিরনির্ম্মাণ ব্যাপার হইতে সুরু করিয়া তথায় ও ঢাকায় আচার্য্যের কাজ, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর সভাপতির কাজ, ব্রাহ্মবিবাহ রেজিষ্ট্রারের কাজ, ট্রাষ্টীর কাজ, ও ব্রাহ্ম-সমাজের অপর ছোট বড় কাজই তিনি উৎসাহের সহিত করিয়া যাইতেন। তবুও হিন্দুসমাজে এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা বাড়িত বই কমিত না।

তিনি বলিতেন যে তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা ফরিদপুরের জনসাধারণ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পাইয়াছে। বিদ্যালয়ের এমন একজন ছাত্র ছিল না যাহার নাম, নিবাস, অভিভাবকের নাম ও পরিচয় ও অপরাপর তথ্য তাঁহার সুবিদিত ছিল না। তিনি চিনিতেন না এমন ছাত্র তাঁহার বিদ্যালয়ে কেহ পড়ে নাই। যাহারা নিম্নশ্রেণীতে তাঁহাকে ভয় করিত, তাহারাই উচ্চ-শ্রেণীতে আসিয়া তাঁহার বন্ধু হইত। সহরে আগুন লাগিলেও আগুন নিবাইতে তাঁহার ছাত্রগণ তথায় উপস্থিত। ব্যাধির প্রাদুর্ভাবেও রোগীর সেবা তাঁহারই উৎসাহে ছাত্রগণ করিত। শরীর খাটাইয়া কোন সৎকাজ করিতে ছাত্রদের লজ্জা হইবে না, ইহা শিখাইবার পরেও যদি দেখিতেন কোনও ছাত্র শরীর খাটাইতে দ্বিধা করিতেছে, তখনই নিজে সে কাজে হাত দিতেন ও ছাত্রেরা তাহাতে লাগিয়া যাইত। তাঁহার ছাত্রদের ও অধীনস্থ শিক্ষকদের কাহারও গুরুতর পীড়া হইলে তাহাদের রোগশয্যার পার্শ্বে তাহাদের হেডমাষ্টারকে দেখিতে পাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্রদের কৃতিত্ব ও বিদ্যালয়ে শাসন-ব্যবস্থা এই দুইটী ব্যাপারে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ আর বেশী কিছু চাহেন না। এই দুই ব্যাপারেই তাঁহার উপরিস্থিত ইন্সপেক্টার, প্রিন্সিপ্যাল, ও ডিরেক্টার সর্ব্বদাই তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কোনও বৎসরে বা সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশজনের মধ্যে তিন জন তাঁহারই বিদ্যালয়ের ছাত্র, আবার কোনও বৎসর বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান তাঁহারই ছাত্র। আর প্রতিবৎসরই তাঁহার বিদ্যালয়ে অনুত্তীর্ণ ছাত্রের তুলনায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা খুবই সন্তোষজনক হইত। ইহাতে তাঁহার বিদ্যালয়ের পরিদর্শকগণ তাঁর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। তিনি কিন্তু উহাতে তুষ্ট হইতেন না। ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সাধন করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া দিতে না পারিলে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন না। মৃত্যুশয্যায় একদিন আমাকে বলিলেন "আমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা জীবনে পালন করিতে চিরদিন যত্ন করিয়াছি। ইহাই আমার জীবনের মূলকথা।" ফরিদপুর সম্বন্ধে তিনি বলেন—"ফরিদপুরের যুবকদিগের সর্ব্বাঙ্গীন সেবা করা আমার পক্ষে কতদূর সম্ভব হইয়াছিল তাহা তাঁহারাই জানেন—সে সম্বন্ধে বলিবার আমার অধিকার নাই।"

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য কেহ কেহ ডিব্রুগড় হইতে ১৩ই অক্টোবর গৌহাটি পৌছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইতিপূর্ব্বেই সেখানে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস সে সময় সহরে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরম আদরের সহিত তাঁহাদের বাসের ও আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বৃদ্ধা মাতা তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান। শ্রীযুক্ত জে, বড়ুয়ার গৃহে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীযুক্তা কণিকা দেবী সঙ্গীত ও শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। ১৪ই অক্টোবর প্রাতে ইঁহারা শিলং রওনা হন। শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত বাহাদুর ইঁহাদিগকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার কন্যা কুমারী মাধুরী গুপ্ত সঙ্গীত ও শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। ১৫ই অক্টোবর প্রাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন ও মহেন্দ্র বাবুর কন্যা গান করেন। রাত্রিতে শিলং ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "এক শতাব্দীর তপস্যা" বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন। অনেক গণ্যমান্য লোকে মন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। ১৬ই অক্টোবর রবিবার প্রাতে লাবান ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন ও শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার দত্ত সঙ্গীত করেন। উপাসনার পর অনেক পুরুষ ও মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে রোগশয্যাশায়ী শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সেনের বাটীতে যাইয়া দেখা সাক্ষাৎ করেন। রাত্রিতে শিলং ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন ও শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন উপাধ্যায় সঙ্গীত করেন। উপাসনান্তে অনেক পুরুষ ও মহিলার সহিত আলাপ পরিচয় হয়। ১৭ই অক্টোবর প্রাতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার গুপ্তের বাড়ীতে উপাসনা হয়। পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী চেরাপুঞ্জি গমন করেন। চেরাপুঞ্জিতে শ্রীযুক্ত রোহিণী রায়ের স্ত্রী পুত্র কন্যাগণকে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র কিছু উপদেশ প্রদান করেন। ১৮ই অক্টোবর ইঁহাদিগকে লইয়া উপাসনা করেন। ১৯শে অক্টোবর প্রাতেও ইঁহাদিগকে লইয়া উপাসনা করেন। বেলা ১২ টার পর ৯।১০ খানি গ্রাম হইতে প্রায় ৬০।৬৫ জন নরনারী আসিয়া সমবেত হন। তাঁহারা যখন সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে খাসিয়া ভাষায় গান করিতে লাগিলেন, তখন এক অপূর্ব্ব ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া ভাষায় উপাসনা করেন। পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার প্রাণের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিতে থাকিলে, শ্রীযুক্ত রোহিণী রায় তাহা খাসিয়া ভাষায় বুঝাইয়া দেন। পরে মন্তের শ্রীযুক্ত মথু রায় এক অভিনন্দন পাঠ করেন; তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র যাহা বলেন তাহা শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া ভাষায় বুঝাইয়া দেন। আজ ইঁহাকে তাহাদের মধ্যে পাইয়া সেলা ও মন্তের শ্রীযুক্ত যোগীধন রায় ও শ্রীযুক্ত মথু রায় তাঁহাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনেকে নিজ নিজ স্থানের সমাজ ও প্রচারকের অভাবের কথা জানাইলে পর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সকলকে সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ও সেবা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অদ্য প্রাতে আশ্রমের নিকটে একটী লোকের কলেরা রোগে মৃত্যু হওয়ায়, সকলকে বাধ্য হইয়া চলিয়া যাইতে হয়। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে প্রীতিভোজনযোগ হয়। ১২।১৪ মাইল দূর হইতে আসিয়া সেই দিনই চলিয়া যাওয়ায় এই সমস্ত বৃদ্ধ নর নারী ও বালকগণকে কত কষ্টই না পাইতে হইয়াছে! ২০শে অক্টোবর প্রাতে উপাসনা হয়। এই দিন রাত্রিতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র শিলং প্রত্যাবৃত্ত হন। এই কয়দিন শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত রায়ের স্ত্রী ও কন্যাগণ নানা উপচারে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও বহু যত্ন লইয়াছিলেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৮ই নবেম্বর শান্তিপুর নগরীতে বাবু মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচী পাঁচটী শিশুসন্তান রাখিয়া টাইফয়েড রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি তথায় সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বিগত ১৯শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্তের দেড় বৎসর বয়সের কন্যাটিও নিমোনিয়া রোগে

পরলোক গমন করিয়াছে। সান্ত্বনা দিবার জন্য একটি সন্তানও রহিল না!

বিগত ২০শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা সরলা দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং দেবরকন্যা শ্রীমতী গিরিবালা সেন জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পুত্র কন্যাগণ ঢাকা অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডারে ৫০৲ ঐ অনাথাশ্রমে ২৫৲ ঐ বিধবাশ্রমে ২০৲, ঐ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲ কলিকাতা কালা বোবা স্কুলে ১০৲ সাধনাশ্রমে ২৫৲ দাতব্য বিভাগে ২০৲ ও একটি স্থায়ীভাণ্ডার স্থাপনের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ৩০০৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ২০শে নবেম্বর পরলোকগত বাবু রজনীনাথ সমাদ্দারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য ও পুত্র শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলেন।

বিগত ২৭শে নবেম্বর পরলোকগতা পুণ্যপ্রভা ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রশান্তকুমার, শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী প্রেরিত স্মৃতিলিপি পাঠ করিয়া, জীবনী-পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পতি শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন ঘোষ প্রচার বিভাগে ২৫৲ বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে ১০৲ দাতব্য বিভাগে ৫৲ দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ৫৲ ও সাধারণ বিভাগে ৫৲ দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন

ঊষা কীর্ত্তন—অপরাপর বৎসরের ন্যায় সমস্ত পৌষমাস নগরের দ্বারে দ্বারে ঊষাকীর্ত্তন করিবার আয়োজন হইতেছে। আগামী ১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) শনিবার সিটি স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনাশ্রমে গমন করা হইবে। সকলে ইহাতে যোগদান করেন, এই অনুরোধ। অন্যান্য বিষয় শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্তের নিকট জানিতে পারিবেন।

বিহার ও উড়িষ্যা ব্রাহ্মসম্মিলন—সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানাইতেছেন—"আগামী ২৮এ, ২৯এ, ও ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে গিরিডি নগরে সম্মিলনের ৫ম অধিবেশন হইবে। সকল ব্রাহ্মগণের মধ্যে, বিশেষতঃ এই প্রদেশবাসী ব্রাহ্মগণের মধ্যে, ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপন করা এবং এই প্রদেশবাসী সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদের সহানুভূতি আছে তাঁহাদের সকলকেই আমরা সমাদরে আহ্বান করিতেছি। স্থানান্তর হইতে সমাগত পুরুষ ও মহিলাদিগের বাসের ও আহারাদির বন্দোবস্ত সম্মিলন হইতেই করা হইবে, কিন্তু তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া বিছানা ও মশারী আনেন এই প্রার্থনা।"

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

Centenary of the Brahmo Samaj—An Appeal to the Bramho public and to all Fellow-theists—পাটনা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও তথাকার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন এম এ, এস্ এল্ এম, প্রণীত। এই পুস্তিকায় ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র (১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট) তারিখে প্রথম স্থাপন দিবসেই এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই জমিখরিদের কবলাতে, প্রতিষ্ঠাতা রাজর্ষি রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক যে "ব্রাহ্মসমাজ" নাম প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার স্থলে অপরলোক প্রদত্ত "ব্রহ্মসভা" নাম ব্যবহার করিয়া ও তৎকালে অবলম্বিত উপাসনা প্রভৃতির কার্য্যগত ব্যবস্থার এবং মন্দিরের ট্রাষ্টডিডের আদর্শের মধ্যে যে অনৈক্য ছিল (যদিও এই অনৈক্যটা মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পরেই আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কারণ, রামাবতারের ব্যাখ্যা এই মন্দিরেই হইয়াছিল, কমল বসুর বাটীতে নহে) তাহার উল্লেখ দ্বারা একটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী 'আত্মীয় সভার' সহিত সমশ্রেণীভুক্ত ও অপরটিকে পরবর্ত্তী বিকশিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া, দুইটির পার্থক্য প্রমাণ করিবার প্রয়াস ও তদ্দ্বারা মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিনকেই ব্রাহ্মসমাজস্থাপনের জন্মতারিখ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার মধ্যে বিশেষপক্ষ-সমর্থনকারী একজন সুদক্ষ ব্যবহারজীবীর হস্ত স্পষ্ট লক্ষিত হইলেও সত্যনির্ণয়ে নিযুক্ত নিরপেক্ষ বিচারকের কিছুই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল না। তিনি যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তারিখ পরিত্যাগ করিয়া ১৭৫২ শকের ১১ই মাঘকেই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজের জন্মতারিখ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে বলিতে চাহেন, মহর্ষি কি ব্রহ্মানন্দ যে সেরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার বিন্দুমাত্র প্রমাণও তিনি পস্থিত করিতে পারেন নাই। বরং ১১ই মাঘ হইতে বর্ষগণনা প্রবর্ত্তন ও সাম্বৎসরিক উৎসব-প্রতিষ্ঠার সময়ে মহর্ষি অনুবিধকারণেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিনকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন এবং মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বের ইতিহাস সম্যক অবগত ছিলেন না, পরে যাহা জানিয়াছিলেন তখন তাহাও জানিতেন না, এরূপ অনুমান করিবারই যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ১৮২৮ হইতে ১৮৩০ সালের মধ্যে নিয়মিত কাজ যে আর বন্ধ হয় নাই, সমভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রাজর্ষির মনোভাব যে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল সমাজস্থাপনের সময়ে ও ট্রাষ্ট ডিড প্রণয়নকালে (তাহাও কিন্তু মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই ৮ই জানুয়ারী তারিখে—সম্পন্ন হইয়াছিল) তাঁহার মনে যে দুইটি ভিন্ন আদর্শ ছিল, এরূপ বিন্দুমাত্র প্রমাণও নাই, বরং সেরূপ কিছু যে হয় নাই, তাহারই অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সমাজস্থাপনের সময়ই যে গৃহনির্ম্মাণের সংকল্প উদয় হইয়াছিল এবং তাঁহার সময়ে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পরও যে ৬ই ভাদ্রই সাম্বৎসরিক উৎসব হইত, তিনি স্বয়ং উক্ত তারিখকেই ব্রাহ্মসমাজের জন্মতারিখ মনে করিতেন, সে বিষয়েও কোনই সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ৬ই ভাদ্রকে ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনের তারিখ বলিয়া স্বীকার না করিলে, স্পষ্ট অলঙ্ঘনীয় প্রমাণ সত্ত্বেও সত্যকে অস্বীকার করাই হয়। এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সংবতের পরিবর্ত্তন করিবার কথা আনিয়া মূল প্রশ্নটাকে কেন তমসাচ্ছন্ন করা হইয়াছে লেখকই জানেন। পূর্ব্ব ইতিহাস যেখানে অন্ধকারে আবৃত সেখানে পরবর্ত্তীকালে পূর্ব্ব হইতে বর্ষগণনা করিতে যাওয়াতে এরূপ ভুল অনেক স্থানেই হইয়াছে। খৃষ্টাব্দ খৃষ্টের কথিত জন্মতারিখের চারি বৎসর পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সংবৎ-সম্বন্ধীয় ভুল সংশোধন করা না করার সঙ্গে জন্মতারিখ নির্ণয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই। মন্দির প্রতিষ্ঠা তারিখের গুরুত্ব যত অধিকই হউক না কেন, এবং তাহার পূর্ব্বে সমাজের অবস্থা যত অপূর্ণই থাকুক না কেন, তাহার কিছুই কোনও প্রকারে উহার আরম্ভ বা জন্মতারিখটাকে উড়াইয়া দিতে বা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সত্য ঘটনার অস্তিত্ব কাহারও মতামতের উপর নির্ভর করে না। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের তারিখ এই সত্যটাকে কোনও প্রকার যুক্তিই খণ্ডন করিতে পারে না। আমরা এত দিন কি মানিয়াছি বা বলিয়া আসিয়াছি তাহার উপরও এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে না। বহুদিন প্রচলিত থাকিবার নজীর বা প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ছাপ সত্যকে মিথ্যা করিতে পারে না। স্বীয় অভিরুচি অনুসারে ব্যক্তি বা দলবিশেষ ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র অপেক্ষা ১৭৫২ শকের ১১ই মাঘের উপর, ব্রাহ্মসমাজস্থাপনতারিখ অপেক্ষা মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিনের উপর, অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারেন। সে বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার নাই। সকলেরই সেই অধিকার আছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজস্থাপন ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা এই দুইটি ঘটনাকে এক ও অভিন্ন করিবার ক্ষমতা কোনও মানুষেরই নাই। পরস্পরের ভাবকে সম্মান ও সত্যকে স্বীকার করিয়া সকলে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে যে সর্ব্বাংশে ভাল হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই পুস্তিকা দ্বারা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সহায়তা হইবে না, বরং বাধাই সৃষ্ট হইবে। সম্মিলনের পন্থা ইহা নহে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা ১৬ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীহেমচন্দ্র বসু বি এ।

Registered NO 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ১৬ই পৌষ, রবিবার ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৮ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১৮শ সংখ্যা। 1st January, 1928. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় উৎসব-দেবতা, তুমিত তোমার অসীম প্রেমে আমাদিগকে তোমার উৎসবে আহ্বান করিতেছ। কিন্তু তাহা সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত আয়োজন ত আমরা বিশেষ কিছুই করিতেছি না। বিনা আয়োজনেও ত আমরা কোনও প্রকারেই তাহা সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে পারিব না। তথাপি কেন যে এখনও আমরা উদাসীন ভাবেই দিন কাটাইতেছি, জানি না। নানা আবর্জ্জনারাশিতেই আমরা হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি; তাহাতে তোমার জন্য কোনও স্থানই আমরা রাখি নাই। শূন্য হৃদয় না হইলে যে তোমাকে হৃদয়ে পাইব না, তাহা ত আমরা ভাল করিয়াই জানি। আমাদের শক্তিতে যে তাহা আমরা করিতে পারিব না, তাহাও আমরা বার বারই দেখিয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া না লইলে আমাদের আর অন্য কোনও উপায়ই নাই। আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতাই তুমি জান। তুমি দীনজনতারণ, কাঙ্গালশরণ; তুমি এই দীন হীনদিগকে তোমার উৎসবের জন্য প্রস্তুত করিয়া লও। তুমি প্রাণে ব্যাকুলতা দাও, হৃদয়ে দীনতার সঞ্চার কর, তোমাতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে সমর্থ কর। হে প্রেমময় পিতা, তুমি আমাদিগকে হাত ধরিয়া তোমার পথে নিয়ে যাও, তোমার উৎসব সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত করিয়া লও। আমাদের মলিন হৃদয়ে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, জীবনে তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। তোমার উৎসব যেন আর ব্যর্থ হইয়া না যায়। তোমার ইচ্ছাই সকল বিষয়ে পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

অস্পৃশ্য কে?—ওকে তোমরা অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছ কেন? ওর অপরাধ কি? ওর জন্ম নীচ কুলে? জন্মের উপর ত ওর হাত নাই! কোন্ কুল উচ্চ, কোন্ কুল নীচ, এ কে করিল? সে গরীব? সে মূর্খ? সে কলঙ্কের কালি গায় মেখেছে? তাই ব'লে তোমরা তাঁকে ছুঁতে চাও না? তোমাদের বুঝি গভীর জ্ঞান, তোমরা বুঝি নিষ্কলঙ্ক, পূতচরিত্র! তোমরা বুঝি ধনী! তোমরা বুঝি ধার্ম্মিক! তাই তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ? তোমাদের জ্ঞান, প্রেম, নিষ্ঠা কতটুকু? তোমাদের ধন ঐশ্বর্য্য কত দিনের জন্য? দেখ্‌ছ না, তোমরা যাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছ, অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছ, তাঁকে কে এসে জড়িয়ে আছেন? কে তাঁকে হাত ধ'রে তুলছেন? কে তাঁকে আলিঙ্গন কচ্ছেন? তিনি যাঁকে ত্যাগ করেন নাই, তুমি তাঁকে ত্যাগ করবে? তিনি যাঁকে ভাল বাসেন, তুমি তাঁকে অস্পৃশ্য ক'রে রাখ্‌বে? তিনি যাঁর গৃহে বাস করেন, তুমি তাঁকে ছুঁতেও পার না? তবে তুমিই যে অস্পৃশ্য হ'য়ে যাবে! তোমার হৃদয়মন্দির হ'তেই যে দেবতা চ'লে যাবেন। তাঁর কাছে কেহই অস্পৃশ্য নাই। দুই দিনের জন্য যে কালি গায়ে মেখে ব'সে আছে তাঁকে দূর ক'রে দিও না; তাঁর কালি মুছিয়ে দাও। যে প'ড়ে যায় তার হাত ধ'রে তোল। জন্মের জন্য ত সে দায়ী নয়—তুমি শ্বেত, সে কৃষ্ণ; তুমি ব্রাহ্মণ, সে চণ্ডাল; সকলেই যে প্রভুর ঘরের ছেলে। কেহই অস্পৃশ্য নয়, কেহই শূদ্র নয়। বিশ্বপিতার সন্তান সকলেই।

আশ্চর্য্য গণিত—কেশবচন্দ্র বলিতেন,—"জীবন বেদে" লিখেছেন,—তোমাদের পৃথিবীর গণনা, এ রাজ্যে খাটে

না; তোমরা বল, পাঁচ থেকে, তিন গেলে, দুই থাকে; এ রাজ্যের নিয়ম, তিন থেকে পাঁচ গেলে দুই থাকে। তোমরা বল, আগে ভাব্‌ব, আগে অর্থসংগ্রহ কর্‌ব, আগে ভিত্তি স্থাপন কর্‌ব, পরে ছাদ তুল্‌ব। এ রাজ্যের নিয়ম এই, কর্‌বার আগেও ভাব্‌ব না, পরেও ভাব্‌ব না; আগে ছাদ্‌ তুল্‌ব, পরে ভিত বাঁধ্‌ব। এ রাজ্যের গণনাই অন্যরূপ। কেশবচন্দ্রের গণনা কিরূপ তা জানি না, সবটা বুঝি না; কিন্তু আমিও দেখ্‌ছি এ রাজ্যের গণনা তোমাদের গণনার সঙ্গে একরূপ নয়। তোমরা বল—উন্নতি চাই? উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর, সকলকে পশ্চাতে রেখে অগ্রসর হও, দশজনের সুরের উপর তোমার সুর চড়াও; দশ জনকে থামিয়ে দিয়ে তুমি আপনার কথা বল। কিন্তু এ রাজ্যের নীতি অন্যরূপ। তুমি উন্নতি চাও? সকলের পায়ের তলে পড়; সকলকে আগে যেতে দাও; সকলে কথা বলুক, তুমি নীরবে শোন; সকলে এগিয়ে যাক্‌ তুমি পশ্চাতে থাক। সকলের বোঝা তুমি বও, সকলের পায়ের নীচে প'ড়ে থাক; সকলে তোমাকে চরণে দ'লে যাক। তোমার অযথা কলঙ্ক রটনা হোক, তুমি তার প্রতিবাদ কর্‌বে না, আত্মসমর্থন কর্‌বে না, নীরবে স'য়ে যাবে। সকলে তোমাকে ঘৃণা করুক, উপেক্ষা করুক, তুমি সকলকে ভাল বাসিবে; হিতচিন্তা কর্‌বে, কল্যাণচেষ্টা কর্‌বে; দুঃখে শোকে নির্যাতনে প্রসন্ন থাক্‌বে। হৃদয়ে প্রেম, বুকে আশা, মুখে হাসি, জীবনে আনন্দ। শোকে আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ, অপমানেও আনন্দ। ইহাই এ দেশের আশ্চর্য্য গণিত।

বিচারের ভার তোমার উপর?—তুমি যে লোকের সমালোচনা ক'রে যাচ্ছ, কার কি করা উচিত ছিল, কার কি করা উচিত হয় নাই, অবিরত ব'লে যাচ্ছ, তোমার উপর কি বিচারের ভার পড়েছে? ভগবান কি শাসনের ভার তোমার উপর দিয়েছেন? তুমি নিজের দিকে তাকাও না? নিজের কত ত্রুটি, কত কলঙ্ক তার দিকে তোমার দৃষ্টি নাই; কেবল পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছ। তুমি কি তাকে ভাল ক'রে জান? তার বাহিরের দুটো একটা কাজ দুই এক জনের সঙ্গে ব্যবহার তুমি দেখেছ; তা দিয়ে ত লোকটাকে জান্‌তে পারা যায় না। আমাদের বিচারে কত ভুল হয়। কে কি ভাবে কোন্‌ কাজটি করে, কার বাহিরের কর্কশতার অন্তরালে কি কোমল ভাব রয়েছে, দুইটা দোষ দুর্ব্বলতা আছে বটে, কিন্তু তার ভিতরে গোপন কত মহৎ ভাব, শুভচিন্তা, কল্যাণচেষ্টা রয়েছে, তুমি কি তা জান? লোককে আমরা চিন্‌তে পারি না। আমার দৃষ্টির অন্তরালে কত উচ্চ ভাব, মহৎ চরিত্র, তার রয়েছে, কে বলিবে? বিচারের ভার প্রভু পরমেশ্বরের উপর রাখাই কি ভাল নয়? তুমি আমি কে যে মানুষের বিচার করিব? কত পঙ্কের মধ্যে পদ্মফুল ফুটে উঠে! কন্টকের ভিতরে গোলাপের জন্ম। তাই বলি, তোমার উপর বিচারের ভার নয়, যিনি প্রভু তিনিই সব দেখ্‌বেন।

সম্পাদকীয়

উৎসবের আয়োজন—শুধু উৎসবের আহ্বান শুনিলেই, উৎসব সম্ভোগের জন্য ব্যাকুল হইলেই যে যথেষ্ট হইল, উৎসব সফল হইয়া গেল, তাহা নহে। তাহার জন্য অপর কিছু আয়োজনও করিতে হইবে। বিনা আয়োজনে যখন কোনও কার্য্যই সাধিত হয় না, তখন এ ক্ষেত্রেও তাহার যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে। আমরা সাধারণতঃ বাহিরটাই সর্ব্বাগ্রে দেখি, তাই বাহিরের অনেক আয়োজন আমরা ইতি-মধ্যেই অবলম্বন করিয়াছি। সে সকল আয়োজন যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, শুধু তাহাই যে যথেষ্ট নহে, সে কথা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা অনেক সময় সেই দিকটা ভুলিয়া থাকি বলিয়াই, আমাদের মধ্যে উক্ত প্রকার চেষ্টার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বাহিরের আয়োজনই যে খুব সন্তোষকর হইতেছে এরূপ কথা ত বলা যায় না, এ বিষয়েও আরও অনেক করিবার রহিয়াছে কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা আজ বিশেষ কিছু বলিতেছি না। বাহিরের আয়োজনে যদি কোনও প্রকার ত্রুটি নাও থাকে, তাহা হইলেও যে উৎসব সফল না হইতে পারে, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে পারে, সে কথা ভুলিলে কিছুতেই চলিবে না। সর্ব্বোপরি উৎসব অন্তরের ব্যাপার, অন্তরেই উহা সম্ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং অন্তরের আয়োজন ব্যতীত অন্য কিছুতেই কিছু হইবে না। সকল হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা ও প্রেম ভক্তির সম্মিলনেই যে উৎসব বিশেষভাবে সফল হইয়া উঠে, তাহা ব্যতীত যে উৎসব জীবন্ত হইয়া উঠে না, জমাট বাঁধে না, সে কথা আমরা সকলেই অবগত আছি,—তাহার অনেক পরিচয় আমরা সর্ব্বদাই পাইতেছি। সুতরাং সকল হৃদয়ের এই আকুল আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনাই যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান আয়োজন হওয়া আবশ্যক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রার্থনা যত অধিক সংখ্যক হৃদয় হইতে এবং হৃদয়ের যত গভীর স্থান হইতে ও সরল ভাব হইতে উত্থিত হইবে, ততই যে উৎসব সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠিবে, প্রেমময়ের করুণাধারা প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইবে, তাহা আমরা বিশেষরূপেই অবগত আছি। ইহার অভাবেই যে আমাদের উৎসব পূর্ব্বের ন্যায় জীবন্ত ও সরস হয় না, তাহা অধিক করিয়া না বলিলেও চলিবে—যাহার সামান্য দৃষ্টি আছে সেই তাহা দেখিতে পারে। অথচ আমরা যে বিশেষভাবে এ বিষয়ে কোনও আয়োজন করিতেছি তাহা ত বলিতে পারি না। উৎসবের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য একদিন প্রার্থনা করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার অর্থ এই নয় যে, শুধু সেই দিনই ওরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে। উক্ত কর্ত্তব্যটি আমরা যাহাতে না ভুলিয়া থাকি, তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই ঐ প্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ওরূপ প্রার্থনা প্রতিদিনই করিতে হয়, সর্ব্বদাই করিতে হয়, নতুবা নিজেরও কল্যাণ নাই। বিশেষভাবে উৎসবের সফলতার পক্ষে উহা একান্তই অপরিহার্য্য। সকল হৃদয় হইতে যদি আকুল প্রার্থনা-ধ্বনি উত্থিত হয়, তবে আর উৎসব সরস ও জীবন্ত না হইয়া

পারে না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও উহা একান্ত আবশ্যক। কেন না প্রাণে যদি আকুল প্রার্থনা না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে হৃদয় তাঁহার উন্মুখীন নহে, তাঁহার প্রেমধারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং উৎসব অপরের পক্ষে যতই জীবন্ত ও সরস হউক না কেন, সে হৃদয়ের পক্ষে উহার কোনই মূল্য নাই—সমস্তই তাহার বাহির দিয়া ভাসিয়া যায়, কিছুই অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদের হৃদয়ে এই ব্যাকুল প্রার্থনার অভাব কেন, তাহার কারণ যদি অনুসন্ধান করিতে যাই, তবে দেখিতে পাইব আমরা অপর বিষয় নিয়াই অধিকতর ব্যস্ত আছি, অপর বিষয়কেই অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করিতেছি, বলিয়াই এরূপ ঘটে। যদি তাহা না হইত, তবে নিশ্চয়ই এই অমূল্য সম্পদের জন্য আমরা একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতাম আর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহাকেই চাহিতাম। সুতরাং আমাদের হৃদয়কে অপর সকল ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা হইতে প্রত্যাহৃত করিতে হইবে, উহাকেই আমাদের উৎসবের বিশেষ আয়োজন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই অভাবই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভাব, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টান্বিত হইতে হইবে। আকুল প্রার্থনা জাগাইবার জন্য ইহা যেমন প্রয়োজনীয়, তাঁহার করুণা গ্রহণ করিবার জন্যও তেমনি আবশ্যক। অপর বিষয় লইয়া প্রাণ পূর্ণ থাকিলে হৃদয়দেবতার স্থান যে আর সেখানে থাকে না, তাঁহার সিংহাসনে অপর বস্তুকে বসাইলে তাঁহার বসিবার জায়গা থাকে না, একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই উৎসব সদ্ভাবে সম্ভোগ করিতে হইলে হৃদয়কে শূন্য করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, আমাদের নিজ শক্তিতেই যে এই কার্য্য সাধিত হইবে এরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই। আমাদের যেটুকু করিবার তাহা করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু তাহার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। এজন্যও বিশেষ-ভাবে করুণাময়েরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে, তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করিতে হইবে, তাঁহার আলোকে পথ দেখিয়া লইতে হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রেও প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কোনও ফলপ্রদ উপায় নাই। আমাদের যাহা কিছু চেষ্টা যত্ন তাহা আমাদের প্রার্থনাকে সত্য ও সরল করিতেই সহায়তা করিবে; সে চেষ্টা ও তাহার ব্যর্থতার অনুভূতি ব্যতীত খাঁটি প্রার্থনার উদয় হইতে পারে না। অলসের প্রার্থনা মৌখিক প্রার্থনা, বাহিরের প্রার্থনা। উহার বিশেষ কোনই মূল্য নাই। অনন্যগতি, অনন্যশরণ না হইয়া আমরা তাঁহার নিকট যাইতে পারি না। যতক্ষণ আপনার উপর আশা ও নির্ভর থাকে, ততক্ষণ আমরা প্রকৃতপক্ষে অনন্য-গতি ও অনন্যশরণ হইতে পারি না। আমাদের সকল চেষ্টা আয়োজন যখন ব্যর্থ হয়, আমাদের শক্তিতে আর কিছুতেই কুলাইতেছে না, চারিদিকে আমরা আমাদের অক্ষমতারই পরিচয় পাইতেছি যখন দেখিতে পাই, তখনই আমাদের আত্মশক্তির উপর আশা ও নির্ভর চলিয়া যায়, আমরা নিরুপায় হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে, আকুলপ্রাণে তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করিতে বাধ্য হই। এই আধ্যাত্মিক নিয়মের উপরই আমাদের সকল চেষ্টা আয়োজনের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের সাধন ভজন যখন এই স্বাভাবিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহা পূর্ণরূপে ফলপ্রদ ও কল্যাণকর হয়। কৃত্রিম সাধন ভজন দ্বারা কখনও প্রকৃত সফলতা লাভ করা যায় না, উহা কল্যাণপ্রদও হয় না। বরং তাহা হইতে অহঙ্কার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া মহা অকল্যাণই প্রসূত হয়। সুতরাং আমাদের সকল সাধন ভজন, চেষ্টা যত্ন যাহাতে সরল ও স্বাভাবিক হয়, তাহার মধ্যে কোনও প্রকার অস্বাভাবিকতা, অসরলতা ও কৃত্রিমতা প্রবেশ না করে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আর একটি বিষয়েও আমাদিগকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—উৎসবের প্রধান লক্ষ্যটিকে যাহাতে আমরা না ভুলি, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। আমরা অনেক সময়ই প্রধান লক্ষ্য ভুলিয়া, প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ, জীবনের পরিবর্ত্তন, জীবন-দেবতার সংস্পর্শে নূতন জীবনলাভকে লক্ষ্যস্থানে না রাখিয়া, অপর সকল বিষয়ের জন্যই অধিকতর ব্যস্ত হই—তাহা আনন্দ শান্তি প্রভৃতি উচ্চ সম্পদই হউক, আর মান প্রতিপত্তি, লোকের প্রশংসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয়ই হউক। তাহা হইলে যে উৎসব কোনও প্রকারেই সফল হইবে না, আমাদের সকল আয়োজন ব্যর্থই হইবে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। ইহাতে যে শুধু আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতিই সাধিত হইবে তাহা নহে,—সমস্ত উৎসবই কলুষিত হইবে, সবই পণ্ড হইবে, আমরা অপরেরও গুরুতর ক্ষতির কারণ হইব। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। সম্মিলিত কার্য্যে লক্ষ্যের একতা ও বিশুদ্ধতা একান্ত আবশ্যক। আমরা যে একা নহি, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর যুক্ত, আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা ও কার্য্যের উপর শুধু আপনার মঙ্গলামঙ্গলই নির্ভর করিতেছে না, অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণও বহু-পরিমাণে তাহার সঙ্গে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না,—সে কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণে রাখিতে হইবে। উৎসবের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, আর আমাদের উদাসীন থাকা শোভা পায় না। তাহার আয়োজনে যদি আমরা এখন পর্য্যন্ত নিযুক্ত না হইয়া থাকি, তবে যেন আর বৃথা কালক্ষেপণ না করি। আমরা সকলে তাহাকে সফল করিয়া তুলিবার এবং তাহা সম্যক প্রকারে সম্ভোগ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হই। করুণাময় পিতা আমাদের সহায় হউন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের দান

আজ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব। তাই ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের যে দান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিব, স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিব। আমাদের প্রথমেই মনে হয়, দয়াময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের মধ্য

৮ই ডিসেম্বর পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনের উৎসবের উপাসনায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বনে লিখিত।

দিয়া এক উদার ও মহৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মের আদর্শ প্রকাশ করিয়া তাঁহার অসীম করুণার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্মসমাজের উপাস্য-দেবতার কথাই সকলের চেয়ে বড় কথা। আমাদের ধর্ম্মের উপাস্যদেবতা শুধুই গুটিকয়েক ব্রাহ্মের ব্রহ্ম নহেন। তিনি সর্ব্বজাতির পিতা, সর্ব্বশাস্ত্রের স্বীকৃত, সর্ব্বকালের চিরবাঞ্ছিত, সর্ব্বলোকের আরাধ্য দেবতা। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম শুধুই জ্ঞানের, শুধুই ধ্যানের, শুধুই নীতির অথবা শুধু কর্ম্মসাধনের ধর্ম্ম নহে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই সকলই এ ধর্ম্মের সাধনের অঙ্গ। আমরা নিশ্চয়ই নির্জ্জনে গিয়া, ধ্যানস্থ হইয়া, সেই আনন্দময় রসস্বরূপের স্বরূপসিন্ধুতে ডুবিয়া যাইব, ভূমানন্দ আমাদের আত্মায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে; জীবনের সেই বিশেষ মুহূর্ত্তে মানবজন্ম সার্থক মনে করিব। কিন্তু শুধুই সেই নির্জ্জনের ধ্যানেই কি আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারিব? আমরা ভক্তিপথের পথিক; জীবনের চিরবাঞ্ছিত দেবতার সঙ্গে প্রেমের মিলনই আমাদের সাধনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। আমরা নির্জ্জন-ধ্যান-ধারণার ন্যায় সমাজমন্দিরে শত শত সমবিশ্বাসী ভাইভগিনীর সহিত মিলিত হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইব। আবার গৃহপরিবারে পিতামাতা ও স্ত্রীপুত্রের মধ্যে সেই প্রেমময়েরই প্রেমের লীলা দর্শন করিয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে তাঁহার মধুর গুণগান করিব। আমাদের নির্জ্জন, জনসমাজ ও গৃহ-পরিবার—এই তিনটিই সাধনের স্থান, এই তিন স্থানেই আমরা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব।

আমরা অনেকে যথার্থই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধের মতন পরিবারে বাস করি। তাই মনে হয়, এখানে আবার ধর্ম্ম কোথায়? এখানে ত আমাদেরই আহার নিদ্রা ও সুখ সম্ভোগের ব্যাপার! এখানে আবার প্রেমময় ঈশ্বর কোথায়? এখানে ত আমাদেরই লীলা, আমাদেরই আত্মশক্তির খেলা! হায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষ! গৃহপরিবারে তোমরা কে? তোমাদের কতটুকু কর্ত্তৃত্ব? সেই আনন্দময় ঈশ্বর তাঁহারই বিশ্বলীলার জন্য তিনি আমাদের গৃহপরিবার রচনা করিয়াছেন। এখানে তিনিই কাহাকেও পিতা, কাহাকেও মাতা, কাহাকেও সন্তান, কাহাকেও পতি, কাহাকেও পত্নী, কাহাকেও প্রভু, কাহাকেও ভৃত্য করিয়া দিয়াছেন। যতদিন তাঁহার ইচ্ছা, ততদিনই এখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের, পতির সঙ্গে পত্নীর, স্নেহপ্রীতির বিচিত্র আদান প্রদান ও লীলা চলিতে থাকিবে। তাহার পরে আবার ঈশ্বরই পুত্রের নিকট হইতে পিতাকে, পত্নীর নিকট হইতে স্বামীকে কোথায় কোন্ অদৃশ্যলোকে লইয়া যাইবেন। আমরা কেহই তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব না। তাই বলি, আমাদের গৃহপরিবারে সেই ইচ্ছাময়েরই কর্ত্তৃত্ব। একবার চক্ষু খোল, দৃষ্টিকে প্রেমময়ের প্রেমের আলোকে উজ্জল কর; তাহার পরে চাহিয়া দেখ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যে পুরুষ ও নারী কতই স্বার্থপর, আত্মসুখের জন্য কতই লালায়িত, সেই পুরুষ ও নারী পিতামাতারূপে পুত্রকন্যার, পতিপত্নীরূপে স্বামী ও স্ত্রীর সেবায় আত্মহারা হইয়া প্রতিদিন সুখস্বার্থকে অতি তুচ্ছ মনে করিতেছে। কাহার প্রেম তাঁহাদের অন্তরে আসিয়া হৃদয়কে দেবভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে? তাঁহারা অজ্ঞাতসারে কাহার ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া গৃহধর্ম্মে ও গৃহের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন? সে কি প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরেরই প্রেমে এবং মঙ্গল ইচ্ছায় নহে? যদি তাহাই হয়, তবে আমরা গৃহপরিবারের বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য প্রেম দর্শন না করিয়া, আর কোথায় গিয়া দর্শন করিব?

আমাদের সাধনের জন্য, এই গৃহ হইতে কি নির্জ্জন স্থানেও যাইতে হইবে? হইবে বই কি? ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে শুধু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই নহেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ, উমেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, শিবনাথ প্রভৃতি যাঁহারাই উচ্চতর ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই অবসর অনুসারে গিরিশৃঙ্গে, সিন্ধুকূলে, নদীবক্ষে ও নির্জ্জন প্রান্তরে গমন করিয়া সাধন করিয়াছিলেন। আচার্য্য শিবনাথ কতদিন বালিগঞ্জের মাঠে অথবা ইডেন উদ্যানে গমন করিয়া ঈশ্বরের এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণচিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে সাধনের যে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এই—

"একবার আমরা চারিজন প্রচারক—অর্থাৎ নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রামকুমার বিদ্যারত্ন, শশিভূষণ বসু ও আমি এই সংকল্প করিলাম যে, আমরা হিমালয় পাহাড়ে কিছুদিন নির্জ্জনে বাস করিব। আমরা পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের নিকট স্ত্রী পাশ পাইয়া খার্সিয়াঙ্গে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সাধন ভজনে বসিলাম। একটি চাকর রাখিলাম, সে বাসন মাজিত, ঘর ঝাঁট দিত ও অপরাপর কাজ করিত। নবদ্বীপ বাবু বাজার করিবার ভার লইলেন, আমি রন্ধনের ভার লইলাম। আমরা প্রত্যূষে উঠিয়া সমবেত উপাসনা করিতাম, তৎপরে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ ও উপাসনা করিয়া যে যেদিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতাম; এইরূপে দুই ঘণ্টা-কাল প্রত্যেকে একান্তে যাপন করিতাম। সেই সময়টা প্রত্যেকে নিজ নিজ অভীষ্ট প্রণালীতে চিন্তা, ধ্যান, উপাসনাদি করিতাম। আমাকে রন্ধনের জন্য সকলের অগ্রে ফিরিতে হইত। আমি বাড়ীর অনতিদূরে পাহাড়ের উপরে নির্ঝরের পার্শ্বে একখানি প্রস্তরের উপরে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে প্রতিদিন বসিয়া চিন্তা ধ্যান ও উপাসনা করিতাম। এমন কি, এখনও দার্জ্জিলিং যাইবার সময়ে সেই পাথরখানির উপরে যখন দৃষ্টি পড়ে, তখনি মনে উপাসনার ভাব উপস্থিত হয়। সেই সাধনের ফল চিরদিন রহিয়াছে।"

করুণাময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া আমাদের কাছে ধর্ম্মের এই পূর্ণ আদর্শই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন যে, আমরা নির্জ্জনে, ব্রহ্মমন্দিরে ও গৃহপরিবারে ধর্ম্মসাধন ত করিবই; তদ্ভিন্ন ঈশ্বরকে জীবনের প্রভুরূপে বরণ করিয়া, তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছার অধীন হইয়া গৃহধর্ম্মপালন, আপন আপন সমাজের কল্যাণসাধন, দুঃখীর সেবা ও দেশের কার্য্য—এই সমস্তই ধর্ম্মের অংশ মনে করিয়া সম্পন্ন করিব। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ঈশ্বর সেই রামমোহন রায়ের জীবনে ধর্ম্মের এই মহৎ আদর্শই উজ্জল করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি স্বীয় গ্রামে, শ্মশানের নিকটে, প্রত্যেকখানি ইটের উপরে ওঁ তৎসৎ লিখিয়া, সেই ইটে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, সেই মন্দিরে একাকী বসিয়া সাধন

করিলেন, আবার ধর্ম্মপ্রচারে, শিক্ষাবিস্তারে, সমাজসংস্কারে এবং দেশের সাহিত্য ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আপনার দেহ মনের শক্তি ও উপার্জ্জিত অর্থ সকলই সঁপিয়া দিলেন। তিনিই এ দেশে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিলেন, মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। তাই বলি, ঈশ্বর যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অসীম করুণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আজ আমাদিগকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিতেই হইবে।

করুণাময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া আর একটি উদার ও মহৎ ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত করুণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেই উদার ও মহৎ ভাবটি এই যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই গভীর আধ্যাত্মিক ভাব রহিয়াছে। তাই সকল ধর্ম্মের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, সকল শাস্ত্র হইতেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সকল ধর্ম্মেরই ধার্ম্মিক পুরুষদের চরণে শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া পড়িবে এবং তাঁহাদিগকে ধর্ম্মজীবনের সহায় মনে করিতে হইবে। তাহা ছাড়া বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের যাহাতে মিলন হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এই সকল মহৎ কার্য্যের জন্য যে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার যো নাই। এ বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায় যাহা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়! সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া উপনিষদ, বেদান্ত দর্শন, গীতা এবং অন্যান্য উন্নত শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন পূর্ব্বক হিন্দু ধর্ম্মের পরমোৎকৃষ্ট তত্ত্বসকলের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। যে বাঙ্গালাদেশের লোক তাঁহাদের উন্নত শাস্ত্রের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং পুরাণ উপপুরাণকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া বলিতেন,—নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা হয় না, ক্ষুদ্র মানুষ অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে পারে না, রামমোহন রায় তাঁহাদের সম্মুখে উপনিষদ ও বেদান্তদর্শনের বাঙ্গালা অনুবাদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহাদের প্রাচীনকালের ঋষিগণ অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অমৃতরসে সিক্ত হইয়া তাঁহাকে পুত্র হইতে প্রিয় ও বিত্ত হইতে প্রিয় মনে করিয়াছেন। আবার, তিনি আরবী, পারসী, ইংরাজি, হিব্রু, গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া মুসলমান, য়িহুদী, খ্রীষ্টান সকল ধর্ম্মেরই শাস্ত্র পাঠ করিলেন, সকল ধর্ম্মের সত্য দ্বারাই আপনার ধর্ম্মধারণাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। তাহার পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মহাত্মা কেশবচন্দ্র, মনস্বী প্রতাপচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, প্রচারক গিরিশচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রভৃতি ধার্ম্মিক ও জ্ঞানিগণ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান শাস্ত্র হইতে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশ্বজনীন ও সকল শ্রেণীর লোকের গ্রহণের উপযোগী করিলেন। আমরা যে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকার আধ্যাত্মিক সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি, তাহা কোন কালেই অস্বীকার করিতে পারিব না। আজ যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম শুধুই হিন্দুশাস্ত্রের আলোকেই আলোকিত হইত, মুসলমানধর্ম্মের ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মভাবের উজ্জ্বলরশ্মি ইহার উপরে না পড়িত, তাহা হইলে এই বৃহৎ ধর্ম্মের আকার কতই ক্ষুদ্র দেখিতে পাইতাম! হিন্দু সাধকদিগের কাছে আমাদের বিস্তর ঋণ; কিন্তু খ্রীষ্টান সাধক, বৌদ্ধ সাধক ও মুসলমান তপস্বীদিগের নিকটও ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের ঋণ নিতান্ত সামান্য নহে। কত ব্রাহ্ম সাধক যে হিন্দু সাধকদিগের ন্যায় খ্রীষ্টান সাধক ও মুসলমান তপস্বীদিগের নিকট হইতেও আধ্যাত্মিক ভাব সংগ্রহ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হন, তাহা কে বলিয়া দিবে? অতএব আমরা কি সকল ধর্ম্মেরই ধার্ম্মিকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি?

তবে দুঃখের সহিত একটা কথা আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ও বিশ্বজনীন ভাবের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আশানুরূপ মিলিত করিতে পারি নাই। কিন্তু তবুও যে এই পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজেই বিস্তর হিন্দু এবং অল্পসংখ্যক মুসলমান ও খ্রীষ্টান উপাসনায় মিলিত হন, ইহাও আমাদের পক্ষে যে আনন্দের কথা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুও যে আমাদের উপাসনায় যোগদান করিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা ত এই পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজেই দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া কোন কোন সুশিক্ষিতা খ্রীষ্টান মহিলা আমাদের উপাসনায় যোগদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বেই বাঙ্গালা-ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন পশ্চিম দেশীয় মুসলমান আমাদের উপাসনায় যোগদান করিয়া যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, উপাসনার পরেই তিনি আমার কাছে আসিয়া সে কথা বলিয়াছিলেন। তাহা হইলেও এই টুকুতেই আমরা খুসী হইতে পারি না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু মুসলমানের বিবাদ দেখিয়া আমাদের মন ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে আমাদের কৃতকার্য্য না হইবার কারণ কি? আমার ত মনে হয়, ভারতবর্ষে ভাল করিয়া শিক্ষার বিস্তার হয় নাই; আমাদের মধ্যে চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী লোকের সংখ্যা বড়ই অল্প। এ দেশে যাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি বাহিরের স্থূলবস্তু হইতে ভিতরের গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে প্রবেশ করে না। এই জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মধারণা উজ্জ্বল নহে। ধর্ম্মধারণা উজ্জ্বল নহে বলিয়াই তাঁহারা বাহিরের অতি তুচ্ছ মতামত ও অসার অনুষ্ঠানকেই প্রকৃত ধর্ম্ম মনে করিয়া বিবাদের সৃষ্টি করেন। তাহাতেই যত মারামারি ও রক্তপাত। আমার মনে হয়, ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এই প্রমাণই পাওয়া যায় যে, অনেক জায়গায় ধর্ম্মের বাহিরের বিষয় লইয়াই এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের বিবাদ হইয়াছে। নচেৎ যোগ, ভক্তি, প্রেম, পুণ্য ও পরসেবা প্রভৃতি প্রকৃত আধ্যাত্মিক ব্যাপার লইয়া হয় ত কখনই তেমন বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই। হইবার কথাও ত নয়। কারণ, ঐ সকল আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বরের শক্তিই কার্য্য করিতেছে। আর যে সকল তুচ্ছ মতামত ও বাহিরের অসার অনুষ্ঠান লইয়া বিবাদ করি, সেই বিবাদের

মধ্যে যতই ঈশ্বরের নামের ধ্বজা উঁচু করিয়া তুলি না কেন, প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদের মানবীয় ভ্রান্তবুদ্ধি ও বিদ্বেষপ্রসূত ব্যাপার মাত্র। এই জন্য জ্ঞানের অত্যন্ত উন্নতির সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকলের দৃষ্টি অন্তর্মুখীন ও ধর্ম্মধারণা উজ্জ্বল না হইলে আর মিলনের আশা নাই। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানবান্ হিন্দু এবং মুসলমান প্রকাশ্য সভাতেই বলিয়া থাকেন, মহাত্মা রামমোহন রায় যে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আদর্শ গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে মিলন হওয়া সম্ভব।

কাজে যাহাই হউক না কেন, ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া যে ধর্ম্মের বিচিত্র ভাব সকল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেজন্য ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের করুণায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া উপাসনার যে পূর্ণাঙ্গীন আদর্শ ও গভীর আধ্যাত্মিক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা চিন্তা করিলে আপনা আপনি কৃতজ্ঞতায় মস্তক দয়াময়ের চরণে নত হইয়া পড়ে। আজ পর্য্যন্ত জগতের উন্নত ধর্ম্মসম্প্রদায়-সকলের মধ্যে যত প্রকার সাধনের উচ্চ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমরা ব্রাহ্মসমাজের সাধনার ভিতর সেই সকল ভাবেরই সুমিষ্ট স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমরা উৎসবের বিশেষ বিশেষ দিনে, অথবা সমবেত উপাসনায় কোন কোন শুভমুহূর্ত্তে ভক্ত-সঙ্গে বসিয়া যে আত্মার গূঢ়তম প্রদেশে আমাদের চিরবাঞ্ছিত দেবতার একটুকু স্পর্শ অনুভব করি এবং সেই সময়ে হৃদয়ে যে একটি প্রেম ও পবিত্র ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, প্রাণ আলোকে ও পুলকে পূর্ণ হইয়া যায়; সেই কথা স্মরণ করিয়া কি আমরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারি? যখন কোন ভক্ত ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে পারিবারিক উপসনায় মেয়েরা মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গান করেন, গৃহকর্ত্তা স্ত্রীপুত্র পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে লইয়া মধুর উপাসনায় গৃহখানিকে মধুময় করিয়া তোলেন, তখন স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের যে একটি আশীর্ব্বাদ নামিয়া আসে, তাহার তুলনা কোথায়? তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের যে সমস্ত সাধকেরা নির্জ্জনে গিয়া ধ্যানস্থ হইয়া অসীম সুন্দরের মহাসত্তায় তন্ময় হইয়া যান, তাঁহাদের জীবন যে কিরূপ সার্থক বলিয়া মনে হয়, তাহাই কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়?

এই মন্দিরের উপাসনায় আজ যে সকল পুরুষ ও নারী মিলিত হইয়াছি, আমরা অনেকেই কি বলিতে পারি না যে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় কতদিন দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে বল, সংগ্রামের মধ্যে শক্তি, বিপদের মধ্যে ধৈর্য্য এবং রোগ ও শোকের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি? এই মন্দিরেরই একজন সত্তর বৎসর বয়সের উপাসক আমাকে বলিয়াছেন, "অমৃতবাবু, বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত দুইটি পুত্রের মৃত্যু হইল, গৃহে দুই বিধবা পুত্রবধূ পড়িয়া রহিল, যদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমি যে পাগল হইয়া যাইতাম; এই উপাসনাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে।" আমার নিজের মনই এক এক সময় বলিয়া উঠে, "হে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা, তুমি আমার সহায় না হইলে আমি কিরূপে রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতাম?" কত পুরুষ ও নারী যে এই উপাসনাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মর্ম্মস্থানের গোপন মর্ম্মবেদনা দেবাদিদেবের কাছে নিবেদন করিতেছে এবং প্রাণ জুড়াইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে?

এই উপাসনাকে আমাদের অপূর্ব্ব সঙ্গীতগুলি যে কি জীবন্ত, কি মধুর, কি চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে, তাহা কে না জানে? কতলোক যে ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া শক্তিলাভ করেন, শোকে সান্ত্বনা ও দুঃখের মধ্যেও আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহা কে বলিয়া দিবে? কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, এখন সকলের গৃহেই অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতের সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। যথার্থই বিস্তর সঙ্গীত বিষয়-বৈচিত্র্যে, ভাষার লালিত্যে, রাগরাগিণীর মধুরতায় এবং আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতায় স্বর্গীয় সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ দেশের নরনারীকে শুধু যদি এই সঙ্গীত-গুলি দান করিত, তাহা হইলে চিরস্মরণীয় হইতে পারিত। অতএব আমরা যে উপাসনার আদর্শ ও সঙ্গীতগুলি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণা লাভ করিয়াছি, তাহা আজ মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিব।

ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের যে সকল দান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা এই রকম করিয়া বলিতে গেলে কথা ফুরাইবে না। তাই আমি আর বেশী কিছুই বলিব না। বলিবার প্রয়োজনই বা কি? এ সকল পুরাতন কথা কেই বা না জানে? আমি শুধু ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিবার জন্যই এই পুরাতন কথার উল্লেখ করিলাম।

এখন আমাদের সংকল্প করা আবশ্যক যে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া, ধর্ম্মের ও সাধনের যে সকল উচ্চ ও মহৎ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছি, তদনুসারে আমাদের জীবন গঠন করিব। উহা আমাদের জীবনে যদি আকার প্রাপ্ত হয়, তবেই দেশের লোক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে। নচেৎ আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব যদি উৎসবের দিনে স্মরণ করিবার বিষয় হইয়াই থাকে, তাহা হইলে যতই প্রচারক নিযুক্ত করিয়া উহা প্রচার করি না কেন, অথবা কাগজপত্রে ঐ সকল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখি না কেন, দেশের অতি অল্পলোকই উহা গ্রহণ করিবে।

পরলোকগতা পুণ্যপ্রভা ঘোষ

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল, আমাদের জীবনে একটী স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। সে দিনও এমনি করিয়া উষার মোহন আলো নূতন নূতন বর্ণচ্ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজিকার মত সে দিনও পাখীর কূজনে এমনই সকালে বিশ্ব-বাসী জাগরিত হইয়াছিল, এমনি করিয়া সেদিনও প্রভাত-তপন তাহার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কিরণরাশি বিকীরণ করিতে করিতে পূবের আকাশে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সেদিনের সেই প্রেমময়ী পুণ্যময়ী, স্নেহময়ী মা আমাদের আজ কোথায়? সে দিনও যে প্রাণ আমাদের সমস্ত গৃহ পূর্ণ করিয়া, আমাদের সমস্ত সংসার সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া বর্ত্তমান ছিল, সে প্রাণ আজ কোথায়?

১২৯২ বঙ্গাব্দে, ১৯শে বৈশাখ তারিখে, ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিটে, তাঁহার মাতুল স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর গৃহ "আনন্দ

শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান প্রশান্তকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক পঠিত

আশ্রমে", আমাদের মাতৃদেবী জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুরের অন্তর্গত উলপুরের বিখ্যাত জমীদার রায়চৌধুরী বংশে তাঁহার মাতা বিরজাসুন্দরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরের মুখুটীবংশে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। দাদামহাশয় ভগবানচন্দ্র তাঁহাদের বংশে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্ব স্বত্ব ত্যাগ করিয়া ঢাকায় চলিয়া যান এবং পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য গ্রহণ করেন। কার্য্যোপলক্ষ্যে তাঁহাকে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই ঘুরিতে হইয়াছে। পিতার সহিত আমাদের মাতৃদেবীও ৭ বৎসর কাল বাঙ্গালার নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। সেই সময়ে এই সকল ছোট ছোট জায়গায় পড়াশুনা করিবার সুব্যবস্থা ছিল না, "প্রাইমারী" পড়িয়াই ক্ষান্ত হইতে হইত। ১২৯৯ সালে ৭ বৎসর বয়সে কুচবিহার হইতে "প্রাইমারী" পাশ করিলে দেবী বাবু আদর করিয়া আপন ভাগিনেয়ীকে নিজের কাছে কলিকাতা নগরীতে লইয়া আসিলেন এবং সেই সঙ্গে "বেথুন স্কুলে" ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তখন হইতে বরাবর মা কলিকাতাতেই থাকিতেন, ছুটীতে কেবল মাস দুয়েকের জন্য মাত্র পিতার নিকটে ঘুরিয়া আসিতেন।

লেখা পড়ায় মা আমাদের বরাবরই ভাল ছিলেন। "প্রাইমারী" পরীক্ষায় সমস্ত কুচবিহার রাজ্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মা কুচবিহারে একটা মহা সোরগোলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কুচবিহারের মহারাণী মাতৃদেবীর সমস্ত পাঠের ব্যয়ভার বহন করিয়া "বেথুনে" পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দাদামহাশয় সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। দেবীবাবুর গৃহে থাকিয়াই তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। সেখান হইতেই এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি এফ এ পড়েন; কিন্তু পরীক্ষার দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হওয়াতে তাঁহার এফ্ এ পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার তাঁহার একটা বেশ ক্ষমতা ছিল। তিনি কবিতা রচনা করিয়াছেন অনেক—তাঁহার নিকট হইতেই আমার ভগিনী নীলিমা বোধ হয় তাহার প্রাণমাতানো ভাষার ছটা পাইয়াছিল। মার দুই চারিটী কবিতা "নব্য-ভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল, মামা দেবীবাবুর চেষ্টায়; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সকল কবিতাই প্রায় বিবাহের পূর্ব্বে লিখিত। বিবাহের পরে তিনি একেবারে লেখার চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সংসারের সকল কার্য্য একাকী করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে তিনি আর লেখার চেষ্টা করেন নাই। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার বেশ দখল ছিল—সংস্কৃতে অভিনয়ও তিনি বেশ করিতে পারিতেন।

শৈশব হইতেই মাতৃদেবী বেশ "আমুদে" ও "মিশুকে" ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আমাদের পরিচয় বোধ হয় তাঁহার দিক্ দিয়াই বেশী। মাসীমা বলিতেন যে, মা তোদের যে কয়দিন ছুটীতে বাড়ীতে যাইতেন, সে কয়দিন এক মহা উৎসবের ব্যাপার ছিল। হাসি, গল্প, ছোট অভিনয়—এক এক দিন এক এক আমোদের ব্যাপার সৃষ্টি করিত। ছোট ভাইবোনগুলিকে লইয়া মহা আনন্দে হু হু শব্দে ছুটীর দিন কয়টা কাটিয়া যাইত; দিদি চলিয়া গেলে ভাইবোনগুলি আবার বৎসরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত 'দিদি আসিলে, আমোদ হইবে' বলিয়া। ছাত্রীজীবনে স্কুলে কলেজে সকলের সঙ্গেই তাঁহার বেশ একটা মেলামেশা ভাব ছিল, সকলেই তাঁহাকে বেশ জানিতেন ও ভালবাসিতেন। তবে বিশেষ করিয়া তিনি স্বর্গীয়া শান্তিলতা দেবী (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা) ও প্রেমলতিকা হালদারের সঙ্গেই নিগূঢ় ভালবাসা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মাসীমা লিখিয়াছেন,

"আমার বেশ মনে আছে যে 'প্রেম, পুণ্য, শান্তি' এই তিন বন্ধুর নাম বিশেষ ভাবেই সকলের মুখে উচ্চারিত হইত। কার্য্যবিপর্য্যয়ে এই নিগূঢ় বন্ধু তিনটির প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিবার সুযোগ হয় নাই। এক এক জন এক এক দিকে চলিয়া গেলেন। তারপরে জীবনের প্রারম্ভেই শান্তিদেবী পরলোকে গমন করেন। বন্ধুবিয়োগে তিনি যে কতখানি কাতর হন, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহাদের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল।

"সমাজপাড়ায়" বাস ও "আনন্দ আশ্রমে" ব্রাহ্মসমাজের বহু লোকের সমাগম হওয়াতে তাঁহার সহিত বহুলোকের পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল। শুধু পরিচয় কেন, অনেকেই তাঁহার সহাস্য বদন ও কর্ম্মজীবন দেখিয়া আপন কন্যার ন্যায় তাঁহাকে স্নেহ করিয়াছেন। মাঘোৎসবের সময় "আনন্দ আশ্রমে" ও "আনন্দ বাজারে" আগত যাবতীয় আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও অতিথি অভ্যাগত জনকে প্রাণপণ যত্নে তিনি সেবা করিয়াছেন—কিসে কাহার সুবিধা সে বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল, সকলেই আপন সন্তানের মত তাঁহাকে আদেশ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না।

তার পরে, বিবাহিত জীবনের কথা। ১৭ বৎসরে বিবাহ হয়। গত মাঘ মাসে তাঁহার বিবাহের ২৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। কৈশোরের কত আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া তিনি প্রথম সংসারে প্রবেশ করিলেন—'আদর্শ জীবন যাপন করিব', 'আদর্শ সংসার স্থাপন করিব'—সে সকল আশা, সে সকল কল্পনা কি তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে? আমরা যে এখনও তাঁহার আদর্শের বহু দূরে, এখনও যে আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই! সব পূর্ণ হইতে না হইতেই তুমি চলিয়া গেলে মা?

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ২১শে মাঘ বিবাহবাসরে তিনি যে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, তোমার মঙ্গলসাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নশীলা থাকিব, এবং ধর্ম্মে, অর্থে ও ভোগে তোমাকে অতিক্রম করিব না"—সে প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। যে দিন মা শ্বশুরালয়ে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে দিন বোধ হয় তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে, তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমারি জীবনমাঝে।" তাই আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আপনার আমোদ প্রমোদ, কৈশোরের সুখস্বপ্ন সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া রিক্ত হইয়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার থেকে বাবা যখন

পৃথক হইলেন মাকে লইয়া উনিশ বৎসর পূর্ব্বে, তখন আমি নীলিমা ও মায়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মায়ার তখন বয়স ৭।৮ মাস। তখন হইতে মা আমাদের একলা হাতে সংসারের সকল কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। ইহার উপরে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার ভারও তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবা সারাদিন আপিসেই থাকিতেন, আমাদের তত্ত্বাবধান মা করিতেন। মার কাছেই আমাদের বড় তিন ভাইবোনের হাতে খড়ি হয়। সপ্তমশ্রেণীতে প্রথম আমি স্কুলে ভর্ত্তি হই। ততদিন পর্য্যন্ত এবং তাহারও কিছুদিন পরে পর্য্যন্ত অঙ্ক ও বাঙ্গালা আমি 'মার' কাছেই পড়িয়াছি—ইংরাজীটা কেবল বাবা পড়াইতেন। সকল কাজের মধ্যেও মা আমাদের লইয়া পড়াইতে বসিতেন। মার কাছেই পড়াশুনায় যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা শিক্ষা পাইয়াছি।

দুই মাস পূর্ব্বেও আমরা ভাইবোনেরা সাত জন ছিলাম, এখন ছয় জন। আমরা কেহই কখনও কোন অভাব বোধ করি নাই। মা বাবা চারিদিক্ দিয়া আমাদের ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইতে না হইতে, অভাব বোধ করিতে না করিতে, আমাদের অভাব পূর্ণ হইয়া যাইত। কলিকাতায় বাস করিয়া এতগুলি ভাইবোনকে স্কুলে কলেজে পড়াইয়া, ভাল আহার দিয়া, ভাল বাড়ীতে রাখিয়া মানুষ করা সহজ হইয়াছে বাবার পক্ষে কেবল মার অক্লান্ত পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার ফলে। দেড় বৎসর আগেও গৃহে ঝি ভিন্ন অন্য কোন লোক ছিল না।

পরে ক্রমশঃ মার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়াতে ঝি চাকর বামুন সকলই রাখিতে হইয়াছে। এক বৎসর আগে পর্য্যন্ত মা নিজে সকল হিসাব দেখিয়াছেন। সে সময়ের চাইতে এখন সংসারের ব্যয় বাড়িয়াছে দ্বিগুণ; কারণ, মার মত মিতব্যয়ী হইয়া ব্যয় করার ক্ষমতা সকলের নাই।

সংসারের জন্য তিল তিল করিয়া তিনি নিজের দেহ পাত করিয়াছেন। কৈশোরের নিটোল স্বাস্থ্য, অনুপম দেহলাবণ্য সমস্তই তিল তিল করিয়া তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। নিজের প্রতি তাঁহার একেবারে দৃষ্টি ছিল না—আপনার কোন যত্নই তিনি লইতেন না। সংসারে তিনিই ছিলেন গৃহিণী—বলিবার, কহিবার কেহই ছিলেন না। দুরন্ত পরিশ্রমের পরে দু'বেলা দু'থাল ভাত শুধু লবণ দিয়া খাইতে আমরা দেখিয়াছি। তরি, তরকারী, মাছ, ঘী সবই থাকিত, কিন্তু সে সকল তুলিয়া রাখিতেন পুত্রকন্যাদের জন্য, স্বামীর জন্য, নিজে সে সব বড় একটা স্পর্শ করিতেন না। ইহারই ফলে অকালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল—এবং সংসারকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। মামার বাড়ী অনাথ বালকবালিকা লালিত পালিত হইত। তাহাদের সহিত তিনিও একই ভাবে মানুষ হইয়া আসিয়াছেন—মোটা ভাত কাপড়ে বরাবরই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আলস্য ও বিলাসিতা এ সংসারে স্থান পায় নাই, সে শুধু মায়ের জন্যই। পরিধানে তাঁহার সর্ব্বদা সাদা সূতির কাপড় থাকিত; হাতে কখনও চুরি বা বালার অধিক কিছু পরেন নাই; অন্য কোনও অলঙ্কার তিনি কখনও ব্যবহার করিতেন না। সাজসজ্জার দিকে কখনও তাঁহার দৃষ্টি ছিল না—অতি সাধারণ ভাবেই তিনি বেশভূষা করিতেন। আপনার জন্য আমোদ প্রমোদ আহ্লাদে তাঁহাকে কখনও যাইতে দেখি নাই; যখনই কোথাও গিয়াছেন আমাদের সকলকে লইয়া গিয়াছেন, আমরা যদি যাইতে পারি নাই, তিনিও যাইতেন না। এমনি ভাবে সংসারে তিনি তাঁহার দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন।

এক দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রখর ছিল। ছেলেমেয়েগুলিকে 'মানুষ' করিয়া রাখিয়া যাইবার তিনি একান্ত কামনা করিতেন। রোমান্ ইতিহাসের কর্ণেলিয়ার মার মত তিনিও নিরলঙ্কার, নিরাভরণ থাকিয়া সন্তানদের দেখাইয়া, সন্তানদের গর্ব্বে গর্ব্ব অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন। নীলিমা যখন "ইণ্টারমিডিয়েট" পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিল, মার মনে তখন কি আনন্দ! কত উৎসাহে তিনি তাঁহার প্রিয় নীলিমাকে বি এ পড়িতে দিলেন। সেই নীলিমাই যখন সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার সকল যত্ন, সকল সেবা, সকল শ্রম তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল, অভিমানিনী মা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারই পূর্ব্বে তাঁহারই সন্তান চলিয়া গেল—মুখে কিছু বলিলেন না, নীরবে সমস্ত সহ্য করিলেন, কিন্তু অন্তরে যে অনলশিখা প্রধূমিত হইয়াছিল, ধীরে ধীরে শরীরের উপরে সে তাহার প্রকোপ দেখাইতে লাগিল। গত জুন মাসে পুরী হইতে ফিরিয়া তিনি আর বড় শয্যাত্যাগ করেন নাই। নীলিমার শ্রাদ্ধ-বাসরের সপ্তাহকাল পরেই তাঁহার ভীষণ diarrhoea দেখা দিল, রোগে শোকে জর্জ্জরিত সেই ক্ষীণ দেহ আর যুঝিতে পারিল না, শয্যার সহিত দেহ মিশাইয়া গেল। তখনও মা জানিতেন তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় নাই, খোকন্ মাত্র ৪ বৎসরের, রমা ৮ বৎসরের, আমার M. B. পাশ করার আর ৮ মাস বাকী; তাই তিনি তখনও বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন—আমাকে ডাকিয়া অতি করুণ, অতি কাতর স্বরে তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রশান্ত, diarrhoea টা কোন রকমে বন্ধ কর, না হইলে আমি যে আর বাঁচি না।" চেষ্টার ত্রুটি বাবা রাখেন নাই। কিন্তু উপর থেকে যে মহানের ডাক্ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, মানুষের পাঁজী-পুঁথী সব যে সেখানে ব্যর্থ হইয়া যায়। এলোপ্যাথী, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথী সকলই হইল; কিন্তু প্রাণ যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। শেষ সপ্তাহে কেবল injection এর উপর নির্ভর করিয়া তিনি জীবিত ছিলেন। তারপর—তারপরে সব শেষ। ৬ই নভেম্বর রবিবার diarrhoea এর উপর heart এর acute attack হয়, পরের রবিবার ১৩ই নভেম্বর বিকালে তাঁহার নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল। বেলা ৪। ঘটিকায় বাবার হাতে হাত রাখিয়া, আমাদের পাশে লইয়া, মা আমাদের চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ছেলেবেলায় মাকে আমি বড় ভয় করিতাম। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত ভয়টা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। বড় হইবার পরে তিনি কখনও কোন বিষয়ে আমাকে অমত করিতেন না—আমার বিচারবুদ্ধির উপর সব ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সময়ে সময়ে মনে হইত এতটা যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ না পাইলেই ভাল ছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মা এত-

গভীরভাবে ভালবাসিতেন এবং তাহাদের অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় এতটা ব্যস্ত হইতেন যে, আমাদের বাড়ী ফিরিতে দেরী হইলে মাকে দেখিতাম শুষ্ক হইয়া জানালার ধারে আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। ইদানীং অসুখে আর অতটা পারিতেন না, কিন্তু উদ্বেগ তো ঘুচিত না—আমাদের বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত তিনি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেন না। বড় হইবার পরে, মা ছিলেন আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু; এমন কোন গোপন কথা ছিল না, যাহা মাকে না বলিয়াছি—কলেজে বা বন্ধুমহলে এমন কোন কথা হইত না যাহা মার কাছে গল্প না করিয়াছি! ভাবিয়াছিলাম মার অনাবিল স্নেহ প্রীতি ভালবাসা আরও অনেকদিন ভোগ করিবার সুযোগ পাইব; কিন্তু বিধির অমোঘ বিধান মানুষের অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা নাই। অকালে মাতৃহারা হইয়া আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ হারাইয়াছি; এখন শুধু স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট আছে। তাহাই এখন পাথেয়, তাহাই বুকে ধরিয়া সংসারের বন্ধুর পথ অতিবাহিত করিতে হইবে। তাঁহার অধ্যবসায়, মিতাচার, আত্মত্যাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, পবিত্রতা ও সরল বিশ্বাসই আজ আমাদের দৃষ্টান্ত। তাঁহার স্বরচিত কবিতাবলীতে এই সকল ভাবের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

অন্যের সুখের লাগি' নিজ সুখ যদি
নাহি পারি উপেক্ষিতে, জীবনে কি ফল?
সেবাধর্ম্ম পালিবারে নাহি পারি যদি,
মানব-জনম তবে হইবে বিফল।"

আর একস্থানে লিখিতেছেন,

"আমিত্বের ভাব যেন জাগে না পরাণে,
জীবনের দিনগুলি কাটে না বিফলে!

জগতের তরে যেন হয় গো যাপিত
জীবনের প্রতিক্ষণ, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত।

ক্ষুদ্র এ হৃদয় মম পূর্ণ কর প্রেমে,
সফল হই গো যেন কর্ত্তব্যসাধনে।"

তাঁহার আর একটা ক্ষুদ্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়াই আজ এই প্রবন্ধ শেষ করিব—

আমি চাই ফুল্ল ফুলটীর মত
পবিত্র সুরভি হ'তে,
আমি চাই শুধু আপনা ভুলিয়া
সুবাস বিলা'য়ে দিতে।

চাই নিভৃতে ফুটিয়া, সাধনা সাধিয়া,
নীরবে ঝরিয়া যেতে;
চাহি কুমুদের মত প্রতিদান ভু'লে,
প্রেমে আত্মহারা হ'তে।

তটিনীর মত স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া,
অনন্তে মিশিতে চাই,
নীল নভোস্থলে, ধ্রুবতারা মত,
স্থিরলক্ষ্য হ'য়ে রই।

জ্যোছনার মত স্নিগ্ধ নির্ম্মল,
সমুজ্জ্বল হ'তে যায় সাধ;
ভু'লে যেতে চাই জগতের তুচ্ছ
অভিমান, বাদ বিসম্বাদ।

জুড়াইতে চাই তপ্ত ধরাবক্ষ
সলিলের শৈত্য ল'য়ে
অন্যের মালিন্য ধুয়ে দিতে সাধ,
নিজ অশ্রুধারা দিয়ে।

আকাশের মত প্রশস্ত, প্রশান্ত,
যেন এ হৃদয় হয়,
সত্য, ধর্ম্ম, প্রেম, তিতিক্ষা, বিশ্বাসে
যেন সদা উজ্জ্বলময়।

তোমারি কাজেতে, ওহে জগদীশ,
আপনা সঁপিতে চাই;
আমি আর সব ভুলি, শুধু তুমি নাথ,
বিরাজ এ হৃদি-ঠাঁই।"

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রাহ্মমহিলাদের কর্ত্তব্য

(ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে মহিলাসম্মিলনে পঠিত।)

(১)

আজ ভগ্নীগণের সাদর আহ্বানে এই সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছি। আমার প্রাণে অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচ সত্ত্বেও আপনাদের সঙ্গে মিলিবার ও প্রাণ খুলিয়া কয়েকটি কথা বলিবার সুযোগ হারাইতে ইচ্ছা হইল না। আপনারা যে আমাকে আপনাদের মধ্যে আনিয়া বসাইয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদের কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ যে বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য। আজ সাধনার বিষয় সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট বলিতে চাই। কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কথা তাঁহারা সুন্দর ভাবে অনেক বলিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা-দেবতার চরণে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা-ভরে অবনত হই। যাঁর আশীর্ব্বাদে আমরা এই ধর্ম্মধনে ধনী হইয়াছি, তিনি যে আমাদের সকলের একমাত্র পিতা মাতা, বন্ধু নেতা, জীবনের ধ্রুবতারা, এ বিশ্বাস না করিলে ব্রাহ্মসমাজে আসাই বৃথা। সেই বিশ্বজননীর উপর যদি আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি, তবে আর ভয় নাই,—জীবনের সকল অস্থিরত্ব চলিয়া গিয়া কর্ত্তব্যের প্রশস্ত পথ নয়নগোচর হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ আমাদের নিকটে অনেক দাওয়া দাবী করিতেছেন। আমরা যে তাঁহাদের অল্প একটু শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইয়া দূরে রাখিয়া দিব, তাহা হইবে না। তাই এই পুণ্য মাসে, ভাদ্রোৎসবের সময়, আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহনের সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছি, তাঁর আদেশবাণী প্রাণস্পর্শ করিতেছে। তাঁর প্রতি আমরা কি সম্যক্ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছি? ধর্ম্মপিতা যোগনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ আমাদের কি বলিতেছেন? জীবনে যোগ ভক্তি সাধন করিয়া কি ধন্য হইতে পারিয়াছি? তাঁদের অতি আদরের যোগ্য ও প্রিয় সন্তান ব্রহ্মানন্দ আজ মধুর স্বরে কি বলিতেছেন? প্রাণের ভাই ভগ্নীসকলকে অকৃত্রিম স্নেহ-ডোরে কি বাঁধিতে পারিয়াছি? যে নারী জাতির কল্যাণের জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁর প্রতি আমরা কি কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি? বিফলতার দিক ভাবিতে গেলে, মনে অনেক রূপই নিরাশা আসে। কিন্তু আজ একবার সফলতা ও আশার দিকে তাকাইয়া দেখি, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে কত শুষ্ক প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়াছে, কত মৃত প্রাণ নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। সত্য সত্যই আমাদের মত সৌভাগ্যবতী কে আছে? এই ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা কত ধনে ধনী হইয়াছি, কত সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে অবাক হইতে হয়। ব্রাহ্মিকাদিগের কর্ত্তব্যরাশি অনেক। আমরা যদি সাধারণ লোকের মত জীবন যাপন করি, তবে বিধাতার চরণে বিশেষভাবে অপরাধী হইব। প্রথমে ব্রাহ্মিকাগণ নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন যাহাতে উপাসনা করেন, ইহা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। উপাসনা ব্যতীত ধর্ম্মজীবন গঠিত হওয়া অসম্ভব। যে উপাসনা হইতেই

আমরা প্রতিদিন পরম জননীর আদেশ লাভ করিব, তাঁর শক্তি ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া জীবনের শত কর্ত্তব্যরাশি সাধন করিব, তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মিত রূপে সাধন না করি, তবে যে পদে পদে পদস্খলিত হইব। জীবন ধর্ম্মে গঠিত না হইলে কর্ত্তব্যরাশি কিরূপে বুঝিতে পারিব? পরে, তাঁর সন্তানদের উপর প্রাণের বিশ্বাস ও ভক্তি অর্পণ করা প্রত্যেক ব্রাহ্মিকার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অল্প শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে দূরে রাখিলে চলিবে না, তাঁদের সঙ্গে প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে হইবে। যুগে যুগে তাঁরা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য এ পৃথিবীতে বিধাতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। যাঁহারা সরলা ব্রাহ্মিকা, তাঁহারা ইঁহাদের প্রত্যেকের কাছে ঋণ স্বীকার করিবেন। পরে, ভাই ভগ্নীর প্রতি প্রীতি। আমরা যদি শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই প্রীতি সাধন করি, তবে ঠিক মত আমাদের সাধনা হইবে না। এক পিতার সন্তান বলিয়া সকলকে ভালবাসিতে হইবে। এই তিনটি কর্ত্তব্য আমাদের জীবনের সাধনায় বিশেষ সহায়তা করিবে। নিয়মিত ভগবানের পূজা আরাধনা, তাঁর সুপুত্রদিগকে হৃদয়ের ভক্তি দান, তৃতীয় ভাই ভগ্নীদিগকে প্রাণের আত্মীয় জ্ঞানে প্রীতি।

আপনাদিগের নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে আমি দু একটি কথা বলিয়া শেষ করিতে চাই। সভানেত্রীর আসন দিয়া আমাকে আপনারা যে সম্মান দেখাইয়াছেন, তার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আছি। আপনাদের সহিত যাহাতে প্রীতিবন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারি, এই আমার প্রার্থনা। আজ সমগ্র পৃথিবীতে একটা মিলনের সাড়া পড়িয়াছে। সে মিলনমন্দির কোথায়, যেখানে শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা একপ্রাণে সেই আনন্দময়ীর পূজা করিতে পারি? আমি যাঁর কন্যা হইয়া নিজেকে কত সৌভাগ্যবতী ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, সেই পুণ্যশ্লোক পিতৃদেব ব্রহ্মানন্দের আশীর্ব্বাদ লইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়াছি। মহামিলন ও সমন্বয়ের বার্ত্তা লইয়া তিনি আদিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাঁর আশীর্ব্বাদ ও প্রাণগত চেষ্টায় আজ প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা কত উচ্চ অধিকারে অধিকারী হইয়াছেন, তাহা যেন বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখি। ব্রহ্মানন্দ দেব আজ পরলোকধাম হ'তেও আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ের প্রেম শতধা হইয়া সকল অপ্রেম অমিলন দূর করিতে চাহিতেছে। আমরা আর কতদিন তাহাতে বাধা দিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিব? শতাব্দীর অন্তরাল হ'তে ধর্ম্মপিতামহের বাণীও আজ আসিতেছে। সে মহামিলনের কথা না শুনিয়া আমরা কতদিন আর বধির হইয়া থাকিব? যে বিচ্ছেদ অমিলন অপ্রেম ব্রাহ্মসমাজের কত অকল্যাণ করিতেছে, তাহা সেই প্রেমময়ের প্রেমস্পর্শে দূরে চলিয়া যাউক। আমরা পরস্পরে মিলিত হইয়া সেই মহামিলন সাধন করি। আমরা কাহাকেও আর দূরে রাখিব না, সকলে সকলকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিব। মহামিলনমন্দিরে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মা আনন্দময়ীর পূজা করিব। প্রেমময়ী জননী আমাদিগকে বিশেষভাবে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীমতী মণিকা মহলানবীশ।

( )

ভগিনীগণ! আমরা আজ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য মিলিত হইয়াছি।

এ বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করি, ততই মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের কি শেষ আছে? যাহার কাছে আমরা যত ঋণী, তাহার কাছে কর্ত্তব্য ও সেজন্য দায়িত্বও আমাদের তত বেশী। ব্রাহ্মসমাজ নারীদের জন্য যাহা করিয়াছেন, অতীতের নারীসমাজের সহিত বর্ত্তমান নারীসমাজের তুলনা করিলেই, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ও উন্মুক্ত আকাশে বিচরণকারী মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেই, ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু আমরা ব্রাহ্মসমাজের এই অযাচিত দান পাইয়া, প্রতিদানে কি করিতেছি? নিজেদের সুখ সুবিধা ও আরাম, ইহাই কি আমাদের সকল কর্ম্মের লক্ষ্য নয়? তবুও সময় সময় আমাদের প্রাণে কেমন একটা বেদনা উপস্থিত হয়, এবং মনে হয় আমাদের কি ব্রাহ্মসমাজের জন্য কিছু করণীয় নাই? এ বিষয়ে দায়িত্ব-বোধ ও কর্ত্তব্য সকলের এক হওয়া সম্ভবপর নয়। আমি এ বিষয়ে যাহা চিন্তা করিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা সন্তানের জননী, তাঁহাদের সঙ্গেই আমার এ চিন্তার ঐক্য হইবে আশা করি।

পরিবারের সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। সেই জন্য আমাদের কর্ত্তব্য বহুমুখী হইলেও, পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন করিয়া আদর্শ পরিবার গঠন করিতে পারিলেই, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও কর্ত্তব্য পালন করা হয়, এবং ব্রাহ্মসমাজকেও শক্তিশালী করিতে পারি। কিরূপে আদর্শ পরিবার গঠন হইতে পারে, সে বিষয়ে যদিও প্রত্যেকের বিভিন্ন আদর্শ থাকিতে পারে, তবুও কোন কোন বিষয়ে সাধারণ ঐক্য থাকিবেই। আমি বিশেষ-ভাবে একটা বিষয়ের প্রতিই সকলের চিন্তা আকর্ষণ করিতেছি, এবং এ বিষয়ে সকলেরই এক মত হইবার আশা করি,—যাহা সকল জননীর বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়। আজ কাল সকলের মুখে শুনিতে পাই, ব্রাহ্মসমাজের আর সেদিন নাই, ব্রাহ্মসমাজ আদর্শ চ্যুত হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আর কেহ সেই শ্রদ্ধা রাখিতে পারিতেছেন না। ইহাতে কি মনে হয় না, ব্রাহ্মপরিবারগুলিই আদর্শ চ্যুত হইয়াছে? অতীতের ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ, বিদ্যা ধন জন পদ সকল বিষয়েই উন্নত, কিন্তু তথাপি আমরা সকলের শ্রদ্ধা হারাইতেছি কেন? অতীতের সেই ত্যাগ, সেই সত্যনিষ্ঠা, সেই নির্ভিকতা, সেই নিস্বার্থপরতা হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমরা আমাদের সন্তানদিগকেও সেই শিক্ষা দিতে পারিতেছি না। এজন্য আমরা জননীরা কি অনেকাংশে দায়ী নই? আমরা কি পরিবারে ধর্ম্ম, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ সন্তানদিগকে দেখাইতে পারিতেছি? যখন দেখিতে পাই, ব্রাহ্ম-সন্তানেরা মিথ্যা কথা বলিতে লজ্জা বোধ করে না, দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা নাই, পরের জন্য ভাবিতে বা ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত, নিজের সুখ সুবিধা লইয়াই বিব্রত, তখন কি মনে হয় না, আমরা জননীরাই সেজন্য দায়ী? আমরা যদি উচ্চ আদর্শজীবন দেখাইয়া সন্তানদিগকে শরীর ও মনে উন্নত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের আজ এ দুর্দশা হইত না। তাই মনে হয়, দেহের কোন অঙ্গ বিকল হইলে যেমন সমস্ত দেহ সেই বেদনা অনুভব করে, আমাদের পরিবারে যে পরিমাণে আমরা আদর্শচ্যুত হইব, সেই পরিমাণে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমাদের চিন্তা ও আলোচনা এই হউক, কিসে আমরা সকল বিষয়ে উন্নত হইব, এবং আমাদের সন্তানদিগকে শরীর ও মনে উন্নত করিতে পারিব। ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবার এই বিশেষ দিনের স্মৃতি-উৎসবে মিলিত হইয়া, এই কথাই স্মরণ হইতেছে যে, আমরা ব্যক্তিগত জীবনে এই উপাসনার মধ্যদিয়া যতই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগস্থাপন করিতে পারিব, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিব, এবং তাঁহার সহিত প্রীতির যোগ স্থাপন করিতে পারিব, ততই আমরা আমাদের মলিনতা ও দুর্ব্বলতা স্পষ্ট দেখিতে ও পরিহার করিতে সমর্থ হইব, এবং তাহার আলোকে জীবনপথে চলা সহজ ও সুখকর হইবে এবং আমাদের সকল কর্ম্ম সহজ ও সরল হইবে।

শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য।

নাম গান।

(সুর—"আহা কি করুণা তোমার, মা ব'লে
যে চিনেছি গো")

আহা কি মধুর নাম, তাপিত হৃদয় জুড়াল'রে ;—
দয়াময় দয়াময় দয়াময় দয়াময়।
দারিদ্র্যদুঃখদহনে পাপ তাপ প্রলোভনে,
(বল) দয়াময় দয়াময় দয়াময় দয়াময়।
রোগে শোকে মনস্তাপে, দুর্দ্দিনে ঘোর বিপাকে,
(বল) দয়াময় দয়াময় দয়াময় দয়াময়।
কি সম্পদে কি বিপদে, কি আনন্দে কি বিষাদে,
(বল) দয়াময় দয়াময় দয়াময় দয়াময়।
কি বিচ্ছেদে, কি মিলনে, কি জনমে, কি মরণে,
(বল) দয়াময় দয়াময় দয়াময় দয়াময়।
কি সজনে কি বিজনে, কি শয়নে কি স্বপনে
(বল) দয়াময় দয়াময় দয়াময় দয়াময়।
শুদ্ধ শান্ত সরল মনে, মিলে সাধু ভক্ত সনে,
(বল) দয়াময়, দয়াময় দয়াময় দয়াময়।
ভক্তিরসে গ'লে গ'লে, ভেসে ভেসে নয়নজলে,
(বল) দয়াময় দয়াময় দয়াময় দয়াময়॥

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

বিভাস—একতালা।
(তোমাতে যখন মজে—সুর)

মধুর ব্রহ্মনাম জীবের প্রাণারাম,
জপ অবিরাম মন-রসনা ;
শয়নে স্বপনে জপ কায়োমনে,
পুরিবে কামনা, ঘুচিবে যাতনা।
নামের গুণে গলে পাষাণ হৃদয়,
পাষণ্ড দানব দেবতুল্য হয়,
মানব জীবন হয় সুধাময়,
ঘোচে পাপ তাপ বিষয়বাসনা!
(নাম) বিপদে সম্পদে জীবের সম্বল,
নিরাশ্রয়-আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল,
ভকতহৃদয়ে প্রেম-পরিমল
শুদ্ধ হয় জীব করিলে সাধনা।
মৃত প্রাণ হয় পুনঃ সঞ্জীবিত,
তৃপ্ত হয় প্রাণ পিয়ে প্রেমামৃত,
অড়ায় জীবন জনমের মত,
জপিতে ও নাম অলস হয়ো না।
(মধুর ব্রহ্মনাম ভুল না ভুল না)

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী অষ্ট নবতিতম মাঘোৎসব নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করিবেন, এরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সকলে উৎসবে যোগদান করিয়া উহাকে সফল করিয়া তোলেন, এই প্রার্থনা:—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ ব্রাহ্মপরিবারে এবং ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসে উপাসনা।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে ঐ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় উদ্বোধন।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে ৭ঘটিকায় উপাসনা, সন্ধ্যা ৬৷০ ঘটিকায় বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় সঙ্গত সভার উৎসব।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৭ঘটিকায় উপাসনা, সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় বক্তৃতা।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা; সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি সভা।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) শনিবার—প্রাতে ৭ঘটিকায় উপাসনা; অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় আলোচনা সভা; সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় বক্তৃতা—ছাত্রসমাজের উৎসব।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) রবিবার—ব্রাহ্ম যুবকগণের উৎসব—প্রাতে ৭ঘটিকায় উপাসনা, ১ ঘটিকায় আলোচনা সভা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় উপাসনা—বরাহনগর শ্রমজীবিগণের উৎসব।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে ব্রাহ্ম মহিলাদের উৎসব-৮ ঘটিকায় উপাসনা; সিটিকলেজগৃহে পুরুষদিগের জন্য উপাসনা। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায়—বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—উপাসকমণ্ডলীর উৎসব—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা; ৪ ঘটিকায় নগর কীর্ত্তন; সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় উপাসনা।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) বুধবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব—প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন, প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা, অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা, ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা, ৪ ঘটিকায় ইংরাজিতে উপাসনা, ৫-৩০ ঘটিকায় কীর্ত্তন, সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় উপাসনা।

১২ মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব, ৭ ঘটিকায় উপাসনা, অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আলোচনা সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় বক্তৃতা।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা; অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আলোচনা; মেরীকার্পেণ্টার হলে ৪ ঘটিকায়—রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব; সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় তত্ত্ববিদ্যাসভার উৎসব।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শনিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা; অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বালকবালিকা-সম্মিলন; সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায়—ইংরাজিতে উপাসনা।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকায় মন্দিরে উপাসনা; উদ্যান সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায়—উপাসনা।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৮ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহ রায়পুর গ্রামে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার চক্রবর্ত্তীর পিতা (বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ১৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য এবং ও পুত্র পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন।

বিগত ২১শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে বাবু শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী অল্প কয়েক দিনের রোগে ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। ত্যাগ ও বিশ্বাসের বলেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন এবং নানা প্রকারে তাহার সেবা করিয়া গিয়াছেন।

বিগত ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের পত্নী সুনীতিবালা এপোপ্লেক্সি রোগে হঠাৎ ৪৪ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে দীর্ঘকাল রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাকের জ্যেষ্ঠপুত্র কিরণকুমার দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৩৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১৩ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অনিলকুমার ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া সুধার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৫ই ডিসেম্বর চুঁচুড়া নগরীতে শ্রীযুক্ত ধ্রুবজ্যোতি সেনের কন্যা কল্যাণীয়া মনীষা ও কাঁথি নিবাসী শ্রীমান শচীন্দ্র-কুমার মাইতির শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা প্রচার বিভাগে ১০৲, সাধনাশ্রমে ৫৲, দাতব্য বিভাগে ৬৲, ও বাণীবন মধ্য ইংরাজী স্কুলে ৫৲, দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

প্রতিকৃতি-উন্মোচন—কয়েক বৎসর হইল বন্ধু-বর্গের চেষ্টাতে পরলোকগত প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানা তৈলচিত্র অঙ্কিত হয়। কিন্তু বাঁধান না হওয়াতে তাহা এতদিন অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই পড়িয়া ছিল। যুবক সমিতির চেষ্টায় তাহা বাঁধান ও পুনরায় রং করান হইয়াছে। বিগত ১১ই ডিসেম্বর ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী গৃহে ডাক্তার পি কে রায় কর্ত্তৃক এই প্রতিকৃতিখানার আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস প্রার্থনা ও যুবক সমিতির সম্পাদক সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও সভাপতি মহাশয় প্রচারক মহাশয়ের জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার দত্ত সভাপতি ও বক্তাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

বিদেশীয় প্রতিনিধির অভ্যর্থনা—বিগত ২০শে ডিসেম্বর যুবক সমিতি বিলাতস্থ সোসাইটি অফ ফ্রেণ্ড্স সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ডাক্তার জে ডবলিউ গ্রেহাম মহোদয়কে এক সান্ধ্য-সমিতিতে অভ্যর্থনা করেন। অনন্তর তিনি ব্রহ্ম-মন্দিরে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির কার্য্য করেন।

সমাধিস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠা—গত ২৫শে ডিসেম্বর ঢাকার পরলোকগত ব্যারিষ্টার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সমাধিস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন। শৈলেশ বাবুর মাতা এই উপলক্ষে তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস নবগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ২৫০০০৲, পচিশ হাজার টাকা, কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৫০০৲, পাঁচশত টাকা, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা, কলিকাতা সাধনাশ্রমে ২৫৲ ঢাকা নববিধান সমাজে ১০৲, অনাথ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ১০৲, অনাথ আশ্রমে ৫৲, উয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ে ৫৲, মত্ত বালিকা বিদ্যালয়ে ৫৲, এবং এতদ্ভিন্ন শৈলেশের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ২০৲, ঢাকা নববিধান সমাজে ৫৲, এবং কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲, টাকা দান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

(সুবর্ণ সাম্বৎসরিক)

১৩৩৫ সনের ২রা জ্যেষ্ঠ (ইংরাজী ১৯২৮, মে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হইবে। এই সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ মাসে স্কুল কলেজ সমূহ গ্রীষ্মাবকাশের নিমিত্ত বন্ধ থাকে। সেই সময় কলিকাতা হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপক প্রভৃতি স্থানান্তরে গমন করেন। সে নিমিত্ত উক্ত সময় উৎসবের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন, যে আগামী ইষ্টারের ছুটির সময় এপ্রিল মাসের ৫ই হইতে ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত উৎসব সম্পন্ন হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে। উৎসবের কয়েক দিন প্রত্যহ মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা, কয়েকদিন উষাকীর্ত্তন, একদিন কলিকাতা মহানগরীতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন, দুইটী বিশেষ বক্তৃতা, দুইদিন ব্রাহ্মসম্মিলনী, একদিন মহিলাদিগের বিশেষ উৎসব, একদিন বালক বালিকাসম্মিলন ও একদিন উদ্যান, সম্মিলন হইবে। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় প্রচারক ও পরিচারকগণ মিলিত হইবেন এবং মফঃস্বলবাসী সমুদয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণকে উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করা হইবে। তাঁহাদিগের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হইবে। উৎসব উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান ম্যাসেঞ্জার পত্রিকার একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরলোকগত নেতৃবৃন্দের ছবি, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি পুস্তক (Album) মুদ্রিত করা হইবে। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রসারের নিমিত্ত একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনেরও চেষ্টা করা হইবে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আনুমানিক ৩০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক।

এই অর্থ সংগ্রহ ও উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি-দিগকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটী সম্প্রতি তাঁহাদিগের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা উক্ত কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্য ও সহানুভূতিকারি-গণের বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি সকলে সমবেত চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এই মহোৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। এই নিমিত্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক যিনি যে অর্থ দান করিবেন তাহা ২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, অথবা ২৮বি, নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন অথবা ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কমিটীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করিবেন।

আর ভেঙ্কট রত্নম্—মাদ্রাজ, জি বি ত্রিবেদী—বোম্বাই, এ গোপালম্—কালিকট, শ্রীবিশ্বনাথ কর—কটক, শ্রীরঙ্গবিহারীলাল—পাটনা, শ্রীসতীশরঞ্জন দাস—দিল্লী, রঘুনাথ সহায়—লাহোর, জে আর দাস—রেঙ্গুন, শ্রীশ্রীনাথ চন্দ—ময়মনসিংহ, শ্রীঅতুলানন্দদাস—ডিব্রুগড়, শ্রী অবলা বসু, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীশশিভূষণ দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কলিকাতা, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ (সভাপতি, সাঃ ব্রাঃ সমাজ), শ্রীব্রজসুন্দর রায় (সম্পাদক, সাং ব্রাঃ সমাজ) শ্রীঅন্নদাচরণ সেন ও শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কমিটীর সম্পাদক)

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০শ ভাগ।	১লা মাঘ, রবিবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
১৯শ সংখ্যা	15th January, 1928.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে করুণাময় পিতা, নানা অবস্থা ও ঘটনার মধ্য দিয়া তুমি আমাদিগকে উৎসবদ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছ। আমরা তোমার কৃপা সম্ভোগ করিবার জন্য কতটুকু প্রস্তুত হইয়াছি, [illegible] আমরা ত উপযুক্ত চেষ্টা যত্ন বিশেষ কিছুই করি নাই। তুমি এবার চারিদিকের শোকদুঃখের মধ্য দিয়াই প্রস্তুত করিতেছ, আমাদের মোহঘোর ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে জাগাইতেছ। ক্ষীণবিশ্বাসী আমরা, তাহার মধ্যে কতটুকু তোমার মঙ্গল ব্যবস্থা দেখিতে পারিতেছি, তোমার জীবন্ত বিধাতৃত্ব ও সত্তা প্রকাশ অনুভব করিতে পারিতেছি, তুমিই জান। আমরা যে দুঃখতাপে অভিভূতই হইয়া পড়ি, তোমার অসীম করুণাতে নির্ভর করিয়া শান্তচিত্তে সকল বহন করিতে পারি না! তুমি যদি প্রাণে আশা ও বল না দেও, তোমাতে নির্ভর ও আত্মসমর্পণ না দেও, তবে আমরা কি প্রকারে তাহা পাইব? কি প্রকারে তোমার উৎসবগৃহে প্রবেশ করিব? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে ছাড়িয়া দিতে সমর্থ কর। তুমি যেমন করিয়া আমাদিগকে উৎসব সম্ভোগ করাইতে চাও, আমরা যেন তাহাতেই প্রস্তুত থাকিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এইরূপ হৃদয় দেও। আমরা যেন দ্বারে আসিয়া আপনার দোষে ফিরিয়া না যাই। তুমিই আমাদের একমাত্র চালক হও। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

উৎসবে আনন্দ—উৎসবের বারতা শু'নে তোমরা জেগে উঠেছ—আজ পত্রে পুষ্পে গৃহ সজ্জিত করেছ! কত সাজ সজ্জা, কত উৎসব সঙ্গীত! কত বন্ধুবান্ধব এসেছেন! কত আলাপ আলোচনা, কত উপাসনা উপদেশ, কত বক্তৃতা, কত সম্মিলন! আজ তোমরা কার স্পর্শ পেয়ে মেতে উঠেছ? কোন্ দেশের হাওয়া এসে গায়ে লেগেছে? গন্ধবাহী সমীরণ কোন্ ফুলের গন্ধ ব'য়ে এনেছে? তাই তোমরা বিভোর হ'য়ে [illegible]! [illegible] আনন্দ! কত দুঃখ বেদনা পেয়েছ! আজ আনন্দধ্বনি কর। আজ আনন্দে প্রাণের দেবতার চরণে প্রীতির অঞ্জলি দিয়ে কৃতার্থ হও। আজ আমিও কি এক আনন্দের আভাস পেয়েছি! আমিও কি মধুর সঙ্গীত শুনে জেগে উঠেছি! আমার গৃহ সাজান হয় নাই; আমার গৃহে আনন্দের কোলাহল নাই, বন্ধু বান্ধবের সমাগম নাই; কাহাকেও আমি ডাকি নাই, কোনও সঙ্গীতধ্বনি গৃহে উঠ্ছে না। তবু আমার প্রাণে আজ কি উৎসবের আনন্দ! আমি বিভোর হ'য়ে আছি। তোমরা কোনও সঙ্গীত এখানে শোন না। কোনও বাজনা এখানে বাজে না। কিন্তু আমার প্রাণে যেন কার স্পর্শ লেগেছে; আমার হৃদয়ের মৃদঙ্গ বেজে উঠেছে; আমার অন্তরে মমভুলান সুরে মধুর সঙ্গীত বেজে উঠেছে। আমার প্রাণে আজ আনন্দ ধরে না। কার আগমনে প্রাণ ভরপুর হ'য়ে গেছে! কি সুগন্ধ, কি মধুর রসধারা! আমি আর আপনাকে সামলাতে পারি না; তোমরা যেয়ে দশ জনের সঙ্গে উৎসব কর; আমার প্রাণে যে উৎসবের আনন্দ, তা ছেড়ে যেতে পারি না। এ উৎসব নিত্য উৎসব, নিত্য আনন্দ; এখানে হৃদয়ে প্রাণসখা এসেছেন! সঙ্গে কত অমরবৃন্দ এসেছেন। কত সঙ্গীত, কত আনন্দ! এই উৎসবে আমি মেতে যাই।

তবুও ভাল বাসিব—সে যদি আমাকে প্রীতি না করে, যদি ঘৃণা করে, তবুও তাকে প্রীতি ক'রব। সে যদি উপেক্ষা

করে, তবুও প্রেম ঢেলে দিব। সে যদি আমাকে দূরে তাড়িয়ে দেয়, তবুও তাকে প্রাণে রাখিব। সে যদি আমাকে কুৎসা করে তবুও তার গুণ ব্যাখ্যা ক'রব; সে যদি স্থান না দেয়, তবুও তাকে হৃদয়ে স্থান দিব। সে যদি অনিষ্ট করে, তবুও আমি তার ইষ্ট সাধন ক'রব। সে যদি পর ভাবে তবুও, তাকে আপনার ক'রে হৃদয়ে রাখিব। সে যদি অপরাধ করে, আমি কেবল মঙ্গল ক'রব, তা নয়, আমি তবুও ভালবাসিব। সে যদি ভ্রান্ত পথে যায়, তবুও তাকে প্রীতিভরে টেনে আনিব। আমার প্রভু পাপীকেও ভালবাসেন, অপরাধীকেও স্নেহ করেন; যে দূরে যায় তাকেও কাছে টেনে আনেন। প্রেম কেবল দিতেই চায়, না পেয়েও দিতেই চায়। যার হৃদয়ে প্রেম জেগেছে, তার অনেক দুঃখ জানি; অনেকের জন্য তাকে বেদনা পেতে হয়। যিশু সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাতেই আনন্দ, তাতেই কল্যাণ। তাই আমি প্রেমের ব্রত নিয়েছি; প্রেমের মৃত্যু নাই। তোমরা আমাকে উপেক্ষা কর, আঘাত কর, বেদনা দাও, তবুও তোমরা আমার আপনার। আমি তোমাদিগকে প্রেমে আলিঙ্গন করব; তোমাদের কল্যাণচিন্তা করব, মঙ্গলসাধন করব। অপ্রেম পেয়েও প্রেম বিলাব।

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং—ক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না, অক্রোধদ্বারা ক্রোধ জয় করতে হয়। যে তোমাকে ক্রোধভরে কটুবাক্য বলেছে, প্রহার করতে উদ্যত হয়েছে, অপমান করেছে, তুমি যদি আরও উচ্চৈস্বরে তাকে প্রতিবাদ কর, কটুবাক্য বল, তাকেও প্রহার করতে যাও, [illegible] হবে, এ ক্রোধের শান্তি হইবে না—ক্রোধে ক্রোধই বেড়ে যাবে, কোলাহল হবে, ঘাত প্রতিঘাত হবে, অপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠবে। মহান্ অনর্থ ঘটবে। সে রাগ করেছে, অপমান করেছে, আঘাত করেছে? তুমি শান্ত থাক, স্থির হ'য়ে থাক; এখন কথা ব'লো না, কোনও উত্তর দিও না। তোমার নীরব ভাষা তার প্রাণ স্পর্শ করবে; তোমার প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্র তার প্রাণে বেদনা জাগাবে; তোমার কোমল দৃষ্টি তার মর্ম্ম স্পর্শ করবে; তোমার প্রেমপূর্ণ আহ্বান তাকে অনুতপ্ত করবে। তুমি প্রেমদ্বারা তার ক্রোধকে জয় করবে। প্রেমই তার হৃদয় অধিকার করবে। ক্রোধের প্রতিদানে প্রেম দাও; অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় কর।

সম্পাদকীয়

উৎসব-দ্বারে—আমরা কে কিরূপ আয়োজন লইয়া, কি ভাবে প্রস্তুত হইয়া, উৎসবদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, জানি না। অধিকাংশই যে যথোপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইয়া আসি নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কেন না, আমাদের মধ্যে সেরূপ একটা সাড়া পড়িবার লক্ষণ বিশেষ কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এখনও আমরা অধিকাংশই উদাসীনভাবে অসার বিষয় লইয়াই মত্ত আছি, বৃথা কোলাহলে মগ্ন রহিয়াছি। যেরূপ শান্ত ভাবে, নির্জ্জনে নীরবে, হৃদয়ের গোপনপ্রদেশে জীবনদেবতাকে পাইবার জন্য দীন অন্তরে প্রতীক্ষা করিতে হয়, তাহার কোন পরিচয়ই আমাদের অধিকাংশের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না। যাহারা কিছু আয়োজনাদি করিয়াছি মনে করিতেছি, তাহারাও যে ঠিক ভাবে প্রস্তুত হইয়াছি, এরূপ বলিতে পারি না। কারণ, যদি আমাদের আয়োজনের উপরই আমাদের নির্ভর স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে অচিরেই তাহার ব্যর্থতা প্রমাণিত হইবে—আত্মবলে সে গৃহে প্রবেশ করা যায় না, অহঙ্কারীর প্রবেশাধিকার সেখানে নাই। তিনি স্বয়ং দ্বার খুলিয়া না দিলে কেহই আপন শক্তিতে সে দ্বার খুলিতে পারে না। অন্তরদর্শী দেবতা তিনি, অন্তরের অবস্থা দেখিয়াই তিনি সকলকে বাছিয়া লন। প্রকৃত দীনতা ও ব্যাকুলতা যাহার মধ্যে নাই, তাহার নিকট তিনি দ্বার খুলিয়া দেন না। খুব ব্যাকুল ভাবে দ্বারে আঘাত করিলেই যে সকল সময় দ্বার খুলিয়া দেন, তাহাও নহে। ভক্তদের জীবনে কি ব্যাকুলতার পরিচয়ই না আমরা দেখিতে পাই! অথচ তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা কত বিরহযাতনাই না ভোগ করিয়াছেন! আমাদের মধ্যে ত সে ব্যাকুলতার সহস্রাংশের একাংশও দৃষ্ট হয় না! তবে আমরা কি প্রকারে আশা করিতে পারি যে, আমাদের ব্যাকুলতার দ্বারা আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব? দীনতার বলে প্রাপ্ত হইব মনে করিলেও আমাদিগকে নিশ্চয়ই ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে—দীনতারও একটা অহঙ্কার আছে, দীনতার উপর নির্ভর রাখিলে আর তাহা দীনতা থাকে না, অহঙ্কারেই পরিণত হয়।

প্রকৃত দীনতার সঙ্গে যেমন উপযুক্ততার ভাব থাকিতে পারে না, তেমনি কোনও প্রকার দাবী [illegible] থাকিতে পারে না। [illegible] তাহাকে যে ভাবে পাইলে সুখী হই, তিনি যে সেই ভাবেই আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন, আমার এমন কোন্ দাবী বা অধিকার আছে? তিনি যদি উপযুক্ত হই নাই বলিয়া আরও দীর্ঘকাল আমাকে দূরে রাখেন, আমাকে অধিকতর ব্যাকুল ও দীনহীন কাঙ্গাল, একান্ত শুদ্ধচিত্ত ও নির্ভরশীল করিবার জন্য, অধিকতর উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্যই, অসীম মঙ্গল ভাবের দ্বারা চালিত হইয়াই, তাঁহার প্রকাশের আনন্দ প্রদান না করিয়া বিরহের দুঃখ বেদনাই ব্যবস্থা করেন, তবে কি তাহাতেও তাঁহার অসীম প্রেম ও করুণারই পরিচয় দেখিব না? আর, তাহা দেখিতে না পাইলে কি তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবই সূচিত হয় না? তাঁহার করুণা ও প্রেমে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি যাহা দিবেন তাহা যে আমাদের মঙ্গলের জন্যই দিবেন, আমাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য যাহা আবশ্যক তিনি যে শুধু তাহাই প্রদান করিবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহই থাকিতে পারে না। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যখন আমরা অনেক সময়ই প্রকৃত কল্যাণ কোথায় তাহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারি না, তখন সে বিচারভার তাঁহার উপর প্রদান করিলেই যে আমরা নিশ্চিন্ত প্রাণে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া জীবনপথে চলিতে পারি, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ইচ্ছা অভিরুচির বিরোধী কিছু আসিলেও, তাহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে বরণ করিয়া লইতে সমর্থ হই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা

যায়। আমাদের আপনার ইচ্ছা অভিরুচি অনুযায়ী কিছু বাছিয়া লইতে গেলে, শুধু যে তাহা হইতেই বঞ্চিত হইব এরূপ নহে, বরং যাহা আমরা পাইতে পারিতাম, যাহাতে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। এরূপ অবস্থায় উৎসব আমাদের পক্ষে সফল না হইয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থই হইবে। সুতরাং তিনি যাহাকে যাহা দেন তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আপনাকে একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। আপনাকে না দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ভক্ত গাহিয়াছেন—"যদি ত্রাণ পেতে চাও প্রাণ তাঁরে দেও, সে-পদে লুটা'য়ে পড় অমনি"। ঋষি বলিয়াছেন "একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।" এই ত্যাগ অর্থ বাহিরের কিছু ত্যাগ নয়,—বাহিরের ত্যাগ কিছু কঠিন কথা নয়, চিরস্থায়ী অমূল্য সম্পদের জন্য তুচ্ছ পার্থিব ধন সম্পদ সহজেই ত্যাগ করা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনাকে ত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে। আপনাকে ত্যাগ করার অর্থ আপনার সমস্ত ইচ্ছা অভিরুচি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে, অমৃতত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত ছাড়িতে হইবে। বীজ একবারে বিনষ্ট হইয়া গেলেই তাহার স্থানে মহামহীরুহ উৎপন্ন হয়, ফীনিক্‌স্ পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইলেই, সেই ভস্মরাশি হইতে নূতন ফীনিক্‌স্ জন্ম গ্রহণ করে। পুরাতন মানুষ না মরিলে তাহার স্থলে নূতন মানুষ জন্মে না, পুরাতন জীবন ত্যাগ না করিলে নূতন জীবন পাওয়া যায় না। কিছু রাখিয়া কিছু দিব, তাঁহার সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত চলে না [illegible] তার সর্ব্বনাশ" সে কথার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। "সর্ব্ব" অর্থাৎ তিনি ছাড়া অপর যাহা কিছু সমস্ত আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু, 'বিনষ্ট' বা পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথার্থরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 'পরম' লব্ধ হন না, ইহা অতীব সত্য কথা। অপর কিছু আকাঙ্ক্ষণীয় থাকিলে আমরা তাহার পশ্চাতেই ধাবিত হই বলিয়া যে অতি নিকটস্থ হৃদয়-দেবতাকেও দেখিতে পাই না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু করিলে, অপর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহারই অনুসরণ করিলে, নিশ্চয়ই কাহারও "সর্ব্বনাশ" সাধিত হয় না—"যাহার পাইলে স্বাদ থাকে না অপর সাধ' তাঁহার প্রাপ্তিতে সর্ব্বলাভ, পরম লাভই ঘটে। সুতরাং এই ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগ। আপনাকে এই ভাবে ত্যাগ করিতে পারিলে আর উৎসব কিছুতেই আমাদের জীবনে নিষ্ফল হইতে পারে না; কারণ, উৎসবে যাহাই পাই না কেন—আনন্দ সুখই পাই, আর দুঃখ বেদনাই পাই, সরসতাই আসুক আর শুষ্কতাই আসুক—সকলের মধ্যেই তাঁহার প্রেমের ব্যবস্থা দর্শন করিয়া, তাঁহার আনুগত্য লাভের দ্বারা জীবনের পূর্ণ সার্থকতা সাধিত হয়। কিন্তু 'ত্যাগের মাহাত্ম্য' যত অধিকই হউক না কেন, 'গ্রহণেরও' প্রয়োজন আছে। আমাদের উৎসব শুধু একাকিত্বের উৎসব নহে,—আমাদের উৎসব সকলকে লইয়া, কাহাকেও ছাড়িয়া গেলে নিশ্চয়ই আমরা 'সকলের' পিতার নিকট স্থান পাইব না, তাঁহার নিকট যাইতে সকলকে সঙ্গে লইয়াই যাইতে হইবে। তাই আমাদের সঙ্গীতে আছে, "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে।" আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিলে, সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রেমস্বরূপ মহান্ দেবতার জায়গা হয় না। যে হৃদয় উদার প্রেমে যত প্রশস্ত, অপরের সঙ্গে যুক্ত, তাহা ততই তাঁহার সঙ্গেও যুক্ত। অপরের দুঃখ বেদনা ভুলিয়া নিজের আরাম সুখ খুঁজিতে গেলে, আনন্দ আরাম পাওয়া যায় না, দুঃখ বেদনার বোঝাও বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ তাঁহা হইতে বঞ্চিত হওয়া রূপ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দুঃখ ও অকল্যাণ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। প্রেমেই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে যুক্ত হইতে হয়। যেখানে প্রেমের অভাব থাকিলে সেই যোগসূত্রই ছিন্ন হইয়া যায়—অপ্রেম থাকিলে সম্পূর্ণ বিপরীত গতিবশতঃ কোনও প্রকার নৈকট্যই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং হৃদয় হইতে সর্ব্ব প্রকার অপ্রেম দূর করিয়া যে উৎসবে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শুধু অপ্রেম না থাকিলেই যথেষ্ট হইল না, উদাসীনতা থাকিলেও চলিবে না—সত্য প্রেমই থাকা চাই। এই প্রেম থাকিলেই অপরের দুঃখ বেদনা আপনার মধ্যে সমভাবে অনুভূত হইবে। এবার চারিদিকে বহু পরিবারে যে শোকের আগুন জ্বলিয়াছে, সেই শোক যদি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে আমাদের মধ্যে প্রেমের নিতান্তই অভাব হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে এই শোক বেদনা লইয়াই তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে। শোকের আগুন যদি আমাদের সকল ক্ষুদ্রতা মলিনতা ইহসর্ব্বস্বতা দূর করিয়া আমাদের হৃদয়কে [illegible] আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া হৃদয়কে একেবারে শূন্য করিয়া ফেলে, তবে নিশ্চয়ই সেখানে প্রেমস্বরূপ শুদ্ধমপাপবিদ্ধমের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। অশ্রুজলে ধৌত হৃদয়েই তাঁহার পবিত্র অধিষ্ঠান সম্ভবপর। এক দিকে শোকের অশ্রু, অন্য দিকে অনুতাপের অশ্রু এবং তাহার সহিত যাহাদের হৃদয়ে আবার ভক্তির অশ্রু মিলিত হইবে, তাহাদের হৃদয় যে এই ত্রিবেণীসঙ্গমে পরম তীর্থে পরিণত হইবে—তাহাদের যে আর সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যদি শুদ্ধা ভক্তি আমরা লাভ নাও করিতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভক্তির স্বর্গীয় মন্দাকিনীধারা আপনা হইতেই কালে সেইখানে আসিয়া মিলিবে। এখন আমরা বেদনার বিবিধ ধারাতে স্নাত ও পূত হইয়াই উৎসবদ্বারে প্রতীক্ষা করি। আর সমস্ত তিনিই যথাসময়ে করিবেন। তিনিই আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, তিনিই আমাদের জন্য এই শোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনিই কালে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবেন। আমরা তাঁহার উপর সকল ভার দিয়া, তাঁহারই হস্তে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া, আশান্বিত হৃদয়ে দ্বারে প্রতীক্ষা করি, তিনিই তাঁহার করুণায় উৎসবগৃহে লইয়া আমাদের যাহাকে যাহা দিতে হয়, যে স্থানে রাখিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আমরা যেন আর কিছু না চাই। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক। তাহা হইলেই উৎসব সফল হইবে।

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩৪)

পাখীদিগকে অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত ও স্বাধীন বলিয়াই মনে হয়। তাহারা সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিযুক্ত, আনন্দিত ও উৎসাহযুক্ত হইয়াই যেন বাস করে। যথা ইচ্ছা গমন করে, যেখানে খুসী বাস করে। আহার্য্য সঞ্চয় সংগ্রহ করে না। সদাই যেন ভয়ভাবনাহীন, কিছুতেই আবদ্ধ নহে বলিয়াই মনে হয়। সাধারণ ভাবে সকল পাখীকে এরূপ ভাবাপন্ন মনে হইলেও, কোকিলকে বিশেষ ভাবে এরূপ ভাবাপন্ন মনে হয়। কোকিল কোথাও আপনাকে আবদ্ধ করে না। কখনও বাসা নির্ম্মাণ করে না। একস্থানে স্থায়ী হইয়া বাসও করে না। ঋতুবিশেষে দেশবিশেষে গমন করে এবং এরূপ নিয়ত যাযাবর হইয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়। অন্যান্য পাখীরা বৎসরের মধ্যে কোন সময় বাসা নিম্মাণ করিয়া থাকে, ইহারা তাহাও করে না। সন্তানপালনের যে আনন্দ পাখীগণ ভোগ করিয়া থাকে, ইহারা সে ভারও বহন করে না, সে আনন্দও ভোগ করে না। কেবলই উন্মুক্ত থাকিয়া, সুখের পায়রার মত সুখের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। এরূপ ভাবে উন্মুক্ত হইয়া বেড়াইবার অবস্থাকে প্রলুব্ধ হইবার মত মনে হইতে পারে। কিছুতে আবদ্ধ না হইয়া সদা স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া, স্বাধীন ভাবে কেবলই ছুটাছুটী করিয়া বেড়াবার ভাবটা খুবই আকর্ষণের, প্রলোভনের, মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহাই আদর্শনীয় কি না [illegible] যে কোথাও ধরা দেয় না, কাহারও হয় না, সে বিশেষ ভাবে কোন কাজের হয় কি না সন্দেহ, সে সম্ভবতঃ কাহারও কাজে লাগে না। সাংসারিক বিষয়ে বদ্ধ হওয়া, আসক্ত হওয়া, কখনই ভাল নহে। এরূপ অবস্থাতেই মুক্তির প্রার্থনা কল্যাণকর; কিন্তু প্রেমে, ঐশ্বরিক ভাবে, আকৃষ্ট হইয়া কোথাও আপনাকে না রাখা কল্যাণকর কি না সন্দেহের বিষয়। যে আপনাকে কোথাও রাখে না সে কাহারও হয় না, যে কোন স্থানকেই আপনার কার্য্যক্ষেত্র করে না সে কোন ক্ষেত্রেই কর্ম্মক্ষম হইয়া কুশলকারী হয় না। তাই প্রার্থনা করিতে হয় "বাঁধিও আমায় যত খুসী ডোরে, মুক্ত রাখিও তোমাপানে মোরে, ধূলায় রাখিও পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে।" মুক্তি আর বন্ধনের এরূপ লক্ষণই ভাল। কোন কিছুতেই একান্ত আবদ্ধ হওয়াও ভাল নহে। আর কেবলই ভবঘুরের ন্যায় নিয়ত ঘুরিয়া বেড়ান, আপনাকে কাহারও না করা, ইহাও ভাল নয়। মুক্তি ও বন্ধন দুইয়েতে মিলিলেই জীবন সফল হয়, কাজের হয়।

(৩৫)

বর্ত্তমানে নানা স্থানে নানা নামে পরিচিত যে সব ব্যোমযান সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা মানবকে পক্ষীকুলেরও বিস্ময়কর সম্পদ দিয়াছে, যাহার সাহায্যে মানব পক্ষীকেও পরাজিত করিতেছে, তাহার সম্ভাবনা কল্পনা সুদূর অতীতে এ দেশে হইয়াছিল। রামায়ণে বর্ণিত পুষ্পরথ তাহারই পূর্ণ কল্পনা বা পূর্ব্বাভাস। সুধী বিজ্ঞজনের অভিমত এই যে, এ প্রকার কল্পনা যাঁহারা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে এতাদৃশ আশ্চর্য্য সম্ভাবনার কথা উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদের গৌরব ও মর্য্যাদা সামান্য নহে। তাঁহারা আপনাদের উদ্ভাবনা ও কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলেও, তাঁহারা যে এরূপ সম্ভাবনার কথা ভাবিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের গৌরব অতিশয়। যাঁহাদের মন হইতে এতাদৃশ কল্পনা আসিয়াছিল তাঁহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন। বর্ত্তমানে 'যে আদর্শ আসিয়াছে—আধ্যাত্মিক, সার্ব্বভৌমিক, বিশ্বজনীন, উদার যে ধর্ম্মের সংবাদ আসিয়াছে—যাহার সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া, যাহার পূর্ব্বাভাস অনুভব করিয়া, পুলকিত ও উৎসাহিত হইতে হইতেছে, যাঁহাদের মনে সে আদর্শ সমুদিত হইয়াছিল, তাঁহারা কখনই সামান্য ব্যক্তি নহেন। তাঁহারা অতি মহৎ, অতি উন্নতমনা ব্যক্তি। কারণ, তাঁহারা এই মহিমাময় ধর্ম্মের প্রথম দ্রষ্টা। তাঁহারা এ তত্ত্বপ্রকাশের ঋষি। আমাদের প্রাণে সময় সময় যে অতি মহৎ, অতি উচ্চদরের বাসনার উদয় হয়, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পদলাভের জন্য প্রার্থনা আসে, তাহাও ব্যর্থ হইবার নয়, শুধু কল্পনা নহে। জীবনে এখনই তাহা আসিতেছে না বা আসে নাই বলিয়া তাহাকে তুচ্ছ মনে করিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। তাহা এখন জীবনে আসিতেছে না বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। আসিবেই তাহা, সময়ে জীবনে আসিবেই।

(৩৬)

মতকে কতটা মান্য আবশ্যক, অথবা মতকে কতটা অগ্রাহ্য করা [illegible] মতকে কি নগণ্য বলিয়া মনে করা যায়, না, উড়াইয়া দেওয়া যায় বা দেওয়া উচিত? আমার ত সেরূপ মনে হয় না। কারণ, মত ত আর কিছুই নহে। তাহার সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই—যাহা আমরা হইতে চাই, যেরূপ আদর্শ আমাদের সম্মুখে আসে, যাহার পশ্চাতেই সারা জীবন ধরিয়া চলিতে হয়, তাহাই আমাদের মত। সুতরাং তাহা ছাড়িতে বা ভুলিতে পারা যায় না। তাহার প্রতি উদাসীন হওয়াও ভাল কথা নহে। যাহা হইতে হইবে তাহাকে চিরদিনই অতি যত্নে, অতি দৃঢ়তার সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। এরূপ না হইলে জীবনগঠন, সাধনচেষ্টা কখনই সম্ভবপর ও সার্থক হয় না। তবে অন্ধতা গোঁড়ামি কখনই শোভন নহে। যে গোঁড়ামি বা অন্ধতা অন্যের মতকে একান্ত তুচ্ছ করিতে বলে—অপরের অবলম্বিত মতকে কেবলই অগ্রাহ্য করিতে বলে, তাহা কখনই প্রশংসনীয় নহে। আত্মমতে নিষ্ঠাবান হইয়া পরমতের প্রতি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই সমুচিত। মতেরও গৌণ মুখ্য আছে। যাহা অবান্তর, যাহা কেবলই বাহিরের, তাহাকে বেশী আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার তেমন প্রয়োজন নাই। সে বিষয়ে উদারতাই শোভনীয়, তাহাই সকলের পক্ষে অবলম্বনীয়।

(৩৭)

ভক্তদলে ভর্ত্তি হইতে হইলে ভক্ত হইয়াই সে দাবী করিতে পারা যায়। যে ভক্ত নয় সে কেমন করিয়া ভক্তগণের দলের এক জন হইতে পারে? তাহার সে প্রার্থনা কেন? ভক্তবৎসল

যে আমাকে ভক্ত দলের একজন করিয়া লইবেন সে ত আর শুধু অনুরোধ উপরোধে নয়। তিনি জানিয়া শুনিয়া, আমাকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া, আমার যে স্থান পাওয়া উচিত সেই স্থানে আমাকে লইয়া যাইবেন, স্থান দিবেন। প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা ও অধিকার অবশ্যই আমার আছে। কারণ, তাহাই সে পদবী লাভের একটি উপায়। কিন্তু বিধাতা বিচারহীন নহেন। বিচারপূর্ব্বক আমাকে যে দলে রাখিতে হয় রাখিবেন, না হয় অপেক্ষা করিতে বলিবেন। অসহিষ্ণুতা কখনই শোভন নহে।

(৩৮)

যাহাদের সঙ্গে আছি বা থাকি তারা যদি সৎ ও সাধু গুণবিশিষ্ট হন, তাহা পরম লাভের কারণ হয়। তাহা যেন সোণায় সোহাগা হয়। আর তাহারা যদি সে ভাবের না হন, তবে সংগ্রাম ও সঙ্কট খুব হইলেও, আমার পক্ষে তাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছাটা কি ভাল হয়? তাহাতে কি পরম প্রভুর অনুমোদন পাইবার সম্ভাবনা আছে? তিনি জানিয়া শুনিয়াই আমাকে তাঁদের ভিতরে রাখিয়াছেন। তাঁর বিবেচনা বিচারের উপরে আর আমার কিছু করিবার ভাব পোষণ করা কি উচিত? এ সব সঙ্গকে দুষ্টস্থানে সুসঙ্গলাভের চেষ্টায় অসহিষ্ণুতাই ব্যক্ত হয়। তাহাতে বিধাতার অনুমোদন পাইব না। বরং তাঁহার ইচ্ছাকে মান্য না করার ফল ভোগ করিতে হইবে।

(৩৯)

'জামদগ্ন্য' পরশুরামই যে শুধু মাতৃহন্তা হয়েছিলেন, এমন ত নহে। সন্তানদের সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে মাতৃহন্তার কাজ করিতে হয়। জন্মিয়াই মাতৃরক্ত শোষণ আরম্ভ হয়। সেবা শুশ্রূষার জন্য মায়ের কত রক্ত নিঃশেষিত হয়, তাহার হিসাব কে জানে? একটু অসুখ হইলে আর মায়ের নিদ্রা নাই। অসুখ যেন মায়েরই হইয়াছে। এ ভাবে কতপরিমাণে যে সন্তান মায়ের আয়ুশেষের কারণ হয়, তাহার হিসাব হয় না। পরে সন্তান যদি মাতার অন্তরে শেলবিদ্ধ করিয়া দুঃশীল হইয়া যায়, মাতার গৌরবহানিকর, অশেষ যাতনাকর কুকীর্ত্তি যদি সন্তান উপার্জ্জন করিতে থাকে, তখন মায়ের ত মরণই হয়। তাহা হইলেও বুঝা যায় পরশুরামই একা মাতৃহন্তা নহেন। অনেক মাতৃহন্তা এ রাজ্যে আছে। সন্তানগণের পক্ষে মাতৃহন্তা হইবার মতন অপরাধ আর কি আছে? অথচ সে অপরাধে অনেকেই অপরাধী হয়। এমন কেন হয়, কে তাহা বলিবে? দুর্ব্বুদ্ধির এত প্রাবল্য কেন হইয়া থাকে? শুভমতিদাতা আমাদিগকে সুমতি দান করুন।

অমর কথা (১১)

মৃত্যুঞ্জয়

কে তুমি গো ভূমা মহা
অনন্ত মহান্,
শুধু আমি হোতে চাই
তোমারি সমান।

অমৃতা অমর নাম
জেগে আছে বুকে,
তারি সাথে মরে যাওয়া
সব গেছে চুকে।

বাজে বুকে দিবা যামি
কত ব্যথা নিতি নিতি,
বেদন-ঝঙ্কারে জাগে
কত দুখ, কত ভীতি!

হিমানীর হিম শেষে,
মধু দূতী আসে হেসে,
চুমাটুকু দিয়ে যায়,
না জানি সে কি আবেশে!

বসুধা বাসন্তী রাগে
সাজে সবে প্রেম-সাজে,
চ'লে গেল হিম মোহ,
বাজে, ও কি গান বাজে?

তেমনি গো দ্বন্দ্বমোহ,
রচিয়া বিষম ফাঁদ,
ঢাকে যবে দিনশেষে,
হেসে এল প্রেমচাঁদ।

আকুল জাগানো সুরে
সখা যে ডেকেছে মোরে,
ছুটি তাই প্রাণপুরে,
জেগে উঠি ঘুম-ঘোরে।

বুক কাঁপে গানে গানে,
কেন গো আপন ঘরে
এমনি জটিল দ্বন্দ্ব,
ভুল বুঝে কেঁদে মরে!

বঁধু মোর এলে কি গো,
আকুল মধুর সাজে,
দিন রাত চেয়ে থাকা
বড় ব্যথা বুকে বাজে।

ছেড় না ছেড় না আর,
আকুল আঁধার পথে
সাথে সাথে থাক, নাথ,
আমারি জীবন-রথে।

ধরণীর বুকে এই মানব তনুখানি হোচ্ছে তার শুভ্র আত্মারই স্বচ্ছ আবরণ। দেহ ও আত্মার এ কি সম্মিলন! পরমাত্মার মঙ্গল ইচ্ছায় জীবাত্মা দেহের ঘরে বসেই চৈতন্যে অনুপ্রাণিত; তাইত পার্থিব লীলাঘরেই তার এত লীলারঙ্গ! ধমনীতে ধমনীতে আনন্দছন্দ ঢেলে দিচ্ছে, দেহ ও আত্মা মেশামিশি হোয়ে চৈতন্যের লীলা সাধন কোরছে। দৈহিক যন্ত্র প্রভাবে বহির্জ্জগতের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মহামহিমায় জীবাত্মা অন্তরে ও বাহিরে দ্বৈত-জ্ঞানের মহিমা উপলব্ধি কোরছে। যখন দেহ ভেঙ্গে যাবে তখন মুক্ত আত্মা সংসারের ধূলি ঝেড়ে অনন্তে উধাও হবে। এই পরমমুক্তির নামই কি মৃত্যু?

দেহখানি যেন ক্ষণভঙ্গুর স্বচ্ছ আবরণ। তাই তার প্রতি কর্ম্মপুরে এই জীবাত্মা আর এই তার দেহবীণাখানির স্বতন্ত্র মহিমা। যাকে প্রেম বলি বা অপ্রেম বলি তার দেহের ঘরে স্থান কই? এ ত আমি জ্যোতির্ম্ময়ী অমৃতময়ী চেতনাময়ী আমি; কখনও এই ক্ষীণ শান্ত স্নিগ্ধ করুণ অমিয় বচনে প্রাণের অমৃত স্নেহ প্রেম সিঞ্চন করি, আবার কখনও অন্ধ হোয়ে, ক্ষুব্ধ হোয়ে উত্তেজিত হই। আর এই আমারই রসনায় কি কর্কশ মর্ম্মদগ্ধ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে লজ্জা ও ধিক্কারে আপনার সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করি। সাহস ভয় লজ্জা বেদনা আনন্দ সবই ত আত্মানুভূতি। কেবল দেহযন্ত্রে নানা ভাবে তার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। যেদিন দেহমুক্তি হবে, জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যক্ত হবে, ভস্মমুঠিতে পরিণত হবে, হায়রে হায়! এই ভস্মমুঠিতেই কি আমার বিচিত্র জাগরণ লীলাপর্ব্ব সাধন হোয়েছিল? এত ভাবতেও পারি না।

তবে কি আমি রূপখানিই ভালবাসি না ঘৃণা করি? কোথায় ভালবাসার উৎস? ভেবে চিন্তে যখন দেখতে যাই দেখি আত্মসত্তাতেই এই ভালবাসার জন্ম, প্রেমজ্যোতিতেই তার মুগ্ধ সত্তা। তাই ত জীবাত্মা যখন দেহের ঘরে বাস করেন কত প্রেমপূজা! আর যেদিন মৃত্যুমলিন দেহপিঞ্জর ভগ্ন কোরে পাখী উড়ে গেল, সেদিন সে দেহে কই সে ভাবপ্রবণতা' কই সে প্রেমোচ্ছ্বাস, আর অপ্রেমরই বা কই সে ভীম তাণ্ডব প্রতাপ?

তবে ত রূপের ঘরে আমার ভালবাসার নিত্য বসতি নয়। আত্মজ্যোতিতেই সকল প্রাণের ইতিহাস; যতক্ষণ আত্মসুন্দর দেহমন্দিরে বিরাজ করেন তার যত কিছু আয়োজন, ততক্ষণ তার দেহের বিচিত্র অঙ্গনে কত আনন্দ উৎসবমেলা, কত সতর্কতা, কত লুকোচুরি, কত ধূলি, কত কালি, কত প্রতারণার ব্যর্থ প্রয়াস। দেবতার মঙ্গল বিধানেই জীবাত্মার এ রূপের সাজ, তাইত রূপের সঙ্গে এমনি কোরে প্রাণময় মেশামিশি, কি নিবিড় প্রণয়! তাই তার বিরহ আশঙ্কায় কত ভীতিমোহ, জেগে ওঠে।

মৃত্যু আবার তবে কি? এই রূপের আবরণ উন্মোচন কোরে অরূপ সত্তা লাভ কি? এ দেহ কি বিনাশের পথে যাবে? কই তা ত যায় না—যা থেকে গড়ে উঠ্‌ল এই পঞ্চভূতের দেহ, পঞ্চভূতেই পরিণত হোল! কোথায় ধ্বংস? মুক্ত আত্মা কি তবে ঘুমিয়ে পড়লেন স্রষ্টার সৃষ্টিলীলার ভিতর? কেমন কোরে তা হবে? ধূলিমুষ্টির যদি বিনাশ নেই, তবে যার চেতন-স্পর্শে এই ধূলার ঘরে এত সাজ, এত লীলা, তারই মরণ কখনও সম্ভব? বিশ্বাস করি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা অনন্ত সত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত অনন্ত জীবন। ধূলার আবরণ উন্মোচন কোরেই স্রষ্টাপাতা বিধাতার অনন্তসত্তাতেই জাগ্রত। তিনি স্রষ্টা, তিনি বিনাশের জন্য সৃষ্টি করেননি; তাইত মৃত্যুভয় চলে গেল সংসারে, অভয় পিতার আনন্দসহবাসের ভিতরই জীবাত্মা আনন্দে অভয়ধামে যাত্রা করেছেন।

তবে কেন এ যবনিকা? এত ক্রন্দন? রূপের ঘরে এমন কোরে মুগ্ধ কোরেছেন যে তার বিরহ বিচ্ছেদ অসহ্য হোয়ে ওঠে। এই ভয়াবহ মৃত্যুময় সংসারে কে দিল এ মৃত্যুঞ্জয় বর? যে শক্তিপ্রভাবে আনন্দে ভবপারাবার পার হবার আয়োজন। তাই ত এ লীলাযজ্ঞে কত দেহের নিত্য আহুতি। মানবজীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাসে কত প্রতারণা, কিন্তু মরণপথের যাত্রীর বুকে আর কই প্রতারণা? চলেছে ত অনন্তযাত্রী অনন্তের পথে। কোথায় গেল তার ভীতিচঞ্চল কম্পিত ত্রাস? ও কি আনন্দ আবেশ! আঃ, দেহমুক্তির আনন্দ আরাম শান্ত বিরামের কি অব্যক্ত অনুভূতি হিমশীতল বদনখানিতে ফুটে ওঠে! ঐ মৃত্যুহসিত মুখমণ্ডলে কি শান্ত মাধুরী, কি অব্যক্ত হাসিরেখা! আহা! দেখ দেখ মৃত্যুঞ্জয়ী যাত্রীর কি আনন্দ বিশ্রাম, পরম মুক্তি।

এ কি মোহ! রূপকেই জড়িয়ে ধোরে রাখতে চাই, রূপের ধূলিপরিণতি কল্পনা কোরতেও বুক ভেঙ্গে যায়, অথচ এই আমার প্রিয়ের পরিত্যক্ত দেহের ঘরে আর কই বেদনার অনুভূতি? সমস্ত শান্তি। তবে কেন বেদনা? এ রূপসভায় এ কি রূপের বিচিত্র অভিনয়, ব্যবহারিক সত্তায় অভ্যস্ত প্রাণ সয় কেমন কোরে সে অভাব? মৃত্যুকে ত ভয় করি না। যে রূপসুন্দরে আমি আমার প্রিয়সুন্দরের পরিচয় পেয়েছি, যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেও সাধ মেটে নি, রূপের এ ব্যবহারিক সত্তার অভাবে তাই ত আমার বুক কাঁপে। সাংসারিক ধনে একান্ত অনুরাগই বেদনা জাগিয়ে তোলে, অজ্ঞান অন্ধ জড়তার অন্ধকার তুচ্ছ অসার মোহই যত বেদনার জন্মদান করে। পরম কল্যাণদাতা আমাদের কল্যাণের জন্যই সমস্ত নিয়মিত কোরেছেন। তাই কেবলই বিদায়! বিদায়। জগতের বুকে এই খেলাঘরে নিত্য নূতন বিদায়গান। রজনীর আনন্দকোলে বিশ্রাম নিতে যাই তখনও ত প্রিয়দের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। কই তখন ত বিচ্ছেদ-বেদনায় প্রাণ আকুল হোয়ে ওঠে না! তা কেন হবে? সেখানে যে মিলনের আশা প্রাণকে আশ্বাসের বাণীতে নিশ্চিন্ত কোরেছে, তাই আনন্দে বিদায় নিয়ে নিদ্রার শান্তবুকে ঘুমিয়ে পড়ি।

মৃত্যু ভয়াবহ কেন? যদি দেব নিয়ম ভঙ্গ করি, যদি অমর আত্মাকে অসার মলিনতায় মলিন করি, যদি দৈহিক ভোগ-লালসার ভিতরই চরম আনন্দ সম্ভোগ কোরতে চাই, যদি প্রতিদিনের যাত্রাপথে ব্যর্থ ঘাত প্রতিঘাত, অট্টপরিহাসে আত্মীয় পরিজনকে লাঞ্ছিত প্রতারিত করি, তবেই আকুল ভয় ভাবনা, তবেই মৃত্যু শিহরণ। আর যদি সংযমের পুণ্যনিষ্ঠা জীবনে উদ্‌যাপিত হয়, যদি সত্য ধর্ম্মের জন্য জীবন দিন রজনী উৎসর্গী-কৃত হয়, যদি ত্যাগমন্ত্রে নবদীক্ষা লাভ হয়, যদি বিশ্বপ্রেমে চিত্ত পুলকিত হয়, তবে ভয় কোথায়? দেহকে সর্ব্বস্ব মনে করি, ধূলার ঘরে নিত্য গৃহ রচনা কোরতে চাই, তাইত মরণসথার এ রুদ্র প্রকাশ। দৈহিকতা ঐহিকতার ভিতর পরম চরিতার্থতা দান কোরতে গিয়েই এত অপরাধ। প্রাণময়ী আত্মার স্বরূপ ভুলে কত ভুলের বোঝা জমিয়ে তুলি। অনিত্য খেলা খেলতে গিয়ে শাশ্বত আনন্দলোক ভুলে যাই, তাইত নিত্য আমি অথচ নশ্বর ত্রাসে চমকে উঠি।

কুকর্ম্মের সার্থকতা এ দীন সংসারেই বা কোথায়? মৃত্যুর পরপারে তবে কেন তার জন্য পিপাসা? দেব আশীর্ব্বাদে পরম

কল্যাণ সত্তা আত্মসংযমে। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত জীবাত্মা দেবস্বভাব যদি লাভ কোরতে পারে, সত্যব্রতে ব্রতী মানবের অনন্ত যাত্রায় ভয় কোথায় ?

পাপী আর সাধুর কি বিভিন্ন অনুভূতি ! যে যাত্রায় পাপীর ভীতি শঙ্কামোহ সে যাত্রাগানেই সাধুর মুখমণ্ডল কি পুণ্য আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ! দেবস্বভাবের ভিতরই নিত্য শুদ্ধ সত্তা, কোন মোহজঞ্জাল জমে ওঠে না। এই দেহের ঘরেই প্রাণযোগে পরমযোগ সাধন কোরে চলেন ; তাই মুক্তির আনন্দে যাত্রাগান গেয়ে চলেন। অনন্ত পথের পথিক অনন্তধামের নিত্য সম্বল সংগ্রহ কোরেই চলেন।

মৃত্যুই হোল পরমসম্পদ। কোথায় গেল লাভ লোক্সান ? কোথায় জীবাত্মার চরম লক্ষ্য ? বিশ্বপাতার আনন্দ বুকে যিনি বাস করেন তাঁর মৃত্যুভয় কোথায় ? কাজ শেষ হোল, সখার আহ্বানগান বেজে উঠেছে, তাই তাঁরই বিচিত্র দান দেহবীণা-খানি নানা সুরে পরম সাধনা সাধন কোরেই চলেছেন—খেলা শেষ কোরে, আবার অনন্তের বুকেই হেসে উঠ্‌বেন। জীবাত্মার চরমানন্দ রূপসভাতেই পরম সখার আনন্দ বুকে বিশ্ব নিকেতন, তাঁরই আনন্দনিকেতন, তাঁরই আনন্দমহিমায় বিশ্ববাসীর এ প্রাণের বন্ধনযোগ।

মরণসখার কালো রূপে আমার ভয় কোথায় ? আশার বাণী শুনেছি মর্ম্মকোণে, জীর্ণ তনু এবার ভাগবতী তনু লাভ কোরবেন, এবার নিত্য সত্য আমি সত্য সাজে সেজে উঠ্‌ব। কোথায় ক্ষতি ? আমার প্রিয়জনদের হারিয়ে ফেল্‌ব কি ? তাই কি এত বিচ্ছেদবেদনা ? ওগো তা কেমন কোরে হবে ? তারাও যে প্রিয়তমের বুকেই বাস করে, তারাও যে নিত্য স্নেহ প্রেমের নিবিড় বন্ধনে যুক্ত ! দেহের ব্যবহারিক সত্তা ফুরিয়ে গেল, তাই বোলে কি প্রেম ফুরাবে ? প্রেমসুন্দরের প্রেমসত্তার শেষ কোথায় ? ভক্তপ্রাণের আনন্দগান প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে কি ? তবে ভয় কেন ? দেহান্তে কি ভাবে জাগরণের গান বেজে উঠ্‌বে কে জানে ? কোথায় বন্ধন-বেদনা ? কেবলই মুক্তির জয় শঙ্খ বেজে উঠ্‌বে। এই দুদিনের খেলাঘরে কত ব্যর্থতা, কত দৈন্য নিরাশা ! কে চায় চিরদিন থাক্‌তে ? মৃত্যুর মঙ্গল সুর আশার গান শুনিয়ে যায়, তাই অমৃতধামের যাত্রীর মুখে চোখে আনন্দের হাসি, আনন্দে প্রয়াণ। কোথায় মৃত্যুবিভীষিকা ? যে ইচ্ছায় রূপ গড়ে উঠেছিল, সেই অখণ্ড ইচ্ছালীলাতেই দেববিকাশ দেবত্বের, নব মহিমানন্দ জেগে উঠ্‌বে।

ভক্তপ্রাণের প্রেমানন্দরসসুধা কে পান করেছেন ? সে মধু আনন্দে প্রাণ বিভোর কার ? ধরণীর বুকে বাস কোরেই ও কি আনন্দধ্যানে জীবাত্মার আনন্দসমাধি ! এইত মৃত্যুর সুস্পষ্ট আভাস, এখানেই ত সে আনন্দ সমাধিপুরে আমার বুকের ধনদের দর্শন পাই। কোথায় দেখ্‌ব, ইহলোকে না পরলোকে, কে জানে ? জানি প্রাণময়ে প্রাণপুরেই প্রাণের প্রকাশ, প্রিয়জনদের নিত্য হাসি। সচ্চিদানন্দে হেসে উঠেছেন সব, যতদিন দেহের ঘরে বাঁধা আছি, কই সে পূর্ণ শাশ্বত মঙ্গল-স্বরূপের পরিপূর্ণ পরিচয় ? মৃত্যুর মঙ্গল মহিমায় যেদিন দেহের খেলা শেষ হয়, সে দিন সত্য সত্তা ফুটে উঠে।

তাইত মৃত্যু মানবের পরম সম্পদ। কেন আনন্দময়ী বসুধাজননীর বুকে জেগে উঠ্‌লাম ? কেন অনন্ত যাত্রীর সঙ্গে এ দীন যাত্রীরও যাত্রাগান ? প্রকৃতির বুকে কেন অনন্ত গান বাজে ? তাইত উত্থান পতন হাসিকান্নার বিচিত্র সাধনার ভিতরই জীবাত্মার পুণ্য সত্তা। যুগে যুগে ভক্তজীবনের মর্ম্ম-কথাই এই। সূতিকাগৃহ থেকে শ্মশান ভূমি পর্য্যন্ত কেবলই দেবসাধনা। জীবনরথের সারথী কে ? মরণসখার গোপন রহস্যের ভিতরই দিনরজনী সুরসাধনা, অনন্ত মোক্ষফল-লাভের চেষ্টা, আর পূর্ণ মঙ্গলে পরমনির্ভরের আয়োজন। এই জন্যই যে আমার জাগরণপালা।

এস ওগো মরণসখা, আমার পরমবন্ধু, থাক্ পড়ে এ জীর্ণ অপটু দেহ ; এখন দেবতনু লাভ করি, নিম্ন অধিকার থেকে উচ্চ অধিকার, পরম গৌরব লাভ করি, ক্ষুদ্র তুচ্ছ ইন্দ্রিয়লালসার উর্দ্ধে শাশ্বত অতীন্দ্রিয় আনন্দ সুধা পান করি। কোথায় গেল ক্ষুদ্র আমি ? এ কি মহীয়সী মহিমালোকে আমার আনন্দ সত্তা, এ বিশ্ববুকে ক্ষুদ্র বিন্দু হোয়ে অনন্ত সিন্ধুবুকে মিশে যাই। কেমন কোরে ক্ষুদ্র জ্যোতিকণা মহান্ আদিত্যের জ্যোতির্ম্ময় লোকে উধাও হোয়ে যাই।

এস আমার মরণশরণ, অন্ধ যাত্রীর পরম সহায়, কেন এ ব্যর্থ বিভীষিকা ! কোন্ আলোকে ধরণীর বুকে আমার এ যাত্রাপথের আয়োজন ? কে জানত এ বসুন্ধরার আনন্দকুঞ্জে এ আনন্দ-মেলা ? কে জানে পরমুহূর্ত্তে কি হবে ! একি অব্যক্ত কুহেলী ? জানি কি কোথায় যাব ? তবুও ত প্রতি মুহূর্ত্তে কোন্ অজানার গোপন রহস্য আমারও পথের গতি নিয়ন্ত্রিত কোরছে ! ওগো তেম্‌নি কোরেই আমার মহাযাত্রার আনন্দ গান গেয়ে যাব। অজানার গোপনলীলা তেম্‌নি কোরেই হেসে উঠবে। তবে কেন অবিশ্বাসের শিহরণ ? প্রিয়ধনেরা কোথায়, আমার বুকের মাণিকেরা কার বুকে হাস্‌ছে ? সেই বুকে চলেছি আমি। কেন সে মহীয়সী মহিমা ভুলে যাই ? কে জানে দেহান্তে সব আমার কেমন কোরে দিব্যরূপে হেসে আস্‌বেন ! সে কি আনন্দ সত্তায় বিভোর হোয়ে যাব, কে জানে ?

ওগো রূপসভায় এইত হোল বেশ। মৃত্যু আমার মৃত্যুঞ্জয় হোয়ে এলেন, আমার হৃদয়ঘর শূন্য কোরে দিলেন যেই, শূন্যের ভিতর পূর্ণ মঙ্গল দেখা দিলেন, আর মরণসখার অমৃত-স্বরূপে আত্মপুরে প্রাণে প্রাণে মেশামিশি হোয়ে গেল ! উঃ কত দিনের আকুল প্রতীক্ষা, কত দিনের অশ্রুধারা, কত দিনের রক্তাক্ত বুক আজ সার্থক হোল। মিলনবাঁশি বেজে উঠ্‌ল। এ কি কথা, এ কি অধিকার ! এ কি নবজীবন ! প্রেমসখা, এ কি নিবিড় বন্ধন ! ওগো আমার প্রিয়ধনেরা, সত্য সত্যই নিত্য মিলনগানে চিরগৌরব সঙ্গীত গেয়ে উঠ্‌বেন। ওগো প্রেমসুন্দর, তুমিই ক্ষুদ্র বুকে প্রেমসিন্ধু রচনা করেছ, গভীর থেকে গভীরে নিয়ে চলেছ। মরণদেবতার বিচিত্র স্পর্শে রূপ ঘুমিয়ে পড়্‌লেন, তবু প্রেম ফুরোলো না। কে বলেছে আমার দুদিনের বন্ধন ! এ কি অনন্ত বন্ধন, দেবলোকের সঙ্গে অনন্ত মিলন, গোপনে গোপনে ! কে দেখ্‌তে পাবে, কে স্পর্শ কোরবে ? অথচ প্রেম নিয়ে চলেছে প্রেমসভায়। যা শুদ্ধ পবিত্র মুক্ত, তার ক্ষয়

কোথায়? পুণ্যময়ের পুণ্য জ্যোতিতত্ত্ব পরস্পরে আত্মায় আত্মায় প্রেমযোগ, অক্ষয় মঙ্গল ফল। কোন তপস্যায় এ মোক্ষফলের আয়োজন? এ যে প্রেমের লীলা, তাই বিশ্বযুকে জীবাত্মার আনন্দলীলা।

মরণপ্রিয় আমার চরমসঙ্গী, মৃত্যুবাসরে করুণার গান গেয়ে এলেন, স্রষ্টা পাতা বিধাতার অনন্ত প্রেমালোকে সব হারাণো ছবি উজ্জ্বল হোয়ে উঠুক। যেই মৃত্যুযবনিকা উধাও হোল, এ কি শাশ্বত গৌরবলোকে নবজন্মের আয়োজন! ওগো ভক্ত প্রাণের আনন্দসখা ভক্তবৎসল তুমি যে এ দীনেরও জীবন-সম্বল! তোমায় যখন হারাই তখনই মৃত্যুর অন্ধকার। তোমার কথায়, তোমার সেবায় দিনযামিনী তোমারই পথে চোল্‌তে দাও। এই বিকারের পরপারে নির্ব্বিকার লোকে স্থান দেও। তোমারি আনন্দে নব আনন্দ আশা জাগিয়ে তোল। প্রেম-পথে সকল বাধা ভেঙ্গে দাও। তোমারি আনন্দগানে আনন্দ-সাধনায় দেবত্বের মহিমা লাভ কোর্‌তে দাও। তোমারি আনন্দে সমস্ত মর্ম্মপীড়ন সহ্য করি। তোমারি আশায় আমি শান্ত হই, শুদ্ধ হই, স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রস্তুত হই। ওগো আমার নয়নের জ্যোতিতে তোমারই প্রেমজ্যোতি উজ্জ্বল কর। ওগো তুমি যে অমৃতময় মৃত্যুঞ্জয়, তাই ত মরণস্বরূপে মৃত্যুঞ্জয় মাধুরী ফুটে উঠ্‌ল। ধন্য হোলাম, কৃতার্থ হোলাম। ব্রহ্ম-কৃপাহিকেবলম্‌।

পরলোকগত শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী

মঙ্গলময় ঠাকুর, আজ ১২ দিন হ'ল আমাদের বড় আদরের বাবা তাঁহার পার্থিব দেহ ত্যাগ করেছেন। যে সুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রতিনিয়ত আমাদের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিত, সে দেহ আজ চিতাভস্মে পরিণত হয়েছে। যিনি একদিনও দূরে থাকিলে, যাঁহার শারীরিক অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রতিপদে আমরা সকলে শঙ্কিত ও ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তাম, তাঁর শরীর আজ ইহ-সংসারে কোথাও, কোথাও নাই। কিন্তু ঠাকুর, তাই ব'লে কি বাবা আমাদের আর নাই? বিশ্বাস করি, তিনি আছেন, আছেন—শুধু পরলোকে নয়, ইহলোক পরলোক সর্ব্বলোক এক ক'রে তিনি তোমারই মধ্যে আছেন। হে সত্য দেব! তিনি যেমন ছিলেন আজও তেমনি সুন্দর আছেন, আরও স্নিগ্ধ, শুভ্র ও উজ্জ্বল হ'য়ে আছেন। চিরসুন্দর, তোমার অসীম সৌন্দর্য্যে তাঁহার অনন্ত জীবন চিরউদ্ভাসিত হোক, এই আমাদের প্রার্থনা।

প্রভো! আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে প্রণাম করি ও তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তার পরে, আমাদের পিতা, পরমারাধ্য পিতা, তাঁহাকে প্রণাম করি ও তাঁহার আশীর্ব্বা ভিক্ষা করি। আর আমাদের পিতৃবংশের ও মাতৃবংশের পরলোকবাসী সকল গুরুজনকে স্মরণ করি ও তাঁহাদের আশী-র্ব্বাদ ভিক্ষা করি। বিশেষ ক'রে, আমাদের বড় আদরের ছোট ভাই যে আজ ৯ বৎসর ইহলোক ত্যাগ ক'রে গিয়েছে, তাহাকে স্মরণ করি ও তাহার শুভেচ্ছা কামনা করি। আশা করি, তাঁরা সকলেই আজ এখানে উপস্থিত আছেন এবং আমাদের মধ্যে থেকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতেছেন। আর, ইহলোকস্থ উপস্থিত অনুপস্থিত সকল গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি ও বন্ধুবান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। ইহলোকবাসী পরলোকবাসী সকলের স্নেহসংস্পর্শে এ মঙ্গলানুষ্ঠান সার্থক হউক।

এই অনুষ্ঠানে অধম অক্ষম সন্তান আমরা কি করিব? কিছুই তো করিতে পারি না। তাই কেবল পিতার জীবনকথা কিছু ব'লে প্রাণে শান্তি পেতে ইচ্ছা করি। সে কথাই আজ অতি সংক্ষেপে জ্ঞাপন ক'রে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করি।

বাবার জীবন আমাদের ঘটনাবহুল ছিল না। অতি সাধারণ ভাবেই তিনি জীবন যাপন ক'রে গিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর জীবনে অনেক নাও থাকতে পারে; কিন্তু আমরা জানি এই সাধারণ জীবনই তিনি এমন বিশেষভাবে কাটিয়ে গিয়েছেন, যে, চরিত্র সম্পদে এরূপ জীবন অতি বিরল। দৈনন্দিন কার্য্যা-বলীর মধ্যে তাঁহার কতকগুলি গুণ এমনই স্রোতের মত প্রবাহিত হ'ত, যার সৌন্দর্য্য সত্যই আমাদের চিরমুগ্ধ ক'রে রেখেছে। সেই সৌন্দর্য্যকথাই আজ সাধারণ ভাবে ব'লে আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধা জানাব। এ কথা বল্‌তে যেন সত্য হ'তে বিচ্যুত না হই। বাবা, তুমি একদিন বলেছিলে "দেখিস, তোরা যেন কোনও দিন আমার জীবনকথা বল্‌তে অতিরঞ্জন না করিস্‌।" সেই উপদেশ যেন আজ মেনে চল্‌তে পারি। তোমারই উপদেশ স্মরণ ক'রে আজ তোমারই কথা বল্‌তে আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।

৫২ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে October মাসে বাবা কৃষ্ণ-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের পিতামহ স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তখন কৃষ্ণনগরে Govt. translator ছিলেন। বাবা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বাল্যজীবনের অধিকাংশ তাঁহার কৃষ্ণনগর ও আসামের গৌহাটীনগরে ও শেষভাগ কলিকাতা সহরে কাটিয়াছিল। School এর উর্দ্ধতন শ্রেণীতে তিনি কলিকাতা Albert School এর ছাত্র ছিলেন এবং অতি মেধাবী ছাত্র বলিয়াই তাঁহার নাম ছিল। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে তিনি তদানীন্তন Entrance Examination কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। কিন্তু কলেজে পড়িবার সময়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার দুই বৎসর ক্ষতি হয়। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে তিনি Duff College হইতে B. A পাশ করেন। পরে অসুস্থতা নিবন্ধন, কিছুদিন পড়াশুনা বন্ধ করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি private student হইয়া ইংরাজীতে M A পাশ করেন।

ছাত্রজীবনের অধিকাংশ বাবার ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে অতিবাহিত হইয়াছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান, কোন দিনও ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিতে পারেন নাই। B A পাশ করিবার সময় হইতে কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি মধ্যে মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আসিতেন এবং সাধারণ দশ জনের ন্যায় উপাসনায় যোগও দিতেন। কিন্তু তখনও তিনি উপাসনায় কোনও আকর্ষণ অনুভব করিতেন না—

ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রাণের যোগ স্থাপিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় একদিন সন্ধ্যাকালে ঘোর দুর্য্যোগে তিনি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ট্রামে যাইতেছিলেন। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় তিনি ট্রাম হইতে নামিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রবেশ করেন। সেদিন বাহিরে ভয়ানক জল, ঝড়, দুর্য্যোগে অনেকেই মন্দিরে আসিতে পারেন নাই। কয়েকজন মাত্র উপাসক গভীর ভক্তিভরে ভগবদারাধনায় নিমগ্ন। বাবা যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন তখন ভক্তপ্রবর পরলোকগত হরিমোহন ঘোষাল মহাশয় ভাববিহ্বল কণ্ঠে গাহিতেছিলেন—"কর তাঁর নাম গান, যতদিন রহে দেহে প্রাণ।" এ গানের করুণস্পর্শে বাবা মুগ্ধ হইলেন, দেহ মন প্রাণ গলিয়া গেল, প্রতি রক্তবিন্দু তালে তালে গাহিতে লাগিল, "কর তাঁর নাম গান।" বাবা মোহাবিষ্টের ন্যায় শেষ পর্য্যন্ত উপাসনায় যোগ দিলেন। যখন বাহিরে আসিলেন শুনিলেন অশান্ত প্রকৃতি তখনও গাহিতেছে "কর তাঁর নাম গান।" মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ট্রামে উঠিলেন, সেখানেও শুনিলেন "কর তাঁর নাম গান।" গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর রবেও শুনিলেন "কর তাঁর নাম গান।" দূরাগত কলধ্বনি, তাহাও যেন গাহিতেছে "কর তাঁর নাম গান।' কি যে বাণী সেদিন শুনিলেন, জীবনে আর ভুলিলেন না। সেই দিন হইতে বাবার ধর্ম্মজীবনের সূচনা হইল, ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রাণের যোগ স্থাপিত হইল। এই সময় হইতে বাবা নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং চারি বৎসরের মধ্যে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তারিখে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষা গ্রহণ করিবার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাবা এমনই ধর্ম্মভাবে দীপ্ত হন যে সাংসারিক সকল বিষয়ে তিনি একরূপ উদাসীন ছিলেন। পরহিতৈষণায় সর্ব্বদাই এরূপ ব্যাকুল থাকিতেন যে, অনেকে কেবল এই গুণেই তাঁহার সহিত পরিচিত হ'ন। নিজে অসুস্থ থাকিয়াও তিনি অনেক সময়ে পরের সাহায্য করিতে গিয়া নিজেকে বিপদ্গ্রস্ত করিয়াছেন। কিন্তু বাবার তখন নিজের দিকে দৃষ্টি ছিল না। সৌভাগ্য বশতঃ সেই সময় বাবা কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধুর সংস্পর্শে আসিয়া প্রাণে বড়ই তৃপ্তি বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত তিনি যুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন বলিলেও হয়।

এইরূপ এক পরিবারের সংস্পর্শে মা'র সহিত প্রথম পরিচয় হয়। মা তখন মাতৃপিতৃহীন অবস্থায় তাঁহার বড়দিদির বাড়ীতে ছিলেন। দুঃখিনী মা'র কষ্টে বাবা ব্যথিত হ'ন এবং পরে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। মা আমাদের দেখিতে সুন্দর ছিলেন না, শিক্ষাও তাঁহার অল্পই হইয়াছিল। বাবা একদিকে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তেমনই সুশিক্ষিত ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি লৌকিক হিসাবে অনেক ভাল বিবাহই করিতে পারিতেন এবং সে সুযোগ ও সুবিধাও তাঁর হয়েছিল। কিন্তু সব তুচ্ছ ক'রে, তিনি কেবল গুণকেই বরণ ক'রে প্রকৃত মহানুভবতারই পরিচয় দিয়েছিলেন।

এই সময় হইতেই বাবা প্রকৃত কর্ম্মজীবনে পদার্পণ করেন। যদিও ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে ২।১টী কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তথাপি তখনও তাঁর প্রকৃত কর্ম্মজীবন নিরূপিত হয় নাই। সে সময় তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন, বিবাহিত জীবন যাপন করিবেন না। তাই চাকরীর প্রতি তাঁহার তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি যে পরিবারের সন্তান ও তাঁহার যা শিক্ষা ছিল, ইচ্ছা করিলে তিনি বেশ ভাল কাজই যোগাড় করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সেদিকে মনোযোগ দেন নাই। পরে তিনি শিক্ষকতাই জীবনের একমাত্র কর্ম্ম স্থির করেন এবং আজীবন শিক্ষকতা কাজেই জীবন অতিবাহিত করেন। প্রথমে তিনি কিছুকাল পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষকতা করেন। পরে কাঁথি, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া ও কলিকাতা City College School এ প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এই সিটিস্কুলেই তাঁহার জীবনের শেষ ১২ বৎসর ব্যয়িত হয় এবং মৃত্যুর ১২ দিন পূর্ব্বেও তিনি স্কুলের কাজ করেন।

বাবার কর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রধান গুণ লক্ষ্য করিয়াছি—তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা। এরূপ একান্ত মনে কাজ করিতে খুব কমই দেখা যায়। কর্ত্তব্যকে তিনি সর্ব্বাগ্রে স্থান দিতেন—অন্য কোনও দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। নিজ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন। নির্ভীক চিত্তে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন, লোকে কি বলিবে একবারও ভাবিতেন না। ইহাতে অনেক সময় লোকের বিরাগভাজনও হইতেন, কিন্তু পরিণামে সকলেই তাঁহার প্রশংসাই করিতেন।

তাঁহার আর একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, যখন যে স্কুলে কাজ করিয়াছেন সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়েই তিনি মনোযোগী ছিলেন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি এত ক্ষুদ্র বিষয়েও এত মনোযোগ দিয়াছেন যে, আমরা অনেক সময়ে অবাক হইয়া গিয়াছি। কোনও কাজেই তিনি নিজে তত্ত্বাবধান না করিয়া শান্তি পাইতেন না। দুর্ব্বল অসুস্থ শরীরেও তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন এবং সর্ব্বদাই স্কুলের বিষয় ভাবিতেন। এ বৎসরও অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১৯২৮ সনের স্কুলের Book List ঠিক করিয়া গিয়াছেন।

ছাত্রদের তিনি আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বত্রই ছাত্রদের ভালবাসা পাইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের মঙ্গলচিন্তা করিতেন, রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতেও তাহাদের কথা! এজন্য অনেক সময়ে লোকে তাঁহাকে Strict বলিত, কিন্তু তাহাতে তিনি কখনও নিজ কর্ত্তব্যে শিথিল হন নাই। স্কুলে discipline রক্ষা বিষয়েও তিনি এরূপ অনন্যসাধারণ ছিলেন। কিছুতেই তিনি discipline ভঙ্গ হইতে দিতেন না। শৃঙ্খলার অনেকগুলি নিয়ম তিনি স্কুলে পালন করাইতেন এবং নিজেও পালন করিতেন। হাঁপানী রোগেও তিনি বহুকষ্টে স্কুলবাড়ীর উপরের তলায় উঠিয়া ক্লাস করিতেন। কেহ যদি বলিতেন নীচের তলায়ও ত আপনি Special Class করিতে পারেন, বলিতেন—'না, তাহাতে ছেলেদের ওঠানামায় অপর ক্লাসের পড়ার ক্ষতি হইবে।" যাহাতে স্কুলের সকল কাজই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য তাঁহার এরূপই চেষ্টা ছিল।

অধিকাংশ স্কুলেই বাবা প্রধান শিক্ষকের কাজই করিয়াছেন। সকল ব্যবস্থা তিনি নিরপেক্ষভাবে করিতেন। বন্ধু বা আত্মীয় জন কাহারও প্রতি কোনও বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই এবং এমন তাঁহার ব্যবহার ছিল যে কেহ তাঁহার কাছে ইহা প্রত্যাশাও করে নাই। খোসামোদ তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না এবং কোনও কারণেই কোনও অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন নাই। মৃত্যুর পরে, আমরা আক্ষেপ ক'রে বল্‌তে শুনেছি "এমন নিরপেক্ষ Head master আমরা আর পাব না।"

ব্যক্তিগত জীবনে বাবার কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল। বিশেষভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁহার গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস আত্মীয়-স্বজনের স্নেহে বঞ্চিত হ'য়ে, ব্রাহ্মসমাজে এসে দারিদ্র্যের মধ্যে অনেক দুঃখ কষ্টই বাবা পেয়েছেন; কিন্তু কোনও দিনই তাঁকে এতটুকু ক্ষোভ করিতে দেখি নাই। জীবনের প্রত্যেক কাজে তাঁর গভীর বিশ্বাসের পরিচয় পেয়েছি। স্বভাবতঃই তিনি অল্পভাষী ছিলেন, বেশী কিছু বলিতেন না, কিন্তু অনুভব করেছি, কিসের বলে তিনি সব তুচ্ছ ক'রে, কঠোর সংগ্রাম ক'রে গেলেন।

বাবার আর একটী গুণ ছিল আত্মদানের স্পৃহা। স্বার্থ-ত্যাগের কোন বড় কাজ তিনি ক'রে যাননি, কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবনটাই স্বার্থত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে আসা, তাঁহার বিবাহ, তাঁহার নিজ কর্ম্মক্ষেত্র-নির্ব্বাচন এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যান্য অনেক ঘটনার মধ্যেই তাঁহার আদর্শের পরিচয় আমরা পেয়েছি।

বাবার আর একটী উল্লেখযোগ্য গুণ তাঁহার সত্যানুরাগ। আমরা যতদূর জানি তিনি কোনও কারণেই সত্য পথ হইতে বিচ্যুৎ হন নাই। যদি কোনও ক্ষেত্রে মানুষকে জানা যায় এবং সত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিজ পরিবারে। এই পারিবারিক জীবনে, আমার জ্ঞানে এই ২০ বৎসরের মধ্যে, আমি বাবাকে কোনও দিন কোনও কাজে একবিন্দু মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে দেখি নাই। বাড়ীর কেহ কোনও প্রকারে মিথ্যা ভাবের প্রশ্রয় দিলে তাঁহাকে কতই না ব্যথিত হ'তে দেখেছি! বেশী দিন নয়, একবার বাবার Life Insurance এর জন্য health examination করান হয়। ডাক্তার 1st. Class health Certificate দেন, কিন্তু তথাপি বাবা সে Certificate এ Life insurance করালেন না। তাঁর বিশ্বাস হয় যে, ডাক্তার ঠিক Certificate দেন নাই। agent জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমি জানি আমার স্বাস্থ্য ভাল নহে। আমি Life insurance করাতে পারি না।

তিনি যেরূপ সত্যানুরাগী ছিলেন সেরূপ স্পষ্টবাদীও ছিলেন। ইহাতে অনেক সময় হয়ত লোকের মনে ব্যথাও লাগিয়াছে, তথাপি বাবা কথা ঘুরাইয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার আদর্শ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের দুজন ভক্তিভাজন বন্ধু। বাবা প্রায়ই তাঁহাদের কথা বলিতেন আঃ কি খাঁটী মানুষ! নিজে তিনি সর্ব্বদাই খাঁটী থাকিতে চেষ্টা করিতেন এবং যাঁরা খাঁটীভাবে চলিতেন তাঁদের প্রাণ দিয়ে ভক্তি করিতেন। ইহাতে বোঝা যায় খাঁটী হবার আকাঙ্ক্ষা কিরূপ প্রবল ছিল।

বাবা স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাজে কথা মোটেই বলিতেন না এবং কোনও প্রকার নিরর্থক আমোদ প্রমোদ পছন্দ করিতেন না। যাহা কিছু করিতেন নীরবে করিয়া যাইতেন, আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। অনেক সময়ে দেখিয়াছি চাঁদা কি অন্য প্রকার দান সবই "এক বন্ধু" এই বলিয়া দিতেন।

এরূপ চুপ্‌চাপ্ গম্ভীর প্রকৃতির হইলেও বাবা স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তাঁহার এ পরিচয় বাহিরের লোকে না জানিলেও আমরা জানি। কি স্নেহশীল সন্তান-বৎসলই তিনি ছিলেন! সর্ব্বদাই আমাদের কি ভাবনাই না ভাবিতেন! মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতেও বলিয়াছেন—'মা, তোকে মেরে ফেল্লাম!' আবার বলিয়াছেন—"মনার গায়ে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, গায়ে কি দিয়েছে দেখে আয়।"

শুধু যে পরিবার পরিজনের প্রতি তা নয়, সকলের প্রতিই তাঁহার এক স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। তিনি সকল পরিচিতেরই মঙ্গল চিন্তা করিতেন, দুঃখে দুঃখিত হইতেন, এবং উন্নতিতে আন্তরিক আনন্দিত হতেন।

বন্ধুদের সংবাদের জন্য তিনি সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। অসুস্থ ছিলেন বলিয়া অনেক সময় তিনি নিজে সকলের সংবাদ নিতে পারিতেন না, কিন্তু আমার ভাইদের পাঠিয়ে প্রায়ই তাঁদের সংবাদ নিতেন। রোগশয্যায় শুইয়াও যদি কোন বন্ধুর অসুখের কথা শুনিতেন, যতক্ষণ না তাঁহাদের খবর পাইতেন, অস্থির হইয়া থাকিতেন। এবার মৃত্যুশয্যায় কাতর অবস্থায় যখন শুনিলেন শ্রদ্ধেয় অখিলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় অসুস্থ, এত অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, তৎক্ষণাৎ আমার ভাই শরৎকে পাঠাইলেন এবং সে সংবাদ লইয়া আসিলে তবে স্থির হইলেন।

স্বল্পভাষী ছিলেন ব'লেই বাবা সাধারণতঃ যাহাই বলিতেন মূল্যবান ও সারগর্ভ কথাই বলিতেন। অনেক দিন পূর্ব্বে ট্রেনে একটী অপরিচিত মুসলমান ছাত্রের সহিত আলাপ করায়, তিনি এতই উপকৃত হয়েছিলেন যে, কয়েক বৎসর পরেও সে দিনের সেই আলাপের কথা স্মরণ করিয়ে, নিজের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে Life & Teaching of Mahammad বইখানি বাবাকে উপহার দিয়ে যান।

বাবার আর একটী বিশেষত্ব ছিল তাঁহার গভীর জ্ঞানানুরাগ। আজীবন তিনি পড়াশুনা করিয়াই কাটাইয়াছেন; এবং অনেক বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান অতি গভীর ছিল। যে সমস্ত বিষয়ে বইএর মধ্য দিয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ হয় নাই, সে সকল বিষয়েও খবরের কাগজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান লাভ করিতেন। এমন তন্ন তন্ন ক'রে খবরের কাগজ পড়িতে বড় দেখা যায় না। বর্ত্তমান জগতের সমস্ত ঘটনার সঙ্গে খবরের কাগজের ভিতর দিয়ে নিজেকে যুক্ত রাখিতেন। অসুস্থ অবস্থায় যখন বসিতে পারেন না, দেখিতে কষ্ট হয়, তখনও খবরের কাগজ পড়িতেন। এবার মৃত্যুর ৭ দিন পূর্ব্বেও যখন নিজে আর পড়িতে পারেন না, তখন আমার ছোটভাই সুজিৎ খবরের কাগজ পড়েছে, তিনি রোগশয্যায় শুয়ে তাই শুনেছেন।

সমস্ত জীবনই বাবা অসুস্থ শরীরে কাটিয়েছেন। অনেক বারই তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, আবার সেরে উঠেছেন। অনেকবারই তাঁর জীবন সম্বন্ধে আমরা হতাশ হয়েছি, কিন্তু কোনও দিনই ভাবি নাই, সত্যই তিনি এবার চ'লে যাবেন। বাবা মাঝে মাঝে বল্‌তেন বেশীদিন বাঁচবেন না, কিন্তু সে আশঙ্কামাত্র। এবৎসর কিন্তু তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমরা প্রথমে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই, এখন সব বেশ স্পষ্ট বুঝিতেছি। এবার প্রায়ই বাবা একা চুপ ক'রে বসে থাকতেন; বল্‌তেন, একাই তো যেতে হবে, প্রস্তুত হচ্ছি। সত্যই তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অসুস্থ হবার মাত্র ১২ দিন পূর্ব্বেও তিনি আমাদের একটী বংশতালিকা (geneological table) তৈরী ক'রে যান, এবং মৃত্যুর মাত্র ২৯দিন আগে একটা কবিতা রচনা ক'রে যান। মৃত্যুর পরে তাঁর diary'র প্রথম পৃষ্ঠায় কবিতাটী দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ কবিতাটী আমরা পাই নাই, যতটা পেয়েছি, তার থেকে বুঝতে পারি, তিনি নীরবে কি একান্তভাবেই ভগবানকে চাহিতেছিলেন। অসম্পূর্ণ অবস্থায় কবিতাটীর যতটুকু পেয়েছি তাহা এই—

(১)

আমি চাইতে আসি
তোমার কাছে, চাইতে নাহি পারি—
আমি সুখ চাহি, ধন বিভব চাহি,

প্রাণ ভ'রে কেন চাইতে পারি না
হই যেন তোমারি?

(২)

আমি গাহিব গাহিব করি,
সবখানি প্রাণ দিয়ে একটী বার,
তোমার নামটী শুধু, হরি ;
যেন জীবনের পথে চলতে পারি,
ওগো দয়াল ঠাকুর হরি,
তোমার নামটী বুকে ধরি'।

যে ঠাকুরকে তিনি চেয়েছিলেন, আশা করি আজ বাবা তাঁকে একান্তভাবেই পেয়েছেন। সংসারে বন্ধনের মধ্যে যে দ্বিধা সঙ্কোচ, যে বাধা তাঁহার ঠাকুরকে তাঁর থেকে দূরে রেখেছিল, আজ তা ঘুচে গেছে, তাঁর মঙ্গলময় ক্রোড়ে বাবা আমাদের চিরশান্তি লাভ করেছেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী অষ্ট নবাতিতম মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করিবেন, এরূপ নির্দ্ধার করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সকলে সবান্ধবে এই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিয়া উহাকে সফল করিয়া তোলেন ইহাই একান্ত প্রার্থনা:—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ ব্রাহ্মপরিবারে এবং ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসে উপাসনা।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতঃকালে ঐ ; সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় উদ্বোধন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম। সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, এম এ।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় সঙ্গত সভার উৎসব।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা ; আচার্য্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি সভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। বক্তাগণ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, ডা: কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত পি, মহালানবিশ।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) শনিবার—ছাত্রসমাজের উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭ঘটিকায় উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস। অপরাহ্ণ ২ঘটিকায় আলোচনা সভা ; সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় বক্তৃতা—বিষয়—"ধর্ম্ম ও সমাজ" বক্তা অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) রবিবার—ব্রাহ্ম যুবকগণের উৎসব—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ১ ঘটিকায় আলোচনা সভা। বরাহনগর শ্রমজীবিগণের উৎসব—অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন (হেদুয়া হইতে) ও সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় উপাসনা—আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৯ই মাঘ ((২৩শে জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে ব্রাহ্ম মহিলাদের উৎসব—পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় উপাসনা ; আচার্য্যা শ্রীযুক্তা কামিনী রায়। সিটিকলেজগৃহে পুরুষদিগের জন্য উপাসনা। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায়—বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—উপাসকমণ্ডলীর উৎসব—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা ; সভাপতি পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ; বক্তাগণ—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। ৪ঘটিকায় নগর কীর্ত্তন (বিডন স্কোয়ার হইতে) ; সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) বুধবার—**সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসব**—প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা, ৪ ঘটিকায় ইংরাজিতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ। ৫-৩০ ঘটিকায় কীর্ত্তন। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

১২ মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব, পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আলোচনা। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা ; আচার্য্যা শ্রীযুক্তা সুশীলা বসু। ৪ ঘটিকায়—মেরীকার্পেণ্টার হলে রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় তত্ত্ববিদ্যাসভার উৎসব।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা ; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বালকবালিকা সম্মিলন ; সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায়—ইংরাজিতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় মন্দিরে উপাসনা ; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন। ৯ ঘটিকায় উদ্যানসম্মিলন। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায়—উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

প্রচার—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভগ্ন শরীর লইয়া বিগত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বরে বরিশালে নিম্ন লিখিত কার্য্য করিয়াছেন:—

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় ৮।১০ দিন, খৃষ্টোৎসবে, একটী গৃহপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে, ২।৩টী পারলৌকিক অনুষ্ঠানে, ৩।৪ দিন এক পারিবারিক সাপ্তাহিক উপাসনায়, আচার্য্যের কার্য্য, এক শোকার্ত্ত পরিবারে, এক মুমূর্ষু বন্ধুর নিকটে, এক রুগ্ন বন্ধুপরিবারে ৩ দিন প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি। বি এম্ স্কুলের ছাত্রদিগের পুরস্কারবিতরণসভায় সভাপতির কার্য্য, ২টী ব্রাহ্ম-বন্ধুসভায় সভাপতির কার্য্য ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন। পোষ্টাফিসগৃহে এক বন্ধুর বিদায়-অভিনন্দনে বক্তৃতা। টাউনহলে অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মরণার্থ সভায় সভাপতির কার্য্য। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায়, ব্রাহ্মবন্ধু সভায় অনেকগুলি পারিবারিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন। ব্রহ্মবাদী পত্রিকা সম্পাদন, তত্ত্বকৌমুদী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি লিখন এবং "বাথার পূজা" নামক কবিতা পুস্তক প্রণয়ন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগী-সম্পাদকরূপে সাধারণ সাধারণ কার্য্য। সহরের কয়েকটী হিন্দুপরিবারে রোগীদের তত্ত্বাবধান, গৃহে আগত ও সহরের বহু শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে নীতি ধর্ম্ম, ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা ও প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগ হইতে কলিকাতা থাকিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দুই দিন প্রাতঃকালে আচার্য্যের কার্য্য, যুবক সমিতির পক্ষ হইতে একদিন সাধনাশ্রমে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কথকতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভায় একদিন বুদ্ধের সাধনা ও নির্ব্বাণ বিষয়ে বক্তৃতা, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীলের বাড়ী একদিন কথকতা ও পরিবারে পরিবারে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করিয়াছেন। ভাগলপুর গমন করিয়া দুই রবিবার তথায় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য, একদিন কথকতা, ব্রাহ্মমহিলা সমিতিতে একদিন আলোচনা, পরলোকগত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা ও ২৪শে ডিসেম্বর খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন। পাটনা গমন করিয়া গর্দ্দানীবাগে উপাসনা সঙ্গীতাদি ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী কথকতা এবং বাঁকীপুর রামমোহন রায় সেমিনারীতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কথকতা করেন। গয়া গমন করিয়া কথকতা ও উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। গিরিডি গমন করিয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিহার উড়িষ্যা ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসবে দুই দিন উপাসনা, আলোচনাতে যোগদান ও শেষদিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কথকতা করিয়াছিলেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদারের মাতা চন্দ্রশোভা হালদার ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১১ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর দের পত্নী (শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্তের তৃতীয়া কন্যা) রেণুকা দে দুইটি শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ১লা জানুয়ারী শ্রীমতী স্নেহময়ী মজুমদার ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দাস তাঁহাদিগের পরলোকগত পিতা বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য ও জ্যেষ্ঠা কন্যা স্নেহময়ী প্রার্থনা করেন।

বিগত ২রা জানুয়ারী পরলোকগত বাবু শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস শাস্ত্র পাঠ ও কন্যা কুমারী করুণাময়ী চক্রবর্ত্তী জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ১০৲, প্রচার বিভাগে ১০৲ দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ১০৲ ও বাণীবন ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৮ই জানুয়ারী পরলোকগত কিরণকুমার বসাকের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও শ্বশ্রূমাতা শ্রীমতী ইন্দুমতি ঘোষাল প্রার্থনা করেন।

বিগত ৮ই জানুয়ারী শ্রীমতী বিভাবতী বসু তাঁহার পরলোকগতা বিমাতা সুনীতাবালা মিত্রের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৩৲, ও সাধনাশ্রমে ২৲, টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৬শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ নগরীতে পরলোকগত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কল্যাণীয়া সুলতা ও পরলোকগত ভাই সুন্দর সিংহের পুত্র শ্রীমান শিবস্বরূপের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ কালীকচ্ছ গ্রামে শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দীর পালিতা কন্যা বালবিধবা শ্রীমতী হেমদা দাস ও ত্রিপুরা হরিপুর গ্রাম নিবাসী নবদীক্ষিত শ্রীমান ধনঞ্জয় দাসের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাসের গৃহে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় খৃষ্টোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস খৃষ্ট-বচন ব্যাখ্যা এবং মন্মথবাবু প্রার্থনা করেন। সঙ্গীত, উপাসনা, ব্যাখ্যা এবং প্রার্থনা প্রভৃতিতে উৎসব অতীব মধুর হইয়াছিল। প্রীতিজলযোগে উৎসব শেষ হয়।

বিগত ১১ই পৌষ কল্যাণকুটিরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর চতুঃষষ্টিতম জন্মদিনে একটী মধুর উৎসব হয়। সমাজের নরনারী এবং সহরের অনেক উপাসকবন্ধু যোগদান করেন। জমাট কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। সত্যানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য, মন্মথবাবু মনোমোহন বাবুর রোগমুক্তি ও জীবনের বিশেষত্ব বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রার্থনা, এবং বাবু রাজকুমার ঘোষ ও মনোমোহন বাবু প্রার্থনা করেন। প্রীতি জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিগত ১৩ই পৌষ সর্ব্বানন্দভবনস্থ সমাধিপ্রাঙ্গণে স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয়ের পরলোকগমন দিনে পারিবারিক ভাবে উপাসনা হয়। সত্যানন্দ বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় জমাট কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য এবং উপরত আত্মার উদ্দেশে "তর্পণ" শীর্ষক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সত্যানন্দ বাবু পিতার জীবনপ্রসঙ্গ করিয়া প্রার্থনা করিলে প্রীতিজলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমাজের নরনারী এবং অনেক উপাসকবন্ধু অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বাবু যোগানন্দ দাস বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন বিভাগে ৫৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন।

বিগত ১২ই পৌষ বাবু ললিতকুমার বসুর গৃহে তাঁহার বালক পৌত্র ও শিশু পৌত্রীর পরলোকগমন উপলক্ষে উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। মঙ্গলবিধাতা শোকার্ত্ত পরিবারে সান্ত্বনা এবং উপরত আত্মা দুইটীর মঙ্গল বিধান করুন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালী ক্রমে, গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের ষট্চত্বারিংশত্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

২৪শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে উৎসবের উদ্বোধন। বাবু উমেশচন্দ্র নাগ উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে মিঃ ডি, এন্ মুখার্জ্জি 'অদ্বৈতবাদ' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে উপাসনা। আচার্য্য বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস। অপরাহ্নে বাবু উমেশচন্দ্র নাগ পাঠ করেন। সন্ধ্যার উপাসনায় বাবু ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ডাঃ বি রায় হিন্দীতে উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন; প্রায় ২৫০ লোকের সমাগম হয়। প্রথমে কতিপয় বালিকা গান করে, পরে মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি প্রার্থনান্তে কিছু উপদেশ দেন; তারপর একটী গান হইয়া, প্রীতিজলযোগ হয়। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য বাবু শ্রীরঙ্গবিহারী লাল। ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগীর উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাবু ভবসিন্ধু দত্ত রবীন্দ্রনাথের গান ও তাহার ব্যাখ্যা করেন। সর্ব্বশেষে তিনি শান্তি বাচন করিয়া উৎসব শেষ করেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২৯শে পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ২০ম সংখ্যা।

১৬ই মাঘ, সোমবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯

30th January, 1928.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধু, তুমি তোমার অসীম করুণায় দীনজনদের জন্য তোমার উৎসবদ্বার খুলিয়া দিয়াছ। আমরা কত ভয়ে ভয়ে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম! আমাদের চারিদিকে কেবলই নিরাশার অন্ধকার দেখিতেছিলাম; তুমি কৃপা করিয়া সে অন্ধকার অপসারিত করিয়া আশার আলোক দেখাইলে। তোমার দয়ার তুলনা নাই। তোমার প্রেমের স্রোত অবিরাম গতিতে বহিয়া যাইতেছে; আমাদিগকে তাহা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা এখনও তাহাতে আপনা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে পারি না—নানা বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছি। তুমিই যে সকল ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া নিবে, তাহারই আয়োজন দেখিতেছি। তোমার আরও কত করুণা আমরা পাইব জানি না। তুমি যে জীবন্ত ভাবে কার্য্য করিতেছ, তাহার পরিচয় তুমি দিয়াছ। ইহাতেই আমাদের আশা—আমাদের উপর কোনও আশা নাই। তোমার কাজ তুমি করিবেই। আমাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াও তোমার পথেই অগ্রসর করিবে—তুমি কখনও পড়িয়া থাকিতে দিবে না। ইহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তবে আমাদের সকলের জীবনে, সকল বিষয়ে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক; তুমিই জয়যুক্ত হও। যে ভাবে তোমার ইচ্ছা হয় আমাদিগকে তোমার পথে লইয়া চল, উৎসব সফল কর। আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমারই হই।

অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব

আমরা যে দিনের জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, করুণাময় উৎসবদেবতার অপার কৃপায় তাহা সমুপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকের শোক তাপ দুঃখ বেদনা নিরাশার অবসন্নতার মধ্যে আশাতীত ভাবেই তাঁহার করুণা আমরা পাইতেছি। আকুল প্রাণের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই। পিতা উৎসব-দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, দীন হীনদিগকেও ভিতরে ডাকিয়া লইয়াছেন। তিনি যে কোনও অবস্থায়ই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, দীন হীন জনের তিনিই যে পরম বন্ধু, তাহার পরিচয় তিনি এবার বিশেষ করিয়া দিতেছেন। আরও কত দিবেন তিনিই জানেন। "তাঁহার করুণা মুখে বলা নাহি যায়।" কোনও বর্ণনা দ্বারা উৎসবের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাই আমরা সে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইব না।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রমুখ বন্ধুগণের যত্নে সমস্ত পৌষ মাস প্রতিদিন নগরের বিভিন্ন অংশে ঊষাকীর্ত্তন ও কীর্ত্তনান্তে কোনও এক গৃহে উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক দিন নিমতা গ্রামে, ও অপর এক দিন আন্দুল গ্রামে যাইয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) রবিবার ও ২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) সোমবার প্রাতঃকাল ব্রাহ্ম-পরিবারে ও ছাত্রছাত্রীনিবাস প্রভৃতিতে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উক্ত দুই দিবস অনেক গৃহ সুসজ্জিতও হইয়াছিল। ১লা মাঘ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে দুই বেলা উপাসকমণ্ডলীর নিয়মিত উপাসনা হয়। তাহাতে স্বভাবতঃই উৎসবের জন্য প্রস্তুতির কথা ছিল। প্রাতে শ্রীমতী সুশীলা বসু ও রাত্রিতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী উপাসকমণ্ডলীকে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) সোমবার— সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইলে পর, যথা সময়ে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের আসন

গ্রহণ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে উদ্বোধনের উপাসনা আরম্ভ করেন। "কর তাঁর নাম গান" ইত্যাদি সঙ্গীতটি গীত হইলে পর উদ্বোধন এবং "শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন" ইত্যাদি সঙ্গীতের পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা হয়। তৎপরে "তুমি আনন্দ আরাম আশা বিশ্রামের ঘর" ইত্যাদি সঙ্গীত গীত হইলে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—

এই জগতের তীর্থযাত্রার নিয়মে আর যাহারা অমৃত-পথের পথিক, অমৃতের ভিখারী, তাহাদের তীর্থযাত্রায় কিছু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা কি? দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তীর্থযাত্রায় কিছু পথের সম্বল লইয়া যাইতে হয়, বিনা সম্বলে পথ চলা যায় না; আর অমৃতের যাত্রীকে, অমৃতের ভিখারীকে বিনাসম্বলেই যাইতে হয়। তাই ভক্তদের মুখে শুনি "দীনতা-বসন পর রে"। দীনতা লইয়াই এই তীর্থযাত্রায় যাইতে হয়। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন এ পথে অন্য সম্বল নাই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। "প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে"। রাখ তোমার বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান। প্রখর বুদ্ধি, খ্যাতি প্রতিপত্তি, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, সাধন ভজনের অহঙ্কার, কোনও প্রকার গুণগৌরব এ পথের সহায় নহে, বরং বিঘ্ন। অহঙ্কার মহা বিঘ্ন। আরব দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল উপদেশ শুনিয়াছি তাহার মধ্যে একটি আখ্যায়িকা উল্লেখযোগ্য। আপনারা শুনুন—এক মণিমুক্তা-ব্যবসায়ী বহু মূল্য মণিমুক্তার এক বোঝা লইয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন—উটের পিঠে অনেক বোঝা চাপাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দূর যাইয়া দেখিলেন, যত নিকটে জলাশয় পাবেন ভাবিয়াছিলেন তাহা হইল না; তাঁহার গণনায় কিছু ভুল ছিল। তিনি ক্রমে তৃষ্ণায় কাতর হইতে লাগিলেন। পথশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত ও তৃষিত বণিক যতই জলাশয়ের আশায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই মরুভূমির বিশাল বক্ষ যেন বিশালতর আকার ধারণ করিতে লাগিল। দেখিলেন, জলাশয় অনেক দূরে রহিয়াছে। উট সে বোঝা লইয়া আর চলিতে পারিতেছে না। প্রাণ বাঁচে না। ফেলিয়া দিলেন সব মণিমুক্তার বোঝা, ফেলিয়া দিলেন তাঁহার হীরা জহরৎ যাহা কিছু সব। আগে ত প্রাণ বাঁচান চাই, তাহার পর মণিমুক্তা। রেখে দেও তোমার পদগৌরব, রেখে দাও তোমার খ্যাতি প্রতিপত্তির বড়াই ও গুণগৌরবের কথা। এই পথের যাত্রীদের পক্ষে উহারা বড় ভারী বোঝা। বোঝা ভারী করিয়া চলিয়াছ। এই বোঝা লইয়া অমৃতস্বরূপের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। গুণগৌরব এ পথে বড় বাধা, ভারী বিঘ্ন। অমৃতের যাত্রীকে সব বোঝা পথে ফেলিয়া দিতে হইবে।

পরমপিতা প্রতিদিন দারুণবেদনা দিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, তাঁহার কৃপা ভিন্ন অন্য সম্বল নাই। দারুণ বেদনায় জর্জ্জরিত হৃদয় লইয়া সেই সর্ব্বসন্তাপহারীর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি প্রাণ শীতল করিয়া জুড়াইয়া দিয়াছেন। আর কিছুতেই বেদনা দূর হয় নাই। সাধু মহাত্মারা বলিয়াছেন—A true view of one's self and consequently a low opinion of one's self is the best and most valuable lesson to be acquired. (আপনার বিষয়ে সত্য জ্ঞান এবং সেই হেতু নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়।) কি করিয়া যে তাঁহার সঙ্গে প্রাণের যোগ হয়, এটি জানা বড় কঠিন। আমার কথা আপনাদের বলিতে পারি। আমি দেখিয়াছি, আমি যে দীন হীন ইহা সর্ব্বাগ্রে জানা দরকার। ইহা জানাও কঠিন। তবে এই বিষয়ে সহায়তা পাই। অন্তরতর অন্তরতম এই বাক্যটী স্মরণ করিয়া আমি প্রতি দিন বুঝি, আমি অতি দীন। তিনি আজও আমার অন্তরতর অন্তরতম হন নাই। এ কথা সত্য যে, তাঁহার সেই রূপের আভাস পাইয়াছি যাহাতে অন্য বাসনা থাকে না। "একমেবাদ্বিতীয়ং কামনাহরণং" এই বলিয়া আমি তাঁহাকে ডাকি। তিনি কখনও কখনও সেই রূপের আভাস দিয়াছেন। সেই স্মৃতিই সম্বল। "নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।" কি সুন্দর আকাঙ্ক্ষা, পবিত্র বাসনা! আপনারা আমাকে বেদীতে বসাইলে কি হইবে? আমার এখনও সে অবস্থা হয় নাই যাহাতে বলিতে পারি, "নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।" সে জন্য আমি লজ্জিত। জানি আর সকলই তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র। Malebranche বলিয়াছেন—The littleness of all that is not God. (ঈশ্বর ব্যতীত আর যাহা কিছু সকলই অকিঞ্চিৎকর।) জানি সেই অসীম ব্যতীত প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটিতে পারে না। জগতের সমস্ত সম্পত্তিও সে ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না। তিনি ভিন্ন মানবের লভনীয় ও লোভনীয় অন্য কিছু নাই। তবু কত সময় দেখি মন ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য লালায়িত হয়! সে জন্য তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া লজ্জা পাই। তখন বুঝি আমি কত দীন।

আর এক প্রকারে আমাদের দীনতা অনুভব করি। Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained Strength. (তুমি স্তন্যপায়ী শিশুদিগের মুখ হইতে বল পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছ।) কোথায় তোমার জ্ঞানগৌরব? কত সময় কত স্তন্যপায়ী শিশু ও বালকবালিকার নিকট হইতেও কত শিক্ষা ও বল পাওয়া যায়। পাঞ্জাবে কয়েকটি বালকের সমাধি আছে। তাহারা বালক হইয়াও অনায়াসে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, "হয় ধর্ম্ম ছাড়, মুসলমান হও, না হয় তোমাদিগকে মাটিতে পুতিয়া ফেলা হইবে।" বালকেরা এই ভাবে মরিতে প্রস্তুত, তথাপি ধর্ম্ম ছাড়িতে স্বীকৃত হইল না। তাহাদিগকে জীবিতই মাটিতে পুতিয়া ফেলা হইল। তাহারা কিছুতেই ধর্ম্ম ছাড়িল না। আমার সেই ধর্ম্মভাব ও বিশ্বাসের বল কোথায়? তাহাদের কথা ভাবিয়া লজ্জা পাই। Joan of Arc ১৯ বৎসরের বালিকা; কি ভাবে প্রাণ দিলেন আপনারা অনেকেই জানেন। অগ্নিতে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইল। তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে যে শেষ বাক্য উচ্চারণ করিতে শুনা গিয়াছিল তাহা—"যিশু", "যিশু"। এই বিশ্বাস ও ত্যাগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া লজ্জিত হই, দীনতা অনুভব করি। আপনাদের সম্বল থাকে ভাল, আমার নাই। এই ব্রাহ্মসমাজে দেখিয়াছি মৃত্যুশয্যাশায়ী যুবক পত্নীকে আশা দিতেছেন, 'ভয় নাই, আবার দেখা হইবে।' কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক ঘোর ব্যাধিগ্রস্ত শয্যাশায়িনী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হইল "কেমন

আছেন" ? বলিলেন 'বেশ আছি।' "বেশ আছেন। যখন সমাজে যাইতেন, তখনও বলিতেন 'বেশ আছি,' এখনও বলিতেছেন 'বেশ আছি।" "তখনও বেশ ছিলাম, এখনও বেশ আছি।" এ বিশ্বাসের বল আমার নাই। আমি ত রোগে কাতর হইয়া এরূপ বলিতে পারি না। আমি দীনতা হীনতা অনুভব করি। আর্ত্ত জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দীনতা হীনতা অনুভব করি। কত বেদনা জগতে, কত বেদনা ঘরে ঘরে! কে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবে, আশার কথা বলিবে? সেই শক্তি আজও হয় নাই যে সকলকে বলি কাহারও কোনও ভয় নাই। সেই শক্তি সময় সময় বিদ্যুৎ-ছটার ন্যায় আসে। একদিন আসিয়াছিল, ইচ্ছা হইয়াছিল ছুটিয়া যাইয়া সকলকে বলি "ভয় নাই, কাহারও কোন দুঃখ থাকিবে না, নিশ্চয় একদিন দুঃখ বেদনা দূর হইবে, শান্তি আসিবে।" সেই অবস্থা রাখিতে পারি কই? তাহা যে হারাইয়া ফেলি! তখন নিজের দীনতা হীনতা বুঝিতে পারি।

জগতের কারাগারগুলির কথা ভাবুন। আমাদের কত সহস্র সহস্র ভ্রাতা কারাক্লেশে অশেষ যন্ত্রণা যে ভোগ করিতেছে, আমরা তাহার কি করিতে পারিতেছি? কিন্তু আমরা এ জন্য পরম পিতার নিকট দায়ী। কি ভীষণ দুঃখ কষ্টে তাহারা দিন কাটাইতেছে! কে তাহাদের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবে? কে তাহাদের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বলিবে "ক্ষমা প্রার্থনা কর, ক্ষমা প্রার্থনা কর; ক্ষমা পাইবে, শান্তি পাইবে।" কত জন প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে রহিয়াছে! কাল প্রাণদণ্ড হইবে, আজও অনুতাপ নাই, প্রার্থনা নাই। কে যাইয়া বলিতে পারেন, "অনুতাপ কর, প্রার্থনা কর, ভয় নাই?" বহুদিন হইল Oxford missionএর একজন মিশনারী এরূপ অবস্থাপন্ন এক যুবকের নিকটে গিয়া তাহাকে লইয়া প্রার্থনা করিলেন। আমাদের কয় জনের এই ধর্ম্মবল আছে যে, সে অনুতাপ করিলে মুক্তি পাইবে, এই বিশ্বাস লইয়া এরূপ লোকের নিকটে গিয়া প্রার্থনা করি? ঘরে বসিয়াও এ প্রার্থনা করিতে পারি। আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি, "তুমি অখিলতারণ, সকলের পাপ হরণ কর, সকলকে ক্ষমা কর, পবিত্র কর, জগতের সকল দুঃখ ক্লেশ দূর কর।"

চারিদিকে শোকের আঁধার, কত পরিবার শোকে মুহ্যমান! কত হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! পুত্র উপযুক্ত হইতেছিল, হঠাৎ যোগ্যপুত্র মারা গেল। ব্যবসা করিতেছিল, টাকাকড়ি উড়াইয়া দিল। বৃদ্ধবয়সে আবার বিধবা পুত্রবধূর ভার গৃহস্বামীর স্কন্ধে পড়িল। এরূপ কত পরিবার! সেই সকল আর্ত্ত পরিবারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দীনতা অনুভব করি। বলিতে পারি কোথায় "স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি সকলজীব-সুখকারী হে!" "যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে!" এ স্মৃতিই শোকে পরম সান্ত্বনা। আমাদেরও শ্রুতি ও স্মৃতি দুই আছে। ব্রাহ্ম-সমাজের যে সকল আচার্য্য ও ভক্তগণ পরম পিতার অভয়পদে আশ্রয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত সাধুবাক্য আমাদের স্মৃতি। আর আমরা ব্রহ্মকৃপায় এক এক সময় তাঁহার যে অভয়বাণী শুনিয়াছি তাহা আমাদের শ্রুতি। আমরা কেন বলিতে পারি না, কোন ভয় নাই, শোক থাকিবে না, এক দিন এক মুহূর্ত্তে শোক চলিয়া যাইবে, তাহার স্থলে সুখ আসিবে, আনন্দ আসিবে, প্রেমময়ের প্রেমপীযূষবারির স্রোত বহিয়া যাইবে? এরূপ আমাদের জীবনেও ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সেই অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। Imitation of Christ আপনারা অনেকে পড়িয়াছেন—"তুমি অপরকে সান্ত্বনা দিতে পার, কিন্তু ঘোর দুর্দ্দিনে তুমি চারিদিক অন্ধকার দেখ।" তোমার অনেক বিদ্যা বুদ্ধি আছে, দুর্দ্দিনে তাহাতে কুলায় না। শোকের মধ্যে আমাদের দৈন্য অনুভব করি। এই জন্য শোক পরম সহায়।

"বিনা দুঃখে হয় না সাধন সেই যোগিজনার বাঞ্ছিত চরণ রে।" পরম ধনকে পাইতে হইলে সাধন চাই। আমরা দুর্ব্বল, ত্যাগ করিতে পারি না; তিনি ত্যাগ করাইয়া দেন, বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া দেন। বাড়ী অরণ্য হইয়া গেল, সাধনের বড় সুবিধা হইল। এই পথ দিয়াই যাইতে হইবে। কিন্তু যদি এ পথে নিয়ত অন্ধকারই দেখিতাম, তবে পথেই মৃত্যু ঘটিত, অমৃতনিকেতনে পঁহুছিবার আশা থাকিত না। তিনি জানেন "আমি সহজে দুর্ব্বল, তাহে নিঃসম্বল, বেঁচে আছি কেবল তব কৃপাবলে"। তিনি দয়াগুণে এক এক সময় বুকে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। তাহাতেই পথ পাই, অন্ধকারের মধ্যে আলোক পাই, দুর্ব্বলতার মধ্যে বল পাই—কিছুতেই একেবারে নিরাশার মধ্যে ডুবিতে পারি না। এই রূপে দুঃখ শোকই আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যায়। Dante বলিয়াছেন—Sorrow remarries us to God. (শোক আমাদিগকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্বিবাহিত করে।) শোকে পুনর্মিলন হয়। অন্ধকার দেখিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়। নিরুপায় হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়। বুঝিতে পারি তিনি বিনা আর দিন চলে না। তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, শোকে পুনর্মিলন হইল, তাঁহার শরণ লইতে বাধ্য হইলাম। আসুক তবে জগতের শোকের অন্ধকার—সব অন্ধকার হইয়া যাউক। জগতের বেদনা ভুলিয়া যে শান্তি তাহা কাল্পনিক। এই ভাবেই যদি তিনি পথ চলিবার ব্যবস্থা করেন, তবে তাহাই হউক। একদিন মনে হইল তিনি আমাকে বলিতেছেন "তুমি এই প্রার্থনার ভার বহন করিয়া চল"। জগতের সকল দুঃখ শোকের বোঝা আমার হউক। প্রাণ ভরিয়া বলি "তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে। রবি শশি তারা শোভে না আমার কাছে, যদি হারাই তোমারে। কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে, কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই?" অতি সত্য কথা। এই রূপে শোকসন্তাপের দ্বারা তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছেন।

পাপবেদনা—তাহাও তাঁহার কৃপা—কৃপা! তিনি পুণ্য-স্বরূপ প্রাণে আছেন বলিয়াই পাপে লজ্জিত হই, অনুতপ্ত হই। সে বেদনা কি ভীষণ! "অনুতাপ করিতে ভয় পাইও না, অনুতাপ কল্যাণকর।" St. Paul বলিয়াছেন—আমার তুল্য পাপী জগতে নাই। পাপবেদনায় কি রূপ কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতে হয় সে বিষয়ে সেণ্ট পলের কথার তুল্য মর্ম্মস্পর্শী বাক্য কোথাও পাঠ করি নাই। প্রার্থনা করিতে হয় with groanings that cannot be uttered—যে ভীষণ যন্ত্রণার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না অন্তরে সেইরূপ বেদনা লইয়া প্রার্থনা করিতে হয়। Thomas A Kempis বলিয়াছেন—I

would feel compunction rather than know how to define it. (অনুতাপ কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা আমি হৃদয়ে অনুতাপের বেদনা অনুভব করিতে চাই।) এ বেদনা কি বৃথা? বহুদিন পূর্ব্বে আমার কোন বন্ধুর একটী ১৫ বৎসরের ছেলে মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়াছিল, "আপাততঃ ক্লেশ পাইতেছি, কিন্তু ইহাতে আত্মার কল্যাণ।"

"Of all acts, is not, for a man, repentance the most divine?" মানুষের পক্ষে অনুতাপ কি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র অনুষ্ঠান নহে? আপনার অপরাধ স্মরণ করিয়া গভীর অনুতাপ ও বেদনা অনুভব না করিলে শুদ্ধ হওয়া যায় না। Victor Hugo বলিয়াছেন, "যদি তুমি দেখ নরকে পড়িয়া গিয়াছ, তবু ভীত হইও না। ঐ দেখ তোমার উপাস্য দেবতা, যাঁহার চরণে তোমার গতি মুক্তি, তোমার পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন।"

কে অনুতাপবেদনার বর্ণনা করিতে পারে? Shakespeare ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন না। তথাপি অনুতাপের ভয়ানক চিত্র তাঁহার মত আর কেহ আঁকিতে পারে নাই। পাপবেদনার চিত্র যাহা Macbethএ আছে, এমন আর কোথাও নাই।

জগতে যদি এতই দুঃখ বেদনা, তবে আশা কোথায়? ভরসা তাঁহার অভয়বাণী। "ভয় কি? অভয় দানে তোষেন জগতজনে।" যদি আমরা মাঝে মাঝে তাঁহার অভয়বাণী না শুনিতাম, তবে ত্রাসে বেদনায় মুমূর্ষুপ্রায় হইতাম। তাঁহার সেই অভয়বাণী শুনিবার জন্যই আমরা আবার উৎসবদ্বারে আসিয়াছি। শোক তাপ বেদনা বুঝাইয়া দিতেছে যে, আমাদের কিরূপ অসহায় অবস্থা। সেদিন এক বন্ধুকে বলিতেছিলাম দুই বৎসরের মধ্যে আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ যে শ্মশান হইয়া গেল। এই শ্মশানে বসিয়াই সাধন করিতে হইবে, প্রার্থনা করিতে হইবে। Tennyson বলিয়াছেন—That anchor holds. অকূল পাথারে প্রার্থনা আমাদের কূল কিনারা। প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় না। "যখন যেরূপে বিভু রাখিবে আমারে সেই সুমঙ্গল, যেন না ভুলি তোমারে।" এই কথাই প্রাণে জাগিতেছে। তাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না। ভুলিতেও পারা যায় না।

"নিরঞ্জন সেই যাঁর দরশনে নাহি রহে দুঃখ লেশ হে।"

তাঁহার দর্শনে সকল দুঃখ দূর হয়। দর্শন পাইয়াছি বলিতে পারি না, আভাস মাত্র পাইয়াছি। অনেক দিন পূর্ব্বে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে গীত হইয়াছিল—

"প্রভু মঙ্গল শান্তি সুধাময় হে, জয় পুণ্যনিধে গুণসাগর হে।"

প্রাণে নিয়ত সেই ধ্বনি ধ্বনিত হইতে লাগিল; পথে ঘাটে যেখানে যাই প্রাণে সেই ধ্বনি। কি যে আভাস পাইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তিনি কি বৃথা তৃষ্ণা দিয়াছেন? তাঁহার দ্বার হইতে বৃথা ফিরিয়া যাইব? তাহা কখনও হইতে পারে না। বৃথাই কি তাঁহার সৌন্দর্য্যের আভাস দিয়াছেন? যেরূপ দেখিয়া "লালসা থাকে না অন্য," যে প্রেমজ্যোতি দেখিয়া সকল অভাব দূর হয়, সেই পুণ্যজ্যোতির আভাস পাইয়া বলি—"যাঁর চরণ পরশরতন, পাপি-হৃদয়-তাপহরণ।" তাঁহার চরণস্পর্শে সকল পাপবেদনা দূর হয়, সমস্ত পুণ্যময় হইয়া যায়।

বহুদিন পূর্ব্বে এক পরলোকগত বন্ধু বলিয়াছিলেন—"তোমার প্রকাশে জগত এক মহা তীর্থস্থান হইয়াছে।" কি পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া তিনি ইহা বলিতে পারিয়াছিলেন! সত্যই তাঁহার প্রকাশে জগত পুণ্যতীর্থ হইয়া যায়। আমরা সেই প্রকাশ দেখিতে চাই, সেই পুণ্যস্পর্শ লাভ করিতে চাই। আমরা তাঁহার কৃপার ভিখারী, আমাদের নিকটও তাঁহার অভয়বাণী আসে। আবার তাঁহার কৃপা আসুক, আমরা আবার তাঁহার অভয়বাণী শুনি।

যদি কেহ বলেন, এত পাপ তাপ ভাবিলে উৎসব হয় না, তাঁহাদের বলি তাঁহারা উৎসব বলিতে কি বুঝেন জানি না। আমি কল্পনার উৎসব ভোগ করিতে চাহি না। সত্য প্রকাশ চাই, যাহাতে বলিতে পারা যায় "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং—" সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। ভুলিয়া যাউন আনন্দের লালসা। সেই সত্য প্রকাশের জন্য সকলে প্রার্থী হউন। আবার তিনি আমাদের মধ্যে আসুন, আসুন—আমাদের নিকট প্রকাশিত হউন। তাঁহার প্রকাশে সকল ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা চলিয়া যাউক।

আমরা আবার তাঁহার দ্বারে ভিখারী হইয়া আসিয়াছি। তাঁহার প্রকাশের ভিখারী। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে একটি কথা শুনিয়াছিলাম—"প্রকাশমন্দির।" সেই 'প্রকাশমন্দিরে' প্রবেশ করিয়া পূজা করিতে হইবে। বিশ্বপতি পূজার আয়োজন রাখিয়া দিয়াছেন তাঁহার চরণে; সেই চরণস্পর্শে পূজা করিতে হয়। তবে আমরা সেই "প্রকাশমন্দিরের" দ্বারে আসিয়া প্রার্থনা করি "পিতা, খোল দ্বার, খোল দ্বার!" যেমন বাল্যকালে বিদেশ হইতে বাড়ী গেলে পিতা মাতা দ্বার খুলিয়া স্নেহে আদরে গ্রহণ করিতেন, সেরূপ পরম পিতাকে ডাকিতেছি "পিতা, খোল দ্বার, খোল দ্বার।" শুধু আমার জন্য নয়, কেবল আমাদের কয়েক জনের জন্য নয়, জগতের পাপী তাপী সকলের জন্য প্রার্থনা করি "পিতা, খোল দ্বার, খোল দ্বার।" এক এক সময় মনে হয়, রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে এক ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়াছি। সেখানে যদি আর কিছুই না পাই, সেস্থান মরুভূমি হইলেও যদি সেখানে জগৎকারণকে পাই, তবে পাইয়া বলি "তোমাকে পাইয়াছি, আমার জীবন ধন্য হইয়াছে, আর কিছু চাহি না। অসীম ক্ষমাশীলতা তোমার, জগৎ পাপ ক্ষমা করে না, তুমি কর; জগৎ বেদনা জানে না, তুমি জান। তুমি ক্ষমা কর, বেদনা দূর কর, দ্বার খোল"। আপনারা সকলে এই প্রার্থনা গ্রহণ করুন—"পিতা, খোল দ্বার, খোল দ্বার।" আপনারা যদি গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকেন, আপনারা ধন্য। আমি পথেই চলিতেছি, গৃহে প্রবেশ করিতে পারি নাই। এই প্রার্থনা করিতেছি—"পিতা, খোল দ্বার, খোল দ্বার।"

প্রতিদিন জগতের চিকিৎসালয়গুলির কথা স্মরণ করিয়া, কারাগারগুলির—জগতের অস্থান কুস্থান সকলের—কথা স্মরণ করিয়া, প্রার্থনা করি "অখিলতারণ, পাপতাপহারী পিতা, খোল দ্বার, খোল দ্বার।" এই আমাদের জপমালা হউক, সকলের প্রার্থনা হউক, "পিতা, খোল দ্বার, খোল দ্বার।" জগতের দুঃখ তাপ দূর হউক। এই প্রার্থনা লইয়াই আমরা সকলে উৎসবে প্রবৃত্ত হই।

উপদেশান্তে প্রার্থনা। তৎপরে সকলে দাঁড়াইয়া "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে" ইত্যাদি বন্দনা গান করিলে অদ্যকার উপাসনা শেষ হয়

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার—

প্রাতঃকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

যিনি ভীষ্ম বলিয়া আপনার আমার নিকট পরিচিত, তিনি নামে দেবব্রত। শান্তনুতনয় দেবব্রত এমন একটা কিছু করিয়া ফেলিলেন, যাহা দেখিয়া লোকের একেবারে তাক্ লাগিয়া গেল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল "কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! একে ক্ষত্রিয়, তাতে কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, এই ব্যক্তিও কি না এমন অলৌকিক ত্যাগ করিতে পারিল! এ ত যেমন তেমন মানুষ নয়, এ ভীষ্ম।" সেই অবধি দেবব্রত ভীষ্ম নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন। ভীষ্মের বিভূতি দেখিয়া আর্য্যজগৎ এতটা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, আব্রাহ্মণ হিন্দু অপুত্রকের পুত্র হইয়া ভীষ্মের তর্পণ করিতে গিয়া আজও বলিতেছে :—

(নমঃ) বৈয়াঘ্রপদগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া, 'চরাচরে খ্যাত' প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, জন্মমৃত্যুর বিধাতার ইচ্ছায় ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম মৃত্যুর প্রতিক্ষা করিতেছেন, কোন উচাটন নাই। এ সমত্ব, এ সর্ব্বংসহতা, বিস্মিত না করিয়া ছাড়ে না। আমরা কিছু সকলে ভীষ্ম হইয়া জন্মাই নাই, ইচ্ছা করিলেই অদ্ভুতকর্ম্মা হইতে পারি না। তবে দেবব্রত হইয়া জন্মিয়াছি বটে। যিনি অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারেই আছেন; আমাদের অকিঞ্চিৎকর জীবনের সুখ দুঃখকে বাদ দিয়া নাই। যাঁর ইচ্ছা অর্জ্জুনের শর হইয়া কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের শরশয্যা রচনা করিয়াছিল, তাঁরই ইচ্ছার ঘাত প্রতিঘাতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবন-সংগ্রামে প্রতিদিন শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত ও রক্তাক্ত হইতেছি। মানুষের দুঃখের অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে গিয়া কবি সীতা-সরমা সংবাদে সীতার মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন :—

"সুধাও কি গো ভগ্নী সুধাংশুবদনী,
দুঃখের কাহিনী তোমায় বলব কি!
বিধি সব দুঃখ আহরিয়ে, তাহে গরল মিশায়ে,
গড়েছিল দিদি বুঝি মূরতি জানকী॥"

দুঃখের সময় মানুষ দুঃখকে এইরকম বড় করিয়াই দেখে। তিল থাকিলে ত তাহাকে তাল করা যায়। দুঃখের অনুভূতি একটা সত্য জিনিষ যাহাকে অগ্রাহ্য করিবার যো নাই। দুঃখ একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিবার নয়। আলো ও ছায়ার মত সুখ দুঃখ জীবনের সঙ্গী। সুখের আধখানা জীবনেই কি বিধাতার হাত, বাকী আধখানাতে নয়? তাও কি হ'তে পারে? সেই 'একে' শুধু 'জলে স্থলে শূন্যে' আর সুখে ভাবিব, দুঃখে নয়? তবে যে অন্তরাত্মা অস্তিকে না থাকিয়া দূরে রহিলেন! বিধাতা সদাই তাঁর বিধানে, সে বিধান সুখেরই হউক বা দুঃখেরই হউক। চক্রাঘাতে রুধিরাক্তকলেবর রাজা বাণ শিবসমক্ষে নৃত্য করিতেছিলেন। আশুতোষ তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, বাণ কহিলেন, 'দেব, আমি যেমন বাণ-পীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শোণিতাক্তকলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।" পুত্রত্ব লাভ করিতে গেলে ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইতে হইবে। যতদিন "আমি ও আমার পিতা এক' না হইয়াছি, ততদিন তনয়ত্বপ্রাপ্তি ঘটে নাই। সকলই মায়া, সকলই মোহ, এই বলিয়া পাপ তাপ দুঃখকে উড়াইয়া দিয়া জীন হইবার পথ হীন-যান, প্রকৃষ্ট পথ নয়। মদন ভস্ম করিয়া জীবের শিব হইবার পথ মহা-যান নয়, প্রশস্ত পথ নয়, অন্ততঃ ভক্তির পথ নয়। প্রাণে বেদনা লইয়াও ভগবদ্-ইচ্ছায় সায় দিতে হইবে। নহিলে দুনিয়ার মালিককে মানা হইল না, দেবব্রতের ব্রত রক্ষা হইল না।

আবার আমার ভাবনা চিন্তাই শুধু আমার নয়; পরের ভাবনাও মানুষকে ভাবিতে হয়। প্রেমের পথে চলিতে চলিতে পরের ভাবনা মানুষকে পাইয়া বসে। "আপনি কাঁদিব তাহে দুঃখ নাই, কিন্তু মুছাইব পরের আঁখি"। যেমন নিজের দুঃখে তেমনি পরের দুঃখেও মানুষ কাতর হইয়া বিধাতার দোষ দেয়। অলক্ষিতে অশুভবাদের চোরাবালিতে পা দিয়া তলিয়া যেতে থাকে। পরদুঃখের ভার বহিতে না পারিয়া ভাবে এ কি মঙ্গলময়ের রাজ্য? এত কান্নার রোল, এত চোখের জল, এত অত্যাচার, এত অবিচার! শরশয্যায় শয়ান জনমানবকে দেখিয়া বিমূঢ় হইলে চলিবে না। তোমার সহানুভূতির পশ্চাতে যদি ব্রহ্মানুভূতি, সেবার পশ্চাতে যদি শুভপরিণামাশা, না থাকে, তবে তোমার দৃষ্টি নারিকেলের মালার মতন চিরদিনই আধখানা থাকিয়া গেল। ঘরে বাহিরে তাকাইয়া দেখ, জগন্নাথ তাঁহার জগৎ জুড়ে; এ জগৎ কাণ্ডারীবিহীন নৌকার ন্যায় তাঁহাকে ছাড়িয়া নাই। দেবব্রত মানব, শরশয্যায় থাকিয়াও ঋষি-কবির দিব্য দৃষ্টিতে জগতের পানে তাকাইয়া বল—

"God's in his heaven
All's right with the world.

সায়ংকালে "ব্রাহ্ম সমাজের শত বর্ষের সাধনা" বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) বুধবার—

প্রাতঃকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

মফঃস্বলে কোন ক্ষুদ্র সহরে একটী ব্রহ্মমন্দির ছিল। সেখানে তিন কি চারিটীর অধিক ব্রাহ্মপরিবার ছিলেন না। বহুকালের

কথা বলিতেছি, একবার মাঘোৎসবের সময় মন্দিরটী পত্র পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় সেখানে কোন বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু মন্দিরের ভিতরে গেলে দেখা যায় যে ৩,৪টীর অধিক লোক নাই। তাঁহাদের মধ্যে ক্ষমতাশালী এমন লোক ছিলেন না, বা এমন কোন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন না, যাঁহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক আসিয়া সেখানে জুটিবেন। ১১ই মাঘের প্রাতঃকাল। উপাসনার স্থলে ৩,৪টী লোক বসিয়া আছেন। তাঁহাদের না আছে ধনবল, না আছে জনবল। সুতরাং উৎসবের বাহিরের আয়োজন সামান্যই ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্মপিপাসু ভক্ত লোক ছিলেন। উপাসনার সময় হইলে আচার্য্য বেদীতে বসিলেন। উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনা আরম্ভ করিতে গিয়া আচার্য্য ব্রহ্মপ্রকাশে মগ্ন হইয়া গেলেন। দুই চারিটি কথা বলিতে না বলিতেই তিনি বেদী হইতে নামিয়া নীরব হইয়া বসিলেন। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া গেলেন, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। সজন উপাসনায় যখন একজনের প্রাণে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, একজন যখন ঈশ্বরের জীবন্ত স্পর্শ লাভ করেন, তখন অন্যান্যেরাও তাহা দ্বারা আনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। সেখানেও তাহাই ঘটীয়াছিল। আচার্য্য ও সমবেত উপাসক সকলে ব্রহ্মসত্তায় মগ্ন হইয়া নীরবে বসিয়া আছেন। কোন কথা নাই, উপদেশ নাই, বক্তৃতা নাই। এমন সময় মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া একটী ভদ্রলোক যাইতেছিলেন। মন্দির সজ্জিত দেখিয়া কৌতুহলপরবশ হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সেখানে আসিয়া উপাসনা, উপদেশ বা বক্তৃতাদি কিছু শুনিতে পাইবেন। সুতরাং সকলে নীরবে ও নিঃশব্দে বসিয়া আছেন দেখিয়া প্রথমতঃ তিনি কিঞ্চিত নিরাশ হইলেন। পরে চাহিয়া দেখিলেন যে উপাসকদিগের মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সকলে ভক্তিতে গদগদ, কাহারও বা নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতেছে। সকলেই যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সেই ব্যক্তি তখন বুঝিলেন যে, তাঁহারা এমন কিছু পাইয়াছেন যাহা পাইয়া সকলে একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। সেই ব্যক্তিও অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া এই দৃশ্য সম্ভোগ করিলেন। অবশেষে যখন সেখান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন পথে পরিচিত লোক যাঁহার সঙ্গে দেখা হইল তাঁহাকেই বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মসমাজে আজ কি চমৎকার দৃশ্য দেখিলাম, উহাঁদের মুখ দেখিলেই বোঝা যায় যে উহাঁরা যথার্থই কিছু পেয়েছেন; যান, একবার দেখিয়া আসুন।" তাঁর এই কথা শুনিয়া সত্য-সত্যই কেহ কেহ সেই দৃশ্য দেখিতে আসিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মের আবির্ভাবে যথার্থই ধরাধামে স্বর্গ অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা যে কল্পনা নয়, তাঁহাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের জীবনে যে এক উন্নত অবস্থা দেখা গিয়াছে, তাহা এই উপাসনাপ্রভাবে। ব্রাহ্মগণ দেশে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষাপ্রচার, সমাজসংস্কার, জনসেবা অধর্ম্ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি কার্য্যে অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। দেশের সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া একজন ইউরোপীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "Brahamo Samaj is a power and not of an ordinary kind". এই শক্তির মূল কোথায়? ইহার মূল ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মানুগত জীবন। বহুকাল পূর্ব্বে কোনও সুদূর সহরে একম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহারই অধীনস্থ কয়েকটী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে নীতিবিগর্হিত কার্য্যের নিমিত্ত এক অভিযোগ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে কি দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সতর্ক করিতে গিয়া যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই, "তোমাদের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ হওয়াতে আমি অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি, আমার একান্ত ইচ্ছা যে তোমাদের চরিত্রের সংশোধন হয়। এখানে কি ব্রাহ্মসমাজ আছে? শুনিয়াছি ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মপরায়ণ চরিত্রবান লোক এবং সকল সৎকার্য্যে উৎসাহী। আমার এই পরামর্শ যে তোমরা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান কর: তবে তোমাদের পরিবর্ত্তন হইবে। যদি এখানে ব্রাহ্মসমাজ না থাকে, তবে তোমরা একটী ব্রাহ্মসমাজই স্থাপন কর।" ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া সেই সকল ব্যক্তিরা লজ্জিত হইলেন এবং ঈশ্বরকৃপায় তাহাদের সুমতি হইল। তাঁহারা অবিলম্বে সেই স্থানে ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে সেই স্থানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় শুনিয়াছিলাম যে, একটী হরি-ভক্ত বালক এক দল দস্যুকে হরিভক্তে পরিণত করিয়াছিল। উল্লিখিত স্থানেও একদল দুর্নীতিপরায়ণ লোক ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কত মন্দ লোক ভাল হইয়াছেন, কত পাপী সাধু হইয়াছেন. তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইহার কারণ কি? ব্রহ্মোপাসনার জীবন্ত প্রভাব। ঈশ্বর সকল ভাল'র সার, তিনি সকল শক্তির উৎস। তাঁহার নামে, তাঁহার উপাসনায় দুর্ব্বল মানুষকে শক্তি প্রদান করে, জীবনকে তাঁহার অনুগত করে এবং সকল সাধু কার্য্যে উৎসাহিত করে। এই উপাসনার বলেই ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী হইয়াছিল। আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই যে, ব্রাহ্মসমাজ আর পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিশালী নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে আমাদের উপাসনাতে শৈথিল্য আসিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোকের সংখ্যা হ্রাস হয় নাই; সমাজের জনবল ও ধনবল উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে শক্তির অভাব কোথায়? ব্রাহ্মসমাজ বলিতে একটী উপাসকের দল বুঝায়। ব্রাহ্মগণ যদি এই উপাসনার প্রতি উদাসীন হন, তবে শক্তি কোথায় পাইবেন? শক্তিলাভ করিতে হইলে ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকা চাই। উপাসনা ভিন্ন ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকা যাইতে পারে কি প্রকারে? যদি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ চাও, সমাজকে ধর্ম্মে ও নীতিতে উন্নত দেখিতে চাও, সকল সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে রত থাকিতে চাও, দেশের ও দশের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে চাও, উপাসনাকে নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন কর। দেখিবে নিত্য প্রাণে নূতন সংকল্পসকল উদিত হইবে। আপনাকে

দুর্ব্বল মনে করিয়া নিরাশ হইতেছ? দেখিবে কোথা হইতে শক্তি আসিতেছে। সকল চেষ্টা সফল হইবে, সকল আশা পূর্ণ হইবে। সমাজে নব চেতনার সঞ্চার হইবে, সমাজ শক্তিশালী হইবে। সমাজের শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত নানা চেষ্টা হইতেছে, তাহা ভাল। কিন্তু আমাদিগকে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, উপাসনাকে বাদ দিলে ব্যক্তিগত জীবনের কি পারিবারিক, কি সামাজিক জীবনের, প্রকৃত কল্যাণ নাই। ঈশ্বর করুন, এই বিশ্বাস আমাদিগের উজ্জ্বল হউক। আমরা প্রকৃত কল্যাণের পথ আশ্রয় করিয়া সকলে নবচেতনা ও নব বল লাভ করিয়া ধন্য হই।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "যুগসমস্যা ও ব্রাহ্মসমাজের সমাধান" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সনাতন গৌরের নবাবের অধীনে মন্ত্রীর কর্ম্ম করিতেন। বৈরাগ্যের তীব্র উত্তেজনায় সে কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে কাশীতে যেয়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন, তাঁহার ভক্তদলমধ্যে গৃহীত হইলেন। দিনে দিনে সনাতনের হৃদয়ে নানা তত্ত্বজিজ্ঞাসা স্ফুরিত হইতে লাগিল। চৈতন্য ভেবেছিলেন ৫।৬ দিন মাত্র কাল অবস্থিতি করিবেন, কিন্তু নানা প্রসঙ্গে দুই মাস কেটে গেল। শ্রীচৈতন্য প্রশ্নের উত্তরে সনাতনকে বলিলেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবানে শরণ না লইলে ভক্তি লাভের উপায় নাই। অকিঞ্চন শরণাগত হইতে হইবে, ইহা যেন মনে থাকে। সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন শরণাগতের লক্ষণ কি? শ্রীচৈতন্য বলিলেন :—ভগবানকে লাভ করার পক্ষে যাহা অনুকূল তাহা অবলম্বন করা, যাহা প্রতিকূল তাহা ত্যাগ করা এবং বিপদে আপদে তিনি রক্ষা করিবেন এইরূপ বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করা এবং ভগবানকে রক্ষাকর্ত্তৃত্বে বরণ করা, আর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা ও দীন হীন কাঙ্গালের ন্যায় হওয়া। তিনি ভগবানকে লাভ করিবার জন্য কি না করিয়াছিলেন! জাত্যাভিমানের চিহ্ন, প্রেমের প্রধান অন্তরায়, যজ্ঞসূত্র ছিন্ন ক'রে ফেলেছিলেন এবং দীন হীন কাঙ্গালের বেশে লোকের দ্বারে গিয়ে হরিনাম প্রচার করেছিলেন। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের এই প্রেম ভক্তির ভাব দেখে লোকের হৃদয় বিগলিত হ'য়ে যেত। এমন ভাব হয়েছিল যে লোকে বলিত, গোরা অরুণ নয়নের কোণে যার পানে চায়, যে হরিনামানন্দ চায়। তাহার ভাষায় যে ভক্তিলাভের পথে ধর্ম্মাভিমানের ও অহঙ্কারের স্থান নাই! শরণাগতের আবার অভিমান কি? অন্তরে যদি এই সব ভাব হয়, তবে বাহিরে তাহা প্রকাশ পায়। আর অন্তরে এই ভাব না আসিলে, বুদ্ধি বিদ্যার সাহায্য লইয়া যতই যা করা যায়, তাহাতে হৃদয় সরস হয় না, কৃতার্থ হইলাম এইরূপ ভাব আসে না। ভগবান করুন গভীর সাধনা দ্বারা প্রেম ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হই।

সায়ংকালে "সঙ্গত সভার" উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম "ব্রাহ্মসমাজের সার সত্য" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

এক শ্রেণীর সাধক আছেন, তাঁরা বড়ই অসহিষ্ণু, তাঁদের মনে কোন ভাবের উদ্রেক হওয়া মাত্র তাঁরা এমন ব্যাকুল হ'য়ে পড়েন যে, একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। ক্ষুধার্ত্ত যেমন যা পায় তাই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পায়, ভাল মন্দ বিচার করে না, এও সেইরূপ। ইঁ'দের ব্যাকুলতা প্রশংসনীয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ব্যাকুলতাই ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপকরণ নয়। ব্যাকুলতার সঙ্গে সহিষ্ণুতা চাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুলতার অভাব ছিল না—এমন ব্যাকুলতা ছিল যাতে ঈশ্বরবিরহে সূর্য্যরশ্মি কৃষ্ণবর্ণ ব'লে মনে হোতো। কিন্তু তিনি সহিষ্ণুতা হারাণ নাই। ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির সন্ধানে ছিলেন, ভাবুকতার পাথারে আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই। তিনি আত্মজীবনীতে বলেছেন—"আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য—অন্ধবিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে। তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা আরও বাড়িতে লাগিল, এক একবার ভাবিতাম, আমি আর বাঁচিব না।" ইহাই ব্যাকুলতা ও সহিষ্ণুতার সম্মিলনের পথ—মণিকাঞ্চনের যোগ। এই ধীর আত্মচিন্তার পথে কিরূপে চলতে হয়, মহর্ষি স্বীয় অভিজ্ঞতা হ'তে তার ইঙ্গিত করেছেন—"এই বিষাদ-অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয়জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত আমি যে জ্ঞাতা, তাহাও তো জানিতে পারি। দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও মননের সহিত আমি যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়, শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্ব্বপ্রথমে এই আলোকটুকু পাই। যেন ঘোর-অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্যকিরণের একটি রেখা আসিয়া পড়িল। বিষয়বোধের সহিত আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি, ইহা বুঝিলাম। পরে যতই আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে, আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চারিত হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবনপোষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটি কাহার লক্ষ্য? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে না, চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটী চেতনাবান্ পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র

মাতার স্তন্য পান করে। ইহা কে তাঁহাকে শিখাইয়া দিল? তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল? যিনি তাঁহার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎসংসার চলিতেছে। যখন এতটুকু জ্ঞানের আমার ফুটিল, তখন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদ-ঘন অনেক কাটিয়া গেল। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম।" ইহাই ঋষি-প্রদর্শিত দীপোপম আত্মতত্ত্বের আলোকে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হয়, তারই আভাস। উপনিষদে আছে,

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ,
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।
শ্বেত। ২।১৫

দীপস্বরূপ আত্মজ্ঞানের সাহায্যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি পরমপুরুষকে জেনে সকল বন্ধন হ'তে মুক্ত হন। কোন্ অতীতকালে ঋষিহৃদয়ে এই তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছিল, তা কে নির্ণয় করবে? কিন্তু ইহার সফলতা আমরা মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথের জীবনে দেখতে পাচ্ছি। তিনি আত্মতত্ত্বের আলোকে ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে সকল পাশ হ'তে মুক্ত হয়েছিলেন।

প্রথম, জ্ঞানগরিমার পাশ। মানুষ জ্ঞানগর্ব্বে অন্ধ হ'য়ে পড়ে। অপরা বিদ্যার কথা তো দূরে, পরা বিদ্যার চর্চ্চা করতে যেয়েও মানুষ অহংকারে মত্ত হয়, পরমপুরুষকে না দেখে' নিজেকেই দেখে। মহর্ষি ফিক্টে প্রভৃতির দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, ভূতত্ত্বের একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান বহির্ম্মুখীন হয় নাই। সকল জেনেও বন্ধনমুক্ত ছিলেন, গেয়েছিলেন— ব্রহ্মরূপাহি কেবলম্

পাশনাশহেতুরেষ, নতু বিচারবাগ্বলম্
দর্শনস্য দর্শনেন ন মনোহি নির্ম্মলম্।
বিবিধশাস্ত্রজল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলম্।

এই গীত উপনিষদের, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" —এই প্রসিদ্ধ বাক্যের পুনঃ সংস্করণ মাত্র।

দ্বিতীয়, ভোগবিলাসের পাশ। প্রিন্স দ্বারকানাথের সে পাশ অত্যন্ত গুরুতর হইলেও, দেবেন্দ্রনাথ ঋষিনির্দ্দিষ্ট আত্মতত্ত্ববলে তাহা ছিন্ন করতে সমর্থ হলেন। শুদ্ধোধনের ন্যায় পুত্রের গতি-রোধার্থ দ্বারকানাথ যদিও আয়োজনের ত্রুটী করেন নাই। যেদিন বাগানবাড়ীতে গান বাজনার এক জমকাল মজলিস্, সেই দিন দেবেন্দ্রনাথের পড়লো তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনের দিন। দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমরা সেইদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব, অতএব এ গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আমি আজ বাগানের মজলিসে যাইতে পারিলাম না।" তারপর মহর্ষি লিখছেন—"আমার হৃদয় যে বলিতেছে 'তোমা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ', তখন যে আমি উপনিষদে এই কথা পড়িয়াছি:— 'ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্যঃ'। আর কি কেহ বিষয়েতে আমাকে ডুবাইতে পারে? আর কি কেহ আমাকে ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে?"

তৃতীয়, মান মর্য্যাদার বন্ধন ও লোকনিন্দার পাশ। অনেকে সকল বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়েও, এই বন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হন না। দেবেন্দ্রনাথ যখন হিন্দুমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করবেন না ইহা ঠিক করলেন, তখন সকলে দ্বারকানাথের মানমর্য্যাদার কথা উল্লেখ করতে লাগলেন। খুল্লতাত রমানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাজা দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি লোকনিন্দার ভয় দেখাতে লাগলেন। দক্ষিণহস্তস্বরূপ ভাই গিরীন্দ্রনাথও ভয় পেলেন। মহর্ষি কিন্তু অটল রইলেন—প্রথম অপৌত্তলিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হ'ল। মহর্ষি লিখছেন—"জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরও গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাহি না।" এইরূপ কৃতকার্য্যতায় যে ধর্ম্মের জয় অনুভব করা, ইহা আধ্যাত্ম জীবনের উচ্চতম সোপানে অবস্থিত।

চতুর্থ, ধনসম্পত্তির পাশ। কার ঠাকুর কোম্পানীর বৃহৎ কারবার নষ্ট হ'লে মহর্ষি যে ট্রাষ্ট সম্পত্তি পর্য্যন্ত পাওনাদার-দিগকে দিতে গিয়েছিলেন, তা এখন প্রবাদবাক্যেই পরিণত হয়েছে। সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা সংসারে থেকেও ভোগ বিলাসের সকল আয়োজন পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম-সাধনের উচ্চতম গ্রামে অবস্থিত। ত্যাগে কষ্ট অনুভব না ক'রে মহর্ষি আনন্দই অনুভব করেছিলেন। মহর্ষির এ সময়কার মনের ভাবটি কি চমৎকার—"চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। হে ঈশ্বর, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল; এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।"

পঞ্চম, শোকপাশ। পুত্রশোকে মানুষ আত্মহত্যা করে, পাগল হয়। এ দেশে ব্রহ্মজ্ঞানীর পরীক্ষা পুত্রশোকে। মহর্ষি পুত্র হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ ব্রহ্মজ্ঞানীর মত শান্ত ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

ষষ্ঠ, জরাপাশ। মহর্ষি ইহলোকেই জরা মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে দিব্যধামবাসী হয়েছিলেন। যখন তাঁহার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করেছিল, তখন তিনি বলতেন "আমি ইহলোকেও নাই, আমি পরলোকেও নাই, আমি ব্রহ্মের মহিমালোকে বাস করিতেছি।" জরা যত বৃদ্ধি পাইতেছিল 'ব্রহ্মতেজ' যেন তাঁহার মধ্যে তত অধিকতর প্রবেশ করিতেছিল। তিনি জরার উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন।

সপ্তম, মতভেদ পাশ। এই পাশ ছিন্ন করতে না পেরে কত সাধু মহাত্মা নরহত্যা পর্য্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাইবেলে মতাবরোধীদের প্রতি যে অকথ্য গালাগালি বর্ষিত হয়েছে তা নয়, তাহাদের প্রতি অনন্ত নরকের ব্যবস্থা হয়েছে। কি কঠোর মনোভাবের পরিচায়ক! যে বুদ্ধদেবের মুখে কোথায়ও একটী কটুবাক্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার মুখেও বিরোধী জ্ঞাতি-ভ্রাতা দেবদত্তের প্রতি নরকের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষির অন্তরে এই বিরোধও দাগ বসাতে পারে নাই। কেশব-চন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের পরে মহর্ষি যে তাঁহাকে সময়ান্তরে একখানা চিঠি লিখেছিলেন তাহা এই—

"আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ!

"৩০শে আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল; তাহার শিরোনামাতে চির পরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে সত্য সত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্য মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

"আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি, এমন আর কাহারও কাছে পাই না। তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি, এখনও তোমার নিকট হইতে সায় পাইতেছি। তোমার নিকট কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগবন্ধন হইয়াছিল! নানা প্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই।"

আমরা মহর্ষির জীবনে উপনিষদের একটী শ্লোকের সার্থকতা দেখ্‌লাম। আর একটী শ্লোকের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে আমরা উপসংহার করবো। এ সেই শ্লোক যা উড়ে এসে তাঁর হাতে পড়েছিল—তখন তার অর্থ তিনি বুঝ্‌তে পারেন নাই। সে শ্লোকটী এই—

ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্।

জগতে যা কিছু আছে ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত কর। মহর্ষির জীবনে এ আদেশ কেমন পরিস্ফুট! পদ্মগন্ধে তিনি ভগবানের গাত্রগন্ধ অনুভব করেছেন। দাবানলে ভগবানের বহ্নি-উৎসব দর্শন করেছেন। সমুদ্রতরঙ্গ দেখে বিহ্বল হ'য়ে নৃত্য করেছেন, আবার পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছেন। কোমলে কঠোরে ভগবানের লীলা অনুভব করেছেন। নিজেকে এমনি ভাবে ব্রহ্মে লীন ক'রে দিয়েছিলেন যে, 'গৃহে ফিরিয়া যাও', হিমালয়ে এই আদেশ পেয়ে তাহা গ্রহণ কর্‌তে একটু বিলম্ব হ'তেই, "দেখি যে হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড়্ ধড়্ করিতেছে। আমার শরীরে এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনও রূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল।" কিন্তু যেই গৃহে ফিরিবার আয়োজন হ'ল, অমনি সব ঠিক। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" যে কেমন ক'রে তাঁর জীবনে মূর্ত্তি গ্রহণ করেছিল তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "মা গৃধ কস্যসিদ্ধনম্"—সর্ব্বস্ব দিয়েও তৃপ্তি নাই, হাতে একটা আংটী ছিল তা দিলেন এবং বল্লেন, "যাবৎ অঙ্গে একটী চীর পর্য্যন্ত থাকিবে তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে সব দিলাম।" কোন্ কালে কোন্ অরণ্যে এই "ঈশা বাস্যং" মন্ত্ররূপ বীজ কোন্ ঋষিহৃদয়ে উপ্ত হয়েছিল, আজ আমরা তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথরূপ ফুলফলশোভিত সুন্দর বৃক্ষ রূপে দেখ্‌তে পেলাম। বাস্তবিক, এই ভোগবিলাস-পিপাসু সভ্যতার দিনে মহর্ষির জীবন ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ দান। ভগবান করুন, আমরা যেন তাঁহার এই অমূল্য দানের সদ্ব্যবহার কর্‌তে সমর্থ হই।

সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন দাস, শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহর্ষির জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় প্রারম্ভে ও শেষে বক্তৃতা করেন।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) শনিবার— ছাত্র সমাজের উৎসব। প্রাতঃকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

উৎসবের ভিতরকার কথাটি হচ্ছে প্রাচুর্য্য। প্রতিদিনকার জীবনে আমরা যাহা পাইয়া থাকি, উৎসবের দিনে তদপেক্ষা অনেক বেশী পাব, এই আমাদের আশা। কিন্তু তাই বলিয়া প্রতিদিনকার জীবনে যদি আমরা কিছুই না পেয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও যদি আশা রাখিবার আর কোন সূত্র না পাই, তবে উৎসবের দিনের প্রাচুর্য্য আমাদিগের অন্তরে তীব্র বেদনাকেই জাগাইবে, আনন্দকে নয়। যে কাঙ্গাল ক্ষুধার্ত্তের সম্বৎসর শাকান্নও জুটে নাই, এবং যাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নব বর্ষ কোন নূতন সমাচার নিয়া আসে নাই, বৎসরান্তে উৎসবের ভূরি ভোজনের নিমন্ত্রণে আসা কি তাহার পক্ষে একটা নিতান্তই নিষ্ঠুর বিদ্রূপাত্মক সাজা নয়? উৎসবক্ষেত্রে তাহার জন্য কাঙ্গালী-ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু উৎসবস্বামীর পার্শ্বে অবাধিত আনন্দ-পানভোজনে তাহার স্থান নাই।

আমরা ভবানীপুর সম্মিলনসমাজে বৎসর বৎসর হেমন্ত ঋতুতে 'নবান্ন উৎসব' ক'রে থাকি। চাষী চৈত্র বৈশাখের খরতাপে পুড়িয়া পুড়িয়া জমী চাষ করিয়াছে; কঠিন মাটিতে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে দৃঢ়মুষ্টিতে লাঙ্গলখানি ধরিয়া চষিবার সময় তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই, কিন্তু আশা রাখিয়াছে আষাঢ় শ্রাবণের বারিধারা ইষ্টকসদৃশ কঠিন চষা মাটিকে গলাইয়া কর্দ্দমাক্ত করিয়া দিবে। সে ধান্যের চারা রোপণ করিতে করিতে, সদ্যজাত শিশুর পানে মায়ের মত, দেখিয়াছে বর্ষার মেঘ ও রৌদ্র সেই চারাগুলিকে কেমন আদর দিয়া সবল ও সতেজ করিয়া তুলিয়াছে; বর্ষাশেষে ফলিতপ্রায় গাছগুলিকে সে কত যত্নে বিঘ্ন ও শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিতে কত রজনী বিনিদ্র হইয়া কাটাইয়াছে; শরতে ধান্যের শিষ্‌গুলি যখন সোণালী রং ধরে' উজ্জ্বল সৌর-কিরণে অল্প অল্প বায়ুহিল্লোলে দুলিয়াছে তখন চাষীর প্রাণও আশায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। অবশেষে হেমন্তের সন্ধ্যায় কাটা ধান্যের সোণালী বোঝাগুলি বাঁশ দিয়া গাঁথিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে যাইতে তাহার প্রাণ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মাটি চাষ হইতে শস্যকর্ত্তন ও বহিয়া লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত শস্যজীবনের প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে সঙ্গে চাষীর জীবনের একটি অনুকূল প্রবাহ চলিয়াছে। শস্য এক দিনে তার সোণালী মুকুট পরিবার অধিকার পায় নি। তার জীবনী-শক্তিকে মাটির কাঠিন্য ভেদ করে' ভিতর হ'তে রস আহরণ করিতে হইয়াছে, বর্ষার প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে

রাতারাতি বাড়িয়া উঠিয়া নিমজ্জন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে, প্রখর রৌদ্রতাপ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনার জলীয় শাঁসকে পরিপক্ক করিতে হইয়াছে। শস্যজীবনের এই সকল কাঠিন্য ও সংগ্রাম চাষী অম্লানচিত্তে আপন জীবনের সফলতার পথে অপরিহার্য্য ও অপ্লাবনীয় কাঠিন্য ও সংগ্রাম বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে। আমার ও আপনার হইয়া সে বিশ্বপালয়িত্রী জননীর বিধান পালন করিয়াছে; তাই প্রতিদিন কুন্দপুষ্পের মত ধপ্‌ধপে সুমিষ্ট অন্নভরা থালা আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। তাই চাষীর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা মিশাইয়া এই 'নবান্ন উৎসব' করতে আমরা ভালবাসি। সেই কৃতজ্ঞতার দিনে আমরা বিশেষরূপে স্মরণ করিতে বাধ্য হই, চাষীজীবনের কাঠিন্যের ভিতর দিয়া স্ফুরিত সফলতা ও তার ভিতর দিয়া বিশ্বজননীর সর্ব্বজীবপালয়িত্রী স্নেহলীলা।

আমাদের এই উৎসবের দিনে কি এইরূপ একটি সংগ্রাম হইতে স্ফুরিত জীবনের সফলতা জুঁই চাপার মত সুগন্ধ বিতরণ করছে না—সোণালী ধান্যের আঁটিগুলি যেমন গৃহাভিমুখী চাষীর নাসাপুটে সুগন্ধ ঢালিয়া দিয়া তার চিত্তকে উচ্ছ্বসিত করিতেছিল? যদি না ক'রে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে আমাদের ধর্ম্মজীবনের বিকাশের স্তরে কোথাও আমরা স্বভাবের পথে থাকিতে পারি নাই। জীবনীশক্তি যাহাদের মধ্যে শত ফুলে ফলে বিকশিত হইবার জন্য প্রতিযোগিতা করিতেছে, যাহাদিগের ফুটিবার পথে ক্ষতিলাভগণনা বা যোগক্ষেমচিন্তা বাধা রচনা করিতে সাহসী হয় না, যাহাদিগের অন্তরের আশা সকল সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়, যাহারা ভাঙ্গা গড়ার সকল কাঠিন্যকে ক্রীড়াকন্দুকের মত বরণ করিয়া লয়, যাহারা মৃত্যুর কোলে Nearer, nearer to Thee, o Lord" বলিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ভালবাসে—আজ সেই প্রারব্ধজীবন ভাই ভগিনী, আপনাদের সঙ্গে উৎসব করিতে আসিয়াছি। আজ জীবনের উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়াছি—একনিষ্ঠ ধ্যান ধারণা বা প্রগল্‌ভা-ভক্তির উৎসবে নয়!

ব্রাহ্মধর্ম্ম ধর্ম্মজীবনের কোন্ আদর্শকে হাতে লইয়া আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছে? সে কি বেদান্তের ব্রহ্মাত্মৈক-বোধ দ্বারা আনন্দ, সাংখ্যের কৈবল্যদ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের মিথ্যা জ্ঞানের অপনয়ন-দ্বারা অপবর্গ ও নিঃশ্রেয়স? অথবা সে কি বৌদ্ধের নির্ব্বাণ, না, বৈষ্ণবের প্রগল্‌ভা ভক্তি? অথবা, যে হেতু ব্রাহ্মধর্ম্মবিধান সর্ব্বশেষে প্রকাশিত, এ সকলের সমন্বয়ে যাহা তাহাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আপনাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শরূপে ধরিয়াছেন? না, ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের এক অত্যাশ্চর্য্য আদর্শ ধরিয়াছেন; জীবনের এক অভিনব সার্ব্বভৌমিক সংজ্ঞা দিয়াছেন। ভারতের প্রায় সমস্ত ধর্ম্মবিধানই ধরিয়া লইয়াছেন, জগতে দুঃখ আছে, জীবন ত্রিতাপের অধীন, অথচ দুঃখ ও তাপ ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান পাইতে পারে না—অতএব দুঃখতাপময় জগৎ মিথ্যা। কেহ বলিয়াছেন মিথ্যা জ্ঞান তিরোহিত হইলে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, এই মিথ্যা জগৎজ্ঞান চলিয়া যাইবে, আর তখনই সকল দুঃখের আত্যন্তিক লয় হইবে; কেহ বলিয়াছেন আপন স্বরূপে অবস্থান হইলেই প্রকৃতি তার সুখ দুঃখময় জগৎ-প্রপঞ্চ লইয়া সাধকের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবেন; কেহ বলিয়াছেন সর্ব্ব বাসনার নির্ব্বাণদ্বারাই ত্রিতাপের অবসান হইবে; আর কেহ বলিয়াছেন অহরহ নিরবচ্ছিন্ন সমযোগে ভক্তিমার্গে বিহার করিতে পারিলেই ভগবানের সাযুজ্যহেতু আনন্দলাভ হইবে—তাহা ভিন্ন জীবের ত্রিতাপ দূর করিবার আর কোন পথ নাই।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের যে আদর্শ ধরিয়াছেন তাহাতে দুঃখ তাপ সংগ্রামের স্থান আছে, দেশ কালের অধীন জগতের স্থান আছে। দৈহিক জীবন বা Physical life এর অনেক প্রকার বিকাশভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু মোটামুটি তাকে দুইভাগে বিভক্ত বলিয়া আমরা চিন্তা করিতে পারি। এক উদ্ভিজ্জগতে, আর এক প্রাণিজগতে। Physical life উদ্ভিজ্জগতে যে বিকাশের পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উহা জঙ্গমত্ব বা চলিষ্ণুতাকে খর্ব্ব করিয়া স্থাবরত্ব দ্বারাই তার চরম বিকাশটিকে পাইতে চাহিয়াছে। উদ্ভিদ্ তার স্থাবরত্বের নিবিড়তা দ্বারা অভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তিকে এমন আশ্চর্য্য বিকাশে—ফুলে ও ফলে—ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রাণিজগতে জীবনী-শক্তির এমন সৌন্দর্য্যে সৌগন্ধে ও মাধুর্য্যে পরিণতি দেখা যায় না; কিন্তু সেই পরিণতি জীবগণের মধ্যে অন্য ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার চলনভঙ্গিমায়, শক্তির প্রাচুর্য্যে, কর্ম্মের উদ্যমে, হর্ষপুলকের লীলায়। ঠিক এই রূপেই মনে হয়, অধ্যাত্মজীবনও কোন কোন ক্ষেত্রে জঙ্গমত্ব ও শক্তির দিক খর্ব্ব করিয়া স্থাবরত্ব ও সত্তামাত্রায় আপনার পরিণতিকে খুঁজিয়াছে।

চিরকাল জিজ্ঞাসু ভক্তের নিকট ভগবান্ এক অনির্ব্বচনীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া ভক্তগণ বলিয়াছেন, ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ, আবার তিনি সবিশেষ—সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত হ'য়ে আছেন; তিনি নিষ্ক্রিয় সত্তামাত্র, আবার তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল; তিনি সর্ব্বলক্ষণ-বর্জ্জিত, অনির্ব্বচনীয়, আবার তিনি ব্যক্তিরূপী, অন্তরতর অন্তরতম, প্রিয়জন, পিতা, সখা, গুরু ইত্যাদি। এই যে দুই দ্বন্দ্বকূটে প্রকাশমান ভগবান্, তাঁহাকে সম্যক্ রূপে পাইতে হইলে সাধকেরও এই দুই দ্বন্দ্বকূটকে স্বীকার করিয়া, এই দুই দ্বন্দ্বকূটেই অবস্থিতি করিয়া, তবে মিলন-অভিসারে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন মানবপ্রকৃতি এই দুই দ্বন্দ্বকূটে অবস্থান বিপজ্জনক মনে করিয়া, অথবা একটে অপরাপেক্ষা হীনতর মনে করিয়া এবং অন্যকে চরম বলিয়া ধরিয়া, অধ্যাত্ম জীবনের পরিণতিকে অন্বেষণ করিয়াছেন।

তাঁহাদের দৃষ্টিতে নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরই যেমন সত্য ঈশ্বর, ঠিক তেমনি মানবাত্মারও সর্ব্ব বিশিষ্টতাবর্জ্জিত চিন্মাত্র সত্তার দিকটাই কেবল আসল ও সত্য। তাই মানবের সেই পরিণতির পথেও তাহার সর্ব্ব ইচ্ছাকে ত্যাগ ও কর্ম্মের পরিহার অপরিহার্য্য। তাহারা নিজেকে সকল দিক হইতে প্রত্যাহার করিয়া ধ্যানপ্রবাহে নির্ব্বিশেষ সত্তাতে পার্যবসিত

করিয়া সুখে অবস্থান করিতেই ভালবাসেন। বিশিষ্টতাময় জগৎ তাই তাঁহাদের নিকট অবস্তু ও মিথ্যা। যাহারা এই পথে ভগবানের সঙ্গে মিলিতে যান, তাহারা যেন গিরিশৃঙ্গে তাঁহার সঙ্গে মিলন সম্ভোগ করেন, কিন্তু তাহারা মানব সাধারণের জন্য কোন আনন্দের সুসমাচার লইয়া ফিরিয়া আসেন না।

কিন্তু মানুষের সমগ্র জীবনখানি তাহার দেহ ও জগৎ-সম্বন্ধবিরহিত নহে। ইহা ভগবানেরই ইচ্ছা যে, আমরা আত্মধর্ম্মী হইয়াও দেহী ও জড় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অন্ততঃ যতদিন আমরা এই জগতে আছি, ততদিন দেহ ও জগৎকে বাদ দিয়া আমরা আমাদের জীবনের পরিণতিকে কখনই লাভ করিতে পারি না। যাঁহারা তাহা পাইতে প্রয়াস পান, তাঁহারা সৃষ্টিমূলে ভগবানের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিতে প্রয়াস পান। তাই মানবের জীবন সত্যিকার হইতে হইলে তাহাতে যেমন Transcendental এবং static উপলব্ধির স্থান রহিয়াছে, তেমনি তাহাতে immanent বা বিশিষ্টতাযুক্ত এবং Dynamic বা শক্তিমূলক—কর্ম্ম ও সেবামূলক—উপলব্ধিরও অবকাশ রহিয়াছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে এই তত্ত্বটি এইরূপ দাঁড়ায়:—মানব স্বরূপাংশে ঈশ্বরসন্তান—ঈশ্বরের সঙ্গে এক। এই ঐক্যের আকর্ষণই ভক্তি ও প্রেমের মূল। ঐক্যমূলক প্রেমের আকর্ষণে মানবাত্মা যেমন একদিকে আপনাকে আত্মরূপে, জড়াতীত অমৃতের সন্তানরূপে, উপলব্ধি করেন, তেমনি অপরদিকে বিশ্বে ওতঃপ্রোত ভগবানের বিশিষ্ট ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, তাঁহার লীলাধারায় তাহার স্থান কি অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে ও সৃষ্টিলীলায় ভগবানের কি ইচ্ছা তাহাও উপলব্ধি করেন। সেই অবস্থায় মানব পারিপার্শ্বিক সকল ঘটনা ও অবস্থার spiritual assessment করতে শিক্ষা করে এবং আত্মার আলোকে আত্মাতে প্রকাশিত ভগবদিচ্ছাপালনে আপনাকে দুঃখতাপময় দেশকালবন্ধনের অধীন জগতের সংগ্রামের মধ্যে নিয়া আসিতে পরম পরিতৃপ্তি বোধ করে। যাহাকে আপন হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন এমন প্রেমাস্পদ নারীকে লাভ করিতে যেমন উদ্ভিন্নযৌবন পুরুষ কুলশীল মান লোকলজ্জা লোকভয় সকল বাধা পায়ে ঠেলিতে আত্মপ্রসাদ বোধ করে, তাহা অপেক্ষাও শতগুণ আবেগে উদ্ভিন্নাত্মালোকে বিচ্ছুরিত-হৃদয় মানবসন্তান ভগবদিচ্ছাকে আলিঙ্গন দিবার জন্য জাগতিক সকল বাধা পদদলিত করিতে আনন্দলাভ করেন। অন্য কথায় দেশকালের বন্ধনের মধ্যেই আত্মার অমৃতজীবনের অভিব্যক্তি—ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

যুবক বন্ধুগণ কি এই জীবনের আস্বাদন পাইয়াছেন? হে প্রারব্ধ-জীবন বিকাশোন্মুখ যুবকগণ, তোমরা কি সংগ্রামকে ভয় পাও? যৌবনের ধর্ম্ম ত তাহা নহে। পশ্চিম দিকে চাহিয়া দেখ যৌবন ত সংগ্রামের কাঠিন্যকেই বরণ করিয়া লইতে চায়। জীবনের প্রাচুর্য্যে আদর্শের জন্য, বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য, ত্যাগের জন্য, সত্যের জন্য যৌবন আপনাহারা, দিশাহারা হইয়া ছুটিয়াছে। আকাশে কত তারা গণা হইল না, সাগরতলে কত অপরূপ গাছপালা জীব দেখা হইল না, মেরুতে কত স্থান এখনও জরীপ হইল না, নিখিলপ্রবাহের কত তরঙ্গ এখনও ধরা দেয় নাই ও তাকে মানবের কাজে লাগান হয় নাই, মানবদেহের কত রোগের ঔষধ এখনও পাওয়া যায় নাই, জাতীয় উত্থান পতনের কত রহস্য এখনও ঢাকা রহিয়াছে, সুদূর অতীতের মানব-ইতিহাসের কত স্মারকচিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই, জাতীয় জীবনের কত দুর্নীতি কুরীতি এখনও আপন মাতৃভূমির মুখ জগতের সম্মুখে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, পৃথিবীর কোন সুদূর পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময় প্রদেশে এখনও সভ্যতা এবং ধর্ম্মের আলোক যায় নাই, কত জরাব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, ঈশ্বরের বিগ্রহসকল হৃদয়ের ত্যাগ ও সেবাকে আকর্ষণ করিতেছেন—বিশ্বের যুবকগণ, দেখুন, কেমন করিয়া জীবন-বোধের প্রাচুর্য্যে নৃত্য করিয়া করিয়া কোথায় চলিয়াছে! ভারতের যুবকগণ কি শুধু পেছনে পড়িয়া থাকিবেন?

জীবনবোধের প্রাচুর্য্যে যৌবনে যে আত্মার আলো প্রথমে চোখে লাগিয়া যুবককে পাগল করিয়া তোলে তাহা হচ্ছে সত্যের আলো—the Divine effulgence of truth, the ineffable beauty of truth. মানুষের মধ্যে ঐ যে আত্মার দিক, অমৃতের দিক বলিলাম, সেখানেই তার প্রকাশ। আপনারা তাকে বিবেকবাণী বলিতে চান্ বলুন, conscience বা moral facultyএর অনুশাসন বলিতে চান্ বলুন—আমি তাকে মানুষের স্বরূপ বা আত্মার দাবী বলিতে ভালবাসি। আত্মাসম্বলিত মানুষ ভগবানের এ অতি আশ্চর্য্য সৃষ্টি! জীবনটা—মানুষের সমগ্র জীবনটা—একটা romance. কোন Shakespeare বা Goethe বা Dante এমন romance লিখ্‌তে পারেন নাই। এই romance মানুষের নিকট অসীমরহস্যে উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে, যতই সে আত্মাতে প্রকাশিত যে আলোক তাহা দ্বারা জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকে। মেরুপ্রদেশের আবিষ্কর্ত্তাদিগের মধ্যে একটি বীর্য্য-কারুণ্যরসসিক্ত, ত্যাগ-শোভন, etiquette গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহার কথা কি আপনারা জানেন না? দলের জীবনরক্ষার উপযোগী রসদসকল যখন প্রায় নিঃশেষিত, তখন তাহাদিগের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ, যাহার আহারের জন্য সকলের চেয়ে বেশী রসদের প্রয়োজন হয়, ঐ দেখুন কাহাকেও না বলিয়া সান্ধ্যপ্রার্থনা-সমাপনান্তে সহযোগী পথিকদিগের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া, তমসাচ্ছন্ন তুষার ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যুবক, হে ভারত যুবক, শ্রদ্ধাগম্ভীর হৃদয়ে ও বিস্ময়-রোমাঞ্চ কলেবরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতীচ্য যুবক বীরদিগের এই ত্যাগ-বেদনা-শোভন প্রয়াণ-অভিসার দর্শন কর। সত্যের অন্বেষণে বাহির হইয়া কি এইরূপ Arctic etiquette গ্রহণ করিতে ভয় পাও? প্রারব্ধজীবনের পথিকের চক্ষু সত্যের অমল ধবল অমৃতস্রাবী আলোকে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। ভগবানের আশ্চর্য্য বিধানে যৌবনেই অতি উজ্জ্বল রূপে এই সত্যের আলো মানুষের চিত্তগগনে প্রাতঃ সূর্য্যের হৈম প্রভার মত দেখা দেয়। সত্য কি তাহা জানিতে কখনও ভুল হয় না; শুধু তাহা জীবনে পালন করিতেই ভীরু যে, কাপুরুষ যে, মেরুদণ্ডবিহীন যে,

ত্যাগের ভয়ে, সংগ্রামের ভয়ে, দেশাচার, লোকাচার গতানুগতিকের ভয়ে, কূটতর্কজালদ্বারা সেই সত্যের মুখ চাপা দিতে যায়। মানুষ কৈশোরেই অতি স্পষ্টরূপে নিজের মধ্যে দুইটি মানুষের কথা শুনতে পায়। Alphonse Dandet বলেছেন "Oh, this terrible second me, always seated, whilst the other is on foot, acting, living, suffering, bestirring itself. This second me that I have never been able to intoxicate, to make shed tears, or put to sleep. And how it *sees into things*, and how it mocks !"

কোন রকমে বুদ্ধির পেঁচ খেলাইয়া বাক্যের consistency রক্ষাতে সত্যনিষ্ঠা নাই, তাহাতে কোন কৃতিত্বও নাই। সত্যবোধের মধ্যে যে অসীম ব্যাপকত্ব, গুরুত্ব এবং জীবন-দাতার প্রসন্ন আঁখি-দৃষ্টির নিম্নে যে অসীম আত্মপ্রসাদ ও নির্ভর রহিয়াছে, তাহাতে আংশিক ভাবে বিস্ময়বিহ্বল হইয়াই, কতকটা স্বগতভাবে আর কতকটা মহাত্মা যীশুকে লক্ষ্য করিয়া, Pilate বলিয়া উঠিয়াছিলেন What is Truth ? যীশু বলিয়াছিলেন "To this end was I born and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the Truth." দণ্ডদাতা বিচারকের আসনে বসিয়াও চিন্তাহীন উদাসীন Pilate আত্মালোকে ভাস্বর-মুখশ্রী যীশুর সত্যনিষ্ঠায় দৃঢ়তা, গভীরতা ও সর্ব্বত্যাগ-নির্ভীকতা সন্দর্শন করিয়া একটু চিন্তাগম্ভীর ও উন্মনা না হইয়া পারিলেন না। "And what is Truth" এই বলিয়াই বিচারাসন হইতে উঠিয়া গেলেন ও সমবেত য়ীহুদী জনসঙ্ঘকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "আমি ত দেখিতেছি এই লোক নিরপরাধ।"

Truth is conformity in action, thought and speech of what I am—of that "terrible second me !" এই সত্যের মহিমা, অমিত তেজ, স্বর্গীয় মাধুরী যার আস্বাদনে আসিয়াছে সেই দেশকালের শত বন্ধনের মধ্যে অমৃতজীবন যাপন করিতে সমর্থ—সেই প্রারব্ধজীবন পথিকই মত্ত মাতঙ্গ যেমন ফুলের মালা ছিন্ন করে, তেমনি লজ্জা ভয় স্বার্থ সুখের দুশ্ছেদ্য নিগড় ছিন্ন করিয়া অজানা সত্যের পথে অগ্রসর হয়। আমি প্রারব্ধজীবন সত্যবীরদিগের এইরূপ মত্ততা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি।

আমার বাল্যজীবন ময়মনসিংহ নগরে কাটিয়াছে। সেখানে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হয়েছিল সত্যের অকৃত্রিম সেবায়। আজ সেই সত্যবীরদিগের অনেকে পরলোকে আছেন—ভক্তিভাজন শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়, আমার শিক্ষাগুরু ভক্তিভাজন অমরচন্দ্র দত্ত ও গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও ভক্তিভাজন চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয়;আজ তাঁহারা ওপারে গিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। ভক্তিভাজন শ্রীনাথচন্দ্র মহাশয়, যাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা প্রথম শুনিয়াছি, ও ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ মহাশয়। ধন, প্রাণ, মান, আত্মীয় স্বজন থাকে থাক্ যায় যাক্, সত্যের আলোকে চলিব, এই ছিল তাঁহাদের পণ ! তখন তাঁহাদের জীবনসঙ্গীত ছিল :—

বড় সাধ মনে কোটি হৃদয় সনে,
সবে মিলে গ'লে জল হয়ে যাই।
কভু সিন্ধু রূপে কভু থাকি কূপে,
নদী সরোবরে পিপাসা মিটাই।
প্রেমসূর্য্য যবে উদিবে আকাশে,
বাষ্প হয়ে সবে উড়িব আবেশে;
কূপসিন্ধুবারি একই মেঘে মিশে
বিশ্বাস-বাতাসে দেশে দেশে যাই।
পাষাণ হয়ে আছে যে দেশের জমী,
তথায় হৃদয়রেণু বৃষ্টি হয়ে নামি,
গলাব সে দেশ হলেও মরুভূমি;
ভাসিব ভাসাব বাসনা যে তাই।
চন্দ্রমা গগনে উদয় হবে যবে,
শিশির হয়ে পড়ি পরাণপল্লবে,
ফুটাইয়ে ফুল, ভরিয়া সৌরভে,
মায়ের গৌরব বাড়াইতে চাই।
হৃদয়ের মাগো, তুমি পরশমণি,
ছুঁয়ে দেও সবায়, গলুক এখনি;
ঘুচুক দেশের দুঃখের রজনী,
নাচুক জগৎ বলি ভাই ভাই।

অমর বাবু এই গান রচনা করেছিলেন। আত্মার demand, "terrible second me" এর আদেশ পালন করিবার জন্য কি উন্মাদনা, কি ত্যাগের সাধনা, কি দৃঢ়তা এই সত্যসেবক-দিগের ছিল! তাঁহাদের অনেকেই সত্যপালনের জন্য গৃহ হইতে বহিস্কৃত, আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, জন-সাধারণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সত্যকে অচলসমান ধরিয়াছিলেন। শুনেছি এঁদের ধোপা নাপিত বন্ধ করিবার জন্য এবং যাহাতে তাঁহারা চাকর না পান সেজন্য সহরের লোকেরা ব্যবস্থা করেছিল। তাঁরা কি দমিয়া গিয়াছিলেন ? না—তাঁদের মধ্যে যিনি বলিষ্ঠ ছিলেন (শরৎবাবু) তিনি কাঁধে বহিয়া জল আনিবার ভার নিলেন; যিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ তিনি বাসন মাজিবার ভার নিলেন। আবার তাঁহারাই সহরে যখন কোন বিপদ বা মহামারী উপস্থিত হইত, তখন লোকের বাড়ীতে যাইয়া, সেবা করিবার অধিকার যাঁচিয়া লইতেন। নূতন যাহারা তাঁহাদের দলে মিশিতে আসিত, তাহারাও যখন আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতেন, তাহাদের স্থান এঁরাই করিয়া দিতেন। এইরূপে ক্ষুদ্র মণ্ডলীটী একটি সমাজে পরিণত হইল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সর্ব্বত্রই এইরূপ। এঁরা resolution ক'রে, paper theory ক'রে, Vote সংগ্রহ ক'রে, একটা দল গঠন করেন নাই। সত্যই ছিল তাহাদের unwritten Law এবং watchword; যাহারা সত্যকে ধরিয়াছিলেন, পুরাতন সমাজ—যাহার অস্থি মজ্জাতে অসত্যের সঙ্গে সন্ধি ছিল—আর তাহাদিগকে বরদাস্ত করিতে পারিল না; তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল, আর নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিল।

আমি সমাজ গড়তে বলি না। সত্যের অকৃত্রিম সেবক হও, এই আমার নিবেদন। সত্যকে পালন কর্‌তে যেয়ে তুমি যা হও তাই ভাল। দেশাচার, লোকাচার, সমাজের যুযুর দূর ক'রে দেও। এই ভয়টা যে কত সূক্ষ্মরূপে বালকের মনেও কার্য্য করে তার একটি গল্প বলি। ভক্তিভাজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক দিন তাঁর বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এক জন বালক ছাত্রের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, সে বিদ্যালয়ের কোন ছুটিতে বাড়ীতে যাইয়া তাদের ঠাকুরঘরে যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে অসম্মতি জানায়। তাহাতে তাহার ঠাকুরদাদা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিস্, তাই ঠাকুর দেবতা মানিস্ না।" বালক মনে করিল ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়াটা বুঝি বড়ই নিন্দনীয়। সে রবি বাবুকে চিঠি লিখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "গুরু দেব, আমি কি সত্যি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছি?" রবিবাবু বালককে লিখিয়া দিলেন "কেন তুই ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে যাবি? তুই বলিস্ তোর ঠাকুরদাদাকে যা' ভাল বুঝ্‌ছি তাই কচ্ছি; ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে যাব কেন?"

আমিও বলি ব্রাহ্ম নামটা ভাল না লাগে ব্রাহ্ম হইও না, বা ব্রাহ্ম থাকিও না। সত্যকে ধর। তাতে হিন্দু থাকতে পার থাক, মুসলমান থাকতে পার থাক, ব্রাহ্ম হইতে হয় হও, অথবা কোন সমাজভুক্ত না হও ক্ষতি নাই। কিন্তু ভাই সত্যকে পালন করিতেছ কি না সেই বিচার, সেই মাপকাঠী, তোমারই অন্তরে। সরল প্রাণে বুকে হাত দিয়া তোমাকে বল্‌তে হবে "হাঁ, আমার আত্মায় প্রকাশিত এই সত্যের আলো—আমি তাহা খর্ব্ব করি নাই। আমি কূট বিচার তর্কে তাকে ঢেকে রাখ্‌তে চেষ্টা করি নাই"। এইটুকু হ'লেই হ'ল।

আমাদের দেশে কি সত্যের সেবক, প্রাণজীবনের প্রাচুর্য্যে উদ্ভাসিতহৃদয় যুবক আছে? নাই -নাই। এ দেশ চিরবার্দ্ধক্যের দেশ—এ দেশে জীবন নাই, যৌবন নাই, যুবক নাই। যদি থাকতো, তবে কি এই দেশটা একটা অতিকায় মহিষের মত, এমন ক'রে শতাব্দীর পর শতাব্দী নোংরা কর্দ্দমের মধ্যে শুয়ে থেকে শুধু গলাটা উর্দ্ধদিকে বাড়িয়ে, কোন রকমে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ছেড়ে প্রাণ ধারণ কর্‌তো! মাঝে মাঝে একজন মহাত্মা গান্ধি বা চিত্তরঞ্জন এসে একটি ছোট্ট রাখাল বালকের মত তাকে উঠাইতে চেষ্টা কর্‌তে যেয়ে, তার লেজটা মুচ্‌ড়িয়ে দিচ্ছে, কাণটা ম'লে দিচ্ছে—কিন্তু তাতে তার কি হয়? সে সম্মুখের দুটো পা দিয়ে একটু উঠ্‌বার চেষ্টা দেখাইয়া আবার শুয়ে থাকছে!

স্বরাজ্য-প্রচলন ও মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণার অনেক পূর্ব্বে এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছিলেন ও এখনও করিতেছেন—"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যাহার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার"। এটা মানুষের আত্মার দাবী—এ দাবী পূরণ না কর্‌লে চল্‌বে না ভাই! দেশ তখন গ্রহণ করে নাই। ঠাট্টা করেছে, বিদ্রূপ করেছে। এখনও যে না করে তা নয়। আজ কিনা স্বরাজলাভের জন্য যখন দেশ দেখ্‌তে পাচ্ছে যে, হিন্দু মুসলমানের একতা না হ'লে এবং কোটি কোটি অস্পৃশ্য জাতির জনবল ভিন্ন দেশ উঠবে না, স্বরাজ্য লাভ হবে না, তখন National dinner দিয়ে এবং সাত পাঁচ রকমের বহিঃপ্রলেপের দ্বারা, as a matter of expediency, অস্পৃশ্যকে বল্‌তে চাচ্ছে "ভাই, এই যে তোমাকে ঘৃণা করি না, তোমার হাতের ছোঁয়া খাই—চল দুজনার interest এক ক'রে ফেলি," তা হবে না; এ মেকি চল্‌বে না। হায়রে! যে দেশ রামচন্দ্র, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও হরিচন্দ্রের দেশ; যে দেশ দধীচির আত্মত্যাগ কপিলের নির্ভীক চিন্তাধারা, ভক্তশ্রীচৈতন্য, নানক, কবির ও রামানন্দের আচণ্ডাল আপামর ও আযবন আলিঙ্গনের দেশ—সে দেশ আজ কোন্ মায়াবীর মায়ামোহে মুগ্ধ যে, সে সত্যকে লইয়া আত্মার চিরন্তন দাবী পূরণ করিবার জন্য এরূপ ছেলে খেলায় মত্ত। সত্যকে সাকল্যেই গ্রহণ করিতে হইবে। গৃহে untouchability, বর্ণাশ্রম, বাইরে উদারতা, এ ভাবে সমাজের মালিক যিনি, জাতীয় জীবনের বিধাতা যিনি, তাঁকে ঘুস দিয়ে ভুলাতে পারা যায় না! সত্যকে short cut ক'রে কেহ কখনও পায় নাই। you must go the whole length and with patience—তাতে যত ত্যাগ, যত সংগ্রাম, প্রার্থিত ফল লাভ যত দেরীই হউক, বরণ করিয়া লইতে হইবে।

এদেশে যে যুবক নাই তার কত প্রমাণ! বাল্যবিবাহ, বিবাহে পণগ্রহণ, বালবিধবার enforced ব্রহ্মচর্য্য, রাস্তায় ঘাটে বাজারে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন কলুষিত দৃষ্টি—এগুলি কি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে না যে, দেশের যুবকেরা দেশাচার, লোকাচার, সুখপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার পর্দ্দা দিয়া আত্মার দাবীর মুখে চাপা দিয়া রাখিয়াছেন? সমাজপতিগণ, বৃদ্ধগণ, দেশাচার লোকাচারের প্রকাণ্ড বোঝাটা বইতে বইতে যাদের মেরুদণ্ডটা একবারে ভেঙ্গে গিয়াছে তারা, যে মতলবই আঁটিয়া বসুন না কেন—আজ যদি দেশের যুবকগণ পণ করিয়া বসেন, উপরি উক্ত কদাচারগুলি নিজের জীবন দ্বারা কখনই সমর্থন করিবেন না, তবে এ সব কদাচার নির্ম্মূল হইতে কয় দিন লাগে?

কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা বল্‌ছি। আমি সকালে বিকালে প্রায়ই একটা পার্কে বেড়াতে যাই। একদিন বিকাল বেলা বেড়াচ্ছি, শুন্‌তে পেলাম দুইটি যুবক কোন বিষয় আলোচনা করিতেছে। একজন বল্লেন "তুমি যা বল্‌চো তা ঠিক মনলাম; কিন্তু তাই ব'লে কি বাপ দাদা যা করছেন তা উল্‌টিয়ে দেবো?" কি পরিতাপের বিষয়, শক্তিপ্রচুর যৌবনে যারা পদার্পণ করেছে, নিজের বুদ্ধি ও বিবেকের আলোকে সব কিছু যাচাই করিয়া নেওয়াই যে যৌবনের স্বভাব, সেই যুবকদের কি এই মনোগতি? আর এক দিন ভোরে এক জন ভদ্র মহিলার সম্বন্ধে এমন একটা গর্হিত মন্তব্য শুনলাম যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে বল্‌তে পারি না। সেই মহিলা উক্ত পার্কের অতি সন্নিকটে বাস করেন। অনুমান করি, তিনি শ্রদ্ধাহীন কলুষিত দৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই, অতি প্রত্যূষে, বেশী লোকজন আসিবার পূর্ব্বেই, পার্কে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু তাহাতে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। কয়েকজন যুবক যেন তাঁহাকে দেখিবার জন্যই অতি প্রত্যূষে আসিতে লাগিল। একদিন ভোরে আমি দুইজন

যুবকের পাশ কাটাইয়া চলে যাচ্ছি, এমন সময় শুন্‌তে পেলাম তারা উক্ত ভদ্র মহিলাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। ভদ্র মহিলাটি তখন পার্কের অপর দিকে বেড়াচ্ছেন। তারা তাঁর পানে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে এবং এমন একটা গর্হিত বাক্য ব্যবহার করিয়া আলোচনা করিতেছে যাহা আমি উচ্চারণ করিতে পারি না। না জানি তাদের আলোচনার ভিতরে ও মনের অভিসন্ধিতে আরো কত গর্হিত ব্যাপার ছিল! ছিঃ-ছিঃ ছিঃ—কি দুঃখের বিষয়! এই কি যুবকের কাজ? প্রাণভজীবনের প্রাচুর্য্যে যাদের হৃদয় পর্ব্বতনিঃস্যন্দিনী স্রোতধারার মত সকল বাধা ও সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া আপন শাক্তলীলায় যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতম, যাহা কিছু মহত্তম যাহা কিছু পবিত্রতম, তার পশ্চাতে ধাবিত হ'তে চায়, তাদের কি এই কথাবার্ত্তা?

আত্মার দাবীর অধীনতাতেই পরম স্বাধীনতা। বিবেক-পরায়ণ যুবক শুধু নিজে নিরবদ্য পবিত্রতার শুভ্র ভূষণে শোভা পান, তাহা নহে—তার বিবেকপরায়ণতা, তার loyalty to soul's demands "calls for active service in converting men to the moral ideal which it seeks to maintain." Like king Arthur's knights তার সম্বন্ধে বলা যায়, :—

> "The conscience is his king.
> He rides abroad redressing human wrongs;
> Speaks no slander, no, nor listens to it;
> Honours his own word, as if his God's,
> Lives sweet life of utter chastity"
> সত্যই শাস্ত্র। সত্যম্ শাস্ত্রমনশ্বরম্।

কারণ, সেই শাস্ত্র, সেই Law is the expression of the very mind of God in his counter part, the human soul. Theodore Parker বলেছেন "the mode of man's finite being is of necessity a receiving, of God's infinite being of necessity a giving'. এই যে আদান ও প্রদান, এই যে " Divine osmosis of spirit without and spirit within, possible by the soul's impassioned attentiveness, is made *the primary condition of spiritual life*". (একজন Christian Mysticএর উক্তি)। যুবক বন্ধু, mark the expression "impassioned attentiveness". এই যে আকুল আবেগপূর্ণ আত্মার দাবীর প্রতি প্রগল্‌ভ বিশ্বস্ততা, ইনিই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের দূতীস্বরূপিনী এবং আবেগপূর্ণ মনের এই তন্ময় একাগ্রতা is the privilege of youth—the virgin mind of youth. আর আমি যে জীবনের romance এর কথা বলেছি, তাহা এই Divine osmosis of spirit without and spirit within এর মধ্যে নিহিত। আর যে হেতু এই আদান ও প্রদান দেশ কালের বন্ধনের মধ্যে যাপিত জীবন-খানিকে এক অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, বিশিষ্টতা দান করে, সেই হেতু উহা ত্যাগবহুল, সংগ্রামবহুল, বেদনাময় আনন্দপুলকে চির উচ্ছ্বাসময়।

বড় পরিতাপের বিষয়, জীবনের এই আত্মাহুতিদানে আহ্বানকারী অনন্ত রক্তিমাভা আমাদের যুবকবৃন্দকে পাগল করিতেছে না। একজন যুবক আমাকে বলিয়াছিলেন, সত্য-রক্ষা ক'রে ব্যবসা চলে না। আমি এমন কথা শুনিতে চাই না। যে সত্য রক্ষা না করিলে জীবন চলে না, সমাজ চলে না, দেশ চলে না, সে সত্য ভঙ্গ ক'রে যে ব্যবসাকে চালাইতে হয় সে ব্যবসায় চাই না। সত্যরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য হ'তে, সংসার হ'তে, ব্যবসায় হ'তে বনবাসে পাঠাইয়াই ত আজ ভারতের এই দশা! আর আমি বিশ্বাস করি না ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে হয়। ব্যবসায় কি ভগবানের রাজ্য নয়?

আফিসে দেখ্‌তে পাই পাঁচ মিনিট বিলম্বে আসিলে যুবক কেরাণী বাবুরা মিথ্যা হাজিরা লিখিতে লজ্জিত হয় না, Tramway কোম্পানীকে একটি পয়সা ঠকাইবার জন্য যুবক ছাত্রবৃন্দ একটা মিথ্যা কথা বল্‌তে লজ্জা বোধ করেন না; Railway Stationএ মালগুলি ওজন করিবার সময় দুই একটি পুটুলী সরাইয়া রাখিয়া দেন। হায়রে, কবে দেশের যুবকগণ হৃদয়ঙ্গম কর্‌বেন যে, এই মিথ্যাকে আপনার ঘরে আতিথ্য দিয়া আপনার চরিত্রের, দেশের, জাতীয় চরিত্রের কি মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। যার চরিত্রের বল নাই, হৃদয়ে সত্যের আলো ধারণ করিবার শক্তি নাই, সে কি পিঠের শিরদাঁড়াটা সোজা করিয়া দাঁড়াইয়া—বিশ্বের দরবারে দূরের কথা—দেশের ও দশের কাছে কখনও দাঁড়াইতে পারে? আমাদিগকে কি শুধু ইংরেজের গোলাগুলি ভীরু কাপুরুষ ক'রে রেখেছে? আজ যে আমাদের মুখের সাম্‌নে Lord Birkenhead ও Miss Mayo ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে অপমান করে যাচ্ছেন—সে অপমান যে ভাই আমরা যুগে যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী অল্প অল্প ক'রে অর্জ্জন করেছি। প্রকৃতি আজ কড়ায় গণ্ডায় শোধ নিতেছে।

ভাই বোন, উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! একটি পয়সা ঠকাতে যেয়ে বিশ্বের ন্যায়তুলাদণ্ডে আর ঠ'কে যাইবার নিয়তিকে আকর্ষণ করো না, অমরাত্মার বাণীকে অগ্রাহ্য ক'রে, দেশাচার লোকাচারের পায়ে মাথা লুটাইয়া, তোমার প্রকৃতির দাসত্বপ্রবণতাকে আর নিবিড় ক'রে তুলো না। এই slave mentality রাজ-পুরুষেরা আমাদের মনে injection ক'রে দেন নাই। এ যে আমাদের পৈতৃক ধন। উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! হে ব্রাহ্ম যুবক, হে ব্রাহ্ম কন্যা, উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! যারা বল্‌ছে ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে, তাঁদের কথা কানে তুলো না। হাটে বাজারে ঘাটে, পরিবারে কর্ম্মক্ষেত্রে ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানসকলে যাইয়া দেখ ব্রাহ্মজীবনের নৈতিক আদর্শের কত প্রয়োজনীয়তা। Knights of the Round Table এর মত মণ্ডলীবদ্ধ হও :—

> Let conscience be your king.
> Rride abroad redressing human wrongs;
> Speak no slander, no, nor listen to it;
> Honour your own word, as if your God's,
> Live sweet lives of utter chastity.

এই জগৎ সত্য, এ জগতের দুঃখ তাপ সংগ্রাম সত্য, এবং এই সত্য দুঃখ তাপ সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে জীবন-

কমলটি ফুটে উঠে তাহাই সত্য। ব্রাহ্ম ভক্ত গাহিয়াছেন—"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।" দুঃখ তাপ সংগ্রামময় যে জগৎ তার মধ্যেই অমৃতজীবনের কমলটী স্বর্গীয় সুষমায় ফুটে উঠবে, এই জীবনদাতার ইচ্ছা। তাইত তিনি দুঃখ তাপ সংগ্রামকে সত্য করেছেন। ভাই, দুঃখ তাপ সংগ্রামের প্রত্যেক আবেশে আবেশে আমরা যে আমাদের অমৃত জীবনের রসমাধুরী গভীররূপে আস্বাদন করিয়া সুখী হই, তাহা জীবনদাতা দেখিতে ভাল বাসেন। 'দুঃখ তাপ সংগ্রাম সরাইয়া লও', এ আমাদের প্রার্থনা হইতে পারে না; কিন্তু 'দুঃখ তাপ সংগ্রামকে মহান্ ক'রে দাও ও তাহা সহিবার মত ভক্তি দাও', এই আমাদের প্রার্থনা। ছোট দুঃখ, ছোট তাপ, ছোট সংগ্রাম, ছোট ভাবনা, ছোট চিন্তা, এ নিয়ে কি আমাদের জীবন কাটিয়া যাইবে? সেবার যে মহান্ দুঃখ,—দেশের ও দশের সেবায় যে মহান দুঃখ, আর জীবন-কমলবিকাশকারী যে গভীর দুঃখ, তাকে কি ব্রাহ্মযুবক বরণ ক'রে নিবেন না? দুঃখিনী সমাজমাতা আজ কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকরী বিদ্যালাভের অবসানে, দু একটি জীবনের রুটি মাখনের চিন্তায়, তুচ্ছ ক্ষণিকের, বিলাস আমোদ প্রমোদে এবং যাহা সুনিশ্চিত ও পূর্ব্বসেবিত তাহার নিরাপদ আবেষ্টনে যে চির চির পুরাতন জীবন, তার মত অশোভন যুবকের পক্ষে আর কি আছে? রুগ্ন মুমূর্ষু সমাজমাতার ধমনীতে যে যুবকের তাজা রক্তের প্রয়োজন হইয়াছে। কোন্ ত্যাগী সন্তান, মাতার কোন্ সুসন্তান, আপন শরীর হইতে সেই রক্ত দান করিয়া মাতৃঋণ শোধ করিতে প্রস্তুত আছেন? জীবনদাতার অঙ্গীকার আছে, যিনি তাঁর সত্যের পতাকা কাঁধে নিবেন তাকে বহিবার শক্তি তিনি দিবেন।

হে পরমাত্মন্, তুমিই সত্যের আলো মানবপ্রাণে দেও। যে জন সেই আলোর সাহায্যে অমৃতের পথে যাত্রা করে, সেই ধন্য। তুমি সঙ্গে থাক, কাছে থাক, অন্তরে থেকে কথা বল, বল দেও, উৎসাহ দেও, আশা দেও। তোমার মত গুরু আর আমাদের কে আছে? শুধু কি তাই? অজানা জীবনপথে চল্‌তে চল্‌তে যখন ভয় পাই, বন্ধুর পথ অতিক্রম কর্‌তে যখন হয়রাণ হইয়া পড়ি, সংগ্রামের তীব্রতায় যখন দমিয়া পড়ি, তখন চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তোমারই স্নেহ-অঙ্কে অভয় পাই, বিশ্রাম পাই এবং নূতন প্রাণ পাই।

যুগে যুগে তুমি তোমার আশ্রিত জনের জীবনে অপূর্ব্ব লীলা করেছ। অবিশ্বাসী জন, সংশয়ী জন, যারা তোমার হাতে, তোমার সত্যের আলোর নিকটে আত্মসমর্পণ না করিয়া, স্বার্থ ভোগসুখ ও সংসারবুদ্ধির নিকট আত্মবিক্রয় করেছে, তারা তোমার ঐ লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন কর্‌তে সক্ষম হয় না। তারা ত চিরকালই অমৃতের পথের যাত্রিকদিগকে পাগল বলেছে, বিদ্রূপ করেছে। কিন্তু আমরা যে তোমার সেই আশ্রিতবাৎসল্য আস্বাদন করিয়াও এমন অবিশ্বাসীর মত দিন কাটাইতেছি, সে দুঃখ কোথায় রাখি পিতা? তোমার ইঙ্গিত পালন করিবার জন্য যাহারা গৃহহারা হইয়াছিলেন তাহাদিগকে কি তুমি গৃহ দেও নাই? যাহারা তোমার আলোকে চলিবার জন্য মার খেয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদের ব্যথা দূর করিবার জন্য কি কত অকথিত সান্ত্বনা, স্নেহের পরশ, অমৃত-জীবনের রোমাঞ্চ, তাহাদের প্রাণে ঢালিয়া দেও নাই? ব্রাহ্ম-সমাজের লোক যদি তা বলে, তবে তারা মানুষ নামের যোগ্য নয়। আমাদের অযোগ্যতা দেখে কত সময় প্রাণে প্রশ্ন জেগেছে—কেন প্রভু, তুমি এমন সত্যের কৌস্তুভমণি এমন অযোগ্যদিগকে দিলে? তোমার জগতে ত কত যোগ্যতর জাতি রয়েছে—তাদের মধ্যে এই সত্যালোক তুমি প্রদান করিলে আজ তোমার সমস্ত জগৎ হয়ত সেই আলোকের আভায় ভাস্বর হ'য়ে উঠ্‌তো! হে ধর্ম্মাবহ পাপনুদ ভগবান্, তুমি কৃপা ক'রে আমাদিগকে আবার তোমার সেই মৃতসঞ্জীবনী পরশ দাও; আমরা জেগে উঠি। এই ব্রাহ্মসমাজে তোমার কত গুণী জ্ঞানী আছেন, কত শক্তিসম্পন্ন প্রিয়দর্শন যুবক আছেন, কত পূতশীলা স্নেহ দয়া প্রীতি ও সেবার বিগ্রহস্বরূপিনী কন্যা আছেন—প্রভো, তুমি তাঁহাদের ডাক তোমার পতাকার নিম্নে। তাঁহারা সকলে তোমার পতাকা কাঁধে নিলে সমাজ জাগিবে, ভারত জাগিবে, নিখিল বিশ্বে রোমাঞ্চ উঠবে। কথা থেমে যাক্, বাক্‌বিতণ্ডা থেমে যাক্। কল্পনা জল্পনা থেমে যাক্, নীরবে শ্রদ্ধাবনতশিরে সকলে আমরা তোমার পতাকার নিম্নে আসিয়া দাঁড়াই; অমৃতজীবনপথে সত্যের আলোকে তোমার নাম সার করিয়া, একমাত্র তোমার মহিমাই উদ্দেশ্য করিয়া, বাহির হইয়া পড়ি। ত্যাগ ও সংযমের মনভুলান আলো আবার তোমার প্রারব্ধজীবন পুত্র কন্যাদিগকে পাগল ক'রে তুলুক। তোমার চরণে এই ভিক্ষা। ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

অপরাহ্ণে "বর্ত্তমান চিন্তাধারা ও ব্রাহ্মসমাজ" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার সেন, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ ও সভাপতি মহাশয় আপনাদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। সায়ংকালে "ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব" বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ভাই সীতারাম, মিঃ জি বি ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বক্তৃতা করেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

অধ্যক্ষ সভা।—নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী ও সভ্যদিগকে এবং প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া বর্ত্তমান বর্ষের (১৯২৮ সনের) অধ্যক্ষ সভা গঠিত হইয়াছে :—

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়—সভাপতি, বাবু ব্রজসুন্দর রায়—সম্পাদক, মিঃ এস্ এম্ বসু—ধনাধ্যক্ষ, বাবু প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী, বাবু অশোক চাটার্জি ও বাবু নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সহকারী সম্পাদক। কলিকাতা—বাবু ললিতমোহন দাস, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু অন্নদাচরণ সেন, বাবু রজনীকান্ত গুহ, বাবু কালিদাস নাগ, বাবু হেমচন্দ্র সরকার, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, বাবু অমিয় কুমার সেন, বাবু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, বাবু শশিভূষণ দত্ত, বাবু অর্পণাচরণ ভট্টাচার্য্য, কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, বাবু প্রফুল্লকুমার রায়, লেডি অবলা বসু, শ্রীমতী লতিকা বসু, বাবু কালীমোহন ঘোষাল, বাবু সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিশির-কুমার দত্ত, শ্রীমতী শান্তা নাগ, বাবু ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বাবু প্রতুলচন্দ্র সোম, বাবু অনিলকুমার সেন, বাবু অমল হোম, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, বাবু বিরজাশঙ্কর গুহ, বাবু অমূল্য-কুমার সেন, বাবু শিশিরকুমার মিত্র, বাবু সুরেন্দ্র মোহন দত্ত, বাবু সুশোভনচন্দ্র সরকার, বাবু সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমতী প্রতিভা ভট্টাচার্য্য, বাবু রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি, বাবু শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। মফঃস্বল—বাবু উপেন্দ্রনাথ বল, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বাবু সত্যানন্দ দাস কাজি আবদুল গফুর, বাবু অতুলানন্দ দাস, বাবু শ্রীনাথ চন্দ, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ই সুব্বাকৃষ্ণায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর, ভাই সীতারাম, বাবু হরানন্দ গুপ্ত, শ্রীমতী ললিতা রায়, বাবু মনোমোহন দত্ত, রায় সাহেব প্যারীমোহন দাস, বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী, বাবু প্রফুল্লকুমার চাটার্জ্জি, বাবু মথুরানাথ গুহ, বাবু সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত, বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী সুষমা দাস, বাবু জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, বাবু সুরেন্দ্রকুমার চন্দ, শ্রীমতী উষাবালা রায়, বাবু ললিতকুমার রায়, রায় সাহেব

সতীশচন্দ্র ঘোষ, বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, বাবু লালমোহন চাটার্জ্জি, বাবু দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, ও বাবু প্রমথনাথ সরকার। প্রতিনিধি—শ্রীমতী সুরমা সেন—বাণীবন, বাবু গুরুকুমার মিত্র—টাঙ্গাইল, বাবু বিভূতিভূষণ সরকার—কৃষ্ণনগর, মিঃ ইউ মনুজাপ্পা—বাঙ্গালোর, বাবু অনিলকুমার সেন—উল্টাডাঙ্গা, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত—শিলং, বাবু অনাথবন্ধু সেন—খাসি পাহাড়, বাবু হরকালী সেন—দিনাজপুর, বাবু অনিমেষ দাস গুপ্ত—বরিশাল, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়—কুমারখালী, মিঃ মহাদেব মুদলিয়ার—বাঙ্গালোর কেণ্টনমেণ্ট, বাবু শিশিরকুমার দত্ত—কাওরাইদ, বাবু বীরেন্দ্রকুমার রায়—কালীকচ্ছ, বাবু মধুসূদন জানা—কাঁথি, বাবু শ্রীরঙ্গবিহারী লাল—বাঁকিপুর, বাবু মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি—ময়মনসিংহ, বাবু রজনীকান্ত সাহা—হাবড়া, বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস—গিরিডি, বাবু হরকুমার গুহ—বীরভূম, বাবু অবিনাশচন্দ্র রায়—মেদিনীপুর, বাবু ঈশানচন্দ্র চাটার্জ্জি—নিমতা, বাবু অক্ষয়কুমার সেন—পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ, বাবু সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী—কুমিল্লা, বাবু প্রবোধচন্দ্র দাঁ—তেজপুর, শ্রীমতী লাবণ্যলতা গুহ—চেরাপুঞ্জি, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—দেরাধুন, বাবু কেদারনাথ চাটার্জ্জি—মৌসমাই, বাবু বরদাকান্ত বসু—আন্দুল, বাবু জয়কালী দত্ত—রাঁচি।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৮ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে বাবু অক্ষয়কুমার রায় অল্প সময়ের অসুখে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ২৭শে জানুয়ারী তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও কন্যা সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

বিগত ১২ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস শাস্ত্র পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পুত্রগণ সুবর্ণসাম্বৎসরিক স্থায়ী ভাণ্ডারে ১০০৲, জ্যেষ্ঠা কন্যা স্নেহময়ী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, তৃতীয়া কন্যা কিরণ্ময়ী বাণীবন ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲, এবং পঞ্চমকন্যা শান্তিময়ী এক বৎসরের জন্য ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে মাসিক ৫৲, টাকার একটি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদারের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ শাস্ত্র পাঠ করেন। হীরালাল বাবু সংক্ষেপে মাতার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তিনি সাধারণ বিভাগে ২৫, প্রচার বিভাগে ৫০৲, সাধনাশ্রমে ৩০৲, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ২৫৲, ও নিমতা ব্রাহ্মসমাজের মন্দির-সংস্কার কার্য্যে ২০৲, এবং পৌত্রগণ প্রচার বিভাগে ৫০৲, দুঃস্থব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ২৫৲, ও বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲, দান করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুকৃতি চৌধুরী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲, প্রচার বিভাগে ৫৲, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ১০৲, ও রাণাঘাট ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৯শে জানুয়ারী ময়মনসিংহ নগরীতে পরলোকগত বাবু অমরচন্দ্র দত্তের শাশুড়ী মেঘমালা মল্লিক পরলোকগমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদিগের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী খুল্লতাত পরলোকগত বসন্তকুমার লাহিড়ীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পরলোকগত রামসুন্দর দাসের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ধুবড়ী-প্রবাসী তদীয়া কন্যা কুমারী লাবণ্যপ্রভা দাস সাধারণ সমাজের প্রচার ফণ্ডে ২৲, টাকা দান করিয়াছেন। এই সকল দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মা শান্তি লাভ করুন।

নামকরণ—বিগত ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রকৃতিকুমার ঘোষের প্রথম পুত্রের (তৃতীয় সন্তান) নামকরণ অনুষ্ঠান শিশুর প্রথম জন্মদিনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে নির্ম্মলেন্দুকুমার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পিতা সাধারণ বিভাগে ৫৲, টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২২শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কালীপদ বসাকের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান শিশুর প্রথম জন্মদিনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন; শিশুকে অরুণকুমার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পিতা প্রচার বিভাগে ২৲, ও দাতব্য বিভাগে ২৲, দান করিয়াছেন।

মঙ্গলময় পিতা শিশুদিগকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

মুন্সিগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ—ব্রহ্মমন্দির মেরামতের জন্য যে দান সংগৃহীত হইয়াছিল মুন্সিগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন তাহার আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠাইয়া দাতাগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। কলিকাতা হইতে—লেডি অবলা বসু ১০৲, কুমারী সুধা দত্ত (now Mrs. S. C. Ghosal) ১০৲, রায় পি কে দাসগুপ্ত বাহাদুর ১০৲, ডাঃ পি চাটার্জি ২০৲, মিঃ ডি কে মিত্র ১০৲, বাবু শশিভূষণ দত্ত, ৫৲ বাবু শিশিরকুমার দত্ত ১০৲, মিষ্টার এস্ কে গুপ্ত ৫৲, গিরিডি হইতে বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস ৪৲, এবং মুন্সিগঞ্জ হইতে বাবু উমাচরণ সেন ৫৲, মোট ৮৯৲। খরচ—কাঠ বাবদ মাঃ আবু সরকার ২১৲, লোহার শিক বল্টু ইত্যাদি বাবদ মাঃ সারদা দের দোকান ৫৲, টিন ২খানা ৮৲, মজুরী বাবদ বলরাম মিস্ত্রিকে ২১৲, ঘরের ভিটি এবং সিঁড়ি প্রভৃতি মেরামত বাবদ ২৬৲, টাকা পাঠাইতে পোষ্টঅফিস কমিশন ৸০ মোট—৮১৸০। হস্তে অবশিষ্ট ৭।০

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ—গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া ব্রহ্মমন্দিরে গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্মৃতি উপাসনা হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের ৯৪ তম মৃত্যু স্মৃতিদিনে বিশেষ উপাসনা হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের বার্ষিক স্মৃতি উপলক্ষে উপাসনা ও তাঁহার জীবনী পাঠ ও তাঁহার রচিত গীত কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। তিন দিবসই শ্রীযুক্ত বারাণসী চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩রা ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ২১ম সংখ্যা।

১লা ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯
14th February, 1928.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে করুণাময় পিতা, উৎসবান্তে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমারই নিকট প্রণত হইতেছি। প্রেমস্বরূপ তুমি, তোমার প্রেমের ত সীমা নাই। তাই দীনহীন কাঙ্গালদিগকেও পরমস্নেহে তোমার উৎসবগৃহে ডাকিয়া লইয়া এক পাশে স্থান দিলে—প্রাণে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইলে! তুমি ত চিরদিনই মুক্তহস্তে তোমার কৃপা বিতরণ করিতেছ। কিন্তু আমরা যে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারি না! সর্ব্বসাক্ষী দেবতা তুমি, তুমি আমাদের সকল দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা জান—আমরা যে বার বার তোমার কত দয়া ও প্রেম পাইয়াও আবার অসার বিষয়ে মত্ত হইয়া তোমা হইতে দূরে চলিয়া যাই, তাহা তুমি দেখিতেছ। তুমি ত তোমার অসীম সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে চিরমুগ্ধ করিয়াই রাখিতে চাও, প্রাণে নিত্য নূতন শুভ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া উৎসাহের সহিত তোমার পথে অগ্রসর করিতেই নিযুক্ত আছ। আমরা যে অল্পেই অবসন্ন হইয়া পড়ি, তোমার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া, তোমার করুণাস্রোতে ভাসিয়া চলিতে পারি না! তুমি যে চিরযৌবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবার প্রাণে জাগাইলে, তাহা আমরা তোমার করুণা ভিন্ন কি রূপে প্রাপ্ত হইব? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার সে প্রকাশের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ করিয়া রাখ, যাহাতে আমরা চিরযৌবন লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তুমি আমাদিগকে তোমাকে ভুলিয়া থাকিতে দিও না। আমাদিগকে চিরদিনের জন্য তোমার করিয়া লও। তোমার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) রবিবার— প্রাতঃকালে যুবকদিগের উৎসব। যুবকগণ নগরের এক অংশে উষাকীর্ত্তন করিয়া আসিয়া মন্দিরে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করেন। তাহার পর ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি প্রথমে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন :—

আজ যুবকদিগের উৎসবে Swedenborg এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উদ্বোধন করি—"In Heaven the angels are advancing continually towards the spring-time of their life. (স্বর্গে দেবদূতগণ তাঁহাদের যৌবনের দিকেই নিয়ত অগ্রসর হইতেছেন।) পূর্ণযৌবন সম্মুখে, পশ্চাতে নহে। যাহা ক্রমে বৃদ্ধি পায়, ক্ষয় হয় না, তাহাই যৌবন। আত্মার যৌবন চিরযৌবন—আত্মার বার্দ্ধক্য নাই। There are some thoughts that always find us young, and keep us so. Such a thought is the love of the universal and eternal beauty. (এমন কোন কোন বিষয় আছে যাহার চিন্তাতে আমরা চিরযৌবন প্রাপ্ত হই। সার্ব্বভৌমিক ও চিরন্তন সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ এরূপ একটি বিষয়।) জগৎপতির সৌন্দর্য্যের চিন্তায় যুবকেরা চিরদিন যুবক থাকিতে পারেন, আমরা পূর্ণতর যৌবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। সে অবস্থা আমাদের হয় নাই, কিন্তু তাহার আভাস যে পাই নাই, এরূপও বলিতে পারি না,—আভাস একটু পাইয়াছি। সঙ্গীতে আছে "সকলই ভুলিব, কেবল হৃদয়ে

জাগিবে তুমি।" "আপনারে যার ভুলে' পাইয়ে তোমারে।" তাঁহার প্রকাশে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনাকে ভুলিয়া যাইব তাঁহার যে প্রকাশে, আমরা সেই প্রকাশই আজ ভিক্ষা করি। তাঁহার কৃপা ভিন্ন সে প্রকাশ পাওয়া যায় না। আমরা তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হই। তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হউন, কৃপা করিয়া তাঁহার পূজা করিতে সমর্থ করুন।

উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

মানবাত্মা অসীমের সন্ধানে ছুটিয়াছে—ছুটিয়াছে। এই আত্মা-বিহঙ্গমের দুইটি পক্ষ আছে, যে পক্ষের সাহায্যেই সে অসীমের পথে ছুটিয়াছে। তাহার একটি পক্ষ দুঃখ—বেদনা। প্রথমেই যুবক বন্ধুদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি, সুখে সুখে এই পথে যাওয়া যায় না। In frivolity there is no refuge for the human spirit in distress. (Wordsworth). (দুঃখ-বিপদগ্রস্ত মানবাত্মার পক্ষে হাস্যকৌতুকে কোনও আশ্রয়স্থান নাই।) এই সংসারে হাস্যকৌতুকের পথে তুমি শান্তি পাইবে না। জীবনে এই সত্য বুঝিতে পারিয়াছি যে, গভীর বেদনা আত্মার উন্নতিপথের সহায়। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—"দুঃখমেব পরাপূজা দুঃখমুৎবর্ত্তনং যথা।" (দুঃখই পরা পূজা, কেননা দুঃখই আমাদিগকে উৰ্দ্ধদিকে লইয়া যায়।) একই কথা নানা দেশে নানা ভাষায় ব্যক্ত হইতেছে। ক্লেশকেই পরম সম্পদ্ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। Goethe কে কেহ কেহ the wisest man of modern times—বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ—বলিয়াছেন। আমি উহা একেবারেই মানি না। একজন ধর্ম্ম-প্রাণ লেখক তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, Goethe never knew what it was to kneel in the dust with bowed head and broken heart—(ভগ্ন হৃদয়ে লুণ্ঠিত মস্তক হইয়া ধূলাতে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করা কাহাকে বলে তাহা Goethe জানিতেন না। এই জন্যই "The Earth was eloquent to him but the skies were silent. (পৃথিবী তাঁহাকে অনেক তত্ত্ব শিখাইয়াছিল, কিন্তু আকাশ নীরব ছিল।) পার্থিব বিদ্যা তিনি অনেকই পাইয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বর্ত্তমান জগতে অল্পই আছে। কিন্তু তিনি স্বর্গীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারেন নাই। বেদনাতে যে প্রাণ ভেঙ্গে যায়, সে অবস্থা তাঁহার হয় নাই; তাই স্বর্গ হইতে কোন বাণী তিনি শুনেন নাই। চারিদিক চাহিয়া অনেক বস্তু দেখিয়াছেন, অনেক বাণী শুনিয়াছেন, কিন্তু অন্তরের নিভৃতে অন্তরতর অন্তরতমের বাণী শুনেন নাই। যুবকবন্ধুগণ, জ্ঞানগর্ব্ব ছাড়; মাটীতে লুটাইয়া যদি না পড়িতে পার, তবে সে বাণী শুনিতে পারিবে না, সে পথে চলিতে পারিবে না। Hutton বলিয়াছেন—For man it is a weary way to God, but a wearier far to any demigod. (মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিবার পথ নিতান্তই ক্লেশকর, কিন্তু প্রতিভা-খ্যাতি-জ্ঞান-গর্ব্বে গর্ব্বিত মানুষের পক্ষে তাহা আরও অধিক দুর্গম।) অনেক সময় মনে হয়, আর যেন পাপ তাপ নিরাশার ভার বহন করা যায় না। স্মরণ রাখিও In frivolity there is no refuge for the human spirit in distress (দুঃখ বিপদগ্রস্ত মানবের পক্ষে হাস্য কৌতুকে কোনও আশ্রয়স্থান নাই।)

জগতের নিকট তোমাদের কি দায়িত্ব আছে তাহা যদি স্মরণ না কর, হিসাব নিকাসের দিন যদি জবাব না দিতে পার, দূরে পড়িয়া থাকিবে। আত্মা-বিহঙ্গমের একটি পক্ষ ছিন্ন হইবে, গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারিবে না।

Carlyle এর মনে আক্ষেপ ছিল যে, তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান হইল না; কিন্তু সে ক্ষোভ দূর হইয়াছিল। তাহার পর গভীরতর দুঃখ আসিল। তাঁহার বিখ্যাত Edinburgh Addressএর পর যখন চারিদিকে তাঁহার প্রশংসাধ্বনি উঠিল, তাঁহার পত্নী আনন্দে এক tea-party-র আয়োজন করিলেন। তিনি গাড়ী করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইলেন; গাড়ীতেই হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতিরিক্ত আনন্দেই তাঁহার হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। পতির যশে যে আনন্দ হইল, তাহা হৃদয়ে ধরিতে পারিলেন না। কার্লাইল গভীর দুঃখে নিমগ্ন হইয়া বলিলেন—Now can I worship truly—(এখন আমি সত্যভাবে ঈশ্বরের পূজা করিতে পারিতেছি।) নিরাশ্রয় না হইলে, পরমাশ্রয়কে পাওয়া যায় না। চারিদিক অন্ধকার না দেখিলে, যিনি জ্যোতির জ্যোতি তাঁহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার মহা পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞানে শুনিয়াছি ভারতবর্ষে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তিনি কি রূপ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু একটি কথা জানিতাম না। তাঁহার পুত্রের নিকট শুনিয়াছি, তিনি যখন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া উপাসনা করিতেন, তখন যাহারা তাহার পাশ দিয়া যাইত তাহারা শুনিতে পাইত, তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছেন। প্রতিভার, বিদ্যাবুদ্ধির, তাঁহার কোনও অভাব ছিল না। তবুও তিনি আকুল বেদনা লইয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেন। রামমোহন রায়ের অতুল প্রতিভা ছিল—পৃথিবীতেই তাঁহার সমকক্ষ পাওয়া কঠিন। তিনি গাড়ীতে চলিতে চলিতে অনেক সময় চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতেন। এক দিন মিস্ হেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "আমি প্রার্থনা করি, যেন পাপচিন্তা হইতে মুক্ত থাকি।" মিস্ হেয়ার বলিলেন, "রাজা, আপনার মনেও কি পাপচিন্তা আসিতে পারে?" তিনি উত্তর করিলেন "আমরা সকলেই দুর্ব্বল।" এখানেই তাঁহার মহত্ব। তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যার খ্যাতি, যাহাতে বেন্থাম অবাক্ হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ কিছু নয়। এই বেদনা, আর এই বিনয়, ইহাতেই তাঁহার মহত্ব।

একবার কেশবচন্দ্র Sunday Mirror পত্রিকায় লিখিলেন, "আমি বলিয়া থাকি সকলের নিকটেই আমরা কিছু শিক্ষা পাইতে পারি; আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, Devil এর নিকট কি শিক্ষা পাইতে পারি—আমি বলি, অধ্যবসায়ের উপদেশ পাইতে পারি, একাগ্রতার উপদেশ পাইতে পারি।" এক অভাগিনী নারী কোনও যুবককর্তৃক আহত হয়। সেই আঘাতেই তাহার

প্রাণ যায়। আঘাতের বেদনাতে অস্থির হইয়া সে দোতালা হইতে একতালাতে চৌবাচ্চার জলে লাফাইয়া পড়িল। উচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়া কত বিপদজনক তাহার সে চিন্তা করিবার অবসর থাকিল না। শুনিয়াছি গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমি পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য দোতালা হইতে ঝাঁপাইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে পারি।" কি নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কথা! এই একাগ্রতা ভিন্ন এ পথে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ একেবারে কল্পনা নয়—অর্জুন পাখীর চক্ষু ভিন্ন আর কিছু দেখিতেছেন না। এরূপ না হইলে লক্ষ্য ভেদ করা যায় না, সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ব্রাহ্ম আচার্যদের মধ্যেও এরূপ একাগ্রতার কথা শুনিয়াছি, দেখিয়াছি। তাঁহারা গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন, পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন।

যুবক বন্ধুরা হয়ত বলিবেন "কেবল বেদনার কথাই বলিবেন?" না, এতক্ষণ একটি পক্ষের কথাই বলিলাম। আর একটির কথাও বলিতেছি। মানবাত্মার আর একটি পক্ষ ভূমানন্দ। তুচ্ছ সুখ নয়, সেই আনন্দ যাহা একমাত্র ব্রহ্মসহবাসেই লাভ করা যায়। আমি তাহা পাই নাই, আভাস মাত্র পাইয়াছি। যদিও কোনও গ্রন্থে পড়ি নাই, তবু সেই আভাস পাইয়া নিজেই বলিলাম "কামনাহরণং"। কল্পনা করিয়া বলিব না, যেটুকু পাইয়াছি তাহাই বলিতে পারি। ইহাই "vision beatific" (ভূমানন্দজনক দর্শন)। "লালসা থাকে না অন্ত"— কি মিষ্ট কথা! ক্ষুদ্র সুখ দিয়া কি হইবে? তাহাতে অন্তরের গভীর বেদনার শান্তি হইবে কি? তাহা কি রূপে হইবে তাঁহার প্রকাশ ভিন্ন? তাহা হইতে পারে না। এইজন্যই Dante বলিয়াছিলেন "Sorrow remarries us to God. (দুঃখ আমাদিগকে ঈশ্বরের সহিত পুনর্বিবাহিত করে।) তাঁহার সহিত মিলন না হইলে, পরাশান্তি—ভূমানন্দ—পাওয়া যাইবে না। পরমসুন্দরে চিত্ত অর্পণ করিয়াই চিরযৌবন লাভ করিতে হইবে।

Jeremy Taylor চার্চ অব ইংলণ্ডের একটি কর্মের জন্য প্রার্থী হইলে, Archbishop Laud তাঁহাকে বলেন যে, তিনি যে কাজের প্রার্থী তাহার পক্ষে তাঁহার বয়স অতি অল্প। তাহার উত্তরে "he begged His Grace to pardon that fault of youth and promised, if he lived, he would mend it soon (তিনি তাঁহার যুবকত্বের অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে উক্ত দোষ শীঘ্রই সংশোধন করিবেন।) যৌবন কখনও নিন্দনীয় নহে।

Thoreau বলিয়াছিলেন I am sixty years young (আমি ষাট বৎসরের যুবক)। সেই যৌবন কেবল ভূমানন্দেই পাওয়া যায়, যাহা পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "আমি এখন ইহলোকেও নই, পরলোকেও নই, আমি এখন ঈশ্বরের মহিমালোকে রহিয়াছি।" যিনি ভূমানন্দ পাইয়াছেন, তিনি আর কিছুই চাহেন না।

এই দুই পক্ষে যখন আমরা চলিতে শিক্ষা করি, তখনই কর্মযোগ সহজ হয়। কতকগুলি কর্ম করিয়া গেলেই কর্মযোগ হয় না। তিনি ভিন্ন গতি নাই জানিয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্য যখন কর্ম করি, তখনই কর্মযোগ হয়। একমাত্র তাঁহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল কর্ম করিতে হইবে। তাই গীতার উপদেশ, নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া যাও, সকল কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ কর। সত্যের কথা সকল দেশে একই। Goethe বলিয়াছেন The spirit in which I act is the highest matter. (আমি যে ভাবদ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করি তাহাই সর্ব্বপ্রধান কথা।) খ্যাতি প্রতিপত্তি, জয় পরাজয়, বড় কথা নয়। কি অভিপ্রায়ে কাজ করিতেছি, ব্রহ্ম গৌরবান্বিত হইতেছেন কি না, তাহাই প্রধান চিন্তার বিষয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। এমার্সন বলিয়াছেন The measure of an act is the sentiment from which it proceeds. (যে ভাব হইতে কোনও কার্য্য করা হয় তাহাই উহার পরিমাপক।) পরম পিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি অতি ছোট কাজও করি তবে তাহাতেই কল্যাণ। Dacca Collegeএ একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার কলেজে যাইতে কোনও দিন এক মিনিটও দেরী হইত না। এক দিন দেখা গেল, তিনি ঠিক সময়ে আসিলেন না, এক ঘণ্টা চলিয়া গেল। অবশেষে তিনি ক্লাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে ক্ষমা কর, আমার একটি মেয়ে পুড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহার দেহ সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়া আসিতে দেরী হইয়া গেল।" তাহার পর শান্ত ভাবে আপনার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাকেই বলে কর্মযোগ।

Goethe সকল ধর্মের তুলনা করিয়া Christianityকে (খৃষ্টধর্মকে) এই বলিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন যে, ইহা আমাদিগকে Reverence for what is beneath us (আমাদের নিকটে যাহা নিম্নতর ও নিকৃষ্ট মনে হয়, তাহার প্রতি ভক্তি ও সম্মান) শিক্ষা দেয়। দীনতা চাই—দীনতা না থাকিলে মহৎ হওয়া যায় না। কেহ বলিয়াছেন "Let me sin deep that I may cast no stone (আমি যেন গভীর পাপে লিপ্ত হই, তাহা হইলে আমি কাহারও প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে পারিব না।) কি মহৎ ভাব!

কেহ বলিতে পারেন, যৌবনকালে কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হয়? কেন? শাক্য সিংহের বয়স কত ছিল? ১৯ বৎসর বয়সে মার্টিন লুথারের ধর্মজীবন আরম্ভ হইল। যৌবনকালেই জগতের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। জগতে দুঃখের অবধি নাই, কুড়াইয়া লইলেই হয়; কিছু কুড়াইয়া লও। আর আনন্দ চাও? ভূমানন্দের অনুসন্ধান কর। আমি এম্ এ, পরীক্ষার পূর্ব্বদিন মন্দিরে আসিলাম, ইচ্ছা ছিল একটু থাকিয়াই চলিয়া যাইব। কিন্তু উঠিতে পারিলাম না! মন্দিরের মধ্যে কি এক মধুর স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল! গোস্বামী মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। কি আনন্দে সকলের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, আর উঠিতে পারিলাম না। তখন মনে ভাবিতে লাগিলাম, কি বস্তু ইহারা পাইয়াছেন যাহাতে ইহারা এরূপ মুগ্ধ হইয়াছেন। আমি ত সেরূপভাবে ডুবিতে পারি না!

পরশমণির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। রূপ না সনাতন (ঠিক স্মরণ নাই) পরশমণি পাইয়াও তাহাকে তুচ্ছ করিয়া দূরে

ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট স্পর্শমণির জন্ম আসিলে, তিনি তাঁহাকে সেখান হইতে কুড়াইয়া লইতে বলিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণের মনে হইল "পরশমণি দিয়া কি করিব? যে বস্তু পাইয়া ইনি তাহাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, তাহাই চাই, তাহারই অনুসন্ধান করি।" সেই ভূমানন্দের নিকট আর সকলই তুচ্ছ।

জগতে ফুলের সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা মধুরতর কি আছে? তাহাও পরম সুন্দরের কাছে অতি তুচ্ছ। তাঁহার প্রকাশে সকল ভুলিয়া যাইতে হয়। শুধু সুখ সৌন্দর্য্য নয়, দুঃখ যাতনাও ভুলিয়া যাওয়া যায়। Bahai movement এর (বাহাই ধর্ম-সম্প্রদায়ের) যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাকে ভয় দেখান হইল জলন্ত অগ্নিসম তপ্ত ইট তাঁহার বুকে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। তিনি নিজেই সেই ইট লইয়া বুকে রাখিলেন। St Lawrenceকে জীবন্তই লোহার শিকের উপর ভাজা হইতেছিল, তিনি শান্তভাবে বলিলেন Turn me, this side is done. (আমার পাশ ফিরাইয়া দেও, এই দিকটা হইয়া গিয়াছে)। কি আনন্দ পাইয়া তাঁহারা এই যাতনাকে তুচ্ছ করিয়াছেন? সেই আনন্দই পাইতে হইবে।

কথিত আছে নারদকে ভগবান একবার দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন "তোমাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্ম একবার দেখা দিলাম, তোমার অন্তরের কলুষ দূর না হইলে আমাকে আর পাইবে না।"

St Augustineও বলিয়াছেন, "এক এক সময় কি আনন্দ পাই, কিন্তু তাহা ধরিয়া রাখিতে পারি নাই!" তাঁহার কৃপায় আমরাও প্রলুব্ধ হইয়াছি। ইহা সত্য। আমরা যে আবার তাহা ভুলিয়া যাই, ইহাই দুঃখের কথা। এক দিন মন্দিরে গান হইতেছিল "বঞ্চিত হওরে কেন লভিতে পরমধন।" বাহির হইতে এই কথা শুনিয়া প্রাণে কিরূপ ধাক্কা লাগিল বলিতে পারি না। গভীর বেদনাতেই বুঝি অন্য কিছুতেই শান্তি নাই, ভূমানন্দ ভিন্ন অপর আনন্দ কিছু নয়। "তোমার তুলনা তুমি হে।" তাঁহার সঙ্গে অন্য কিছুরই তুলনা হয় না।

অন্য কিছু করিতে হইবে না, তাহা বলিতেছি না। রাজনীতি বা সাহিত্য বা অপর যে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে হয় করিবে। সব কর্ম্মেই যাইতে হইবে। কিন্তু সকলের মধ্যে এক লক্ষ্য থাকিবেন তিনি। তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সকল কর্ম্ম করিতে হইবে।

Rousseauর সময় হইতে ইউরোপের অনেক জ্ঞানী লোক সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর যে কত অনিষ্টকর সে কথা দারুণ আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন। Spencer, Wordsworth, Mill, Carlyle, Emerson প্রভৃতি সকলেই এইরূপ বলিয়াছেন। Wordsworth যে Dove Cottage এ বাস করিতেন, তাহা একটি দোতালা কুঁড়ে ঘর মাত্র। সেই কুঁড়ে ঘরে যে সকল কবিতা লেখা হয়, তারই সম্বন্ধে Matthew Arnold বলিয়াছেন "বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী সাহিত্যে সেই কবিতাগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" তিনি Plain living and high thinkingএর (বিলাসহীন ও মহৎচিন্তাপূর্ণ জীবনের) অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

Emerson বলিয়াছেন You have no right to do a thing, unless you are equally willing to be prevented from it. (তুমি যদি কোনও কার্য্য হইতে বিরত হইতে প্রস্তুত না থাক, তবে তোমার তাহা করিবার অধিকার জন্মে নাই।) নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলিতে প্রস্তুত না হইলে, কর্ম্ম করিবার অধিকার জন্মে না। Thomas A Kempis বলিয়াছেন—You must break your will a hundred times. (শতবার নিজের ইচ্ছাকে চূর্ণ করিতে হইবে।) বার বার নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট বিসর্জ্জন দিতে হইবে। নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগত না করিলে কর্ম্মযোগ হয় না। বর্ত্তমানে কর্ম্মযোগ না হইয়া, কর্ম্মভোগই হইতেছে।

Tennyson যখন Wordsworth এর পর Poet-laureate হইলেন তখন লিখিয়াছিলেন—These laurels fresh from the brow of him who uttered nothing base. (যিনি কখনও কোন অসাধু কথা বলেন নাই তাঁহার মস্তকহইতে সদ্যপ্রাপ্ত এই পুষ্পমাল্য পাইলাম।) এইখানেই Wordsworth এর মহত্ব। তিনি ক্ষুদ্র বিষয়ের কথা বলেন নাই, মহৎ বিষয়েরই কথা বলিয়াছেন, পরমসুন্দরের অসীম সৌন্দর্য্যই দেখিয়াছেন।

সক্রেটীশও বলিয়াছেন, "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা জগতের পক্ষে কল্যাণকর কি না তাহাই ভাবিয়া দেখ। অনেকে তোমার কথার প্রশংসা করিতেছে কি না তাহা ভাবিও না।" পরম সুন্দরকে অন্তরে দেখিয়া কথা বলিলেই তাহা আনন্দদায়ক হয়।

Dante দৈহিক সৌন্দর্য্যের কথা ভুলিয়া পরম সুন্দরের কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গ পাইলে আর কোনও সাধই থাকে না। তিনি Beatriceএর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুসন্ধানেই ছুটিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মের নিকট পৌঁছিয়া বিয়াট্রিসকেও ভুলিয়া গেলেন। সে সৌন্দর্য্যের নিকট আর সকল সৌন্দর্য্যই তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ।

Matthew Arnold এর মতে এমার্সন বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী গদ্য-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক। এমার্সন আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন দেখিয়া শুনিয়াই বলিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে দেখিয়া, তাঁহার বাণী শুনিয়া, লিখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতা।

বই লিখিবে? কি লিখিবে? দেখিয়া লেখ। Christএর parables গুলির তুলনা মিলে না। তাহা কোথা হইতে আসিল? Consider the lilies of the field how they grow; they toil not, neither do they spin; yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. (মাঠের লিলি-ফুলগুলির দিকে চাহিয়া দেখ, তাহারা শ্রম করে না, সূতা কাটে না, অথচ সলোমন তাঁহার সমস্ত গৌরব সত্ত্বেও এরূপ সুন্দর পোষাকে সজ্জিত নহে।) তিনি পরম সুন্দরকে দেখিয়াছিলেন, তাই ইহাদের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তোমাদের ভাবিবার অবসর নাই, এই সৌন্দর্য্য দেখিবার সময় ও শক্তি নাই।

Ovida বলিয়াছেন একটা গোলাপ যদি ৫০০ বৎসরে

একবার ফুটিত, তাহা হইলেও লোকে বিস্মিত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য পূজা করিত। এই সৌন্দর্য্য তোমরা দেখিতে পাও না? বৃক্ষ পত্রের নাচ দেখ না? বায়ুহিল্লোলের স্নিগ্ধতাতে তাঁহার কৃপার স্পর্শ পাও না? তাহা না হইলে কি হইল? প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি দেখিলে? প্রকৃত আনন্দ কি পাইলে?

রাজনীতির চর্চ্চা করিতে চাও? রাজনীতি কাহাকে বলে? রাজনীতি কেবল লোকের মঙ্গলের জন্য—All law is only beneficence acting by rule. (নিয়মের দ্বারা মঙ্গল সাধন করার নামই আইন।) Lincoln বলিয়াছেন—I am not bound to succeed. I am bound to do the right, whatever it may cost me in money, influence, power. (আমি সফলতা লাভ করিতে বাধ্য নই। যেরূপ ক্ষতিস্বীকার করাই আবশ্যক হউক না কেন, সব স্বীকার করিয়া, যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহা করিতেই আমি বাধ্য।) লোকের মহত্ত্ব সফলতাতে নহে। যখন বিফলতা আসে, তখনই লোকের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

Sir Walter Scott যখন শোকে দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, তখনই তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইল। Milton এর মহত্ত্ব কখন প্রকাশ পাইয়াছিল? যখন On evil days and evil tongues though fallen (যদিও দুর্দ্দিনে ও লোকের নিন্দা গ্লানির মধ্যে পতিত) তখনই তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। রামমোহন রায়ের গায়ে লোকে থুথু দিয়াছে। তিনি হাসিয়া বলিতেন, "কোচ্ম্যান্ হাঁকাইয়া চল।" এখানেই তাঁহার মহত্ত্ব।

আমরা অধিকার লইয়া ব্যস্ত থাকি। তাহা অতি তুচ্ছ। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অধিকার কি? আমাদের অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে যাইবার অধিকার আছে। এই অধিকার পাইবার জন্য আমরা ব্যস্ত নই। আর ক্ষুদ্র অধিকারের জন্য ঝগড়া বিবাদ করি! এই উচ্চ অধিকারের জন্যই যেন আমরা ব্যস্ত হই। সেই এককে পাইলেই সকল পাওয়া হইবে। "এক প্রথম তেজ সেই একেরই অসংখ্য কিরণ"—তাহা দেখ না? তবে কি সৌন্দর্য্য দেখ? A beautiful face is a key to the meaning of the universe. (একখানি সুন্দর মুখ বিশ্বের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশক। সুন্দর মুখ দেখিয়া যদি বিশ্বের মধ্যে পরম সুন্দরের প্রকাশ না দেখিতে পাও, তবে সৌন্দর্য্য দেখা হইল না। বাহিরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভিতরের সৌন্দর্য্যই অধিকতর দেখিতে হইবে। মানবের মানবত্বের সৌন্দর্য্য দেখ। যাহা দেখিয়া সেণ্ট ফ্রান্সিস্ ঘৃণিত লাঞ্ছিতদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেই সৌন্দর্য্য দেখিবার অধিকার চাই। যতই কেন আমরা মলিন না হই, এক দিন পুণ্যভূষণে ভূষিত হইবই। সেই পুণ্যের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইবে। সেই পুণ্যলাভে পরস্পরের সহায়তা কর। কর্ম্মভোগ না হইয়া যাহাতে কর্ম্মযোগ হয়, তাহাতে সাহায্য কর। যে ভূমানন্দে পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ডুবিয়াছিলেন, যাহার আভাস আমরাও পাইয়াছি, তাহার জন্য সহিষ্ণুতার সহিত প্রতীক্ষা করি।

আর্কিমিডিস ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন না। তথাপি তিনি ভয়ে ভীত হন নাই। নিষ্কাশিত অসি হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান সৈনিকের নিকট তিনি প্রাণভিক্ষা করিলেন না, বলিলেন—"Wait till my problem is solved". (আমার সমস্যার পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।) আমরা কি অঙ্ক করিতেছি? সেই সমস্যা-পূরণের জন্য ব্যস্ত হও, যাহাতে সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়।

সাহিত্য, আর্ট (শিল্প) প্রভৃতির নামে চারিদিকে কি হইতেছে? বাড়ী ঘর কি দিয়া সাজান হইতেছে? বিলাসিতার জন্য কেবল কর্ম্মভোগই হইতেছে। যাঁহাকে ঘরে আনিলে সকল সুন্দর হয়, যাঁহার জন্য আর সকল পরিত্যাগ করা যায়, তাঁহাকে পাইবার জন্য কি করিতেছ? "এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্য সকল স'বে।" আর সকল ছাড়িয়াও যদি সেই পরম ধনকে পাই, তবে তাহাই পরম লাভ। আমরা তাহাই ভিক্ষা করি। ভিক্ষুক হইবার অধিকার আমাদের আছে। আমরা সেই ধনের ভিখারী হই, আমরা কর্ম্মযোগের ভিখারী হই, ভূমানন্দের—চিরযৌবনের—ভিখারী হই।

উপদেশ ও প্রার্থনান্তে "কর ব্রহ্মপ্রীতি প্রিয়কার্য্য এই ত উপাসনা" ইত্যাদি সঙ্গীত হইয়া এই বেলার কার্য্য শেষ হয়। তৎপরে প্রীতিভোজন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় "ব্রাহ্মসমাজের কাজ" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মফঃস্বল হইতে প্রাপ্ত কয়েকখানা টেলিগ্রামের উল্লেখ করিয়া প্রেরিত কয়েকটি (শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত প্রভৃতির) প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ পাঠ করেন ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম জ্ঞাপন করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নিজেদের বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। সভাপতির মন্তব্যান্তে সভাভঙ্গ হয়।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় হইতে বরাহনগর শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে নগরসংকীর্ত্তন। সকলে হেদুয়াতে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রার্থনা করেন এবং সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বিডনষ্ট্রীট, ডাফষ্ট্রীট, মাণিকতলাষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্টষ্ট্রীট, সুকিয়াষ্ট্রীট, রঘুনাথ চাটার্জ্জিষ্ট্রীট, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীলেন, বেচুচাটার্জ্জিষ্ট্রীট, ও কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট, হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে কিছু সময় সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। তৎপরে উপাসনা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীচৈতন্যের রচিত "চেতোদর্পণমার্জ্জনং" এই শ্লোক অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া উদ্বোধন করেন এবং আরাধনান্তে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ দেন:—

ভাগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সেই গ্রন্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকাটির সংক্ষিপ্ত সার এই:—মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এক দিন বিষন্ন মনে বসিয়া ছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, "আমি বিধিপূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্মপালন করিয়াছি, বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান

সুগম করিবার জন্য এক অখণ্ড বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি এবং যাহারা বেদাধ্যয়নে অনধিকারী তাহাদিগকে বেদোক্ত ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য মহাভারত রচনা করিয়াছি। তথাপি আমার হৃদয় তৃপ্ত হইতেছে না কেন? আমার মনে হইতেছে যেন আমার কোনও কর্ম্ম অসম্পন্ন রহিয়াছে। পরমহংসদিগের প্রিয় ভাগবতধর্ম্ম আমি বিশেষভাবে নিরূপণ করি নাই, উহাই কি আমার অতৃপ্তির কারণ?" ব্যাস এরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি ব্যাসের বিষাদ ও অতৃপ্তি বুঝিতে পারিলেন এবং ব্যাসও তাঁহার নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, "আপনি মহাভারতে নানা কাম্যকর্ম্ম সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন এবং লোকদিগকে এরূপ কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন। ইহা আপনার পক্ষে মহা ভ্রম হইয়াছে ("মহান্ ব্যতিক্রমঃ"), কারণ এরূপ কর্ম্মে স্বভাবতঃই লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, ধর্ম্মোপদেষ্টারা বহুলভাবে এই সকল কর্ম্মের উপদেশ দিলে লোকে এই সকলকেই পরম ধর্ম্ম মনে করে এবং নিষ্কামকর্ম্ম ও ভগবদারাধনা হইতে বিমুখ হয়। আপনি বিশেষ ভাবে ভগবানের অমল যশ কীর্ত্তন করেন নাই। আপনি এখন তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিয়া তাঁহার লীলা দর্শন করুন্ এবং সেই লীলাবর্ণনে পরিপূর্ণ এক খানা গ্রন্থ লিখুন্, তবেই আপনার হৃদয় তৃপ্ত হইবে।" এই বলিয়া নারদ তাঁহার নবজীবন লাভের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। সেই বৃত্তান্তের সার মর্ম্ম এই:—নারদ কতিপয় ঋষির দাসীপুত্র ছিলেন। ঋষিগণ বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে চারি মাস একত্র বাস করিতেন। সেই সময় তাঁহারা মিলিত ভাবে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতেন। নারদ পঞ্চবর্ষীয় বালক হইলেও সেই গুণকীর্ত্তনশ্রবণে আকৃষ্ট হন। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। ঋষিগণ তাঁহার ভগবৎপ্রীতি ও সুশীলতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হন এবং তাঁহাকে ভগবৎতত্ত্ব ও ভগবৎসাধন শিক্ষা দেন। চাতুর্ম্মাস্যান্তে ঋষিগণ আশ্রম ছাড়িয়া নানা দিকে চলিয়া গেলেন, নারদ মাতার আশ্রয়ে রহিলেন। ঘটনাক্রমে সর্পাঘাতে মাতার মৃত্যু হইল। তখন নারদ আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া নানা গ্রাম, প্রান্তর, পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় অরণ্যে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রান্তিবশতঃ একটা বৃহৎ বটবৃক্ষ-মূলে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি ঋষিদিগের উপদিষ্ট সাধনপ্রণালী অনুসারে ভগবৎ-ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হওয়াতে তিনি ভাবে বিভোর হইলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই সেই ভাব-প্রবাহের মধ্যে ভগবানকে হারাইয়া ফেলিলেন। পুনরায় চিত্ত স্থির করিয়া ধ্যানস্থ হইয়াও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি এই মর্ম্মের একটি আশ্বাসবাণী শুনিলেন—"তোমার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির জন্যই আমি তোমাকে একবার দেখা দিয়াছি। তুমি এই জন্মে আর আমার দেখা পাইবে না। আমার গুণকীর্ত্তন দ্বারা যখন তোমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইবে, তখন তুমি দেহান্তে আমার চিরপার্ষদরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে।" এই বাণী শ্রবণ করিয়া নারদ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন ভগবানের গুণকীর্ত্তনে যাপন করিলেন। ভগবানের পার্ষদরূপে নবজীবন লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, বীণাযোগে ভগবৎকীর্ত্তন করিতে না করিতেই ভগবান্ সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। এইরূপে ব্যাসকে শান্তিলাভের উপায় ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া দেবর্ষি বিদায় লইলেন এবং ব্যাস নারদের নির্দ্দেশানুসারে ভাগবত রচনা করিলেন। এই আখ্যায়িকা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নহে, সত্য হইতেই পারে না, কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিকভাবে সত্য। ইহার রূপকাবরণ ভেদ করিলেই ইহার মূল্যবত্তা অনুভব করা যায়। সাধারণতঃ সমুদায় পৌরাণিক আখ্যায়িকা সম্বন্ধেই এই কথা সত্য। ইহাদের রূপক ভেদ করিতে না পারিলে এই সকল আখ্যায়িকা অতি অশ্রদ্ধেয় ও বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহাদের ভিতরে প্রবেশ করিলে সার সত্য পাওয়া যায়। নারদ প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষি—উপনিষদ্ যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী; সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাই। দেখিতে পাই সেই উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ে তিনি আর এক জন দেবর্ষির—দেবসেনাপতি স্কন্দ বা সনৎকুমারের—নিকট ভূমাতত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন। নারদ-সনৎকুমার সংবাদ অতি উপাদেয় বস্তু। বেদব্যাস বৈদিক যুগের শেষাংশের লোক। কোনও বৈদিক গ্রন্থে তাঁহার নাম পাই নাই। এই দুই ব্যক্তির মিলন ঐতিহাসিক ভাবে অসম্ভব। ভাগবত-রচনার সময় তাঁহাদের মিলন আরো অসম্ভব। ভাগবতে বৌদ্ধ রাজাদিগের বিবরণ, পশ্চিম ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছাধিকার, এমন কি চতুর্দ্দশ জন তুরস্ক রাজারও উল্লেখ আছে। এমন আধুনিক যুগে ব্যাস-নারদের মিলন কেবল আধ্যাত্মিক ভাবেই সম্ভব। ভাগবত-রচয়িতা গভীরভাবে মহাভারত অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছিলেন মহাভারত-রচয়িতা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকেই বাড়াইয়াছেন, জ্ঞান-কাণ্ডের ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান এবং প্রাচীন ভাগবত-পঞ্চরাত্র ধর্ম্মের উপদিষ্ট ভক্তিসাধনের উপর তিনি তেমন ঝোঁক্ দেন নাই। মহাভারতের আদিস্তর বেদব্যাসের রচনা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরবর্ত্তী স্তরগুলি তাঁহার রচিত হওয়া অসম্ভব। যাহা হউক, ভাগবত-রচয়িতা বেদব্যাসকেই মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং নারদকে ভাগবত-পঞ্চরাত্র ধর্ম্মের প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ব্যাস ও নারদকে একত্র করিয়া এবং ব্যাসকে নারদের দ্বারা ভাগবতপুরাণ রচনায় প্ররোচনা করিয়া এই শিক্ষা দিতেছেন যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মের দিন তো শেষই হইয়াছে, ভক্তিশূন্য ব্রহ্মজ্ঞানও সম্যক্ ধর্ম্ম নহে,—ব্রহ্মে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ এবং মানবজীবনে তাঁহার লীলাদর্শন ও কীর্ত্তন, ইহাই সারধর্ম্ম। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু তিনিও যে ভক্তিধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। উপনিষদ্ এবং মহাভারত, (বিশেষতঃ মহাভারতান্তর্গত ভগবদ্গীতা) অপেক্ষা ভাগবতে ভক্তিধর্ম্ম অধিকতর ফুটিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাভারতের ন্যায় ভাগবতও কোন কোন বিষয়ে বড় ভুল ("মহান্ ব্যতিক্রমঃ") করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভক্তির আদর্শ প্রচার করিতেছেন তাহা ভাগবত-ধর্ম্মের আদর্শ অপেক্ষা অনেক উচ্চতর। প্রথমতঃ, ভাগবতকার তাঁহার অবতারবাদকে মূলে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু অবান্তরে ইহাকে নির্দ্দোষ

করিতে পারেন নাই, মোটের উপর ইহাকে লৌকিক বিশ্বাসের অনুযায়ীই করিয়াছেন। তাঁহার মতে "অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ"—প্রত্যেক আত্মাতেই পরমাত্মা অবতীর্ণ হন,—কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক মহাপুরুষ-কাহিনীর উপর বিশেষ ঝোঁক্ দিতে যাইয়া তিনি তাঁহার অবতারবাদের শুদ্ধতা ও উদারতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বৈদান্তিক বামমার্গের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ও লয়বাদ পরিহার করিতে পারেন নাই। ভক্তি আস্বাদন করিবার ইচ্ছা তাঁহার খুব প্রবল, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী ও লয়বাদীর পক্ষে ভক্তির পূর্ণ আস্বাদন অসম্ভব। প্রথম হইতেই যদি সাধকের এই ধারণা থাকে যে উপাস্য-উপাসকের ভেদ মিথ্যা, মায়িক, সুতরাং উপাসনা ও ভক্তি-মূলক ধর্ম্ম ব্যাবহারিক এবং অস্থায়ী ধর্ম্মমাত্র, পারমার্থিক ও স্থায়ী ধর্ম্ম নহে, তবে ভক্তি কখনও সম্পূর্ণরূপে ফুটিতে পারে না। ভাগবতোক্ত স্তবস্তুতিগুলিতে এই অভাব স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। জীব যে অন্তে ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষরূপে লীন হইয়া যাইবে, এই মতও ভাগবতকার স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপেই শিক্ষা দিয়াছেন। এই লয়বাদ প্রকারান্তরে ঈশ্বরের প্রেম অস্বীকার করে, সুতরাং ইহা ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী। তৃতীয়তঃ, ভাগবতকার তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ভগবদ্-গুণকীর্ত্তনের উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তনগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে, প্রত্যেকের ভিতরে ও বাহিরে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় ঘটনায়, ঈশ্বর যে নিত্য-লীলা করিতেছেন, এই অনুভূতি তাঁহার গ্রন্থে উজ্জ্বল নহে। যাহা হউক, উপরি-উক্ত প্রত্যেক বিষয়েই এখন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অখণ্ড পরব্রহ্মের অভেদ অদ্বৈতভাব স্বীকার করিয়াও দেখাইতেছেন যে জীবের সঙ্গে তাঁহার একটী চিরন্তন ভেদ ও দ্বৈতভাব রহিয়াছে। এই চিরন্তন দ্বৈতভাব না দেখিলে ভক্তিধর্ম্ম কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভগবৎ-লীলা দর্শন সম্বন্ধেও ব্রাহ্মধর্ম্ম কাল্পনিক আখ্যায়িকা উপেক্ষা করিয়া এবং ঐতিহাসিক মহাপুরুষ-কাহিনীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সাক্ষাৎভাবে ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলীর দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিতে বলিতেছেন। ধর্ম্মবিশ্বাস যত দিন পরম্পরাপ্রাপ্ত মত ও প্রাচীন ইতিহাসের উপর নির্ভর করে তত দিনই মনে হয় দেশ, কাল ও ব্যক্তিত্বের সীমায় ঈশ্বরাবতরণ অলৌকিক, সাময়িক ও অস্থায়ী ব্যাপার। যখন দেখা যায় অসীমের সহিত সসীমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ও চিরন্তন ব্যাপার, তখন উপাসক ব্যক্তিগত ও সমবেত জীবনে ঈশ্বরের জীবন্ত লীলা প্রত্যক্ষগোচর করিয়া প্রেমভক্তিতে প্লাবিত হন। এই ভক্তিধর্ম্মই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ, এবং ইহাই বর্ত্তমান যুগের জীবন্ত পরিত্রাণপ্রদ বিধান।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) সোমবার—

প্রাতঃকালে মন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

অনেক দিন বিদেশবাসের পর যখন স্বদেশে ফিরে দেশের নারীদের দেখলাম, একটা আত্মবিস্মৃত সলজ্জ কোমল ভাব যে তাদের বিশেষত্ব সেই কথাটা মনে হ'ল। আজ এখানে এসে ভগবদর্চ্চনার জন্য সম্মিলিত ভগিনীদের মুখশ্রী দর্শন করে' হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত। এই দৃশ্য, এই ভক্তিনম্রতা, এই ভাববিহ্বলতা সকল স্থানে দেখা ঘটে নাই—আর কোথাও নাই এমন কথা অবশ্য বল্‌তে পারি না। কিন্তু বিদেশে যখন ছিলাম, তখন সেখানে নারীদের সজীবতা, কর্ম্মপটুতা, নানা-বিষয়ে সজাগভাব দেখে ইচ্ছা হয়েছে আমাদের ভাবপ্রবণ দেশে নারীরা, পুরুষদের মায়েরা, ভাইদের বোনেরা, যদি এই রকম সজীব সজাগ হন, যদি তাঁদের ভাবপ্রবণতার সঙ্গে, ধর্ম্মে রুচি ও ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি সম্মিলিত হয়, তবে ভারতবর্ষ সত্য সত্যই পুণ্যভূমি হবে। স্বপ্নাবিষ্টের মত আদর্শের ধ্যান ভাল, কিন্তু সজাগ না হ'লে আদর্শের সার্থক অনুসরণ সম্ভবে না, অভ্যস্ত জীবন ও ঈপ্সিত জীবনে চিরদিন ব্যবধান থেকে যায়। নিজের দিক থেকে নীরব অনুভূতির যতই মূল্য থাক, সলজ্জ সৌন্দর্য্য পরের চোখে যতই মধুর হোক, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার বল না থাকলে জীবনটা গড়ে' উঠে না। আজ এই কথাই বল্‌তে চাই যে, আমাদের আরও জীবন পেতে হবে, নির্জ্জীবতা দূর করে' জীবনের লক্ষ্য জেনে, লক্ষ্যে পৌছিবার পথ ও উপায় কি করে' ধরা যায়, তা ভাব্‌তে হবে। আর যত গুণই থাক্, মোটের উপর আমরা যে নির্জ্জীব, এ অভিযোগ সত্য।

বড় সহরে যেখানে মানুষ ক্রমাগত আস্‌চে যাচ্চে, কেনা-বেচা কচ্চে, বড় তীর্থস্থান যেখানে নানা দেশবাসী, নানা ভাষা-ভাষী লোকের ভিড়, সেখানে যদি পাড়া গাঁয়ের একটি লোক এসে পড়ে, যে কখন সহরে বাস করেনি, তার অবস্থা কল্পনা করা যাক্। সে সহজে পথ হারায়, তার যেখানে যাবার কথা মানুষের ঠেলায় ঠেলায় রাস্তার মোড় কখন ছাড়িয়ে এল না বুঝতে পারায়, সেখান থেকে অনেক দূরে এসে পড়ে। যদি সে দুর্ব্বল বা অশক্ত হয়, দ্রুত চল্‌তে না পারায় আর কেহ হয়তো দ্রুতবেগে যেতে যেতে তাহাকে বেশ ধাক্কা দিয়ে যায়। যারা সপ্রতিভ, পথ চেনে, কি করতে এসেছে, কোথায় যাবে সে কথা মনে রেখে চলে, তারা মানুষের ভিড় ঠেলে পা চালাতে ও কনুই দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে হয়তো অন্যের পা মাড়িয়েও রাস্তা করে' চলে।

জগতে অনেক মানুষের জীবনই ভিড়ের মধ্যে ঠেলা খেয়ে চলার মত। উদ্দেশ্য মনে রেখে, রাস্তা বুঝে, সময়ের কাজ সময়ে করে' চলা হয় না। তাদের কেউ পাড়াগেঁয়ে মানুষের মত, কেউ বা বালকের মত কাজ ভুলে', পথ ভুলে' সময় নষ্ট করে। যদি পথে নূতন রকমের কিছু দেখে তার দিকে চেয়ে থাকে। কোথায় কারা বাজনা বাজিয়ে গেল, কোথায় একটা জমকাল

মিছিল চলেছে, কারা কোথায় মারামারি কচ্ছে, তাই দেখতে দেখতে অনেকটা বেলা কেটে যায়।

চালাক চতুর নয় বলে', পথ চলা অভ্যাস নাই বলে', যে মানুষ পথ হারায়, ক'রবার কি ছিল তা ভুলে যায়, সে কতকটা ক্ষমার পাত্র, কিন্তু আবার এমন মানুষ আছে যারা পথের মধ্যে কতগুলি প্রলোভনের হাতে পড়ে। কেউ জুয়ারীর দলে মিশে জুয়া খেলতে ব'সে যায়, কেউ মদের দোকান দেখে, "একটু খেয়ে আসি" বলে' ঢুকে পড়ে, কেউ বা আর কোন লোভে পড়ে' হৃতসর্ব্বস্ব হয়ে বিলম্বে বাসায় ফেরে।

"আমি একলা এসেছি এ ভবে, আমার একলা যেতে হবে" এই কথা সব সময়ে মনে থাকা ভাল। যদিও এক অর্থে এ কথাটা ঠিক নয়। বাহিরের দিকে আমরা মোটেই একলা নই। এখানে আমরা মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করি, মানুষের স্নেহে পালিত, বর্দ্ধিত, গঠিত ও শিক্ষিত হই, মানুষের দেখাদেখি চলি, বলি, কাজ করি; ভাল কাজ শিখি, মন্দ কাজ শিখি, আঘাত পেয়ে আঘাত দিয়ে চলি—একলা অতি অল্প সময়ই থাকি। মাতৃজঠর হ'তে ভূমিষ্ঠ হবার সময় একলা আসি, মৃত্যুকালে একলা বিদায় হই। ঐ টুকুই একাকিত্বের সীমা। তাহাও তো সকল সময়ে নয়। যুদ্ধে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে, ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে, রেলগাড়ীর বা জাহাজের দুর্ঘটনায়, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে কত লোক এক সঙ্গে যমালয়ে যাত্রা করে। কিন্তু এক সময় জন্ম বা মৃত্যু ঘটিলেও প্রত্যেকের নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব ঘোচে না। এক আঘাতে মরিলেও আমার ব্যথা সে আমারই। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মানুষমাত্রই ব্যস্ত, কিন্তু আমার আশা ভরসা, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, রোগের জ্বালা, শোকের বেদনা, নিরাশার মর্ম্মপীড়া, সে নিতান্তই আমার। আমার আমিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিত্বই আমার একাকিত্বের মূল। এই আমার একাকিত্বে আমার স্বাতন্ত্র্য। আমার নিজত্ব যে পরিমাণে আমি মনে রাখতে পারি, সেই পরিমাণে আমার মনুষ্যত্বের সার্থকতা। "আমি একলা এসেছি এ ভবে, আমার একলা যেতে হবে" এই বলে' সমাজ সংসার ছেড়ে দিয়ে বৈরাগী হ'য়ে, রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে' জীবনযাত্রা শেষ করাতে সে মনুষ্যত্ব সার্থক হয় না। অথবা কেবল আমার সুখ, আমার স্বস্তি, আমার নিজের ধনমান প্রভুত্ব খুঁজে বেড়া'লেও হয় না। এই অগণ্য মানবের বাসস্থান ও কর্ম্মক্ষেত্রে আমি এসেছি একজন বাঁচতে আমার নিজের মত, অনুসন্ধান করতে আমার নিজের কর্ত্তব্যের পথ এবং চলতে আমার নিজের পায়ে। নিজের শক্তি সামর্থ্য জ্ঞান বুদ্ধি যা ভগবানের কাছে পেয়েছি তা অক্ষুণ্ণ রেখেই কেবল নয়, সে সকল শক্তিকে—দেহের, মনের, কর্ম্মের এবং ধর্ম্মের—চালনা দ্বারা বাড়াতে। আমার মানবত্বের উত্তরাধিকার, আত্মার গৌরব রক্ষা করতে হবে, এই কথাটা যদি সব সময়ে মনে থাকে, তবে হুজুগে পড়ে ছুটাছুটী ক'রবার, ভিড়ে পড়ে ঠেলায় ঠেলায় পথ চলার কিম্বা আঘাত পেয়ে পড়ে যাবার যে সব সম্ভাবনা, তা কম হয়।

আজ সকলকে মনে করাতে চাই যে, আমাদের সকলের যেমন জন্ম মরণ একলা—একলা আসি, একলা যাই—যেমন নিজের সুখ দুঃখের অনুভূতি, আশায় উৎফুল্লতা, নিরাশার অবসাদ একলাই ভোগ করি, তেমনি জীবনের সার্থকতা যে চাই, গৌরব রক্ষা করা যে চাই, এই মন্ত্রটিও জীবনে সাধন করতে হবে একলাই। তা' না হ'লে জীবনের গৌরব রক্ষা হয় না।

শুনে শুনে ভাল মন্দ বুলি ব'লতে শেখা সে তো টিয়া পাখীও পারে, অভ্যাস করালে কতগুলি সঙ্কেত অনুসারে চলা, এমন কি কতকটা বুদ্ধি খরচ করে চলা উচ্চশ্রেণীর পশু—হাতী ঘোড়া কুকুরও তো পারে। কিন্তু মানুষ নামের যোগ্য হওয়া, মননশক্তির অনুশীলন করা, সেটা মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের গৌরব, মনুষ্যত্বের চরম পরিচয়। "জীবতোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি পশু পক্ষিণঃ স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।"—

যার মন আছে সেই জীবিত, সে-ই মানুষ। আমাদের একটা মন আছে, সেই কথা ভুলি বলেই উদ্দেশ্য বিচার না করে' হুজুগে চলি, সুশ্রী দেখায়, কি বিশ্রী দেখায় বিচার না করে' ফ্যাসানের (fashion) দাসত্ব করি, লোভে প'ড়ে কর্ত্তব্য ভুলে যাই। এত বড় সুন্দর জগতে বাস করি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখেও দেখি না, বিস্ময়ে ও আনন্দে ভগবানের চরণে মাথা নত করি না, জগতের বড় বড় সাধু মহাত্মাদের জীবন আলোচনা করে' আপনাকে তাঁদের পথে চালাবার জন্য ব্যস্ত হইনা। ছোট তুচ্ছ বিষয় নিয়ে থাকি, আর আপনাকে ছোট করি "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এ কথা তো ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে; মহাজনদের পথে যে আমাদের সর্ব্ব প্রযত্নে চলতে হবে সে কথা মনে রাখি কৈ? কি করে' মানুষ মহাজন পদবী লাভ করে? সে কি ভিড়ের ঠেলায় পথ হারিয়ে, না ভিড় ঠেলে আপনার পথ করে' চলে? জ্ঞানে বড় হ'য়ে, প্রেমে বড় হ'য়ে, মানুষের সেবাতে আত্মনিয়োগ করে,' পৃথিবীকে নূতন কিছু দান করে', পৃথিবীর জ্ঞানী ও সাধুরা মহাজন আখ্যা লাভ করেছেন। নিজের একখানা এই জড় দেহকে আরাম দিয়ে, কেবল নিজের আরামেই মগ্ন থেকে কেউ মহাজনের মহত্ব ও জনত্ব—প্রকৃত মনুষ্যত্ব—পায় নাই।

আমাদের আসল মানুষ হ'তে হবে। ভিড়ের মধ্যেই সাধনার একাকিত্ব, কর্ত্তব্যানুভূতির একাকিত্ব, তাই সাধন করে 'করে' চলতে হবে। আমি যে আমি, আর দশজন থেকে পৃথক, আমার পরিবারে, আমার সমাজে, আমার স্বদেশে আর এই বিপুল পৃথিবীতে আমার মিথ্যাই জন্ম হয় নাই। সকলের সঙ্গেই আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আমি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়েও সকলের সঙ্গে সংসৃষ্ট, সকলের সুখ দুঃখের ভাগী; আমার জীবনে সকলের কাজের ফলাফল আছে, সকলের জীবনে আমার চিন্তা কথা ও কাজের ফলাফল গিয়া পৌঁছে, এ কথা মনে রাখব। আমি ছোট নই, কারণ বিশ্বস্রষ্টা এত বড় সুন্দর পৃথিবীতে আমাকে পিতা মাতার স্নেহের মধ্যে পাঠিয়ে ছিলেন, স্নেহ দিবার প্রবৃত্তি দিয়ে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির বীজ আত্মায় বপন ক'রে, সম্মুখে কর্ত্তব্যের বিশাল ক্ষেত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি ছোট নই, আমার চারিদিকের স্থান টুকু সুন্দর করবার

সুখকর করবার, আমার চিন্তা ও কর্ম্মশক্তিকে বাড়িয়ে তোল্‌বার মত শক্তি অল্পাধিক আমারও আছে। মৌমাছির চাকটীতে একটী মৌমাছি কাজ করে না, অনেকে মিলে করে বলেই তাদের প্রত্যেকের দেহের তুলনায় শতগুণ বড় চাক গড়ে ওঠে। প্রত্যেকের শ্রম তার মধ্যে আছে। এই বৃহৎ মানবসমাজ-রূপ মধুচক্রে আমরা এক একটি মৌমাছির মত খাটতে এসেছি, কেবল নিজে মধু খেয়ে উড়তে আসিনাই, কিছু না দিয়ে, ভবিষ্যতে যারা আসচে তাদের জন্য সঞ্চিত না রেখে, পরের আহৃত মধু খেয়ে বাঁচতে আসিনাই।

আজ তরুণীদের কাছে অনুরোধ, জীবনের দিকে প্রত্যেকে প্রত্যহ একটু দৃষ্টি দিতে আরম্ভ কর। "একলা এসেছি একলা যেতে হবে" এটা একদিকে ঠিক আর একদিকে এটা একটা মস্ত ভুল। আমাদের থাকতে হবে সকলের সঙ্গে, চল্‌তে হবে সকলের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে, বাঁচতে হবে সকলকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার উপায় করে', ভাব্‌তে হবে সকলের কথা, একলার কথা নয়, একলার মুক্তি নয়। সে ভাবনা সহজ হয়, সম্ভব হয় কি ক'রে? সকলের কর্ত্তা যিনি, পিতা যিনি, রক্ষক পালক যিনি তাঁকে সম্মুখে রেখে, তাঁকে জীবনের প্রভু বলে' জেনে, মেনে, তাঁর সকল অভিপ্রায় পালন কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থেকে। তিনি "মহতো মহীয়ান্"। তিনি ভূমা। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" তিনিই ভূমা, তাঁকে যদি মন সমর্পণ করি, সব ছোট খাটো কাজ, ভোগ, ত্যাগ, দেনা পাওনা যদি তাঁর নামে করি, জীবনে ভূমাত্ব আসে, ভূমানন্দের আমরা আস্বাদ পাই।

তিনি প্রাণে থেকে প্রাণ আলোকিত করুন, সকল ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা দুষ্কর্ম্ম ও অকর্ম্মণ্যতা হ'তে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের গৃহ পরিবার সুন্দর ও পবিত্র করুন, তিনি আমাদের হাত ধরে জীবনের দুর্গম পথ উত্তীর্ণ করুন।

সিটিকলেজগৃহে পুরুষদিগের জন্য পৃথক উপাসনা হয়। তাহাতে ভাই সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করেন। (হিন্দিতে উপাসনাদি হইয়াছিল।)

সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন। তাহাতে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত, সভাপতির অভিভাষণ পঠিত, কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ নিযুক্ত এবং একেশ্বরবাদী বন্ধু প্রভৃতিকে ধন্যবাদাদি প্রদত্ত হয়।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন।

শতবার্ষিকী উৎসবের আর অধিক বিলম্ব নাই। এখন হইতেই বিশেষ নিষ্ঠার ও দৃঢ়তার সহিত সকলের প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক কেন্দ্রে এতদর্থে উপযুক্ত আয়োজন হওয়া উচিত। এই উৎসবের অর্থ ও উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ইহা কেবল কয়েক দিনের সাময়িক উত্তেজনায় পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত নহে। শত-বার্ষিকীর অর্থ একশত বর্ষের কার্য্যাবসানে কাতর হৃদয়ে ভগবানের চরণে পড়া, বিগত একশত বৎসরে ভগবান যে সমুদয় করুণা করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া মঙ্গলময় বিধাতার নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা এবং নব শতাব্দীতে নব উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করা। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজকে এবং প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাকে এই জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। একজন মফঃস্বলের ব্রাহ্ম তাঁহার এক বন্ধুকে এ বিষয়ে এক-খানি পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছি, তখন হইতেই মনে মনে শতবার্ষিক মহোৎসবের কল্পনা করিয়া আসিতেছি। তখন সন্দেহ হইত এত কাল বাঁচিয়া থাকিব কি না; কিন্তু দেখিলাম বাঁচিয়া রহিলাম! এবং হয়ত বা অবশিষ্ট কয়েক মাসও বাঁচিয়া থাকিব।

"এ উৎসব যাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার পক্ষে প্রকৃত আন্তরিক উৎসব হয়, ইহাই আকাঙ্ক্ষা করি। আন্তরিক উৎসব শুধু অন্যের বক্তৃতাশ্রবণদ্বারা বা অন্যের উপাসনায় যোগদান দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। এ সকলের দ্বারা অবশ্য সাহায্য হইবে; কিন্তু প্রত্যেকের নিজের কিছু করা চাই। আপনারা যে সকল আয়োজন করিতেছেন, খাটিতেছেন, তদ্দ্বারা আপনাদের আন্তরিক উৎসব হইতেছে। কিন্তু এ সকল আয়োজনের ফলভোগী আমরা, স্বয়ং কিছু না দিলে, কোনো না কোনো আকারে কিছু ত্যাগ স্বীকার না করিলে, প্রকৃত ভাবে ফলভোগী হইতে পারিব না; অন্যান্য বার্ষিক উৎসবের ন্যায় ইহা হইতে সামান্য ফলই পাইব, তদধিক কিছু পাইব না। আমার মনে হয়, যে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ অনুভব করেন, তাঁহারই এখন হইতে ভাবিয়া দেখা উচিত, কি ত্যাগ ক'রে তিনি স্বয়ং ব্যক্তিগত-ভাবে এই মহোৎসব উপলক্ষে আপন ঋণ অন্ততঃ কণামাত্রও পরিশোধ করিতে পারেন। আপনাদের আয়োজনে শক্তি সময় ও অর্থদ্বারা সাহায্য করা ত আছেই; তাহা সম্ভব না হইলে, অন্য নানা উপায়েও ইহা হইতে পারে। প্রত্যেকে আপন আপন প্রণালী ভাবিয়া লইতে পারেন।

"কিন্তু মনে হয়, এ সব বিষয়ে এখনও সকলের চিন্তা জাগে নাই। এমন কি আপনাদের কেন্দ্র-সমিতি যাহা করিতেছেন ও করিবেন, তাহাকে যথাসাধ্য সহায়তা করার অতিরিক্ত, প্রত্যেক সহরের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাজগুলির যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আপন আপন ক্ষেত্রে কিছু করিবার আছে তাহাই যেন এখনও অনেক সমাজ চিন্তা করিতেছেন না। আমার একজন বন্ধু সেদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "Centenary কি জায়গায় জায়গায় হবে নাকি? যাহা করিবার কলিকাতার কমিটিই ত করিতেছেন।" এত গেল ব্যক্তিবিশেষের ভাব। সমবেত জীবনেও দেখিতেছি, মফঃস্বলের সমাজগুলি আপন আপন কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। অন্ততঃ এখানকার এই বৃহৎ সমাজে এ চিন্তা একটুও জাগে নাই। কেন্দ্রসমিতি সমগ্র ভারতের জন্য যেমন কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতেছেন, অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, জেলাসমিতি কি নিজ নিজ জেলার

জন্য সেরূপ করিবেন না? ঢাকা সমাজের কর্ত্তব্য, ঢাকা জেলার মহকুমাগুলিতে ও প্রধান প্রধান গ্রামগুলিতে দলবদ্ধ হইয়া গিয়া উৎসবাদি করা। পাঁচ জন ব্রাহ্ম গিয়া মাসে একটি গ্রামে উৎসব করিয়া আসিলে, ১৭ মাসে (১৯২৮ আগষ্ট হইতে ১৯৩০ জানুয়ারী পর্য্যন্ত) সতেরটি উৎসব হইতে পারে। অন্যান্য কার্য্যও কত থাকিতে পারে।

"এই সকল বিষয়ে প্রত্যেক মফঃস্বল সমাজের চিন্তা জাগাইবার জন্য আপনারা কেন্দ্র-সমিতি হইতে চেষ্টা না করিলে কিছুই হইবার আশা নাই। আমরা শুধু আপনাদের একটি partyর আগমন প্রতীক্ষা করিয়াই বসিয়া থাকিব। আপনারা আসিয়া কয়েকদিন দুই চারিটি বক্তৃতা করিবেন ও উপাসনা করিবেন; আমরা তাহা শুনিব; এই পর্য্যন্তই হইবে। আর, কয়টি সহরেই বা আপনারা যাইতে পারিবেন, এবং কয়টি সহরই বা আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে সক্ষম হইবে?"

এই ব্রাহ্ম বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকলেরই বিবেচনা-সাপেক্ষ। এ বিষয়ে আমরা সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই উৎসব আমাদিগের পক্ষে মহা সুযোগ। সত্যই আমাদের পরমসৌভাগ্য যে আমরা এই উৎসবে যোগ দিবার সুযোগ পাইব। একশত বৎসরে একবার মাত্র এমন দিন আসে। আমরা কি ইহার গুরুত্ব ও সাত্ত্বিকতা প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব? এখন হইতে সকলে প্রার্থনা করি, যেন এই শত বার্ষিক উৎসবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং ব্রাহ্মসমাজে নবযুগ আসে।

ব্রাহ্মসমাজ।

দীক্ষা—সাধনাশ্রমের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী মানভূম জিলার তামলীন গ্রাম নিবাসী শ্রীমান করালীকুমার কুণ্ড পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। আমরা নব দীক্ষিতকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। করুণাময় পিতা তাঁহাকে দিন দিন পবিত্র ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—অধ্যক্ষ সভার বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন:—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, ডাক্তার কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। হেমচন্দ্র সরকার প্রচারকদিগের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩১শে জানুয়ারী মিঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৩০শে জানুয়ারী ম্যাঙ্গালোর নগরীতে রাও সাহেব কে রঙ্গ রাও ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।

বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে বাবু প্রেমরঞ্জন মজুমদার প্রায় ৬ মাস কাল ক্ষয় রোগে ভুগিয়া বৃদ্ধা মাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী গিরিডি নগরীতে পরলোকগতা রেণুকা দের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য ও মাতা প্রার্থনা করেন। পিতা শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে প্রচার বিভাগে ৫০৲, দাতব্য বিভাগে ১০৲, দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ১০৲, সাধনাশ্রমে ১০৲, সুবর্ণ সাম্বৎসরিক ফণ্ডে ১০৲, ছাত্র সমাজে ১০৲, গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, ও মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, দান করিয়াছেন।

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাস মাতার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১৫ই জানুয়ারী ডিব্রুগড় নগরীতে শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া জ্যোৎস্না ও রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাস গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান করুণাকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে রায় সাহেব কমললোচন দাসের চতুর্থকন্যা কল্যাণীয়া প্রকৃতিবালা ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাসগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জয়ন্তকুমারের এবং কমললোচন বাবুর পঞ্চমকন্যা কল্যাণীয়া রেণুকাবালা ও প্রিয়নাথ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অজিতকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কমললোচন বাবু সাধারণ বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—পরলোকগত রজনীকান্ত দের প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র রজনীকান্ত-স্মৃতিভাণ্ডারে একশত টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ, দাতব্য বিভাগে ৫৲, দিনাজপুর ব্রহ্মমন্দিরনির্ম্মাণ ফণ্ডে ২৫৲ ও তথাকার মাঘোৎসবের দাতব্য ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা এবং কন্যা শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায় সুবর্ণসাম্বৎসরিক ফণ্ডে ৪৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের পত্নীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে

সুবর্ণ সাম্বৎসরিক ভাণ্ডারে তিনি ও পুত্রগণ ১০০৲ টাকা ও কন্যা উষাবালা রায় ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পরলোকগত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲ টাকা এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

পরলোকগত মণিলাল মল্লিকের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে পত্নী দাতব্য বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

রায় সাহেব রাজমোহন দাস পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মল্লিক পিতামহের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীমতী সুশীলা ঘোষাল কন্যা বিভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্য উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এ সকল দান সার্থক হউক এবং সকলে কল্যাণ লাভ করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ঢাকায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের উপাসনা, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিতে যোগদান করিয়া বিস্তর নরনারী উপকৃত হইয়াছেন। উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

১লা মাঘ হইতে ৫ই মাঘ পর্য্যন্ত সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু, প্রচারক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় উষাকীর্ত্তন ও উপাসনা করেন। তৎপরে ৫ই মাঘ রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে উপাসনা হয়, অবিনাশ বাবু উপাসনা করেন। ৬ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন কর্ত্তৃক উপাসনা সম্পন্ন হয়। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় অবিনাশ বাবু সভাপতি হন এবং শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা নাগ প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমৃত বাবু বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী; রাত্রে "ব্রাহ্মসমাজের অতীত ও ভবিষ্যৎ" বিষয়ে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। ৮ই মাঘ প্রাতে ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন; রাত্রে অমৃত বাবু কর্ত্তৃক উপাসনা সম্পন্ন হয়। ৯ মাঘ মন্দিরে বেলা ১০টার সময় মহিলাদিগের উৎসব হয়। বিস্তর মহিলা আগমন করেন। অমৃত বাবু উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রীতি-ভোজনের পরে অপরাহ্ণে মহিলাদিগের আলোচনা হয়। পুরুষদিগের জন্য প্রাতে ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন গৃহে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার উপাসনা করিয়াছিলেন। রাত্রে "ধর্ম্মের নব সাধনা ও পুরাতন বাধা" বিষয়ে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। ১০ই মাঘ প্রাতে স্বর্গীয় আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ৪টার সময় নগর সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রে উপাসনা; অমৃত বাবুর দ্বারা উপাসনা সম্পন্ন হয়। ১১ই মাঘ সমস্ত দিন-ব্যাপী উৎসব। সকালে ও সন্ধ্যায় সহরের বিস্তর পুরুষ ও নারী মন্দিরে আগমন করেন। সকালে অবিনাশ বাবু, মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ ও সায়ংকালে অমৃতবাবু উপাসনা এবং অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১২ই মাঘ সকালে অক্ষয় বাবু উপাসনা ও রাত্রে মিঃ রমণীকান্ত দাস "বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৩ই মাঘ সকালে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসনা সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ২টার সময় দরিদ্র-দিগকে চাউল, পয়সা ও কম্বল বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যাকালে সঙ্গত-সভার উৎসব উপলক্ষে অবিনাশ বাবু উপাসনা করেন। ১৪ই মাঘ প্রাতে অবিনাশ বাবু উপাসনা করেন। দুইটার সময় বালকবালিকা সম্মিলনী হয়; বালকবালিকাদের সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে মন্দির আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার রায় প্রভৃতি তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে তাহাদের প্রীতিভোজন হয়। উহার সমস্ত ব্যয় রায় সাহেব প্যারীমোহন দাস প্রদান করেন। রাত্রে "রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি" বিষয়ে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫ই মাঘ সকালে পরলোকগত আনন্দমোহন দাসের বাগানে উদ্যানসম্মিলন হয়। প্রথমে উপাসনা; মনোরঞ্জন বাবু উপাসনা করেন। তৎপরে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র শ্রীমান অনন্তকুমার শিকদার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষাকার্য্য অমৃত বাবুর দ্বারা সম্পন্ন হয়। বাগানের প্রীতিভোজনের ব্যয় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দাস প্রদান করেন। রাত্রে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে ঢাকা ইউনিভারসিটি আফিসের ক্লার্ক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অবিনাশ বাবু দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। উৎসবের মধ্যে ১১ই মাঘ মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন হইয়াছিল। তৎপরে অন্য এক দিন ছাত্রসমাজের সভ্যগণ একটি সান্ধ্যসমিতি করিয়া আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীমতী ইন্দু চৌধুরী, শ্রীমতী নীরদা বসু প্রভৃতি সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজ—মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় গৌহাটী ব্রহ্মমন্দিরে অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব ১০ই, ১১ই ও ১২ই মাঘ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

গৌহাটী ব্রহ্মমন্দির মেরামতের জন্য এযাবৎ নিম্নলিখিত দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে এবং নিম্নোক্ত টাকা হস্তগত হইয়াছে:—**প্রাপ্ত**—শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর সদয়চরণ দাস শিলং ৫৲, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, ঢাকা ১০৲, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস গৌহাটী ৫৲, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ ১০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া ঐ ৪৲ মোট ৩৪৲। **প্রতিশ্রুত**—শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার লাহিড়ী গৌহাটী ৫৲, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাস ঐ ৫৲, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র তালুকদার ঐ ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ ১৫৲, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাস ঐ ৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানভিরাম বরুয়া ঐ ২৬৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ

সেন ঐ ২০৲, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস ঐ ১০৲, শ্রীযুক্তা এম্ হালদার, গোলাঘাট ৫৲ মোট ৯৩৲ টাকা।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—গত ৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে উপাসনা হয়; মিঃ ডি এন মুখার্জি উপাসনার কার্য্য করেন। ১০ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বাবু রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; অপরাহ্নে নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা—ডাঃ বি রায় সভাপতির আসন গ্রহণ এবং বাবু উমেশচন্দ্র নাগ, বাবু নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গগনচন্দ্র হোম বক্তৃতা করেন। ১১ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস; অপরাহ্নে মিঃ ডি এন মুখার্জি ও বাবু উমেশচন্দ্র নাগ পাঠ ও প্রার্থনা করেন; বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগির রাত্রিতে উপাসনা করেন। ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য ডাঃ বি রায়। ১৩ই মাঘ অপরাহ্নে মহিলাদের জন্য উপাসনা হয়; বাবু ভবসিন্ধু দত্ত উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ—১০ই মাঘ প্রিয়নাথ দাসের বাসাতে মহিলাদিগের একটী বিশেষ সম্মিলন হয়। ব্রাহ্ম হিন্দু ও খৃষ্টান সমাজের শতাধিক মহিলা উক্ত সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবের প্রাথমিক উপাসনা শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র দাসের পত্নী করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে মহিলাদিগকে প্রীতি-জলযোগে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ উপাসনা করেন। অপরাহ্নে কীর্ত্তন ও উপাসনা, শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে গোলোক বাবুর বাসায় উপাসনা হয়; কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে স্থানীয় টাউন হলে তিনি "ভারতীয় ধর্ম্মের রূপ ও সাধনা" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৩ই মাঘ অপরাহ্নে গোলোক বাবুর বাসায় বালক বালিকা সম্মিলন হয়। গান, উপদেশ ও কমিক আবৃত্তি হইয়া বালক বালিকাদিগের জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজ—কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের উনষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব ও অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে:—

৮ই মাঘ সায়ংকালে উদ্বোধন; আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায়। ৯ই মাঘ, প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়; অপরাহ্নে ছাত্রসমাজের উৎসব, বক্তা শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস, বিষয় "পৌরাণিক তত্ত্ব"। ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়; সায়ংকালে বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস, বিষয় "পৌরাণিক তত্ত্ব"। ১১ই মাঘ মাঘোৎসব—প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, অপরাহ্নে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও প্রার্থনা, সায়ংকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। ১২ই মাঘ—কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন গুপ্ত। অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। ১৩ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়; অপরাহ্নে মহিলা উৎসব। কয়েকজন মহিলা প্রবন্ধ পাঠ করেন, মিসেস প্রতিভা দত্ত প্রভৃতি আলোচনা করেন, শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস উপদেশ প্রদান করেন। ১৪ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন গুপ্ত। অপরাহ্নে বালক বালিকা সম্মিলন, বালক বালিকারা সুন্দর আবৃত্তি করিবার পর তাহাদের জলযোগ করান হইয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুবর্ণ সাম্বৎসরিক

১৩৩৫ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৯২৮, মে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হইবে। এই সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে স্কুল কলেজসমূহ গ্রীষ্মাবকাশের নিমিত্ত বন্ধ থাকে। সেই সময় কলিকাতা হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপক প্রভৃতি স্থানান্তরে গমন করেন। সে নিমিত্ত উক্ত সময় উৎসবের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ইষ্টারের ছুটীর সময় এপ্রিল মাসের ৫ই হইতে ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত উৎসব সম্পন্ন হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। উৎসবের কয়েক দিন প্রত্যহ মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা, কয়েক দিন উষাকীর্ত্তন, এক দিন কলিকাতা মহানগরীতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন, দুইটী বিশেষ বক্তৃতা, দুই দিন ব্রাহ্মসম্মিলনী, এক দিন মহিলাদিগের ও একদিন যুবকদিগের বিশেষ উৎসব, একদিন বালক বালিকাসম্মিলন ও এক দিন উদ্যান-সম্মিলন হইবে। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় প্রচারক ও পরিচারকগণ মিলিত হইবেন এবং মফঃস্বলবাসী সমুদয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণকে উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করা হইবে। তাঁহাদিগের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হইবে। উৎসব উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকার একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরলোকগত নেতৃবৃন্দের ছবি, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি পুস্তক (Album) মুদ্রিত করা হইবে। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রসারের নিমিত্ত একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনেরও চেষ্টা করা হইবে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আনুমানিক ৩০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই অর্থসংগ্রহ ও উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি-দিগকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটী সম্প্রতি তাঁহাদিগের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা উক্ত কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্য ও সহানুভূতিকারি-গণের বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, সকলে সমবেত চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এই মহোৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। এই নিমিত্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক যিনি যে অর্থ দান করিবেন তাহা ২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, অথবা ২৮বি, নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন অথবা ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কমিটীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করিবেন।

আর ভেঙ্কট রত্নম্ নায়ডু—মান্দ্রাজ, জি বি ত্রিবেদী—বোম্বাই, এ গোপালন্—কালিকাট, শ্রীবিশ্বনাথ কর—কটক, শ্রীব্রজবিহারীলাল—পাটনা, পি কে রায়—কলিকাতা, শ্রীনেপালচন্দ্র রায়—ঢাকা, শ্রীসতীশরঞ্জন দাস—দিল্লী, রঘুনাথ সহায়—লাহোর, জে আর দাস—রেঙ্গুন, শ্রীশ্রীনাথ চন্দ—ময়মনসিংহ, শ্রীঅতুলানন্দ দাস—ডিব্রুগড়, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী—বরিশাল, শ্রীঅবলা বসু, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীশশিভূষণ দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কলিকাতা, শ্রীব্রজসুন্দর রায় (সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ) শ্রীঅন্নদাচরণ সেন ও শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কমিটীর সম্পাদক)

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২১শে ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু।

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। | ১৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

২২ম সংখ্যা। | 29th February, 1928. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে প্রেমস্বরূপ, তুমি আমাদিগকে তোমার প্রেমের পথে চলিবার জন্য নিয়তই আদেশ করিতেছ। উৎসবের মধ্যে বিশেষভাবে তোমার সে আহ্বান আমাদের নিকট আসিয়াছে। তাহাই যে জীবন ও কল্যাণের পথ তাহা তুমি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছ, প্রাণে সে পথে চলিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছ। কিন্তু আমরা যে কত দুর্ব্বল তাহা ত তুমি জান। সে পথে নানা বাধা বিঘ্ন দুঃখ বেদনা দেখিয়া আমরা অনেক সময় ভীত হই, আরামের পথ খুঁজিয়া বেড়াই; অসার আরাম ও সুখের অন্বেষণে মৃত্যুর পথেই ধাবিত হই। চারিদিকের মোহান্ধকারে প্রকৃত পথ দেখিতে পাই না। হে প্রেম-রবি, তুমি কৃপা করিয়া প্রাণে একটু প্রকাশিত না হইলে সে মোহান্ধকার আর কিছুতেই বিদূরিত হয় না। তুমি এবার দয়া করিয়া আমাদিগকে যে পথ দেখাইলে, সে পথে চলিবার শক্তিও আমরা তোমারই নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে বল বিধান করিবে, আমাদিগকে সকল বহিবার ও সহিবার শক্তি প্রদান করিবে? হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে হাত ধরিয়া তোমার প্রেমের পথে লইয়া চল, আমরা তোমারই উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া তোমার পথে চলি। তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু ও চালক হও। তোমার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক।

অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—

প্রাতঃকালে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পাইলে পরে প্রকাশ করিব।

অপরাহ্ণ ১½ ঘটিকার সময় নবদ্বীপচন্দ্র-স্মৃতিসভা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার এবং সভাপতি প্রচারক মহাশয়ের জীবন ও কার্য্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

অপরাহ্ণ ৪½ ঘটিকার সময় বিডন স্কোয়ার হইতে নগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হয়। সকলে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বিডনষ্ট্রীট, রাজাগুরুদাসষ্ট্রীট, মাণিকতলাষ্ট্রীট, বারাণসীঘোষষ্ট্রীট, ও কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে, কিছু সময় সেখানে সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে; তৎপরে উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

আজকার নিশার অবসানে ১১ই মাঘের নূতন আলোকে ধরা উদ্ভাসিত হইবে। ব্রহ্মধামের যাত্রিগণ, তোমরা কি উৎসবের আহ্বান শুনিয়াছ? তোমরা কি উৎসবদেবতার আগমনধ্বনি শ্রবণ ক'রেছ? এত দিন ধরিয়া উৎসবের দেবতা তোমাদের কাছে আসিয়া আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছেন;

তোমরা কি তাঁর পায়ের ধ্বনি শোন নাই? তোমরা কি তাঁর স্পর্শ প্রাণে অনুভব কর নাই?

তোরা শুনিস্ নি কি, শুনিস্ নি কি তাঁর পায়ের ধ্বনি?
সে যে আসে আসে আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী,
সে যে আসে আসে আসে।
গেয়েছি গান যখন যত, আপন মনে ক্ষেপার মত,
সকল সুরে বেজেছে তাঁর আগমনী।
কত কালের ফাগুন দিনে, বনের পথে,
সে যে আসে আসে আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে, মেঘের রথে,
সে যে আসে আসে আসে।

জীবনের কত ঘটনায়, কত সুখ দুঃখে, প্রকৃতির কত বিচিত্রিতার ভিতর দিয়া তিনি সর্ব্বদাই এসে ডাকছেন। সে ডাক কি শোন না? আর, উৎসবদেবতা এই উৎসবের ভিতরে তোমাকে আমাকে ডাকছেন—ভক্ত যাঁরা, প্রেমিক যাঁরা, ব্যাকুল-চিত্ত যাঁরা তাঁদের ডাকছেন; আবার দুঃখী যারা, শোকার্ত্ত যারা, দীন হীন যারা, পাপে প'ড়ে আছে যারা, তাদেরও ডাক্‌ছেন। প্রতি বৎসরই ত শুনি—

জাগো পুরবাসী, ভগবত-প্রেম-পিয়াসী,
আজি এ শুভ দিনে কি বা বহিছে করুণারস-মধুধারা,
শীতল বিমল ভগবত-করুণারস-মধুধারা।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে, নিরাশায় পথ চেয়ে,
বরষ কাহার কাটিয়াছে?
এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ,
জগতের জননীর কাছে।
ওগো কার অতি দীন হীন বিরস বদন,
ওগো ধূলায় ধূসর মলিন বসন?
দুঃখী কে বা আছ, শুনগো বারতা,
ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা।

যাঁরা ভক্ত, যাঁরা ভগবতপ্রেমপিয়াসী, উৎসবে তাঁরা প্রভুর ডাক শু'নে আস্‌বেন। আজ এ উৎসবে কেবল তাঁদেরই আহ্বান নয়, তোমার আমারও আহ্বান; দুঃখী তাপী যারা, বিরস বদন যাদের, মলিন বসন যাদের, সংসারে পতিত যারা, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত যারা, যারা অস্পৃশ্য হ'য়ে রয়েছে, তাদেরও আহ্বান—বিশ্বজননী তাদেরও ডাক্‌ছেন। সুতরাং আমরা নিরাশ হ'ব না, দুঃখী ব'লে, পাপী ব'লে, শোকার্ত্ত ব'লে, রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত ব'লে নিরাশ হ'ব না। আমরাও ব্রহ্মেরই আহ্বানে, জগতের মাতার আহ্বানে, তাঁহারই মন্দিরে প্রবেশ করিব। এ মন্দিরের দ্বার সকলের জন্য, সকল দেশের লোকের জন্য, সাধু অসাধুর জন্য, শ্বেত কৃষ্ণের জন্য, ব্রাহ্মণ শূদ্রের জন্য, পাপী পুণ্যবানের জন্য উন্মুক্ত।

উৎসবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া কি দেখিব? ব্রহ্মের প্রকাশ, বিশ্বরাজের প্রকাশ। তাঁর সিংহাসনতলে সকল সাধু ভক্ত সমাসীন হ'য়ে আনন্দে এক প্রাণে তাঁরই নাম—তাঁরই গুণ—কীর্ত্তনে নিযুক্ত, তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন। কেবল আর্য্য ঋষিগণ নহেন, কেবল যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী গার্গী নহেন, কেবল বুদ্ধ চৈতন্য নানক নহেন, কেবল রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ কেশব শিবনাথ নহেন; ঐ ঈশা, ঐ মুসা, ঐ মহম্মদ, ঐ মার্টিন লুথার, ঐ জোরোয়াষ্টর, ঐ কন্‌ফিউসিয়াস্ সকলে এসেছেন। তোমার প্রাণ উদার কর্‌তে হবে; সকলকে প্রণাম কর্‌তে হবে। সকল সাধু ভক্তকে আপনার ব'লে গ্রহণ কর্‌তে হবে। বেদ বাইবেল কোরান জেন্দাবেস্তা হ'তে সকল দেশের সাধুগণ উপস্থিত। এখানে দেশ কাল জাতি বর্ণের ভেদ নাই। এখানে যদি বল, খৃষ্ট কেন এলেন, মহম্মদ কেন এলেন, তোমাকেই স'রে যেতে হবে, ব্রহ্মের উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না। সুতরাং প্রাণটা বড় কর্‌তে হবে, উদার কর্‌তে হবে। বিশ্বের সকল ধর্ম্ম, সকল সত্য, গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত হ'য়ে ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে হবে।

সংসারে তোমরা কত লোককে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছ! কত ভেদজ্ঞান তোমাদের—শ্বেতকৃষ্ণভেদ, ব্রাহ্মণচণ্ডালভেদ ধনীনির্ধনভেদ, জ্ঞানীমূর্খভেদ! ব্রহ্মের উৎসবমন্দিরে যে সকলেই এসেছেন! তাঁর আহ্বান শু'নে কত কুষ্ঠরোগী এসেছেন, কত বসন্তে ক্ষত হয়েছে যাদের তাঁরা এসেছেন। তুমি ঘৃণাবোধ কর? তোমার নিজের যে ক্ষত আছে, তা দেখ্‌তে পাও না? অন্যের ক্ষত দেখে তুমি তার পাশে বস্‌তে পার না! তা যদি হয়, তোমাকেও দূরে যেতে হবে। এখানে সকলের সঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া ব্রহ্মের চরণে বস্‌তে হবে। এখানে প্রেম ল'য়ে উপস্থিত হ'তে হবে। এখানে যেমন সাধুগণ এসেছেন, তেমনি দুঃখী তাপী পাপী সকলেই ব্রহ্মের ডাক শু'নে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে একাসনে বস্‌তে হবে। এক প্রাণ হ'য়ে, হাত ধরাধরি ক'রে নাচ্‌তে হবে। এখানে যে ব্রহ্মের লীলা, এ যে প্রেমের লীলা, এখানে যে পাপীর নবজীবন-লাভ, এখানে যে দুঃখীর অশ্রুমোচন হবে; এখানে যে নীচে প'ড়ে ছিল তাঁকে বিশ্বপতি ধ'রে তুল্‌বেন! যাকে ঘৃণা করেছ তাকে তিনি আলিঙ্গন দিবেন। আজ প্রেমের দৃষ্টি নিয়ে উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে হবে! ব্রহ্মকে দেখ নাই, তাই তাঁকে চিন্‌তে পার্‌ছ না। ব্রহ্মপ্রেমের আলোকে দেখ যে পর ছিল সে আপনার হলো, যে দূরে ছিল সে নিকট হলো, যে কুৎসিৎ ছিল সে সুন্দর হলো। এত দিন কি ভাবে দিন কাটায়েছ! ভাই ভাইয়ে ঝগড়া করেছ; ভাইয়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছ!

কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত,
ব্যথিলে পরের প্রাণ,
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে,
বেলা হলো অবসান!
সংসারের ধূলা ধু'য়ে ফেলে এস,
মুখে ল'য়ে এস হাসি;
হৃদয়ের থালে ল'য়ে এস ভাই,
প্রেম-ফুল রাশি রাশি।

আজ প্রেম নিয়ে ঈশ্বরের মন্দিরে, উৎসবমন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে হবে। ভেবে দেখ কত ব্যথা পেলে, কত ব্যথা দিলে।

মোহে অন্ধ হ'য়ে বিবাদে মাতিয়ে
বিঁধেছি ভাইয়ের প্রাণ,

যাতনা দিয়েছি, যাতনা পেয়েছি,
নিজ হৃদে নিজে হেনেছি বাণ।

* * *

মোর সে সব অপরাধ ভু'লে
নেবে না কি পিতা, আজি কোলে তু'লে,
দিবে না কি দীনে, আজি শুভ দিনে,
করিতে তোমার মহিমা গান?

মেরী করেলির এক খানা বই আছে, যার নাম Sorrows of Satan. বই খানি সুন্দর, অনেকেই পড়েছেন। আমরা যে অপরাধ করি, পাপের পথে চলি, তাতে শয়তানের দুঃখ আরও বাড়ে! কিন্তু আমি বলি, আমাদের অপ্রেমে, আমাদের অপরাধে, শয়তানের দুঃখ হয় কি না, জানি না; হ'লেও সে জন্য আমাদের চিন্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের প্রাণে ব্যথা হয়। Sorrows of Satan ত নয়, এ যে Sorrows of our Father! ছেলেরা যদি কলহ করে, পরস্পরকে আঘাত করে, পিতার প্রাণে তাতে কত বেদনা! আমরা যে কারণে এবং অনেক সময়ে বিনা কারণে ভাইকে ক্লেশ দেই, বাক্যবাণে আঘাত ক'রে কত বেদনা দেই, তাতে পিতার প্রাণে কত কষ্ট! তাঁর মুখ কি মলিন থাকবে? ভাইকে হৃদয়ে টেনে নিতে পার না? ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করতে পার না? ভাইকে আলিঙ্গন দিতে পার না? ভাই এর সঙ্গে মিশে কাজ করতে পার না? ভাইকে ভাল করতে পার না? তা হ'লে যে পরম পিতার কত ক্লেশ হবে! তাঁর মুখ যে মলিন হবে! রজনীর অবসানে ব্রহ্মের উৎসবমন্দিরে প্রবেশ করবে—তখনও কি ভাই ভাইকে দূরে রাখিবে? সজারুর ন্যায় কাঁটা খাড়া ক'রে উৎসবমন্দিরে যাবে? দৃষ্টি কোমল করবে না? হৃদয় স্নেহে পূর্ণ করবে না? একটু ভালবাসা দিবে না? ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা হবে না? তা হ'লে যে পিতার কষ্ট হবে! তা হ'লে যে পিতার কাছে যাওয়া যাবে না! দেখ, তোমার ভাই বোন সকল, দুঃখী ভাই বোন সকল, কত বেদনা, কত শোক তাপ পাচ্ছে! তাদের বুকে টেনে আনবে না, সহানুভূতি করবে না? ব্রহ্মের কাজে এসেছ, দেশের কাজে এসেছ, দশের কাজে এসেছ, সেখানেও পরস্পর মিলতে পারবে না? সেখানেও আঘাত করবে? আজ উৎসবমন্দিরে প্রেম নিয়ে আসতে হবে। তাই ত যীশু বলেছেন, ঐ নৈবেদ্য রেখে যাও, আগে যার সঙ্গে অমিল আছে তার সঙ্গে মিলন ক'রে এস. নতুবা তোমার পূজার অর্ঘ্য গৃহীত হবে না। আজ যে প্রেম চাই, আজ যে ভালবাসা চাই; আজ যে ভাই ভাইএ আলিঙ্গন চাই। প্রেমবিহনে সমাজ মরুভূমি হলো, হৃদয় শুষ্ক হলো, আপনার লোক পর হ'য়ে গেল!

ও ভাই, ও বোন,
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি
আপনারে ভুলিবে না?
হৃদয়মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে
হৃদয় কি খুলিবে না?
লইব বাটিয়া সকলে মিলিয়া
প্রেমের অমৃত তাঁরি,
পিতার অসীম ধন রতনের
সকলেই অধিকারী।

তবে ভাই বোন সকল, এই উৎসবমন্দিরে প্রেম ল'য়ে প্রবেশ কর।

সেণ্ট পল বলেছেন—"যদি আমার মানুষ ও দেবতাদের ন্যায় বাক্‌শক্তি থাকে, কিন্তু হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তবে আমার বাক্য কাংস বাদ্যযন্ত্রের মত ফাঁকা আওয়াজ। যদি আমার ভবিষ্যৎ-বাণী করিবার শক্তি থাকে, সকল গূঢ় রহস্য আমি জানতে পারি, খুব জ্ঞান থাকে, আমি বিশ্বাসবলে পর্ব্বত স্থানচ্যুত করতে পারি, তবুও যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, আমি অতি তুচ্ছ। যদি দান দুঃখীদের সমস্ত বিলিয়ে দেই, আমার শরীর যদি দগ্ধ হ'তে দেই, তবুও যদি প্রাণে প্রেম না থাকে, আমার উহাতে কোনও পুণ্য নাই। যার প্রেম আছে সে অনেক সহ্য করে, সে সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করে, সে কাহাকেও হিংসা করে না, সে আপনাকে বাড়িয়ে তু'লে গর্ব্ব প্রকাশ করে না। সে অসঙ্গত ব্যবহার করে না, সে নিজের সুখ স্বার্থ খোঁজে না; সহজে সে ক্রোধ প্রকাশ করে না, তার মনে কোনও কুভাব আসে না। লোকের দোষ দুর্ব্বলতা দে'খে সে উল্লাস বোধ করে না, সত্যপ্রতিষ্ঠাতেই তাঁর আনন্দ। সে সকল বোঝা বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে; সকল বিষয়েই আশাশীল, সকলই সহ্য করে। প্রেম কখনও বিফল হয় না।"

এই প্রেম, মানুষের প্রতি প্রেম, ভাই বোনদের প্রতি প্রেম, নিয়ে উৎসবমন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। প্রভু পরমেশ্বর যাঁদের ডাকেন, তাঁর পুত্র কন্যা যাঁরা, তাঁদের প্রতি অপ্রেম রাখিলে, প্রাণে শান্তি পাবে না, ঈশ্বরের মুখ দেখতে পাবে না, ব্রহ্মের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না। আজ ক্ষমা চাও ও ক্ষমা কর; কেবল ক্ষমা নয়, প্রেম কর, আজ ভাইকে ভাই ব'লে হৃদয়ে গ্রহণ কর—যে তোমাকে দূরে ঠেলে দেয় তাকেও নিকটে আন; যে তোমাকে আঘাত করে, বেদনা দেয়, উপেক্ষা করে তাকেও প্রীতির সহিত আলিঙ্গন কর; যে হস্ত প্রহার করিতে উদ্যত সে হস্ত চুম্বন কর; যে তোমার অনিষ্ট করে তারও কল্যাণ কর। মানবের দুঃখে শাক্যসিংহ রাজ্যত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হ'লেন; যীশু চিরদিন বিষণ্ণ রহিলেন, মানবের উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিলেন। চৈতন্য বলিলেন, "লোকের পায়ে ধরি', ভজাইব হরি"। তোমরা প্রেমের দৃষ্টিতে দেখ—প্রেম—উৎসবমন্দিরে প্রবেশ করতে হ'লে, এই প্রেম নিয়ে আসতে হবে।

তার পর তাঁর চরণে যদি এসে থাক, তবে এখানে বস; কত উৎসব চ'লে গিয়েছে—মন্দিরে এসেছ আবার চ'লে গিয়েছ, আবার সংসারের ধূলা গায়ে মেখেছ। এবার তা করো না। "যদি ডাক শু'নে ভাই এসেছ রে, তবে ফিরে আর যেয়ো না রে। পরব্রহ্ম তোমার আছেন সাথে, আর ভয় নাই।" তাঁর ডাক শুনেই ত এসেছ; তবে ঐ চরণে বস, চিরদিনের তরে বস। মেরী মার্থার গল্প ত জান। যীশু যখন তাদের বাড়ী অতিথি

হ'লেন, মেরী তাঁর চরণে ব'সে রইলেন, তাঁর সঙ্গে কত সুখ দুঃখের কথা বলিলেন, আর মার্থা কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন! যীশু বলিলেন, Mertha, Mertha, thou art troubled about many things; but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part that shall not be taken away from her. মার্থা, মার্থা, তুমি নানা বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত করেছ। কিন্তু একটি জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, মেরী সেইটি নিয়েছে, যাহা কখনও তার হারাতে হবে না। সেইটি প্রেম—ঈশ্বরে প্রেম—তাঁর সহবাসের আনন্দ, তাঁর চরণে বসা। আর এই ঈশ্বরপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ না কর্‌লে মানুষকে চিন্‌তে পার্‌বে না, ভাইকে ভাই ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে না, তাকে ভালবাস্‌তে পার্‌বে না। বাষ্প প্রথমে উপরে উঠে, সেখানে মেঘ হ'য়ে আবার করুণার ধারারূপে পৃথিবীতে পড়ে; প্রেম উপরে দেবাদিদেবের চরণ ধৌত ক'রে করুণা-মন্দাকিনীরূপে মানবসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। মহর্ষি হিমালয়ে যেয়ে ঈশ্বরের সহিত প্রেমযোগে যুক্ত হইলেন, পরে মানবে প্রেম বিলা'বার জন্য, কল্যাণ সাধন কর্‌তে, দেশে ফিরে এলেন। যে পর্য্যন্ত ভ্রমর মধু না পায়, সে পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ছুটাছুটি করে; এক বার মধুতে মুখ দিলে আর কোথাও যায় না। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—ভোমরা রে,

তুই কি মধু পিয়িয়ে হলি ভোর;
(ওরে) তরল পরাণ তোর জমাট বাঁধিল রে।
আলু থালু বেস দেখি, চোখে নাহি জল,
মুখে নাহি সরে রা, পরাণ বিহ্বল রে।
গুণ্ গুণ গুণ ক'রে, মন কেঁদেছিল,
কি মধু পড়িল মুখে, চুপ হ'য়ে গেলি রে।
* * *
আপনার জন যারা ডুবাইতে চায়
মুখ দেখে পর হ'য়ে ঘরে ফিরে যায় রে।
* * *
কি ছিলি কি হলি, তুই কারে প্রাণ দিলি,
(তুই) বাঁচিয়ে মরিলি, (তুই) বাঁচিতে মরিলি।

তাই বলি, যদি প্রেমের চরণে এসে থাক, তবে ঐ চরণে প'ড়ে থাক; ঐ প্রেমরসে ডু'বে থাক; তাঁর চরণে আত্মা মন নিবেদন কর; আত্মসমর্পণ কর; তাঁর নাম গান কর। মহর্ষি বলেছিলেন "কর তাঁর নাম গান যতদিন রবে দেহে প্রাণ।" ভাই বোন সকল, কার কাছে এসেছ? কার মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছ? তিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি; কিন্তু তিনিই আবার তোমার আমার প্রত্যেকের হৃদয়নাথ। তিনি ডেকে এনেছেন, তিনি আদর ক'রে এনেছেন; আজ ভাল ক'রে তাঁর চরণে বস; তাঁর প্রেমের কথা বল। ভেবে দেখ, জীবনের প্রতি ঘটনা ভেবে দেখ; কেমন ক'রে হাত ধ'রে তিনি টেনে এনেছেন, কত সুখ দুঃখ, কত আশা নিরাশা, কত সংগ্রামের ভিতর দিয়া তিনি টেনে এনেছেন! তাঁর হাত তোমারই হাতে বাঁধা রয়েছে। মহর্ষি বলেছেন, "তিনি হাতে ধ'রে আনিলেন, আমি তা বুঝ্‌তে পেরে এখন তাঁর হাত ধ'রে চলিলাম।" তাঁর প্রেম অনুভব কর, প্রেমের কাহিনী সকলকে বল। তাঁর নাম গানে আনন্দ লাভ কর—কেবল নির্জ্জনে নয়, কেবল একান্তে নয়, কেবল হৃদয়ের গূঢ় প্রদেশে নয়, দশ জনের সঙ্গে, ভক্ত দলের সঙ্গে, ভাই বোনদের সঙ্গে মিলে তাঁর নাম কর। তাঁর চরণে তোমরা মিলিত হও না, তাঁর অর্চ্চনায় তোমরা সকলে এস না, তাইত ভাইকে চিন্‌তে পার না, বোন্‌কে চিন্‌তে পার না। ভাই বোন্‌কে চিন্‌বে কি ক'রে, যদি তাঁর চরণে ব'সে তাঁরই প্রেমের আলোকে পরস্পরকে না দেখ? তোমরা বল তাঁর কাজ হচ্ছে না, সমাজের কাজ হচ্ছে না, দেশের কাজে ব্রাহ্মগণ অগ্রসর হচ্ছে না, ব্রাহ্মদের প্রাণে ত্যাগ জাগ্‌ছে না, সেবার ভাব জাগ্‌ছে না। এ সব হবে কি ক'রে তাঁর চরণে না বস্‌লে? তাঁর প্রেমে আপনাকে না দিলে, দশ জন মিলে তাঁর প্রেমপ্রসঙ্গ না কর্‌লে, কেমন ক'রে সেবার ভাব জাগ্‌বে, ত্যাগ আস্‌বে, বৈরাগ্য আস্‌বে, আত্ম-নিবেদন আস্‌বে, কর্ম্মচেষ্টা আস্‌বে? তাই বলি, ব্রহ্মের ডাক্ শু'নে এসেছ, আজ ব'সে থাক—মগ্ন হ'য়ে ব'সে থাক। দশজন মিলে তাঁর চরণে ব'সে থাক। "রইলাম তোমার নামে প'ড়ে", এই ব'লে প'ড়ে থাক। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর। সুখ দুঃখ চিন্তা করো না। তিনি যা দিবেন—সুখ দিন আর দুঃখ দিন্—তাহাই তাঁহার প্রেমের দান ব'লে গ্রহণ কর। আনন্দচিত্তে তাঁর প্রেমের দেওয়া দুঃখ শোক অপমান বেদনা নির্য্যাতন গ্রহণ কর। অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে তাঁর বাণী পালন কর—তাঁর প্রীতিপ্রেরণায়, তাঁর প্রিয় কার্য্য ভেবে, পরসেবাতে নিযুক্ত হও। তাঁর নামে, তাঁর প্রেমে, আপনাকে বিলোপ ক'রে, সেবাব্রতে ব্রতী হও। তাঁর সেবার কার্য্য, তাঁর প্রিয় কার্য্য, সাধন কর্‌তে যেয়েও তোমরা আপনাকে ভুল্‌তে পার না? আপনার যশ, আপনার নাম কিসে হবে, তা ভুল্‌তে পার না? তুমি কার কাছে বসেছ, কার কাজে এসেছ, ভেবে দেখ দেখি! আজ ব্রহ্মের মন্দিরে এসেও কি ক্ষুদ্রতা নিয়ে থাক্‌বে, আপনাকে বড় কর্‌তে যাবে? আপনার দলকে, সম্প্রদায়কে, বড় কর্‌তে চাইবে? তোমরা পরস্পর কলহ কর্‌বে? যেখানে নিজের স্বার্থ নাই—দেশের কাজ, ঈশ্বরের কাজ—সেখানেও এক হ'তে পার না? আপনাকে ভুল্‌তে পার না? নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর উর্দ্ধে উঠ্‌তে পার না? এখানে ব'সেও, ঈশ্বরের মন্দিরে ব'সেও, ঈশ্বরের চরণ-তলে ব'সেও ভাব্‌বে, 'আমার কাজ লোকে বুঝল না, আমাকে লোকে আদর কর্‌ল্ না, আমার দলের আদর হলো না?' এ সব ক্ষুদ্রতা দূর কর। তাঁতে আত্মসমর্পণ করেছ? তাঁর প্রেমে প্রেমিক হ'য়ে কাজে অগ্রসর হয়েছ? কে কি কাজ কর্‌বে, কে আচার্য্য হবে, কে ঝাড়ুদারের কাজ কর্‌বে, কে মন্ত্রী হবে, কে চৌকিদার হবে, কে কতটা আদর পাবে, কাকে কতটা তাঁরই জন্য দুঃখ দৈন্য নির্য্যাতন সইতে হবে, তুমি কি তার বিচারক? তাঁর হাতে এ টুকু ছেড়ে দিতে পার না? ধর্ম্ম-মন্দিরে, ব্রহ্মমন্দিরে এসেছ; এখানে অধিকার সাব্যস্ত কর্‌বার স্থান নয়, এখানে কেবল দিতেই হয়, এখানে সেবা কর্‌বার অধিকার। এখানে প্রাণ মন সময় শক্তি অর্থ সমর্পণ কর্‌বার অধিকার। এখানে কে কতটা অধিকার লাভ করিল, ক্ষমতা লাভ করিল, প্রশংসা লাভ করিল, আদর পাইল, সে দিক দিয়ে

আস্‌তে হবে না; সে দিকে যার মন আছে তাকে অন্য ক্ষেত্রে যেতে হবে। এখানে কে কতটা দিল, কে কতটা প্রেম বিলাইল, কে কতটা ত্যাগ করিল, কে কতটা সেবা করিল, কে কতটা আপনাকে বিলোপ কর্‌তে পার্‌ল, কে কতটা অপরের জন্য, অপরকে বড় কর্‌বার জন্য, আপনাকে দীন কর্‌তে, ছোট কর্‌তে পার্‌ল, তাহাই দেখিতে হবে।

তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তাই আজ বলি, রজনীর অবসানে উৎসবের মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হইবে; স্বয়ং ব্রহ্ম এসে, প্রেমময় পিতা এসে দ্বার খুল্‌বেন—সকলকে তিনি ডেকেছেন; সাধু ভক্ত যাঁরা, সকল দেশের জ্ঞানী ভক্ত কর্ম্মী যাঁরা, তাঁরা আস্‌বেন, দুঃখী তাপী পাপী যারা তারাও আস্‌বেন। সকলকে গ্রহণ কর, কেহ দূরে থেক না, কেহ কাহাকেও অপ্রেমের চক্ষে দেখ না। সকলকে হৃদয়ে বরণ ক'রে লও, প্রেমে সকলকে আলিঙ্গন কর; অপ্রেম বিদ্বেষ দূরে রেখে এস, প্রেমে এক হ'য়ে তাঁর চরণে বস। আর উঠ্‌বে না, তাঁর নামরসে ডুব্‌বে, মজ্‌বে; তাঁর প্রেমসুধা পান ক'রে আনন্দলাভ কর্‌বে। এ আনন্দের তুলনা নাই। চির দিনের তরে ডু'বে থাক্‌বে। তাঁর নামরস আস্বাদন কর্‌লে সব বদলিয়ে যায়; তোমার দৃষ্টি বদলিবে, সব সুন্দর, সব মধুর হবে, বিশ্ব মধুময় হ'য়ে যাবে, মানুষগুলি কত সুন্দর ব'লে মনে হ'বে, কত আপনার ব'লে মনে কর্‌তে ইচ্ছে হবে। আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তাঁরই প্রেমে সকলের সেবাতে নিযুক্ত হবে। নিজেকে ছোট ক'রে, নিম্ন স্থানে রে'খে, অপরকে বড় কর্‌বে। তবেই উৎসব সফল হবে, জীবন ধন্য হবে। নূতন জীবন লাভ হবে, স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হবে—ব্রহ্মনাম ঘরে ঘরে ধ্বনিত হবে। ব্রহ্ম আমাদের ডেকেছেন। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।"

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) বুধবার— অদ্য উৎসবের প্রধান দিন। যুবকগণ রাত্রি জাগিয়া মন্দির পত্রপুষ্পে সুশোভিত করেন। অপর দিকে উষাগমের বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুলাত্মা নরনারীগণ মন্দিরে সমবেত হইতে আরম্ভ করেন এবং সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর যথা সময়ে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন। "জাগো পুরবাসী ভগবত-প্রেমপিয়াসী" ইত্যাদি সঙ্গীত মিলিতকণ্ঠে গীত হইলে আচার্য্য ব্রাহ্মসমাজের ও বাহিরের দেশীয় বিদেশীয় ধর্ম্মাচার্য্য ও শিক্ষকদিগকে স্মরণ করিয়া ও সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া উদ্বোধন করেন। "হে (প্রভু) পরমেশ্বর তব করুণা" ইত্যাদি দ্বিতীয় সঙ্গীতের পর আরাধনা ও সমবেত প্রার্থনা হইল। অনন্তর "তোমাতে যখন মজে আমার মন" ইত্যাদি সঙ্গীতের পর তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

"পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোহপি লভেৎ তস্য তুচ্ছ সকলং।"

(বহু পুণ্যফলে যদি কেহ প্রেমধন লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আর সব তুচ্ছ।)

Bacon বলিয়াছেন—"Man, when he resteth and assureth himself upon divine protection and favour, gathereth a force and faith which human nature in itself could not obtain; therefore, as atheism is in all respects hateful, so in this, that it depriveth human nature of the means to exalt itself above human frailty"

(বিধাতা নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন ও কৃপা প্রদর্শন করিবেন, ইহা যখন মানুষ নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারে ও ইহার উপর নির্ভর স্থাপন করিতে পারে, তখন সে এমন একটা শক্তি ও বিশ্বাস প্রাপ্ত হয়, যাহা মানবপ্রকৃতি আপনা হইতে পাইতে পারে না; এই হেতু নাস্তিকতা যেমন সর্ব্বপ্রকারে, তেমনি এই বিষয়েও, ঘৃণনীয় যে ইহা মানবপ্রকৃতিকে মানবীয় দুর্ব্বলতার উপরে উঠিবার উপায় হইতে বঞ্চিত করে।)

"পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোহপি লভেৎ তস্য তুচ্ছ সকলং"—

এই বাক্যটি আমাদের নিত্য চিন্তা, নিত্য সাধনের বিষয়। যদি প্রেমধন লাভ করিতে পারি তবে আর সকলই তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ। Love thy neighbour as thyself—তোমার প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভাল বাস—এই আমাদের পিতার প্রথম আদেশ। প্রতিদিন এই আদেশ শুনিতে পাইতেছি। অথচ এই বিষয়ে আমরা কত দুর্ব্বল! এ জন্য তিনি লজ্জা দিতেছেন। এই লজ্জা তাঁহার কৃপা। তিনি বুঝাইয়া দিতেছেন, সকল ব্যাপারে এই আনুগত্য চাই। Casabianca-র কথা আপনারা জানেন। চারিদিক আগুনে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, প্রাণ যায়, তবুও সে সেস্থান ছাড়িয়া প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিল না! পিতা দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়াছেন, সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, একটু নড়িলও না। এই রূপ আনুগত্য ব্যতীত জীবনে শান্তি নাই। যদি সকল বিষয়ে পরমপিতার অনুগত হইয়া চলিতে পারি, তবেই জীবনে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু এই আনুগত্য লাভ করিব কি প্রকারে? প্রেম ভিন্ন আনুগত্য নাই, প্রেম না থাকিলে আনুগত্য আসে না! প্রেমই সকলের মূলে, প্রেমই জীবন। As much love so much life—যতটুকু প্রেম ততটুকুই জীবন। যেখানে প্রেম নাই, সেখানে জীবনই নাই। এই পাপতাপময় সংসারে প্রেমের অর্থ বেদনা—প্রেমের পথ সুগম নয়। দুর্ব্বিসহ বেদনার ভার বহিয়াই প্রেমের পথে চলিতে হয়। এই বেদনাতেই আমাদের জীবন সফল হয়।

আপনারা Stoicদের কথা শুনিয়াছেন। তাঁহারা দুঃখ বেদনাকে গ্রাহ্য করিতেন না—তাহার প্রতি উদাসীনই ছিলেন। Marcus Aurelius একজন Stoic ছিলেন। এক উৎসবের দিনে ৫০০ গর্ভবতী সিংহী আনা হইল, তাহাদিগকে বধ করা হইবে। কি প্রকারে তিনি এই নৃশংস ব্যাপার সাধিত হইতে দেখিলেন, জানি না। কিন্তু প্রেমের স্পর্শে এই কঠোরতা গলিয়া গেল। এক সময় তিনি তাঁহার

পল্লীনিবাসে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার এক পৌত্রের অসুখ হইলে, রোম হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া বলিলেন চিকিৎসায় ভুল হইয়াছে, এখন আর তাহাকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। সেই বালককে ক্রোড়ে করিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে প্রাণ বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িল, হৃদয় দ্রবীভূত হইল।

John Stuart Mill এর কথা অনেকে জানেন। দারুণ নিরাশা ও বিষাদে তাঁহার প্রাণপূর্ণ হইল। তাঁহার দিন কাটে না, এরূপ অবস্থা হইল। সেই সময় তিনি Marmontel এর জীবনচরিত পড়িলেন। মার্মন্টেলের পিতার মৃত্যু হইল, সকলে কাঁদিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ১২ বৎসরের বালক বলিয়া উঠিল "আমি আমার পিতার স্থান পূরণ করিব।" এই কথা পড়িয়া Mill এর চক্ষে জল আসিল, প্রাণে শান্তি আসিল— বুঝিতে পারিলেন জীবনের উদ্দেশ্য আছে, অপরের জন্য জীবনধারণ করাতেই, অপরের সেবাতেই, জীবনের সার্থকতা। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—প্রতিনিয়ত জগতে প্রেম ছড়ান। কেমনে জগতে প্রেম ছড়াইবে ?

"প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।" কেমনে দেখিব ? এই পৃথিবীতেই তাঁহার প্রেমমুখ প্রকাশিত। হৃদয়পটে লিখিত প্রেমবিধিতেই বিশ্বপতির পরিচয় লাভ করা যায়। প্রাণের বেদনা লইয়াই ছুটিয়া যাও শোকের দ্বারে দ্বারে। শোক দুঃখের মধ্যেই তাঁহার প্রেমমুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এক ভক্তিভাজন বন্ধু ঘোর দুর্দ্দিনে আমাকে উপদেশ দিলেন— "শোক ভুলিবে না, শোক একটি সাধন।" এই পথে চলিতে চলিতে শোক অপসারিত হয়, আনন্দ আসে। এই পথেই মুক্তি। God is Love—ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। এই যে অন্তরে থাকিয়া তিনি বলিতেছেন—প্রেম বিলাও, জগতের পাপী তাপীদের জন্য প্রার্থনা কর, আগে তাহারা পরে তুমি, তুমি শুধু নিজের জন্য কি চাও ? অপর সকলকে ভুলিয়া থাকিলে প্রেমস্বরূপের দেখা পাইবে না। কেশবচন্দ্রের জননী বলিয়াছিলেন, তিনি পূজায় বসিয়া আগে জগতের কল্যাণের জন্য অঞ্জলি দেন। অতি সার কথা। আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। তাহা হইলেই তাঁহার প্রেমমুখ দেখিতে পাইব।

এক বন্ধু একবারের উৎসবের উপাসনা সম্বন্ধে আমাকে বলিলেন "উৎসবের দিনে কেবলই শোকের কথা ? সকলেই ত আর শোকে কাতর নয়! আনন্দও ত অনেকে চায়!" তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করুন। শোকই শ্রেষ্ঠ সেবা, তাহার মধ্য দিয়াই প্রেমের পথে যাইতে হইবে, আনন্দলাভের অন্য পথ জানি না।

এক ভক্তিভাজন বন্ধুর মুখে শুনিলাম, তাঁহার এক আত্মীয় বড় পাপাসক্ত, তিনি প্রাণে ব্রহ্মের বাণী শুনিলেন, 'ওরে তুই তাহাকে ভালবাস্, তাহা হইলেই তাহার মঙ্গল হইবে।" Saint' Progress নামক একখানা পুস্তকে একটি ধর্ম্মযাজকের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার কন্যা বিপথে গেল, চারিদিকে তাহার নিন্দা প্রচারিত হইল, সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, সুপথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে লইয়া ভজনালয়ে যাইতেন। সেখানেও বিদ্রূপ, নিন্দা, লাঞ্ছনা। তথাপি এই পথেই চলিতে হইবে। আমাদের প্রতি প্রেমস্বরূপের উপদেশ—প্রেমের পথে যাও, পাপীকে আরও জড়াইয়া ধর।

শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনেরও সেই উপদেশ। এমন লোককে বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন, যাহার ব্যবহারে সকলে ত্যক্ত বিরক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ছাড়িতে হইবে না, আরও ভালবাসিতে হইবে। তাঁহার আর একটি উপদেশ— "কেবল সুখে সুখেই ডাকিবে ? ক্লেশের দিনে কি করিবে ?" দুঃখ কষ্টেই ডাকি। এক পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু একদিন আমাকে বলিলেন "দুঃখ কষ্টে ডাকা হয় ভাল"। যদি দুঃখ কষ্টেই ডাকিতে হয়, তবে তাহাই হউক। আর কি করিব ? ভক্তিভাজন অগ্রজস্থানীয় নবদ্বীপচন্দ্রেরও এই উপদেশ। তিনি এক দিন আমাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া বলিলেন "ভাল কাজ করিতে গেলে সেজন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।" পরমপিতার সেবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। প্রেমে বেদনা আছে, তবু প্রেম দিতে হইবে, সেবার ভাবে দিতে হইবে। তিনি প্রেম দিতে বলিয়াছেন। জগতে প্রেম ছড়ান সোজা কথা নয়। যে চলিয়া গেল তাহার জন্য ত ক্লেশ হইবেই। এ ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে। আমরা একটি প্রেমপরিবার। Rabbi Ben Ezra একটি উপদেশে সেই কথাই বলিয়াছেন।

Poor vaunt of life indeed,
Were man but formed to feed
On joy, to solely seek and find and feast :
Such feasting ended, then
As sure an end to men.

* * *

Rejoice we are allied
To that which doth provide,
And not partake, effect and not receive !
A spark disturbs our clod ;
Nearer we hold of God,
Who gives, than of his tribes that take,
I must believe ;
Then, welcome each rebuff,
That turns earth's smoothness rough,
Each sting that bids nor sit nor stand but go.
Be our joys three parts pain,
Strive, and hold cheap the chain ;
Learn, nor account the pang ; dare,
Never grudge the throe.

(মানুষ যদি কেবল সুখভোগের জন্যই, শুধু সুখের অন্বেষণ এবং প্রাপ্তি এবং উপভোগের জন্যই সৃষ্ট হইত, এবং এই প্রকার আমোদ প্রমোদের অন্তে অবধারিতরূপে মানুষের সব শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে এই জীবনের কোনও মূল্যই থাকিত না।......এই বলিয়া আনন্দ কর যে, আমরা তাঁহার সঙ্গে যুক্ত

যিনি আমাদের প্রয়োজন বিধান করেন, কিন্তু আমাদের নিকট হইতে কিছু ভাগ গ্রহণ করেন না; কার্য্যসাধন করেন কিন্তু কিছু গ্রহণ করেন না। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমাদের এই মাটির দেহের মধ্যে এক অস্থিরতা আনিয়া দিল। আমি বিশ্বাস করি যাহারা সুখভোগ করে তাহাদের অপেক্ষা যিনি নিজে সর্ব্বত্যাগী হইয়া সুখ বিধান করেন, তাঁহার সঙ্গেই আমাদের নিকটতর সম্বন্ধ। তাহা হইলে যে পরাজয় বা ব্যর্থতার আঘাত জীবনের পথ বন্ধুর করিয়া দেয় এবং বেদনা দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করে, তাহাদের প্রত্যেককে আমরা সাদরে বরণ করিয়া লই। আমাদের সুখের তিন ভাগই যদি বেদনা হয়, তাহা হইলেও সংগ্রাম করিয়া যাও, বাধা বিঘ্নকে অতি তুচ্ছজ্ঞান কর; শিক্ষা গ্রহণ কর; বেদনাকে গণনার মধ্যে আনিও না, সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হও, যাতনাকে কখনও গ্রাহ্য করিও না।) যদি সুখে আহার করিবে, সুখে দিন কাটাইবে, তবে বৃথা জীবনের অহঙ্কার।

Rejo ce we are allied to that which doth provid and not partake, effect and not receive—আনন্দ কর এই বলিয়া যে, যিনি আমাদের জন্য অনেক আয়োজন করেন, তিনি নিজে কিছু চাহেন না। "নিজে সর্ব্বত্যাগী পরোপকারী।" ব্রহ্মের কথা। আমরা তাঁহার সঙ্গে যুক্ত যিনি অপরের জন্য সব করেন। "যো বিদধাতি কামান্"—যিনি তোমার জন্য সব আয়োজন করেন, তিনি তোমার নিকটে আছেন।

A spark that disturbs our clod. এই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ প্রেম। অগ্নির ধর্ম্ম ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া যাওয়া।

Nearer we hold of God who gives যিনি দান করেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ। তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হইবে। A spark এই প্রেম।

Each sting that bids nor sit, nor stand, but go আসুক আঘাত, আসুক বেদনা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই, যাও ছুটিয়া যাও। যেন দীর্ঘ পথ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছ। সেই sting, সেই আঘাত, আসুক যাহা তোমাকে বলে অগ্রসর হও। বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। আনন্দের মধ্যে তিন ভাগ বেদনা। Our sincerest laughter
With some pain is fraught.

(আমাদের অকপট হাসির সঙ্গেও কিছু বেদনা মিশ্রিত থাকে।) তিন ভাগই বেদনা হউক, আর এক ভাগই বেদনা হউক, যাহাই হউক, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া, বেদনাকে অগ্রাহ্য করিয়া, সাহসের সহিত কল্যাণের পথে চল। বেদনা পাইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না।

Be our joy three parts pain, আমাদের সুখের তিন ভাগই যদি বেদনা হয়, তবে তাহাই ভাল। সেই বেদনাই বরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহাতেই কল্যাণ। অমৃতের পথে মৃত্যুও নাই, ব্যথাও নাই।

We are all rich, all great in God. (ঈশ্বরকে পাইয়াই আমরা সকলে ধনী, সম্পদশালী।) তাঁহাকে পাইলে সকল সম্পদই লব্ধ হয়। তাঁহাকে পাইয়াই আমরা প্রেমধনে ধনী হই। "ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি"—ব্রহ্মোপাসকের ইহাই হয়। ব্যথা লইয়াই যাইতে হয়, প্রীতি লইয়া, বেদনায় কাতর হইয়াই, যাইতে হয়।

ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশ—"তপ্যন্তে লোকতাপেন প্রায়শঃ সাধবো জনাঃ।" (সাধুজনেরা প্রায়ই লোকের দুঃখ তাপে তপ্ত হয়।) পরের দুঃখে বেদনা অনুভব করিয়াই তাঁহার পূজা করিতে হয়—তাহাই শ্রেষ্ঠ আরাধনা। প্রেম দানের তুল্য কল্যাণ আর কিছু নাই। I am the way, the truth and the life (আমিই পথ, সত্য এবং জীবন) প্রেমই এই "আমি।" "পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছ সকলং। যাতি মোহান্ধতমঃ, প্রেমরবেরুদয়ে ভাতি তত্ত্ব বিমলং।" (যদি বহু পুণ্যফলে কেহ প্রেমধন লাভ করে তবে তাহার আর সকল তুচ্ছ। প্রেমরবির উদয়ে মোহান্ধকার বিদূরিত হয়, বিমল তত্ত্বালোক প্রকাশিত হয়।) সকলকে প্রেম দিলে, হৃদয়ে প্রেমস্বরূপের প্রকাশ দেখিলে, মোহান্ধ দূর হইবে, বিমল তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। তিনিই প্রেম রবি, প্রেমের উৎস। দেবেন্দ্রনাথ এই বলিতেছেন। আর এমার্সনের উক্তি—

The affirmation of affirmations is love. As much love so much perception. Good will makes insight, as one finds his way to the sea by embarking on a river. (সকল কথার সার কথা প্রেম। যতটা প্রেম ততটা অনুভূতি। শুভ ইচ্ছা অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যেমন কেহ নদীতে নৌকায় উঠিলেই সমুদ্রে যাইয়া পৌছে।) As much love so much perception. যে পরিমাণে প্রেম সেই পরিমাণেই অনুভূতি। প্রেম থাকিলে সবই ঠিক ভাবে বুঝিতে পারা যায়। তাহা না থাকিলে কিছুই সত্য ভাবে জানা যায় না। সকল দেশের ঋষিগণের একই কথা। সকল সত্যের যিনি সত্য তিনি প্রেম। দুই জনের একই কথা। জগতের কল্যাণকামনাতেই আমরা পরাবিদ্যা লাভ করি। Good wi l makes insight. As one finds his way to the sea by embarking on a river. নদীর স্রোতই সাগরে লইয়া যায়। প্রেমস্রোতে আপনাকে ঢালিয়া দেও, তাহাই ব্রহ্মসাগরে লইয়া যাইবে। কেবল প্রেম দিয়া যাও—disinterested love—নিঃস্বার্থ ভাল বাসা বিলাইয়া যাও—তাহাই সাগরে লইয়া যাইবে। সেই সাগরকূলে সেই পুণ্য দেশ যেখানে Love is an unerring guide (প্রেম অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক), প্রেমই ঠিক পথ দেখাইয়া দেয়—বিপথে যাইতে দেয় না; যেখানে Love is exercised freely unhindered by the infirmities of our earthly life. (আমাদের পার্থিব জীবনের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বাধীন ভাবে প্রেমের অনুসরণ করা যায়।) পশুপক্ষী সকলের প্রতিই মায়া মমতা থাকিবে। প্রেম অবারিত ভাবে সর্ব্বত্র প্রসারিত হইবে। প্রেমস্বরূপ যিনি, তাঁহার নিকট স্থির হইয়া বসিলে প্রেম আস্তে আস্তে আসিবে। এই আমাদের নিত্য চিন্তার বিষয় হউক "পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছ সকলং।" প্রতিদিন লজ্জিত হইয়া তাঁহার

নিকট বসিতে হয়। তিনি জানাইয়াছেন, তিনি প্রেমের উৎস, তিনি পুণ্যের উৎস। "যাবে সকল পাপ।" তাঁহার নিকট বসিলে সকল পাপ দূর হইবে। আমরা তাঁহার নিকট বসা ভিন্ন আর কি করিতে পারি?

The divine effort is never relaxed; The carrion in the sun will convert itself to grass and flowers and man though in brothels or jails or on gibbets is on his way to all that is good and true (বিধাতার কার্য্যের কখনও বিরাম নাই। সূর্য্যের প্রভাবে পচা গলা মাংসও পুষ্প ও তৃণে পরিণত হয়। মানুষ কুস্থানেই থাকুক আর জেলখানাতেই থাকুক, অথবা ফাঁসি কাষ্ঠেই ঝুলুক, সে যাহা কিছু সত্য ও মঙ্গল তাহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে।) তাঁহার প্রেমের বিরাম নাই। তাঁহার প্রেমে সকল সুন্দর হইবে, উন্নত জীবন উন্নতির পথে চলিবে, পতিত জন উদ্ধার পাইবে। কেহই আর কুৎসিত থাকিবে না, মলিন থাকিবে না। প্রতিনিয়ত পরম পিতার প্রেম সকলের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত আছে। "যাবে সকল তাপ—" The tears of the human soul are, as it were, unwept before the smile of God; its plaints unsung amid the harmonies of heaven, its sins untwined by the wounding yet healing hand of an angel penitence. (ঈশ্বরের দয়ার নিকটে মানবত্মার শোকাশ্রু এমন ভাবে মুছিয়া যায় যেন উহা বর্ষিতই হয় নাই, স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনির মধ্যে যেন তাহার গান গীতই হয় নাই, এবং অনুতাপরূপ দেবদূতের নিরাময়কারী হস্তের আঘাতে তাহার পাপসকল যেন খসিয়াই যায় এরূপ মনে হয়।) মধ্যে মধ্যে পরম পিতার বাণী শুনিয়া এই অবস্থার পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হই। সাধুবাক্য প্রাণে বল দেয়। কিন্তু নিজে ব্রহ্মবাণী না শুনিলে কাজ হয় না। ক্ষীণ ভাবেই শুনিতে পাই। যেখানে জ্যোতির জ্যোতি চির জ্যোতি,— "ন যত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্—"যেখানে সূর্য্য চন্দ্র তারকাদি প্রকাশ পায় না—সেই রাজ্যের আভাস একটু তাঁহার কৃপায় মাঝে মাঝে পাই। সে জ্যোতির কিরণকণা আমাদের হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাশা বিষাদের আঁধার দূর করে। তাঁহার চরণস্পর্শে একটু পুণ্য প্রেমামৃত পাই। জানি নিজের পাপ, জগতের পাপ। এক দিন সব যাইবে—চির দিবার উদয় হইবে। The day is great and final. The night is for the day but the day is not for the night. (দিনটাই বড় ও চিরস্থায়ী; দিনের জন্যই রাত্রি, কিন্তু রাত্রির জন্য দিন নয়।) "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতি নেতরেষাং—যে ধীরেরা তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিবে তাহারাই শাশ্বতি শান্তি পাইবে, অপরে নহে। তাঁহাকেই অন্তরে পাইতে হইবে, তাঁহার করুণাস্রোতেই আপনাকে ভাসাইয়া দিতে হইবে।

আমার নৌকা ভাঙ্গা; তাহা লইয়াই স্রোতে ভাসিতে হইবে। তাহাই সাগরে লইয়া যাইবে—যাঁহার দর্শনে "লালসা থাকে না অশ্রু" তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবে; সেই আত্মহরণ রূপ যাহা দেখিলে মৃত্যুব্যথা দূর হয়, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশিত করিবে। তাঁহারই আদেশে শোক, বেদনা, অনুশোচনা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। সকলের কল্যাণ কামনা করিতে হইবে। তাহাতেই পরা বিদ্যা পাইব। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। তাঁহার পূজার দ্বারাই সেই পরা-বিদ্যা লাভ করা যায়। সেবার তুল্য পরম পূজা আর নাই। সেই সেবাতেই আমাদিগকে নিযুক্ত হইতে হইবে।

জহুরীই মণিমুক্তার মূল্য বোঝে। সেণ্ট পল বলিয়াছেন— Charity never faileth; but whether there be prophecies they shall fail; whether there be tongues they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away. (প্রেম কখনও ব্যর্থ হয় না। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করিবার শক্তি থাকিলেও তাহা এক দিন ব্যর্থ হইবে, ভাষার শক্তি থাকিলেও তাহা এক দিন বন্ধ হইয়া যাইবে, জ্ঞান থাকিলেও তাহা এক দিন চলিয়া যাইবে।) বিদ্যাবুদ্ধি সব যাইবে, এক প্রেম থাকিবে। আর আমাদের ব্রাহ্মসমাজের সাধুও সেই কথাই বলিলেন—পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছ সকলং। "যদি পুণ্যরাশির দ্বারা প্রেমধন লাভ করা যায় তবে আর সকল তুচ্ছ। প্রেম-রবির অভ্যুদয়ে সকল মোহান্ধকার দূর হয়, হৃদয়ে বিমল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। ক্ষণকালের জন্যও যদি হৃদয়ে প্রেম-সূর্য্যের উদয় হয়, তবে আর সমস্তই তাহার করতলগত হয়।" আমরা এই প্রেমেরই ভিখারী। আমরা ইহারই সাধনে নিযুক্ত হই। সকলে আকুল প্রাণে ইহাই প্রার্থনা করি। প্রেমস্বরূপ কৃপা করিয়া আমাদিগকে এক বিন্দু প্রেম প্রদান করুন।

অনন্তর "তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ" ইত্যাদি বন্দনা গীত হইলে আবার অনেকক্ষণ সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। তাহার পরও কেহ কেহ মন্দিরে থাকিয়া ব্যক্তিগত ধ্যান প্রার্থনাদিতে নিযুক্ত থাকেন। মন্দির কখনও একেবারে শূন্য থাকে না। পুনরায় অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী কোনও নগরের জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখি, নদীর একটি জলশূন্য খাতে জাহাজ পড়িয়া রহিয়াছে। উহা বেশ গভীর হইলেও একেবারেই জলশূন্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই, মহা শব্দ করিয়া উপর্য্যুপরি পর্ব্বতাকার তিনটি ঢেউ আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত জলে পূর্ণ করিয়া জাহাজখানা ভাসাইয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, সমুদ্র হইতে নিকটস্থ বৃহৎ নদী বহিয়া বাণ আসিয়াই এক নিমেষের মধ্যে এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিল। অনেকেই বোধ হয় গঙ্গাতেও এরূপ বাণ ডাকিতে দেখিয়াছেন। তবে কলিকাতায় যে বাণ আসে তাহা তত্টা উঁচু হইয়া, সেই পরিমাণ জল লইয়া, আসে না। সে যাহা হউক, এই বাণ ডাকার একটি বিশেষত্ব আছে। ঝড় বাতাসেও নদীতে প্রবল ঢেউ উঠিয়া থাকে, নদীবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাতে আর

তাহাতে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ঝড় বাতাসে নদীর জল ফুলিয়া উঠিলেও বিন্দু পরিমাণে বাড়ে না, জল যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া যায়। কিন্তু বাণ ডাকিলে জল বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যাহা ছিল তাহা আর থাকে না, মরা গাঙ্গে জল আসে, যাহা শুষ্ক ডাঙ্গা ছিল তাহাও জলে পূর্ণ হইয়া যায়। আধ্যাত্মিক জীবনেও ইহার অনুরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়—বিশেষ ভাবে উৎসবাদির মধ্যে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের ন্যায় শুষ্ক জীবনেও সে সময় এরূপ প্রেমের বন্যা আসে, করুণাময়ের প্রকাশে শুষ্ক মৃত অবস্থার মধ্যে এরূপ একটা নব জীবনের সঞ্চার হয় যে, আমরা আর পূর্ব্বাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারি না, একটা উচ্চতর মহত্তর জীবনে মুহূর্ত্ত মধ্যে নীত হই। It is an addition to our being—ইহাতে আমাদের জীবন কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, উন্নত হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহাতে অনন্ত উন্নতির পথ খুলিয়া যায়—the infinite enlargement of the heart with a power of growth to a new infinity in every side. (আত্মার অনন্ত বিকাশ, যাহাতে সকল দিকে নূতন অনন্তের পথে বর্দ্ধিত হইবার শক্তি জন্মে।) And it sweeps away all cherished hopes and the most stable projects of mortal condition in its flood. (সেই বন্যাতে আমাদের যাহা কিছু চিরপোষিত আশা ভরসা ও সাংসারিক জীবনসম্বন্ধীয় সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কল্পনা জল্পনা, সমস্তই ভাসিয়া যায়।) যাহারা সকল দড়াদড়ি খুলিয়া বন্ধন-মুক্ত হইয়া আপনাদিগকে এই স্রোতে ছাড়িয়া দেয়, তাহারা সহজেই উন্নতির পথে চলিয়া যায়। আর যাহারা তাহা না করে, তাহাদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত হইতে হয় বটে, কিন্তু সে স্রোত এক দিন তাহাদের বন্ধনও বলপূর্ব্বক ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। বুঝিতে হইবে ইহা একটা কৃত্রিম সাময়িক উত্তেজনা নয়। নদীতে যেমন ঝড় বাতাসে সাময়িক তরঙ্গ উত্থিত হয়, জীবনেও নানা কারণে সেরূপ সাময়িক উচ্ছ্বাস আসিতে পারে,—উৎসবাদির মধ্যে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনের উত্তেজনাতে, অন্যের ভাবোচ্ছ্বাসের সংস্পর্শে, মনে হইতে পারে যে আমরা কোনও উচ্চতর জীবনে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু তাহা প্রকৃত জীবন সূচনা করে না, জীবনের বৃদ্ধি বুঝায় না। ঝড় বাতাসের ঢেউ থামিলে যেমন দেখা যায়, জল যেখানে ছিল সেখানেই আছে, এই অবস্থায়ও ক্ষণকাল পরেই বুঝিতে পারা যায় যেখানকার জীবন সেইখানেই রহিয়াছে। কিন্তু বাণের ঢেউ থামিলে কখনও সেরূপ হয় না, জল বহুপরিমাণে বাড়িয়াই গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। যুবক-দিগের উৎসবের দিবস আচার্য্য মহাশয় যে চিরযৌবনের কথা বলিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহা লাভ করা যায়। জীবনের স্থায়ী স্রোত, স্থির শান্ত প্রবাহই, সত্যজীবনের পরিচায়ক। সৌভাগ্য ক্রমে এরূপ অনেক জীবন দেখিয়াছি, যাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ বয়সেও চিরযৌবনের উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস, কোনও বাধা বিঘ্নে বিচলিত না হইয়া শান্ত গম্ভীরভাবে ব্রহ্মপ্রেমে পূর্ণ হইয়া যাওয়া, নীরবে অবিরাম গতিতে জীবনের কার্য্য সাধন, সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাওয়া, উজ্জ্বলভাবে লক্ষিত হইয়াছে। ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত বলিতেন "লোকে বলে আমি বুড়া হইতেছি, আমি দেখি আমি দিন দিন যুবান হইতেছি।" রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়কে দেখিয়াছি কি গভীর ভাবে ব্রহ্ম-প্রেমসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, স্থির শান্ত ভাবে বসিয়া আছেন আর অবিরল ধারে দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল পড়িতেছে! কত দুঃখ কষ্ট সংগ্রামের মধ্যে জীবনের কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন! অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়াকে দেখিয়াছি কি প্রকার নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন এবং মহা দুঃখ ও বিপদের মধ্যেও শান্ত অবিচলিতভাবে মঙ্গলবিধাতাতে নির্ভর রাখিয়া আপনার কাজ করিয়া গিয়াছেন—শারীরিক রোগ দুর্ব্বলতাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন নাই। আরও অনেক জীবনে এরূপ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি। বাণ ডাকাটা একটা সাময়িক ব্যাপার হইলেও, তাহার ফল যেমন স্থায়ী হয়, সে স্রোত যেমন চিরদিনই অবিরামগতিতে বহিতে থাকে, তেমনি উৎসবাদিতে প্রেমময়ের প্রেমের বন্যা উচ্ছ্বসিত আকারে প্রবাহিত হইলেও তাঁহার করুণাস্রোত নিয়তই আমাদিগকে সেই প্রেমসাগরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। তাই প্রাতঃকালে আচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন, নদীর স্রোতে ভাঙ্গা নৌকা ছাড়িয়া দিলেও যেমন সমুদ্রে যাইয়া পৌঁছিতে পারা যায়, তেমনি আমাদের ভাঙ্গা মলিন জীবনগুলি তাঁহার করুণা-স্রোতে ভাসাইয়া দিলে আমরাও তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিব। ইহা একটা কাল্পনিক কথা নয়। ধর্ম্মটা সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতারই বিষয়। শুধু অপরের অভিজ্ঞতাই যে এই সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা নহে। আমরা প্রত্যেকে আপনার জীবনেও ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে পারি। আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে ইহার সাক্ষ্য দিতে পারি। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি—তাঁহার কৃপায় এমন প্রকাশ দেখিলাম যে, সকল সন্দেহ সংশয় ভয় ভাবনা চলিয়া গেল—জীবনকে উচ্চতর অবস্থায় লইয়া গেল, যেখানে সংসারের ক্ষুদ্রতা মলিনতা যেন আর আমার নিকট পৌঁছিতে পারিত না। তাঁহার জীবন্ত মঙ্গলবিধাতৃত্ব এমন উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে পাইলাম যে, "যেজন ব্যাকুল প্রাণে তোমারে ডাকে" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সংকীর্ত্তনটী প্রাণের সহিত গাহিতে পারিতাম না—অনুভব করিতাম, তিনি ত নিজেই ধরিয়া তুলিতেছেন তবে কিরূপে বলি "উঠিতে পারি না নিজ বলে, তুমি আমায় তোল করে ধ'রে," অথবা "ধরিবার নাহি তৃণখান।" কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোনও প্রার্থনাই প্রাণে উদয় হইত না, কিছু প্রার্থনা করিতে গেলেই বাধা লাগিত। ইহা যে এক মুহূর্ত্ত বা দুই এক দিনের ক্ষণিক অনুভূতি মাত্র ছিল তাহা নহে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ইহা চলিয়াছিল। দুঃখের বিষয় অবশেষে আপনার দোষেই সেই অবস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আরও অনেক সময় কৃপা করিয়া তাঁহার সত্য প্রকাশ তিনি দেখাইয়াছেন। অনেক-বার এরূপও হইয়াছে যে, উৎসবের মধ্যে কিছুই পাই নাই, মহা-শুষ্কতা ও শূন্যতাতেই উৎসব চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার পরেই পাইয়াছি। কি প্রকারে কি অবস্থায় যে এরূপ ঘটে, তাহা বলা যায় না—কোনও দার্শনিকও তাহা বলিতে পারেন না। এমার্সন

বলিয়াছেন, "তিনি কখনও এক পথে আসেন না, পথের কোনও চিহ্নও রাখিয়া যান না।" শুধু এইমাত্র বলা যায় যে, উহা সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মকৃপার উপরই নির্ভর করে। সে কৃপা কখন কি ভাবে আসিবে তাহা কেহ জানে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্। পাপনাশহেতুর্বেদ নতু বিচারবাগ্মলম্। দর্শনস্থ দর্শনেন ন মনোহি নির্ম্মলং, বিবিধশাস্ত্রজল্পনেন ফলতি তাত কিম্ ফলম্।" (একমাত্র ব্রহ্মকৃপাই পাপনাশের হেতু, বিচার অথবা বাগ্মল নহে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনের দ্বারাও মন নির্ম্মল হয় না। বিবিধ শাস্ত্রের জল্পনাতে কোনও ফল ফলে না।) তবে, কি হইলে হয় বলিতে না পারিলেও, কি হইলে হয় না, তাহা বলা যায়। আপনার কোনও শক্তি সামর্থ্যের উপর, সাধন ভজনের উপর নির্ভর থাকিলে যে হয় না, তাহা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। বুদ্ধদেবের জীবন ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি কি প্রকার কঠোর সাধন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যতদিন সেই সাধনের উপর নির্ভর ছিল, তত দিন সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু যখন উহা ব্যর্থ বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন, অনন্যগতি হইয়া পড়িলেন, তখনই সফলকাম হইলেন। ইহার অর্থ এই নয় যে, সাধন ভজনের কোনও প্রয়োজন নাই। আপনাকে প্রস্তুত করিবার জন্য, তাঁহার প্রকাশ গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য, তাহার যথেষ্টই আবশ্যকতা আছে। মূল কথা এই যে, অহঙ্কারীর সে রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই, দীন হীন না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। স্রোতের নীচে ডুবিয়া গেলে, স্রোতের দ্বারা চালিত হইলে, বন্ধুর প্রস্তরখণ্ডও মসৃণ হয় এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বালুকণাতে পরিণত হইলেও জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, ধরণীকে শস্যশালিনী করে। আর যে প্রস্তরখণ্ড স্রোতের হাতে আপনাকে অর্পণ না করিয়া, মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্রোতের পথে বাধা উৎপন্ন করে, তাহার দ্বারা Cataract এরই সৃষ্টি হয়, নিজের বা অপরের কোনও কল্যাণ সাধিত হয় না। তবে, ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, সে চিরদিন এই ভাবে থাকিতে পারে না, উচ্ছ্বসিত জলরাশির নিকট তাহাকে এক দিন পরাজিত হইতেই হয়, সে স্রোতের দ্বারা তাহাকে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেই হয়, অপরাপর শক্তি তাহার উচু মাথাকে ক্রমে নীচু করিয়াই দেয়। মঙ্গলময় জীবন-বিধাতার জীবন্ত প্রেম ও ইচ্ছার স্রোতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া, আপনার ইচ্ছা অভিরুচিকে মসৃণ ও চূর্ণ হইতে দিয়া যে জীবনলাভ, তাহাতেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ, মানবজীবনের সার্থকতা এবং তৎসঙ্গে অপরের, দেশের ও জগতের কল্যাণ ও উন্নতি। নিজে উঠিলে দেশও উঠিবে, নিজে না উঠিয়া কাহাকেও উঠান যায় না। আমরা প্রচার করিতে চাই, আমাদের কথা শুনাইতে ব্যস্ত হই। কিন্তু সকল সময় ভাবিয়া দেখি না যে, কথায় প্রচার হয় না, তাহাতে কোনও কাজই হয় না। আর, সত্যে প্রতিষ্ঠিত জীবন, নির্জ্জন বন জঙ্গলে নীরবে অবস্থিতি করিলেও, চারিদিকে তাহার প্রভাব নিশ্চয়ই বিস্তারিত হইবে। ইহা আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম। জড় জগতে আমরা wireless telegraphy (তারহীন তাড়িৎবার্ত্তাবহ) surcharged electric jar বা battery (তাড়িৎপূর্ণ পাত্র বা যন্ত্র), radiation (তাপবিকীরণ) প্রভৃতি কার্য্য দেখিতেছি। তাহা যে কতদূর বিস্তারিত হয়, তাহাদের প্রভাবের যে সীমা কোথায়, কেহ বলিতে পারে না। জগতের অতি দূরস্থিত পদার্থ সমূহও পরস্পরের মধ্যে তাপ-বিকীরণ করিয়া থাকে। অতি দূর দূরান্তরের বস্তুসকলের মধ্যেও যোগ রহিয়াছে। অধ্যাত্মরাজ্যে এই যোগ আরও সত্য, আরও ঘনিষ্ঠ—সেখানে দেশকালের কোনও ব্যবধানই নাই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বাক্যের উপর নহে। এমার্সন বলিয়াছেন "Life alone can impart life; and though we should burst, we can only be valued as we make ourselves valuable. (একমাত্র জীবনই জীবন প্রদান করিতে পারে; এবং আমরা যদি চিৎকার করিয়া বুক ফাটিয়াও মরি, তথাপি আমরা নিজেকে যতটা মূল্যবানরূপে গড়িয়া তুলিব ততটা মূল্যই প্রাপ্ত হইব।) সত্য জীবন লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রচারের অপর সকল চেষ্টাই নিষ্ফল। আর খাঁটি জীবনের প্রভাব কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নহে। তাই আমাদের নিজের ও এই পতিত দেশের উদ্ধারের জন্য আমা-দিগকে সেই ব্রহ্মাশ্রিত সত্য জীবনই লাভ করিতে হইবে। আপনাদিগকে প্রেমময়ের অবিরামবাহী করুণাস্রোতে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে হইবে, তাঁহারই দ্বারা গঠিত ও চালিত হইতে হইবে, তাঁহার হস্তে আপনাকে চূর্ণবিচূর্ণ হইতে দিতে হইবে। তিনি আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করুন। তিনিই জীবনের একমাত্র রাজা ও প্রভু হইয়া বসুন। আমাদের সকল ইচ্ছা অভিরুচি বিলুপ্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেক জীবনে ও সমাজে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব—মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপার করুণায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। আগামী ইষ্টারের ছুটির সময় এই উপলক্ষে বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকলকে এই দিনের স্মৃতিতে হৃদয়ের প্রীতি অর্পণ করিতেছেন এবং এই পবিত্র ব্রহ্মোৎসবে সকলের শুভ কামনা ও সাহচর্য্য প্রার্থনা করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই পঞ্চাশ বৎসরে সকলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ভগবানের করুণার কত পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার প্রেমের কত লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন! আজ তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার দিন; আজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তাঁহার প্রেমের সাক্ষ্য দিবার দিন। এই উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। সকলে সপরিবারে ও সবান্ধবে এই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিয়া ভগবানের করুণার সাক্ষ্য দিবেন,

এবং তাঁহাদিগের প্রেম ও ভক্তির দ্বারা উৎসব সফল করিবেন, ইহাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিনীত নিবেদন। নিম্নে উৎসবের কার্য্য-সূচী প্রদত্ত হইল।

কার্য্য-সূচী।

৫ই এপ্রিল, (২৩শে চৈত্র) বৃহস্পতিবার—সায়াহ্ন ৬-৪৫—উৎসবের উদ্বোধন।

৬ই „ (২৪শে চৈত্র) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন। ৭ ঘটিকায় উপাসনা। উপাসনান্তে "জীবনে ভগবানের করুণার সাক্ষ্য" বিষয়ে আলোচনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় সভ্যগণের সম্মিলন। আলোচ্য বিষয়—"ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি।" সায়াহ্ন ৬-৪৫ বক্তৃতা।

৭ই „ (২৫শে চৈত্র) শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন। ৭ ঘটিকায় যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। দ্বিপ্রহরে যুবকদিগের সম্মিলন। অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকায় বালক বালিকা সম্মিলন। সায়াহ্ন ৬-৪৫—বক্তৃতা।

৮ই „ (২৬শে চৈত্র) রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উষা কীর্ত্তন। ৭ ঘটিকায় উপাসনা। তৎপরে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রার্থনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় মহিলাদিগের সম্মিলন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন। সায়াহ্ন ৬-৪৫ মিঃ—উপাসনা।

৯ই „ (২৭শে চৈত্র) সোমবার—প্রাতে ৯ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত উদ্যান সম্মিলন। সায়াহ্ন ৬-৪৫ মিঃ—উপাসনা।

মফঃস্বল হইতে আগত অতিথিদিগের বাস ও আহারের বন্দোবস্ত করা হইবে।

কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী—কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে একটি বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

১২ই ফাল্গুন শনিবার অপরাহ্ণে একটি সামাজিক সম্মিলন হয়। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "দেব সেবা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৩ই ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৩৷৷৹ ঘটিকায় "মণ্ডলীগত জীবন" বিষয়ে আলোচনা; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয় আপনাদের বক্তব্য প্রকাশ করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়। সায়ংকালে উপাসনা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৪ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী) সোমবার বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ নিযুক্ত ও আচার্য্যগণ মনোনীত হন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত ননীভূষণ দাস গুপ্ত সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী আসাম তেজপুরের অন্তর্গত চতিয়া গ্রামে বাবু গোলকচন্দ্র লইকীয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি দুই বৎসর পূর্ব্বে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

বিগত ৩রা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দের কন্যা (দ্বিতীয় সন্তান) অণিমা ১বৎসর ৫ মাস বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় এই উপলক্ষে ৬ই ফাল্গুন বিশেষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা (শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহের পত্নী) ইন্দুলেখা গুহ দুইটি শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ-বিবাহ—বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাস গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুহাসিনী ও রায় সাহেব কমললোচন দাসের মধ্যম পুত্র শ্রীমান প্রভাতকুসুমের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কমললোচন বাবু সাধারণ বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে কল্যাণীয়া কুমারী নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরলোকগত বাবু হৃদয়নাথ রাহার পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

নামকরণ—বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী কটক নগরীতে শ্রীযুক্ত মহানন্দ করের প্রথম সন্তানের (পুত্র) নামকরণ হয়। শিশুর পিতামহ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর নাম সুনন্দ রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে পিতা উৎকল ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ এবং কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মঙ্গলময় বিধাতা শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ১২ই ও ১৩ই ফাল্গুন হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের একষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে—১২ই অপরাহ্ণে নগর কীর্ত্তন, কীর্ত্তনের নেতা শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে; তৎপরে মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য। ১৩ই প্রাতে উষাকীর্ত্তন। ৮৷৷৹ টায় সমাধিক্ষেত্রে তর্পণ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত, তৎপরে প্রার্থনা—শ্রীমতী অবন্তী ভট্টাচার্য্য। ৯৷৷৹ টায় মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। অপরাহ্ণে শাস্ত্রপাঠ ব্যাখ্যা ও উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য। সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে শ্রীযুক্ত হৃচিৎরঞ্জন রায়ের বাটীতে বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল, বিষয় "ভারতের ধর্ম্মধারা ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম"।

কালীঘাট প্রার্থনা সমাজ—উক্ত সমাজের মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে :—

২রা মাঘ—উৎসবের উদ্বোধন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত। ৩রা, ৪ঠা, ৫ই মাঘ—পারিবারিক উপাসনা ও উপাসনান্তে জলযোগ। ৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত। ৭ই মাঘ—উপাসনা, আচার্য্য, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত। ৮ই মাঘ—উৎসব আচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ। প্রার্থনা মিঃ আর কে দাস, তৎপরে প্রীতিভোজন।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

আগামী ইষ্টারের ছুটিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে। তদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বালক-বালিকাদের মধ্যে রচনার প্রতিযোগিতা হইবে। চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসর বয়সের বালক বালিকাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইবে :—

"ব্রাহ্মসমাজ এ দেশের জন্য কি করিয়াছেন।"

চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন কথা" সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইবে।

প্রথম বিষয় সম্বন্ধে রচনা লেখক ও লেখিকাদের মধ্যে যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাহাদিগকে দুইটি রৌপ্য পদক এবং যিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে রচনা লেখক ও লেখিকাদিগকে এইরূপ দুইটি রৌপ্য পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই দুইটি রচনাতে যাঁহারা প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের রচনা উৎসব উপলক্ষে যেদিন বালকবালিকা সম্মিলন হইবে সেদিন পাঠ করা হইবে।

বালকবালিকা সম্মিলনের দিন ছোট ও বড় বালিকবালিকাদের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হইবে।

চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদের আবৃত্তির জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "ভাইবোন" কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হইবে।

চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের বালক বালিকাদের জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "উৎসর্গ" নামক কবিতা (৩ ও ৪ stanza বাদ) আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হইবে।

এই আবৃত্তির প্রতিযোগিতাতেও বড় ও ছোটদের মধ্যে প্রথম দুই জনকে দুইটি রৌপ্য পদক এবং দ্বিতীয় দুই জনকে দুইটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। আগামী ৩১ মার্চ্চের মধ্যে বালক বালিকাগণ তাঁহাদের রচনা নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। তৎপরে আর কোন রচনা গৃহীত হইবে না। "শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।" মোড়কের উপর "রচনা প্রতিযোগিতা" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে।

রচনা ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার করিয়া লিখিতে হইবে এবং ১২০০ শব্দের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুবর্ণ সাম্বৎসরিক

১৩৩৫ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৯২৮, মে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হইবে। এই সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে স্কুল কলেজসমূহ গ্রীষ্মাবকাশের নিমিত্ত বন্ধ থাকে। সেই সময় কলিকাতা হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপক প্রভৃতি স্থানান্তরে গমন করেন। সে নিমিত্ত উক্ত সময় উৎসবের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ইষ্টারের ছুটীর সময় এপ্রিল মাসের ৫ই হইতে ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত উৎসব সম্পন্ন হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। উৎসবের কয়েক দিন প্রত্যহ মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা, কয়েক দিন উষাকীর্ত্তন, এক দিন কলিকাতা মহানগরীতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন, দুইটী বিশেষ বক্তৃতা, দুই দিন ব্রাহ্মসম্মিলনী, এক দিন মহিলাদিগের ও একদিন যুবকদিগের বিশেষ উৎসব, একদিন বালক বালিকাসম্মিলন ও এক দিন উদ্যান-সম্মিলন হইবে। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় প্রচারক ও পরিচারকগণ মিলিত হইবেন এবং মফঃস্বলবাসী সমুদয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণকে উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করা হইবে। তাঁহাদিগের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হইবে। উৎসব উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকার একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরলোকগত নেতৃবৃন্দের ছবি, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি পুস্তক (Album) মুদ্রিত করা হইবে। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রসারের নিমিত্ত একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনেরও চেষ্টা করা হইবে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আনুমানিক ৩০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই অর্থসংগ্রহ ও উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটী সম্প্রতি তাঁহাদিগের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা উক্ত কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্য ও সহানুভূতিকারিগণের বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, সকলে সমবেত চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এই মহোৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। এই নিমিত্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক যিনি যে অর্থ দান করিবেন তাহা ২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, অথবা ২৮বি, নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন অথবা ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কমিটীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করিবেন।

আর ভেঙ্কট রত্নম্ নায়ডু—মাদ্রাজ, শি বি ত্রিবেদী—বোম্বাই, এ গোপালন্—কালিকাট, শ্রীবিশ্বনাথ কর—কটক, শ্রীরঙ্গবিহারীলাল—পাটনা, পি কে রায়—কলিকাতা, শ্রীনেপালচন্দ্র রায়—ঢাকা, শ্রীসতীশরঞ্জন দাস—দিল্লী, রঘুনাথ সহায়—লাহোর, জে আর দাস—রেঙ্গুন, শ্রীশ্রীনাথ চন্দ—ময়মনসিংহ, শ্রীঅতুলানন্দ দাস—ডিব্রুগড়, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী—বরিশাল, শ্রীঅবলা বসু, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীশশিভূষণ দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কলিকাতা, শ্রীব্রজসুন্দর রায় (সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ) শ্রীঅন্নদাচরণ সেন ও শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কমিটীর সম্পাদক)

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৫ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু বি এ

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ।	১লা চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
২৩য় সংখ্যা।	14th March, 1928.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবনদেবতা, তুমিই আমাদের জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু ও কর্ত্তা। তুমিই আমাদিগকে এখানে আনিয়াছ, তুমিই আমাদিগকে নানা কাজের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিতেছ—আমাদিগকে পুণ্য প্রেমে সুসজ্জিত করিয়া সুন্দর ও মহৎ করিবার জন্য বিবিধ আয়োজন করিতেছ এবং নিয়ত সেই পথে ডাকিতেছ। উৎসবের মধ্যে বিশেষ ভাবে তোমার সে আহ্বান আমরা শুনিয়াছি—সকল বিষয়ে সর্ব্বোপরি তোমার দাবী ও আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তোমার দাস হইবার জন্য তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ। হে অন্তর্দর্শী দেবতা, তুমি আমাদের অন্তরের সকল অবস্থা জান, আমরা যে অন্তরে কত কিছুর দাসত্ব করিতেছি, তোমার নির্দ্দেশ মানিয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার পথে চলিতে পারিতেছি না, দেখিতেছ। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই দুর্ব্বলতা দূর না করিলে যে আর আমাদের অন্য উপায় নাই। তুমি আমাদের হৃদয়ে সেই শক্তি ও দৃঢ় সঙ্কল্প দেও, যাহাতে আমরা এখন হইতে আর কাহারও অধীন হইয়া না চলি—জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যে তোমাকেই একমাত্র প্রভু ও কর্ত্তা জানিয়া, সকল বিষয়ে তোমারই আদেশ মানিয়া চলিতে সমর্থ হই। তুমি আমাদের প্রতি জীবনে গৃহ-পরিবারে সমাজে তোমার সিংহাসন স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত কর, সর্ব্বোপরি তোমারই রাজত্ব স্থাপিত কর। আমরা তোমারই দাস রূপে জীবনের সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। সর্ব্বত্র তোমারই জয় হউক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) বুধবার— মাধ্যাহ্নিক উপাসনার পর, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ও ভাই সীতারাম ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৪ ঘটিকার সময় আবার ইংরাজীতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। তৎপরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিতে থাকে। এবং যথাকালে সায়ং-কালীন উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

শত বৎসরের বেশী হইল—বলিতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলা দেশে ও ভারতে এক মহা রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছে—অনেক পুরাতন রাজ্য গিয়াছে, নূতন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। তেমনি এই শতাব্দীর শেষভাগে এক নূতন যুগ আমাদের দেশে আসিয়াছে। এই যুগ এক নূতন সভ্যতা লইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশেই এই সভ্যতা আসিয়াছে। এমন সভ্যতা আর কোনও দেশে হয় নাই। ভাবিলে হৃদয় মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়, আকুল হইয়া উঠে। কে ইহা করিল, কে ইহাকে বর্দ্ধিত করিল? ইহার মধ্যে মানুষের হাত দেখিতে পাই না, স্বয়ং বিধাতার হাতই দেখিতেছি। ভবিষ্যৎ জগতের আদর্শ, পরে সমস্ত জগতে যে আদর্শ আবির্ভূত হইয়াছে তাহা, ইহার মধ্যে দেখিতে পাই। ইহার লক্ষণ কি?

প্রাচীন কালে শুনিয়াছিলাম জুডিয়া দেশে এক সভ্যতা আসিয়াছিল—তাহার কেন্দ্র ছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর। সে সভ্যতা

গিয়াছে, তাহা আর জীবিত নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার লক্ষণ সত্য-স্বরূপ অনন্তস্বরূপ নিরবয়ব একমেবাদ্বিতীয়ম্ পবিত্রস্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা জীবন্ত ক্রিয়াশীল মঙ্গলবিধাতায় বিশ্বাস। ইহা কথার কথা নয়। প্রাণ মন দিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তিনি ব্যক্তি, তিনি প্রত্যেকের নিয়ন্তা, সংসারের কর্ত্তা, সকলের প্রভু। ইহাই এই সভ্যতার কেন্দ্র। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার জগতে কখনও কোনও অমঙ্গল হইতে পারে না। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সব পাপী পরিত্রাণ পাইবে, এই সুসমাচার ইহার বিশেষ লক্ষণ। বর্ত্তমানে এরূপ সভ্যতা কোথাও দেখি নাই, যাহা ঈশ্বরকে পূর্ণ মঙ্গলময় বলিতেছে, সকলের পরিত্রাতা বলিতেছে। আর কোথাও এ কথা বলে না। কিন্তু বঙ্গদেশের এই সভ্যতা বলিতেছে, তিনি ব্যক্তি, তিনি প্রেমময়, তিনি সকলের কল্যাণসাধনেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহার সত্য আরাধনা, আধ্যাত্মিক আরাধনা—বাক্য নয়, ছাগবলি গরুবলি নয়, কোন পদার্থ বলিদানে নয়, আপনার আত্মাকে, আপনার অহঙ্কার গর্ব্ব স্বেচ্ছাচারিতা সবকে বলিদান করিয়া আরাধনা—করিতে হয়। এই ঈশ্বরে বিশ্বাস, এই আরাধনা, এই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। অন্য লক্ষণ, ইহার পূজাতে বাহ্য উপকরণের কোনও প্রয়োজন নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক। তেমনি ইহা সকল দেশের, সকল শ্রেণীর লোক, বালক বৃদ্ধ জ্ঞানী মূর্খ সকলের জন্য। ইহাতে জাতির বিচার নাই, বাক্যময় মন্ত্রের উচ্চারণ নাই—প্রাণের ভাষাতে, প্রাণের ভালবাসাতে, এই পূজা করিতে হয়। এরূপ সভ্যতা জগতে কি কোথাও আছে? এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও পূজার পাত্র মনে করা হয় না, এই ইহার আর এক লক্ষণ। ইহাতে কোনও গুরু পুরোহিত মধ্যবর্ত্তী প্রেরিত পুরুষ প্রভৃতি কিছুই নাই। এই পূজা কোনও বিশেষ দেশেরও বস্তু নয়; ইহা সকল দেশেরই জন্য। মুস্লিম কাফের, গ্রীক বার্বেরিয়ান, হিন্দু যবন, বৌদ্ধ খৃষ্টান, সকলেই এই পূজা করিবে। এমন বিশালতা আর কোথাও নাই—জগতের সমস্ত জাতিকে লইয়া এই পূজা—কোনও প্রকার অধিকারী-ভেদ নাই—বালক বালক-কণ্ঠে, বৃদ্ধ সাধুভাষায়, নর নারী সকলে যে যে ভাবে পারে, এই পূজা করিবে—সকলের সমান অধিকার। এমন জাতি আছে যাহারা বলে নারীর পূজায় অধিকার নাই। ঈশ্বরের আরাধনাতে এরূপ স্ত্রীপুরুষ-ভেদ নিতান্ত অসঙ্গত। এই সভ্যতায় এই ভেদ নাই।

অন্য লক্ষণ—ইহা সম্পূর্ণ পবিত্রতার পক্ষপাতী। অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে দেখা যায়, পাপের প্রতি সেরূপ ঘৃণা নাই—যেমন, মাদকদ্রব্য-সেবন দূষণীয় নয়। এই নূতন সভ্যতা বলে কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না, অপবিত্র আমোদ প্রমোদ করিবে না, এ সকলের সংস্পর্শে আসিবে না। কোনও প্রকার অশ্লীল আমোদ আহ্লাদ, যাহাতে হৃদয় বিন্দুপরিমাণে মলিন হইতে পারে, যাহাতে হৃদয়ে কালিমা পড়িতে পারে, দাগ পড়িতে পারে, তাহা করিবে না। সমস্ত বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। অপরাপর সভ্যতা সে কথা বলে না।

এই সভ্যতার আনন্দ পরমেশ্বরে। জ্ঞানালোচনাতে, প্রকৃতির পর্য্যালোচনাতে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নাতে, জগতের সৌন্দর্য্যে, পশুপক্ষী নদনদীর সুস্বরে যে আনন্দ ও মাধুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহার উপভোগেই ইহার আনন্দ সুখ ও আমোদ।

আবার দেখিতে পাই, ইহাতে পতিতের উদ্ধার। যাহারা পতিত তাহারা কি চিরপতিত হইয়াই থাকিবে? না, না, তাহারা পতিত থাকিবে না। পাপী পুরাতন জীবন বর্জ্জন করিয়া সাধু জীবন লাভ করিবে, সে আবার সাধু সাধ্বীদের মধ্যে স্থান পাইবে। সত্যং শিবং সুন্দরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং এক নিয়ন্তা জগতের রক্ষাকর্ত্তা। যাহারা একবার পড়িয়া যায় তাহারা পড়িয়া থাকিবে না। তিনি তাহাদিগকে সুন্দর ও পবিত্র করিয়া তুলিয়া লইবেন। তিনি সকলের কল্যাণই করেন। তাঁহার মঙ্গল বিধান কখনও ব্যর্থ হয় না।

ইহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালীন। ইহা জাতিভেদ জানে না। সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। এক মানুষ অপর মানুষকে এই ভাবে দেখিবে যে, সে ঈশ্বরের প্রতিরূপ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান বিদ্যমান, এমন নীচ কেহ নাই যাহার মধ্যে ভগবান নাই, যে ভগবানের সন্তান নয়, তাঁহার প্রতিরূপ নয়। সুতরাং দেখিতেছি এক নবযুগ আবির্ভূত হইয়াছে।

ইহা জ্ঞান বিজ্ঞানকে ভয় করে না। যতই জ্ঞান বাড়িবে ততই বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে,—মানুষ দেখিবে এক ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা, সকলের উপর তাঁহার করুণাধারা বহিয়া যাইতেছে। জগতের এমন কোনও অংশ নাই, যেখানে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও বিধাতৃত্ব নাই, যেখানে অন্য কোনও শক্তি কার্য্য করিতেছে। আর বলিতে চাই না।

সকলের অনুভব করিতে হইবে, কি মহা ব্যাপার আসিয়াছে ইহা বৃথা আসে নাই। ইহা বাঙ্গলাদেশের সকলকে এক করিয়া দিবে, হিন্দু মুসলমানের বিবাদ দূর করিবে। জগতে কত দ্বন্দ্ব কোলাহল! ইহা তাহা দূর করিবে। চক্ষুতে দেখিতেছি, এই সভ্যতার মধ্যে যাহারা আসিয়াছে তাহারা পাঞ্জাব বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে আসিলেও সে কথা মনে থাকে না, সকলে প্রাণে প্রাণে মিশে যায়, সবই এক হইয়া যায়; পরস্পরের মধ্যে আহার বিহার আদান প্রদান চলিবে না, এরূপ হয় না। ইহা সবকে, সব দেশকে, এক প্রাণ করিয়া দেয়। তাহারা মনে করে না কেহ তাহাদিগকে ভিন্ন করিয়া দিবে। প্রাণ এক, লক্ষ্য এক।

আমরা ইংরাজদিগকে বিদেশী দেখিয়া কত কি বলিতেছি। এই ধর্ম্মসঙ্ঘ বলিতেছে, ইংলণ্ডের লোকও ভাই—সকলে এক ঈশ্বরের পূজা করিয়া প্রাণে প্রাণে যোগ অনুভব করিতেছে, এক হইয়া যাইতেছে। আমেরিকা সম্বন্ধেও সেই কথা,—সকলে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাইতেছে, এক হইয়া যাইতেছে। রামমোহন হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমে ইহা বর্দ্ধিত হইতেছে।

নানা জনে বলিতেছে ইহা modern thoughts এর (বর্ত্তমান চিন্তাধারার) উপযোগী নয়। ইহারা আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত প্রভৃতিতে যোগ দেয় না। ইহা modern thoughts এর বিরোধী। তাহারা বলে সব ভোগ কর। ইহা বলে, বিধাতার ইচ্ছা যাহা তাহাই কর—ত্যাগের দ্বারাই আমাদের কল্যাণ হয়,

ভোগের দ্বারা নয়। modern thoughts বলে ত্যাগে নয়, ভোগেই উন্নতি ও তৃপ্তি। এই নাকি একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহা বলিয়া ত্যাগকে অপদস্থ করিতে চায়। রোমীয় সভ্যতা দেখুন, ভোগের জন্য উহা সব করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই উহা ধ্বংস পাইল,—ধন গেল, চরিত্র গেল, সতীত্ব গেল, রাজ্য গেল। এই দেশেও অনেক রাজত্ব গেল শুধু ভোগের জন্য। modern thoughts বলে ভোগ কর, তবে উন্নতি হইবে, বাণিজ্য বাড়িবে, কারিকর জন্মিবে, শিল্পের উন্নতি হইবে, ইত্যাদি। ইতিহাস তাহা শিক্ষা দেয় না। যাহারা ত্যাগ করিয়াছে তাহারাই জগতে সভ্যতা আনিয়াছে। বিলাসিতা পতনের পথেই লইয়া গিয়াছে। রামমোহন প্রভৃতির কথা বলিলে বলিবে, বড় লোকের কথা বলা হইতেছে। সকলেই তাঁহাদের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে পারে। তাঁহাদের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। অন্য সামান্য জীবনের কথাই বলিতেছি। এই যে পবিত্রতা, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, তাহাই মানুষকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া গিয়াছে, সকল প্রকার উন্নতির কারণ হইয়াছে।

একটি ১২ বৎসরের বালিকার কথা বলিতেছি। পিতা তাহাকে বিবাহ দিতে চাহিল। সে বলিল "জ্ঞানে উন্নত হইব, ছোট হইয়া সংসারে থাকিব না।" পিতা তাহার মহৎ ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিলেন না। এই কন্যা পিতাকে হাতে ধরিয়া শেষে ব্রাহ্মসমাজে নিয়া আসিল। ছোট বালিকা অন্ধ পিতার হাত ধ'রে পথ দেখায়, এখানেও যেন তাহাই হইল। তাই বলিতেছি, ছোট বালিকা, মনে করিও না তোমাদের কোনও কাজ নাই। তোমাদের প্রাণে উচ্চভাব জাগুক, দেখিবে তোমাদের দ্বারায় কত মহৎ কাজ সাধিত হইতে পারে। আমরা বলি না ধর্মের ভাব কেবল বৃদ্ধের মধ্যে আছে। না, সকলের মধ্যেই আছে। এই বালিকা সমস্ত পরিবারকে ব্রাহ্মসমাজে আনিল। এরূপ আরও অনেক বালিকা দেখিতে চাই। আমাদের মধ্যে এরূপ বহু বালিকা হউক।

আর একটি নারী—তিনি বড় ঘরের বিধবা কন্যা। যেমন শুনিতে পাই গাছের বীজ শত হস্ত দূরে যাইয়া পতিত হয়, তেমনি ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ব সেই গ্রামে যাইয়া পড়িল, একখানা উপাসনাপ্রণালী তাঁহার হাতে পড়িল। তিনি ঈশ্বরের পূজা আরম্ভ করিলেন। লোকে বলিল এ কি করে? তাহাকে ইহা পরিত্যাগ করিতে বলা হইল, তাহাকে ফাঁসি দিতে নিয়া গেল। ফাঁসি দেওয়া হইল না, কোনও প্রকারে রক্ষা পাইল। আবার নদীতে ফেলিয়া দিতে চাহিল। সে নারী কি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিল? প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল, তবু ধর্ম ছাড়িল না। বাঙ্গালার নারী এই করিতে পারিয়াছে। আজ অন্যপ্রকারে তোমাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। আমোদ প্রমোদ, বিষয় বিলাসের মধ্যে ফেলিয়া তোমাকে মারিবার চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গলার নারী, বল, ঐ কন্যার মত বল, "এই সকলের মধ্যে যাইব না, বিলাসে আপনাকে হারাইব না, উচ্চলক্ষ্যের পথে চলিব, জীবনের উন্নতি সাধন করিব।" এই সভ্যতার মধ্যে বিলাস বিভ্রম আমোদ প্রমোদ নাই; এক ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি, এই পবিত্র পথে গমনই ইহার এক মাত্র লক্ষ্য। ঐ বালিকা, ঐ বয়স্কা নারীর ন্যায় লোকের দ্বারাই ধর্মসমাজ পুষ্ট হয়। কত নারীর কথা বলিব? এরূপ কত নারী দেখিয়াছি! ইহাদের দ্বারাই ধর্মসমাজ, আমাদের পুত্র কন্যাগণ, রক্ষিত হইবে। এই ধর্মসমাজে কত করুণা পাইতেছি! ঈশ্বরের এই করুণা দেখিয়া তাঁহার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিব। এখানে কেবল পুণ্য পবিত্রতার হাওয়া প্রবাহিত করিব। তবে এই প্রার্থনা আসুক, এই আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য ইচ্ছা আসুক, সমস্ত পবিত্র করিব, সুন্দর করিব, মহৎ করিব। কত পুরুষ এই সমাজের জন্য আপনাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন! কত স্মরণ হইতেছে! কত বলিব? সে কথা বলিব না। কেবল দয়ার কথা বলিব। এক জনের কথা বলিব—বড় দরিদ্র, পুত্র কন্যা পালন করা কঠিন। এই ধার্ম্মিক লোককে একটি কাজ দেওয়া হইল—টাকা বেশ হইবে, মদের দোকানের মালিকের কেরাণীর কাজ, মদের দোকানের সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই। তবুও তিনি বলিলেন "অনাহারে থাকি সেও ভাল, তথাপি অন্যায় করিব না, অন্যায়ের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিব না।" ব্রাহ্মসমাজের গৌরব ইঁহার দ্বারা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আজ যেন সকলে বলিতে পারি "না খাই, না পরি, তবুও অন্যায় কাজ করিয়া জীবিত থাকিব না, ঈশ্বরের নিকট খাঁটি থাকিব।" সকলের হৃদয় হইতে এই আশীর্ব্বাদভিক্ষা আসুক।

এক যুবকের কথা বলি। নৌকা ডুবু ডুবু, হাল বিগড়িয়া গিয়াছে, জল উঠিতেছে, সকলে ভয়ে কাতর। যুবক ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত, কোনও ভয় নাই। এরূপ করিয়া কি তাঁহার করুণার পরিচয় পাও নাই? আর এক জন যুবক ছিল, সে হাল ধরিতে জানে না, তবু ক'ষে হাল ধরিল, "ব্রহ্মনামের তরী তোদের লেগেছে তীরে" ব'লে হাল ধরিল, নৌকা তীরে লাগিল। এইরূপ বিশ্বাসী লোকের দ্বারাই কাজ হইয়াছে।

আর এক স্থানের কথা শুনিয়াছি, সেখানে ব্রাহ্মসমাজ ছিল না। কয়েকটি রাজকর্ম্মচারী দুষ্কর্ম্মের জন্য অভিযুক্ত হয়। ইংরাজ বিচারক তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি তাহাদের কার্য্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে দণ্ড দিয়া সে লজ্জা আর বৃদ্ধি করিতে চাহেন না, তাহারা সংশোধিত হইয়া ভদ্র ভাবে জীবন যাপন করে তাহাই তিনি চাহেন। তিনি শুনিয়াছেন ব্রাহ্মসমাজে গেলে লোক ভাল হয়, তাহারা যেন ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া যোগ দেয়, আর যদি সেখানে ব্রাহ্মসমাজ না থাকে তবে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে, তিনি গবর্ণমেণ্টের জমী হইতে মন্দিরের জন্য জমি দিবেন। তাঁহারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার উপদেশ মত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, উপাসনা করিয়া উদ্ধার পাইলেন, এবং পবিত্র জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। আজ এই কথা শুনে কি আনন্দ হইতেছে না? উপাসনা করিলে ব্যভিচারীর পাপ সকল চলিয়া যায়, পাপী পুণ্যবান হয়। এই রূপে ব্রাহ্মসমাজের লোক আপনাদের জীবনের দ্বারা, চরিত্র জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা, উন্নত পবিত্র জীবনের দ্বারা, ইহাকে শোভন করিয়াছে, লোভনীয় করিয়াছে, শক্তিশালী করিয়াছে।

এই নূতন সভ্যতা, এই নূতন ধর্ম্মসমাজকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আমাদের পবিত্রতার দ্বারা, আমাদের জীবনের দ্বারাই তাহা করিতে হইবে। অনুরাগ ও ভালবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ঈশ্বরের অনুগত জীবন লাভ করিতে হইবে। এই অনুরাগ, এই ভালবাসা, আমাদের জীবনের লক্ষণ হউক। ইহার উপর জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

Peninsular war এর সময় একটি নগর দখল করিবার জন্য বহু সৈন্য সেনাপতির আদেশে পরিখার মধ্যে জীবন দিল। সেই মৃত দেহের সেতুর উপর দিয়া যাইয়া অপরে নগর দখল করিল। এই ভাবে প্রভু পরমেশ্বরের আদেশ শুনিতে হইবে, তাঁহার আদেশে জীবন দিতে, সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে, প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পনর বৎসরের এক বালক পিতা মাতা সব ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য আসিয়াছে, কিছুই তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। এখন সে একজন ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বস্ত ত্যাগী সেবক। সেবার জন্য সকলকে বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে, সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। শুদ্ধ পবিত্র জীবনদ্বারা সমাজকে উন্নত করিতে হইবে, সুন্দর করিতে হইবে, শক্তিশালী করিতে হইবে। বালক বৃদ্ধ সকলকেই ইহা করিতে হইবে, এই জন্য খাটিতে হইবে। আজ আমরা সকলে তাঁহারই শরণাপন্ন হই, তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করি। তিনি আমাদিগকে এই কার্য্যসাধনে, তাঁহার অনুগত জীবন লাভে, সমর্থ করুন। তাঁহার করুণা আমাদের এই প্রিয় সমাজের উপর বর্ষিত হউক। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মেরই জয় হউক।

অনন্তর শ্রীমতী সরলা দেবী একটি প্রার্থনা করেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন চলিলে পর অদ্যকার উৎসব শেষ হয়।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উদ্বোধনে তিনি প্রথমতঃ সাধনাশ্রমসংসৃষ্ট পরলোকগত আত্মাগণকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মের কয়েকটি কথা বলেন :—"ভাল ভাল বাড়ীতে দেখা যায়, বড় ভোজ হ'লে, আগে বাড়ীর লোকেদের খাওয়া দাওয়া হয়, তার পর বাড়ীর চাকরদের খাওয়া দাওয়া হয়। চাকরদের খাওয়াবার সময়ও গৃহকর্ত্রী মায়ের মতন যত্নে তাদের খাওয়ান। আমাদের এ উৎসবে কাল বাড়ীর লোকেদের ভোজ হ'য়ে গেল, আজ চাকরদের ভোজ। সাধনাশ্রমের ভাই-বোন্ আমরা এই ব্রাহ্মসমাজ-বাড়ীর চাকর। এমন বাড়ীর চাকর হওয়া, এমন বাড়ীর সামান্যতম সেবা করা, এমন কি, উঠান ঝাঁট দেওয়া, উচ্ছিষ্ট পাতা কুড়ানো, ময়লা পরিষ্কার করা, সবই কত গৌরবময় কাজ, তা একবার আজ হৃদয়ে অনুভব কর। সংসারে অনেক চাকরী আছে। জনসমাজের কল্যাণকর্ম্মের মধ্যেও অনেক ভাল ভাল কাজ আছে। কিন্তু আমরা অনুভব করি, ব্রাহ্মসমাজের চাকর হওয়াতে আমাদের যে গৌরব ও যে সৌভাগ্য হ'য়েছে, তা আর কোন কাজে হ'তে পারত না। আজ নিজেদের সেই অধিকারের মূল্য অনুভব করি। আমরা ভাল ক'রে সারাবছর কাজ করতে পারিনি; আমরা ভাল চাকর নই; সেজন্য বাড়ীর লোকেদের ভৎর্সনা পদাঘাত পাবার যোগ্য আমরা। এত অযোগ্য, এত দণ্ডের ভাগী, তবু আমরা এই বাড়ীরই চাকর, আর কারো নই। ঐটুকুই আমাদের দাম। আমাদের মন বুদ্ধি শক্তি, আমাদের রক্ত মাংস, ব্রাহ্মসমাজের চাকর হবার জন্যই দিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, ঐ টুকুই আমাদের মূল্য। আজ বিশ্বজননীর এই উৎসবক্ষেত্রে, আমরা নিজেদের অধম ব'লে, সকলের পায়ের তলার চাকর ব'লে অনুভব করি। সেই ভাবে আজ উৎসবক্ষেত্রে বসি। মা বাড়ীর লোকেদের খাইয়েছেন। চাকর আমরা, আমাদেরও যত্ন ক'রে, মায়েরই মতন আদর ক'রে, তিনি খাওয়াবেন। আজ নম্রতায়, দীনতায়, নিজেদের অযোগ্যতার অনুভবে হৃদয় পূর্ণ হোক্।"

তৎপরে আরাধনা হয়। আরাধনার পরে সতীশবাবু প্রথমতঃ রোমনগরে কারারুদ্ধ সেণ্ট পলের পত্র (Ephesians IV 1-6, VI. 13-19) হইতে এই কয়েকটি উক্তি পাঠ করেন, ও সাধনাশ্রমের অন্তীভূত সকল লোককে সেণ্ট পলের এই অমূল্য উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিতে অনুরোধ করেন :—

"I, therefore the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

With all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love ;

Endeavouring to keep the unity of the spirit in the bond of peace.

There is one Body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling ;

One Lord, one faith, one baptism ;

One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. * * *

Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness ;

And your feet shod with the preparation of the gospel of peace ;

Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.

And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God :

Praying always with all prayer and supplication in the spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;

And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel.

তৎপরে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ দান করেন :—

আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী সাধনাশ্রমের বয়স ৩৬ বৎসর পূর্ণ হবে। ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মভাবের ম্লানতা অনুভব ক'রে, ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য কর্ম্মীর অভাব দেখে; ১৮৯২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে সাধনাশ্রম স্থাপন করেন। তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বয়স কিঞ্চিদূন ১৪ বৎসর ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী জীবনের ৩৬ বৎসর কাল সাধনাশ্রম তাহার সেবা করিয়া আসিতেছেন। সাধনাশ্রম নানা প্রণালীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বলবৃদ্ধি ক'রেছেন। সাধনাশ্রম ইহার কর্ম্মক্ষেত্রকে অনেক প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন, অনেকগুলি স্থায়ী ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন, অনেকগুলি বিশ্বাসী ও উৎসাহী মানুষকে ইহার প্রচারক ও সেবকরূপে ইহার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ ক'রেছেন।

কিন্তু সাধনাশ্রমের উদ্দেশ্য কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যকে বলশালী করা নয়। ইহা ব্রাহ্মসমাজে কেন আছে ও কেন থাকবে, ইহার উদ্দেশ্য কি, তা শাস্ত্রী মহাশয় নানা ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। আমি আজ কয়েক প্রকারে তাহাই প্রকাশ করবার চেষ্টা করব। কিন্তু সাধনাশ্রমের উদ্দেশ্য যে-যে ভাবে আমি আজ এখানে ব্যক্ত করব, তার কোনটিতেই সে যে সিদ্ধিলাভ ক'রেছে, তা' নয়। ইহার বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা আমরা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করছি। বিশেষতঃ ইহার অযোগ্য সেবক আমি, আজ সাধনাশ্রমের দুর্ব্বলতা ও নিজ অক্ষমতা অতিশয় ক্লেশের সঙ্গেই অনুভব করছি। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মসমাজের নিকটে সাধনাশ্রমের বিশেষ ভাবটি আজ নিবেদন করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের নব শতাব্দীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকটি অঙ্গের পক্ষে নিজ ভবিষ্যৎ লক্ষ্যকে আবার ভাল ক'রে উপলব্ধি করা প্রয়োজন হ'য়েছে। এই জন্যই আমি আজ এ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে যাচ্ছি আমার কথা শুনতে শুনতে আপনাদের পদে পদে মনে হ'বে "কই, সাধনাশ্রমের দ্বারা এ কাজটি হ'চ্ছে কই?" আমরা যে কিছু পারিনি, তা ঠিক। তবু আজ আপনাদের কাছে ব'সে, সাধনাশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ছবিটি আছে, তার আলোচনা করতে আমাকে অনুমতি দিন।

শাস্ত্রী মহাশয় অনেকগুলি তুলনার সাহায্যে সাধনাশ্রমের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর একটি তুলনা এই ছিল যে, সাধনাশ্রম হবে ব্রাহ্মসমাজের রান্নাঘর। ব্রাহ্মসমাজ দয়াময়ী বিশ্বজননীর দয়ার অন্ন প্রেমের অন্ন সংসারের দুঃখী তাপীকে পরিবেশন করিবেন। সেই দয়ার, অন্ন, প্রেমের অন্ন, প্রস্তুত হ'বে কোথায়? সকল বাড়ীতেই দেখা যায় যে রান্না করবার জন্য আলাদা একখানি ঘর থাকে। কর্ম্মালয় ও রন্ধনালয় কেহ এক করে না। যেখান দিয়ে লোকজন সর্ব্বদা যাতায়াত করে, যেখানে কাজকর্ম্ম করে, যেখানে নানা কোলাহল, বিশৃঙ্খলা, ও ধূলি,—সেখান থেকে কিছু আড়ালে রান্নাঘর তৈয়ারী করে। জুতো নিয়ে সহজে সেই ঘরে কেহ প্রবেশ করে না। যে-বাড়ীতে রান্নাঘর নাই, সে বাড়ী বাড়ীই নয়। ধর্ম্ম-সমাজেও তেমনি রান্নাঘরের প্রয়োজন হয়। ধর্ম্মসমাজের নানা কর্ম্মোদ্যোগ, এবং তাহা হইতে উত্থিত নানা তর্কবিতর্ক, উত্তাপ, ও কোলাহল, এ সকল হ'তে কিছু পরিমাণে নির্লিপ্ত এমন একটি স্থান থাকা দরকার হয়, যেখানকার হাওয়াতে কেবল দয়ালের নাম, কেবল দয়ালের দয়ার প্রসঙ্গ ও সাধুভক্তদের চরিত্রের প্রসঙ্গ, কেবল মানুষের ধর্ম্মজীবনের ব্যাকুলতা,—এই সকল সঞ্চিত ও ঘনীভূত হবে। কেহ যখন কাহাকেও খেতে বসায়, সে কত সাবধান হয়, যেন ভোজনকারীর খাদ্যে একটুও ধুলো না পড়ে। ব্রাহ্মসমাজ দেশবাসীকে আত্মার অন্ন পরিবেশন করবেন। সে কাজে যাতে দয়ালের দয়ার অমৃতের সঙ্গে, সাধুভক্তদের চরিত্রের ও ভক্তির অমৃতের সঙ্গে, আমাদের কর্ম্মোদ্যোগ হ'তে উত্থিত ধূলি, একটুও মিশতে না পায়, তার জন্য একটা স্বতন্ত্র রান্নাঘর থাকা দরকার। সাধনাশ্রমকে শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সেই রান্নাঘর বলতেন।

সাধনাশ্রমের ভাই বোন্, আমরা রান্নাঘরের কাজের কত যে অযোগ্য, তা মনে ক'রে আজ মন ক্লেশে পরিপূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। কত বাড়ীতে দেখা যায়, রাঁধ্বার আলাদা লোক থাকে না। বাসন মাজার চাকরকে দিয়েই রান্নার কাজ কোন রকমে চালিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু তার হাতে সব জিনিষ বিস্বাদ হয়। আমাদের হাতে মায়ের দয়ার অন্ন প্রেমের অন্ন ঠিক রান্না হয় না। আমরা ঐ কাজের যোগ্য নই, ওর চেয়ে নীচু কাজেরই যোগ্য। আজ নিজেদের অযোগ্যতার অনুভূতিতে মন পূর্ণ হোক্।

তার পর, ব্রাহ্মসমাজ যে একটি আধ্যাত্মিক সাধকমণ্ডলী, এই সত্যটিকে স্পষ্ট করবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় বলতেন, ব্রাহ্মসমাজে একটি অগ্নিকুণ্ড থাকা চাই, আর সাধনাশ্রম হ'বে ব্রাহ্মসমাজের সেই অগ্নিকুণ্ড। য়ুরোপ প্রভৃতি শীতের দেশে চারিদিকে যখন তুষার পড়ে, তখন যেখানে আগুন থাকে, মানুষ সেখানেই ছুটে যায়। আগুনের চারিদিকে সকলে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ঘিরে বসে। তেমনি, জনসমাজে যখন ধর্ম্মাগ্নির তাপ নাই, যখন সাংসারিকতার শীতল বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত, তখন এমন একটি স্থান থাকা দরকার হয়, যেখানে গিয়ে মানুষ তপ্ত হবে, ধর্ম্মাগ্নি যাদের মধ্যে আছে এমন ব্যাকুলাত্মাদের সংস্পর্শ পাবে, এবং ঈশ্বরকে নিয়ে ঘনিষ্ঠ দল হ'য়ে বস্‌বার পবিত্র আস্বাদনটি লাভ করবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলতেন, সাধনাশ্রম হবে ব্রাহ্মসমাজের সেই অগ্নিকুণ্ড।

ব্রাহ্মসমাজ যে একটি ধর্ম্মসাধকমণ্ডলী, এ সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্য আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা যায়। সাধনাশ্রমকে বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজের মধুচক্র। প্রজাপতিতেও

মধু খায়, মৌমাছিতেও মধু খায়। কিন্তু প্রজাপতিদের মধ্যে দলবদ্ধ জীবন নাই, এবং তাদের একটা মধুসঞ্চয়ের স্থান থাকে না। প্রজাপতিরা দেখতে সুন্দর। তারা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে মধু খেয়ে বেড়ায়, কিন্তু চাক বাঁধে না। ধর্ম্মজীবনের দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজটা প্রজাপতিদের সমাজ হওয়া উচিত নয়, মৌমাছিদের সমাজই হওয়া উচিত। ধর্ম্মরাজ্যে তত্ত্বরাজ্যে সাধনরাজ্যে কত দেশে দেশে কত কালে কালে কত ফুল ফুটেছে, ফুটছে, ভবিষ্যতেও ফুটবে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও ভক্তিশাস্ত্র, বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণব ও শিখ ধর্ম্ম, মধ্যযুগের নানা আকারের ভক্তিধর্ম্ম,—ভারতের এই সকল ধর্ম্মান্দোলন, এবং ভারতের বাহিরে পারসীক ইহুদী খ্রীষ্টিয় ও মহম্মদীয় প্রভৃতি নানা ধর্ম্মবিধান,—এ সকলই যেন ঈশ্বরের উদ্যানে প্রস্ফুটিত নানা জাতির ফুল। সে সকল ফুলে কত সৌন্দর্য্য, কত মধু! কত ভাবুক কত কবি কত পণ্ডিত কত জ্ঞানী তাদের মধ্যে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্চেন। সে ফুলের দৃশ্য আর সে প্রজাপতি ওড়ার দৃশ্য দেখলেও মন মুগ্ধ হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম শুধু ফুলের রস চেখে চেখে উড়ে বেড়াবেন না। ব্রাহ্মসমাজ হবে এমন এক মধুচক্র, যাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের, অতীত ও বর্ত্তমানের, সব ফুল হ'তেই বিন্দু বিন্দু রস এনে সঞ্চিত করা হবে। আবার, সে রস এখানে শুধু সঞ্চিতই হ'বে না, কিন্তু মধুচক্রে যেমন ফুলের রস ক্রমশঃ মধুতে পরিণত হয়, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যের সকল ফুলের রস এখানে সুমধুর ব্রাহ্মধর্ম্মে ও মধুময় ব্রাহ্মজীবনে পরিণত হবে। তার মধ্যে যদি কিছু অম্ল তিক্ত কটু কষায় রস থাকে, তা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে, মধুময় ব্রাহ্মধর্ম্মরসে পরিণত হ'বে। ধর্ম্মজগতের যে-কোন ধর্ম্মের মধ্যে যে-কোন ফুল ফুটেছে, সকলের রস এখানে নিয়ে আসতে হবে। কোনটির রস না নিয়ে আসা, কোনটির রস আপনাতে সঞ্চয় না করা, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে নিষিদ্ধ। শুধু অতীত হ'তে নয়, বর্ত্তমান হ'তেও রস সংগ্রহ করতে হবে; এবং শুধু ধর্ম্মজগৎ হ'তে নয়, মানুষের সকল মহান প্রয়াস হ'তেই রস সংগ্রহ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নববিধানী ভাইয়ের সাধনা থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন? বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের ও আর্য্যসমাজের সাধনা হ'তে আমরা বঞ্চিত হ'ব কেন? বাহাই ধর্ম্মের সাধনা হ'তে আমরা বঞ্চিত হ'ব কেন? আচার্য্য জগদীশের বিজ্ঞানমন্দিরে ও কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে ও "বৃহত্তর ভারত পরিষদে" যে উন্নত অনুপ্রাণনসকল রয়েছে, তা হ'তেই বা আমরা বঞ্চিত হব কেন?—সকই এখানে সঞ্চয় করতে হবে, এবং সব বস্তুকেই মধুময় ব্রাহ্মধর্ম্মে ও ব্রাহ্মজীবনে পরিণত করতে হ'বে। যেমন মধু সঞ্চয় করে ব'লে ও মধু প্রস্তুত করে ব'লে পতঙ্গরাজ্যে মৌমাছির জাত আলাদা, ধাত আলাদা, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে ব্রাহ্মের জাত আলাদা, ধাত আলাদা। ব্রাহ্মেরা সব সঞ্চয় ক'রে আনে, আবার সাধনার দ্বারা সব বস্তুকে মধুময় ধর্ম্মজীবনে পরিণত করে। একাজের জন্য ব্রাহ্মসমাজে একটা মধুচক্র থাকা প্রয়োজন। যাতে ব্রাহ্মসমাজ শুধু ভাবুকের কবির জ্ঞানীর পণ্ডিতের সমাজ মাত্র না হয়, সাধকের সমাজ হয়, এবং যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবনরস জগতের কোনও শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, প্রয়াস, চিন্তা বা ভাব বাদ প'ড়ে না যায়. তার জন্য এতে একটা মধুচক্র চাইই চাই। সাধনাশ্রম হবে ব্রাহ্মসমাজের সেই মধুচক্র। সাধনাশ্রমের ভাই বোন্, আমরা প্রজাপতি হ'ব না। লোকে দেখুক, জানুক, এ ইচ্ছা আমরা করব না। পরিশ্রমী মধুমক্ষিকার মত নীরবে, লোকচক্ষুর প্রায় অগোচরে থেকে, ব্রাহ্মসমাজের কাজেও খেটে যাব; আর আমাদের নিজ নিজ জীবনে ও আমাদের চক্রটিতে মধু সঞ্চয় ও মধু প্রস্তুত ক'রে যাব, এই আমাদের আদর্শ হোক্।

অগ্নিকুণ্ড ও মধুচক্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্চে যে ব্রাহ্মসমাজে দল বাঁধবার, জোট বাঁধবার একটি বিশেষ ধারা আমরা দেখতে চাই। প্রত্যেক crystalএর দানা বাঁধবার একটি বিশেষ ধারা আছে। প্রত্যেক element-এর নিজের পরমাণুর সঙ্গে, এবং অন্যান্য elementএর পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হ'বার একটি বিশেষ ধারা আছে; তাই দিয়ে সেই elementকে চেনা যায়। ভারতের খনিতে কিংবা ব্রাজিলের খনিতে, যেখানেই থাকুক, এই লক্ষণ দিয়ে সোনাকে সোনা ব'লে চেনা যায়। তেমনি মানুষও মানুষের সঙ্গে নানা ভাবে দল বাঁধে। দলবদ্ধ হ'য়ে তারা club, আমোদগোষ্ঠী, পাঠগোষ্ঠী সৃষ্টি করে, এবং আর্ত্তসেবা, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি কত কি কাজ করে। ব্রাহ্মরাও এ সকল ভাবে মিলিত হন, দল বাঁধেন। এ সকল বিষয়ে সংসারের আর সব লোক যেমন, ব্রাহ্মও তেমনই। কিন্তু ব্রাহ্মদের মধ্যে দল বাঁধবার এ সকল সাধারণ মানবীয় ধারার অতিরিক্ত আর একটি বিশেষ ধারা থাকা উচিত। তা এই যে, এরা ধর্ম্মসাধনমণ্ডলীর ভাবে মিলিত না হ'য়ে থাকতে পারে না; যেখানে তিনটি ব্রাহ্ম, সেখানেই তারা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করতে, দয়ালের নাম গান করতে জোট বাঁধে। ব্রাহ্মরা অন্য অনেক রকমে জোট বাঁধে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম নিয়ে জোট বাঁধাটাই এদের বিশেষত্ব, ধর্ম্ম নিয়ে জোট বাঁধতেই এরা সব চেয়ে বেশী ভালবাসে। ব্রাহ্মদের crystallization এর এই ধারা হওয়া উচিত; ব্রাহ্মের chemical characteristic এইরূপ হওয়া উচিত। তিনটি ব্রাহ্ম একত্র হ'লে automatically সেখানে একটি ধর্ম্মমণ্ডলী হবে।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি এ দেশে ধর্ম্মসমাজরূপে জীবিত থাকতে হয়, তবে প্রতি ব্রাহ্মের স্বভাবের অণু পরমাণুতে এই ধারাটি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহা অসম্ভব। ব্রাহ্মদের স্বভাবে কি এই ধারাটি আছে? ব্রাহ্মসমাজ ভাল ক'রে আত্মপরীক্ষা করুন। যদি দেখা যায় যে ব্রাহ্মরা যে-যে সহরে যায়, সেখানে গিয়ে তারা সৃষ্টি করে শুধু আমোদের দল, কি শিল্প সাহিত্যের দল, কি সমাজসংস্কারের দল, কি অন্য অন্য কাজের দল, অর্থাৎ ধর্ম্মের দল ছাড়া আর যে কোনও রকমের দল,—যদি দেখা যায় যে ব্রাহ্মরা ধর্ম্ম নিয়ে ঘনিষ্ঠ মণ্ডলী হচ্চে না, ব্রাহ্মদের স্বভাবের অণু পরমাণুতে এই আধ্যাত্মিক মণ্ডলীত্বের ভাবটি সঞ্চারিত হচ্চে না, তবে বলি, হে ব্রাহ্মগণ, তোমাদের প্রচারকেরা গিয়ে সেই সহরে ব্রাহ্মসমাজের কথা যতই প্রচার ক'রে আসুন, তাতে কিছু ফল হবে না। সে বিপুল অভিনয়

ব্রাহ্মসমাজকে ঠেকা দিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। হয় ব্রাহ্মসমাজকে ধর্ম্মমণ্ডলীরূপে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে, নয়, ব্রাহ্মসমাজের আশা ছেড়ে দিতে হবে। যদি মনে ক'রে থাক যে দেশের সাম্‌নে ব্রাহ্মসমাজকে সমাজসংস্কারের, কি জনসেবার, কি স্বাধীনতা-প্রচারের, একটি উদ্যোগরূপে দণ্ডায়মান ক'রে রাখ্‌লে ইহা তেজস্বী জীবনে জীবিত থাকবে, তবে ভুল মনে ক'রেছ। এমন কি, যদি ব্রাহ্মসমাজকে উদার ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রচার করবার একটা উদ্যোগরূপে দণ্ডায়মান রাখ্‌তে চাও, তাতেও ব্রাহ্মসমাজকে জীবিত রাখ্‌তে পার্‌বে না। এ সকলের কোনটিই ব্রাহ্মসমাজের আসল কাজ নয়, কোনটি এর আসল লক্ষণ নয়। হয় ধর্ম্মমণ্ডলীরূপে জীবিত থাকা, নয় মৃত্যু; এর আর মধ্যপথ নাই। ব্রাহ্মসমাজে এই ধর্ম্মমণ্ডলীত্বের লক্ষণটি বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য নানারূপ সতেজ আয়োজন থাকা দরকার। সাধনাশ্রমকে আপনারা তার একটু আয়োজন ব'লে দেখ্‌তে পারেন।

তার পরে, ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মব্যবস্থার ও কর্ম্মী প্রস্তুত করবার আয়োজনের কথা ভাবা যাক্‌। অনেক বন্ধুদের মুখে এমন কথা শুন্‌তে পাই, "ব্রাহ্মসমাজে কর্ম্মী প্রস্তুত করা হচ্চে না, কর্ম্মী প্রস্তুত করবার একটা ভাল কারখানা চাই।" কারখানার তুলনাটি আমার মনে ধরে না। ব্রাহ্মসমাজের যা প্রয়োজন, তাকে কারখানার সঙ্গে নয়, বরং কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বর্ত্তমান যুগে, কর্ম্ম এবং কর্ম্মব্যবস্থা (organisation), এই দুই বস্তু জনসাধারণের মনকে বড় বেশী পরিমাণে অধিকার ক'রে র'য়েছে। মানুষ যে এ সকলের চেয়ে বড়, এবং জীবন ও চরিত্রই যে কল্যাণের ও কল্যাণকর্ম্মের মূল উৎস, অনেক সময়ই লোকে তা ভুলে যাচ্ছে। মনে করুন, কোন এক দেশে এক বছরের ফসল কাটা হ'য়ে গেল। সে শস্য হাজার লোকের হাত দিয়ে বেচা হ'ল, কেনা হ'ল। তা নিয়ে নানা দোকান বাজার ব'সে গেল। ধান-ছাটা, গম-পেষা, নানা কল-কারখানার সৃষ্টি হ'ল। রেল ষ্টীমার নৌকাতে সে শস্য নানা দিকে চল্‌ল। এই দোকান-পাট কল-কারখানা রেল-ষ্টীমার দেখ্‌তে মস্ত ব্যাপার। কিন্তু মূলে তো সেই ফসল। সেই ফসল প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয় কি ক'রে? এক বছরের ফসল থেকে তো আর এক বছরের ফসল সৃষ্টি হ'তে পারে না। তার জন্য চাই জমির ভাল রকম উর্ব্বরতা, চাই জমির ভাল রকম চাষ। তেমনি, এক যুগের তেজস্বী কর্ম্ম হ'তেই অন্য যুগের তেজস্বী কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। অন্য সকল ব্যাপারে যাই হোক্‌, ধর্ম্ম-সমাজের সম্বন্ধে এই কথা সত্য, যে, কর্ম্মী হ'তে কর্ম্মী প্রসূত হয় না, কর্ম্ম হ'তে কর্ম্ম প্রসূত হয় না। জীবন হ'তেই কর্ম্মীর জন্ম হয়, জীবন হ'তেই কর্ম্মের জন্ম হয়। ধর্ম্মসমাজের মানুষ-গুলির মধ্যে সারবান্‌ চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন হ'ল জমি; এক এক যুগের তেজস্বী কর্ম্ম হ'ল তার ফসল। সহরের লোকেরা জমি ও তার চাষের ব্যাপারটি চোখে দেখে না, অনেক সময়ে তাকে মনেও রাখে না। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "এবৎসরে দোকানগুলি কেন শূন্য? বাণিজ্য-তরীগুলি কেন চল্‌চে না? কল কেন ঘুর্‌চে না?" তবে তার উত্তর দিতে হয় যে জমিতে উৎপাদিকাশক্তি নাই। তেম্‌নি, ব্রাহ্মসমাজে। "তেজস্বী কর্ম্মী কেন নাই? তেজস্বী কর্ম্মপ্রবাহ কেন নাই?" উত্তর,—জমিতে সার নাই। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের জমিতে সার দেওয়া প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজে এত মানুষ, এতগুলি গৃহ, এতগুলি পরিবার। কোন্‌ গৃহ হ'তে ভগবানের ভবিষ্যৎ তেজস্বী সেবক আবির্ভূত হবেন, কে জানে? সব পরিবারেই সেই সার সঞ্চার করতে হবে, যেন ব্রাহ্মসমাজজমি হ'তে আগামী যুগে আবার সোণার ফসল উৎপন্ন হ'তে পারে।

এ বিষয়ে আমাদের চোখ ফোটা চাই। 'কাজ' 'কাজ' করলেই ব্রাহ্মসমাজের কাজ অগ্রসর হবে না। কাজের ভাল ব্যবস্থা (organisation) করলেও ব্রাহ্মসমাজের কাজ অগ্রসর হবে না। ব্রাহ্মসমাজে কাজের মানুষ আমরা কি দেখে নির্ব্বাচন করব? ব্রাহ্মসমাজের কাজে আমরা কি-রকম মানুষকে চাইব? বক্তৃতায়, প্রচারে, প্রতিবাদীর মতখণ্ডনে, বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায় নানা কাজের ব্যবস্থাবিধানে (organisation এ) পরিপক্ক মানুষ অন্বেষণ করব? না, মানুষটা কেমন, তার personality কেমন, তাই দেখ্‌ব? তাকে মানুষের মধ্যে রাখ্‌লে সে অপরের মধ্যে কি-রকম ভাব কি-রকম প্রভাব বিস্তার করে, তার চরিত্র হ'তে জীবন হ'তে আচরণ হ'তে ব্যবহার হ'তে আর-সকলে কি পায়, তাই দেখ্‌ব? এই শেষোক্ত বস্তুটিই হ'ল personality। কিন্তু, এ বস্তুটি ধীরে জন্মে। কৃষিক্ষেত্রে গিয়ে দেখ, সব কাজ কত ধীরে ধীরে হয়। তেম্‌নি, মানুষের চরিত্র গ'ড়ে ওঠে ধীরে ও নিঃশব্দে; মানুষের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ মধুর ও তেজস্বী personality ফুটে ওঠে ধীরে ও নিঃশব্দে। বিধাতার এই ধীর, নিঃশব্দ, অদৃশ্য, নিগূঢ় প্রণালীতে বিশ্বাস ক'রে, ইহারই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর রেখে, মণ্ডলীতে-মণ্ডলীতে ও পরিবারে-পরিবারে মানবজমিন চাষ করা চাই; মহৎ আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত আত্মোৎসর্গশীল মহাপ্রাণ মানুষ প্রস্তুত করা চাই। মানুষই যেখানে শুষ্ক শীর্ণ ক্ষুদ্র, সেখানে কাজ তেজস্বী কি-ক'রে হবে? আগে মানুষ তৈয়ারী করবার কৃষিক্ষেত্র, তার পরে কর্ম্মক্ষেত্র। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে একটি মানুষ তৈয়ারী করবার বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। তার জন্য বহু আয়োজন চাই। সাধনাশ্রমকে সেইরূপ একটি আয়োজন ব'লে আপনারা দেখ্‌তে পারেন।

তার পর, ব্রাহ্মসমাজে একটি বিশেষ বড় প্রশ্ন এই যে, এখানে ধর্ম্মের দাবী, ধর্ম্মের আহ্বান, অনুকূল কর্ণে গিয়ে পড়ে, না, বধির কর্ণে গিয়ে পড়ে? এখানে ধর্ম্ম ও সংসার, এ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটি কিরূপ? ব্রাহ্মসমাজে আমরা বিশ্বাস করি না যে ধর্ম্ম ও সংসারের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন, অথবা উভয়ের মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ আছে। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে, কে প্রভু ও কে ভৃত্য, ও কে রাজা ও কে প্রজা, কার উপরে কার দাবী প্রভুত্ব ও জোর খাটবে, কে কার কাছে যোড়-হাত থাকবে,— ধর্ম্মসমাজে এ সকল প্রশ্নের কেবল এক প্রকার উত্তর সম্ভব। ধর্ম্মই সংসারের উপরে রাজা ও প্রভু, এবং সংসারের উপরে ধর্ম্মের দাবী ধর্ম্মের ক্ষমতা ও ধর্ম্মের অধিকার অতি স্পষ্ট ভাবে ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়,—এ লক্ষণ যেখানে নাই, সেরূপ একটি মানুষের দল আর যা কিছু হোক্‌, তাহা ধর্ম্মসমাজ কখনও নয়।

রাজার রাজত্ব ব্যর্থ হ'য়ে যায়, যদি সে রাজ্যের লোকেরা তাদের ধন ও জনের উপরে রাজার দাবীটা স্বীকার না করে, যদি রাজা লড়্‌বার জন্য সৈনিক না পান, রাজ্য চালাবার জন্য রাজস্ব না পান। প্রত্যেক রাজ্যে রাজার দাবীটা ঘোষণা কর্‌বার ও আদায় কর্‌বার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি আয়োজন থাকে। ধর্ম্মেরও তেমনি অশেষ দাবী আছে মানব-সমাজের উপরে। মানব-সমাজ সেই দাবী না মান্‌লে, তার বাধ্যতা স্বীকার না কর্‌লে, সংসারে ধর্ম্মের রাজত্ব বজায় থাকে না। সেই রাজরাজেশ্বরের নাম নিয়ে, ধর্ম্ম, মানবসমাজে এসে এই দাবী করেন, "আমার কাজে তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে দিতে হ'বে। Give me your best, ablest, noblest, sweetest, deepest men and women. তোমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা সব চেয়ে প্রতিভাবান্, সব চেয়ে শক্তিমান্, সব চেয়ে উদারমনা, সব চেয়ে মধুরস্বভাব, সব চেয়ে গভীরপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাদের আমি আমার জন্য চাই। এটা আমার ভিক্ষা নয়, এটা আমার দাবী।" কেন ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের এ দাবীটা প্রবল কণ্ঠে তার সংসারী মানুষদের কাছে বল্‌তে পার্‌চেন না? ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম আজও কেন সংসারের কাছে ভিক্ষুকের বেশে দাঁড়িয়ে আছেন? ব্রাহ্মসমাজ তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে ধর্ম্মের কাজে দিতে কি বাধ্য নন, দায়ী নন? ব্রাহ্মসমাজ তার তৃতীয় শ্রেণীর মানুষগুলিকে ধর্ম্মের কাজে অবতীর্ণ কর্‌বেন, ও অনুগ্রহ ক'রে তাদের কোনও রকমে বস্তু রক্ষার আয়োজন কর্‌বেন, এই কি ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের মনের ভাব (attitude) হওয়া উচিত? শাস্ত্রী মহাশয় এক সময়ে সাধনাশ্রমের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কাছে ধর্ম্মের এই দাবীটি তেজের সঙ্গে ঘোষণা ক'রেছিলেন। তাঁর সেই যুগের অগ্নিময় উপদেশ আমাদের অনেকের প্রাণে এখনও ধ্বনিত হ'চ্চে। নব শতাব্দীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, বল ব্রাহ্মসমাজ, তোমার ধর্ম্মকে কি সংসারের দ্বারে ভিক্ষুকের বেশে দীনসাজেই চিরকাল দণ্ডায়মান রাখবে? ব্রাহ্মসমাজে সাহসপূর্ণ কর্ম্মকল্পনা নাই কেন? বৃহৎ কর্ম্মোদ্যোগ নাই কেন? গত বৎসর মাঘোৎসবের পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয়া হেমলতা সরকার মহাশয়া, পশ্চিম ভ্রমণ ক'রে ফিরে এসেছিলেন। তিনি নানা স্থানে আর্য্যসমাজ, বিবেকানন্দ সম্প্রদায়, ও রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের কাজ কর্ম্ম দেখে এসে আমাকে বলেছিলেন, "দেখে এলাম, দেশময় সব সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠান-সকল ও সেবার উদ্যোগসকল বিশাল ও তেজস্বী; কিন্তু এত বড় বিস্তৃত দেশে ব্রাহ্মসমাজের যেন কোন নাম, কোন চিহ্ন নাই।" এ কথা তো আমাদের জানাই ছিল। কিন্তু হেমদিদির সঙ্গে ঐ আলোচনার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত গভীর ক্ষোভে আমার অন্তর জর্জ্জরিত হ'য়ে র'য়েছিল। ভাবছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ তেমন হবে কোথা হ'তে? ঐ সকল সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ধর্ম্মটাই তাদের রাজা, তাদের প্রভু। তাদের ধর্ম্মই সব গৃহীদের, চাকুরে কি ডাক্তার কি উকীল কি বণিক, সকলেরই, তনু মন্ ধনের মালিক। তারা জানে, ধর্ম্মের কাজের জন্য যে দাবী আস্‌বে, তা দিতেই হ'বে। ধর্ম্মের কাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে নামাতেই হবে। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবসা বাণিজ্যের চেয়েও অধিক আর্থিক সচ্ছলতার অবস্থায় রাখ্‌তেই হবে। তাদের মধ্যে ধর্ম্মের কাছে সংসার যোড়-হাতে দণ্ডায়মান। ধর্ম্মের দিক থেকে, টাকা খসাবার জন্য বা খেটে দিবার জন্য কোন আহ্বান এলে, তারা তাতে নিজেদের ধন্য ব'লে অনুভব করে। তাদের কাছে ধার্ম্মিক জনের প্রসন্নতালাভ সম্রাটের অনুগ্রহলাভের চেয়েও বেশী মূল্যবান্। আর ব্রাহ্মের কাছে তার ধর্ম্মটা, তার পায়ের তলার অনুগ্রহপ্রার্থী ভিখারীর মত। "দয়া ক'রে এক টাকা চাঁদা দিই, তাই ঢের," এই যেন ব্রাহ্মের ভাব। ছি ছি! ধিক্ ধিক্! ধর্ম্মের সংশ্রবে 'চাঁদা' কথাটি উচ্চারিত হ'তে শুনলেও মন গ্লানিতে পূর্ণ হয়। 'চাঁদা' আবার কি কথা? ধর্ম্মকে কি তোমার দ্বারে উপস্থিত দয়ার পাত্র ভিখারীর মতন মনে কর, যে, ধর্ম্মের সংশ্রবে 'চাঁদা' কথাটির উল্লেখ কর? তোমার সর্ব্বস্বের উপরে যার অধিকার, তাকে তুমি 'ভিক্ষা' বা 'চাঁদা' দিবার স্পর্দ্ধা কর? এই যেখানে অধিকাংশ মানুষের মনের অবস্থা, ধর্ম্ম যেখানে সংসারের দ্বারে হাত যোড় ক'রে ভয়ভীত মুষ্টিভিক্ষার কাঙ্গালের মত দাঁড়িয়ে থাকে, সে সম্প্রদায়ের কর্ম্মকল্পনায় সাহসই বা কোথা হ'তে আস্‌বে, কর্ম্মোদ্যোগ বৃহৎই বা কি ক'রে হ'বে? হে ব্রাহ্ম, তুমি কি চাও যে আগামী যুগে ব্রাহ্মসমাজের কাজ বৃহৎ ও তেজস্বী হোক্? তবে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম হ'তে এই ভিক্ষুকের ভাবটি ঘুচাও। ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মকে রাজার সম্মান, রাজার অধিকার দাও। যে-সকল সম্প্রদায়কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্‌চ, তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে শিক্ষা লও। ব্রাহ্মসমাজে তাদের তুলনায় ধন জন শিক্ষা প্রতিভা শক্তি সবই অধিক আছে; কিন্তু ধর্ম্মের দাবী এখানে কারও উপরে খাটে না, তাই ব্রাহ্মসমাজ এত দরিদ্র ও দুর্ব্বল। ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম ভিক্ষুক, সংসারই প্রভু ও রাজা, তাই ব্রাহ্মসমাজের এই অবস্থা। ছি ছি! সে ধর্ম্ম-সমাজের কি কখনও কল্যাণ হ'তে পারে, যেখানে ধর্ম্ম সংসারের কাছে রাজার বেশে আস্‌তে পান না, অনুগ্রহপ্রার্থী ভিখারীর বেশে সংসারের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বাধ্য হন? আগামী যুগে যদি ব্রাহ্মসমাজকে অধঃপতন হ'তে রক্ষা কর্‌তে হয়, তবে এই স্রোত ফিরাতেই হবে। সেই রাজরাজেশ্বরের দাবীটা নিজে স্বীকার কর্‌বার ও সংসারকে স্বীকার করাবার জন্য এক দল মানুষকে দাঁড়াতেই হবে। কে সেই মানুষ হবে, বল! সাধনা-শ্রমের ভাইবোন্, সেই দাবী জীবন দিয়ে স্বীকার কর। নিয়ে এস জীবন, শ্রেষ্ঠ জীবন, কর্ম্মঠ জীবন, সংসার যার খুব বেশী বেশী দাম দেয়, এমন সব জীবন। এমন জীবন দাও, এমন জীবন টেনে আনো। অজস্র ভাল ভাল মানুষ এবং অজস্র ধন চান সেই রাজরাজেশ্বর নিজের কাজের জন্য! তাঁর সেই দাবী ব্রাহ্মসমাজে ঘোষণা কর্‌বার জন্য ও আদায় কর্‌বার জন্য অনেক আয়োজন চাই। আপনারা সাধনাশ্রমকে সেইরূপ একটি আয়োজন ব'লে দেখ্‌তে পারেন।

ধর্ম্ম ও সংসার এ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক রাখ্‌তে হ'লে আরও একটি কথা ভাব্‌বার দরকার হয়। যখন কোনও ধর্ম্ম-সমাজে সমতার অবস্থা থাকে, তখন স্বভাবতঃ তার ধর্ম্মপ্রাণ ও চরিত্রবান মানুষগুলির প্রভাব ও প্রতিপত্তিই তাহার মধ্যে

সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল থাকে। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যাঁদের সম্বন্ধ একান্তভাবে ধর্ম্মেরই সম্বন্ধ,—যাঁদের জীবন উপাসনার হাওয়ায়, আত্মপরীক্ষা আত্মদৃষ্টি অনুতাপ ও ব্যাকুলতার হাওয়ায় গঠিত, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যাঁদের মনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরদ, তাঁরাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পুরুষ হবেন, ইহাই স্বাভাবিক। ধনী নহেন, পদস্থ মানুষ নহেন, পণ্ডিত নহেন, বাগ্মী নহেন, দেশের সম্মুখে যিনি নাম ক'রেছেন তিনি নহেন, যিনি খুব ভাল ক'রে কাজের ব্যবস্থা করতে কি দল বাঁধতে পারেন, তিনিও নহেন,—কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ, চরিত্রবান্, আত্মোৎসর্গশীল ও ব্যাকুলাত্মা মানুষেরাই ব্রাহ্মসমাজে প্রাধান্য লাভ করবেন, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাবশে নানা কারণে মাঝে মাঝে ইহার ব্যতিক্রম ঘট্‌তে পারে। সময় সময় ব্রাহ্মসমাজকে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়্‌তে হয়; তখন ইহার যোদ্ধৃপ্রকৃতির মানুষগুলি ইহার প্রথম পংক্তিতে গিয়ে সজ্জিত হন। কখনও প্রতিবাদীর উত্তর দিবার প্রয়োজন হয়, তখন ইহার তার্কিক ও বাগ্মীরা সেই কাজের প্রধান ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু কোনও সুস্থ ধর্ম্মসমাজ অধিক দিন এ অবস্থায় থাক্‌তে পারে না। অচিরে তাহাকে আবার নিজের শক্তিসকলকে সাম্যাবস্থায় নিয়ে আস্‌তে হয়; নিজের forces re-adjust কর্‌তে হয়; ধর্ম্মপ্রাণ মানুষদের আবার প্রথম পংক্তিতে নিয়ে বসাতে হয়।

মানুষের শরীরে কখনও হাত দুখানি বেশী খাটে, কখনও পা দুটি বেশী খাটে, কখনও মাথা বেশী খাটে, কখনও বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেশী হয়। এই সকল কাজের দরুণ শরীরের রসরক্ত ক্ষণকালের জন্য সেই সেই অঙ্গে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হ'য়ে যায়, অথবা কোন কোন পেশী অধিক শ্রান্ত হ'য়ে ওঠে। এই অসমতার অবস্থা দূর ক'রে সমগ্র শরীরের রসরক্তকে আবার সমতার অবস্থায় আন্‌তে সাহায্য করে, শরীরের কতকগুলি glands। তেমনি, সকল প্রকার সাময়িক আন্দোলন ও উত্তেজনার পরে, ধর্ম্মসমাজকে নিজের সমতার অবস্থায় দ্রুত ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য তাহার মধ্যে নানা আয়োজন বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়।

সাধারণ অবস্থায় ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের প্রাধান্য, এবং সাময়িক পরিবর্ত্তনের পরে সেই প্রাধান্যের দ্রুত পুনরাবর্ত্তন, ইহাই ধর্ম্ম-সমাজের স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। ঈশ্বরের শক্তি ব্রাহ্মসমাজে কাজ কর্‌চে কি না, তার একটি বড় পরীক্ষা এখানে, যে এতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও প্রধান কারা হ'য়ে ওঠে। ধর্ম্মই সংসারকে অনুপ্রাণিত করবেন, সাংসারিকতা ধর্ম্মপ্রাণতার উপরে প্রভুত্ব করবে না,—ইহাই ধর্ম্মসমাজের সুস্থ অবস্থা। সাংসারিকতা যদি কখনও ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হ'য়ে দাঁড়ায়, সংসারে ধর্ম্মের ও নীতির স্থান যে সর্ব্বোচ্চে, ইহা যদি সংসারের মানুষ কোনও দিন স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়, তখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই বাধা অপসারিত করবার জন্য, প্রয়োজন হ'লে তাকে চূর্ণ কর্‌বার জন্য, ধর্ম্মসমাজে একটি প্রবল শক্তি থাকা আবশ্যক হয়। যে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ রাজভক্ত, সে দেশেও যেমন সৈনিকের ও দুর্গের প্রয়োজন থাকে, ধর্ম্মসমাজের এ প্রয়োজনটিও সেইরূপ। ব্রাহ্মসমাজের এই প্রয়োজনসাধনের নানা আয়োজনের মধ্যে সাধনাশ্রমকে একটি আয়োজন ব'লে আপনারা দর্শন ক'র্‌তে পারেন।

আগামী যুগে আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মমণ্ডলীর ভাবটিকে আরও উজ্জ্বল ক'রে তুল্‌তে হ'বে ও সকল সাধনাদলকে আরো ভাল ক'রে একত্র করতে হবে। ধর্ম্মজীবনের ও উন্নত চরিত্রের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের জমিতে সেই উর্ব্বরতা ভাল ক'রে সঞ্চার করতে হ'বে, যাতে কালে কালে ইহাতে তেজস্বী কর্ম্মীর ও সতেজ কর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। ব্রাহ্মসমাজের ধন, জন ও প্রতিভার উপরে রাজরাজেশ্বরের দাবী ঘোষণা ক'রে, এবং সে দাবী আদায় ক'রে, ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম-কল্পনাকে কর্ম্মোদ্যোগকে শতগুণ বর্দ্ধিত করতে হবে। ব্রাহ্ম-সমাজে যাহাতে ধর্ম্মের পক্ষটি সর্ব্বদা প্রবলতম থাকে; তার জন্য ইহাতে নানা শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি করতে হবে।—এই সমুদয় কার্য্যেই সাধনাশ্রমের গুরুতর দায়িত্ব র'য়েছে। ভগবান্ অতীত যুগে ইহাকে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের যে কাজ করিয়েছেন, তিনি তাঁর যে অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ ক'রে এর মধ্য দিয়ে কতকগুলি জীবনকে তাঁর সেবাতে টেনে এনেছেন, আমরা তাঁর সেই করুণা স্মরণ ক'রে আশাপূর্ণ অন্তরে ভবিষ্যতের দিকে তাকাই। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি সাধনাশ্রমের প্রত্যেকটি মানুষকে ইহার আদর্শের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এবং সে আদর্শের জন্য নিজ নিজ জীবন মন উৎসর্গ করতে সমর্থ করুন।

হে ব্রাহ্মসমাজের প্রভু, ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে তোমার কত করুণা তুমি প্রকাশ ক'রেছ! ব্রাহ্মসমাজের একখানি হাত যে সাধনাশ্রম, তার মধ্য দিয়ে তোমার কত করুণা তুমি প্রকাশিত ক'রেছ! আমাদের মধ্যে আরও আত্মোৎসর্গের ভাব দাও, আরও নিষ্ঠা দাও, আরও দৃঢ়তা দাও, আত্মদৃষ্টি দাও, দীনতা দাও। হে দেব, তোমার কার্য্যে ব্যবহৃত হ'বার মহান্ গৌরবের উপযুক্ত আমাদের কর। তোমার মহাপ্রাণ বিশ্বাসী আত্মোৎসর্গশীল সেবকদের উপযুক্ত অনুবর্ত্তী আমাদিগকে কর। তোমার আদর্শ ইহার মধ্যে জয়যুক্ত হউক, তোমার শক্তি ইহার জীবনে সতেজে কার্য্য করুক।

অনন্তর কিছু সময় সংকীর্ত্তন হয় ও শ্রীমতী সরলা দেব একটি প্রার্থনা করেন।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় "প্রচার" বিষয়ে আলোচনা; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার সভাপতির কার্য্য করেন। মিঃ সুব্বা-কৃষ্ণায়া, ভাই সীতারাম, শ্রীযুক্ত বজ্রবাহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস, মালিয়াট হইতে আগত দুইটি বন্ধু, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় ও সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নানা কথা বলেন।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" এই বিষয়ে একটি বহু তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) শুক্রবার— প্রাতঃকালে উপাসনা। শ্রীমতী সুশীলা বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

জগৎপিতা জগদীশ্বর আমাদের সকলের—জগদ্বাসী সকলের—একমাত্র উপাস্য, আমরা সকলে তাঁহার উপাসক। তিনিই আমাদের প্রত্যেকের রক্ষাকর্ত্তা, বিধাতা, জীবনদাতা ও প্রভু, আমরা তাঁহার সন্তান, সেবক সেবিকা, দাস দাসী; আমাদের আর অন্য কোনও আশ্রয় বা অবলম্বন নাই। আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক সকল কল্যাণের মূল তাঁহার অনন্ত অসীম প্রেম ও মঙ্গল ইচ্ছা। কায়মনোপ্রাণে তাঁহার ইচ্ছাপালন—ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক এবং জাগতিক সকল ঘটনা ও অবস্থায় তাঁহার বিধি অনুসরণ—করাই, তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই, তাঁহার পূজা। এই পূজা জগদ্বাসী ইহপরলোকবাসী সকল আত্মার সহিত মিলিত হইয়া, একহৃদয় হইয়া, করিবার জন্যই ব্রহ্মোৎসব—মাঘোৎসবের আয়োজন। তাঁহাতে সর্ব্ব-হৃদয় মিলিত হইয়া একমনে এক-প্রাণে তাঁহার পূজা এবং প্রিয়কার্য্যসাধন করিব, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ বার্ত্তা। তিনি আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁহার অনন্ত প্রেম অন্তরে ও বাহিরে, তাঁহার সৃষ্টিকৌশলে, তাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতন নূতন তত্ত্ব, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও শক্তিতে, যেমন প্রসারিত রাখিয়াছেন, জীবন্ত বিকাশশীল ও ক্রিয়াশীল অবস্থায় রক্ষা করিয়াছেন ও করিতে-ছেন, আমরাও ঠিক তদ্রূপ বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত শরণাগত

হইয়া তাহা গ্রহণ করিব, ইহাই আমাদের ধর্ম্ম, উদ্দেশ্য, আশা ও লক্ষ্য। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হইতে পুরাতন সকল আচার্য্য, ব্রহ্মের সেবক, ভক্ত মহাজনগণ তাঁহাদের জীবন বাক্য ও চিন্তা দ্বারা এই ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিয়াছেন, এই ধর্ম্মের—বিশ্বজনীন ধর্ম্মের—বার্ত্তা বহন করিয়া আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের উদার বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই আদর্শের সহিত নিজেদের জীবন তুলনা করিয়া লজ্জায় ধূলির সহিত মিশিয়া যাইতেছি। এই লজ্জা ও ধিক্কারের সহিত হৃদয়ে অনুভব করিতেছি যে, এই আদর্শকে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত মন প্রাণের সহিত চেষ্টিত না হইলে, আমাদের কাহারও কল্যাণ আনন্দ শান্তি ও শক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। সকল দেশের সকল জাতির সাধু ভক্ত মহাজনগণ তাঁহাদের সমস্ত হৃদয়ের প্রাণ-ঢালা ব্রহ্মভক্তি অনুরাগ বিশ্বাস বৈরাগ্য ত্যাগ আত্মসমর্পণ ও আত্মবিসর্জ্জন দ্বারাও আমাদিগকে তাঁহাদের সেবা ও ভক্তির পথে আনয়ন করিতে পারিতেছেন না। কারণ, আর কাহারও সে শক্তি নাই, একমাত্র ব্রহ্মেরই সেই শক্তি আছে। আমরা দীন হীন অধম পাপী তাপী অবিশ্বাসী হই আর যাহাই হই, আমরা তাঁহার সন্তান, স্বাধীনভাবে স্বইচ্ছায় তাঁহার অনুগত হইব, সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইব, জানিব, পাইব, ইহাই তিনি চান। আমাদের উদ্ধত বিদ্রোহভাবকে পরাজিত করিবার জন্য তিনি আমাদের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, অপমান লাঞ্ছনার মধ্যে যে পথ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা আমরা কবে দেখিব, কবে অনুসরণ করিব, সেই জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা জ্ঞান প্রেম, ধন ঐশ্বর্য্য, যশ প্রতিপত্তি যাহা লাভের জন্যই ধাবিত হই না কেন, তাহাতে দৈন্য ও রিক্ততা কেবল বর্দ্ধিতই হইবে এবং হইতেছে। আমাদের জীবন পরিবার সমাজ এবং দেশের সকল প্রকার কল্যাণচেষ্টা এই দৈন্যই উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিতেছে। আমরা যে তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া নিজের জ্ঞান বুদ্ধি চেষ্টা ও কৌশল দ্বারা মিলন ও শান্তি, শক্তি ও ভক্তি লাভ করিতে পারি না, এই সত্য আমাদের জীবন পরিবার সমাজ ও আচার অনুষ্ঠান দ্বারা প্রচারিত হইতেছে। সত্যের প্রচার অবশ্যম্ভাবী,—আমরা যাহা তাহাই প্রকাশিত হইবে। ইহাতেই মঙ্গল এবং ইহার মধ্যে তাঁহার করুণাই দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার ন্যায় ও ধর্ম্ম এমনই সূক্ষ্ম ও অনতিক্রমণীয় যে, আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াও স্বেচ্ছাচারিতার পথ হইতে আমাদিগকে আনুগত্যের পথে আনিতে, তাঁহার এই প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যের অগণিত মানবকে তাঁহার ইচ্ছানুসরণ করিতে বাধ্য করিতে, একটুও ভুল হয় না। ইহাই আমাদের আশা। সুসন্তান না হইলেও এক দিন আমাদিগকে সুসন্তানই হইতে হইবে, ইহাই তাঁহার বিধি। তিনি আমাদের ইহপরলোকবাসী প্রতি আত্মার বিচিত্র গঠন, বিচিত্র শক্তি ও অভিরুচি দ্বারা তাঁহার এক মহা মানবত্ব, এক বিরাট সন্তানত্বের আদর্শ পূর্ণ করিতে চান। জগতের সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত যত সাধু ভক্ত মহাজনগণ তাঁহাদের সন্তানত্বের সুমহৎ সৌন্দর্য্যে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ভাবের সহিত ক্ষুদ্র দীন হীন মলিন আমরা মিলিত হইতে না পারাতে তাঁহারাও প্রভুর ইচ্ছার পূর্ণতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সকল সন্তান স্রষ্টার যে বিশেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সৃষ্ট হইয়াছে, এক হইয়া যে বিরাট পূজা করিবে, তাহা আজ পর্য্যন্তও পূর্ণ হয় নাই—কবে হইবে তাহা জানি না, কিন্তু এক দিন অবশ্যই পূর্ণ হইবে, সকলে প্রাণব্রহ্মকে পাইবে।

"সবে এক হ'লে প্রাণব্রহ্ম পাবে,
বিয়োগ হ'লে মৃত্যু সার"

ভক্তের এই যে ভাব-সংগীত ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যতই বিজ্ঞানের নানা আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা আমরা সভ্যতার গর্ব্ব করি না, আমরা যখন সকলে এক হই নাই, তখন আমাদের মৃত্যুই সার। আমাদের জন্য রাষ্ট্র সমাজ পরিবার দেশ সব মৃত্যুর করাল ছায়াই প্রদর্শন করিতেছে, অনৈক্য বিচ্ছেদ দ্বেষ হিংসা অত্যাচার দ্বারা মৃত্যুর নানারূপই প্রকাশ করিতেছে। এক জনকে বাদ দিয়াও তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই। জ্ঞানীর পুঞ্জ জ্ঞানে জগতের কত জনের হৃদয়ের জমাট অজ্ঞানতা একটুও অপসারিত করিয়া অজ্ঞানতার মৃত্যু হইতে জগতকে এবং নিজকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। ধনীর উত্তুঙ্গ প্রাসাদাবলী ও অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও কত নিরাশ্রয় রুগ্ন গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন মানব-সন্তান কত দুঃখ ক্লেশ পাইতেছে! ইহা কি ধনী ও দরিদ্র উভয়ের পক্ষেই মৃত্যু নহে? কত সাধু ভক্ত মহাত্মা আপনার প্রেমভক্তিতে আত্মহারা হইয়া জগতের পাপী তাপীর কথা ভুলিয়া রহিয়াছেন! ইহাও কি সাধু ও পাপী উভয়ের পক্ষেই মৃত্যু নহে?

আমাদের ধর্ম্মের এই বার্ত্তা যে, জগতের ইহপরলোকবাসী সকল আত্মার সহিত এক হইতে হইবে—কাহাকেও তুচ্ছ করিলে বা বাদ দিলে চলিবে না। অথচ, আমরা মাতাপিতার সহিত পুত্র কন্যা, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা ভগিনী, সমাজস্থ সকলের সহিত একপ্রাণ হইতে পারিতেছি না! জগতে আমাদের ধর্ম্মের বার্ত্তা কি করিয়া বহন করিয়া চলিব? কি করিয়া প্রভুর অভিপ্রেত সেই বিরাট মহাপূজার যে যে ভার যাহার উপর প্রকৃতির বিশেষত্ব দ্বারাই, তিনি অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সংসাধন করিব?

তাঁহার অনুগত হইয়া চলিলে যে ভাবে তাঁহার মহা অভি-প্রায়—যাহা প্রত্যেক মানবের বিশেষত্বের কারণ—সাধন করিতে পারিতাম, তাহা অবশ্য এখন আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে না। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া চলিলেও আমরা আমাদের বিশেষত্বের বিনাশ ক'রতে পারি নাই। আমাদের বিশেষত্বপূর্ণ গুণ না থাকুক, দোষও যে বিশেষত্বপূর্ণ, তাহাতে ভুল নাই। আমাদের দোষ বিভিন্ন রকমের এবং তাহাদ্বারাই আমাদের অন্তর্যামী পরমেশ্বর দোষ সংশোধন করিবার বিশেষ বিশেষ উপায় ধরাইয়া দিতেছেন। তাঁহার অনন্ত প্রেমদৃষ্টি আমাদের প্রত্যেকের বিশেষত্বপূর্ণ দোষ, অপরাধ, অজ্ঞতা ধরাইবার জন্য প্রত্যেকের বিশেষত্বপূর্ণ দোষদ্বারা সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছার পথে চলিলে যেমন ঘাটে ঘাটে মিলিয়া আমরা পূর্ণ একত্ব, পূর্ণ মানবত্ব—সন্তানত্ব—লাভ করিতাম, তেমন প্রত্যেকের দোষ ত্রুটির জন্য প্রত্যেকে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাইব যে, দোষ সম্বন্ধে এইরূপ ঘাটে ঘাটে মিলিত হইবার বিশেষত্ব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সত্য সত্য বর্ত্তমান থাকিয়া আমা-দিগকে তাঁহার পূর্ণ সন্তানত্বের পথে লইয়া যাইতেছে। আমরা যে জন্য তাঁহার হইতে পারিতেছি না, ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার বিশ্ব-জনীন সার্ব্বভৌমিক বার্ত্তা বহন করিবার উপযুক্ত হইতেছি না, তাহার কারণ আমাদের মধ্যে সত্য সত্যই রহিয়াছে। ভাব বা কল্পনা দ্বারা তাহা উড়াইয়া দিবার শক্তি আমাদের নাই। কারণ, মিলিত হইবার প্রকৃত অন্তরায়, পূজার বাধা, তাহার মধ্যেই রহিয়াছে। আত্মদৃষ্টিদ্বারা আত্মসংশোধনে নিযুক্ত হইলে, এই যে আমরা কিছু নই এই আমরাও, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য পাইয়া ও দিয়া, এক হইতে পারিব, উন্নত ও বিকসিত হইতে পারিব, প্রাণব্রহ্মকে পাইয়া মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইব। প্রাণব্রহ্মই আমাদের জীবন; তাই তাঁহাকে বাদ দিয়া আমরা যদি জ্ঞান প্রেম ধন ও শক্তি উপার্জ্জন করি, তবে সে জ্ঞান জ্ঞান নয়, সে ধন ধন নয়, সে শক্তি শক্তি নয়। তিনি আমাদের প্রাণ; উচ্চ নীচ, সাধু ভক্ত, পাপী তাপী, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, আমরা সকলে তাঁহার অঙ্গ; তাঁহাতেই আমরা জীবিত বর্দ্ধিত উৎসাহিত ও আশান্বিত, আর অন্য ভরসা আমাদের কিছুই নাই! তাঁহার হইয়া তাঁহার পূজা করিব, সেবা করিব, সকলে মিলিয়া সব বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছাপালন করিব, মহোৎসবের করুণাধারাতে এই ইচ্ছা তিনি জানাইলেন। তিনি দয়া করুন

আমরা যে নিজেরা কিছু নই তাহা জানিয়া, দীন হীন হইয়া, তাঁহার শরণাগত হইয়া থাকি। আমাদের দোষ ত্রুটি, তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ ভাব, সবই তিনি জানেন। তিনি যে ভাবে তাঁহার করিতে চান, দ্বিধা না করিয়া এবার হইতে তাহা পালন করিয়া, তাঁহারই ইচ্ছা জয়যুক্ত করি। তাঁহারই অনুগত হই। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তাঁহার করুণার জয় হউক।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় "ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি" সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

৪ ঘটিকার সময় মেরী কার্পেণ্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অনুপস্থিত কালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন এবং শ্রীমতী উর্ম্মিলা চক্রবর্ত্তী পুরস্কার বিতরণ করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বালকবালিকাদিগকে কিছু উপদেশ দেন ও বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে নানা পরামর্শ প্রদান করিয়া বক্তৃতা করেন এবং পুস্তক খরিদের জন্য সকলের নিকট চাঁদা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহারা প্রত্যেকে ১০৲ টাকা চাঁদা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। শ্রীযুক্ত বনমালা গোস্বামী পিতার স্মরণার্থ ১১৲ টাকা প্রদান করেন। এই ভাবে প্রায় ১০০৲ টাকা সেই স্থানেই সংগৃহীত ও প্রতিশ্রুত হয়। বালকবালিকা-দিগের আবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া কার্য্য শেষ হয়।

সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মধাম" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

ব্রাহ্মসমাজ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব—মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপার করুণায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। আগামী ইষ্টারের ছুটির সময় এই উপলক্ষে বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকলকে এই দিনের স্মৃতিতে হৃদয়ের প্রীতি অর্পণ করিতেছেন এবং এই পবিত্র ব্রহ্মোৎসবে সকলের শুভ কামনা ও সাহচর্য্য প্রার্থনা করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই পঞ্চাশ বৎসরে সকলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ভগবানের করুণার কত পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার প্রেমের কত লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন! আজ তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার দিন; আজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তাঁহার প্রেমের সাক্ষ্য দিবার দিন। এই উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। সকলে সপরিবারে ও সবান্ধবে এই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিয়া ভগবানের করুণার সাক্ষ্য দিবেন, এবং তাঁহাদিগের প্রেম ও ভক্তির দ্বারা উৎসব সফল করিবেন, ইহাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিনীত নিবেদন। নিম্নে উৎসবের কার্য্য-সূচী প্রদত্ত হইল।

কার্য্য-সূচী।

৫ই এপ্রিল, (২৩শে চৈত্র) বৃহস্পতিবার—সায়াহ্ন ৬-৪৫—উৎসবের উদ্বোধন।

৬ই „ (২৪শে চৈত্র) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন। ৭ ঘটিকায় উপাসনা। উপাসনান্তে "জীবনে ভগবানের করুণার সাক্ষ্য" বিষয়ে আলোচনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় সভ্য-গণের সম্মিলন। আলোচ্য বিষয়—"ব্রাহ্ম-সমাজের শক্তিবৃদ্ধি।" সায়াহ্ন ৬-৪৫—বক্তৃতা।

৭ই „ (২৫শে চৈত্র) শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন। ৭ ঘটিকায় যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। দ্বিপ্রহরে যুবকদিগের সম্মিলন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বালকবালিকা-সম্মিলন। সায়াহ্ন ৬-৪৫—বক্তৃতা।

৮ই „ (২৬শে চৈত্র) রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উষা কীর্ত্তন। ৭ ঘটিকায় উপাসনা। তৎপরে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রার্থনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় মহিলাদিগের সম্মিলন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন। সায়াহ্ন ৬-৪৫—উপাসনা।

৯ই „ (২৭শে চৈত্র) সোমবার—প্রাতে ৯ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত উদ্যান-সম্মিলন। সায়াহ্ন ৬-৪৫—উপাসনা।

মফঃস্বল হইতে আগত অতিথিদিগের বাস ও আহারের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১লা মার্চ্চ বারাণসী নগরীতে বাবু ভূতি নাথ বসু ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একজন নিয়মিত উপাসক ও ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধু ছিলেন।

বিগত ২রা মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার ললিনী-কুমার দত্ত নিয়োমোনিয়া রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে হইয়াছিল।

বিগত ৩রা মার্চ্চ ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন নিয়মিত উপাসক ছিলেন ও মৃত্যুর কয়েক-দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটি অর্গ্যান বাদ্যযন্ত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

বিগত ৫ই মার্চ্চ বহরমপুর নগরীতে শরৎ সিংহ হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব অপেক্ষাও চরিত্র-মাধুরীর জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বিগত ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে মিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় অল্প কয়েকদিনের অসুখে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। উচ্চপদগৌরবসত্বেও তাঁহার মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বিগত ৪ঠা মার্চ্চ পরলোকগত বাবু প্রেমরঞ্জন মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস শাস্ত্র পাঠ করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ২৫৲ ও বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—গত ৮ই মার্চ্চ লাহোর নগরীতে শ্রীযুক্ত

বিনোদবিহারী সরকারের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া ইলা ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ দত্তের পুত্র শ্রীমান তাপসকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের—মিশন ফণ্ডে ২৲, সাধারণ ফণ্ডে—২৲, এবং শিবনাথ স্মৃতিমন্দির ফণ্ডে—১৲, দান করিয়াছেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

আগামী ইষ্টারের ছুটিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে। তদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বালক-বালিকাদের মধ্যে রচনার প্রতিযোগিতা হইবে। চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসর বয়সের বালক বালিকাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইবে :—

"ব্রাহ্মসমাজ এ দেশের জন্য কি করিয়াছেন ?"

চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন কথা" সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইবে।

প্রথম বিষয় সম্বন্ধে রচনা লেখক ও লেখিকাদের মধ্যে যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাহাদিগকে দুইটি রৌপ্য পদক এবং যিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে রচনা লেখক ও লেখিকাদিগকেও এইরূপ দুইটি রৌপ্য পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই দুইটি রচনাতে যাঁহারা প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের রচনা, উৎসব উপলক্ষে যেদিন বালকবালিকা-সম্মিলন হইবে, সেদিন পাঠ করা হইবে।

বালকবালিকা-সম্মিলনের দিন ছোট ও বড় বালিকবালিকা-দিগের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা আবৃত্তির প্রতি-যোগিতা হইবে।

চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদের আবৃত্তির জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "ভাইবোন" কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হইবে।

চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের বালক বালিকাদের জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "উৎসর্গ" নামক কবিতা (৩য় ও ৪র্থ stanza বাদ) আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হইবে।

এই আবৃত্তির প্রতিযোগিতাতেও বড় ও ছোটদের মধ্যে প্রথম দুই জনকে দুইটি রৌপ্য পদক এবং দ্বিতীয় দুই জনকে দুইটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। আগামী ৩১ মার্চ্চের মধ্যে বালক বালিকাগণ তাঁহাদের রচনা নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানায় পাঠাইবেন। তৎপরে আর কোন রচনা গৃহীত হইবে না।

"শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।" মোড়কের উপর "রচনা প্রতিযোগিতা" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে।

রচনা ফুলস্‌ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে এবং ১২০০ শব্দের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুবর্ণ সাম্বৎসরিক

১৩৩৫ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৯২৮, মে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হইবে। এই সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে স্কুল কলেজসমূহ গ্রীষ্মাবকাশের নিমিত্ত বন্ধ থাকে। সেই সময় কলিকাতা হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপক প্রভৃতি স্থানান্তরে গমন করেন। সে নিমিত্ত উক্ত সময় উৎসবের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ইষ্টারের ছুটীর সময় এপ্রিল মাসের ৫ই হইতে ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত উৎসব সম্পন্ন হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। উৎসবের কয়েক দিন প্রত্যহ মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা, কয়েক দিন উষাকীর্ত্তন, এক দিন কলিকাতা মহানগরীতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন, দুইটী বিশেষ বক্তৃতা, দুই দিন ব্রাহ্মসম্মিলনী, এক দিন মহিলাদিগের ও একদিন যুবকদিগের বিশেষ উৎসব, একদিন বালক বালিকাসম্মিলন ও এক দিন উদ্যান-সম্মিলন হইবে। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় প্রচারক ও পরিচারকগণ মিলিত হইবেন এবং মফঃস্বলবাসী সমুদয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণকে উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করা হইবে। তাঁহাদিগের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হইবে। উৎসব উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকার একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরলোকগত নেতৃবৃন্দের ছবি, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত একখানি পুস্তক (Album) মুদ্রিত করা হইবে। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রসারের নিমিত্ত একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনেরও চেষ্টা করা হইবে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আনুমানিক ৩০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই অর্থসংগ্রহ ও উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি-দিগকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটী সম্প্রতি তাঁহাদিগের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা উক্ত কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্য ও সহানুভূতিকারি-গণের বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, সকলে সমবেত চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এই মহোৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। এই নিমিত্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক যিনি যে অর্থ দান করিবেন তাহা ২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, অথবা ২৮বি, নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন অথবা ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কমিটীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করিবেন।

আর ভেঙ্কট রত্নম্ নাইডু—মাদ্রাজ, দ্বি বি ত্রিবেদী—বোম্বাই, এ গোপালন্—কালিকাট, শ্রীবিশ্বনাথ কর—কটক, শ্রীব্রজবিহারীলাল—পাটনা, পি কে রায়—কলিকাতা, শ্রীনেপালচন্দ্র রায়—ঢাকা, শ্রীসতীশরঞ্জন দাস—দিল্লী, রঘুনাথ সহায়—লাহোর, জে আর দাস—রেঙ্গুন, শ্রীশ্রীনাথ চন্দ—ময়মনসিংহ, শ্রীঅতুলানন্দ দাস—ডিব্রুগড়, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী—বরিশাল, শ্রীঅবলা বসু, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীশশিভূষণ দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কলিকাতা, শ্রীব্রজসুন্দর রায় (সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ) শ্রীঅন্নদাচরণ সেন ও শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কমিটীর সম্পাদক)

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১২ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫০ম ভাগ। ২৪ম সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৪, ১৮৪৯ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯
29th March, 1928.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তোমার অনন্ত কালপ্রবাহে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, চলিয়া যাইতেছে। তোমার কৃপায় প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তোমার প্রেমের অপূর্ব্ব দান লইয়াই আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়, আমাদিগের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা, অবহেলা উদাসীনতা সত্ত্বেও আমাদিগের কিছু না কিছু মঙ্গলসাধন করিয়াই যায়। আমরা তোমার প্রেমের স্রোতে আপনাদিগকে অর্পণ করিলে যেরূপ সহজে উন্নতির পথে চলিতে পারি, তাহা না করিলে সেরূপ হইতে পারে না বটে, আমাদিগকে নানা প্রকার দুঃখ কষ্টে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হয় সত্য, তথাপি তোমার করুণা আমাদিগকে তোমার না করিয়া কখনও ক্ষান্ত হইবে না। উৎসবের মধ্যে তুমি আমাদিগকে ইহা বিশেষভাবেই অনুভব করিতে দিয়াছ। তাই আবার এক উৎসব শেষ হইতে না হইতেই আমাদের জন্য অন্য উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছ—তুমি আমাদিগকে আর মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে দিবে না। এই হেতু আমরা আশান্বিত হৃদয়ে তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। যেরূপ অনন্যগতি হইয়া তোমার শরণ লইতে হয়, সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিতে হয়, আমরা যে ঠিক সেই ভাবে তোমার শরণ লইতে পারি না তাহা তুমি জান। হে করুণাময় পিতা, তুমিই কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই ভাবে প্রস্তুত করিয়া লও। কত বৎসর চলিয়া গেল! এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হইতে পারিলাম না! এবার তুমি আমাদিগকে তোমার করিয়া লও। আমরা আর সকল পরিত্যাগ করি। এক তোমার হাতেই আপনাদিগকে অর্পণ করি। তোমার ইচ্ছা আমাদের জীবনে ও সমাজে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শনিবার—

প্রাতঃকালে ইংরাজীতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত সুব্বাকৃষ্ণায়া আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন ও তাহাদিগকে উপদেশ দেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় তাহাদিগকে কিছু বলেন। এবং বালকবালিকাদের দান সংগৃহীত হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় স্যার নীলরতন সরকারের ব্যয়ে তাহাদিগের প্রীতিভোজন সম্পন্ন হয়।

সায়ংকালে ইংরাজীতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) রবিবার—

প্রাতঃকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

৯ ঘটিকা হইতে উদ্যান সম্মিলন। তথাকার উপাসনাতে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সেখানে আলোচনাদিও কিছু হইয়াছিল। সায়ংকালে মন্দিরে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত

গুরু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
তৎক্রিয়াত্ম বিনিক্ষেপঃ ষড় বিধা শরণাগতিঃ॥

ঈশ্বরসেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ, প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ, 'তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন,' এই বিশ্বাস, তাঁহার রক্ষাশক্তিতে আত্মসমর্পণ, তাঁহার (সুখ দুঃখময়) কার্য্যে আত্মনিক্ষেপ, তাঁহাতে শরণনিষ্ঠ মতি, এই ছয়টী শরণাগতের লক্ষণ।

চৈতন্য চরিতামৃত। মধ্যলীলা, ৫৫৮ পৃঃ

অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব শেষ হইল। আমাদের মধ্যে কত জন, কেহ বা পতি, কেহ বা পত্নী, কেহ বা পুত্র কন্যা, কেহ বা পিতামাতা, হারাইয়া বুকে বিষম বেদনা লইয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা সুদীর্ঘকাল যাঁহাদিগের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি, এবার তাঁহাদিগকে নিকটে না দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় কত ব্যথিত হইয়াছে! কিন্তু চোখের জলের মধ্য দিয়াই তাঁহার করুণার স্পর্শ আমরা নিবিড়তর রূপে অনুভব করি। তাই, যাঁহারা প্রিয়জনকে হারাইয়া কাতর হইয়াছিলেন, যাঁহারা দুঃখভার লইয়া উপাসনালয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা ও আশার বাণী শুনাইয়া উৎসব সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

মাঘোৎসবে আমরা যে সকল সদুপদেশ শুনিয়াছি, সেগুলি দুই শ্রেণীতে স্থাপিত হইতে পারে। কয়েকটী উপদেশ সামাজিক সাধনের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রজাপতি মধু পান করে, মধু আহরণ করে না; ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায়, মধুচক্ররচনার দিকে তাহার মন নাই। ব্রাহ্মগণ প্রজাপতি হইবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না, মধুচক্র হইতে চেষ্টা করিবেন। ব্রাহ্মগণের মিলনের নিয়ম ধর্ম্মসাধন; ব্রাহ্মসমাজ যদি ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে না পারে, তবে ইহার কোনও আশা নাই। ধর্ম্ম রাজা, সংসার প্রজা; কিন্তু ব্রাহ্মগণের নিকটে ধর্ম্ম পদতলে লুণ্ঠিত ভিখারীর মত দীন বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম হইতে ভিক্ষুকের বেশ দূর করিতে হইবে। ধর্ম্মের দাবী স্বীকার করিতে হইবে—এক জন আচার্য্য এই অপ্রিয় সত্যসমূহ আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া দিয়াছেন। অপর এক জন সমবেত সাধনে আমাদিগের ঔদাস্য ও ব্যর্থতা বিবৃত করিয়াছেন। সকলেই যে নিরাশার কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের মিলিত চেষ্টায় কিরূপে এক নব সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে, কিরূপে ইহার মুক্তিপ্রদ বার্ত্তা শুনিয়া কত নিঃসহায় নিরয়মগ্ন পাপী তাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে, এই সুসমাচারও বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগের একমাত্র সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিক সম্পদ্, বারংবার নানা ভাবে এই তত্ত্বটীও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গত বৎসরের ন্যায় এবারও অনুভব করিয়াছি, সামাজিক উপাসনার প্রতি বহু ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার যথোচিত অনুরাগ দেখা যাইতেছে না। ইহা একটা ভাবনার বিষয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপদেশগুলি ব্যক্তিগতসাধনবিষয়ক। এগুলির প্রধান সুর বেদনা। হাস্যকৌতুকের পথে শান্তি নাই, আশ্রয় নাই, ক্লেশকে পরম সম্পদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি কদাপি বুকভাঙ্গা বেদনায় মাটীতে লুটাইয়া না পড়িয়াছে, তাহার বিদ্যা বৃথা। নিরাশ্রয় না হইলে পরমাশ্রয়কে পাওয়া যায় না। আত্মার দুইটী পক্ষ, একটী বেদনা, দ্বিতীয়টী ভূমানন্দ। সেই কামনাহরণের রূপ দর্শন করিলে সকল দুঃখের উপশম হয়। মানবজীবনের নিত্য সাধনীয় বস্তু প্রেম। প্রেমের অর্থ বেদনা। প্রেমের পথ সুগম নয়; বেদনাতেই জীবনের সাফল্য। শোক তাঁর সেবা, শোক তাপে তাপিত হওয়াই আরাধনা। স্বার্থপরতার তুল্য অকল্যাণ নাই, প্রেমদানের তুল্য কল্যাণ নাই। প্রেম আমাদিগকে জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করে। যে পুণ্যপুঞ্জদ্বারা প্রেমধন লাভ করিয়াছে, তাহার সকলই তুচ্ছ। আচার্য্য এই যে উপদেশগুলি মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, ইহা স্মরণ রাখিয়া সাধনে নিযুক্ত হইলে আমরা কৃতার্থ হইতে পারি।

এই বেদনার সুরটী এবার খুব কালোপযোগী হইয়াছে। নবীনবয়াঃ উপাসকগণ হয়ত একথা স্বীকার করিবেন না। আমি নিজের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিতেছি। কে এমন ভাগ্যবান আছে, যাহার অন্তরে কোনও ব্যথা নাই, যে অব্যক্ত, দুঃসহ দুঃখে পীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করে নাই, কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে অশ্রুমোচন করিতে করিতে অগতির গতি অনাথনাথের পদতলে শরণ লইতে চাহে নাই! "তিনি যাহাকে ভাল বাসেন, তাহাকে শাসন করেন"—আমরা অনেকেই তাঁহার দ্বারা শাসিত ও দণ্ডিত হইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেমের পরিচয়ও নিয়তই পাইতেছি। আমরা জানি যতদিন না আমরা দেহ মনপ্রাণ দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারিব, তত দিন আমাদিগের শান্তি নাই, আরাম নাই, আনন্দ নাই, দুঃখের অবসান নাই।

চৈতন্যচরিতামৃতে ভক্ত শরণাগতের ছয়টি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আনুকূল্যস্য ইত্যাদি। আমরা যদি ঈশ্বরের শরণাগত হইতে চাই, তবে আমাদিগকে প্রথমতঃ তাঁহার সেবার অনুকূল বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে হইবে। দেহমনের স্বাস্থ্য, জ্ঞানালোচনা, হৃদয়ের বিকাশ, ইচ্ছার সংযম, এই সমুদায় অনুকূল বিষয়। দেহ ভগবানের মন্দির, দেহ ভগ্ন হইয়া পড়িলে তাঁহার সেবার ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য দেহের যত্ন ধর্ম্মসাধনের অন্তর্গত। জ্ঞানের উন্নতি ও ধর্ম্মের উন্নতি এক সূত্রে গ্রথিত। জ্ঞানবিমুখ ভক্তি মানুষকে কিরূপে অধঃপাতে লইয়া যায়, তাহা আমরা চক্ষুর সম্মুখে অহরহই দেখিতে পাইতেছি। ভক্তি যে জ্ঞান ছাড়া বাঁচিতে পারে না, তাহার একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই, যে চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মকে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আস্তিক্যবুদ্ধি ও অনুরাগ থাকিলে সকল বিদ্যাই সাধকের চিত্তে ভক্তি-উদ্দীপনের সহায় হইতে পারে। চৈতন্য বলিতেছেন,

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম;
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফূরণ।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি॥
সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি। মধ্য। ১৮৬ পৃঃ

স্থাবর জঙ্গম দেখিয়া যেমন ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়, স্থাবরজঙ্গমবিষয়ক বিদ্যার অনুশীলনও তেমনি ব্রহ্মস্ফূর্ত্তির সাহায্য করিয়া থাকে। হৃদয়ের বিকাশ প্রেমের সাধনের উপরে নির্ভর করে। বৈষ্ণবশাস্ত্র এই সাধনটীকে 'জীবে দয়া' বলিয়া প্রচার করিয়াছে। আমরা ইহাকে বলি, 'ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধন'। ইচ্ছার সংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম একই কথা। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহা শম দম উপরতি তিতিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এগুলি পরোক্ষ সাধনের অন্তর্গত। অপরোক্ষ সাধনের মধ্যে উপনিষদুক্ত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ধ্যান ধারণা ও সমাধি সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, নামকীর্ত্তন, সামাজিক উপাসনা অপরোক্ষ সাধনের বিভিন্ন অঙ্গ। বৈষ্ণবেরা এক কথায় ইহাকে বলিয়াছেন, 'নামে রুচি।' "নামে রুচি জীবে দয়া সর্ব্বধর্ম্ম সার।" কেহ কেহ হয় তো বলিবেন, এ সমুদায় তো জীবনব্যাপী সাধনসাপেক্ষ। আমরা কি ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তবে ঈশ্বরের শরণ লইবার যোগ্য হইব? আমরা যে এখনই তাঁহার শরণাগত হইতে চাই। আমরা আপনার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, আপনার ভার বহিতে বহিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি; আমরা তাঁহার আশ্রয় পাইয়া তাঁহার 'নিরাপদ কোলে' থাকিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভর হইব, ইহাই আমাদিগের আকিঞ্চন। কথাটা অযৌক্তিক নহে। ইহার উত্তরে বলিতে হয়, আমরা যতটা পারি, তাহাই করি না কেন? যাহা যাহা তাঁহার সেবার অনুকূল, সাধুসঙ্গ, সদালোচনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সজন ও নির্জ্জন উপাসনা, সত্যানুসরণ, প্রেমানুগত্য, পুণ্যানুরাগ— এগুলির কোনটাই তো আমাদিগের সাধ্যের অতীত নহে— এগুলি গ্রহণ করিতে বাধা কি? যিনি যতটুকু অনুকূল বলিয়া অনুভব করেন, ততটুকুই পালন করুন, তাহাতেই আত্মার কল্যাণ হইবে।

অনুকূলবিষয়গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহা যাহা পূর্ব্বোক্ত অনুকূল বিষয়-সমূহের বিপরীত তাহাই ঈশ্বরসেবার প্রতিকূল। বিষয়াসক্তি, রিপুপরবশতা, মোহ ও প্রমাদ এবং সর্ব্বোপরি অপবিত্রতা, শরণাকাঙ্ক্ষীর বর্জ্জনীয়। যাহা কিছুর সহিত দুর্নীতির লেশমাত্র সংস্রব আছে, যাহা কিছু ভোগলালসা উদ্দীপিত করে, মলিন কামনার প্রশ্রয় দেয়, পাপে রুচি ও পুণ্যে অরুচি জন্মাইয়া আত্মাকে বলহীন করিয়া ফেলে, শরণার্থী তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবেন। উন্মার্গগামিতা তো ধর্ম্মসাধনের মহা শত্রু বটেই—অবিশুদ্ধ আমোদপ্রিয়তাও উহার গুরুতর অন্তরায়। যিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার পক্ষে নীতিপরায়ণতা এত প্রয়োজনীয়, যে একদা সাত্বিক প্রকৃতি ভগবদ্ভক্ত রবার্টসন সংশয়তিমিরে পতিত আকুল আত্মার অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন," মানুষ যখন অবিশ্বাসে পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখে, ধরিবার ছুঁইবার কিছুই পায় না, 'জীবন অর্থহীন, মৃত্যুই আত্মার পরিণতি, ঈশ্বর এই প্রাণহীন নিখিলজগৎ হইতে আপনাকে প্রত্যাহরণ করিয়াছেন,' এই ভাবিয়া যখন সে হতাশ্বাস হইয়া পড়ে, তখন তাহার এই ভীষণ অবস্থা হইতে অক্ষত থাকিয়া উদ্ধার পাইবার একটীমাত্র উপায় আছে; সে উপায়টী এই যে, যাহা তাহার নিকটে এখনও ধ্রুব ও সন্দেহাতীত, সেই শাশ্বত ধর্ম্মনীতির সরল ও প্রধান বিধিসকলকে সে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া থাকিবে।" Life I 103

উপর্য্যুক্ত সাধনদ্বয়কে একটী সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে প্রকাশ করিতে হইলে আমরা বলিতে পারি, ঈশ্বরের ইচ্ছার আনুগত্য অর্থাৎ যাহা তাঁহার প্রিয় তাহার অনুবর্ত্তন, ও যাহা অপ্রিয় তাহার পরিহার, ধর্ম্মসাধনের প্রথম সোপান।

শরণাগতের তৃতীয় ও চতুর্থ লক্ষণ, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস, এবং তাঁহার রক্ষয়িতৃত্বে এই বিশ্বাস-প্রণোদিত আত্মসমর্পণ। মানুষ যাঁহার শরণ লইতে চায়, তাঁহার সম্বন্ধে এই বিশ্বাস পোষণ করে, যে তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন, নতুবা সে তাঁহার আশ্রয় খুঁজিবে কেন? আমরা যদি যথার্থই ঈশ্বরের শরণাকাঙ্ক্ষী হই, তবে আমাদিগকে অকপট চিত্তে বিশ্বাস করিতে হইবে, যে তিনি আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না, নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। আমরা কি শুধু অন্নবস্ত্র সম্বন্ধেই এই বিশ্বাস লইয়া জীবনপথে চলিতে থাকিব? তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"—"তিনি চিরকাল সকল প্রাণীকে যথোপযুক্তরূপে সমুদায় প্রয়োজনীয় পদার্থ বিধান করিতেছেন।"—ইহা তো চিরন্তন সত্য। আমার সম্বন্ধে এ বিধির ব্যতিক্রম নাই। তিনি আমার যাবতীয় অভাব মোচন করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, যতদিন দেহ থাকিবে, রক্ষা করিবেন। কিন্তু যে দিন অন্ন জুটিবে না, মাথা রাখিবার ঠাঁই মিলিবে না, মুখ তুলিয়া চাহিবার কেহ থাকিবে না, 'বায়ুভূত নিরাশ্রয়' হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব, সেই দিনই কি ভাবিব, তিনি আমার প্রতি বিমুখ হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে বিরত হইয়াছেন? না, প্রাণপণে এই বিশ্বাস ধরিয়া পড়িয়া থাকিব, যে তিনি আমাকে সকল আশ্রয়ে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং পরমাশ্রয়রূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন? "সম্পদে তোমায় করি ধন্যবাদ, বিপদে বিষণ্ণ, এ তো অপরাধ।" ধনজনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা সহজ, কিন্তু দুঃখ বিপদের ঘনান্ধকারে তাঁহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করা এবং তাঁহার করুণা ও রক্ষয়িতৃত্বে অবিচলিত নির্ভর রাখা—এইটি অতি কঠিন হইলেও নিত্য প্রয়োজনীয় সাধন। একা সরলপ্রাণ শরণভিখারীই বলিতে পারেন, "Though he slay me yet will I trust in him" "তিনি যদি আমাকে মারিয়াও ফেলেন, তথাপি আমি তাঁহাতে বিশ্বাস রক্ষা করিব।" কিন্তু যতক্ষণ শুধু দেহের মঙ্গলামঙ্গলে তাঁহার করুণার পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট থাকি, ততদিন আধ্যাত্মিক জীবনের নিম্নতর ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছি। দৈহিক সুখ দুঃখের অতীত আত্মলোকে তাঁহার মহিমা, তাঁহার দয়া স্পষ্টতররূপে অধিকতর মনোহররূপে প্রকাশিত। পুনঃ পুনঃ পাপপ্রলোভনের নিকটে পরাজিত হইয়াও জানিয়াছি, তিনি আমার আত্মাকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না, তিনি মহাবিনাশ

হইতে আমাকে রক্ষা করিবেনই করিবেন। তাই অন্তরের নিভৃততম দেশে কখনও তাঁহার তিরস্কার শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হই, কখনও আশা ও উৎসাহের বাণী শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াই, নূতন প্রতিজ্ঞায় বুক বাঁধিয়া আবার সাধনপথে যাত্রা করি। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্য কথোপকথন মুমুক্ষুর পরম সম্বল।

পঞ্চম লক্ষণটি উপরে যাহা বলা হইল, তাহারই প্রপূর্ত্তি। তিনি আমার রক্ষক, পালনকর্ত্তা, আমাকে সর্ব্বাবস্থায় নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, ইহা যদি বিশ্বাস করি, তবে সুখ বা দুঃখ যাহা তাঁহার হস্ত হইতে আসিবে, তাহাই শিরে তুলিয়া লইতে পারিব। তাঁহার দান স্বাদু হউক বিস্বাদ হউক, বিশ্বাসীর নিকটে সমভাবে আদরণীয়। তাঁহার কাধ্যে আত্মনিক্ষেপ বাক্যটীর অর্থ তাঁহার বিধানস্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া, ভাসাইয়া দেওয়া, ঝাঁপাইয়া পড়া। প্রিয় অপ্রিয় যাহা কিছু ঘটিবে, অপরাজিতচিত্তে আমাদিগকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু বিপুলায়তনকর্ম্মক্ষেত্রে, বহুজনের নয়নসমক্ষে, বীরত্বব্যঞ্জক যশস্কর ক্রিয়াকলাপে, কিংবা কদাচিদুপস্থিত অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে নয়—কিন্তু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, সাধারণ কাজকর্ম্মে, দৈনন্দিনব্যাপারে, আলাপেব্যবহারে, হাটেবাজারে, বিশ্রামালয়ে রন্ধনাগারে নিত্য নৈমিত্তিক ছোট বড় সমুদয় ঘটনার চঞ্চল উচ্ছ্বসিত প্রবাহে স্থিতধী হইয়া মনস্তুষ্টিকর বিষয়ের ভোগ ও দুঃখদায়ক বিষয়কে পরিপাক করিতে অভ্যস্ত না হইলে আমরা প্রকৃত শরণাগত হইতে পারিব না।

কথাটীর অন্যপ্রকার অর্থও করা যাইতে পারে। তাঁহার কার্য্য বা সেবা সুখকর বা দুঃখকর, যাহাই হউক না কেন, তাহাতেই আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এটী সেবাধর্ম্মের সনাতন নিয়ম। ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্মের যেটুকু ভাল লাগে তাহা করিব, যাহা রুচিকর নহে তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইব, শরণার্থীর এরূপ ভাবিবার অধিকার নাই। মানুষ কোন ক্ষেত্রেই নির্ব্বিচারে স্বীয় অভিরুচির অনুসরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। শিক্ষার্থীকে নিজের রুচিবিরুদ্ধ বহু বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্দাম প্রকৃতিকে সংযত ও শৃঙ্খলিত করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের পথে অগ্রসর হইতে হয়। যে ব্যক্তি ধন চায়, সে ধনের আশায় কতই না অপ্রীতিকর শ্রমসাধ্য কর্ম্মে আপনাকে অহর্নিশি নিযুক্ত রাখে! ফলতঃ দুঃখের সহিত সংগ্রাম মানবজীবনের নিয়তি—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, চতুর্বর্গের কোনটীই কঠোর আয়াস ব্যতীত লভ্য নহে। অতএব, আমরা যদি তাঁহার শরণ প্রার্থনা করি, তবে আমাদিগকে ক্লেশসাধ্য কর্ম্মে, অমনোরম সেবায়, চিত্তবিক্ষোভকারী ব্যাপারে অন্তরের বিদ্রোহিতা দমন করিয়া, বিশ্বস্ত ভৃত্যরূপে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া, সংসারে বাস করিতে হইবে।

শরণাগতের ষষ্ঠ লক্ষণ, ঈশ্বরে শরণনিষ্ঠ মতি। যিনি সকল বিষয়ে ইষ্টদেবতার ইচ্ছার অনুগামী, তাঁহার রক্ষাশক্তিতে যাঁহার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর আছে, যিনি সুখে দুঃখে তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত হইয়া চলিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার মতি ভগবৎশরণে একনিষ্ঠ হইয়াছে, ইহা আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি। আমরা ঈশ্বরের শরণ চাই, অপর কাহারও শরণ চাহি না; আমরা তাঁহার শরণ পাইব, কেন না, তিনি আমাদিগকে কদাপি তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত করিবেন না; তাঁহার শরণ না পাইলে আমাদিগের দিন চলে না; পিপাসার্ত্ত প্রাণী যেমন স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী পানে ধাবিত হয়, তেমনি আমাদিগের আকুল আত্মা তাঁহার চরণাশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া চলিয়াছে—এই প্রকার আকুলতা দ্বারা আবিষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাতে শরণনিষ্ঠ মতি উদিত হইয়াছে।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার সারনিষ্কর্ষ নিম্নোক্ত দুই পংক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে—

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ,
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ।

অনন্তর কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইয়া অদ্যকার ও এ বৎসরের মাঘোৎসবের কার্য্য শেষ হয়। পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু অনেকেই অনুভব করেন উৎসব শেষ না হইয়া আরম্ভই হইল। এবার বিশেষভাবে ইহাকে সম্বৎসর ধরিয়া রক্ষা করিতে হইবে।

আমরা জানি অতি অসম্পূর্ণ ভাবেই উৎসবের বিবরণ প্রদান করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। তথাপি তাঁহার করুণায় আমাদের কাজ যতটুকু করিতে পারিলাম, তাহার জন্য তাঁহারই নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। সকল বিষয়ে তাঁহারই জয় হউক, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

উৎসবে উদ্দীপনা

আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে, তাহার পরে ব্রাহ্মসমাজ শত বৎসর অতিক্রম করিবে। এজন্য আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মগণ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত মহোৎসবের আয়োজন করিতেছেন। এই দুই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী পুরুষ ও নারীদিগের চিত্ত যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ জন্য যাঁহার মন ব্যাকুল হইবে না, তিনি যত বড় জ্ঞানীই হউন আর ধার্ম্মিকই হউন, তাঁহার যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি মোটেই অনুরাগ নাই, তাহাই বুঝিতে হইবে। শত সহস্র পুরুষ ও নারী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, যে সমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়াছেন, কত সত্যরত্ন লাভ করিয়াছেন, মানবজীবনের বিচিত্র রহস্যকথা অবগত হইয়া অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন এবং জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের যুগে জীবন্ত ঈশ্বরের অনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রেমে অন্তর প্লাবিত করিবার উপায় অবগত হইয়াছেন;—তদ্ভিন্ন কত পুরুষ ও নারী ব্রাহ্মসমাজের আশ্চর্য্য উপাসনার অধিকারী হইয়া সংশয়ের মধ্যে বিশ্বাস, দুর্ব্বলতার মধ্যে বল, পাপের মধ্যে পুণ্য এবং দুঃখ ও শোকের মধ্যে সুখ ও শান্তিলাভ করিতেছেন;—কত পুরুষ ও নারী এই নূতন সমাজে বাস করিয়া শিক্ষা, স্বাধীনতা

ও বর্ত্তমান উন্নত যুগের আদর্শের অনুরূপ বহু প্রকার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুখ লাভ করিয়াছেন; সেই ব্রাহ্মসমাজের শত বৎসর পূর্ণ হওয়ার আমরা কি মহোৎসব এবং ঈশ্বরের অসীম করুণা ও এই সমাজের ঈশ্বরের সেবকদিগের সাধনা ও ত্যাগের কথা স্মরণ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমরা যদি হীন স্বার্থপর লোকের মতন অকৃতজ্ঞ এবং পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অবসাদগ্রস্ত মানুষ না হই, তবে নিশ্চয়ই আমরা উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত উৎসবের আয়োজন করিয়া আধ্যাত্মিক আনন্দে হৃদয় প্লাবিত করিব।

কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, শুধুই কয়েক দিন উৎসাহের সহিত উৎসবের উপাসনা, বক্তৃতা, আলোচনা এবং যুবকসম্মিলন, বালকবালিকাসম্মিলন ও উদ্যানসম্মিলন করিলেই চলিবে না। কেহ মনে করিবেন না যে, ঐ সকল অনাবশ্যক বলিয়া, আমি মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ করিতে অথবা উৎসাহীলোক-দিগের গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিতে চাহি। আমি নিশ্চয়ই জানি, এইরূপ উপাসনা, বক্তৃতা ও সম্মিলনই ধর্মসমাজের লোকের প্রাণে বিশ্বাস ও প্রেম এবং সেবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিবার একটী শ্রেষ্ঠ উপায়। অন্তরে বিশ্বাস, ব্যাকুলতা ও আশা লইয়া উহাতে যোগদান করিতে পারিলেই যে আমরা আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ করিয়া সবল হইব, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? তবে, আমার বিশেষ কথা ও প্রস্তাব এই যে, এই উৎসবেরই কর্ত্তব্য মনে করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগের একটী মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমাদের নেতৃস্থানীয় সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রাণ-কৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, বরিশালের শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি দলবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া, পুরুষ ও নারী সকলেরই হৃদয়ে একটা উদ্দীপনা জাগাইতে চেষ্টা করিবেন; অন্ততঃ এক দল পুরুষ ও নারী যাহাতে এই নূতন বৎসরে, নব উদ্যমে, নবোৎসাহে ধর্ম্মসাধনে এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মশক্তি নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হন, সেই জন্য যত্নবান হইবেন।

এখন সেই সময় আসিয়াছে, যখন প্রত্যেক বয়স্ক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, আমাদের সমাজের প্রত্যেক তরুণ যুবক ও তরুণী চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি? কেন আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি? বিপুল হিন্দুসমাজের পার্শ্বে কেন একটা নূতন সমাজ গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছি? এদেশে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক যেমন টাকা রোজগার করিয়া, খাইয়া, ঘুমাইয়া, স্ত্রীপুত্রকে সুখে রাখিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেছেন, আমরা কি সেই রকমই আহার নিদ্রায় আমোদে প্রমোদে তৃপ্তিলাভ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল বলিয়া মনে করিব? তাহা হইলে স্বতন্ত্র একটা ব্রাহ্মসমাজের কি প্রয়োজন ছিল? আহার নিদ্রা ও স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের পক্ষে প্রাচীন হিন্দুসমাজই কি যথেষ্ট নয়? আমাদের প্রত্যেক ব্রাহ্মের বুকে হাত দিয়া এই কথাই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া আহার করা নিদ্রা যাওয়া ও স্ত্রীপুত্রকে সুখে রাখাও আমাদের জীবনের একটা বড় কাজ বটে; কিন্তু তাঁহার চেয়েও আমাদের সম্মুখে মহৎ লক্ষ্য ও জীবনের সুমহৎ আদর্শ আছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয়, সেই মহৎ লক্ষ্য এবং জীবনের সেই সুমহৎ আদর্শই হইতেছে—ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তিযোগে যুক্ত হইবার জন্য ধর্ম্মসাধন এবং তাঁহার সেবার জন্য ত্যাগস্বীকার। সাধন ও সেবা—ঈশ্বরকে লাভ করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা—ইহাই ত ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য। আমাদের সকলেরই আত্মার গূঢ়তম স্থানে অনন্তের জন্য মহা তৃষ্ণা রহিয়াছে, অনন্তকে পাইবার নিমিত্ত অন্তরাত্মা ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছে। সংসারের কোন্ ধনৈশ্বর্য্য, কোন মান-মর্য্যাদা আত্মার এই ক্রন্দন থামাইয়া শান্তি দান করিতে পারে? তাহা ত পারে না। তাই বলি, অনন্তকে চাই-ই চাই, তাঁহাকে না পাইলে মানবাত্মার কিছুতেই যে চলে না। সেই জন্য মানবাত্মা যেমন অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে আত্মসমর্পণ করিতে চায়, তেমনি আবার সেই অনন্তের অংশ যে অগণ্য নরনারী,—মানুষ তাঁহাদের সেবা করিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রেম চরিতার্থ করিতে চায়। সেই জন্যই সাধন ও সেবা—এই উভয়ই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য। এই মহাকার্য্যের জন্যই আমাদের জন্মগ্রহণ, সংসারে বাস এবং ধর্ম্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করা।

তাই ত বলিতেছি, আমাদের সমাজের প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার অন্তরে, ধর্ম্মসাধন ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই কাজটি কথায় যত সহজ, কাজে যে সে রকম সহজ নয়, তাহা আমি জানি। কিন্তু সহজ না হইলেও এই কাজটিই আমাদিগকে করিতে হইবে, এইটিই বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার এক প্রধান উপায়। এই কাজের নিমিত্ত বয়স্ক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও তরুণ যুবক ও তরুণীদের অন্তরে উদ্দীপনা জাগাইতে ও শক্তি-সঞ্চার করিতে হইলে, সমাজের নেতৃস্থানীয় পরমশ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের গৃহে গমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভাবোদ্দীপক উপাসনা ও সঙ্গীত করিবেন; তাহার পরে স্পষ্ট-ভাষায় খোলাখুলি ভাবেই বলিবেন, হে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, তোমাদের খাওয়া-পরা, তোমাদের সুখে থাকা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বটে, কিন্তু উহার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ নয়, উহার চেয়েও ব্রাহ্মজীবনের মহৎ উদ্দেশ্য আছে। নীতিতে সুপবিত্র, ভক্তিতে সুমধুর এবং আত্মোৎসর্গের সমুজ্জ্বল জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মদিগের সুমহৎ লক্ষ্য। সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের করুণায় ও পরস্পরের সাহায্যে এই লক্ষ্য সাধন করাই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। অতএব সকলে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হও, ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হও, ঈশ্বরপ্রেমিক এবং তাঁহার সেবক হইয়া জীবনকে ধন্য কর। নচেৎ ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া উহার দলবৃদ্ধি করিয়া, ছত্রিশ জাতির উপরে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা সাইত্রিশ জাতি গড়িয়া হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া লাভ কি?

করুণাময় ঈশ্বর কৃপা করিয়া ইহাই করুন, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অর্দ্ধশতাব্দীর এবং ব্রাহ্মসমাজের শত বৎসরের উৎসবে, তাঁহার পরম প্রিয় সেবকগণ যেন আমাদের অন্তরে উদ্দীপনা জাগাইতে সমর্থ হন, তিনি স্বয়ং যেন আমাদের হৃদয়ে শক্তি-

সঞ্চার করেন; আমরা যেন তাঁহার সাধন ও সেবার জন্য মহৎ সংকল্প গ্রহণ করিয়া, সেই সংকল্পের অনুরূপ মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব—মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপার করুণায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। আগামী ইষ্টারের ছুটির সময় এই উপলক্ষে বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকলকে এই দিনের স্মৃতিতে হৃদয়ের প্রীতি অর্পণ করিতেছেন এবং এই পবিত্র ব্রহ্মোৎসবে সকলের শুভ কামনা ও সাহচর্য্য প্রার্থনা করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই পঞ্চাশ বৎসরে সকলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ভগবানের করুণার কত পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার প্রেমের কত লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন! আজ তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার দিন; আজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তাঁহার প্রেমের সাক্ষ্য দিবার দিন। এই উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। সকলে সপরিবারে ও সবান্ধবে এই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিয়া ভগবানের করুণার সাক্ষ্য দিবেন, এবং তাঁহাদিগের প্রেম ও ভক্তির দ্বারা উৎসব সফল করিবেন, ইহাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিনীত নিবেদন। নিম্নে উৎসবের কার্য্য-সূচী প্রদত্ত হইল।

কার্য্য-সূচী।

৫ই এপ্রিল, (২৩শে চৈত্র) বৃহস্পতিবার—সায়াহ্ন ৭ ঘটিকায় উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৬ই ,, (২৪শে চৈত্র) শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন। ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। উপাসনান্তে "জীবনে ভগবানের করুণার সাক্ষ্য" বিষয়ে আলোচনা। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সভ্যগণের সম্মিলন। সভাপতি পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত "ব্রাহ্ম সমাজের শক্তিবৃদ্ধি" বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করিবেন। সায়াহ্ন ৭ ঘটিকায় "ব্রাহ্মসমাজের বার্ত্তা" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৭ই ,, (২৫শে চৈত্র) শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন। ৭ ঘটিকায় যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। দ্বিপ্রহরে যুবকদিগের সম্মিলন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বালকবালিকা-সম্মিলন। "সায়াহ্ন ৭ ঘটিকায় ব্রাহ্মসমাজের কাজ" বিষয়ে বক্তৃতা।

৮ই ,, (২৬শে চৈত্র) রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উষা কীর্ত্তন। ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। তৎপরে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রার্থনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় মহিলাদিগের সম্মিলন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন। সায়াহ্ন ৭ ঘটিকায়—উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৯ই ,, (২৭শে চৈত্র) সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী। মধ্যাহ্নে প্রীতি-ভোজন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় "প্রচার" বিষয়ে আলোচনা; সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আলোচনা উপস্থিত করিবেন। সায়াহ্ন ৭ ঘটিকায়—উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

মফঃস্বল হইতে আগত অতিথিদিগের বাস ও আহারের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৪শে মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ শীলের মাতা হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার অসুখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই মার্চ্চ পরলোকগত নলিনীকুমার দত্তের আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস শাস্ত্র পাঠ করেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রকুমার জীবনী পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন।

বিগত ১৮ই মার্চ্চ পরলোকগত লর্ড সিংহের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং দ্বিতীয় পুত্র অনারেবল শিশিরকুমার সিংহ জীবনী পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১০ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের দৌহিত্রী কল্যাণীয়া আশালতা ভদ্র ও শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ সমাদ্দারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে যোগেশ বাবু ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ—করুণাময়ের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—২৩শে ফাল্গুন, সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। কিছুকাল কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উৎসবের প্রস্তুতির জন্য উপদেশ দেন। ২৪শে ফাল্গুন—প্রাতে উষাকীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্রের পরলোকগত পিতৃদেবের স্মৃতি লইয়া কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। এবেলাও বরদা বাবুই আচার্য্যের কার্য্য করেন। আরাধনান্তে সাধারণ প্রার্থনার পর দীনবন্ধু বাবু কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রার্থনা করেন; অতঃপর জলযোগান্তে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়। ২৫শে প্রাতে কীর্ত্তনান্তে উপাসনা; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য

করেন এবং এক পরমজ্যোতি পরম গুরুর উপর নির্ভর করিয়াই মানুষ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, এই মর্ম্মে উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে মহিলা-উৎসব; শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত উপাসনা এবং মহিলাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে জলযোগান্তে উৎসব শেষ হয়। সন্ধ্যায় কিছুকাল কীর্ত্তনের পর, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি নিজেই সঙ্গীত উপাসনা এবং উপদেশ প্রদান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। ২৬শে প্রাতে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে নগর সঙ্কীর্ত্তন; গায়কগণ মন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হইলে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন; অতঃপর সকলে মিলিয়া নগরের নানা স্থানে প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে কিছুকাল কীর্ত্তন চলিতে থাকে; তৎপরে একটি সঙ্গীত হইলে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর বক্তৃতা করেন; বক্তৃতার বিষয়—"জীবনের তিন অধ্যায়—স্বার্থ, পরার্থ ও পরমার্থ।" একটী সঙ্গীত হইয়া কার্য্য শেষ হয়। ২৭শে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব,—প্রাতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বেদী গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু যথাসময়ে গান ধরিলেন "মধুর প্রভাতকালে মিলিয়ে সকলে প্রীতির অঞ্জলি দিব মায়ের চরণকমলে" ইত্যাদি। আচার্য্য এই সঙ্গীতটী অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বরে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষায় উপাসনা করেন। উপাসনান্তে জনৈক ভক্ত—শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ কর্ম্মকার--স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপাসকমণ্ডলীর জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন; মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন; অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকায় একটি সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু এম্ এ, কিছু পাঠ করিলে পর নানা বিষয়ে আলোচনা হয়; সায়ংকালে কিছুকাল কীর্ত্তনের পর, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন; এ বেলাও অমলবাবুই সঙ্গীতদ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। উপাসনা মধুর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—১লা হইতে ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার সুযোগ হইল না। উৎসবের পূর্ব্ব হইতে নগরে উষাকীর্ত্তন, চারিদিবস বিভিন্ন ব্রাহ্ম পরিবারে উৎসব, প্রীতি-জলযোগ, কাঙ্গালী-বিদায়, বালকবালিকাসম্মিলন, ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব, ছাত্র সমাজের উৎসব, ব্রাহ্ম বন্ধু সভার উৎসব, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ এবং আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্রের স্মৃতিকল্পে উপাসনা, সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশন, নগরসঙ্কীর্ত্তন, সুহৃদ্-সম্মিলন ও প্রীতিভোজন প্রভৃতি বহু অঙ্গে উৎসব সফলতা মণ্ডিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন টাউন হলে মনোমোহন বাবুর সভাপতিত্বে বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "মাঘোৎসবের বাণী" বিষয়ে, ব্রহ্মমন্দিরে "পথের সম্বল" বিষয়ে, মনোমোহন বাবু "কৃপা-রহস্য" বিষয়ে, সত্যানন্দ বাবু "নব মুক্তি" বিষয়ে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। মহর্ষির স্মরণার্থসভায়, ব্রাহ্ম বন্ধু সভার উৎসবে মনোমোহন বাবুর সভাপতিত্বে সতীশবাবু, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস, বাবু রসরঞ্জন সেন বি, এ, বাবু শ্রীচরণ সেন, বাবু প্রসন্ন কুমার দাস প্রভৃতি বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। ছাত্রসমাজের উৎসবে সত্যানন্দ বাবুর সভাপতিত্বে কুমারী লীলাময়ী চক্রবর্ত্তী, কুমারী শান্তি সুধা ঘোষ এবং অধ্যাপক শরৎ কুমার সেন এম এ, বাবু রসরঞ্জন সেন বি এ ও কল্যাণ কুমার চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। বালক বালিকা সম্মিলনে প্রায় ৬ শত বালকবালিকার সমাবেশ হইয়াছিল। মনোমোহন বাবুর সভাপতিত্বে সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং বক্তৃতাদি হয়। উৎসবে প্রধানতঃ মনোমোহন বাবু, সত্যানন্দ বাবু, সতীশ বাবু, মন্মথ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদ্ভিন্ন বাবু রাজকুমার ঘোষ, বাবু ললিতকুমার বসু কোন কোন দিন আচার্য্যের কার্য্য এবং অন্যান্য বন্ধুগণ পরে প্রার্থনাদি করেন। উদ্বোধনে, ১১ই মাঘ মধ্যাহ্নে, ১০ই রাত্রিতে সতীশ বাবু, মহর্ষির স্মৃতি, নবদ্বীপচন্দ্রের স্মৃতিকল্পে উপাসনায় নগর সংকীর্ত্তনান্তে, ১১ই মাঘ রাত্রিতে, ১৩ই প্রাতে মনোমোহন বাবু, ১১ই প্রাতে, সুহৃদ সম্মিলনে সত্যানন্দ বাবু, ১লা মাঘ প্রাতে, ১২ই মাঘ প্রাতে মন্মথ বাবু এবং ৮ই মাঘ প্রাতে, ৫ই মাঘ শ্মশানে রাজকুমার বাবু উপাসনাদি করেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীমতী উষাবালা হালদার, এবং ব্রাহ্ম কন্যাগণ সঙ্গীতের সাহায্য করেন। ব্রাহ্মযুবকগণ উৎসবের সর্ব্ববিধ কার্য্যে বিশেষতঃ অর্থসংগ্রহ, মন্দির সাজানো, প্রীতিভোজন, ছাত্র সমাজ ও বালক বালিকা সম্মিলন, কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। উৎসবের আদি অন্তে সহরের বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সমস্ত উৎসবে উৎসবদেবতার কৃপার পরিচয় পাইয়া সকলেই ধন্য হইয়াছেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভায় এ বৎসর মনোমোহন বাবু আচার্য্য এবং সত্যানন্দ বাবু, সতীশ বাবু, মন্মথ বাবু, রাজকুমার বাবু ও বাবু ললিতকুমার বসু সহকারী আচার্য্য নিযুক্ত হন। মন্মথ বাবু সম্পাদক, এবং পূর্ব্ব বৎসরের সহকারীগণ এবং ধনাধ্যক্ষ পুনঃ নির্ব্বাচিত হন। পূর্ব্ব সভ্যগণকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়।

বিগত ১৫ই মাঘ অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মিকাসমাজের বার্ষিক উৎসবে মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শ্রীমতী উষাবালা হালদার সঙ্গীত করেন। প্রীতি জলযোগে উৎসব শেষ হয়।

প্রচার—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী দীর্ঘকাল গুরুতর রোগ ভোগ করিয়া ভগবানের কৃপায় অতি আশ্চর্য্যরূপে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ এই তিন মাস কাল বিবিধভাবে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

জানুয়ারীর প্রথমে বরিশাল জেলার এক গ্রামে আহূত হইয়া স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের নামে তথায় স্কুল প্রতিষ্ঠায় সভাপতির কার্য্য, বক্তৃতা এবং স্কুলের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রার্থনা করেন। মাঘের শেষভাগে পটুয়াখালি গমন করিয়া দুইদিন অবস্থান করেন এবং উপাসনা-গৃহে দুইদিন উপাসনা, "ভূমার সন্তান" বিষয়ে বক্তৃতা, এবং সমাজের কার্য্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং সম্পাদক অম্বিকা চরণ সেন মহাশয়ের পরলোকগমনে বিশেষ উপাসনা এবং সহরের লোকদিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও প্রসঙ্গাদি করেন। ফাল্গুনের শেষ ভাগে নারায়ণগঞ্জ সমাজের উৎসবে আহূত হইয়া ৩।৪ দিন অবস্থান করেন। উৎসবে ২।৩ দিন আচার্য্যের কার্য্য, মহিলা-সমাজে উপাসনা ও উপদেশ, এবং "জীবনের তিন অধ্যায়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন, এতদ্ভিন্ন বন্ধুবান্ধব গণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করেন। নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকায় আহূত হইয়া ১২।১৩ দিন অবস্থান করেন। এই সময় মধ্যে দুই রবিবারে মন্দিরে, ৩।৪ দিন প্রাতের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য এবং সঙ্গীতাদি, ৩দিন সঙ্গতে সভাপতির কার্য্য করেন। ইহা ব্যতীত গ্যাণ্ডারিয়া মহিলা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে "প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা ও রাত্রিতে সাধনাশ্রমের বাড়ীতে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য এবং ২।৩ পরিবারে উপাসনা সঙ্গীত করেন। বহু ব্রাহ্মপরিবারে দেখা শুনা এবং বহু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও প্রসঙ্গাদি করেন। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে আহূত হইয়া ৩ দিন অবস্থান করেন। এই সময় মধ্যে রবিবারে প্রাতে শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের

দেবালয়ে এবং রাত্রিতে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য, এক দিন ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণের সম্মিলনে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আলোচনা এবং ৩টী ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা সঙ্গীতাদি করেন। এখানেও ব্রাহ্ম পরিবার সকলে গমন ও দেখা সাক্ষাৎ এবং প্রসঙ্গাদি করিয়াছিলেন।

নিজ বরিশালে অবস্থান কালে মন্দিরে অনেক দিন আচার্য্যের কার্য্য, ছাত্র সমাজের বক্তৃতায় সভাপতির কার্য্য, সহরের রামকৃষ্ণ উৎসবে সারস্বত বালিকা স্কুলের পুরস্কারবিতরণ সভায়, দুটি অভিনন্দন সভায় এবং মাঘোৎসবে ৪।৫ দিন বক্তৃতা। মাঘোৎসবের আদি অন্ত বিবিধ ভাবে আচার্য্যের কার্য্য, সঙ্গীত, বক্তৃতা, সভাপতির কার্য্য, সঙ্গীতাদি রচনা প্রভৃতি করেন। "ব্রহ্মবাদী" পত্রিকার যাবতীয় কার্য্য, "বাথার পূজা" নামক কবিতা পুস্তক প্রণয়ন; বালিকা স্কুলের সহযোগী সম্পাদকরূপে বিবিধ কার্য্য এবং সহরের নানাবিধ হিতানুষ্ঠানে যোগদান, পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য, সঙ্গীত প্রভৃতি এবং গৃহে আগত বহু লোকের সঙ্গে প্রসঙ্গাদি করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মকে ব্যাখ্যান—লাহোর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কমিটী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ।॥০ টাকা। ইহাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশগুলি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল ভূমিকাতে সংক্ষেপে মহর্ষির জীবনী বিবৃত করিয়াছেন। ইহারদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা ও প্রচারের যে বিশেষ সহায়তা হইবে তাহা বলা বাহুল্য; লাহোর প্রচার সমিতি ইহা প্রকাশ করিয়া অতি ভাল কাজ করিয়াছেন। অনুবাদ এমন সরল হিন্দী ভাষাতে করা হইয়াছে যে, আমাদেরও ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। যাঁহারা বাঙ্গলা জানেন না তাঁহারা ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। বহুদিনের একটি অভাব পূর্ণ হইল দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। মূল্য কিছু কম করিতে পারিলে বোধ হয় প্রচার বিষয়ে অধিকতর সুবিধা হইত।

১। **বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।/০। মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজসমূহের মধ্যে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ উচ্চস্থানই অধিকার করিয়া আছে। ইহার গৌরবময় ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। ইহাতে সংক্ষেপে বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া অপর স্থানের ব্রাহ্মগণও উপকার লাভ করিতে পারিবেন। তাই আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। প্রসঙ্গক্রমে সকল স্থানের সম্বন্ধে একটি সাধারণ মন্তব্য করিতে যাইয়া একটু ঐতিহাসিক ভ্রম ঘটিয়াছে। তাহা এস্থলে প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইতেছে। ১৬-১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মহিলাদের আচার্য্যের কার্য্য এই সর্ব্বপ্রথম।" কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ ১৮৮০ সালে পরলোকগতা অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নিযুক্ত হন এবং তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ১৮৭৬ সালে তথাকার "পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজের" আচার্য্য নিযুক্ত হইয়া প্রকাশ্যভাবে উপাসনাদি করিতে থাকেন। তাঁহার দুইটি উপদেশও পরলোকগত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সেই সময় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুবর্ণ সাম্বৎসরিক

১৩৩৫ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৯২৮, মে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হইবে। এই সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে স্কুল কলেজসমূহ গ্রীষ্মাবকাশের নিমিত্ত বন্ধ থাকে। সেই সময় কলিকাতা হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপক প্রভৃতি স্থানান্তরে গমন করেন। সে নিমিত্ত উক্ত সময় উৎসবের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ইষ্টারের ছুটীর সময় এপ্রিল মাসের ৫ই হইতে ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত উৎসব সম্পন্ন হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। উৎসবের কয়েক দিন প্রত্যহ মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা, কয়েক দিন উষাকীর্ত্তন, এক দিন কলিকাতা মহানগরীতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন, দুইটী বিশেষ বক্তৃতা, দুই দিন ব্রাহ্মসম্মিলনী, এক দিন মহিলাদিগের ও একদিন যুবকদিগের বিশেষ উৎসব, একদিন বালক বালিকাসম্মিলন ও এক দিন উদ্যান-সম্মিলন হইবে। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় প্রচারক ও পরিচারকগণ মিলিত হইবেন এবং মফঃস্বলবাসী সমুদয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণকে উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করা হইবে। তাঁহাদিগের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হইবে। উৎসব উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকার একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরলোকগত নেতৃবৃন্দের ছবি, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি পুস্তক (Album) মুদ্রিত করা হইবে। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রসারের নিমিত্ত একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনেরও চেষ্টা করা হইবে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আনুমানিক ৩০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক।

এই অর্থসংগ্রহ ও উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটী সম্প্রতি তাঁহাদিগের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা উক্ত কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্য ও সহানুভূতিকারিগণের বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, সকলে সমবেত চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এই মহোৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। এই নিমিত্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক যিনি যে অর্থ দান করিবেন তাহা ২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, অথবা ২৮।৫, নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন অথবা ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কমিটীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করিবেন।

আর ভেঙ্কট রত্নম্ নাইডু—মান্দ্রাজ, জি বি ত্রিবেদী—বোম্বাই, এ গোপালন্—কালিকাট, শ্রীবিশ্বনাথ কর—কটক, শ্রীব্রজবিহারীলাল—পাটনা, পি কে রায়—কলিকাতা, শ্রীনেপালচন্দ্র রায়—ঢাকা, শ্রীসতীশরঞ্জন দাস—দিল্লী, রঘুনাথ সহায়—লাহোর, জে আর দাস—রেঙ্গুন, শ্রীশ্রীনাথ চন্দ—ময়মনসিংহ, শ্রীঅতুলানন্দ দাস—ডিব্রুগড়, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী—বরিশাল, শ্রীঅবলা বসু, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীশশিভূষণ দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কলিকাতা, শ্রীব্রজসুন্দর রায় (সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ) শ্রীঅন্নদাচরণ সেন ও শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কমিটীর সম্পাদক)

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৭ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু বি এ।